শারদীয়া ১৪২৯
নবকল্লোল

৬৩ বর্ষ

সেপ্টেম্বর ২০২২ * আশ্বিন ১৪২৯

সূচিপত্র

বিশেষ রচনা

শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লিখিত দেবতাদের দ্বারা গীত দেবীস্তুতি বা দেবীসূক্ত

ভাবানুবাদ : স্বামী তত্ত্বসারানন্দ ১৪

মহাবাক্য

স্বামী সুবীরানন্দ ১৬

কথামৃত ও শ্রীম

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ২৪

নিবন্ধ

চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম-সংকীর্তন
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী ৩২
বাদশা, মনীষীদের প্রিয় খাবার
শিবশংকর ভারতী ৩৭
মহাভারত কথা
ড. জয়ন্ত কুশারী ৫৪
প্রেমে-অপ্রেমে সুভাষচন্দ্র
দেবাশিস পাঠক ৯২
ভারতবর্ষে বয়স্ক মানুষদের অসুস্থতা
—পরিষেবার প্রতিবন্ধকতা এবং প্রতিকার
ডাঃ রবীন চক্রবর্তী ১০১
বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ মস্তিষ্কের উপর
কি প্রভাব ফেলতে পারে?
ড. অমিত কৃষ্ণ দে ১০৫
স্মৃতির অতলে ব্যঙ্গপত্রিকা
চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪১৬

৬টি সম্পূর্ণ উপন্যাস

যোনিকীট
সর্বাণী মুখোপাধ্যায় ৬৫
নিষ্ক্রমণ
নবকুমার বসু ১১৫
খাদের ধারে দুজন
বিনোদ ঘোষাল ১৮৫
এসো অন্ধকারে
জয়ন্ত দে ২৪২

দ্রোহজ
কাবেরী রায়চৌধুরী ৩০১
নীল চোখের মায়াকাজল
সাগরিকা রায় ৩৬০

বড়ো গল্প

গৌরগোপালের মৃত্যু হোক
অমর মিত্র ১৬৬

গল্প

পাত্রীপক্ষ
অর্পিতা সরকার ১০৭
মীরা
বাণী বসু ১৫৭
প্রেম
সমীর গোস্বামী ১৬০
লীলাবতী
সমীরণ মণ্ডল ১৬৪
সাবিত্রী-সত্যবান
স্বপ্নময় চক্রবর্তী ২১৯
ম্যারেজ ডেসটিনেশন
বিনতা রায়চৌধুরী ২২৪
চশমা বদল
দীপান্বিতা রায় ২৩১
ক্ষণজন্মা
নলিনী বেরা ২৭৪
মধুমিতা
কণা বসু মিশ্র ২৭৯
পাকা চাকরি
পার্থ দে ২৮২
পাড়ার গন্ধ
জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ২৯১
কালীঘাটের কুকুর
মন্দাক্রান্তা সেন ৩৩৯
গুপ্তচর
শুভমানস ঘোষ ৩৪৪
পরি ও এক ধর্মযোদ্ধার আখ্যান
দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য ৩৪৮
বিলাওল
বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮৩
তিন পীড়ীওঁকা সম্বন্ধ্‌
শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৩৮৮
নতুন আকাশ
শাশ্বতী নন্দী ৩৯৪
হ্যাঁ, অনিমেষরা মাঝখানে
কল্যাণ মৈত্র ৩৯৯
সহযাত্রী
রূপক চট্টরাজ ৪০৩

কবিতা

স্কুল
সুবোধ সরকার ৬০
মন
যশোধরা রায়চৌধুরী ৬০

মেঘেরা
অনিতা অগ্নিহোত্রী ৬১
স্ববিরোধে সুসভ্যতা
কৃষ্ণা বসু ৬২
স্কেডিউল
চৈতালী চট্টোপাধ্যায় ৬২
শ্রীঠোঁট পাঁচালি
গৌরব চক্রবর্তী ৬২
অন্তরাল ও রূপকথা
রাজেশ গঙ্গোপাধ্যায় ৬৪
প্রতিবেদন
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪
আখতারি বাই
জয়দীপ লাহিড়ী ৬৪
ছোঁয়াচে দূরত্বেরা
উজান উপাধ্যায় ১৮০
সাইকেল
কমলেশ কুমার ১৮০
অসমাপ্ত
অনুষ্টুপ শেঠ ১৮০
যাত্রা শুরুর আগে
বিতস্তা ঘোষাল ১৮১
যদি প্রেম দাও
সৈয়দ হাসমত জালাল ১৮১
বিশালাক্ষীতলা
পূর্বা মুখোপাধ্যায় ১৮১
ইঁদুর-বেড়াল খেলা
পঙ্কজ সাহা ১৮২
হয়তো তোমারই জন্য
মহুয়া ব্যানার্জী ১৮২
অল্প একটু প্রেমে
শোভন মহাপাত্র ১৮২
তিন অধ্যায়
সোমা দত্ত ১৮৪
যেভাবে আমি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি
সুস্মেলী দত্ত ১৮৪

ভ্রমণ

পুনশ্চ আমিরশাহি
নন্দিতা বাগচী ২৩৫

নাটক

অন্ধকারের উৎস হতে
বিভাস চক্রবর্তী ৪০৬

অন্যান্য

চেনা-অচেনা নেতাজির পিতৃভূমি কোদালিয়া
সুব্রত ছাটুই ৩৫৮
পাকিস্তান
জয়ন্ত ঘোষাল ৪১১
লাইমলাইট
কুণাল সেনগুপ্ত ৪৩০
শিল্পী সান্তমূর্তি ৪৩১

পুজোর ভূরিভোজ

মহাষষ্ঠী
চন্দ্রা চট্টরাজ ৪১৯
মহাসপ্তমী
সীমা পালিত ৪২২
মহাষ্টমী
শর্মিষ্ঠা দে ৪২৪
মহানবমী
লীমা রায় ৪২৬
বিজয়া দশমী
অমিতাভ দে ৪২৮

পুজোর দিনকাল

আশ্বিন মাসের রাশিফল
জ্যোতিষাচার্য শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ৩৫৬

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কলমে ৪

প্রচ্ছদ
রাজিকা মজুমদার

বিন্যাস ও কারিগরি সহায়তা
মেগাবাইট

প্রধান উপদেষ্টা
রাজিকা মজুমদার
সম্পাদক
রূপা মজুমদার
ফেসবুক পেজ
Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd.
মুদ্রক
বরুণচন্দ্র মজুমদার
এ. টি. দেব প্রাইভেট লিমিটেড
প্রকাশক
রাজর্ষি মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯
(033) 2350 4294 / 95 / 7887
E-mail : dev_sahitya@rediffmail.com

নবকল্লোল
(033) 2350 0270, (033) 2360 1655
Online Payment
Indian Bank
61, M. G. Road, Kolkata-9, College Square Branch
A/c No. : 20808472955, IFS Code : IDIB000C638
State Bank of India
1B, Mahendra Sreemani Street, Kolkata-9
Amherst Street Branch
Current A/c No. : 10597067084, IFS Code : SBIN0001800
Branch Code : 01800 Amherst.
Punjab National Bank
College Street Branch
A/c No. : 0083050402569, IFS Code : PUNB0008320
চেক অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা পাঠালে শুধুমাত্র
DEV SAHITYA KUTIR PRIVATE LIMITED এই নাম লিখবেন।

এখন যে কোনো মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যায়।
গ্রাহক হওয়ার জন্য গ্রাহক মূল্য Indian Bank এবং
Punjab National Bank-এ পাঠাবেন।
বার্ষিক মূল্য হাতে নিলে ৪৮০ টাকা
রেজিঃ ডাকে এক বছরের গ্রাহক মূল্য ৭২৫ টাকা
রেজিঃ ডাকযোগে একত্রে নবকল্লোল/শুকতারা ১১০০ টাকা
Annual Subscription
UK Rs. 3300 for One Year and USA by Air Mail Rs. 3700
R.N.I. Registration No. 5241

মূল্য ১৫০ টাকা

বিশেষ রচনা

মহাকাব্য

স্বামী সুবীরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী দুটি কথাই একে অপরের সমার্থক, পরস্পর ওতপ্রোত, সম্পৃক্ত। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর একান্ত অনুরাগী সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়ারকে (যিনি 'কিডি' নামে পরিচিত ছিলেন) একটা চিঠি লিখেছিলেন—১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চ তারিখে। চিঠিতে বিবেকানন্দ বলছেন, "The life should written as an illustration of the doctrine of his name."—"জীবনীটি লেখা হবে তাঁর উপদেশের উদাহরণস্বরূপ।" আপনারা অনেকেই হয়তো 'গ্রেট সোয়ান' বইটি পড়েছেন। লেক্স হিকসন বলেছেন— "What or who Ramakrishna is can only be intimated by his own starling words..."—'শ্রীরামকৃষ্ণ কে বা কী?'—তা ওনার বাণীর মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে। ভক্তকবিও বলছেন, 'বাণীরূপে রহিয়াছ মূরতি ধরি'। তাই স্বাভাবিকভাবে আমরা যখন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করতে যাই তার মধ্যে 'বাণী' যেন খানিকটা বেশি গুরুত্ব পেয়ে যায় এবং সেটাই স্বাভাবিক। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অমৃতবাণী সমন্বিত যে কথামৃত গ্রন্থ, তার অনেকটাই কিন্তু জুড়ে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-সাধনা এবং ভক্তের রামকৃষ্ণ-সাধনা।

এখন প্রশ্ন হল, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-সাধনা এবং ভক্তের রামকৃষ্ণ-সাধনার মাহেন্দ্রক্ষণটি কী? বড়ো কঠিন প্রশ্ন। আসলে এঁদের জীবনে বিশেষ কোনো মুহূর্তকে মাহেন্দ্রক্ষণ বলে চিহ্নিত করা দুষ্কর। এঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মাহেন্দ্রক্ষণ। মনে পড়ে T. S. Eliot সাহেবের কথা—"a lifetime burning in every moment." প্রতিটি মুহূর্তে প্রদীপ্ত, প্রোজ্জ্বল সেই জীবন। স্বাভাবিকভাবেই তার থেকে বেছে একটি বিশেষ ক্ষণকে, বিশেষ মুহূর্তকে মাহেন্দ্রক্ষণ বলা যেতে পারে না। তবু আমরা ভক্তেরা চরম এবং পরম লগ্নটিকে অন্বেষণ করি। আমার মনে হয়, সেই লগ্নটিকে অন্বেষণ করতে হলে আমাদের যেতে হবে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। আপনারা সবাই জানেন সেই বিখ্যাত ঘটনা—১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি। ১ জানুয়ারি তারিখটি ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন। যখন ব্রিটিশরাজের রাজধানী কলকাতার গির্জায় গির্জায় ঘণ্টা বাজছে, যখন সমস্ত কলকাতা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে নববর্ষের উৎসবে, যখন গির্জায় গির্জায় প্রদীপ্ত আলোকের মালা বিস্তৃত হচ্ছে, ঠিক সেইসময় 'Christ of the modern age'—'আধুনিক যুগের খ্রিস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ' কাশীপুর উদ্যানবাটীতে উপস্থিত ভক্তদের চিত্ত-মন-বুদ্ধি-অহংকারের উত্তরণ ঘটিয়ে তাঁদের হৃদয়-আকাশে এক আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন—যে আলোকবর্তিকা নিয়ে যায় অন্ধকার থেকে আলোতে, অনিত্য থেকে নিত্যে, মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে। যখন চারিদিকে কলকাতা শহরে বিদ্যুচ্ছটা ঝলমল করছে, ঠিক সেইসময় শ্রীরামকৃষ্ণ আলোকিত করলেন কয়েকটি হৃদয়।

এমন একটি দীপশিখা জ্বেলে দিলেন তাঁদের মানসপটে, যা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যায়ও কখনো বিক্ষুব্ধ হবার নয়। ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ছিলেন আরও অনেকে।

এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে ১৯৫৯ সালে স্বামী গম্ভীরানন্দজির একটি বক্তৃতা। ১ জানুয়ারিতে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী গম্ভীরানন্দজি মহারাজ। ওঁর ভাষণে তিনি বললেন, "দেখো আমার বামপার্শ্বে যে বক্তা বসে রয়েছেন তিনি যা বললেন তাতে মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন শুধু ভক্তদের জন্য। আর ডানপার্শ্বে যিনি বসে আছেন, তিনি যা বললেন, তার নির্যাস হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন এসেছিলেন শুধু সন্ন্যাসীদের জন্য। But what I say is, Sri Ramakrishna came neither for the householders nor for the Sannyasins alone—আমি যা বলছি সেটি হচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল গৃহস্থদের জন্যও আসেননি, কেবল সন্ন্যাসীদের জন্যও আসেননি। Sri Ramasrishna came for those who earnestly seek him—শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন তাঁদের জন্য, যাঁরা সত্যি সত্যি ব্যাকুলভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে চান।" আমার স্মৃতির মণিকোঠায় এখনও সেকথা ভাস্বর হয়ে আছে।

এই ব্যাকুলতার শৈলী কী? কীভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে চাইতে হবে? আমরা সাধারণ মানুষ। জানি না তাঁর ভাস্কর্য। তাই শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা কেমন করে ডাকব? 'তুমি না জানালে পরে কে তোমারে জানতে পারে?' শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যি সত্যি দয়াল ঠাকুর। তিনি নিজেই আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' ভগবানই দেখিয়ে দিচ্ছেন, ভগবানই করে দিচ্ছেন, ভগবানই বাতলে দিচ্ছেন—দেখো, এই পথ, এভাবে আমাকে ডাকতে হবে। যদি এভাবে ডাকতে পার, তুমি জেনে রেখো—আমি তোমার, আর তুমি আমার।

সেই পথটি কী? কথামৃতের অনুসারী হয়ে দক্ষিণেশ্বরে। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (যিনি 'শ্রীম' নামে বেশি পরিচিত)-এর প্রথম দর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলছেন, শ্রীম মনে মনে ভাবছেন—সাক্ষাৎ শুকদেব। আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে স্বভাববিনয়ী লাজুক শ্রীম সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্দর্শনে যাননি। মহাপুরুষ দর্শন করবার জন্য সেদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাননি, যাননি যুগাবতারের আশীর্বাদ পেয়ে নিজেকে ধন্য করতে। গিয়েছিলেন অন্য কারণে। যাই হোক, শ্রীম তখন মানসিক দিক থেকে বিধ্বস্ত, অবসন্ন। শ্রীম তারপর মন্দিরাদি দেখতে যাচ্ছেন। মন্দির থেকে এসে দেখছেন সেই ঘর থেকে সবাই চলে গেছেন। বৃন্দে-ঝি বেরিয়ে আসছেন ধুনো দিয়ে। শ্রীম বলছেন—আচ্ছা ইনি, ওই যে সাধুটি আছেন, উনি খুব পড়াশোনা করেন, না?—তা বাবা আমি পড়াশোনা করতে তো কখনও ওঁকে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, তুমি যা জিজ্ঞেস করবে, শাস্ত্র-টাস্ত্র সবই ওঁর মুখস্থ, কণ্ঠস্থ। শ্রীম—খুব ধ্যান-ট্যান করেন?—তা বাবা, তা তো কখনো দেখিনি। শ্রীম—উনি কি এখন সন্ধ্যা-আহ্নিক করছেন?—সন্ধ্যা-আহ্নিক? না বাবা, ওরকম তো কখনো দেখিনি। তবে হ্যাঁ, মুহুর্মুহু সমাধি হয়। শ্রীম বলছেন—আমি ওঁর কাছে যেতে চাই, কী করে যাব? শ্রীম ইতস্তত করছিলেন। তিনি 'কলকাতার ভদ্রলোক'। শ্রীম intellectual, অধ্যাপক, প্রধান শিক্ষক, বিদ্বান, কেশববাবুর ভগ্নীপতি। স্বাভাবিকভাবেই তিনি একটু ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু বৃন্দে-ঝি বললেন—তুমি যাও। অনুমতির প্রয়োজন নেই। দরজা খুলে ঢুকে যাও।

শ্রীম গিয়েছিলেন। তিনি তখনো ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে শেখেননি। কলকাতায় আর দশজন ভদ্রলোক যেভাবে নমস্কার করেন, তেমনিভাবেই তিনি হাত জোড় করে নমস্কার করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কয়েকটি অত্যন্ত সীমিত বাক্যালাপ। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে, বলা যেতে পারে, দীক্ষা দিলেন। ভাবলে শিহরন হয়। একটি বীজমন্ত্র দিয়েছিলেন। যাঁরা আসেননি, যাঁরা ভাবীকালে আসবেন—আপনার-আমার মতো জনসাধারণ—তাঁদের জন্যও ওই বীজমন্ত্র রেখে গেলেন শ্রীম-র মাধ্যমে। সেই বীজমন্ত্রটি হচ্ছে 'আবার এসো'।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর পুণ্যপ্রভাবে যখন একজন প্রবর্তক আধ্যাত্মিক নবোদয়ের পথে যাত্রা শুরু করেন তখন এক অনাস্বাদিতপূর্ব সংগীতের তালে তালে বেশ কিছুক্ষণ চলেন। কিন্তু ক্রমেই জীবনসূর্য এসে তাঁকে গ্রাস করে, তখন মনে হয় 'তপ্তজীবনম্'। তাই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন। কখনো কখনো পদস্খলনও হয়ে যায়। কিন্তু প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কী বলছেন? 'ভয় নাই, তব ভয় নাই।' তুমি এসো, বারংবার প্রত্যাগমন করো আমার কাছে। 'আমি ফরাসডাঙা, আমি কর্মনাশা।' ঠাকুর নরেনকেও বলেছিলেন— নবানুরাগ হলে বেশি বেশি আসতে হয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন বারংবার প্রত্যাগমন করো এখানে। এখানে, মানে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবগঙ্গায় স্নাত হও। হিন্দিতে একটা কথা আছে—'অপনানা'— আপন করে নেওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবকে আপন করে নিতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবটি কী? ত্যাগ, তপস্যা, সমন্বয়, স্বাধ্যায়, বিবেক, বৈরাগ্য এবং অবশ্যই ঈশ্বরপ্রণিধান। সেই ভাবটিকে তুমি আপন করে নিয়ে, আশ্রয় করে নিয়ে এগিয়ে চলো। 'চরৈবেতি চরৈবেতি'। 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।' স্বাভাবিকভাবেই ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি জেনো রেখো, তোমার এক পরম আত্মীয়, পরম আশ্রয় আছে। তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ।

তারপর আমরা কী দেখতে পাই? মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত আসছেন। ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, শ্রীম হলেন রামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গার গোমুখ উৎস। রামকৃষ্ণ-চরণসরোজে বসে যে অমৃত-মধু তিনি আহরণ করেছিলেন, তারই সুধাপাত্র রেখে গেছেন অনাগতকালের ভক্তবৃন্দের জন্য, যার আস্বাদনে সাধকভক্ত-হৃদয়ে ভক্তিপদ্ম ফুটে উঠবে অনায়াসে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ- কথামৃত এমন একটি অনন্যসাধারণ সৃষ্টি যেখানে অবতারপুরুষের অলোকসামান্য উপদেশধারা সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে অভিরাম এক ভাবভাষার বন্ধনে। কথামৃতের কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ১৮৯৭-এর ২৪ নভেম্বর দেরাদুন থেকে স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং লিখেছিলেন মাস্টারমশাইকে— "Many many thanks for your second leaflet. It is indeed wonderful. The move is quite original, and never was the life of a Great Teacher brought before the public untarnished by the writer's mind, as you are doing. The language also is beyond all praise,—so fresh, so pointed, and withal so plain and easy. I cannot express in adequate terms how I have enjoyed them. I am really in a transport when I read them. Strange, isn't it? Our Teacher and Lord was so original, and each one of us will have to be original or nothing. I now

understhand why none of us attempted His life before. It has been reserved for you, this great work. He is with you evidently. Socratic dialogues are Plato all over—you are entirely hidden. Moreover, the dramatic part is infinitely beautiful. Everybody likes it—here or in the West."

কত গৃহীভক্ত প্রতিদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ করে অন্তরে শান্তি অনুভব করেন। কত যুবক এই গ্রন্থ পাঠ করে ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, সন্ন্যাস-জীবনকে বেছে নিয়েছেন। বিশ্বের অনেক মনীষীই গ্রন্থটিকে সেরা hagiography বা সন্ত-জীবনীর মর্যাদা দিয়েছেন। দীর্ঘ এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে গ্রন্থটি সাধক-মনকে আকর্ষণ করেছে, ধর্ম-প্রবুদ্ধ সত্তাকে প্রেরণা দিয়েছে—আজও তার বিরাম নেই।

আজকের পৃথিবী যখন এক মারণ ভাইরাসের আক্রমণে নিতান্ত অসহায়, জীবন ও মৃত্যুর এই যুদ্ধে যখন অগণিত মানুষের মধ্যে মাঝে মাঝেই জন্মাচ্ছে এক চরম অসহায়তা, সেই সময়েও কিন্তু এই মহাগ্রন্থটি মানুষকে দিতে পারে সেই দিশালোক, যা তাকে দুঃখের এই বিপন্ন দিনে পথ দেখাবে, আশা যোগাবে।

আসুন, আমরা পরমকরুণাময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে প্রার্থনা করি, আমরা যেন আজকের এই দুর্যোগবিধ্বস্তকালের মহাবলয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাস্টারমশাইয়ের অপূর্ব সৃজন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের অমৃতবিন্দুগুলি নিজেদের জন্য আহরণ করে নিতে পারি। অতিমারির যে ভয়াল রূপ আমাদের দিনারম্ভে, দিনাবসানে নিত্য আজ আতঙ্কিত করে রাখতে চায়, আমার বিশ্বাস, কথামৃতে বিধৃত স্বয়ং ঈশ্বরমুখনিঃসৃত বাক্যগুলি তীব্র তেজস্বী বেদমন্ত্রের মতো আমাদের শক্তি দেবে, নিরাশাকরোজ্জ্বল এই অমারাত্রির মধ্যেও অনির্বাণ পরমজ্যোতির আলোকরেখা ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে মুক্তি ও আনন্দের নতুন তীর্থতীরে।

দ্বিতীয় দর্শনেই মহেন্দ্রনাথের 'খণ্ডন ভববন্ধন'-এর প্রক্রিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ শুরু করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—আচ্ছা, তুমি কি বিয়ে করে ফেলেছ?—আজ্ঞে হ্যাঁ। শ্রীরামকৃষ্ণ রামলালদাদাকে বলছেন—ওরে রামলাল, এ যে বিয়ে করে ফেলেছে। অধোবদনে মহেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন আর ভাবছেন বিয়ে করা কি এত অন্যায়?—তা তোমার কি ছেলেপুলে হয়েছে? বলছেন—হ্যাঁ। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় আর্তনাদ করে উঠছেন। বলছেন—ওরে, ওর ছেলেপুলেও হয়ে গেছে। মহেন্দ্রনাথ ভাবছেন ছেলেপুলের জনক হওয়াও এত অপরাধের নাকি?—তা তোমার স্ত্রী কেমন? মহেন্দ্রনাথ রিপন কলেজের অধ্যাপক। পাঁচটি বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তাই মুখ-ফস্কে বলে ফেললেন, "আজ্ঞে, অজ্ঞান।" শ্রীরামকৃষ্ণ কশাঘাত করছেন, ভববন্ধন খণ্ডনও করছেন। বলছেন —"আর তুমি বুঝি জ্ঞানী?" ঠাকুর বলতে চাইছেন, তুমি কিছু রসায়ন, কিছু ইতিহাস, কিছু ভূগোল, কিছু দর্শন, কিছু লজিক শিখেই বুঝে নিয়েছ তুমি জ্ঞানী। আর উনি অজ্ঞানী।

তারপর আমরা কী দেখতে পাই? তৃতীয় দর্শনের দিন একথা-সেকথার পর শ্রীরামকৃষ্ণ আর একটি বীজমন্ত্র মহেন্দ্রনাথকে দিচ্ছেন। বলা বাহুল্য, সে বীজমন্ত্র আমার-আপনার-সবার জন্য। বলছেন—দেখো, ঈশ্বরলাভ করতে গেলে, শান্তি পেতে গেলে, পরাশান্তি লাভ করতে গেলে তোমায় মনে রাখতে হবে তিনটি বিষয়ের কথা—সাধুসঙ্গ, নির্জনবাস আর বিশ্বাস। এই সাধুসঙ্গ, নির্জনবাস এবং বিশ্বাস সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে শ্রীম-র জীবনে একটি ঘটনা ঘটেছিল। পল ব্রান্টন ছিলেন সাহিত্যিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী। একসময় ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে তিনি গির্জা থেকে গির্জান্তরে গেছেন। (এই পল ব্রান্টন সাহেবের ছেলে ১৯৮২ সালে কলকাতায় এসেছিলেন পুস্তকমেলার উদ্বোধন করতে।) ব্রান্টন গিয়ে অনেক লোককে জিজ্ঞেস করেছেন, "ঈশ্বরলাভের উপায় কী? কীভাবে আমি ক্রাইস্টকে দর্শন করব?" কেউ সদুত্তর দিতে পারেননি। ব্রান্টন শুনলেন কলকাতায় এক অধ্যাপক আছেন, তিনি ঈশ্বরলাভ করেছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেছেন, তিনি কিছু আলোর দিশা তাঁকে দিতে পারেন। ব্রান্টন এলেন কলকাতায়, গেলেন শ্রীম-র বাড়িতে। উত্তেজিত ব্রান্টন প্রথমেই প্রশ্ন করলেন কোনো মুখচন্দ্রিকা বা গৌরচন্দ্রিকা না করে। বললেন মাস্টারমশাইকে—মহাশয়, আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন? মাস্টারমশাই বলেছিলেন—"Do I need to declare it at the top of my voice from the terrace?"

তারপরই প্রশ্ন—কীভাবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শ্রীম বললেন, প্রার্থনা করো। উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন ব্রান্টন। বললেন, একথা তো আমি পাদ্রিদের কাছে শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। গির্জা থেকে গির্জায় গিয়েছি, যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই তাঁরা বলেছেন, প্রার্থনা করো। এই বস্তাপচা কথা আর শুনতে চাই না আমি। আমি ভেবেছিলাম, তোমার আচার্যদেব তোমায় নতুন কিছু বলেছেন। নতুন কোনো আলোর দিশা তোমার কাছ থেকে পাব। কিন্তু তা তুমি দিতে পারলে না। শ্রীম বললেন—"হ্যাঁ। আমার আচার্যদেব আরও বলেছেন শোনো। তিনি বলেছেন, যদি ঈশ্বরলাভ করতে চাও, যদি পরাশান্তি লাভ করতে চাও, জেনে রেখো নির্জনবাস, সাধুসঙ্গ এবং বিশ্বাস লাগবে।" ব্রান্টন খুব খুশি হয়েছিলেন। তবে শ্রীম বললেন, কিন্তু এটা তুমি মনে রেখো যে, 'miss an inch, miss a mile' সাধু সাবধান!

তারপর তৃতীয় বীজমন্ত্র তথা মহা-আশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণ দিলেন শ্রীম-কে। সেটি কোথায়? চতুর্থ দর্শনের দিন শ্রীম এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। সেই চিরপরিচিত ঘর। নরেন্দ্রনাথ অনবদ্য কণ্ঠে গান গাইছেন। শ্রীম ভাবছেন, ঠাকুর ছাড়া এমন মধুর গান কখনো শুনিনি। ক্রমে গান শেষ হল। শ্রীরামকৃষ্ণ ছোকরাদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছেন। শ্রীম এক কোনায় বসে আছেন। ছোকরারা খুব হাসছেন। শ্রীম গম্ভীর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "দেখো, ওর মৌতাত লেগেছে, তাই এসেছে।" আবার হাসি। এবারও শ্রীম গম্ভীর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "ওর একটু উমের বেশি তো, তাই গম্ভীর।" তারপর একে একে সকলে বেরিয়ে গেল। আছেন মহেন্দ্র আর নরেন্দ্র। গৃহস্থের ইন্দ্র মহেন্দ্র, সন্ন্যাসীর ইন্দ্র নরেন্দ্র। এই দুই ইন্দ্রই আছেন, আর আছেন যুগাবতার। নরেন্দ্র গাড়ু হাতে হাঁসপুকুরের দিকে যাচ্ছেন। মহেন্দ্র সেখানে হাজির। গিয়ে দেখছেন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে সেই কথা বলছেন—নবানুরাগ হলে একটু বেশি বেশি আসবি। এতদিনে মহেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে শিখেছেন। তিনি দাঁড়িয়ে থেকে করজোড়ে আর প্রণাম করেন না। তৃতীয় দর্শনের পরই মহেন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছেন

কথামৃতে—এবারে আমার ভববন্ধন খণ্ড হয়ে গেছে। তাঁর ভাষায়, "আমার অহংকার পূর্ণরূপে চূর্ণীকৃত।" স্বাভাবিকভাবেই আলোকিত মহেন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছেন প্রণাম করে, "আজ কি আর গান হবে?" শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "না, আজ আর হবে না। তবে একটা কর্ম কোরো। বলরামের বাড়িতে কলকাতায় গান হবে, অনেক আনন্দ হবে। তুমি সেখানে এসো।" মহেন্দ্রনাথ যে আজ্ঞা বলে বিদায় নিলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের প্রধান ফটক পর্যন্ত যেতে যেতেই মহেন্দ্রনাথের ভিতর এক অদ্ভুত সংশয়ের সৃষ্টি হল। যদিও আমরা দেখব তিনি অদ্ভুতভাবে সেই 'conflict management' করছেন। কী সেই conflict? আমরা আমাদের কল্পনানেত্র উন্মোচিত করে ভাবচক্ষে দর্শন করতে পারি। মহেন্দ্রনাথের দুই সত্তা। অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ আর ভক্ত মহেন্দ্রনাথ। অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথের অহংকার চূর্ণ হয়েছে, কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধ তো যায়নি। তাই তিনি বলছেন, মহেন্দ্রনাথ, বলরামের বাড়িতে সান্ত্রী আছে। বলরামবাবু জমিদার। তুমি কোনোদিন বলরামবাবুর বাড়ি যাওনি। সান্ত্রী তোমায় চেনে না। যদি সান্ত্রী তোমাকে প্রবেশাধিকার না দেয়, তোমাকে ফিরে আসতে হবে। মহেন্দ্রনাথ, তুমি এত বিদ্বান, তুমি লোকমান্য। তুমি কি পারবে আত্মমর্যাদায় এই আঘাতের গ্লানি সহ্য করতে? আর ভক্ত-মহেন্দ্রনাথ, অধ্যাপক-মহেন্দ্রনাথকে বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—যিনি যুগাবতার, অবতারবরিষ্ঠ, তাঁকে তুমি কথা দিয়েছ, প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। তুমি যদি না যাও তাহলে সত্যের অপলাপ হবে। আর যদি সত্যের অপলাপ হয় তাহলে তোমার নরকেও স্থান হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ তোমার জীবনের ধ্রুবতারা। তোমার হৃদয় সম্রাট, তোমার গুরু, আচার্য, তোমার ইষ্ট, তোমার ইহকাল, পরকাল। এহেন শ্রীরামকৃষ্ণকে তুমি যদি ধোঁকা দাও, তুমি কি কখনো ভেবেছ যে শ্রীরামকৃষ্ণ তোমাকে পরিত্যাগও করতে পারেন, বর্জনও করতে পারেন?

মহেন্দ্রনাথ এই 'conflict management' করছেন অদ্ভুতভাবে। তিনি ভাবছেন, বেশিদূর তো যাইনি। তাই ফিরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে সব কথা খুলে বলি। মহেন্দ্রনাথ বর্ণনা দিচ্ছেন কথামৃতে—শ্রীরামকৃষ্ণ একাকী পাদচারণা করিতেছেন নাটমন্দিরে। একলা নিঃসঙ্গ, সিংহের ন্যায়। সিংহ তো বটেই। ভবতারিণীর ভাবের যিনি প্রধান সংবাহক তিনি সিংহ বই আর কি হবেন? তাই স্বাভাবিকভাবেই মহেন্দ্রনাথ সে কথা বললেন সেটি অত্যন্ত সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণরূপ সিংহ। মহেন্দ্রনাথকে দেখে তিনি একটু থামলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "আবার এলে যে গো?"

মহেন্দ্রনাথ সব কথা বলার পর শ্রীরামকৃষ্ণ এক অদ্ভুত সমাধান দিচ্ছেন। বলছেন, "দেখো, তুমি একটি কর্ম করো। 'আমার নাম কোরো।' তাহলে কেউ তোমায় আমার নিকটে নিয়ে যাবে।"

এক আশ্চর্য আশ্বাস, এক মহা আশ্বাস, যে আশ্বাস সেদিন মহেন্দ্রনাথকেই শুধু তিনি দেননি, শ্রীম-র মাধ্যমে তিনি দিয়েছিলেন লক্ষ-লক্ষ অগণিত ভক্তকে যাঁরা ভাবীকালে আসবেন। যদি তুমি আমার নাম করো, তাহলে শুধু বলরামের ফটকই খুলে যাবে, তাই-ই নয়, স্বর্গের দ্বার অর্গলচ্যুত হবে, মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হবে।

তাই শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং আমাদের শেখালেন, "আবার এসো।" সাধুসঙ্গ করো, নির্জনবাস করো আর বিশ্বাসকে ধরে রাখো। আর সর্বোপরি 'আমার নাম করো।' যদি তা হয় তাহলে জেনে রেখো তোমরাও সেই চিরন্তন আশীর্বাদের অংশীদার হবে। প্রাপক হবে। আশীর্বাদটি কী ছিল? "তোমরা চৈতন্য হও।" তোমরা চৈতন্য-স্বরূপ, তোমরা চৈতন্যময় হয়ে যাও। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি", "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্"।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন, If I have understood him right, Sri Ramakrishna is not God, he is the Father of God.—যদি তাঁকে ঠিক ঠিক বুঝে থাকি, শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান নন, তিনি ভগবানের বাপ। তাই আজ আসুন, আমরা সেই পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি কৃপা করে আমাদের মনের এমন উত্তরণ ঘটান, তিনি আমাদের মন-বুদ্ধি-অহংকারকে পরিবর্তিত করে, উত্তোলিত, বিবর্ধিত করে এমন এক স্থানে পৌঁছে দিন যেখানে আমরা 'বোধে বোধ' করতে পারি, বলতে পারি, বিশ্বাস করতে পারি—'প্রভু তুমি আমার, আর আমি তোমার।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কথামৃতে হৃদি-বৃন্দাবনের মণি-রত্নধন সন্ধান করার উপায় হিসেবে পাঁচটি মহাবাক্যের অবতারণা করেছেন। সেই পাঁচটি মহাবাক্য হল—(১) 'আবার এসো', (২) 'আমার নাম করো', (৩) 'সাধুসঙ্গ', (৪) 'নির্জনবাস', এবং (৫) 'বিশ্বাস'। আসুন, আমরা ওই পাঁচটি মহাবাক্যের অভ্যাসের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবগঙ্গায় অবগাহন করে অমৃতত্বের রত্নধনের সন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

ডুব-ডুব-ডুব রূপসাগরে আমার মন,
তলাতল পাতাল খুঁজলে,
পাবি রে প্রেম রত্নধন,
ডুব-ডুব-ডুব রূপসাগরে আমার মন।।

—

তথ্যসূত্র

১) শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীম, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা

২) পত্রাবলী, স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০০, পৃ ১১২

৩) Great Swan : Meetings with Ramakrishna, Lex Hixon, Shambhala Publications, London, 1992, p. Xvii

৪) Sri Ramakrishna : A Prophet for the New Age, Richard Schiffman, Paragon House, California, 1998.

বিশেষ রচনা

কথামৃত ও শ্রীম

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

কী হতে পারত, আর কী হল? সন্তান যখন জন্মায়, গর্ভধারিণী তখন যন্ত্রণা-কাতর। অসহ্য সেই যন্ত্রণার কোনো দ্বিতীয় নাই—'গর্ভযন্ত্রণা'। কালের কোল ছেড়ে যখন বিশেষ একটি মুহূর্ত বেরিয়ে আসে, তখনো সেই একই উদ্বেগ—কী হয়! কী হয়! মৃত অথবা অমৃত! জনক কি ধরে রাখতে পারবেন মহাকালীর এই দান! মহাদেব কি জাগ্রত হবেন? 'কথামৃতের' জন্ম এমনই এক সংশয়ের সূতিকাগারে। এক ভদ্রলোক! তিনি শিক্ষকতা করেন। মেধাবী, মার্জিত, গম্ভীর, সুজন, দার্শনিক। তাঁর সংসার আছে, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা। পথে, ঘাটে দর্শন পেলে, মানুষ তাঁকে 'মাস্টারমশাই' বলে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। এর বেশি কিছু নয়। সুশিক্ষক। পড়ুয়ারা তাঁকে পছন্দ করেন; কিন্তু সংসারে তিনি জেরবার। তিনি যে রাজহংস, একটি স্বর্ণ ডিম্ব ধারণ করে আছেন, এ কথা পরিবারের কেউ জানেন না, তিনিও জানেন না। জীবন সেই একই—দিনগত পাপক্ষয়। সিমুলিয়ার এক গুপ্ত পরিবারের সন্তান, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। পিতা, মধুসূদন গুপ্ত, কলকাতার হাইকোর্টে চাকরি করেন। সিমুলিয়ার শিবনারায়ণ দাস লেনে বাড়ি। পরে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে। বাড়িটির নাম হবে 'ঠাকুরবাড়ি'। তারপর তো ইতিহাস! সময়। আজ গেলে কাল কী হবে বা হতে পারে, কেউ জানে না। নির্মম এক অনিশ্চয়তার চক্রে জীবনের জলসা। যিনি জানেন, তাঁকে কেউ দেখতে পান না। তাঁর একটি নাম মানুষই দিয়েছে— 'ভগবান', 'নিয়তি'। 'কথামৃতেরও' জন্মপঞ্জিকা তৈরি করা যায়। গর্ভযন্ত্রণার শুরু—২৫ ফেব্রুয়ারি, শনিবার, ১৮৮২ সাল, রাত ১০টা। উত্তেজিত, বিরক্ত, বীতশ্রদ্ধ মহেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই বাড়িতে আর এক মিনিটও থাকা যায় না। পিতা মধুসূদন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন স্বাদের, বিষয়ী মানুষ। বিষয়ী। মাতা স্বর্ণময়ী পরলোকে। তিনি চলে গেছেন ১৮৮০ সালে। মহেন্দ্রনাথের বয়স এখন ২৮ বছর। ১৮৭৩ সালে কলেজে পড়ার সময়েই তাঁকে বিবাহ করতে হয়েছিল। স্ত্রী, নিকুঞ্জ দেবী ঠাকুরচরণ সেনের কন্যা, সম্পর্কে ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রের 'কাজিন'; অতএব মুখ বুজে পুরুষশাসিত গুপ্ত পরিবারের যাবতীয় অনুশাসন অবনত মস্তকে মেনে নেবেন কেন! মহেন্দ্রনাথ ঘোর বিপাকে। নিত্য অশান্তি। মুক্তির একটিই পথ, স্বেচ্ছামৃত্যু। বিদায় পৃথিবী, বিদায় জিবন। টাকা, টাকা, আরো টাকা। ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, আত্মজ্ঞান, যত বাজে অন্বেষণ। একমাত্র সত্য সংসার। ধন-জন-অর্থ-প্রতিপত্তি। এমন পিতার সঙ্গে এক ছত্র-তলে বসবাস, অসহ্য এক যন্ত্রণা।

কথামৃত ভবনের ঠাকুরঘর

রাত দশটা। কলকাতার মানুষের কল-কোলাহল শান্ত হতে শুরু করেছে। নিদ্রার আয়োজন। কম আলোর শহর। গলিঘুঁজি, ঝোপ-ঝাড়, কলাবাগান, খোলা নর্দমা। ছায়া ছায়া নিশাচর। মহেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন পথে। পানশালার প্রাণীরা টলমলো

চলনে গৃহাশ্রমমুখী। মহেন্দ্রনাথ কোথায় যাবেন, কোন দিকে? পশ্চিমে, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে। পরিজনদের কেউই তাঁকে ফেরাতে এলেন না। সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে অন্ধকারে অন্ধকার হয়ে বেরিয়ে এসেছেন স্ত্রী নিকুঞ্জ দেবী। এই নিশুতি রাতে স্বামীকে তিনি একা ছাড়েন কী করে! তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা আপাতত যেমন আছে থাক, পরে, স্বামী শান্ত হলে স্থায়ী একটা সমাধান খুঁজে বের করা যাবে। আপাতত!

মহেন্দ্রনাথ একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করলেন। স্ত্রীকে নিয়ে যাবেন কোথায়? স্ত্রীর পিত্রালয়ে! অবশ্যই না। মান-সম্মানের প্রশ্ন। তিনি সুখ্যাত এক শিক্ষক। একই সঙ্গে কলকাতার তিনটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ইংরিজি, ইতিহাস, সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র তাঁর শিক্ষাদানের বিষয়। পরিবারের স্বার্থান্বেষী সদস্যদের কাছে এ-সব কিছুই নয়। প্রায় সাত বছরের শিক্ষকতার জীবনে তিনি 'সিটি', 'রিপন', 'মেট্রোপলিটান' কলেজে অধ্যাপনা করছেন! বাইরে প্রভূত সম্মান, পরিবারে নিয়ত অসম্মান।

তাহলে স্ত্রীকে নিয়ে এই রাতে যাবেন কোথায়? এই ভয়ংকর দুঃসময়ে একটি আশ্রয়ের কথাই মাথায় আসছে। বরাহনগরে ঈশান কবিরাজ, তাঁর বোনের স্বামী। ঈশানের বাড়িতে আপাতত। ঈশানচন্দ্র মজুমদার। মহেন্দ্রনাথের বড়দির শ্বশুরবাড়ি। কবিরাজ মশাই দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে যাওয়া-আসা করেন। সেখানে একজন সাধক আছেন—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। কবিরাজ মশাই প্রয়োজনে তাঁর চিকিৎসাও করেন। ঈশানের বাড়ি বরাহনগরের তাঁতিপাড়ায়। কয়েক কদম দূরেই দক্ষিণেশ্বর।

মহেন্দ্রনাথের জীবনে সেই রাত এক ভয়ংকর রাত, দুর্যোগের রাত। শ্যামবাজারে এসে ঘোড়ার গাড়ির একটি চাকা খুলে বেরিয়ে গেল। গাড়িটি একদিকে কাত। বড়োসড়ো একটি দুর্ঘটনা হতে পারত। সেই কলকাতা, মধ্যরাত। পথ জনপ্রাণীশূন্য। স্ত্রীকে সাবধানে নামালেন। এখন উপায়! পথেই রাত কাটাতে হবে নাকি? গৃহত্যাগী মহেন্দ্রনাথ! এতটাই দুঃসময়! ঈশ্বর এতটাই নির্দয়! কাজেই পরিচিত এক বন্ধুর বাড়ি। একটুখানি রাতের আশ্রয় কি মিলবে না? না, মিলবে না। বন্ধু দরজা খুলে বিরক্তি মাখানো মুখে, ঘুম ঘুম চোখে তাকিয়ে আছেন। সস্ত্রীক বেড়াতে আসার এই কি সময়! বে-আক্কেলে মাস্টার!

—কিছুক্ষণের জন্যে আমার স্ত্রীকে তোমাদের বৈঠকখানায় বসতে দাও। আমি আর একটি বাহনের খোঁজে যাই।

—এত রাতে কে জেগে আছে তোমার জন্যে! ঘোড়ারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে।

আছে, আছে, কেউ না কেউ আছে। মহেন্দ্রনাথের প্রকৃত বাঁচাটা যে এইবার শুরু হবে। তিনি যেন সদ্যোজাত শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে কংসের কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে দুস্তর যমুনার বাধা অতিক্রম করছেন। মহেন্দ্রনাথ যেন বসুদেব। নিজের নব জন্মকে আগলে নিয়ে চলেছেন, মাতা যশোদার কাছে। বোনের শ্বশুরবাড়ি থেকে বড়জোর মাইলখানেক দূরে সেই নব বৃন্দাবন। এবার আর যমুনা নয়, পার্শ্বে প্রবাহিত গঙ্গা। সেখানে রাম আর কৃষ্ণ এক হয়ে বসে আছেন। তিনি কখনো পুরুষ, কখনো প্রকৃতি। মহেন্দ্রনাথ যেন উদ্ধব। চাকভাঙা মধুর মতো সেই মায়াবী পুরুষটির অধর নিঃসৃত অমৃতবাণী কোষে কোষে ধারণ করবেন। আপাতত জানেন না। যোগমায়ার খেলা চলেছে। কোথায়! শ্যামের বাজার শ্যামবাজারে। রথের চাকা খুলে গেছে। হিসেবটা তো পরে হবে। আগে ঘটনা, পরে ব্যাখ্যা। আগে ফুল, পরে মালা গাঁথা। শেয়াল-ডাকা মাঝরাতে বরাহনগরের তাঁতিপাড়ার একটি বাড়ির সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াল। একটু দূরেই 'পান্তির মাঠ' নামে একটি জনবিরল এলাকায় ডাকাত পল্লি। মহেন্দ্রনাথের নব-জীবন অভিযানের এইটিকেই ধরা যাক 'বেস ক্যাম্প'।

এভারেস্টে যাঁরা আরোহণ করেন, তাঁরা যেমন ডায়েরি লেখেন, 'বেস ক্যাম্প' থেকে যাত্রা শুরু। সঙ্গে অমুক শেরপা। ঠিক সেই রকম। বোনের বাড়িতে সেই বিশ্রী রাতটা কাটল, জীবন-মরণের সীমানায়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সব বেমালুম ধাপ্পা। তুমি কে, কে তোমার? কাণ্ট, হেগেল, হিউম, স্পিনোজা, হবস, গ্রন্থাগারে ধূলার আসনে

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম)

নীরব শব্দমালা। অন্তরে উদ্বেল একটিই প্রশ্ন—'এর পর?' মহেন্দ্র! থাকবে না যাবে? উত্তর এল না কোনো। সময় একটা শামুকের মতো খোলের ভেতর নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে। কাল রাতে স্ত্রী যদি চুপিচুপি পাশে এসে না দাঁড়াতেন, তাহলে কালকের রাতটিই হত, 'কালরাত্রি, মহারাত্রি, দারুণ রাত্রি', ভোর আর হত না।

রবিবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২, বরাহনগর, বোনের বাড়ি। মহেন্দ্রনাথ। পুনর্জন্ম। দূরসম্পর্কের ভাগিনেয় সিদ্ধেশ্বরকে নিয়ে মহেন্দ্রনাথ বেড়াতে বেরোলেন। বিক্ষিপ্ত মন। মনের কথা কাকে শোনাবেন! কে আছে এমন জন! কোথায় সেই দরদী! বরাহনগরের গঙ্গার ধারে বরাবর সেই সময় কলকাতার বাবুদের অনেক বাগানবাড়ি ছিল—ঠাকুর, মল্লিক, দাঁ, দত্ত, বসাক। দূরসম্পর্কের ভাগিনেয় সিদ্ধেশ্বরের (সিধু) সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ এ-বাগান, সে-বাগানে ঘুরছেন। জীবনীকার (ধরমপাল গুপ্তা) লিখছেন, 'One can easily gauge Mahendra's state of mind. Overwhelmed by despair and exhausted in body, he began to wonder if he should still continue to live in this wicked world. চরম হতাশা, ক্লান্ত শরীর। দুষ্ট এই পৃথিবীতে থাকবেন না যাবেন! 'আলোয় ভুবন ভরা', কোথায় সেই আলো! 'হোলি লাইট'! দুজনে প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগানে ঢুকেছেন। এখানে দুটি বর্ণনা আছে। কথামৃতের উদ্বোধনে মাস্টারমশাইয়ের নিজের বর্ণনা; অন্যটি জীবনীকার ধরমপালের বর্ণনা। দ্বিতীয়টি আগে দেখা যাক। সেখানে সময়টা হল সকাল, 'The next morning, Sunday, 26 February 1882.' মহেন্দ্রনাথ ২৫ তারিখ রাত দশটায় গৃহত্যাগ করে বোনের শ্বশুর-বাড়িতে এসেছেন। সেদিন ছিল শনিবার। সিধুর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে প্রথমে প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগানে। সেখানে সিধু জানালেন, দক্ষিণেশ্বরে একেবারে গঙ্গার ওপরে একটি সুন্দর বাগান আছে, রাসমণির কালীবাড়ি। সেখানে একজন পরমহংসও আছেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁরা সেই উদ্যানে প্রবেশ করলেন, 'in a superb rose garden. মহেন্দ্রনাথের স্বভাব ও প্রকৃতি কেমন—অত্যন্ত স্পর্শকাতর, প্রকৃতিপ্রেমী ও সাধুসন্তের অনুরাগী। গোলাপ বাগানের অপরূপ শোভায় মহেন্দ্রনাথ বিভোর। এক একটি 'বেডের' সামনে দাঁড়াচ্ছেন, আর বলছেন, 'ওয়ান্ডারফুল'। 'কথামৃতে' এই বিস্তীর্ণ উদ্যানের বর্ণনা তিনি রাখবেন। সযত্নে, সবিস্তারে। যেন খুলে দেবেন সম্পূর্ণ একটি উদ্যান, একটি আহ্বান—'এসো, প্রবেশ করো!' মহেন্দ্রনাথ এক নিপুণ মালি। এই দেখো পঞ্চবটী, পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলি, বট, অশ্বত্থ, নিম্ব, আমলকী, বিল্ব, 'ঠাকুর নিজের তত্ত্বাবধানে রোপণ করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া এখানে রজঃ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। এখানে সাবেক একটি বটগাছ আছে, তৎসঙ্গে একটি অশ্বত্থ গাছ। দুইটি মিলিয়া যেন এক হইয়াছে।' উত্তর থেকে দক্ষিণে গঙ্গার ধার দিয়ে পথ চলে গেছে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। 'সেই পথের দুই পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। আবার কুঠির দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে যে পথ গিয়াছে তাহারাও দুই পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। পঞ্চবটীর সম্মুখে বিল্ববৃক্ষ, গুলঞ্চ, মল্লিকা, মাধবী। মাধবীলতা শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে আনিয়া ঠাকুর পুঁতিয়া দিয়াছেন। হাঁসপুকুরের ধারে চম্পক, ঝুমকাজবা, গোলাপ, কাঞ্চন, অপরাজিতা, জুঁই, শেফালিকা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, বেলফুল, ধুতুরা, গন্ধরাজ, পঞ্চমুখী জবা, চিনা জবা, কৃষ্ণচূড়া।

সকাল নয়, শ্রীমর লেখনীতে অমৃত কথার উত্থান কাল, 'সন্ধা হয়, হয়,..' ঠিক সেই সময়টা, যখন ফুলগাছে, গাছে কুঁড়িগুলি টুসটুসে হতে থাকে ভোরবেলা ফুল হয়ে ফুটবে বলে। মায়ের কোলে থমকে থাকে উষার আলোর চমকের জন্যে। 'সন্ধ্যা হয়, হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাস্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন।' ঘরে প্রবেশ করলেন, 'একদল মাস্টার'। তার মানে? 'কথামৃতের' পরিসরে মহেন্দ্রনাথ একাধিক নাম পরিগ্রহ করবেন, হয়তো বৈচিত্র্যের কারণে, অথবা 'আমি', 'আমি', এই অহংকার বর্জনের কারণে; অথবা, অজস্র প্রশ্নের বিভিন্নতার একাধিক ব্যক্তিত্বকে চিহ্নিত করা। বাউলের সেই গান, 'তোমার মধ্যে বসত করে কয়জনা!' প্রশ্নকারীর প্রশ্নের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয় রকম, রকম মানসিকতা ও চরিত্র। তিনি নিজেকে খণ্ড, খণ্ড করলেন, চিহ্নিত করলেন এই সব নামে, মাস্টার, মণি, মোহিনীমোহন, জনৈক ভক্ত,

কথামৃত ভবনের প্রবেশদ্বার

সেবক, ইংলিশম্যান। একটা ধাঁধা। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখার প্রয়াস। এক পাঠক প্রশ্ন করেছিলেন, 'কথামৃতে 'মণি' বলে যে ভদ্রলোকের কথা আছে, তাঁর শেষ অবস্থা কী হল?' মাস্টারমশাইয়ের মজার উত্তর, 'বলতে পারি না কী হবে!'

মাস্টারমশাইয়ের জীবনের দুটি প্রবণতা—দীনতা, গোপনীয়তা। দীনতাটাই ছিল তাঁর অন্যতম অহংকার। আমার অনন্যতা। আমার প্রচার, প্রকাশ, বিকাশ, পরিণতি সবই ঠাকুরের কৃপা। তিনি যা করাবেন, বলাবেন, রাখবেন, পাওনা-গণ্ডা, সবই আসবে তাঁর সেরেস্তা থেকে। ঠাকুর বলতেন, 'কাঁচা আমি' আর 'পাকা আমি'। কাঁচা আমি, নিজেকেই কর্তা ভাবে। আর পাকা আমি বলে, 'তুমি ভগবান', ম্যায় গোলাম, তু দেওয়ান, খোদা মেহেরবান।

কথামৃত কীভাবে মাস্টারমশাইয়ের কলমে এল? একেবারে সরাসরি। 'ঠাকুরের সঙ্গে থেকেছি, যে-সব ব্যাপার নিজের চোখে দেখেছি, নিজের কানে শুনেছি, এই গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। অন্য ভক্তদের কাছে শুনে লিখিনি। আমি তাঁর কথামৃত স্মৃতিতে বহন করে আনতাম এবং বাড়িতে এসে তার সংক্ষিপ্ত নোট লিখে রাখতাম। অনেক সময় এক-একদিনের কথার নোট সাতদিন ধরে স্মৃতি থেকে বের করে লিখতাম। তাঁর এক একটি কথার জন্যে আমি চাতকের মতো চেয়ে থাকতাম। ডায়েরির নোট থেকে পুস্তকাকারে বহু পরে কথামৃত লিখিত হয়। এক-একটি scene আমি হাজার বারেরও বেশি ধ্যান করেছি। কাজেই বহু পূর্বে অনুষ্ঠিত সেই লীলাকথা আমার চোখের সামনে ঠাকুরের কৃপায় জীবন্ত হয়ে আসত, যেন এইমাত্র দেখে এলাম। কাজেই এই ভাবে বলা যেতে পারে যে, ঠাকুরের জীবন্ত সম্মুখেই লেখা হয়েছে। অনেক সময় ঘটনার বিবৃতিতে মন প্রসন্ন হত না। তখনই ঠাকুরের ধ্যানে নিমগ্ন হতাম। তখন সঠিক চিত্রটি মনশ্চক্ষুর সামনে উজ্জ্বল ও জীবন্তভাবে প্রকাশিত হত।'

সমাধি ভঙ্গের অব্যবহিত পরে ঠাকুর একদিন মাস্টারমশাইকে বলছেন, 'কী দেখলুম জান, এই বিশ্ব একটি 'শালগ্রাম' শিলা আর সেই শিলার গাত্রে দেখলুম তোমার দুটি চোখ।' মহেন্দ্রনাথ নিজেকে আড়ালে রাখতে চান একধিক নামের ধাঁধা সৃষ্টি করে। উত্তর-প্রত্যুত্তরের খেলা চলবে 'কথামৃতের' পরিসরে। জীবন্ত ঠাকুরের হাঁটা-চলা, ভাব-ভঙ্গি, শ্বাস-প্রশ্বাস, রঙ্গ-রসিকতা, সবই ধরা পড়বে তাঁর উপস্থাপনায়; কিন্তু মাঝে-মধ্যেই ছিটকে আসবে তাঁর প্রতি ঠাকুরের তিরস্কার, গভীর প্রশংসা। নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রাখা কি সম্ভব, যেখানে 'আমি' আর 'তুমি' দুটিই বিদ্যমান। স্বামীজি বলতেন, সম্পূর্ণ ঠাকুরকে বোঝার সাধ্য গৃহীদের দ্বারা সম্ভব নয়। ঠাকুর একটি ব্যাপারে ভীষণ সাবধানি ছিলেন। একদল বাছাই করা তরুণ যুবকদের তিনি সন্ন্যাসী করবেন। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সন্ন্যাসী। 'কর্ম সন্ন্যাস'—'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়'। নরেন্দ্রনাথের পরিচালনায়। গৃহীদের উপস্থিতিতে এই তরুণদের তিনি একটি কথাও বলতেন না। তাঁদের সঙ্গে যত কথা, আদান-প্রদান সব গভীর রাতে, তখন তিনি আর এক ঠাকুর। তৃতীয় আর কেহ নাই। স্বামী শিবানন্দকে স্বামী ওঁকারানন্দ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'শুনতে পাই যে, ঠাকুর আপনাদের যখন উপদেশ দিতেন তখন গেট থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত দেখে নিতেন, কোনো গৃহস্থ ভক্ত আছে কিনা, তারপরে নাকি বলতেন!'

স্বামী ওঁকারানন্দ সমালোচকের দৃষ্টিতে 'কথামৃতের' বিচার করেছেন। তিনি বলেছেন, '...রামকৃষ্ণের ভাব বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে জগতে প্রকাশিত হল। অতএব ঠাকুর এই কথা বলেছেন আর স্বামীজি এই কথা—পৃথকীকরণের এই দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেওয়া যায় না।' স্বামী ওঁকারানন্দ আরো কঠোর ভাষায় বলছেন, 'বর্তমান যুগের নানা সমস্যা সম্পর্কে যখন আমরা ভাবি তখন দেখি, ঠাকুর তো এসব বিষয়ে কিছু বলেননি। তিনি কেবল নাচলেন, গাইলেন, চলে গেলেন, অথচ বলছি অবতার যুগ প্রয়োজনে আবির্ভূত! মজাটা দেখুন, অবতার বলে তাঁকে ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করছি, অথচ যুগসমস্যার কথা তিনি বলেননি। তিনি বলেননি, আমরা বলছি। তাহলে অবতারের বাবা হলুম আমরা—কেননা অবতার কিছু বলেননি, এটা পর্যন্ত ধরে ফেলেছি আমরা। কোত্থেকে ধরলুম? না, আড়াই পাতা পড়ে। কথামৃতকার মাসের মধ্যে একবার কি দুবার ঠাকুরের কাছে গেছেন, সে সময়ে যা শুনেছেন সেইটে সংকলন করেছেন। কিন্তু তার ফাঁকে কত কী হয়ে যাচ্ছে, অলক্ষে এবং লক্ষে। সেগুলো তো মাস্টারমশাই জানেন না। ঠাকুরের কাছে যাঁরা ছিলেন তাঁরা জানতেন। ঠাকুর যখন স্বামীজিকে নিয়ে একান্তে বসতেন, তখন কি মাস্টারমশাই সেখানে থাকতেন! অথচ আমরা কথামৃতের কথাকে একমাত্র অথরিটি ধরে নিয়ে মনে করছি যে, এই কথাগুলি স্বামীজির নিজের আর এইগুলি হল ঠাকুরের।'

স্বামী ওঁকারানন্দজি বলছেন, 'ঠাকুর আর স্বামীজির মধ্যে বিভেদ দেখাতে কথামৃতে শম্ভু মল্লিকের সঙ্গে ঠাকুরের কথাবার্তার যেসব বিষয় আছে, তা তোলা হয়। ঠাকুর শম্ভু মল্লিককে, 'তোমার সঙ্গে ভগবানের দেখা হলে, তুমি কি তাঁর কাছে হাসপাতাল চাইবে?' ওদিকে স্বামীজি বলছেন হাসপাতাল করতে। সুতরাং ঠাকুরের ভাব তো এ নয়। মাস্টারমশাইকে আমি নিজে বলতে শুনেছি—'হাসপাতাল, রিলিফ, ও সব কি কর্মযোগ না কি? কর্মযোগ মানে ফুলতোলা, চন্দন ঘষা'—বুঝুন ব্যাপার? স্বামী ওঁকারানন্দ ঠাকুরের মন্ত্র 'শিবজ্ঞানে জীব সেবার'ও ব্যাখ্যা করেছেন। 'স্বামীজির কর্মযোগ বুঝতে একটু এগিয়ে ভাগবতটা ভালো করে পড়ে নে না বাপ। প্রহ্লাদ নরসিংহকে বলছেন, প্রভু, তোমার বিগ্রহকে পুজো করবার জন্য ভক্ত সম্মত আছে। কিন্তু তুমি এই নিখিল

জগতে প্রাণীরূপে রয়েছ। সেখানে যদি কেউ সমস্ত প্রাণীকে দ্বেষবুদ্ধি করে; আর তোমার বিগ্রহকে পূজা করে, তার কি কোনোকালে ভক্তি হবে? এই কথা বলছেন প্রহ্লাদ।

স্বামীজি ঠাকুরের কাছ থেকে এই মন্ত্র পেয়েছিলেন, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'—দয়া নয় সেবা। ঠাকুরের মুখে যে-দিন এই কথা শুনলেন, সেদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'আজ এমন একটা অপূর্ব কথা শুনলাম, যদি ভগবান দিন দেন তো এই কথা কার্যে পরিণত করব।'

স্বামী ওঁকারানন্দ বলছেন, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' কথাটার এখন খুব চল। কিন্তু কথাটার খুব ভুল অর্থ করা হচ্ছে। যেখানেই যাই খালি শুনি শিবজ্ঞানে জীবসেবা। মনে হয় ঠাকুরের যেন আর কিছু ছিল না। তাঁর প্রেম, ভাবের অপূর্ব নানা বিকাশ, যোগের, বেদান্তের, তন্ত্রের সব রকম ভাব—এ সমস্ত যেন ঠাকুরের কিছুই ছিল না, খালি ওই শিবজ্ঞানে জীবসেবা। যখনই কোনো ঠাকুরের মিটিং হয়, বা স্বামীজির মিটিং হয়—ওই কথা। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' স্বামী ওঁকারানন্দ ব্যাখ্যা করে বলছেন, স্বামীজি এই মহামন্ত্রটিকে কোন মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্য অচলানন্দকে স্বামীজি বলছেন, 'দ্যাখ, তুই ঠাকুরঘরে যেটা চিন্তা করিস, সেটা যখন অন্যান্য কাজ করবি, ঠাকুরের কাজ বা অন্যান্য কাজ, সব কিছুর মধ্যেই ওই চিন্তাটা রাখবি। এইটি হলেই শিবজ্ঞানে জীবসেবা করা যাবে। নচেৎ যদি কেবল রোগী সেবার কথাই ভাবা হয়, তাহলে যতক্ষণ না কেউ রোগী হচ্ছে, সে সেবা পাবে না। সুস্থ লোককে কখনই নারায়ণ জ্ঞান করা যাবে না। দরিদ্র না হলে দেবতা হবে না।' ওই যে স্বামীজি বলেছেন—দরিদ্র দেবো ভব, মূর্খ দেবো ভব। তার মানে কি—আমাদের দরিদ্র হতে হবে, মূর্খ হতে হবে? না, স্বামীজি তা বলেননি। স্বামীজি সকলকেই নারায়ণ-জ্ঞান করতে বলেছেন। তবে দরিদ্র ও মূর্খদের সেবা আগে দরকার—তাদের প্রয়োজন বেশি বলে।'

স্বামী ওঁকারানন্দ এইবার সিদ্ধান্ত আসছেন, 'আমাদের যে-সব সমস্যার সমাধান শ্রীরামকৃষ্ণ করেননি, সেগুলি করেছেন শ্রীবিবেকানন্দ। তার মানে তাঁকে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধান করিয়ে নিয়েছেন। কথামৃতের ঠাকুর আর স্বামীজির ঠাকুর ভিন্ন। কেন? শ্রীম গৃহী, ঠাকুরের সামনে বসে আছেন সংসারে পোড় খাওয়া গৃহীরা। সংসারে চুর, চুর। বিষয়, সম্পত্তি, টাকা-পয়সা, হিসাব-নিকাশ। স্ত্রীর কথায় 'ওঠ-বোস'। 'হা গোবিন্দ', 'হা গোবিন্দ' বলে, কেউ সংসার ত্যাগ করবেন না। ঠাকুরের কথা তাঁদের কাছে সংসার ক্ষতের মলম। ঠাকুর এঁদের সময় দিচ্ছেন কেন? কারণ তিনি করুণাময়, তিনি অবতার। ঈশ্বরের দূত। তিনি এঁদের যে উপদেশ দিতেন, স্বামীজির কাছে সে-ধরনের কথা বলতেন না। বলা যায় না। কেন? স্বামী ওঁকারানন্দ বলছেন, 'স্বামীজি ছিলেন, এ যুগের প্রয়োজন সাধনের উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন আধার। তাই তাঁকে বিশেষ ধরনের উপদেশাদি দিতেন। সে-সব কথা শুনতে পেয়ে কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—ও আমাদের একটা ব্যাপার হয়ে গেল। তাঁর কাছে কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সংযমের কথা বলতেন। সে-সব অন্যেরা ধারণা করতে বা গ্রহণ করতে পারবে না।' স্বামী ওঁকারানন্দজি ঠাকুর সম্পর্কে একেবারে সঠিক কথাটি বলেছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে যে বিপরীত ও বিভিন্ন ভাবের সমন্বয় দেখা যেত, তা কোনো কালে কোনো সাধক মহাপুরুষ বা অবতারের মধ্যে দেখা যায়নি।' একেবারে একশো ভাগ সত্য কথা।

মাস্টার মহাশয়ের একত্রিশ বছরের সাধনা—'কথামৃতের' পাঁচটি খণ্ড

১৯০২ সালে প্রকাশিত হল	প্রথম খণ্ড
১৯০৪ সালে	দ্বিতীয় খণ্ড
১৯০৮ সালে	তৃতীয় খণ্ড
১৯১০ সালে	চতুর্থ খণ্ড
১৯৩২ সালে	পঞ্চম খণ্ড

শেষ খণ্ডের শেষ প্রুফ তিনি দেখে শেষ করে যেতে পেরেছিলেন। পুস্তকাকারে দেখা হয়নি। পৃথিবীতে তাঁর শেষ রাত। 'ফলহারিণী কালীপূজার' রাত। ৩ জুন, ১৯৩২। তাঁর পৈতৃক আবাসের ঠিকানা, ১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। এই গৃহটিকে তিনি কখনো আমার বাড়ি বলতেন না, বলতেন 'ঠাকুরবাড়ি'। আমহার্স্ট স্ট্রিটের স্কুল বাড়িতে (মর্টন স্কুল) সকালে ও বিকেলে প্রতিদিন যেমন যান গিয়েছিলেন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় প্রতিদিনের মতো ঠাকুরবাড়ির (পৈতৃক আবাস) তিনতলায় ঠাকুরঘরের সামনে বসে আরতির পর 'রামনাম' কীর্তন শুনলেন। নেমে এলেন দোতলায় তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে। শরীর অসুস্থ। কিছুদিন যাবৎ দুঃসহ 'নার্ভ পেনে' ভুগছেন। হাত দুটি ক্রমশই অচল হয়ে আসছে। জীবনের ব্রত 'স্বাবলম্বন'। কারো সাহায্য গ্রহণ করবেন না। নুনের পুঁটলি তৈরি করে ব্যথার জায়গায় সেঁক দেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর উঠে যাবেন ঠাকুরকে 'শয়ন' দিতে। নেমে এসে সাড়ে নটার সময় রাতের আহার। তার পরেই শুরু হবে কথামৃত—পঞ্চম খণ্ডের 'প্রুফ' দেখা। সেদিনও একই রুটিন। ব্যথা বাড়ছে, শরীরের অস্বস্তি বাড়ছে। অমাবস্যা। ফলহারিণী কালীপূজার রাত। গ্রাহ্যের মধ্যে আনছেন না। পঞ্চম খণ্ডের শেষ প্রুফ। কালই প্রেসে যাবে।

প্রুখ দেখা শেষ করলেন। রাতে তাঁর সঙ্গে কয়েকজন থাকেন, যেমন বেলুড় মঠের স্বামী রাঘবানন্দ ও কয়েকজন গৃহীভক্ত। আজ তাঁরা গদাধর আশ্রমে কালীপূজায় অংশ নিতে গেছেন। সঙ্গে রয়েছেন অনুগত এক ভক্ত বলাইবাবু। শ্রীম শুয়েছেন। গত চার বছর ধরে এই ব্যথায় ভুগছেন। বাড়ে, কমে, সহ্যশক্তি অসীম। ঠাকুরের শিক্ষা, তপস্যা—'রোগ জানুক আর দেহ জানুক, মন তুলে নাও।' আজকের বেদনা মাত্রাছাড়া, সঙ্গে অন্য উপসর্গ।

খবর পেয়ে এসে গেছেন তাঁর স্ত্রী, জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভাসবাবু, আরো কয়েকজন আত্মীয়। শেষ রাতে এক ডাক্তারবাবু এসে ওষুধ দিলেন। না, কোনো কাজ হল না। রাত ক্রমশ ভোরের দিকে এগোচ্ছে। নতুন একটি দিন। শ্রীম-র জীবনের শেষ দিন। মাস্টারমশাই বললেন, 'আমার শ্বাস উঠছে, আমাকে ভালো করে শুইয়ে দাও।' শয্যার পাশে রয়েছেন তাঁর সহধর্মিণী আর বলাইবাবু। কিছুক্ষণের মধ্যেই গলায় ঘড় ঘড় শব্দ। তিনি বেশ উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'গুরুদেব! মা! কোলে তুলে নাও।' চোখ দুটি ধীরে ধীরে স্থির হয়ে গেল। সকাল আটটা বেজে দশ মিনিট। মহাজীবনের মহাযাত্রা। শোকযাত্রা এগিয়ে চলেছে কাশীপুরের মহাশ্মশান অভিমুখে। ৪ জুন, ১৯৩২ সাল।

স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ) বেলুড় মঠে পার্ষদদের বলছেন, 'ঠাকুর আমাকে এমন করে রেখেছেন যে, একটু গিয়ে মাস্টারমশাইকে দেখে আসব তারও জো ছিল না। তিনি তো তাঁর ভক্তদের সব একে একে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আর আমায় ফেলে রেখেছেন এ-সব শোকতাপ সইতে। তাঁর যে কী ইচ্ছা তিনিই জানেন। আহা, মাস্টারমশাই সারা কলকাতা যেন আলো করে ছিলেন। কত ভক্ত তাঁর কাছে গিয়ে কথামৃত শুনত, ঠাকুরের কথা, প্রাণ জুড়াত। এ অভাব আর পূরণ হবে না। তাঁর কাছে ঠাকুরের কথা ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গই ছিল না। ঠাকুরময় তাঁর জীবন।' মহাপুরুষ মহারাজ একটি ঘটনার কথা বলছেন, 'শ্রীশ্রীমা তখন নীলাম্বরবাবুর বাগানে থাকতেন। যোগেন মহারাজ তখন তাঁর সেবক। একদিন মাস্টারমহাশয় শ্রীশ্রীমাকে চুপি চুপি সব পড়ে শোনাচ্ছেন। ওপরের ঘরে অন্য কোনো লোক নেই। যোগীন মহারাজের মনে হল—আচ্ছা মাস্টার চুপি চুপি শ্রীশ্রীমাকে কী শোনায়। তাই তিনি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনতে আরম্ভ করলেন। মাস্টারমহাশয় শ্রীশ্রীমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা সব পড়ে শোনাচ্ছেন, শ্রীশ্রীমাও তা শুনে খুব আনন্দিত হয়ে বলছেন যে, সব ঠিক লেখা হয়েছে। শ্রীশ্রীমা মাস্টারমহাশয়কে খুব আশীর্বাদ করেন এবং ছাপাবার আদেশ দিলেন। বললেন, 'এতে জীবের অশেষ কল্যাণ হবে।'

১৮৮৬, ২৪ এপ্রিল, শনিবার। কথামৃত হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। সামান্য কিছু ঘটনা আর কথা। কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। বর্ণনা 'একটি ভক্ত আসিয়াছেন! সঙ্গে পরিবার ও একটি সাত বছরের ছেলে।' ভক্তটি আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্রীম, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী নিকুঞ্জদেবী ও সপ্তম বর্ষীয় পুত্র। মাস্টারমহাশয়ের তিন পুত্র ও এক কন্যা। সর্বশেষ আর এক কন্যার জন্ম হয়। ১৮৮৪ সালে এক পুত্রের মৃত্যু হয়। নিকুঞ্জদেবী পুত্রশোকে অধীর হয়ে পড়েন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা জানতেন। কথামৃতের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের বর্ণনায় সে-কথা আছে, 'এক বৎসর হইল একটি অষ্টম বর্ষীয় সন্তান দেহত্যাগ করিয়াছে। পরিবারটি সেই অবধি পাগলের মতো হইয়াছেন। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে মাঝে মাঝে আসিতে বলেন।

এর পরের বর্ণনা, শ্রীশ্রী মাতাঠাকুরাণী ঠাকুরের রাতের আহার নিয়ে এলেন সঙ্গে আলো হাতে নিয়ে ভক্তটির বউ, অর্থাৎ নিকুঞ্জদেবী। 'খাইতে খাইতে ঠাকুর তাঁহাকে ঘরকন্নার কথা অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন। কিছুদিন এই বাগানে আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের কাছে থাকিতে বলিলেন; তাহা হইলে শোক অনেক কম পড়িবে। তাঁহার একটি কোলের মেয়ে ছিল। পরে শ্রীশ্রীমা তাহাকে মানময়ী বলিয়া ডাকিতেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, তাকেও আনবে।

'খাওয়ার পর ভক্তটির পরিবার স্থানটি পরিষ্কার করিয়া লইলেন। শ্রীশ্রীমা যখন নীচের ঘরে গেলেন, তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সেই সঙ্গে গমন করিলেন।

'রাত্রি প্রায় নয়টা হইল। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়া আছেন। ফুলের মালা পরিয়াছেন। মণি ('একজন ভক্তের' নাম পালটে গেল, হয়ে গেলেন মণি) হাওয়া করিতেছেন।

'ঠাকুর গলদেশ হইতে মালা লইয়া হাতে করিয়া আপন মনে কী বলিতেছেন। তারপর যেন প্রসন্ন হইয়া মণিকে মালা দিলেন।

'শোকসন্তপ্তা ভক্তের পত্নীকে ঠাকুর শ্রীশ্রীমার কাছে ওই বাগানে আসিয়া কিছুদিন থাকিতে বলিয়াছেন, মণি সমস্ত শুনিলেন।'

কথামৃত শেষ। ঠাকুরের ঘণীভূত অন্তিম লীলা শ্রীম লিখলেন না। ফুল ঝরার কালে তার দলগুলি মুদে আসে, বর্ণহীন। ঈশ্বরের উদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এমন এক কুসুম, যার বিকাশই আছে, সঙ্কোচ নেই। শতদলে বিকশিত হওয়া। আরো আলো, আরো প্রাণ। শেষটা তাঁর—বিরাট সভাঘরে বিপুল এক অর্কেস্ট্রা। সব বাদ্যযন্ত্র একসঙ্গে ঝমঝম করে বাজছে। কিন্তু এ যেন মনে হচ্ছে, কেউ কোথাও নেই। লণ্ঠনের আলো। নিস্তব্ধ অন্ধকার উদ্যান। দুটি মাত্র চরিত্র। কিছু জাগতিক দুঃখ, সুখের কথা। একটি প্রসাদী থালা। মাস্টারমহাশয়, শ্রীম, সময় তো পেয়েছিলেন অনেক, তাঁর সাজিতে তো অনেক কুসুম ছিল, তা হলে? ছোট্ট একটি মালা হাতে দৃশ্যপট কেন টেনে দিলেন। ক্লান্তি!

চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম-সংকীর্তন

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

সেবারও জগন্নাথের রথোৎসব চলছে। গৌড়দেশ থেকে অগণিত ভক্ত এসেছেন সচল মহাপ্রভুর সঙ্গে অচল জগন্নাথ মহাপ্রভুর দর্শন করবেন বলে। ততদিনে রূপ-সনাতন রাজকার্য ছেড়ে চলে এসেছেন মহাপ্রভুর কাছে—তাঁরা বৃন্দাবন চলে যাবেন কিছুদিন পরে। চলে এসেছেন যবন হরিদাস, নবদ্বীপ ছেড়ে। এখন তিনি পাকাপাকি নীলাচলবাসী। যাইহোক, উড়িয়া, গৌড়িয়া প্রভুর যত ভক্ত আজ নেমে এসেছেন রথের সামনে। প্রভু জগন্নাথ রথোপরি স্থাপিত হয়েছেন, সমস্ত জনারণ্যের মাঝখানে শুধু জয়কার-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে—জয় জগন্নাথ! জয় মহাপ্রভু নীলাচলনাথ!

আমি এক কথায় দুই কথা বলব। এক কথা হল—মহাপ্রভু জননী শচীদেবীর উপরোধে নীলাচলক্ষেত্রে রয়ে গেলেন, পরে তিনি বৃন্দাবনে গেছেন বটে, কিন্তু স্থায়ী আবাস শ্রীক্ষেত্র। দ্বিতীয় কথা হল—পুরীতে থাকার ফলে তাঁর মধ্যে সেই চিরন্তন বিরহ-দশা রয়েই গেল। ভাবটা এই—জগন্নাথের মধ্যে সেই শ্যামল-সুন্দরকে পেলাম বটে, কিন্তু বৃন্দাবনের মধুর রমণ-বসতিতে তাঁকে পেলাম না।

যাইহোক, রথাগ্রে উড়িয়া-গৌড়িয়াদের সংকীর্তন চলছে। হঠাৎই চৈতন্যদেব একটি সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করলেন সকলের সামনে। বলে নেওয়া ভালো—মধুর যে ছন্দোময়ী বাণী মহাপ্রভুর মুখ থেকে নির্গত হল, তার ভাব-রস সবটাই একেবারে প্রাকৃত সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রেমের বিষয়। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের বিশিষ্ট ভাবুকেরা এই শ্লোক বারংবার উদাহরণ দিয়েছেন ব্যঞ্জনা- বৃত্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখানোর জন্য। সকলেই অবাক হয়ে গেল— মহাপ্রভু কৃষ্ণের কীর্তন অথবা তাঁর লীলাবিষয়ক মধুরালাপ বাদ দিয়ে কেন জগন্নাথের সামনে এমন এক জর্জর প্রাকৃত শ্লোক উচ্চারণ করলেন। এত কথার পর সেই শ্লোকের অর্থ না বললেই নয় এবং আরও বলা দরকার যে, এই শ্লোক লিখেছেন সংস্কৃতের এক বিখ্যাত মহিলা কবি।

প্রেমিকার সঙ্গে প্রেমিকের দেখা হয়েছে বহুকাল পরে, কিন্তু যেখানে দেখা হয়েছে, সে জায়গাটা প্রেমিকার ভালো লাগছে না—এমন একটা জায়গা যেখানে প্রেমের সার্থক উদ্দীপন ঘটে না। প্রেমিকা বলছে—সেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হল। আমার প্রথম যৌবনে যিনি আমার কুমারীত্ব হরণ করেছিলেন, যিনি আমাকে অশেষে-বিশেষে কামনা করেছেন, আমার সেই কুমারীত্ব-হরণ-করা বর আমার সামনেই উপস্থিত। আছে সেই চৈত্রের রজনীও—বসন্ত রজনীর কোকিলালাপ-বাচাল যত উপকরণ, তাও ঠিকই আছে, সেই উন্মীলিত মালতীফুলের হাওয়া ভেসে আসছে প্রৌঢ়পুষ্প কদম্বের রেণু গায়ে মেখে। এমনকী আমিও তো সেই আমিই আছি। কিন্তু এ কেমন বুকের মধ্যে উথালি- পাথালি লাগে আমার—সেই যে সেই রেবা নদীর তীরে বেতসী-লতার কুঞ্জবনে তাঁর সঙ্গে যে আমার দেখা

হত, প্রেমের সেইসব প্রথম আকুলতার অভিসন্ধিগুলি আমার সেই লজ্জা-কুঞ্জে ফেলে এসেছি, সেই রেবার তীরে বেতস-গৃহখানির জন্য আমার মন কেমন করে। ইচ্ছে করে সেইখানে ফিরে যাই আবার।

জগন্নাথের রথের সামনে সমস্ত ভক্তদের মধ্যে যখন এক দৈবভাব উদ্দীপিত হচ্ছে, সেই সময়ে এমন এক প্রাকৃত নায়িকার প্রেমাকুল বর্ণনা সবাইকে অবাক করে দিল। একবার নয়, দুবার নয়—এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়েন বার বার। কেউ যার অর্থ বুঝল না, অন্তত চৈতন্যদেব কেন এই সময়ে এমন শ্লোক পড়লেন, তার অন্তর্গূঢ় রহস্যটা একজনই মাত্র বুঝতে পারলেন। তিনি হলেন পুরীতে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গী স্বরূপ-দামোদর। মহাপ্রভুর অন্তরের এই আর্তি কেন, সেটা স্বরূপ বুঝলেন বটে, কিন্তু কাউকে বললেন না। হুসেন শাহের মন্ত্রী দবির খাস রূপও কিন্তু সেবার পুরীতে এসেছিলেন মহাপ্রভুর কাছে। সেই রথযাত্রায় তিনিও ছিলেন প্রভুর কাছাকাছি। তিনিও শ্লোক শুনে স্বস্থানে ফিরে গেছেন।

রূপ, সনাতন আর যবন হরিদাস—এই তিনজন জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করতেন না। বহুকাল মুসলমান সুলতানদের রাজকর্ম করেছেন সেইজন্য রূপ-সনাতন নিজেদের বড়ো হীন এবং ম্লেচ্ছ বলে ভাবতেন, আর হরিদাসের দীনতা ছিল প্রশ্নাতীত। এঁরা জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করতেন না বলে মহাপ্রভু নিজেই এই তিনজনের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন প্রতিদিন। সেই রথযাত্রার পরের দিন জগন্নাথের প্রাতঃকালীন উপল-ভোগ দর্শন করে মহাপ্রভু এসেছেন ওই তিনজনের সঙ্গে দেখা করতে। এসে দেখলেন—রূপ গেছেন সমুদ্র-স্নান করতে। হঠাৎই ওপর দিকে নজর পড়তে শ্রীরূপের ঘরের চালের ওপর তালপাতায় লেখা একটি সংস্কৃত শ্লোক দেখতে পেলেন মহাপ্রভু। সে-যুগে বহু কষ্ট করে লেখার কালি তৈরি করতে হত এবং তালপাতায় লেখার পর তা শুকোতে দিতে হত। তা ঘরের চালে শ্লোক শুকোতে দিয়ে রূপ স্নানে গেছেন আর তখনই মহাপ্রভুর নজরে এল রূপের অপূর্ব হস্তাক্ষর—শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাতি।

রূপের লেখা শ্লোক পড়ে মহাপ্রভু একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর অন্তরের মধ্যে সেই কৃষ্ণপ্রেমের আকুল ভাব জাগল, তিনি আবিষ্ট হয়ে রইলেন। স্নানশেষে রূপ ফিরে এসেই দণ্ডবৎ প্রণাম করে লুটিয়ে পড়লেন মহাপ্রভুর পায়ে। প্রভু তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন—কেউ যে-কথা বুঝতে পারল না—মোর মনের কথা তুই জানিলি কেমনে? আনন্দে মহাপ্রভু সেই শ্লোক-পাতি নিয়ে চললেন স্বরূপ-দামোদরকে দেখানোর জন্য। রূপ যে শ্লোক লিখেছেন সেটাও এক রমণীর বয়ান, কিন্তু সেটা প্রেমময়ী রাধার কথা, কৃষ্ণের উদ্দেশে। পুরাণে প্রমাণ আছে—রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের একবার দেখা হয়েছিল কুরুক্ষেত্রে। কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র বটে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রও বটে। যুদ্ধ লাগলেই দুই বিবাদী ক্ষত্রিয় শিবির এখানে উপস্থিত হতেন ভালো করে যুদ্ধ করার জন্য। বিখ্যাত পানিপথ—যেখানে অন্তত তিন-তিনটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ হয়েছে—সেই পানিপথও কিন্তু কুরুক্ষেত্রের পরিসরের মধ্যেই। তার মানে কুরুক্ষেত্র মানেই যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র মানেই যুযুৎসু ক্ষত্রিয়ের আনাগোনা। আর এই রকম একটা বিপরীত জায়গায় রাধার সঙ্গে দেখা হয়েছে কৃষ্ণের। রূপ গোস্বামীর সংস্কৃত অনুবাদে ব্যাপারটায় রাধার আকুলতা ধরা পড়েছে। তিনি সহচরী সখীদের বলছেন—
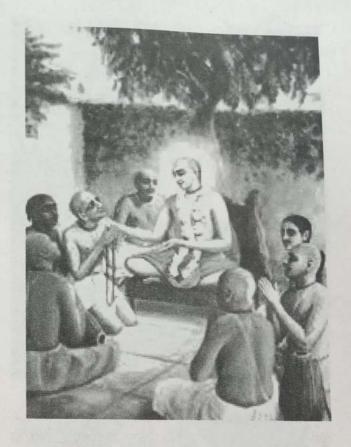
সেই প্রিয়তম কৃষ্ণের সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছে, আমিও সেই আমিই আছি। এমনকী আমাদের মধ্যে যে সেই মধুর মিলন তাও ঘটেছে, এই কুরুক্ষেত্রে। কিন্তু তবু, তবু সেই যমুনা-পুলিন-বনে মধুর মুরলীর পঞ্চম তান যা আমার মনের মধ্যে হু-হু করে উঠত, সেই যমুনা-পুলিনে যদি কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হত আমার, তার জন্যে অন্তরে আমার দুঃখ রয়ে গেল।

ধরে নেওয়া যাক, রূপকৃত এই শ্লোকটি পুরাতন এক প্রাকৃত শ্লোকের কৃষ্ণঘটিত অনুবাদ। কিন্তু এখানে যেটা বড়ো হয়ে উঠেছে, সেটা হল হৃদয় বোঝার ব্যাপার। মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমে, হৃদয়ের মধ্যেও সেই চিরবিরহকাতর রাধাভাব। অথচ মায়ের ইচ্ছায় মূল্য দিতে গিয়ে সন্ন্যাসীর স্বাধীনতা গ্রহণ করে তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে থাকতে পারলেন না। নীলাচলক্ষেত্রে

কিন্তু ক্ষণিকেই তাঁর ভাবান্তর ঘটে গেল। জগন্নাথের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি অন্য দিকে পড়তেই জগন্নাথের রথ, লোকারণ্য সব তাঁকে অন্যভাবে আনমনা করে তুলল, তাঁর ভাবান্তর হল। তারপর সেই বিখ্যাত রসশ্লোক 'যঃ কৌমারহরঃ' এবং অবশেষে তাঁর ভাবান্তরের গান। পুরীতে জগন্নাথকে যখনই দেখেন, প্রভু ভাবেন যেন কুরুক্ষেত্রে দেখা হয়েছে কৃষ্ণের সঙ্গে। কবিরাজ কৃষ্ণদাসের অনবদ্য পয়ারে ভাবটা এইরকম দাঁড়ায়—

সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।।
ইঁহা লোকারণ্য হাতী-ঘোড়া-রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পবন-ভৃঙ্গ পিক-নাদ শুনি।।
ইঁহা রাজবেশ সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের গণ।
তাঁহা গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন।।
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন।
সে সুখ-সমুদ্রের ইঁহা নাহি এক কণ।।
আসা লৈয়া পুন লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় তো পূরণে।।

জগন্নাথদেবের মধ্যেও তিনি তাঁর শ্যামল-কিশোরকে দেখতে পান বটে, কিন্তু তাত্ত্বিকতার দিক থেকে সেই দর্শনে ভেদ না থাকলেও কৃষ্ণের স্ব-পদ-রমণ বৃন্দাবনের মধ্যেই রাধা যেমন তাঁকে পেতে চান মহাপ্রভুর ভাবও তেমনই।

অর্থাৎ সেই যমুনার তীর, সেই বৃন্দাবন। চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রিয় পার্ষদ রূপের সেই শ্লোক ভুলতে পারছেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই শ্লোকের রূপ দিলেন কীর্তনের ভাষায়, কীর্তনের অঙ্গে, কীর্তনের ছন্দে। কাজটা ঠিক কে করলেন জানা নেই, কিন্তু সরল বাংলা ভাষায় একটা কীর্তনের কলি তৈরি হল এবং চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখছেন—

জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া ধুয়া গাওয়াইল।।

'ধুয়া' (বাংলায় ধুয়া কথাটা ধ্রুবা থেকে এসেছে। সাধু ভাষায় এটি ধ্রুবপদ, ধ্রুবক অথবা ধ্রুপদ।) মানে গানের সেই পদ-পদাংশ যেটা গানের প্রথমে গাওয়া হয় এবং কীর্তনের দোহাররা যেটা গেয়ে সুর রক্ষা করেন। চরিতামৃতকার মহাপ্রভুর অন্তর-ভাণ্ডারী স্বরূপের মুখে এবার যে ধুয়া গাওয়ালেন, সেটা কিন্তু একটা ভাবান্তরের পর। প্রথম জগন্নাথকে রথে আসতে দেখে রাধাভাবিত মহাপ্রভু এতটা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি গানের ধুয়া গাইলেন—

সেই তে পরাননাথ পাইলুঁ
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেলু।

এই ধুয়া দামোদর পণ্ডিত গাইতে লাগলেন উচ্চৈঃস্বরে, আর চৈতন্য মহাপ্রভু সেই ধুয়ার সুরে নাচতে লাগলেন আনন্দে। এই কীর্তন বিখ্যাত করে দিয়েছেন রামদাস বাবাজিমশায়। আসলে রথের ওপর জগন্নাথকে দেখে রাধা-ভাবে ভাবিত চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরে যে প্রথম মিলনের ভাবটুকু ভাষায় প্রকট হয়ে উঠল, সেই প্রকটিত ভাবটাই কিন্তু সুর, তাল, লয়ে শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে এমন একটা সংগীত-প্রকৃতি তৈরি করছে, যাকে আমরা কীর্তন বলছি। প্রথম ভাবে যে মিলনের ভাষা, সুর, তাল এমনকী ভাবও—সেই তো পরাণ-নাথ পাইনু বলে মহাপ্রভু ধুয়া ধরলেন—হয়তো এইটুকুই তখন কীর্তনাঙ্গ ছিল, ছিল পুরাতন রাগ-রাগিণী—স্বরূপ-দামোদর তাতেই ধ্রুপদ গাইলেন—

সেই কো পরাণ-নাথ পাইলুঁ
তার সঙ্গে বড়োজোর আর এক পঙ্‌ক্তি—
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেলুঁ।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং অনেক গবেষণার পরেই এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, এই ধ্রুবপদটুকু চৈতন্য মহাপ্রভুরই ভাবোচ্ছ্বাসে সৃষ্ট। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী তিনি বারবার আস্বাদন করেছেন—কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পদটুকু তাঁদের রচনা নয়। অথচ তাঁদের ভাষা আক্রান্ত স্বরূপ-দামোদর অথবা মহাপ্রভুর ভাষা এবং ভাবকে। সেটাই স্বাভাবিক। কেননা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা বদলেছে, সহজ হয়েছে। বিশেষত কীর্তনের সে সুর প্রধানত রাগ-রাগিণীর আশ্রয়ে ছিল তা তো কালের গতিতে পালটাবেই, তাই পালটেওছে। বাংলার জয়দেব কবি—যিনি সংস্কৃত কাব্যকর্তাদের শেষ বংশধর অথচ বাংলা কাব্যভাষার সাংস্কৃতিক এবং সাংস্কারিক জনক—তিনি যে 'ধীর-সমীরে

যমুনা-তীরে'র গান গেয়েছিলেন, অথবা তাঁর 'ললিত-লবঙ্গ-লতা' যেভাবে প্রাবাদিক গানের কলি তৈরি করে দিয়েছিল, তার সুর-স্বর, রাগ-রাগিণী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাল ব্যাপ্ত করে দিয়েছিল নিশ্চয়ই, নাহলে মৈথিল বিদ্যাপতির প্রায়-প্রভাবিত—'সেই তো পরাননাথ পাইনু' কিংবা রায় রামানন্দের 'আপন কৃত গীত' 'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল'—এসব গান কিন্তু কীর্তনাঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর কানে পৌঁছেছে।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল—কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সম্ভোগ-বিরহকল্পের মাধুরী-মাখা এই যে সব কীর্তন, তার প্রকট স্থান কিন্তু নীলাচলক্ষেত্র অর্থাৎ পুরী। এখানে রায় রামানন্দের মতো দক্ষিণী রসিক নিজে কীর্তনের পদ লিখছেন, স্বরূপ-দামোদরের মতো পণ্ডিত-রসিক মহাপ্রভুর নির্জন সহচর, আর ওদিকে আছেন দামোদর পণ্ডিত এবং বাসুদেব ঘোষের মতো গাইয়ে। সব মিলিয়ে নীলাচলে যে কীর্তন চলত—তার পদ, তার সুর-স্বরের ঠাটবাট এতটুকুও নবদ্বীপে মহাপ্রভুর পুরাতন নাম সংকীর্তনের মতো নয়। অথচ এই কীর্তন চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুপ্রেরণায় তৈরি—তার প্রমাণ আছে।

সেবারও গৌড়িয়া ভক্তবৃন্দ নীলাচলে এসেছেন রথযাত্রার কালে। কিন্তু পুরীতে চৈতন্য মহাপ্রভু বেশ কিছুকাল থাকা সত্ত্বেও উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়নি তখনও। চৈতন্য মহাপ্রভুই রাজার মতো ঐশ্বর্যশালীর সঙ্গে পরিচয়ে খানিক কুণ্ঠিত ছিলেন। চৈতন্য পার্যদেরা—সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রামানন্দ রায়েরা অবশ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ওই পরিচয়ের। রথযাত্রা এগিয়ে আসছে, গৌড়ের ভক্তেরা নানা জায়গায় কীর্তন করে যাচ্ছেন সম্মিলিত হয়ে। এর মধ্যে রাজ-প্রাসাদের উপরিতলে দাঁড়িয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য গৌড়িয়া ভক্তদের চিনিয়ে দিচ্ছিলেন একে একে, কিন্তু সেই চেনার সঙ্গে সঙ্গে কীর্তনের সুর ভেসে আসছিল প্রতাপরুদ্রের কানে। অপূর্ব-শ্রুত এই কীর্তনের ধ্বনি শুনে—

> রাজা কহে—দেখি মোর হৈল চমৎকার।
> বৈষ্ণবের ঐছে তেজ দেখি নাহি আর।।
> কোটি সূর্য সম সব—উজ্জ্বল বরণ।
> ....,স কভু নাহি দেখি এই মধুর কীর্তন।।
> ঐছে প্রেমে ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
> কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি।।

গজপতি প্রতাপরুদ্র উড়িষ্যার রাজা, জগন্নাথের পূজারি। কাজেই মন্দিরের ভজন-কীর্তন তিনিও শুনে থাকবেন কিছু, কিন্তু বাংলার কীর্তনাঙ্গ তাঁর জানা ছিল না তেমন করে, তাঁর কাছে গৌড়িয়াদের কীর্তনধ্বনি তাই 'চমৎকার'। প্রতাপরুদ্রের বিস্ময়-চমৎকার দেখে—

> ভট্টাচার্য কহে এই মধুর বচন।
> চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম-সংকীর্তন।।

অর্থাৎ প্রতাপরুদ্র যে কীর্তন শুনেছেন, সেটা কিন্তু নাম-সংকীর্তন নয়, যেটা প্রেমসংকীর্তন—সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলছেন—এটা চৈতন্যের সৃষ্টি। আমরা এটাই বলতে চাই—কীর্তন আগেও ছিল, কিন্তু যে কীর্তন স্বরে-সুরে-ভাবে মাতোয়ারা করে সেই বাংলার কীর্তন গজপতি শোনেননি এবং সেটা চৈতন্যেরই সৃষ্টি। এখানে মনে পড়া উচিত চৈতন্য ভাগবতের প্রমাণ। পিতৃশ্রাদ্ধ সেরে ঈশ্বরপুরীর মন্ত্র কানে নিয়ে চৈতন্য যখন গয়া থেকে নবদ্বীপে ফিরছেন, তখন তাঁর দশা উন্মত্তের মতো—উন্মাত্তবৎ গায়তি নৃত্যতি

ক্বচিৎ—তিনি হরিনামে মাতোয়ারা। তাঁর ব্যাকরণ পড়ানোর টোলে পড়াশোনো ছেড়ে তাঁর ছাত্র-শিষ্যেরা প্রভুর মত্ততা দেখছেন। অবশেষে একদিন বিদ্যায় ইতি দিয়ে চৈতন্য তাঁর শিষ্যদের বলেই ফেললেন—অনেক পড়াশোনো হয়েছে, এবার কীর্তন করো—

> পড়িলাভঙ শুনিলাঙ যতদিন ধরি।
> কৃষ্ণের কীর্তন কর পরিপূর্ণ করি।।

তখনো কিন্তু তাঁর টোলের ছাত্রেরা জানেন না যে, কীর্তন জিনিসটা কী, সেটা কী করে করতে হয়। চৈতন্য এবার শেখাতে আরম্ভ করলেন কেমন করে কীর্তন করতে হয়—তার সুর, স্বর,

রাগিণী এবং সেই জনপ্রিয়তম কীর্তনের পদটি এখনও চলে এবং সেই কীর্তনে পঙ্‌ক্তি যুক্ত হয়েছে আরও অনেকগুলি। চৈতন্য ভাগবতের বয়ানে—আকর কীর্তনটি এই রকম—

শিষ্যগণ বলেন—কেমন সংকীর্তন।
আপনে শিখায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।।
(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।।
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া।।
আপনে কীর্তন-নাথ করেন কীর্তন।
চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব শিষ্যগণ।।

শিষ্যদের তালিম দেবার জন্য যে গানটি চৈতন্য মহাপ্রভুর মুখে উচ্চারিত হয়েছিল—প্রথমত, সেই গানটি এখনও গাওয়া হয়, যদিও চৈতন্য ভাগবতে এই গানের জন্য যে 'কেদার রাগ' নির্দিষ্ট আছে, তার অবশিষ্ট এখনকার গানে অনুসৃত হয় কিনা, সেটা বলা কঠিন। এই গানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল সংস্কৃত ভাষা এবং বাংলা ভাষার মিশ্রণ। প্রথম পঙ্‌ক্তিটি সংস্কৃত, যার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি এখনকার কীর্তনে উচ্চারণ করি আমরা—

(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।।

চৈতন্য ভাগবতে দ্বিতীয় চরণেই বাংলা ভাষা—

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

তার দ্বিতীয় পংক্তিতে আমরা এখনও গেয়ে থাকি—

গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন।।

এই গান চৈতন্য মহাপ্রভুর আগে কোনো পদাবলীতে আমরা পেয়েছি বলে মনে করি না। গানটি তাঁর গুরু ঈশ্বরপুরীর মুখনিঃসৃত কোনো লোক প্রচলিত পদ কিনা, তাও বলা মুশকিল। কিন্তু চৈতন্যচরিতের দুটি উৎস—প্রথমত চৈতন্য ভাগবতে নদীয়া বিহারী চৈতন্য শিষ্যদের কীর্তন কী করে করতে হয়, সেটা শেখাচ্ছেন। ফলে বৃন্দাবন দাস তাঁকে কীর্তন-নাথ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় উৎস চৈতন্য চরিতামৃতে স্বয়ং সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মুখে শুনছি—চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেমসংকীর্তন।

আমরা এখানে বাংলার কীর্তনের ইতিহাস রচনা করতে বসেছি, সেখানে চৈতন্য মহাপ্রভুকেই আমরা বাংলার কীর্তনগানের স্রষ্টা মনে করি। তিনি সংকীর্তন-নাথ, সংকীর্তন-পিতা। এমনকী কীর্তনের যে প্রধান অনুষঙ্গ খোল-করতাল, তারও প্রবর্তক-সংস্কারও আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভু—যেমনটি নরহরি চক্রবর্তী লিখেছেন ভক্তিরত্নাকরে—

শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল-করতাল।
তাহে কেহ অর্পয়ে চন্দন পুষ্পমাল।।

নদীয়া-নগরীতে খোল-করতালের ধ্বনিতে নাম- সংকীর্তনের যে ধারা তৈরি হল, সেই সহজ লোকগ্রাহ্য কীর্তনই জগন্নাথক্ষেত্রে নবকলেবর ধারণ করেছিল চৈতন্যেরই প্রতিভায়। গম্ভীরায় 'স্বরূপ-রামানন্দ সনে' চৈতন্য মহাপ্রভুর যে আস্বাদ্য বস্তু ছিল, সেটা কিন্তু 'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি/রায়ের নাটকগীতি/ কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ'। বলা বাহুল্য, রামানন্দ রায়ের নাটকে অনেক জায়গাতেই লঘু পদ্যগুলিতে যেমন গানের অবসর আছে, তেমনই গীতগোবিন্দ তো রাগাশ্রয়ী গানের জন্যই রচিত। লীলাগুরু বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত-কর্ণরসায়ন গীতিশ্লোকই বটে। আর বাকি যাকে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি—যেখানে কৃষ্ণলীলা-কীর্তনের অবধি তৈরি হয়েছে। বিদ্যাপতির গান চৈতন্য মহাপ্রভুর মুখে শোনার দৃষ্টান্ত, আমরা পাইনি বটে, কিন্তু একই ধাঁচে 'সেই তো পরাননাথ পাইনু' অথবা রায় রামানন্দের কলি—'ন সো রমণ ন হাম রমণী'—এগুলি তো বিদ্যাপতির সমান্তরাল।

কিন্তু পদাবলীর এই সব গান—যার পদ-বাক্য-ছন্দোবিন্যাস দেখে আমরা ধরেই নিতে পারি যে, বিচিত্র রাগ-রাগিণীর পরামর্শে এগুলি অতি সুমধুর হয়ে থাকলেও এগুলি কোনো অনিবদ্ধ সংগীত ছিল না। অর্থাৎ ধ্রুপদী সংগীতে যে আলাপ বা আলপ্তির অংশ থাকে, পদাবলী-কীর্তন বা লীলাকীর্তন কখনোই আলাপমাত্রেই শেষ হয়ে যেত না, কারণ পদাবলীর পদই সেখানে প্রধান অন্তরায়। এখানে বলা দরকার চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে যে পদাবলী-কীর্তন শুরু হয়েছিল, তার সুর-স্বর যতই রাগাশ্রিত থাকুক, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদ অর্থযুক্ত কথার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাই শুধুমাত্র 'আলপ্তি' 'আলাপ' বা 'আলাপচারি'তেই বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদ গাওয়া শেষ হত না। আমাদের ধারণা, রাগ-রাগিণীর সঙ্গে বাংলার লোকগীতির কিছু সুরের ভাবনা অনুস্যূত হয়েই কীর্তনের এক নতুন genre তৈরি হয়, যেটাকে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভাষায় বলতে পারি—'চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম-সংকীর্তন'। ❖

নিবন্ধ

বাদশা, মনীষীদের প্রিয় খাবার

শিবশংকর ভারতী

মিশ্রগৃহের অনিন্দ্যসুন্দর কে এই শিশু? আজকের পূর্ণিমার চাঁদের তরী বেয়ে সে আবির্ভূত, এই পূর্ণিমারই স্বর্ণকান্তি যেন তাঁর সারা দেহে উপচে পড়ছে। উত্তরকালে দীর্ঘায়ত সুন্দর সুঠামতনু কে এই তরুণ? ভুবনমোহন এ রূপ দেখলে দু-নয়ন ফেরানোর কোনো উপায়ই নেই। সর্বচিত্তহারী কে এই করুণ-সুন্দর পুরুষ?

একসময় এই পুরুষটির অভ্যুদয় ঘটে নদিয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ রূপে, তিনিই প্লাবিত করে দেন সুরধনীর দুই তীর প্রেমভক্তির সুধাস্নিগ্ধ কিরণে। আবার দেখি নীলাচলের সাগরতীরে তাঁরই এক অনির্বচনীয় রূপ। সেখানে তিনি স্বয়ং চৈতন্যচন্দ্র। তাঁর মধ্যে প্রেমভক্তির পূর্ণপ্রকাশ। সেখানে ভক্তজনের হৃদয়সাগর উদ্বেলিত করে পূর্ণচন্দ্রের মতোই তিনি বিরাজমান।

নবদ্বীপে মায়াপুর পল্লিতে শ্রীহট্টিয়া পাড়ার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথা (১৪৮৬-১৫৩৩)। আহারলীলায় অমৃতের আস্বাদনই করতেন শচীনন্দন নিমাই তথা শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর বিভিন্ন মিষ্টান্ন ও পদ-ব্যঞ্জনের প্রতি প্রীতির টান ছিল অমোঘ। তাঁর প্রিয় খাবারের মধ্যে ছিল শালিধানের অন্ন, শাকভাজা, থোড় বড়ি ভাজা, মোচার ঘণ্ট, লাফড়া, শুক্তো, পায়েস ইত্যাদি। মা শচীদেবী এগুলি নিজহাতে রান্না করে খাওয়াতেন তাঁর প্রিয় পুত্র আদরের নিমাইকে।

পুরীতে ভক্ত সার্বভৌমের বাড়িতে যখন ছিলেন তখন তিনি চেয়ে চেয়ে খেয়েছিলেন লাফড়া ব্যঞ্জন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের কথায়—

"সার্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে,
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফ্ড়া ব্যঞ্জনে।"

একবার শচীমাতা দেখেছিলেন গোরাচাঁদ পরমানন্দে মাটি খাচ্ছেন মুঠোমুঠো। অথচ তাঁর পাশে পড়ে রয়েছে বাটিভরা খই আর সন্দেশ। এসময় শচীমাতা ভাবলেন নিমাই বোধ হয় মাটি আর মিষ্টির তফাত বোঝার বোধটুকু হারিয়েছে! নিমাইকে জিজ্ঞাসা করলে শচীনন্দন জানালেন, 'মা, ওই যে খই-সন্দেশ সে সব তো মাটিরই রূপান্তর। স্বরূপে তো মাটিই।'

প্রগাঢ় বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন চৈতন্যদেব জগন্নাথদেবের প্রসাদে। সপার্ষদ প্রতিদিন মহাপ্রসাদ পেতেন তিনি পুরীতে থাকাকালীন। মহাপ্রসাদ এতটাই প্রিয় ছিল তাঁর কাছে। মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য কথা মধুরভাবে উল্লিখিত হয়েছে বৃহৎসারাবলীতে (জগন্নাথলীলা)। এখানে তারই পয়ার তুলে ধরছি—

'লক্ষ্মীর রন্ধন শেষে বহে যত ভোগ।
দক্ষিণের পথে আসি দেউল পূর্ণিত।।
সেই ভোগ জগন্নাথে হৈলা নিবেদন।
সে মহাপ্রসাদ হয় শুন দ্বিজগণ।।'

যাইহোক, চৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করে ফিরে এসেছেন শ্রীক্ষেত্রে। নিত্যানন্দপ্রভু এই সংবাদ গৌড়ীয় ভক্ত এবং নবদ্বীপে শচীমাতাকে অবগত করানোর জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজকে গৌড়দেশে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করলেন মহাপ্রভুকে, তখন মহাপ্রভু—

'মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার।
দক্ষিণ হইতে আইলা প্রভু কহে সমাচার।।'

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২/১০/৭২-৭৪)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর দেওয়া জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ আর তাঁর প্রত্যাবর্তন সংবাদ বিতরণ করলেন প্রভুর ভক্ত ও পার্ষদ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, শ্রীনিবাস, মুরারি গুপ্ত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, বাসুদেব দত্ত প্রমুখদের। তাঁরা সকলেই মহাপ্রসাদ পেয়ে অপার আনন্দে বিহ্বল হয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতে লাগলেন উদ্দণ্ডে। মহাপ্রভু যেন এই শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন—জগন্নাথক্ষেত্র থেকে প্রিয়জনকে উপহার দিতে হলে মহাপ্রসাদই পাঠাতে হয়।

পুরীতে যতদিন ছিলেন ততদিন চৈতন্যদেব প্রতিদিন মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতেন। মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ ছিল যেন প্রাণ। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বিরচিত শ্রীশ্রীবৃহদভাগবতামৃত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে গোপকুমার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে মহাপ্রসাদের যে মাহাত্ম্য কথা তুলে ধরেছেন তা বাংলা অনুবাদে—

'স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁহার (শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের) অন্ন রন্ধন করেন এবং করুণাময় প্রভু তাহা ভোজন করিয়া নিজ ভক্তগণের মধ্যে বিতরণ করেন। তাহাতেই ভক্তগণ দেবদুর্লভ অন্নলাভ করিতে পারেন। প্রভুর সেই প্রসাদ অন্নের নাম মহাপ্রসাদ। তাহা জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে কেহ স্পর্শ করিলে বা

যে কোনো মহানীত হইলেও সকলেই অবিচারে ভোজন করিতে পারেন।'

চৈতন্যের মতো চৈতন্যগতপ্রাণ পার্ষদ ঠাকুর শ্রীহরিদাস জগন্নাথক্ষেত্রে একমাত্র মহাপ্রসাদ ছাড়া অন্য কোনো আহার গ্রহণ করতেন না। তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান আহারই ছিল একান্ত প্রিয় মহাপ্রসাদ।

একসময় ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল। ঠাকুর হরিদাসের অন্ত্যলীলার শেষদিনে কীর্তনোৎসবের আয়োজন হল চৈতন্যদেবের ইঙ্গিতে। ভক্তদের মধ্যে অবস্থানরত মহাপ্রভুর নয়নাভিরাম মূর্তির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ঠাকুর হরিদাস। বক্ষস্থলে প্রভুর চরণ দুখানি রেখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করতে করতে মহাপ্রয়াণ করলেন নামযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক ঠাকুর হরিদাস।

এবার হরিদাসের নিষ্প্রাণ দেহভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে নৃত্যরঙ্গে মেতে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। চারদিকে ভক্তদের কীর্তনও উদ্দণ্ড নৃত্যের স্রোত প্রবাহিত, কারও শ্রান্তি নেই, বিরামও নেই এতটুকু। অবশেষে স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর কাঁধ থেকে কেড়ে নিলেন হরিদাসের দেহ। তারপর হরিদাসের সমুদ্রস্নাত দেহ অসংখ্য ভক্তের উপস্থিতিতে সমুদ্রতটে বালুকারাশি ছড়িয়ে সমাহিত করলেন মহাপ্রভু।

'আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর হরিদাসের তিরোধান উৎসবের সাহায্যকল্পে তোমরা আমাকে ভিক্ষা দাও', মানবসমাজ যাঁর কৃপা-ভিখারি, আজ নিজে ভিখারি হয়ে তিনি দ্বারে দ্বারে উপস্থিত, ধীরে ধীরে নানা খাদ্যসম্ভার এল। মহাপ্রভু স্বয়ং হরিদাসের প্রাণপ্রিয় মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করে এনে ঠাকুর হরিদাসের তিরোভাব উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করেছিলেন পুরুষোত্তমক্ষেত্র নীলাচলে।

এখন মোঘল বাদশাদের খানাপিনার কথা। 'সবাই সুরাপান করে, পান না করার জন্য শপথ নেয়, আমি শপথ নিয়েছিলাম এবং অনুতাপ করেছিলাম।' একথা ওমর মির্জার বড়োপুত্র বাদশা জাহির উদ্দিন মহম্মদ বাবরের (১৪৮৩-১৫৩০)। তিনি জন্মেছিলেন উজবেকিস্তানে ফারগানা প্রদেশের আনদিজান শহরে। গোঁড়া সুন্নি মুসলমান ছিলেন। তাঁর স্পৃহা ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। শারীরিক ভাবে সুস্থ ও শক্তসমর্থ বাবর ব্যায়ামের জন্য দু-কাঁধে দুজনকে নিয়ে দৌড়তেন ঢাল বেয়ে। চলার পথে সামনে কোনো নদী পড়লে পার হতেন সাঁতরে। উত্তর ভারতে গঙ্গানদী সাঁতরে পার হয়েছিলেন দু-বার। তবে বাবর একসময় আসক্ত হয়েছিলেন সমকামীতে।

বাদশা বাবর সারা জীবন সুরাপান করে মৃত্যুর ঠিক বছর দুয়েক আগে পান করা ছেড়েছিলেন। তবে তিনি ছাড়তে পারেননি আফিঙের নেশা। বাদশা রাজকীয় সব রকমের খাবার ও মাংস খেতেন। তাঁর সবচেয়ে পছন্দের খাবার ছিল সামুদ্রিক মাছ। লিখতে বসে ভাবতে অবাক লাগে, সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবার—সপ্তায় এই তিন দিন তিনি জল পান করতেন না।

মোঘল বাদশারা প্রায় সকলেই কমবেশি খেতে ভালোবাসতেন ফিরনি, গোলাপজাম, আওয়াধি জিলিপি, শাহি টুকরা, ফালুদা, দক্ষিণ এশিয়ার হালুয়া, বরফি, শের খুরমা (আম দিয়ে তৈরি)।

এবার বাবরপুত্র নাসিরউদ্দিন মহম্মদ হুমায়ুনের কথা (১৫০৮-১৫৫৬)। বাদশা হিসেবে অত্যন্ত দয়ালু, সাহসী ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু শাসন করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা যথেষ্ট কমই ছিল। কঠোর পরিশ্রমে ছিল তাঁর অনীহা। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর পতনের কারণ। বদান্যতার কারণে রাজনৈতিক জীবনে ও সাম্রাজ্য পরিচালনায় তেমন সফলতা লাভ করতে পারেননি তিনি।

বাবরপুত্রের ইরানিয়ান খাবারই বেশি পছন্দ। সুগন্ধী মশলাদার খাবার এবং মিষ্টি, উৎকৃষ্ট ঘি দিয়ে বাদাম ও পেস্তার বরফি, একটু বেশি মশলা দিয়ে তৈরি কাবাব আর নানান ধরনের রুটি তিনি বিশেষভাবে পছন্দ করতেন। এ থেকে স্যালাডও বাদ যেত না। অনেক সুখ্যাত মনীষীদের মতো তিনিও কিন্তু উৎকৃষ্ট চাল-ডালের খিচুড়িকে অপছন্দের তালিকায় রাখেননি। ফল খেতেন সুগন্ধী মিশিয়ে। জল ঠান্ডা করার জন্য বরফ আনতেন পাহাড় থেকে। ফল সুস্বাদু করতে ফলে বরফ মেশাতেন।

বাবরপুত্র হুমায়ুনের প্রিয় খাবারের মধ্যে ছিল আম। ভারত থেকে কাবুল যাওয়ার সময় তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন অত্যন্ত সুস্বাদু আম।

আইন-ই-আকবরী'র কথায় এবার আকবর বাদশার (১৫৪২-১৬০৫) কথায়—'আকবরের গঠন অতি সুন্দর ছিল। আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল বক্ষ এবং বৃহৎ নেত্র। তাঁহার শরীরে বিলক্ষণ বল ছিল। নাসিকার বামভাগে মটরের ন্যায় একটি আঁচিল, তাহাতে তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখাইত। মুখশ্রী দেখিয়া যাঁহারা ভাগ্য অবধারণ করেন, তাঁহারা বলিতেন, ওইরূপ আঁচিল প্রচুর বৈভবের এবং বর্ধিত সৌভাগ্যের অগ্রবর্তী লক্ষণ। তাঁহার প্রকৃতি কোমল এবং উগ্র, স্বর গম্ভীর, বাকপটুতা অসাধারণ, তিনি অতিশয় ক্লান্তিসহিষ্ণু, অশ্বারোহণে কৌতুকী, ভ্রমণে আমোদী এবং শিকারে স্থিরলক্ষ্য। যেরূপ ব্যায়ামে শরীর সবল হয়, তাহাতেও তিনি অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

...কুসংস্কার বর্জিত ঔদার্য তাঁহার নিত্যভূষণ ছিল। মুসলমানের ঔরসে জন্ম, মুসলমান পদ্ধতিতে লালিত, পালিত, শিক্ষিত, কিন্তু বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, হিন্দু, পার্সি এবং খ্রিস্টানের সহিত সমভাবে, সমসংস্কারে তিনি ধর্মালাপ করিতেন।'.....

এবার বাদশা আকবরের খানাপিনার কথা। তাঁর আবদারখানা বা পানশালার কথা বলি।

বাদশাহের পানীয় জল ঠান্ডা করা হত সোরা দিয়ে। বালি ও মাটির তৈরি কুঁজোতে জল ভরে তার মুখে ভিজে ন্যাকড়া কিংবা কাপড় বেঁধে রাখা হত একটা বড়ো গামলায়। সেই গামলায়ও জল থাকত। প্রচুর পরিমাণে সোরা মিশানো হত সেই জলে। কুঁজোর গলায় রেশমের দড়ি দেওয়া থাকত তিনপাক, যেমনভাবে মন্থনদণ্ড ঘোরানো হয়, সেইভাবে ঘোরানো হত কুঁজোকে। খানিকক্ষণ ঘোরালেই খুব ঠান্ডা হত কুঁজোর জল। বাদশাহের পাকশালায় ব্যবহৃত হত গঙ্গা এবং যমুনার জল। তিনি পাঞ্জাবে গেলে জল নিয়ে যাওয়া হত হরিদ্বার থেকে। যখন তিনি আগ্রায় থাকতেন তখন গঙ্গাজল আনা হত প্রয়াগের সঙ্গম থেকে।

আকবরের পাকশালা

সারা দিনরাতের মধ্যে একবার আহার করতেন বাদশা। পাকশালার

প্রধান কর্মচারীর নাম মীর বকাইওয়েল। এই কর্মচারী শুধুমাত্র ব্যঞ্জন চাখতেন। ইনি চেখে দিলে তবেই বাদশা খেতেন। বাদশার আহারের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকত মাংস, ঘি, তেল, শাকসবজি, নানা দেশের ফল, গরম মশলা এবং নানান ধরনের মিষ্টান্ন। বছরের শেষে পাকশালা বিতরিত হত। বহরাঞ্চ নগর থেকে আনা হত সুখদোষ চাল, বাজৌরি থেকে খঞ্জন নামক চাল, হিসার থেকে ঘি এবং তেল, কাশ্মীর থেকে আনা হত নানা প্রকারের জলচর ও স্থলচর পাখি। পাচকরা ভেড়া, ছাগল এবং মুরগি এক স্বতন্ত্র উপায়ে মোটা ও তাজা করে রাখত। শাকসবজির জন্য স্বতন্ত্র বাগিচা ছিল বাদশার। বাদশা আহার করতেন সোনা, রুপো, মার্বেল এবং অত্যুৎকৃষ্ট চিনের বাসনে।

যখন বাদশার আহার্য সামগ্রী পাচকরা নিয়ে যেত, তখন তাদের নাক ও মুখ বাঁধা থাকত রেশমের রুমালে। সোনার পাত্রগুলিও বাঁধা থাকত রেশমের রুমালে। সোনার পাত্রগুলির মুখে মীর বকাইওয়েল লাল রেশম দিয়ে সিল মেরে দিতেন। যখন বাদশার আহার্য সামগ্রী তাঁর কাছে পাঠানো হত, তখন আগে ও পিছনে, উভয় পাশে চোপদার, দারোগা সসৈন্যে যেতেন। আহার্য সামগ্রী বাদশার সামনে রেখে তাঁর সিল ভেঙে, রুমাল কেটে খাদ্যদ্রব্য বের করা হত। তারপর বাবুর্চি সাহেব বাদশাকে দেখিয়ে সমস্ত সামগ্রী চাখতেন। বাদশার আহার শেষ হলে তিনি ধন্যবাদ জানাতেন। পরে তাঁর আহার শেষ হলে ভুক্তাবশিষ্ট সামগ্রীসহ সেই সব সোনা ও রুপোর পাত্র পর্যায়ক্রমে আবার ফিরে যেত বাবুর্চিখানায়।

'আমার পিতৃদেব (আকবর বাদশা) দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কয়েকটি নিয়ম কঠোর ভাবে প্রতিপালন করতেন। তার মধ্যে একটি ছিল পশুর মাংস তিনি সর্বদা খেতেন না। বছরে তিনমাস তিনি মাংস খেতেন। বাকি নয় মাস তিনি সুফি খাদ্য গ্রহণ করে তৃপ্তিলাভ করতেন। ওই সময় কেউ পশুহত্যা করলে তিনি কোনোরকমেই খুশি হতেন না। অনেকগুলি মাস এবং অনেক দিনই তাঁর পরিবার- পরিজন ও অধীনস্থ ব্যক্তিদের পক্ষে পশুর মাংস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল।' কোন কোন মাস ও দিনে তিনি মাংস খেতেন না তার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে 'আকবর নামা'তে। একথা জানিয়েছেন সম্রাট জাহাঙ্গীর।

বাদশার আহার্য সামগ্রী

বাদশার বাবুর্চিখানায় পাককার্য হত তিন প্রকারের। প্রথম—নিরামিষ, যাকে ফার্সিতে বলে 'সুফিয়ানা'। দ্বিতীয়—পোলাও পলান্ন প্রভৃতি। তৃতীয়—মাংস ও শাকসবজি প্রভৃতি।

প্রথম প্রকারের নিরামিষ খাদ্য

জর্দ-বিরিঞ্জ—দশ সের চাল, পাঁচ সের মিছরি, সাড়ে তিন সের ঘি, আধ সের কিশমিশ, এক সের বাদাম, এক সের পেস্তা, একপোয়া লবণ, আধপোয়া আদা, দেড় দাম জাফরান, আড়াই নিস্কল দারুচিনি, এগুলি একত্র করে যে আহার্য সামগ্রী প্রস্তুত হত, তারই নাম জর্দ-বিরিঞ্জ। অনেকে এর সঙ্গে মাংসের ক্বাথও মিশিয়ে থাকেন।

খুস্কে—দশ সের চালের সঙ্গে আধ সের লবণ মিশিয়ে কিছুক্ষণ রাখতে হয়। যখন চাল লবণাক্ত হয়ে যায়, তখন উপরিউক্ত অন্যান্য সামগ্রী মিশিয়ে রান্না করতে হত। দত্তজেরা ও খঞ্জনধানের চালের এই সমস্ত সামগ্রী উত্তমরূপে রান্না হয়ে থাকে।

খিচড়ি—পাঁচ সের চাল, পাঁচ সের ডাল (বুট, মুগ, মসুর ও মটরও চলে), পাঁচ সের ঘি, সাড়ে পাঁচ ছ-টাক লবণ, এইগুলি একসঙ্গে রান্না করলে যা হয় তারই নাম খিচড়ি।

সেরবিরিঞ্জি—দশ সের গম ভাঙিয়ে সাত সের কি ছয় সের ভালো ময়দা হবে। যে পরিমাণ ময়দা হবে, তার অর্ধেক পরিমাণ ঘি, দশ নিস্কল গোলমরিচের গুঁড়ো, চার নিস্কল দারুচিনি, সাড়ে তিন নিস্কল ছোটো এলাচের গুঁড়ো, সাড়ে পাঁচ ছটাক লবণ, এর সঙ্গে কিছু দুধ ও চিনি মিশিয়ে দিতে হয়।

চিক্হী—দশ সের ময়দা মেখে গুলি পাকিয়ে বারংবার জলে ধুতে হবে। যখন ধুয়ে ধুয়ে আঠার মতো দুই সের সামগ্রীতে পরিণত হবে, তখন তাতে এক সের ঘি, এক সের পেঁয়াজ, আধ দাম জাফরান, দারুচিনি ও ছোট এলাচ আর এক দাম ওজনের গোলমরিচ, কাবাবচিনি ও শোঁচ।

বদিঞ্জন—দশ সের বদিঞ্জন, দেড় সের ঘি, দশ ছটাক পেঁয়াজ, আধপোয়া আদা, একপোয়া লেবুর রস, গোলমরিচ ও কাবাবচিনি পাঁচ দাম, ছোট এলাচ, হিং প্রভৃতি আধ দাম।

পাহেত—খোসা ছাড়ানো দশ সের মুগ ডাল, মাষকলায়, আদেস্ তার সঙ্গে আধ সের ঘি, আধ দাম লবণ ও আদা, এক নিস্কল হিং।

হালুয়া—দশ সের সুজি, দশ সের মিছরি, দশ সের ঘি, দশ সের দুধ, এর সঙ্গে কিশমিশ, পেস্তা, বাদাম ও বেদানার রস মিশিয়ে পাক করতে হয়।

দ্বিতীয় প্রকার আহার পোলাও পলান্ন প্রভৃতি

কাবুলি—সাত সের মাংস, তার অর্ধেক পরিষ্কার মাংসের ক্বাথ (জগ-সূপ যে প্রকারে তৈরি করতে হয়, এতে জলের সংস্পর্শ নেই), সাড়ে তিন সের ঘি, এক সের ছাড়ানো নাখদ, দু-সের পেঁয়াজ, আধ সের লবণ, একপোয়া কাঁচা আদা, গোলমরিচ, দারুচিনি ও ছোট এলাচ এক দাম। এর সঙ্গে কিশমিশ ও বাদাম এবং অল্প পরিমাণে পেস্তা। সিদ্ধ করার সময় যদি জলের অভাব হয়, তবে জল না দিয়ে বেদানার রস দিতে হবে।

দে বজ্‌স বেরিয়ান—দশ সের চাল, সাড়ে পাঁচ সের ঘি, দশ

সের মাংস, পাঁচ সের আক্‌নির জল (মাংসের ক্বাথ) এবং আধ সের লবণ। অন্য কোনো মশলা এর সঙ্গে মেশাতে হবে না।

কিমা পোলাও—চাল ও মাংস দশ সের করে (মাংসে হাড় থাকবে না), চার সের ঘি, আড়াই সের ছাড়ানো নাখদ, দু-সের পেঁয়াজ, একপোয়া কাঁচা আদা, গোলমরিচ, ছোটো এলাচ, দারুচিনি, কাবাবচিনি, জাফরান, বড়ো এলাচ এক দাম ওজনের। যদি জলের অভাব হলে দিতে হবে আঙুরের রস।

সন্ডলা—দশ সের মাংস, সাড়ে তিন সের চাল, দু-সের পেঁয়াজ, আধ সের লবণ, একপোয়া আদা, ছোট এলাচ, বড়ো এলাচ, গোলমরিচ, কাবাবচিনি, দারুচিনি, জিরে, রাঁধুনি এক দাম ওজনের, জাফরান আড়াই দাম, আধ সের আঙুরের রস।

বাঘ্‌রা—দশ সের মাংস, তিন সের ফুল ময়দা, দেড় সের ঘি, এক সের নাখদ, এক সের মিছরি, দেড় সের ভিনিগার, একপোয়া পেঁয়াজ, একপোয়া বিট্‌পালং, একপোয়া শালগম, আদা একপোয়া, জাফরান, ছোট এলাচ, বড়ো এলাচ, কাবাবচিনি, দারুচিনি, কচি মটর এক সের।

কিমা সুরবা—দশ সের মাংস, এক সের চাল, এক সের ঘি, আধ সের নাখদ এবং অন্যান্য মশলা যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলি মিশালে কিমা সুরবা তৈরি হয়।

হেরেসা—দশ সের মাংস, পাঁচ সের আটা, তিন সের ঘি, আধ সের লবণ, দুই দাম কাবাবচিনি, এই কয়েকটি মশলা ছাড়া অন্য কিছু এতে মেশাতে হবে না।

কেশেক্‌—দশ সের মাংস, তিন সের আটা, তিন সের ঘি, একপোয়া নাখদ, দেড় সের লবণ, আধ সের পেঁয়াজ এবং পূর্বোক্ত মশলা, এগুলি সব মেশাতে হবে।

হালিম—কেশেকের যে সব সামগ্রী দরকার হয়, এতে সেই সবই থাকবে, এছাড়া মেশাতে হবে পালংশাক, মটরশুঁটি এবং অন্যান্য উপায়ে শাকসবজি।

নুতব্‌—একে হিন্দুরা সেম্বুসে বলে। দশ সের মাংস, চার সের ময়দা, দু-সের ঘি, এক সের পেঁয়াজ, একপোয়া আদা, আধ সের লবণ এবং পূর্বোক্ত অন্যান্য মশলা। কাবুলি ছাড়া উপরোক্ত সমস্ত আহার্য সামগ্রীই হিন্দুস্থানের।

বাদশার তৃতীয় প্রকারে আহার্য সামগ্রী

বেরিয়ান দুরস্ত গোস্কুদ—দু-সের লবণ, এক সের ঘি, এক সের জাফরান, এক সের বড়ো এলাচ, এক সের গোলমরিচ, এক সের দারুচিনি, এর সঙ্গে কিছু মটরশুঁটি মিশিয়ে নিলেই হবে।

ইয়েটনি—দশ সের মাংসের ক্বাথ, এক সের পেঁয়াজ, আধ সের লবণ এবং পূর্বোক্ত মশলাগুলি মিলিয়ে নিতে হবে।

উল্‌মে—একটা ছাগল বা ভেড়ার বাচ্চা এমনভাবে গরমজলে সিদ্ধ করতে হবে যে, যাতে তার সমস্ত লোম উঠে যায়। পরে তার ক্বাথ বের করতে হবে। সেই ক্বাথের সঙ্গে মেশাতে হবে নানান মশলা। এটা হবে এক ধরনের পানীয়।

কাবাব—এটা তৈরি করার কৌশল বলতে হবে না। কারণ, এটা প্রচলিত আহার্যের মধ্যেই আছে।

মেসেম্মেন—একটা বড়ো মুরগির হাড় কণ্ঠদেশ থেকে এমনভাবে বের করে নেওয়া হত যে, তার দেহের মাংস যেখানকার যা, তা থাকত সেখানেই, পরে তার পেটের মধ্যে সামান্য উলমের সঙ্গে পাঁচটা ডিম ভেঙে দিয়ে এবং আরও কিছু জাফরান দিয়ে সেলাই করে দিতে হবে পেটটা। তারপর উপরে কিছু লবণ আর অল্পমাত্রায় পেঁয়াজ ও আদার রস মাখাতে হবে। এবার খাদ্য প্রস্তুত হয়ে যাবে ওটা সুসিদ্ধ হলে।

দুনিয়াজা—দশ সের মাংস (বেশি চর্বি থাকবে না), এর সঙ্গে দশ সের পেঁয়াজের রস, একপোয়া লবণ, পাঁচ দাম গোলমরিচের গুঁড়ো।

মেতেঞ্জেনা গোষ্পন—দশ সের মাংস, অথবা মাছ, দু-সের ঘি, আধ সের নাখদ দিয়ে তৈরি করতে হয় বাদশার এই আহার্য।

দমপোক্ত—মুরগি বা ভেড়া এমনভাবে মারতে হবে যে তার একবিন্দু রক্তও যেন মাটিতে না পড়ে। এমন দশ সের মাংসের সঙ্গে পাঁচ সের ঘি মিশিয়ে এক সের পেঁয়াজের রস দিয়ে এমনভাবে ক্বাথ বের করতে হবে যেন, ওতে জলের এতটুকুও সংস্পর্শ থাকবে না।

মলঘোবা—দশ সের মাংসের সঙ্গে দশ সের দই, এক সের ঘি, একপোয়া আদার রস, ছোটো এলাচ, গোলমরিচ প্রভৃতি দু-দাম করে আর বাদাম। এইগুলো মিশিয়ে তৈরি করতে হয় মলঘোবা।

আকবরের রাজকীয় রান্নাঘরে রান্নার কর্মী ছিল ৪০০ জন। এদের মধ্যে ছিল প্রধান রাঁধুনি, রান্নার স্বাদ পরীক্ষক, রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বকারী প্রভৃতি বিভিন্ন পদমর্যাদার লোক। জল ও পায়েস ঠান্ডা রাখার জন্য বরফ আনা হত হিমালয় থেকে।

বাদশার রুটি তৈরির প্রস্তুত প্রণালী

একখানা রুটি তৈরি করা হয় বাদশাহের জন্য। দশ সের ময়দা, পাঁচ সের দুধ, দেড় সের ঘি, একপোয়া লবণ। এর সঙ্গে মেশানো হয় সামান্য ছানার জল বা আঙুর কি বেদানার রস। আর মেশানো থাকবে বাদাম-পেস্তা আর কিশমিশ। এটাই রুটির আকারে তৈরি করে সিদ্ধ করতে হবে তন্দুরে। এছাড়া আমাদের চাপাটি বা রুটি, লিট্টি এবং লুচিও ব্যবহার করা হত।

বাদশা নিরামিষভোজী। তিনি বলেন, "ভগবান মানুষের জন্য নানা প্রকার আহার্য সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন, সে সব থাকতেও মানুষ যে জীবজন্তুকে নিজের পেটে কবর দেয়, এটা বড়োই অন্যায়। কী বলব, আমি রাজা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। নানা কারণে নানা অবস্থায় পড়ে আমাকে মাংস খেতে হয়েছে। আমি ধীরে ধীরে মাংস ত্যাগ করছি।"

এই উদ্দেশ্যে বাদশা প্রথম মাসে একেবারে মাংস ভোজন করতেন না, পরে রবিবারে মাংস ভোজন করতেন না, শেষে অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতেও মাংস ত্যাগ করলেন। গ্রহণাদিতেও মাংস স্পর্শ করতেন না। নিজের জন্মমাসে নিরামিষাশী হয়ে থাকতেন। বাদশা আকবরকে তাঁর বেগমেরা কখনো কখনো রান্না করে খাওয়াতেন। যোধাবাঈ-এর হাতে পঞ্চরত্ন ডাল খেতে ভালোবাসতেন।

রান্নাঘরে গোলাপজল ছড়িয়ে রাখতে ভালোবাসতেন। তাঁর প্রিয় খাবারের মধ্যে ছিল টকদই আর খিচুড়ি। গোমাংস খেতেন না।

ভেড়ার রোস্ট ও স্টু খেতে পছন্দ করতেন। ঘি মেথি দারুচিনি লবঙ্গ আদা দিয়ে তৈরি পালং শাক ছিল প্রিয় খাবারের অন্যতম। আকবর বাদশা পার্শিয়ান খাবার বেশি পছন্দ করতেন। মুর্গ মসল্লাম, নবরত্ন কোরমা খেতেন কাজু ক্রিম ও সস দিয়ে।

বাদশার পছন্দের ফল

বাদশা ছিলেন বড়োই ফলপ্রিয়। তিনি পারস্য, তাতার, কাবুল, কান্দাহার থেকে ভালো ভালো ফলবাগানের মালিদের আনিয়ে ভারতে বাস করিয়েছিলেন। তাঁরা নানা জায়গায় বিদেশিয় ফলের বাগান করে ফলের চাষ করতেন। কাবুল থেকেও ফল আমদানি করা হত। নাসপাতি, বাবাসেতী, আশিসেরী এলাচ, দুদ চিরাগ ফাধন-চৈত্র মাসে এসে থাকে।

হিন্দুস্থানের নানা জায়গায় ভালো ভালো আঙুর হয়। কাবুল থেকে চেরি ফলও আসে। বাদশা তার নাম দিয়েছিলেন 'শা-আলু'। এ ছাড়াও কাবুল থেকে আসে বেদানা, পীচ, অ্যাপ্রিকট্। বাদশা যখন মদ্যপান করেন বা অহিফেন সেবন করেন, তখন তিনি ফল খেয়ে থাকেন। এই সব ফল সংগ্রহ করার জন্য মনসবদার, আহেদী প্রভৃতি লোক নিযুক্ত আছে।

ভারতীয় ফলের মধ্যে তাঁর পছন্দের ফলগুলি ছিল বেদানা, কাশ্মীরি আঙুর, খেজুর, কিশমিশ, আনারস, আবযোশ, খোবানি, মনক্কা, কুল, বাদাম, পেস্তা, আম, নারাঙ্গী, আখ, কাঁঠাল, কলা, ডালিম, ডাব, পিণ্ডীখেজুর, কেশুর, তেঁতুল, জাম, ফল্‌সা।

সেকালে মোঘল বাদশাদের খানাদানা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমের কথা না বলা হয়। আকবরের অসম্ভব প্রিয় ফল ছিল আম। দ্বারভাঙার কাছে একলাখ আমগাছ পুঁতেছিলেন যাতে সারাবছর বাদশার আমের যোগান থাকে।

জাহাঙ্গীর বাদশার আহার কথা

বাদশা জাহাঙ্গীরের (১৫৬৯-১৬২৭) স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, তিনি ছিলেন ঢের বেশি মানসিক গুণসম্পন্ন। তাঁর জীবনের প্রধানত বৈশিষ্ট্য ছিল প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ-আকর্ষণ, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও ন্যায্য কাজ করার স্পৃহা। দুর্ভাগ্যবশত শেষোক্ত ইচ্ছা-চেষ্টাটি শেষ পর্যন্ত অতিমাত্রায় এবং দুর্বোধ্য রকমের শাস্তিদানের প্রবৃত্তির মধ্যে যেন বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পিতা, পিতামহ ও বৃদ্ধ পিতামহের মতো তিনিও সুরা ও আফিং-এ আসক্ত হয়েছিলেন এবং এই সব মাদকের অত্যধিক প্রভাবেই তাঁর জীবন সংক্ষিপ্ত হয়। বাদশাহি সাম্রাজ্যকে তিনি কোনো অংশেই বৃদ্ধি করতে পারেননি। তাঁর রাজত্বের শেষ কয়েক বছর ছিল বিশেষ হতাশাব্যঞ্জক। হাঁপানি ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি বেশ কষ্ট পান। ১৬২৭ সালের অক্টোবরে কাশ্মীর সীমান্তে লাহোরের পথে মাত্র উনষাট বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

বাদশা জাহাঙ্গীর ভালো শিকারি ছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, 'একবার আমি একদিনে আঠারোটি হরিণ বধ করেছিলাম।' তিনি তাঁর নিজের শিকার করা পশু বা পাখির মাংস খেতে ভালোবাসতেন। ১৬০৬ সালের ১১/১২ মার্চ এক ভোজপর্ব ও উৎসবে তাঁর কথায়, 'আমি আরো আদেশ দিয়েছিলাম যে সেই সময়ে যদি কেউ নেশাকর কোনো পানীয় এবং উল্লাসবর্ধক কোনো ঔষধ গ্রহণ করতে চান, তাঁকে যেন তা করার অনুমতি দান করা হয়।' বাদশা জাহাঙ্গীরের কথায়, 'বন্যগর্দভের মাংস যদিও বিধিসংগত খাদ্য, আর অধিকাংশ লোকই তা খেতে পছন্দ করেন, তাহলেও আমার কাছে সেই জিনিসটি একেবারেই রুচিকর নয়।'

'শওয়াল মাসের ৪ রবিবার প্রায় দিনের শেষে আমি চিতাবাঘ শিকারে ব্যাপৃত হলাম। আমি স্থির করেছিলাম রবিবার ও বৃহস্পতিবার কোনো প্রাণী হনন করা হবে না। আমিও খাদ্য হিসাবে মাংস গ্রহণ করব না। রবিবারের উপরেই গুরুত্ব দিয়েছিলাম বেশি। কারণ ওই দিনটিতে আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবও মাংস খেতেন না। তিনি রবিবারে প্রাণী হত্যাও নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ রবিবার ছিল তাঁর শুভ দিন। তিনি বলতেন, 'ওই দিনে সমস্ত পশু-পাখি-প্রাণীকে দুঃখ দুর্দৈব ও কসাই-এর হাত থেকে মুক্ত রাখাই শ্রেয়।'

বাদশা জাহাঙ্গীর জানিয়েছেন, 'আমি মাছ খুব বেশি পছন্দ করি। তাই সব রকম উৎকৃষ্ট মাছ আমার সামনে আনা হল। হিন্দুস্থানের সর্বোত্তম মাছ রোহু (রুই)। তারপর স্থান হল বারিণ মাছের (কাতলা)। এই দুই প্রকার মাছের আঁশ আছে, দেখতে প্রায় একইরকম। হঠাৎ দেখে সকলে তার তফাত ও প্রভেদ নির্ণয় করতে পারবে না। দুই দেহের মাংসেতেও পার্থক্য অতি সামান্য। তবে যারা মাছের বিশিষ্ট সমঝদার তাদের মতে রোহু হল এর মধ্যে অধিকতর উপভোগ্য।'

বাদশা আরো জানিয়েছেন, 'যে মাছের আঁশ নেই, তা আমি খাই না। তবে শিয়া ধর্মবিশ্বাসের প্রবক্তাদের মতে আঁশশূন্য মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ বলে যে খাই না, তা নয়। এমনিতেই ওই ধরনের মাছের প্রতি আমার একটা বিতৃষ্ণা আছে।'

'সেই পাখির আর এক নাম 'তজরু'। ওর রং অনেকটা মুরগি জাতীয় আর একপ্রকার শিকারি পাখির মতো।....অনেকবার ওই ধরনের বড়ো ও ছোটো সব রকম পাখির মাংস খেয়েছি।....তবে শিকারি পাখির মাংস ঢের বেশি সুস্বাদু।'

একদিন শিকার ক্ষেত্রের একটি অভিজ্ঞতার কথা জানালেন এইভাবে, 'একদিন শিকার ক্ষেত্রে মুখ্য শিকারি ইমামউইর্দি আমার সামনে একটি তিতির পাখি নিয়ে এল। তার একটি পায়েতে ছিল একটি কাটার মতো, অন্য পায়ে কিছু ছিল না। কোনটি স্ত্রী পাখি তা এই বিশেষ অংশটি দ্বারা বোঝা যায়। ওটি স্ত্রী কি পুরুষ তা জানার জন্য আমাকেই সে প্রশ্ন করল। আমি তখুনি বলে দিলাম— 'স্ত্রী'। তারপর পাখিটি কাটা হলে ওর পেটে একটি ডিম পাওয়া গেল। আশেপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা একটু অবাক হয়ে জানতে চাইলেন যে, কী লক্ষণ দেখে আমি মন্তব্যটি করেছিলাম। তদুত্তরে আমি বললাম যে পুরুষ পাখির চেয়ে স্ত্রী পাখির মাথা ও চঞ্চু লম্বায় ছোটো। অনেক পাখি দেখে ও নানা অনুসন্ধান চালিয়ে আমি এই বুঝবার শক্তি সঞ্চয় করেছি।'

জাহাঙ্গীর খিচুড়ি খেতে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। যমুনার জল ছাড়া অন্য কোনো জল তিনি খেতেন না। তাঁর সমস্ত রান্নাই হত যমুনার জল দিয়ে। বাদশার সবচেয়ে প্রিয় ছিল মদ ও আফিং। সারা

দিনরাতের মধ্যে তিনি অধিকাংশ সময়েই ওই নেশায় চুর হয়ে থাকতেন।

বাদশা জানিয়েছেন, 'আমি আর কখনো এই জাতীয় ডালিম ও ফুটি দেখিনি। এমন মনে হয়েছিল যে আমি বোধ হয় আর কোনোদিন ফুটি বা ডালিম খাইনি। অথচ প্রতি বছর আমার জন্য বাদখশান থেকে ডালিম আর কাবুল থেকে বেদানা আসে। কিন্তু ইয়াজদ্ থেকে আনীত ডালিম ও কারিজ ফুটির সঙ্গে তার তুলনা চলে না। আমার পূজনীয় পিতৃদেব ফল খুব ভালোবাসতেন। সেইজন্য আমার খুব মনে হয়েছিল যে তাঁর মহিমময় রাজত্বকালে এইভাবে পারস্য থেকে হিন্দুস্থানে ফল আনা হত।'

বাদশা জাহাঙ্গীরের পত্নী নুরজাহান ফলের খোসা আর চালের গুঁড়ো দিয়ে প্লেট সাজিয়ে তারপর নানান খাবার পরিবেশন করতেন বাদশাকে। নুরজাহান বাদশার টক দই বানাতেন রামধনু রঙের।

একবার বাদশা জাহাঙ্গীর ভ্রমণে বেরিয়ে খেয়েছিলেন মুসুরির ডাল দিয়ে তৈরি খিচুড়ি।

শাহজাহান বাদশার খানাদানার কথা

এখন বাদশা শাহজাহানের কথা (১৫৯২-১৬৬৬)। 'বাদশার জ্যেষ্ঠা কন্যা বেগম সাহেবা ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী ও গুণবতী। তাঁকে সম্রাট সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। হিন্দুস্থানের রাজবংশের কাহিনি যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে একথা অজানা নয়। রাজ কুমারীদের সহজে বিবাহ দেওয়া হত না, পাছে জামাইরাও রাজ্যলোভী হয়ে ওঠেন। সম্রাট শাজাহান সেইজন্য তাঁর কন্যার বিবাহ দেননি। মোঘল আমলে রাজকুমারীদের বিবাহ দেওয়া হিন্দুস্থানে ছিল একটা কঠিন সমস্যা।

প্রথমেই বলি সম্রাট শাহজাহানের অত্যন্ত প্রিয় খাবার ছিল আম। আমের প্রতি এতটাই আসক্তি ছিল যে, অন্য কেউ আম খেলে তাকে শাস্তি দিতেন। ঔরঙ্গজেবও ছিলেন একই পথের পথিক।

বাদশা জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান তাঁদের খানসামাদের পুরস্কৃত করেছিলেন আমপান্না, আম-কা-লাউস, আম-কা-মিঠা পোলাও ও আমের রকমারি মিষ্টি তৈরির জন্য। তাঁদের আম আসত শাহজাহানাবাদ থেকে। এই আম সম্রাট ঔরঙ্গজেব পাঠাতেন পার্শিয়ার শাহ আব্বাসকে।

শাহজাহান যমুনার জল খেতেন ঘন ঘন গন্ধওয়ালা মশলা দিয়ে। বাদশা তাঁর বাপ-ঠাকুরদার মতো খাদ্যরসিক ছিলেন। তাঁর খাবারে বেশির ভাগই থাকত ধনে জিরে হলুদ আর লাল লংকার গুঁড়ো।

বাদশার খাবারের একটি ছিল নিহারী (সারা রাত ধরে মাংসের স্টু হত)। সাবদেগ—এটা খেলে শরীর গরম থাকত। শাহজাহান পত্নী মমতাজ একদিন সেনাছাউনি ঘুরতে গিয়ে দেখেন, মোঘল সেনারা প্রায় সকলেই বেশ দুর্বল ও সৌন্দর্যহীন। তখন তিনি রাঁধুনিকে একটি বিশেষ খাবার তৈরি করতে বলেন, যাতে চাল ও মাংস থাকত যা উপযুক্ত পুষ্টি দেবে। যথাসময়ে তৈরি হল সেই খাবার। সানন্দে খেলেন মোঘল সেনারা। সেই খাবারই পরবর্তী সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে বিরিয়ানি নামে।

বাদশা ঔরঙ্গজেবের আহার কথা

ঔরঙ্গজেব ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির (১৬১৮-১৭০৭)। বাইরের চরিত্রে চাকচিক্য ছিল না, কিন্তু তাঁর বিচারবুদ্ধি ছিল অসাধারণ। বন্ধুবান্ধব আমলা-অমাত্য নির্বাচনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত হুঁশিয়ার এবং এমন কাউকে কোনোদিন আমল দিতেন না, যার দ্বারা তাঁর নিজের কার্যসিদ্ধি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, সেইভাবেই তিনি পদমর্যাদা পুরস্কারাদি বিতরণ করতেন। কতবার যে তিনি রাজদরবারে এবং ভাইদের কাছে ধনদৌলত, রাজৈশ্বর্যাদির প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত বীতরাগ ও বৈরাগ্যের ভান করেছেন এবং গোপনে সিংহাসন অধিকারের ষড়যন্ত্র করেছেন, তার ঠিক নেই। ছলাকলা ও কূটবুদ্ধিতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিলেন না।....

সম্রাট ঔরঙ্গজেব পঞ্চরত্ন ডাল খেতে অত্যন্ত ভালো বাসতেন। তাঁর বর্ণিত বিরিয়ানি রান্নার পদ্ধতি বর্ণিত আছে 'Rukat-e-Alamgiri' গ্রন্থে। তাঁর বিরিয়ানি রান্নায় বেশ বৈচিত্র ছিল। বিরিয়ানি তৈরি হত চাল, তুলসীপাতা, বেসন, আমন্ড বাদাম, দই আর শুকনো খুবানি দিয়ে।
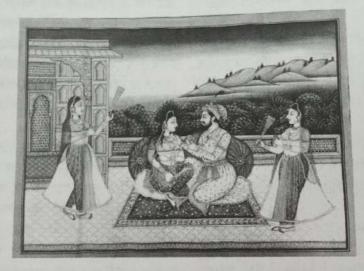
বিরিয়ানির মতো তিনি ভালোবাসতেন খিচুড়িও। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন। মাংস খেতেন না। এমনটা ছিলেন হিটলার।

ঔরঙ্গজেবকে নানা কারণে নিন্দাবাদ করলেও সমস্ত দোষ-ত্রুটি নিয়েও তাঁর মতন একজন প্রতিভাবান, শক্তিশালী, বিচক্ষণ ও মহান সম্রাট হিন্দুস্থানে খুব কমই জন্মেছিলেন।

'কৃতজ্ঞতায় আমি যেন কারো কাছে ঋণী না থাকি।' চিরস্মরণীয় এই উক্তিটি আব্রাহাম লিঙ্কনের (১৮০৯-১৮৬৫)।

বছরের পর বছর ধরে অর্ধাহারে অনাহারে যে জীবন লিঙ্কন কাটিয়েছিলেন, যে ক্রীতদাসদের তিনি দাসপ্রথা থেকে মুক্ত করেছিলেন তারাও সেরকম দারিদ্র চোখে দেখেনি কখনো। লিঙ্কন পরিবার আলু দিয়ে দুটো ভাত খাবে তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত না। লিঙ্কনের মা বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছিলেন।

একসময় আব্রাহাম লিঙ্কন হলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। রাজকীয় খাবার।

—কী হে বামুনপণ্ডিত, কোথায় চললে?

উত্তর এল,

—আমি বামুনপণ্ডিত নই। আমি ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত।

এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছিলেন ঠাকুরদাসের সুপুত্র পরম শ্রদ্ধেয় ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২০-১৮৯১)। তিনি যেমন খেতে ভালোবাসতেন তেমন ভালোবাসতেন খাওয়াতে। তবে নিজের খাওয়ার মধ্যে তাঁর প্রিয় ও সেরা খাবার ছিল লুচি। দারুণ লোভ ছিল লুচিতে।

তখন ঈশ্বরের বয়েস অনেক কম। বাঙাল ভাষায় 'পোলাপান' বলা চলে। তাঁর এক গুরু তাঁকে ডেকে বললেন, 'ঈশ্বর, তুমি একটা শ্লোক লেখ তো দেখি সরস্বতীর বন্দনা করে।'

মহামুশকিলে পড়লেন ঈশ্বর। দেবী সরস্বতীর বন্দনা করে লিখতে হবে শ্লোক, তাও আবার দেবভাষায়। কাজটা যে খুব সহজ নয় তা এতটুকু বুঝতে অসুবিধা হল না, 'পোলাপানের'। গুরুর অনেক পীড়াপীড়ি ও অনুরোধে, শেষমেশ বাধ্য হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র দেবী সরস্বতীর উদ্দেশে একটি শ্লোক লিখে ফেললেন,

'লুচি কচুরি মতিচুর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী মা জয়তা ন্নিরন্তরম্।।'

শ্লোকার্থ হল, 'লুচি কচুরি মতিচুর, জিলেপি, সন্দেশ, গজা এই সব চমৎকার খাবার যার পুজোয় আমরা খেতে পাই, নিরন্তর জয় হোক সেই দেবী সরস্বতীর।'

এই শ্লোক শুনে আনন্দে ডগমগ হলেন গুরু। দেবীর অবিরাম আশীর্বাদ ঝরে পড়ল ঈশ্বরচন্দ্রের উপরে। পরবর্তীকালে তিনি ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন আমার প্রাণের সাগর বিদ্যাসাগর।

তিনি যারপরনাই ভক্ত ছিলেন লুচির। লুচি দেখলে না খাওয়া পর্যন্ত তাঁর যেন শান্তি নাই। গরমাগরম ফুলকো কিংবা ঠান্ডা বাসি বলে কোনো কথা নেই। লুচি হলেই হল।

১৮৭৮ সালের কোনো একটা দিনের কথা। ঈশ্বরচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহ ও আশীর্বাদধন্য ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সেবার তিনি এম এ পাশ করলেন সগৌরবে। এবার চললেন বাদশাহি শহর লখ্নৌতে। সেখানে পড়াবেন সংস্কৃত। ভাবলেন, অনেকটা পথ, একটানা চললে ধকল সইবে না এ দেহে। তিনি জানতেন বিদ্যাসাগর মশাই আছেন টার্মাটাড়ে। এক রাত সেখানে কাটিয়ে একটু ঝালিয়ে নেবেন বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত'টা।

যথাসময়ে যাত্রাপথে শাস্ত্রীমশাই টার্মাটাড়ে নেমে সোজা গিয়ে উঠলেন ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে দেখলেন, স্থানীয় কয়েকজন গরিব সাঁওতাল কিছু খাবার চাইছে। শাস্ত্রীমশাই-এর কাছে একটা খাবারের পোঁটলা ছিল। তিনি সেটি তুলে দিলেন ঈশ্বরের হাতে। বললেন, 'ওতে কিছু বাসি লুচি আছে, সেগুলো ওদের দিয়ে দিন।'

ঈশ্বরচন্দ্র পোঁটলা খুললেন। বেশ খানিকক্ষণ লুচিগুলো দেখলেন নেড়েচেড়ে। শাস্ত্রীমশাই এমনটা দেখে বললেন, 'এমনটা করছেন কেন?'

উত্তরে দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বললেন লজ্জার মাথা খেয়ে, 'আসলে আমি বেছে বেছে খানকয়েক লুচি রাখব, নিজে খাব বলে।'

ছোটোবেলা থেকেই তিনি যে হাভাতের মতো খেতেন, এমনটা নয়। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত খাদ্যরসিক। সুন্দর রান্না করতেন বনেদি বাড়ির পাকা গিন্নির মতো নিজের হাতে লংকা, হলুদ ও অন্যান্য মশলা বেটে। যখনই সুযোগ পেতেন তখনই রান্না করে অপরকে খাইয়ে, এবং আনন্দ পেতেন নিজে খেয়ে।

ঈশ্বরচন্দ্র একবার নিজে উদ্যোগী হয়ে গড়েছিলেন একটি 'ভোজন সমিতি'। উদ্দেশ্য ছিল, সকলকে খাওয়া-দাওয়া করিয়ে আনন্দমুখর করার জন্য। তখনকার দিনে এই সমিতির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সুখ্যাত ব্যক্তিদের অন্যতম অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র রায়, দ্বারকানাথ মিত্র প্রমুখ।

ভোজনরসিক ঈশ্বরচন্দ্র। খেতে ভালোবাসতেন তবে খুব খেতেন না। যেন আশুতোষ। অল্পেই খুশি। নিজের মনের মতো খাবার পেলে তিনি জাতধর্ম মানতেন না। নির্বিকার চিত্তে সাগর অন্যের পাত থেকে তুলে বা কেড়ে নিতে এতটুকুও দ্বিধাচিত্ত হতেন না। জাতপাতের গোঁড়ামি তাঁর কোনো সময়েই ছিল না। পেলেন, তুলে নিয়ে খেয়ে ফেলতেন। রানি রাসমণি কৈবর্ত হলেও তাঁর ঘরে খেতেন নির্বিচারে।

একটা ঘটনার কথা বলি। ঘটেছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীদের বাড়িতে। হরপ্রসাদ তখনো বড়ো হননি। বেশ ছোটো। বয়েস বছর পাঁচেক। তাঁর দাদাদের পড়ার বই এবং অন্যান্য অনেকের মুখে শুনেছেন ঈশ্বরের কথা তবে তখনো পর্যন্ত জানতেন না তাঁদের বাড়িতে যাতায়াত আছে ঈশ্বরচন্দ্রের।

হঠাৎ একদিন শাস্ত্রীমশাইদের বাড়িতে হইচই পড়ে গেল। সেটা শুরু হয়েছে মেয়ে মহল থেকে। কেউ বলছেন, 'এটা কখনো হয় নাকি? বামুনের ছেলে কায়েতের পাত থেকে রুইমাছের মুড়োটা তুলে খেয়েছে! এমনটা বাপু জন্মেও কখনো শুনিনি। ঘোর কলি আর কাকে বলে! জাতধর্ম কি সব চুলোয় গেল?' এমন হাজারও নিন্দাসূচক কথায় ভরে উঠল গোটা বাড়িটা।

হরপ্রসাদ ছোটো হলেও কথাগুলো তাঁর কানে এল। একই সঙ্গে বাড়ল কৌতূহল। তিনি তখনই একছুটে চলে গেলেন মায়ের কাছে। জানতে চাইলেন, এত নিন্দা আর চিৎকার-চেঁচামেচির কারণ কী?

মা আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনার কথা জানিয়ে বললেন, 'তুই জানিসনি, ওই যে বিদ্যাসাগর বামুনের ছেলে হয়ে ও কিনা কায়েতের
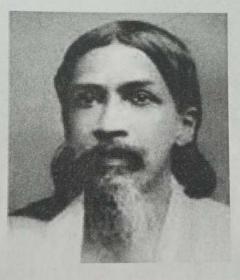
ছেলে অমৃতলাল মিত্তিরের পাত থেকে রুই মাছের মাথাটা কেড়ে খেলে!'

এই ঘটনায় সেদিন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাড়িতে যারপরনাই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

এবার বলি ঋষি অরবিন্দের (১৮৭২-১৯৫০) কথা। তিনি ছিলেন বিপ্লবী এবং যোগী। সংসারজীবনে একসময় জামাই-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বেজায় ভোজনরসিক ছিলেন। খাওয়া-দাওয়া করতে দীর্ঘ সময় নিতেন। শ্বশুরবাড়িতে সকলকে হতবাক করে তিনি চর্ব-চোষ্য খেতেন অনেক সময় নিয়ে। শ্বশুরবাড়িতে নানান ধরনের ব্যঞ্জনাদির সঙ্গে অবশ্যই তাঁর জন্য থাকত ডুবুডুবু তেলে ভাজা পাঁচ থেকে দশ সের ওজনের রুই মাছের মাথা। অরবিন্দ আয়েশ করে চিবিয়ে খেতেন বেশ রসিয়ে।

অরবিন্দের পারিপাট্যের সঙ্গে এই খাওয়ার শক্তি দেখে পরম তৃপ্তিলাভ করতেন তাঁর শ্বশুরমশাই শ্রদ্ধেয় ভূপালচন্দ্র বসু। তিনি সানন্দে সকলকে বলতেন, 'যদি কাহাকেও খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে হয়, তবে সে একমাত্র অরবিন্দ, অসাধারণ তাহার হজম করিবার সামর্থ্য।'

একদিন বাউন্ডুলে ছেলে কিশোর শিবরাম গ্রামের বাড়ি থেকে পালিয়ে এলেন কলকাতায়। ভিখারিদের সঙ্গে থাকা-খাওয়া আর ফুটপাতে বা কোনো মন্দিরে গিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা হল লাইন দিয়ে। হঠাৎ একদিন পরিচয় হল তাঁরই বয়েসি একটি ছেলের সঙ্গে। তার মাধ্যমে যোগাযোগ হল খবরের কাগজ বিক্রি করার ব্যবস্থা। ব্যস, পরদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল কাগজ বিক্রির ব্যবসা। কখনো বউবাজার, কখনো শ্যামবাজার, কখনো হেদুয়া আবার কখনো গোলদিঘি। কিন্তু সেকালে কাগজ বেচা অত সহজ ছিল না। পুরোনো হকাররা নতুন হকারকে তাদের জায়গায় ঢুকতে দেবে কেন? তাই বার বার জায়গা বদল করে চলত তাঁর কাগজ বিক্রি। সারাদিন কাগজ বেচে যা কমিশন পেতেন উত্তরবঙ্গের চাঁচোল রাজপরিবারের উত্তরাধিকারী শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩- ১৯৮০), তাতেই তিনি বেজায় খুশি। ওই পয়সা দিয়েই চলত তাঁর খানাদানা আর সিনেমা দেখা। রোজের রোজগার তাঁর রোজই শেষ।

তিনি খেতে ভালোবাসতেন শুক্তো, শিঙাড়া, চপ, কাটলেট, আর নানান ধরনের সুস্বাদু ভাজাভুজি। অত্যন্ত ভোজনরসিক শিবরামের নানা পদে আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। কলেজস্ট্রিটের দিলখুশা-এ খেতে ভালোবাসতেন তিনি। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় খাবার ছিল রাবড়ি। একমাত্র নেশা ছিল সিনেমা দেখা। পরম বন্ধু ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

অর্থাভাবে অনেক সময় খাবার জুটত না এই ভোজনরসিক মানুষটির। এমন ছিল যে, তিনি জানতেন না পরদিন কী খাবেন। তবু জীবনের দুঃখটাকে কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি হাসিমুখে।

খেতে ভালোবাসতেন, খাওয়াতেও। হাতে সামান্য টাকা এলেও বন্ধুদের সেই টাকা খরচ করে খাওয়াতে তাঁর এতটুকুও কার্পণ্য ছিল না। এমন দিন গেছে যে প্রকাশকের কাছ থেকে পাওয়া কমপ্লিমেন্টারি বইও বেচে দিয়েছেন খাওয়ার জন্য।

জীবনে অর্থ রোজগার সেভাবে করতেই পারেননি বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন এই মানুষটি, তবু হাসিই ছিল তাঁর জীবন, রসিকতায় ছিল প্রখর বুদ্ধির ছাপ।

বাড়িতে অতিথি এলে তাঁকে খেতে দেওয়ার মতো কিছু না থাকলে অনেক সময় দিতেন বিস্কুট, এমনকি এমন উদাহরণও আছে যে, মজা করে নাকি আগত অতিথিকে খেতে দিতেন অ্যান্টাসিড।

জাদুসম্রাট পি. সি. সরকার (১৯১৩-১৯৭১) ওরফে প্রতুলচন্দ্র সরকার। ছা দিয়ে বুড়ো দিয়ে এ নাম শোনেনি এমন মানুষের অভাব আছে এ দেশে, যেমন পুরীর জগন্নাথ। প্রতুলচন্দ্র, যিনি বিজ্ঞানভিত্তিক জাদুশিল্পকে বিশ্বদরবারে শ্রেষ্ঠস্থানে তুলে বাংলা তথা ভারতকে আন্তর্জাতিক ভাবে রূপকথার সিংহাসনে বসিয়ে নিজে গর্বিত হয়েছিলেন, গৌরবান্বিত করেছিলেন আপামর ভারত বাসীকে।

এবার তাঁরই কথা তাঁর স্বনামধন্য পুত্র পি. সি. সরকারের (জুনিয়র) বলা কথা আমার ভাষায়, কখনো তাঁর ভাষার।

জাদুসম্রাট প্রতুলচন্দ্র বলতেন, 'যারা ঘিয়ে ভাজা নিমবেগুন খায়নি, তারা জীবনে কিছু খায়নি।'

নৈবেদ্যের মাখা প্রসাদ তাঁর প্রিয় তো ছিলই, বাঙাল প্রতুলের প্রাণ মন ভরে যেত কালীপুজোর রাতে খিচুড়িভোগ প্রসাদে। তাঁর একান্ত প্রিয় ছিল কালীপুজোর রাতের খিচুড়ি প্রসাদ।

ভোজনরসিক না হলে সে কখনো রসিক হতে পারে না। ঐন্দ্রজালিক বিষয়টা যেমন মনের রসনা তৃপ্তি করে, তেমনই ইন্দ্রিয়ের আহার রসনায় কোনো পার্থক্য নেই।

প্রদীপচন্দ্রের কথায়, 'মায়ের হাতের রান্না ছিল ভারী সুন্দর। মা ছিলেন রন্ধনশিল্পী। তাঁর হাতের রান্নায় ছিল স্বর্গীয় স্বাদ। আমার বাবা মায়ের হাতের রান্না খুব পছন্দ করতেন।'

জাদুসম্রাট পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকতেন, পৌষপার্বণের দিনগুলি বাদ দিয়ে তিনি জাদুপ্রদর্শনের দিন ঠিক করতেন। পৌষপার্বণে
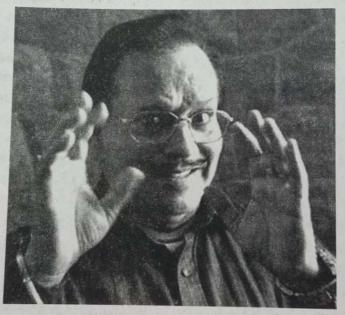
কলকাতায় তিনি থাকবেনই। প্রদীপচন্দ্রের কথায়, মা এমন পিঠেপুলি ও নানান ধরনের পৌষপার্বণের খাবার বানাতেন, বাবা খেয়ে পরম তৃপ্তিলাভ করতেন, সেই সঙ্গে আমরাও।

'পুকুরের চিংড়ি, নারকেলের দুধ আর দই দিয়ে মালাইকারি করতেন মা। এটি বাবার অত্যন্ত পছন্দের খাবার ছিল। খেতেনও মনভরে।' প্রদীপের কথা।

জাদুসম্রাটের পুঁই, পালং থেকে শুরু করে সমস্ত রকম শাকসবজি, সব রকমের মাছে তাঁর রুচি ছিল না। তবে কাঁটা সমেত ছোটো ছোটো মাছ ছিল বেশি পছন্দের। রাজকীয় ইলিশে তাঁর কোনোকালেই অরুচি ছিল না। প্রদীপচন্দ্রের কথা, 'মা এত সুন্দর রান্না করতেন তা বলে বোঝানো যাবে না।'

প্রতুলচন্দ্র চিকেন চাউমিন খেতে ভালোবাসতেন। হংকং-এ একবার প্রদীপচন্দ্রকে খাইয়ে বলেন, 'মশলা ছাড়া কী অপূর্ব স্বাদ এই চাউমিন-এর।'

প্রদীপচন্দ্রের কথায়, 'আমাদের দেশের এত সুন্দর রান্না যে বিশ্বজয় করতে পারে।'

ময়মনসিংহের সরকার-এর দেশে যেমন, কলকাতার বাড়িতেও রসগোল্লা আজও সমাদৃত। কলেজস্ট্রিটে ভীমনাগের কড়াপাকের সন্দেশ ছিল তাঁর অতিপ্রিয়। তিনি দু-বাক্স সন্দেশ কিনতেন। এক বাক্স সহকারী মাধব চৌধুরী আর ড্রাইভারের জন্য। আর এক বাক্স বলতেন পরিবারের জন্য। তিনি ছিলেন সুগার রুগি। আসলে পরিবারের নাম করে কেনা মিষ্টিটা নিজেই সাফ করে দিতেন লুকিয়ে গাড়িতে বসে।

প্রদীপদার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল ফোনে। তখন ছিলেন মুম্বাইতে। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আর আপনার বাবা তো সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেন, বিভিন্ন দেশে যে সব খাবার যেমন, সাপ, টিকটিকি, ব্যাং, কুমির, বাদুড়, গিরগিটি, অক্টোপাস এমন নানান ধরনের বিভিন্ন পশুপাখি ইত্যাদির মাংস কখনো খেয়েছেন?

হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি আর বাবা দুজনেই খেয়েছি। এছাড়া খেয়েছি জ্যান্ত বাঁদরের মাথার কাঁচা ঘিলু।'

জানতে চাইলাম, সাপের মাংস কেমন লাগে খেতে?

নির্বিকার নির্লিপ্তচিত্তে সদা হাস্যময় স্বনামধন্য জাদুশিল্পী শ্রদ্ধেয় শ্রী পি. সি. সরকার (জুনিয়র) ফোনের ওপার থেকে জানালেন, —চিংড়িমাছের মতো।

সে যুগে ভারতের মতো অনুন্নত দেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার, সতীদাহ প্রথার অবলুপ্তি এবং সমাজ সংস্কারক হিসাবে যিনি চিরস্মরণীয়, তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর একান্ত আপন বন্ধুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রানি রাসমণির স্বামী বাবু রাজচন্দ্র দাস (যাঁর নামে বাবুঘাট এবং রাজচন্দ্রপুর স্টেশন) এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ।

রাজা রামমোহন ছিলেন বড়োই ভোজনরসিক। তাঁর খাবার-দাবারের ব্যাপারে বেশি কথায় যাব না। অল্প কথায় বলি, একটা গোটা খাসি কিংবা পাঁঠা কাটা হল। তারপর রান্না করা হল পরিপাটি করে। সমস্ত রান্নাটা এনে ধরিয়ে দেওয়া হল রাজার হাতে। গোটা খাসিটাই তিনি রসিয়ে রসিয়ে খেয়ে ফেললেন সকলের সামনে। এবার কেউ যদি এক হাঁড়ি রসগোল্লা এনে তাঁকে অনুরোধ করেন খেতে, তাতে তাঁর না বলে কোনো কথা ছিল না। অম্লান বদনে খেয়ে নিতেন টপাটপ।

প্রতিদিনের অন্যান্য খাবারের সঙ্গে তালিকায় থাকত ৫০টা আম, ১২টা নারকেল আর ১২ সের দুধ। এর জন্য সেকালে আজকের মতো একটা ডাইজিনও খেতে হত না তাঁকে। ইনিই হলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (বাংলা ১২১৮-১২৬৫) নানান ধরনের খাবারে তেমন কোনো অরুচি ছিল না তবে তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিল শুধু খাসির মাংস।

নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি ও অন্নদামঙ্গল রচয়িতা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের (১৭১২-১৭৬০) অন্যান্য অনেকের মতো খাসি কিংবা পাঁঠার মাংসের প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না। ভেটকি, বাটা, কালবোশ, পাবদা আর ইলিশ পেলেই তাঁর দিলখুশ।

মহানায়ক উত্তমকুমার (১৯২৬-১৯৮০) সম্পর্কে নতুন করে বলার মতো কোনো কথা এ কলমে নেই। তাঁর খাওয়ার কথাগুলো বলি তরুণকুমারের (বুড়োদা) কথা ও কলমে।

'আকালের দিনগুলোয়, বাবা হয়তো আনাজপত্রের জোগান তেমন দিতে পারত না। মা অনুযোগ না করে বসে যেতেন সাধারণ জিনিস দিয়ে অসাধারণ সব রান্নার পদ বানাতে।'

'থোড়ের ছেঁচকি যে অত ভালো স্বাদের হয় মায়ের হাতের রান্না না খেলে জানতেই পারতাম না। মায়ের তৈরি পালং শাকের ঘণ্টর স্বাদ তো এখনো জিভে লেগে আছে। ঘণ্ট তৈরির পর মা বড়ি আর নারকেল কোরা ছড়িয়ে দিতেন। রান্নাটা যেন ওতেই অমৃত হয়ে উঠত।'

'মাঝে মাঝে আক্ষেপ হয়। কেন আজকালকার মেয়েরা মায়েদের মতো রান্না করতে পারে না? আজকাল তো আবার কুকিং রেঞ্জ থেকে ওভেন—রান্নাঘরে কত জিনিসপত্র। অথচ সামান্য ডুমুরের তরকারির জন্য মাকে সেকালে কত মেহনতই না করতে হয়েছে।'

'আগের দিন মা ডুমুর কেটে জলে ভিজিয়ে রাখত। তাতে নাকি ডুমুরের কষ চলে যায়। তারপর আমাদের রাতের খাওয়া- দাওয়ার পাট চুকিয়ে এগারোটা থেকে লেগে পড়ত ডুমুর কাটতে। রাত বারোটাতেও অনেকদিন ঘুম ভেঙে দেখেছি, হাতে কাপড় বেঁধে মা একমনে ডুমুর কেটে চলেছে। ধৈর্যের এক অসামান্য প্রতিমা যেন।'

'তখন আমাদের বাড়িতে ফ্রিজ ছিল না। ছোটো ডেকচিতে কাটা ডুমুরগুলো রেখে তার ওপর মা গামছা চাপা দিয়ে রাখত। পরদিন এক বাটি করে সেই ডুমুরের তরকারি আমাদের হাতে ধরিয়ে দিত, তখন তা মাংসের থেকেও বেশি উপাদেয় লাগত।'

'আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, সামান্য ডুমুর নিয়ে কেন এত আদিখ্যেতা! নেহাতই অভাবের জন্য কি? না, পুরোপুরি তা

নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সন্তানের প্রতি মায়ের চিরকালীন স্নেহ-ভালোবাসা। রান্না সুস্বাদু হলে তবেই আমরা ডুমুরের তরকারি খাব। আর ডুমুর খেলে যে সন্তানদের রক্ত পরিষ্কার হবে।'

'সে সময় এমনও গেছে, দিনের পর দিন আমরা কড়াই ডাল আর আলুপোস্ত খেয়েছি। আজও কোনো বাড়িতে নানান রকমারি পদের মধ্যে যদি ওই সামান্য কড়াই ডাল আর আলুপোস্ত দেয়—চেটেপুটে খেয়ে নিই।'

তরুণকুমারের কথায়, 'কড়াই ডাল আর পোস্তকে দাদা উত্তমকুমারও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দারুণ সম্মান জানাত। আমায় বলত—বুড়ো, এই দুটো রান্নাকে কখনো অবহেলা করিস না। এরা আমাদের অভাবের দিনের সাথী। সুখের দিনে এদের ভুলে যাওয়া অন্যায়। কথাটা সামান্য। কিন্তু ওই কথা ক-টার মধ্যে ধরা পড়ে যায় দাদার বিশাল হৃদয়ের উদারতা।'

'বাবা বাজার থেকে ফিরলেন হতাশ হয়ে। ভালো মাছ পাননি। যেটুকু মাছ বাজারে এসেছে, তারও চড়া দাম। বাজারের ব্যাগ খুলে মা দেখলেন—কিছুটা ভেটকি মাছের কাঁটা এনেছেন বাবা মাছের বদলে।'

'জানি না, আপনাদের সঙ্গে ভেটকি মাছের কাঁটার সম্পর্ক আছে কিনা! সাধারণত ফ্রাই করার জন্য বড়ো ভেটকি মাছগুলোর শরীর থেকে মাংস কেটে নেবার পর যে কাঁটা পড়ে থাকে তা দিয়ে ভালো তরকারি হয়। নিউ মার্কেটেও পাওয়া যায় ভেটকি মাছের কাঁটা। দাম আজকাল অবশ্য ভালোই নেয়।'

'মা সেদিন কিন্তু বাবার বাজার দেখে মনের দুঃখ চেপে রাখতে পারেনি। মৃদু কণ্ঠে অনুযোগ করেছে বাবাকে—আজ রবিবার। এত দেরিতে বাজার গেলে। কুচো মাছও পেলে না। ছেলেগুলো আনন্দ করে খেত।'

'মা জানত না, মাছের রকমফেরে খাবার আনন্দ তৈরি হয় না। আনন্দ জন্ম নেয় মায়ের হাতের স্পর্শে। আন্তরিকতায়। নইলে সেদিনই ভেটকি মাছের কাঁটার তরকারি আমি, দাদা বা মেজদা চেটেপুটে খাবই বা কেন?'

'মানিকদা মানে সত্যজিৎ রায় ছবি তৈরির সময় যেমন খুঁতখুঁতে, খাওয়ার ব্যাপারেও তেমনই রসিক। নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করেন—মাছ-মাংস দুটোই বেশ লাগল। কোথা থেকে আনালে? দাদা অমনি সবিস্তারে জানায়---সিরাজগঞ্জ থেকে কীভাবে টাটকা মাছ নুন দিয়ে আনা হয়েছে। পাঁঠার মাংস কেনা হয়েছে গোপালদার দোকান থেকে।'

'গোপালদা বা গোপাল মুখোপাধ্যায় নামটা বললে হয়তো চিনতে অসুবিধে হতে পারে। আসলে পুরোনো আমলের লোকের কাছে ওর পরিচয় ছিল পাঁঠা-কাটা-গোপাল নামে। বাঙালির পাঁঠার দোকান বলতে সেকালে গোপালদার দোকানকেই বোঝাত। দাদার তাই কড়া হুকুম ছিল—মাংস আনতে হবে গোপালদার দোকান থেকে।'

'সুচিত্রা সেন (১৯৩১-২০১৪) জাতীয় সম্পদ। অসামান্য অভিনেত্রী তিনি। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি 'পদ্মশ্রী' উপাধি পেলেন। তবে কোনো দিনই তাঁর নামের আগে বা পরে, এমনকি তাঁর লেটার হেড-এ সেই উপাধি ভুল করেও ব্যবহার করেননি তিনি। তাঁর সংযত মানসিকতা বিস্মিত করেছিল আপামর জনসাধারণ ও গুণগ্রাহীদের। সাংবাদিকরা তাঁর ইন্টারভিউ নেওয়ার চেষ্টা করলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। পদ্মশ্রী বা সমপর্যায়ের কেউ কোনো মানপত্র পেলে অনেকেই ঘরে বাঁধিয়ে রাখেন গর্বভরে। কিন্তু এই মহানায়িকা শ্রীমতী সুচিত্রা সেন অনন্যসাধারণ। সে সব কোনো কিছুই করেননি তিনি।

শ্রীমতী সেন কখনো বাইরের চা পছন্দ করতেন না। তাঁর জন্য স্টুডিয়োতে চা তৈরি হত আলাদা ভাবে। চা পাতা দুধ চিনি ইত্যাদি রাখা থাকত। তারপর তা ঢালা হত সুদৃশ্য টি-পটে। চিনি থাকত আলাদা পাত্রে। চায়ের কাপ-ডিশের ব্যাপারে তিনি ছিলেন ভীষণ খুঁতখুঁতে। সামান্য দাগ বা ছোপ থাকলে চলবে না। চায়ের কাপ-ডিশ, টি-পট, চিনি, দুধ ইত্যাদি তাঁর কাছে এনে দেওয়া হত সুন্দর একটা ট্রেতে করে। তারপর তিনিই চা বানাতেন নিজে।

সকালে ব্রেকফাস্ট বলতে এক একদিন এক একরকম খেতেন। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেতে ভালোবাসতেন। কোনোদিন দুধ-রুটি, কোনোদিন লুচি বা পরোটা, সঙ্গে মাখামাখা একটু আলুর তরকারি। এসব খেতেন তিনি সকালে পুজো সেরে।

সুচিত্রা সেন কখনো ডায়েটিং করতেন না। তাঁর প্রিয় খাবারের মধ্যে ছিল ভাত, মাছের ঝোল, গন্ধরাজ লেবু, পাঁচমিশেলি তরকারি। মাছের মধ্যে চারাপোনা ছিল তাঁর বিশেষ পছন্দের, পোলট্রির ডিম নয়, তিনি পছন্দ করতেন দেশি মুরগির ডিম এবং এগ চাউমিন।

এছাড়াও তাঁর প্রিয় মাছ ছিল দেশি মাগুর, বড়ো রুইমাছের পেটি, পমফ্রেট, কই, চিংড়ি ও ভেটকি। তাঁর আর একটি পছন্দের খাবার ছিল 'রসুন-ভেটকি'। বোনলেস চিলি-চিকেন হলে তো কথাই নেই যদি সেটা ট্যাংরার চায়না টাউনের হয়।

তাঁর পছন্দের তালিকার বাইরে ছিল যে কোনো মাদকদ্রব্য।

প্রতিবছর বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হত। লোকজন আসতেন। খিচুড়ি আর ইলিশ মাছভাজা দিয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন তিনি। এটি তাঁর প্রিয় খাবারের অন্যতম।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) এক অবিস্মরণীয় নাম। সংক্ষিপ্ত মহাভারত আর হুতোম প্যাঁচার নকশা তাঁর স্মরণীয় অবদান।

তখন উনিশ শতকের মধ্যভাগ। দুর্গাপুজোর প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা চলছে সারা কলকাতা জুড়ে। শোভাবাজারের রাজবাড়ির পুজোর তখন দারুণ নামডাক। সেই পুজোতে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হয়েছেন কালীপ্রসন্ন। বৈঠকখানায় বসে আছেন বিস্তর বড়োলোকদের সঙ্গে। তখন রাজবাড়ির প্রতিভূ ছিলেন হরেন্দ্র কুমার দেব। তিনি এসে কালীপ্রসন্নকে বললেন যে, তাঁরা উপস্থিত সকলকে খাওয়াতে অক্ষম।

একথা শুনে কালীপ্রসন্নর নষ্ট হল মনের প্রসন্নতা। সম্মানে আঘাত হল। পরের বছর তিনি পুজোর আয়োজন করলেন বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটে নিজের বাড়িতে। আলোকসজ্জায় ভরিয়ে দিলেন রাস্তার দু-ধার। বাড়িতে বসালেন তারকার মজলিশ। বিশাল হৃদয় কালীপ্রসন্ন

পাঁচ-সাতশো নয়, নিমন্ত্রণ করেছিলেন হাজার হাজার লোককে। নিজে সুখাদ্য খেতে ভালোবাসতেন। খাওয়াতেও ভালোবাসতেন। নানান ধরনের সুখাদ্য খাওয়ালেন সমাগত অতিথিদের। ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করলেন তাদের। সেকালে ডাকসাইটে বাঙালি কালীপ্রসন্ন অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন তাঁর স্বনাম মহিমা। শেষজীবনে খেয়ে খাইয়ে দান করে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

যে কোনো দেবদেবীর ভোগের রান্না প্রসঙ্গে ভারতবরেণ্য মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামঠাকুরের কথা—

'না খাইয়া ঠাকুরের রান্না করতে নাই, অর্থাৎ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ভোগ রান্না করা উচিত না। রান্না কইরা আস্বাদ নিইয়া যা উৎকৃষ্ট মনে হইবে তাই ঠাকুরকে দিতে হয়। সকল অবস্থায়ই ভোগ প্রস্তুত করা যায়, তাতে ভোগ অপবিত্র হয় না।'

'অস্কার' বিজয়ী বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক ও মহান শিল্পী সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২)। তিনি যেমন খেতেন, তেমন খাওয়াতে ভালোবাসতেন। তবে তাঁর আহার ছিল পরিমিত। সব থেকে প্রিয় ছিল মুড়ি ঘি আর চিনি দিয়ে মেখে খাওয়া। এছাড়া নানান খাবারের মধ্যে তিনি লুচি, অড়হর ডাল, বেগুনভাজা, চিকেন, স্যান্ডউইচ, দই, ডাল, বিভিন্ন সবজি আর ভালোবাসতেন মাংস। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ফিশফ্রাই। তপন থিয়েটারের বিপরীতে 'আপনজন'-এর।

স্বনামধন্য সংগীতশিল্পী, চিত্রপরিচালক ও অভিনেতা কিশোর কুমারের (১৯২৯-১৯৮৭) প্রিয় খাবার ছিল চিংড়ির মালাইকারি। ভেটকি মাছের ঝাল।

রাহুল দেববর্মণের (১৯৩৯-১৯৯৪) বিভিন্ন খাবারের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয় ছিল চিংড়ির চপ। মান্না দে-র অতিপ্রিয় ছিল মাংসের কাটলেট, ফিশ কাটলেট, চিকেন আর শাহি বিরিয়ানি।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (বাংলা ১২১৮-১২৬৫) ভালোবাসতেন মুগডালের খিচুড়ি আর মুগডালের ভাজা পুলি।

প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে যাঁর মুখ না দেখলে দিন ভালো যায় না তিনি হলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮)। তিনি যখন খুশি, যা খুশি খেতেন না। তিন সন্ধ্যা আহ্নিক ছিল বাঁধা। খাবারের মধ্যে প্রিয় ছিল ডাল ভাত। এছাড়া রুটি, টকদই, বেগুন, বিট, গাজর, লাউ, কুমড়ো, স্কোয়াশ, ফলের রস। সবচেয়ে প্রিয় ছিল পেঁড়া সন্দেশ।

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় জওহরলাল নেহরুর (১৮৮৯-১৯৬৪) খাবার ছিল মাপা। পছন্দ করতেন তন্দুরি চিকেন, খাসির রোগন জোস। স্টু কিংবা সুপ খেতে ভালোবাসতেন। তাঁর অপছন্দের তালিকায় ছিল ঝাল ও মশলাদার খাবার। শোনা যায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরামর্শে প্রতিদিন তিনি একটা করে কচি ডাব খেতেন।

অত্যন্ত দয়ালু চিত্তরঞ্জন দাশের (১৮৭০-১৯২৫) কথা। তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী ছিলেন রান্নায় মা অন্নপূর্ণা। চিত্তরঞ্জন মটন পোলাও খাওয়ার পর ২ সের রসগোল্লা খেতে পারতেন। ভালোবাসতেন মায়ের হাতের রসগোল্লা আর পাটিসাপটা। বাসন্তী দেবীর হাতের ফুলকপির তরকারি, চিংড়ির কাটলেট হলে মনটা তাঁর ভরে যেত দেবর্ষি নারদীয় আনন্দে।

'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারপ্রাপ্ত বরেণ্য অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। প্রথমে তিনি ছিলেন জাদরেল আমিষাশী। বেশ কয়েক বছর হল মাছ মাংস ডিম ইত্যাদি ছেড়েছুড়ে দিয়ে হয়েছেন কট্টর শাকাহারী।

তিনি দুপুরে খান দু-তিনটে রুটি (ভাত খান না)। ডাল আর শাকসবজি। এছাড়া তাঁর প্রিয় খাবারের মধ্যে আছে আলুপুরি, পকোড়া, ধোকলা, পরোটা। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় খাবারটি হল ভেন্ডি।

অমিতাভজির পুত্রবধূ ঐশ্বর্য রাই বচ্চন অন্যান্য আহারাদি করলেও তাঁর একান্ত প্রিয় আহার মাঙ্গালোরিয়ান মাছের ঝোল আর মাংস।

মহাকবি মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বাঙালি কবি ও নাট্যকার এবং প্রহসন রচনাকার। তাঁকে বাংলা জাগরণ সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব বলে গণ্য করা হয়। ব্রিটিশ ভারতে যশোর জেলায় কায়স্থ পরিবারে জন্ম হলেও তিনি যৌবনে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে হন 'মাইকেল মধুসূদন'।

মাইকেলের অত্যন্ত নাটকীয় ও বেদনাঘন জীবনে আহারের কোনো বাছবিচার ছিল না। প্রায় সবরকম খাবার-দাবারই খেতেন। তবে তাঁর এক সহপাঠী ও প্রিয়বন্ধু ছিলেন গৌরদাস। গ্রন্থলেখকের কথায়—

'গৌর মধুকে ভালোবাসে, প্রতিভাদীপ্ত চেহারা, মিষ্টি গলা। কথাবার্তার মধ্যে আছে আভিজাত্য তবে বিলাসী আর অমিতব্যয়ী। চালিয়াতি করে সাহেবিআনাও বেশি। মদ খায়। তবু মধুর স্বভাব মধুর মতোই। শুধু গৌরই নয়, সবাই মধুকে ভালোবাসে। মধুর বন্ধুভাগ্য ভালো।'

১৬ শতকের কথা। 'চণ্ডীমঙ্গল' রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (১৫০০-১৫৫১)। তাঁর খাওয়ার তালিকাটা কিন্তু কম বড়ো নয়। দেখা যাক তিনি কী কী খেতেন বা খেতে ভালোবাসতেন।

নিমপাতা দিয়ে শুক্তো, বেগুন, সিম, বিউলির ডাল, চালকুমড়ো, পুঁইশাক, চালতার ঝোল, ফুলবড়ি, ক্ষীর, তিল ও নারকেল দিয়ে তৈরি পিঠে, কাসুন্দি, পাকা চালতা, কাঁচা আম।

মাছটা খুব বেশি পছন্দ করতেন বলে মনে হয় না। তবুও পছন্দের তালিকায় আছে চিতল মাছ, চিংড়ি, ছোটো মাছের চচ্চড়ি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) যেমন ছিলেন খাদ্যরসিক তেমন ভ্রমণপিয়াসী। তিনি একবার ঘুরতে যাওয়ার সময় সঙ্গে গরু নিয়ে যান। প্রতিদিন সেই গরুর দুধ খেতেন ১০ থেকে ১২ সের। দুধে চিনি দিতেন না। দুধের মিষ্টত্বের জন্য প্রতিদিন প্রচুর গুড় আর ঘাস খাওয়াতেন গরুকে।

দেবেন্দ্রনাথ রান্না করতে খুব ভালোবাসতেন, করতেনও। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত। ওই সমাজের অনেককে নিয়ে মাঝেমধ্যে যেতেন বনভোজনে। একবার তিনি চাঁপদানিতে বনভোজনে গিয়ে

বললেন, আজ পায়েসটা আমিই রান্না করে সবাইকে নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াব।

যথাসময়ে রান্না হল। পায়েস পরিবেশনও করলেন তিনি। খাওয়ার সময় সকলেই চুপচাপ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন, তোমরা পায়েস কেমন খেলে? ভালো হয়েছে তো?

উপস্থিত সকলেই জানালেন, বেশ ভালো হয়েছে। এঁদের মধ্যে একজন বলে ফেললেন, সব ঠিক আছে তবে একটু ধোঁয়ার গন্ধ হয়েছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একটু হেসে বললেন, আমি তো ওইটিই চাইছিলুম। আমি আবার একটু ধোঁয়াটে গন্ধ পছন্দ করি পায়েসে।

আসলে রান্নার সময় পায়েসটা একটু লেগে গিয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসুলভ রসিকতা দিয়ে সেটা সেদিন সামলে নিয়েছিলেন।

সেকালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কথা। এ বাড়ির সকলেই ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, নিরামিষাশীও বটে। বিপরীতভাবে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ব্রাহ্মণ তবে তিনি মুসলমানি জীবনযাত্রায় ছিলেন অভ্যস্ত। মাংস খাওয়ায় তাঁর মোটেই অরুচি ছিল না। সেকালে জাত যাওয়ার ভয়ে প্রকাশ্যে তিনি মুসলমানদের সঙ্গে বসে খেতেন না। তবে তাঁর বাড়িতে থাকত একজন মুসলমান বাবুর্চি।

যুরোপীয়দের সঙ্গে তাঁর ওঠাবসা ও মেলামেশায় তিনি ছিলেন বেশ অন্তরঙ্গ। ফলে মাঝেমধ্যে শেরী পান করতেন। তিনি একেবারে মুক্তপ্রাণ এবং আগাগোড়াই ছিলেন মদ্যপানে সংস্কারমুক্ত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে এক জায়গায় লিখেছেন,

'আমার স্মরণ হয় যে রাজা (রামমোহন) আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি মাংসাহার করি কিনা। তিনি আমাকে বলিলেন যে, তুমি তোমার পিতাকে বলিও, প্রতিদিন আহারের সময়ে তোমাকে যেন কিছু মাংস দেওয়া হয়। রাজা বলিতেন যে, বৃক্ষমূলে জলসেচন করা আবশ্যক, নতুবা বৃক্ষ উপযুক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। দেহের সম্বন্ধেও সেই রূপ।'

একসময় দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪-১৮৪৬) সঙ্গে দারুণ অন্তরঙ্গতা রাজা রামমোহনের। সেই সূত্রে দ্বারকানাথের ছোটো ভাই রমানাথের সঙ্গেও রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। তিনিও ধীরে ধীরে মুক্ত হয়েছিলেন বংশপরম্পরাগত কুলাচার ও বিধিনিষেধ থেকে। তারপর দ্বারকানাথ ও রমানাথ দুই ভাই-ই মদ-মাংস খাওয়া শুরু করেন। এই খাওয়াতে তাঁদের রুচিও পাকাপাকি বেশ পোক্ত হয়।

রমানাথের স্ত্রী তাঁর স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন, 'প্রথম যখন এঁরা মাংস খেতে শুরু করেন, এঁদের বমি হয়ে যেত। ক্রমাগত চেষ্টার পর মাংস খাওয়া এঁদের অভ্যেস হয়ে যায়। বাড়ি থেকে বেশ বড়ো উঠোনের এক কোনায় মাটির পাত্রে মাংস রাঁধা হত এবং রান্নার পর সেই পাত্র বাড়ির বাইরে ফেলে দেওয়া হত। ক্রমে দুই ভাইয়ের সঙ্গে সাহেবদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁরা সাহেবদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে খানা খেতে শুরু করলেন। আগে আগে খাবার রাঁধত আনন্দ ও পরমানন্দ নামে দুজন ব্রাহ্মণ পাচক। এখন রামমোহনের সুপারিশে মুসলমান বাবুর্চি রাখা হল।'

কাশীধামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে শিবরাম এই মানব বিগ্রহ পরিচিত ছিলেন তৈলঙ্গ মহারাজ (১৬০৭-১৮৮৭) নামে। প্রায় দেড়শো বছর তিনি বিরাজমান ছিলেন এই শিবপুরীতে। তাঁর দেহের ওজন ছিল ১৪০ কেজি।

স্বামীজি সারা সপ্তাহ না খেয়েই থাকতেন। একান্ত প্রয়োজনে গঙ্গাজল পান করতেন। তিনি উপবাস ভঙ্গের সময় মাটির পাত্রে দই খেতেন উপাস্য দেবতাকে নিবেদন করে। এটা দু-এক সপ্তাহের জন্য নয়। এমন ঘটনা তিনি ঘটিয়েছেন বিশ্বনাথক্ষেত্রে বছরের পর বছর ধরে।

এবার সিদ্ধপীঠ তারাপীঠের জীবন্ত ভৈরব বামাক্ষেপা বাবার (১৮৩৭-১৯১১) খানাপিনার কথা। কারও প্রতি প্রসন্ন হলে দিগম্বর ক্ষেপাবাবা মাঝে মাঝে বলে বসতেন, 'এই শালা, মাল-টাল কিছু এনেছিস তো বার কর।'

কারণ বা গাঁজা, একটা কিছু মিললেই তাঁর আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা থাকত না। খেয়ালি পুরুষের সমস্ত ভাবই দুর্জ্ঞেয়! আচার-আচরণের অর্থ বোঝা দায়।

তারামন্দিরের আরতি অনুষ্ঠান শেষ হলে মন্দিরের পান্ডা শ্মশানে বালির উপরে পাতায় ভোগপ্রসাদ রেখে যান ক্ষেপাবাবার জন্য। বাবার প্রতিদিনের সঙ্গী তাঁর প্রিয় কেলো-ভুলোর দল। কুকুরের দল যে পাতে হুটোপুটি করে খায়, তারাপীঠ ভৈরবও সেই পাতেই ভোজনরত হন পরমানন্দে। এ এক বিস্ময়কর দৃশ্য!

প্রায়ই দেখা যেত, ভাবাবিষ্ট ক্ষেপাবাবা তাঁর প্রিয় কুকুরদের সঙ্গে তাদের খাবার খাচ্ছেন হুটোপুটি করে। আবার কখনো বা ক্ষেপাবাবার জন্য রাখা প্রসাদান্ন প্রিয় পারিষদ কেলো-ভুলোদের সঙ্গে খাচ্ছেন ভাগ করে। আচমন ও স্নানশুদ্ধির বালাই নেই। এসব প্রয়োজনও নিরর্থক হয়ে যেত এই শক্তিপীঠের জীবন্ত ভৈরবের কাছে।

এই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের কোনো বালাই ছিল না শুদ্ধাশুদ্ধ, খাদ্যাখাদ্য, জাত-বেজাতের। দেবতা ও মানুষে, মানুষ ও কুকুরে তাঁর যেমন ভেদজ্ঞান ছিল না, দেবভোগ্য প্রসাদে আর পশুখাদ্যেও তেমন রুচি-অরুচির কোনো প্রশ্ন উঠত না কখনো। সমগ্র সত্তা
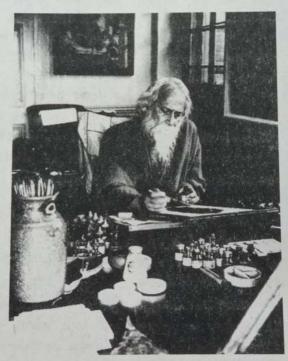
তখন উদ্বুদ্ধ থাকত দিব্য চেতনায়—সব কিছুই একাকার হয়ে উঠত পরম অখণ্ড বোধে।

এবার বলি ঠাকুরবাড়ির কথা। এ বাড়িতে সাধারণ ভাজাভুজি তো হতই, বড়ো ফর্দ থেকে ছাঁটকাট করে বলি, আলুভর্তা, কোর্মা, বেগুনভর্তা, মাখনমারা ঘি ছাড়াও মেটে ভাজা, শুঁটকিমাছ পোড়া দিয়ে জমিয়ে খিচুড়ি খেতেন রবিঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও তাঁর পরিবারের আর সকলে। সকলেই পছন্দ করতেন খিচুড়ি। এর সঙ্গে থাকত ধনেশাকের টক চাটনি। এছাড়া কখনো থাকত নানান টকমিষ্টি চাটনি। রবিঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। তিনি বলতেন, 'দই দিয়া খিচুড়ি খাইতেও মন্দ লাগে না।'

যশোরের মেয়ে ছিলেন রবিপত্নী মৃণালিনী দেবী। তিনি ছিলেন রন্ধনপটিয়সী। রান্নাঘরের সামনে রবিঠাকুর মোড়া পেতে বসে নানান ধরনের উদ্ভট কিছু রেসিপি বলে তা রাঁধতে বলতেন।

এখন ঠাকুরবাড়ির নানান ধরনের খাবারের কথা বলি, যেগুলি করতেন কবিপত্নী। ঠাকুরবাড়ির ফেলসা খিচুড়িতে থাকত মুগ বা সোনামুগ। চাল-ডাল সমান সমান।

আবার কড়াইশুঁটি দিয়ে ফেলসা খিচুড়িতে তিনগুণ ডালের সঙ্গে একগুণ চাল। এর সঙ্গে থাকবে চালের সমপরিমাণে খোসাসমেত কড়াইশুঁটি।

মুগের ডালের ফাঁপা খিচুড়িতে তিনভাগ চালে একভাগ ডাল মেশানো হয়। একইভাবে মালাই ভুনি খিচুড়িতে ডালটা থাকবে সোনামুগ।

জাফরানি ভুনি খিচুড়িতে দু-ভাগ চাল, একভাগ ডাল। এবার 'খেজুরের খিচুড়ি'র কথা। দু-ভাগ চালের সঙ্গে একভাগ ডাল দিয়ে তার মধ্যে দিতে হবে প্রচুর পরিমাণে খেজুর। ঠাকুরবাড়ির যে কোনো অনুষ্ঠানে ভাত, পোলাও-এর সঙ্গে খিচুড়ি থাকতই।

মুগডালে আদা আর মিষ্টি দেওয়া হত ঠাকুরবাড়িতে। মুগ-ডালের চচ্চড়ি, মুগডালের কারি, পাবো ছাড়াও মুগডাল বেটে তাতে পাতলা পাতলা করে কাটা বেগুন ডুবিয়ে বেগুনি আর তৈরি করা হত বেগুন-মুগের ফাঁপরা। প্রতিদিনের পাতে মুগডাল থাকতই। মুগডাল দিয়ে মিষ্টি বানাতে ঠাকুরবাড়ি ছিল যেন ওস্তাদ। মুগের নাড়ু, মুগের ডালের বরফি, মুগের মিঠাই ছাড়াও তৈরি হত মুগ শামলি।

রবিপত্নী মৃণালিনী দেবী সুন্দর জিলিপি করতে পারতেন কচু দিয়ে। সেটা খেতেও ভালোবাসতেন কবি। রবিঠাকুরের নানান ধরনের খাওয়ায় মোটেই অরুচি ছিল না। পাউরুটির গুঁড়ো দিয়ে তৈরি ভেড়ার এবং চিকেন রোস্ট, চিংড়ি কাটলেট, টার্কির কাবাব, চিকেন কাবাব, মিঠা কাবাব, কষা মাংস আর তাঁর বিশেষ পছন্দের খাবার ছিল আনারস দিয়ে খাসির মাংস।

মাছের মধ্যে বিখ্যাত যশুরে রান্না কাঁচা ইলিশের ঝোল, এছাড়া চিতল মাছের পেটি ও চিতলের 'মুইঠ্যা', চালতা দিয়ে মুগের ডাল, ভাপা ইলিশ, নারকেলের দুধ দিয়ে চিংড়ি, আদার মাছ। তিনি বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের রান্নার রেসিপি আনিয়ে বাড়ির বাবুর্চিকে দিয়ে রাঁধিয়ে খেতেন, এমনই ভোজনরসিক ছিলেন কবিগুরু।

ঠাকুরের প্রিয় মিষ্টি ছিল অনেকই তবে তার মধ্যে অতি প্রিয় ছিল ফুলকপির সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের উপরে নারকেলকোরা ছড়ানো মিষ্টি আর লুচি তো আছেই।

রবি ঠাকুরের একান্ত আপনজন মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর সব রকমের খাবার খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। অধিকাংশ সময়েই খেতেন ভাতের বদলে ভেজানো মুগডাল।

পরবর্তী সময়ে আবার নানান ধরনের খাবার খাওয়া শুরু করেন মৃণালিনী দেবীর মায়ের আদেশ বলুন, বা অনুরোধে।

এবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কথা। তাঁর পছন্দের খাবারের মধ্যে আছে ভাত, মুগের ডাল, পুরি, কলা, দই আর ভাতে ভাত। তবে সবচেয়ে প্রিয় ছিল খিচুড়ি আর তেলেভাজা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে তিনি মা বলে ডাকতেন। তাঁদের বাড়িতে গেলে তিনি খিচুড়ি খেতে চাইতেন। চাটনি কিংবা ভাজাভুজির প্রতি তাঁর তেমন কোনো টান বা আকর্ষণ ছিল না। তবে বেগুনি ও চপ হলে তিনি খুশি। তেলে-ভাজার মধ্যে এ-দুটিই ছিল তাঁর একান্ত প্রিয়। তবে দুর্বার আকর্ষণ ছিল খিচুড়িতে।

সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এলেন স্কটিশ চার্চে। লোকমুখে একটা কথা চলে আসছে এবং দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা আছে, তিনি 'লক্ষ্মীনারায়ণ' সাউয়ের দোকান থেকে তেলেভাজা কিনে খেতেন। দোকানটি হাতিবাগানে।

দেশবন্ধু যখন রবিঠাকুরের বাড়িতে যেতেন তখন সুভাষের মতো মাংস খাওয়ার আবদার করতেন। তবে সে ইচ্ছা সব সময়ই পূরণ করতেন কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী। সুভাষ দেশে হোক আর বিদেশেই হোক, তাঁর পছন্দের তালিকাতে থাকত ডাল ভাত পুরি আর কলা দই। রাতের খাবারে তিনি মিষ্টি পছন্দ করতেন। মুগের ডালের যে কোনো ধরনের মিষ্টি আর নাড়ুই ছিল বেশি পছন্দের। তবে সব খাওয়ার শেষে সন্দেশ, রসগোল্লা কিংবা এক পিস চমচম হলে তো আর কথাই নেই। শীতকালে পিঠেপুলি, নলেন গুড়ের পায়েস ছিল তাঁর বড়ো আদরের।

সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭৯) জীবনের শেষ তিন বছর নিত্য ও ছায়াসঙ্গী ছিলেন কবি যুগল সেন। তিনি যে লেখাটা লিখতেন তার প্রেস কপি করাটাই ছিল যুগলের কাজ। বনফুল (ছদ্মনাম) সম্পর্কে তাঁর কথা আমার ভাষায়—

বাংলা সাহিত্যে অনন্য ভার্সাটাইল জিনিয়াস লেখক ছিলেন তিনি। জঙ্গমের মতো বিশাল উপন্যাস যেমন লিখেছেন তিনি, তেমনই ছোট্ট একটি পোস্টকার্ডে গল্প লিখে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন সকলকে। প্রবাসীতে লিখতেন।

বনফুল ছিলেন সর্বভুক। সবরকমের মাছ খেতেন। তাঁর বেশি পছন্দের ছিল রুই। নিরামিষ থেকে বেশি পছন্দের আমিষ। বেশি ভালোবাসতেন মাংস। তাঁর সুগার ছিল। ২/৩ কেজি মাংস যে কোনো সময়ে খেয়ে নিতে পারতেন। তাঁর রাঁধুনির নাম ছিল অর্জুন। একদিন ২ কেজি সিদ্ধ মাংস তিনি খেয়ে ফেলেন অর্জুনের সামনে।

সুগার সত্ত্বেও মিষ্টি ভালোবাসতেন, খেতেনও। চিৎকার করে কথা বলতেন। তাঁকে খাইয়ে কাত করা যেত না। তিনি প্রাণ খুলে যেমন নিন্দে করতেন, তেমন ভালোবাসতেন প্রাণ খুলে। দিলদরিয়া এই মানুষটি ডাকপাখি, বালি হাঁস ইত্যাদির মাংস খেতে ভালোবাসতেন। তাঁর প্রিয়জনদের অনেকেই তাঁর জন্য আনতেন বিভিন্ন পাখির মাংস। খেতেন, খুশিও হতেন।

বিবেকানন্দ তখন নরেন। রসগোল্লার প্রতি আসক্তি ছিল অতিমাত্রায়। রসগোল্লার আকর্ষণেই তিনি প্রথম যান দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। বিবেকানন্দের মেজভাই ছিলেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়—

'রামদাদা (রামচন্দ্র দত্ত) একদিন বলিলেন, বিলে (নরেনের ডাকনাম), তুই তো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াস, দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস আছেন, দেখতে যাবি? চল।'

নরেন্দ্রনাথ অমনি বলিল, 'সেটা তো মুকখু, কী সে পেয়েছে, যে তার কাছে তা শুনতে যাব? আমি স্পেনসার, মিল, হ্যামিলটন, জন লক প্রভৃতির এত দর্শনশাস্ত্র পড়লুম আমি কিছু বুঝি না। আর একটা আকাট মুকখু, কালীর পূজারি কৈবর্তদের বামুন—সেইটার কাছে শিখতে যাব? সেটা জানে কী? কী জেনেছে, যে আমাকে শেখাতে যাবে?'

রামদাদা তথাপি নরেন্দ্রনাথকে পরমহংস মশাই-এর কাছে যাইবার জন্য অনেক অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন। অবশেষে নরেন্দ্রনাথ বলিল,

'যদি সে রসগোল্লা খাওয়াতে পারে তো ভালো, নইলে কান মলে দেব, আকাট মুকখুটাকে সিধে করে দেব।'

এত কথার পর নরেন্দ্রনাথ গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। পরে স্বামী বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হয়ে এলেন 'মুকখু'টার সংস্পর্শে এসে।

বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) যেমন খাদ্যরসিক ছিলেন তেমনই পিতা বিশ্বনাথ দত্তের মতো ছিলেন রন্ধনপ্রিয়। নানান ধরনের সুস্বাদু খাবার তৈরি করতে শিখেছিলেন পিতা বিশ্বনাথের কাছে। যখন তিনি ছাত্র, কলেজে পড়েন তখনও তিনি বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াতেন নিজের হাতে রান্না করে। সন্ন্যাসজীবনে সুযোগ পেলেই তিনি হাতাখুন্তি ধরতেন নির্বিকারে। নানান খাবার তৈরি করে খাওয়াতেন ভক্ত শিষ্যদের। যেদিন তিনি অপার্থিবলোকের উদ্দেশে পাড়ি দেন, সেদিনও নিজহাতে রেঁধে খাইয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলেন তাঁর প্রিয় ভক্ত শিষ্যদের।

বিবেকানন্দ ডালের জল খেতে ভীষণ ভালোবাসতেন। তবে তার সঙ্গে একটা কাঁচালংকা অবশ্যই চাই। এমনিতেই তিনি অসম্ভব ভালোবাসতেন ঝাল খেতে। ভাতের সঙ্গে মোচার ঘণ্ট, ডালমাখা, মুগের মিষ্টি ছাড়াও তিনি সব রকমের মিষ্টি খেতে ভালোবাসতেন। পরে প্রবল ডায়াবেটিসের জন্য সমস্ত মিষ্টি খাওয়া ছাড়তে বাধ্য হন।

লংকাকে ফল বলা যায় না, কিন্তু এর প্রতি আশৈশব স্বামীজির প্রবল আকর্ষণ, নানা সময়ে নানা ভাবে প্রিয় লংকাকে, তিনি প্রবল সমর্থন করেছেন। পরিব্রাজক কালে অনুরাগী হরিপদ মিত্রকে তিনি বলেছিলেন, পর্যটনকালে সন্ন্যাসীদের দেশ-বিদেশের নানাপ্রকার দূষিত জল পান করতে হয়, তাতে শরীর খারাপ করে, এই দোষ নিবারণের জন্য তাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা, চরস প্রভৃতি নেশা করে থাকে। 'আমিও সেজন্যে এত লংকা খাই।'

জানা যাচ্ছে রায়পুরে নরেন্দ্রনাথ তাঁর বাবার কাছ থেকে অনেক রান্নাবান্না শিখেছিলেন। 'সকলের চেয়ে ভালো রাঁধব' এমন একটা জেদ তাঁর বরাবর ছিল। খেলার সাথীদের নিকট অবস্থা অনুসারে এক আনা দু-আনা চাঁদা নিয়ে মাঝে-মাঝে চড়ুইভাতি করা নরেন্দ্রনাথের একটা প্রধান শখ ছিল। খরচার বেশির ভাগ অবশ্য তিনিই দিতেন এবং পাকের কাজও স্বহস্তে গ্রহণ করতেন, তবে অন্য বালকরা তাঁকে সাহায্য করত। পোলাও, মাংস, নানা প্রকার খিচুড়ি ও অন্যান্য বহুবিধ রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য রান্না হত। বিভিন্ন সূত্রের খবর, রান্না খুব ভালো হত, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ খুব ঝাল ভালোবাসতেন বলে মাংস ইত্যাদিতে অতিরিক্ত লংকা দিতেন।

খিচুড়ি এমনই একটা আহার যা ভালো লাগেনি এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। চৈতন্যদেবের অত্যন্ত প্রিয় ছিল খিচুড়ি। শচীমাতা নিমাইয়ের মুখ হাঁড়ি হয়েছে দেখলে তিনি বুঝতে পারতেন নদের চাঁদের জন্য রাঁধতে হবে খিচুড়ি। নবাব বাদশা মহাপুরুষ মনীষী—এমন কেউ নেই যার প্রিয় নয় খিচুড়ি। তবে বিবেকানন্দ একটা কথা বলতেন, 'যে রান্নাটা ভালো করতে পারে না, সে কখনো পাকা সাধু হতে পারে না।'

পলাশীর যুদ্ধে হেরে গেলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা। তিনি যেদিন এবং যখন নৌকা করে মুর্শিদাবাদ থেকে পালাচ্ছিলেন, সেদিন তাঁর নৌকাতে রান্না হচ্ছিল খিচুড়ি।

আঠারো শতকের শেষ থেকে আজ পর্যন্ত যে খিচুড়ি বেলুড় মঠে হয় তা বিবেকানন্দের উদ্যোগ ও পরিকল্পনায়। খিচুড়ি খেতে অসম্ভব ভালোবাসতেন বিবেকানন্দ। তাঁর খিচুড়ি রান্নার রেসিপি আজও চলে আসছে বেলুড় মঠের উৎসব অনুষ্ঠানে।

তাঁর খিচুড়ি রান্নার উপকরণের মধ্যে আছে সমান মাপের চাল, মুগের ডাল আর সবজির মধ্যে আছে আলু, ফুলকপি, কড়াইশুঁটি, পটল থেকে কচু অবধি, কী নেই খিচুড়িতে। আর চাটনির রেসিপিতে আছে, 'টমেটো আমড়া কুমড়ো' দিয়ে চাটনি।

শুধু যে খিচুড়ি পছন্দ করতেন, তা নয়, বিবেকানন্দের পছন্দের তালিকায় আছে মুখরোচক নানান ভাজাভুজি আর চপ। একবারের কথা, খিচুড়ির সঙ্গে সহযোগী চপ ঠিকমতো ভাজা না হওয়ায় একজন সেবক কানাইলালের কান মুলে দিয়েছিলেন তিনি। পরে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন, কেঁদেও ছিলেন। যখন বিদেশে যেতেন তখন তাঁর সঙ্গে যেত মুগ ডাল, কাঁচালংকা, পাঁচফোড়ন থেকে শুরু করে নানা মশলাপাতি।

সাহিত্যিক শংকর তাঁর 'আহারে-অনাহারে বিবেকানন্দ' গ্রন্থে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অনেক কথাই লিখেছেন। আমি এখানে কিছু টুকরো কথা তুলে ধরছি।

কালোজাম, লিচু, আম খুব ভালোবাসতেন। কাশীতে যখন টাকায় ষোলো সের দুধ, শোনা যায়, কাশীতে অসময়ের এই ল্যাংড়া আম পেয়ে স্বামীজি খুব খুশি হয়েছিলেন।

'শ্রীমার মন্ত্রশিষ্য, বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গোৎসবের পূজারি স্বামী

ধীরানন্দ লিখেছেন স্বামীজির আর এক প্রিয় ফলের কথা। নেয়াপাতি ডাবের ভিতর চিনি দিয়ে সেই ডাবের খোলে বরফ ঢুকিয়ে দিয়ে খেতে তিনি ভালোবাসতেন। 'বলরামবাবুর বাড়িতে একটা ডাব দিলুম। খেয়ে ভারী খুশি। বললেন, আঃ চমৎকার, নে তুই খা। আমি খাচ্ছি, তখন বালকবৎ তিনি বলছেন, 'আমায় একটু দে না', এঁটোর জ্ঞান নেই।'

'মাছের মধ্যে কোন মাছ স্বামীজি বিশেষ পছন্দ করতেন? অনেকের ধারণা, ইলিশ, যা দেহাবসানের দিনেও তাঁর আগ্রহে বেলুড়ে কেনা হয়েছিল। শুধু ইলিশ মাছ, তার সঙ্গে ঢাকার পুঁই ডাঁটার কথাও আমাদের অজানা নয়।'

'স্বামীজির আর এক প্রিয় মাছের নাম গলদা চিংড়ি। বলরামবাবু এই প্রীতির কথা জেনেই একবার গলদার ব্যবস্থা করেছিলেন।'....

কলকাতা পুলিশের প্রথম ইন্ডিয়ান ডেপুটি কমিশনার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূপেনবাবুর দাবি, স্বামীজি মাংস ভালোবাসতেন বলে, মাঝে মাঝে তিনি বেলুড়ে মাংস নিয়ে গিয়েছেন।...

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট (১৮৯৭) স্বামী যোগানন্দকে নিউইয়র্ক থেকে চিঠি লিখেছিলেন (২৪ জানুয়ারি ১৮৯৬)—

'যোগেনভায়া, অড়হর ডাল, মুগের ডাল, আমসত্ত্ব, আমসি, আমতেল, আমের মোরব্বা, বড়ি, মশলা সমস্ত ঠিক ঠিকানায় পৌঁছিয়াছে।'...

পশ্চিমের আলুনি শাক-সবজি সেদ্ধ থেকে পূর্ব ইয়োরোপের লংকায় জড়ানো খাবার। কিন্তু স্বামীজির সবচেয়ে প্রিয় খাবার কী জানেন?

তিনিই উত্তর দিয়েছেন—আমাদের ভাত, ডাল, চচ্চড়ি, শুক্তো, মোচার ঘণ্টের জন্যে পুনর্জন্ম নেওয়াও বড়ো বেশি কথা মনে হয় না। শেষ বয়সেও তিনি শুক্তো, মোচার ঘন্ট খেতে দিদিমার কাছে যেতেন। তাঁর আরও কয়েকটা আশ্রয় ছিল। বলতেন, 'যোগেন মা, আজ কাজ সেরে তোমার এখানে আসব, ভালো করে রাঁধবে।'

বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ি'তে গোলাপ মায়ের দুর্বল জায়গা, নরেনের চিংড়ি মাছ দেওয়া পুঁইশাকের প্রতি আকর্ষণ। তিনি বলতেন, 'দ্যাখো যখনই চিংড়ি মাছ দিয়ে পুঁইশাক হয় তখনই নরেনের কথা মনে পড়ে। সে ওই খাবারটা খুব পছন্দ করত।'...

স্বামীজির রান্নার কলাকৌশল বৈচিত্রময়।...তিনি নিজেই লিখেছেন—কাল রাত্রে আমি নিজেই রান্না করেছিলাম। জাফরান, ল্যাভেন্ডার, জৈত্রী, জায়ফল, কাবাবচিনি, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, মাখন, লেবুর রস, পেঁয়াজ, কিশমিশ, বাদাম, গোলমরিচ এবং চাল ডাল—এই সব মিলিয়ে এমন এক খিচুড়ি বানিয়েছিলেন যে, নিজেই গিলতে পারিনি। ঘরে হিং ছিল না, নচেৎ তারও খানিকটা মেশালে সুবিধা হত। ভক্তরা এখন ভাবছেন, এই উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন কী করে?...

স্বামীজির খাওয়াদাওয়ার কথা লিখে শেষ করা যাবে না। স্বামীজি যখন লস এঞ্জেলেসে ছিলেন, তাঁর সকালের ব্রেকফাস্ট দিয়ে স্বামীজির খাওয়ার প্রসঙ্গ শেষ করি।

"স্বামীজি ব্রেকফাস্টে সাধারণত কী খেতেন?

"প্রত্যেকদিন প্রথমে ফল খেতেন—যেমন অরেঞ্জ বা গ্রেপফ্রুট। তিনি পোচড ডিম পছন্দ করতেন, তারপর টোস্ট ও কফি।

"তিনি কি কফির সঙ্গে ক্রিম মেশাতেন?"

"হ্যাঁ, ক্রিম ও চিনি মেশাতেন।"

"আহারের ব্যাপারে স্বামীজি মধ্যপন্থী ছিলেন। সকালে সাধারণত তিনি ২টো ডিম, ২ খানা টোস্ট, ২ কাপ কফি খেতেন। একদিন আমি তৃতীয় কাপ কফি দিতে চাইলে তিনি প্রথমে 'না' বলেন। শেষে আমি পীড়াপীড়ি করলে তিনি রাজি হয়ে বললেন, 'আচ্ছা দিন, মেয়েদের স্বভাবই হচ্ছে পুরুষদের প্রলোভিত করা।'

আরো আছে, তবে এই হল সর্বভুক স্বামীজির সংক্ষিপ্ত আহার-কথা।

'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থের কথায়, ১৮৯৮ সালে একবার বেলুড় মঠে ধর্মাচরণে খাদ্যের শুভাশুভ প্রভাব নিয়ে আলোচনা হয় গুরু বিবেকানন্দের সঙ্গে শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর। কথাপ্রসঙ্গে শরৎ বললেন, 'অনেকের চক্ষে ব্যভিচারাদির পাপ অপেক্ষাও যেন মাছ-মাংস খাওয়া বেশি পাপ, এই মতটা কোথা হইতে আসিল?'
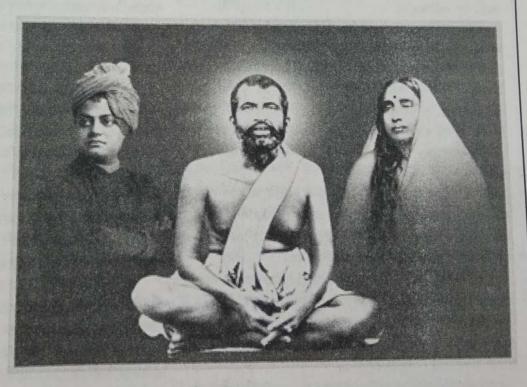
উত্তরে স্বামীজি বললেন,

'কোত্থেকে এল তা জেনে তোর দরকার কী? তবে ওই মত ঢুকে যে তোদের সমাজের ও দেশের সর্বনাশ সাধন করেছে তা তো দেখতে পাচ্ছিস? দেখ না, তোদের পূর্ববঙ্গের লোক খুব মাছ-মাংস খায়, কচ্ছপ খায়, তাই তারা পশ্চিমবঙ্গের লোকের চেয়ে সুস্থ শরীর।... শুনেছি, পূর্ববঙ্গের পাড়াগেঁয়ে লোকে, অম্বলের ব্যারাম কাকে বলে, তা বুঝতেই পারে না।'

শিষ্য শরৎ স্বামীজির কথায় সায় দিয়ে বললেন,

—'দেশে আমরা দু'বেলাই মাছ-ভাত খাইয়া থাকি।'

তখন স্বামীজি বললেন,

—'তা খুব খাবি। ঘাসপাতা খেয়ে পেটরোগা বাবাজির দলে দেশ ছেয়ে ফেলেছে।'

এরপর শরৎ বললেন,

—'কিন্তু মহাশয় মাছ-মাংস তো রজোগুণ বাড়ায়।'

তখন স্বামীজি বলিষ্ঠতার সুরে,

'আমি তো তাই চাই। দেশের যে সব লোককে এখন সত্ত্বগুণী বলে মনে করছিস, তাদের ভেতর পনেরো আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন...এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা...তাই বলছিলুম, মাছ-মাংস খুব খাবি।'

সারদা মাকে দিয়েই শুরু করি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের খানাদানার কথা। মা বলতেন,

'ঠাকুর বড়োই পেটরোগা ছিলেন। আমি নবতে থেকে ঠাকুরের ইচ্ছামতো শুক্তো, ঝোল, এসব রেঁধে দিতুম। মাসের মধ্যে তিনদিন মেয়েরা ওসব করতে পারে না, সে কয়দিন মায়ের (মা কালীর) ওখান হতে প্রসাদ আসত। তা খেলেই ঠাকুরের অসুখ বাড়ত। একদিন ঠাকুর আমাকে বললেন, 'দেখ, তুমি এই তিনদিন রান্না না করাতে আমার অসুখটা বেড়েছে। তুমি ও ক-দিন কেন রাঁধলে না?'

আমি বললুম, 'মেয়েদের অশুচির তিন দিন কাউকে রেঁধে দিতে পারে না।'

ঠাকুর বললেন, 'কে বললে পারে না? তুমি আমাকে (রেঁধে) দেবে। তাতে দোষ হবে না। বল তো, অশুচি তোমার শরীরের কোন জিনিসটা? চামড়া, না মাংস, না হাড়, না মজ্জা? দেখো, মনই শুচি-অশুচি। বাইরে অশুচি বলে কিছু নেই।'

এরপর হতে আমি সর্বদা রান্না করে দিতুম। (অশুচি অবস্থায় ঠাকুরকে পুজো করা চলে কিনা) এ প্রশ্নের উত্তরে মা বলছেন—একথা আমিও ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। ঠাকুর বলেছিলেন, 'যদি পুজো না করার জন্যে তোমার মনে খুব কষ্ট হয় তাহলে করবে, তাতে দোষ নেই। নতুবা করো না।'

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাপার্ষদ ছিলেন স্বামী সারদানন্দ। তিনি লিখেছেন, 'সহজাবস্থায় সচরাচর তাঁর যেরূপ আহার ছিল তার চতুর্গুণ বা ততোধিক পরিমাণ খাদ্য ভাবাবস্থায় উদরস্থ করিলেন অথচ তজ্জন্য কোনো শারীরিক অসুস্থতা হইল না—এইরূপ হইতে দেখিয়াছি।'

'একখানা বড়োসড়ো সর খাওয়া, কামারপুকুরে রাতের আহারের পর এক সের মিঠাই সহ একধামা মুড়ি খাওয়া, দক্ষিণেশ্বরে এক সের পরিমাণ হালুয়া খাওয়া'—এসব ঘটনার কথা জানা যায় নানা প্রামাণ্য গ্রন্থে। একই সঙ্গে এ তথ্যেরও উল্লেখ আছে যে, শ্রীমা সারদা দেখেছিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে জগন্মাতা মহাকালীই অন্ন আহার করেছেন।'

বরাহনগরে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের কাছে ফাগুর দোকান ছিল। ওই দোকানের বিখ্যাত কচুরি ঠাকুর খেয়েছেন আশ মিটিয়ে, গিরিশ ঘোষসহ তাঁর ভক্ত শিষ্যদের কাউকে খাওয়াতে বাকি রাখেননি তিনি। বহু বছর হল সেই দোকানটা আর নেই।

বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়ি শ্রীরামকৃষ্ণকে খেতে দেওয়া হয়েছিল বর্ধমান থেকে আনা মিঠাই। ঠাকুর জল-মিঠাই গ্রহণ করলে ঈশ্বরচন্দ্র বুঝেছিলেন, 'পরমহংস' রূপে বন্দিত ঠাকুরের কোনো ছুঁতমার্গ নেই।

'একবার দক্ষিণেশ্বরে এক অশুদ্ধ ছোকরা মিষ্টান্ন এনেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্যে। রাতে আহারকালে তাঁকে সেটি দেওয়া হলে তিনি তা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, 'এ কোন শালার সন্দেশ?'

এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা প্রয়োজন, শুচি-অশুচির সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর মানতেন আহারকালে—সংস্কার, লোকাচার। টিকটিকি, চুল —ওই জাতীয় কিছু ভোজ্য জিনিসে দেখলে তিনি গ্রহণ করতেন না। বেলা—অবেলা—দিনক্ষণ মানতেন। বলতেন, 'মহাকালের সঙ্গে রমণ করেন যে মহাকালী তাঁরই ইচ্ছায় আর নির্দেশে কাল তথা সময়ের শুভ-অশুভের পুনরাবৃত্তি ঘটে।'

ঠাকুর বলতেন, 'অসৎ, ঘোর বিষয়াসক্ত লোক যেখানে বসে খায় সেখানকার মাটি অপবিত্র হয়ে যায়। সৎ লোক খেলে মাটি শুদ্ধ ও পবিত্র হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিদিনের আহার্য তালিকায় থাকত সাধারণ ভোজ্য ও পানীয়। অন্নব্যঞ্জন, খিচুড়ি, লুচি, মিষ্টান্ন, পায়েস, ফল—ফলের রস, মুড়ি, কড়াই, সুজি, বাতাসা, দুধ, খই। এই খাদ্যগুলি প্রতিদিন ঠাকুর খেতেন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। ঠাকুর ছিলেন পরিমিত আহারী।

সাধনপথে যখন ঠাকুরের উচ্চাবস্থা তখন তিনি একদিন বলেছিলেন, 'আমার অবস্থা এখন মাছের ঝোল মার প্রসাদ হলে একটু খেতে পারি আর প্রসাদী মাংস এখন আর খেতে পারি না তবে আঙুলে করে চাখি পাছে মা রাগ করেন।'

সুরাপান প্রসঙ্গে ঠাকুরের উক্তি, 'দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনের সময় আমার রমণী মাত্রে মাতৃভাব যেমন অক্ষুণ্ণ ছিল, তদ্রূপ বিন্দুমাত্র কারণ গ্রহণ করিতে পারি নাই।'

একসময় মিষ্টান্নের জন্য বিখ্যাত ছিল ধনিয়াখালি। খইচুর নামে একসময় খই-এর তৈরি অতি সুস্বাদু মিষ্টান্ন পাওয়া যেত এখানে। এটি তৈরি করতে মশলাই লাগত প্রায় ৫০ রকমের। এই মিষ্টান্ন খেয়ে পরম তৃপ্তিলাভ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তাঁর পছন্দের মধ্যে অতিপ্রিয় মিষ্টি ছিল কৃষ্ণনগরের সরভাজা আর গরমাগরম জিলিপি, কুলপি ও মোহনভোগ।

নীলাচলে প্রভু জগন্নাথের প্রতি অগাধ ভক্তি-বিশ্বাস ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের। ভক্তি ও নিষ্ঠায় একান্ত হয়ে আস্বাদ নিতেন প্রভুর

মহাপ্রসাদের। ঠাকুর তাঁর ভক্ত পার্ষদদের খেতে বলতেন মহাপ্রসাদ। এ প্রসঙ্গে লাটু মহারাজের কথা—

'রাখাল ভায়ের একদিন দক্ষিণেশ্বরে অসুখ করে, তাতে উনি রাখালকে বললেন, ''ওরে! জগন্নাথের প্রসাদ খা, তাহলে তোর অসুখ সেরে যাবে।'' জানো! জগন্নাথের প্রসাদের এমন গুণ! তোমরা জগন্নাথের প্রসাদকে মানো না, আর তিনি সকলকে বলতেন, ''খাবার আগে দু-এক দানা মহাপ্রসাদ খাবে।'''

মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শ্রীমহেন্দ্র গুপ্তর ভাষায়, 'ঠাকুর বলতেন, কলিতে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। তাঁর কী দৈবদৃষ্টি ছিল আমরা কী করে বুঝব! নিজের বিছানার পাশে পশ্চিমের দেওয়ালে একটি বটুয়াতে মহাপ্রসাদ থাকত। রোজ সকালে প্রণাম করে একদানা খেতেন। ভক্তদেরও দিতেন।

একদিন নরেন্দ্রকেও দিলেন। নরেন্দ্র তা খেতে চায়নি। বলে, 'এ শুকনো ভাত, অপরিষ্কার জিনিস।' ঠাকুর তখন তাকে বলেন, 'তুই দ্রব্যগুণ মানিস—আফিং খেলে আঁটে আর ত্রিফলায় দাস্ত হয়?'

নরেন্দ্র উত্তর করল, 'হ্যাঁ, তা মানি।' তখন ঠাকুর বললেন, 'এও তেমনই। এই মহাপ্রসাদ খেলে জ্ঞানভক্তি বিশ্বাস লাভ হয়।' তখন নরেন্দ্র নির্বিচারে উহা খেল। ঠাকুরের কথায় তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস।

কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত (১৮৫৪-১৯৩২) একটি ঘটনার স্মৃতিচর্চা করেছেন এইভাবে—

''একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর আমায় বললেন, 'রথযাত্রা হয়ে গেল, এই সময় শ্রীক্ষেত্র থেকে রথযাত্রীরা ফিরছে, তুমি স্টেশনে গিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে আমার জন্য মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করে নিয়ে এসো, আমি ওই প্রসাদ গ্রহণ করব'।''

শ্রীম অর্থাৎ শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত যিনি মনে-প্রাণে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-অনুরাগী তিনি কি না গিয়ে পারেন? তিনি স্টেশনে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে শ্রীক্ষেত্র থেকে আগত যাত্রীদের কাছে বিনয়াবনত হয়ে বলেন—'একটু মহাপ্রসাদ ভিক্ষা দেবেন।' শেষ পর্যন্ত একজন যাত্রী তাঁর অন্তরের মহাভাবটি বুঝে আটক খুলে একটু মহাপ্রসাদ দেন। বলাই বাহুল্য যে শ্রীরামকৃষ্ণ তা পেয়ে আহ্লাদিত হয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য ষোলো শতকের অবতার পুরুষ শ্রীচৈতন্যের মহাপ্রসাদ অনুরাগের কথা। তাঁর অনুরাগের কথা জানতেন বলেই ভক্ত-অনুরাগীরা তাঁর অন্ন আহারকালে তাঁকে সবসময়ই মহাপ্রসাদ নিবেদন করতেন। শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ বাসুদেব সার্বভৌম একদিন সন্ধ্যাহ্নিক ইত্যাদি কৃত্যাদি শেষ না হলেও শ্রীচৈতন্যের স্বহস্তে প্রদত্ত মহাপ্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে খেয়েছিলেন। আর তার আস্বাদ গ্রহণকালে আনন্দচিত্তে সরবে উচ্চারণ করে চলেছিলেন শ্লোকবচন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা সে বচনের অর্থ—'মহাপ্রসাদ শুকনো হোক, বাসি হোক, দূর দেশ থেকে আনা হোক, পাওয়ামাত্রই খেয়ে নেবে—কালবিচার করবে না। মহাপ্রসাদ খাওয়ার ব্যাপারে দেশকালের কোনো বিধিনিয়ম নেই।'
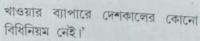
''ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার মেনে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে অব্রাহ্মণ রাসমণির দেবমন্দিরের প্রসাদ খেতেন না। গঙ্গাতীরে রান্না করে খেতেন। আর কথিত আছে যে, এ কাজে তাঁকে সহায়তা করতেন তাঁর ভাগনে হৃদয়। পরে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই মন্দিরের আরাধ্যা মা কালীর পুজোপাঠ করতে শুরু করেন তখন তিনি মা কালীর প্রসাদ খেতে শুরু করেন। মা কালীকে তো তিনি নিজেই অন্ন নিবেদন করছেন—তাই আর বাধা নেই।''—...

ইলিশমাছের দোষটা জেনেও তিনি ছিলেন ইলিশের ভক্ত। কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেন, 'ডাব মাটির ত্রিশ হাত ওপরে সর্বক্ষণ রোদ খাচ্ছে, কিন্তু খেলেই শরীর ঠান্ডা। কিন্তু ইলিশ গঙ্গার দশ হাত গভীর অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, অথচ খেয়েছ কি পেট গরম।'

জীবনের অন্তিম পর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছিলেন গল-রোগে আক্রান্ত। রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে তিনি শ্রীমা সারদাকে বলেছিলেন, 'যখন যার-তার হাতে খাব, কলকাতায় রাত কাটাব আর খাবারের অগ্রভাগ কাউকে দিয়ে বাকিটা নিজে খাব, তখন জানবে দেহরক্ষা করবার বেশি দেরি নেই।'

এ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগ্নে হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'একদিন নরেন দক্ষিণেশ্বরে গেছে। বিকেলে মামাকে জলখাবারের জন্য গুটিকতক সন্দেশ দিয়েছে। মামা কোনো জিনিস নিবেদন না করিয়া খাইতেন না এবং অগ্রভাগ কাউকে দিতেন না। কিন্তু সেদিন নরেনকে আগে সন্দেশ খাওয়াইয়া পরে তিনি নিজে খাইলেন। এই কাজ দেখে আমি চমকে উঠলুম এবং নহবতখানার উপরে শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরানি ছিলেন, তাঁকে বলিতে তিনিও চমকে উঠলেন। কারণ মামা আগে থেকেই বলেছিলেন, দ্যাখ যখন আমি খাবারের আগ ভাগ অপরকে দিয়ে পরে আমি খাব তখন জানবি যে আমার দেহ আর বেশি দিন থাকবে না।' হয়েছিলও তাই।

'খাই খাই' পর্বে নানা শ্রেণির মানুষের নানান ধরনের প্রিয় খাবারের কথা তো হল। এবার বলি, ভগবানের প্রিয় খাবার কী? এবং তিনি কী খেতে ভালোবাসেন?

ভগবানের একমাত্র প্রিয় খাবার এবং খেতে ভালোবাসেন মানুষের 'অহংকার'। ❖

কৃতজ্ঞতা স্বীকার —শংকর, আইন-ই-আকবরী, মনীষীদের অসংখ্য জীবনীগ্রন্থ, বিভিন্ন সংবাদপত্র ও নানা গ্রন্থ থেকে এ লেখার রসদ সংগ্রহ করা হয়েছে। কখনো হুবহু লেখা তুলে ধরা হয়েছে, কখনো করা হয়েছে ভাষার পরিবর্তন। পত্রিকায় পরিসরের বড়োই অভাব। তাই এখানে লেখক-লেখিকাদের এবং তাঁদের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হল না। কৃতজ্ঞচিত্তে সেইসব লেখক ও প্রকাশকের কাছে করজোড়ে নতশিরে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে রইলাম—লেখক।

প্রবন্ধ

মহাভারত কথা

ড. জয়ন্ত কুশারী

"One who writes for another in secret." এই হল একজন Secretary বা সচিব-এর কাজ । তবে আজ এটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই একজন সচিব। কাজের জগতে এখন তিনি আড়ে-বহরে অনেকটা বেড়ে গেছেন। "Secretary" শব্দটি কিন্তু, ল্যাটিন শব্দ "Secretarious" থেকে এসেছে।

কিন্তু না, ইউরোপ, এশিয়া কিংবা বহির্ভারতের কোনো দেশ সচিব-এর কাজ বিষয়ে মন্তব্যটি করেননি। ভাবতে ভালো লাগে, "মহাভারত"-এর কাল প্রথম প্রয়োগ করে বক্তব্যটির প্রতিষ্ঠা করে। অনেক পরে ভাষায় রূপ পরিগ্রহ বিধান আকারে। সাল-তামামি-র বিচারে "মহাভারত"-এর কাল প্রথম আচরণ করে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ বা ২৯০০ অব্দে। এটির স্বীকৃতি লাভ করে বহু পরে। ল্যাটিন ভাষা "Secretarious"-এর মধ্য দিয়ে। তার পরে ইংরাজি ভাষায় "Secretary" শব্দটির মাধ্যমে।

গণেশ ঠাকুর-ই হলেন বিশ্বের প্রথম "Secretary" বা সচিব। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস হলেন তাঁর নিয়োগকর্তা। রীতিমতো Interview দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করে পদটির পদমর্যাদা-র মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দেন মহাভারতের কাল। উভয়ের মধ্যে চুক্তি সাপেক্ষে Services Rule মেনে মহাভারত গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেন ব্যাখ্যাতা ব্যাসদেব এবং লিপিকার ভগবান গণেশ। পরবর্তী কালে এই গ্রন্থটি বিশ্বের স্বীকৃত চারটি মহাকাব্যের অন্তর্গত। আর যার ভাষা হল সংস্কৃত।

গণেশ বলেছিলেন—ঋষিবর, আপনার এই গ্রন্থটি আমি লিখব গোপনে। তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে। তবে গোপনীয়তা রক্ষা করা যেন যথাযথ ভাবে হয়। নাওয়া-খাওয়া-শোওয়া-র সময় বাদ দিলে আমার লেখনি ক্ষণমাত্র থামবে না। ব্যাস ভাবলেন, আমার রচনা-তে আট হাজার আট শো এমন কূট শ্লোক আছে। যার অর্থ কেবল আমি আর আমার পুত্র শুকদেব বুঝতে পারে, সঞ্জয় পারেন কি না সন্দেহ। ব্যাস গণেশকে বললেন, আমি যা বলে যাব আপনি তার অর্থ না বুঝে লিখতে পারবেন না। গণেশ বললেন, তাই হবে। গণেশ সর্বজ্ঞ হলেও কূটশ্লোক লেখার সময় তাঁকে ভাবতে হত, সেই অবসরে ব্যাস অন্য বহু শ্লোক রচনা করতেন।

"উপাখ্যান সমেত এই মহাভারত-এ লক্ষ শ্লোক আছে । উপাখ্যান ভাগ বর্জন করে ব্যাস চব্বিশ হাজার শ্লোকে এক সংহিতা রচনা করেছেন। পণ্ডিতগণের মতে তাই প্রকৃত মহাভারত। তাছাড়া ব্যাস দেড়শো শ্লোকে সমস্ত পর্বের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত অনুক্রমনিকা অধ্যায়ে দিয়েছেন। ব্যাস পূর্বে নিজের পুত্র শুকদেবকে এই গ্রন্থ পড়িয়ে তার পর অন্যান্য শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন। তিনি ষাট লক্ষ শ্লোকে আর একটি মহাভারত সংহিতা রচনা করেছিলেন। তার ত্রিশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে। পনের লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে। চৌদ্দ লক্ষ শ্লোক গন্ধর্বলোকে। আর বাকি এক লক্ষ শ্লোক বিশিষ্ট মহাভারতটি মনুষ্য লোকে প্রচলিত আছে। এত কিছুর লিপিকার কিন্তু সেই একজন-ই। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনি হলেন শ্রী গণেশ। এই অমিত শক্তিধর লিপিকার আজও বিশ্বের বিস্ময়। কেন না, আজকের অত্যাধুনিক যন্ত্রনির্ভর প্রযুক্তিসম্বল মুদ্রণ ব্যবস্থা স্বল্প সময়-এ এই অসাধ্য সাধন করতে পারবে কিনা বিশ্বাস করুন আমার অন্তত জানা নেই। জানি না, ভাবীকাল এর উত্তর দিতে পারবে কিনা। পৃথিবীকে সর্বকালের সর্বলোকের সর্বজ্ঞ-কে উপহার দিল মহাভারত।

মহাভারত-এর কালে চতুর্বর্ণের মানুষ-ই বাস করত। তাঁরা হলেন—(১) ব্রাহ্মণ (২) ক্ষত্রিয় (৩) বৈশ্য (৪) শূদ্র। গুণ ও কর্ম অনুযায়ী এই বর্ণ বিভাগ। এই পরিবারভূক্ত মানুষেরাই সমাজের সদস্য বলে বিবেচিত হত। কেন না, সমাজের ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। আবার অনেকগুলি সমাজের সমবায়ে একটি বৃহৎ অঞ্চল। ধীরে ধীরে এইভাবে রাষ্ট্র। আর অনেকগুলি রাষ্ট্র নিয়ে এই পৃথিবী। আবার চতুরাশ্রম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য- বাণপ্রস্থ-সন্ন্যাস বলবৎ ছিল এই সময়।

শিক্ষা ছিল মূলতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত। (১) শাস্ত্র (২) শস্ত্র। শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত-ছন্দ-জ্যোতিষ। গৌতমের ন্যায়, কপিলের

সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগ, কণাদের বৈশেষিক। বেদ-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র-সাহিত্য, চৌষট্টি কলাবিদ্যা। এছাড়াও ছিল নানান বৃত্তিমুখী শিক্ষা। এই বৃত্তিমুখী শিক্ষার উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র এবং প্রযুক্তি আর বিজ্ঞান। পারিবারিক পেশাকেও গুরুত্ব দিত এই সময়। এই শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল তৎকালীন সমাজে। Medicine এবং Surgery চিকিৎসার দুটি বিভাগই অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। প্রযুক্তি আর বিজ্ঞান এই দুটি শাখায় বিশ্বের নজর কেড়েছিল এই মহাভারতের কালে। নৃত্য, গীত, নাটক, অঙ্কন প্রভৃতি গান্ধর্ববিদ্যা এই সময় চরমোৎকর্ষতা লাভ করেছিল।

ধনুর্বিদ্যা ছাড়াও শস্ত্র বিদ্যায় গদা-মুষ্টি-তরোয়াল-বর্শা যুদ্ধচালনার অনুপুঙ্খ বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হত এই সময়। Preg-Card-এর মাধ্যমেই অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে Pregnancy Test করা হয় যার ফল জানতে অন্তত মিনিট দুয়েক সময় লাগে। প্রসুতি-র মূত্রের ঘ্রাণের মাধ্যমেই মিনিট খানেকের মধ্যে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বলে দিতেন বন্ধ্যা অথবা সন্তান প্রসবিনী কিনা। এমন সন্ধান পাই, মহা ভারতের বিরাট পর্বের নবম অধ্যায়ের ১৪ নম্বর শ্লোকে। সহদেবের সঙ্গে বিরাট রাজার পরিচয় প্রসঙ্গে মাদ্রীপুত্রের (এখানে তাঁর নাম তন্ত্রিপাল) এই গুণপনার বিষয়টি জানতে পারি—

"ঋষভানপি জানামি রাজন্ পূজিত লক্ষণান্।
যেষাং মূত্রমুপাঘ্রায় অপি বন্ধ্যা প্রসূয়তে।।"

পূর্তকর্মেও এই সময়ের যে চমৎকারিত্ব আমরা দেখতে পাই তা এ যুগেও বিস্ময়ের অবকাশ রাখে। দানব কুলের বিশ্বকর্মা ময়দানব ইন্দ্রপ্রস্থে যে সভাগার যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিয়েছিলেন তা এককথায় অনির্বচনীয়। দৈর্ঘ্যে দশ হাজার প্রস্থে দশ হাজার হাত পরিমিত এই সভাস্থান ছিল সর্বঋতুর উপযুক্ত। ময় এমন দিব্য মণিময় সভা নির্মাণ করলেন যার দীপ্তিতে যেন সূর্যের প্রভাও পরাস্ত হল। এই বিশাল সভা নবোদিত মেঘের ন্যায় আকাশ ব্যাপ্ত করে রইল। তার প্রাচীর, তোরণ ও রত্নময় অভ্যন্তর বহুবিধ দ্রব্যে ও চিত্রে সজ্জিত। কিঙ্কর নামে আট হাজার আকাশচারী মহাকায়, মহাবল রাক্ষস সেই সভা রক্ষা করত। ময়দানব সেখানে একটি অতুলনীয় সরোবর রচনা করলেন তার সোপান স্ফটিক নির্মিত। জল অতি নির্মল।

এখন আসা যাক, তদানীন্তন সমাজে শাসন ব্যবস্থা কীভাবে সাজানো হয়েছিল। ত্রিস্তরীয় শাসনব্যবস্থা বলবৎ ছিল এই সময়। সেগুলি যথাক্রমে (১) তাত্ত্বিক (২) প্রশাসনিক (৩) প্রান্তিক। তাত্ত্বিক-এর দুটি স্তর (১) নীতি প্রণয়ন (২) বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহার। নীতি প্রণয়ন-এর ২টি স্তর। (১) প্রায়োগিক (২) শৈক্ষিক। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহার-এর ২টি স্তর। (১) প্রায়োগিক (২) শৈক্ষিক। প্রশাসনিক-এর ৩টি স্তর। (১) আইনশৃঙ্খলা (২) কর ব্যবস্থা (৩) পরিষেবা। কর ব্যবস্থার দুটি স্তর (১) প্রত্যক্ষ (২) পরোক্ষ। পরিষেবা-র চারটি স্তর। (১) শিক্ষা (২) স্বাস্থ্য (৩) পূর্ত (৪) ত্রাণ। প্রান্তিক ২ টি স্তর। (১) সম্পদ সংগ্রহ (২) তৃণমূল স্তর । সম্পদ সংগ্রহ-এর ৩টি স্তর ।(১) খনিজ (২) কৃষিজ (৩) প্রাকৃতিক। তৃণমূল স্তর-এ সুষ্ঠু পরিষেবা।

আইন-শৃঙ্খলা বা Law & Order-এর বিষয়টি খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা হত।

আজকাল "Good governance" কথাটি খুবই প্রচলিত, যার অর্থ হল সুশাসন । শাসনের দুটি দিক। একটি তাত্ত্বিক দিক, অপর দিকে তত্ত্বের রূপদানের আজ্ঞাবাহী কয়েকজন রূপকার বা Executor। সমাজে কল্যাণমুখী তত্ত্বের অভাব নেই। আসল অভাব লোককল্যাণে নিবেদিত দক্ষ রূপকার (Skilled executor)-এর। তার সঙ্গে একইভাবে এসে যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Science & Technology)-র কথা। এর সঠিক প্রয়োগে একদিকে যেমন উদ্যোগের তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী উভয় ফল পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনই উদ্যোগের পিছনে ন্যূনতম খরচ, শ্রম ও সময় (Minimisation of cost–labour & time) লাগে। তাই এগুলির প্রয়োগ করা হত যেমন শিক্ষা-পাঠ্যসূচিতে ঠিক তেমনই ঔদ্যোগিক বা বাস্তবিক ক্রিয়াকলাপে।

প্রশাসনিক দিকটা পুরোটাই কেন্দ্রীয় স্তরে সামলাতেন রাজবংশীয়রা। প্রশাসনিক গতি যাতে মুখ থুবড়ে না পড়ে এবং গতি যাতে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হয় এজন্য কর (Tax) ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছিল। কারণ, কর (Tax) হল প্রশাসনের কাছে অক্সিজেনের মতো। তবে প্রজাবর্গ যাতে কর ভারে প্রপীড়িত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বার্ষিক আয়ের এক ষষ্ঠাংশ আয়কর হিসাবে ধার্য করা হত। এছাড়াও সম্পত্তি (স্থাবর-অস্থাবর) করও নেওয়া হত। সেটি অত্যন্ত নগণ্য। আর দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের থেকে কোন প্রকার কর নেওয়া হত না। অঙ্গরাজ্য, করদরাজ্যদের কাছ থেকে কর নেওয়া হত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুইভাবেই সম্পদ সংগ্রহও ছিল একটি রুটিন মাফিক কাজের আওতায়। পরিবর্তে ছিল

যোজনা বরাদ্দ। প্রয়োজন অনুসারে তা বরাদ্দ করা হত। আর ছিল পরিষেবা দান। এই তালিকায় ছিল শিক্ষা-স্বাস্থ্য -পূর্ত ও ত্রাণ। এই ব্যাপারে প্রশাসন ছিল অত্যন্ত উদার। অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুদান দেওয়া হত। প্রশাসকের আরেকটি আয়ের পথ ছিল পররাষ্ট্র আক্রমণ এবং পরাজিত রাষ্ট্রের ধন-সম্পত্তি ছিল আয়ের অন্যতম উৎস।

প্রশাসন এবং পরিষেবাকে একেবারে তৃণমূল স্তরে (Grass-root level) দেওয়ার জন্য প্রান্তিক শাসনও বলবৎ ছিল। একনজরে তা একবার দেখে নেওয়া যাক্। বলা হচ্ছে—

"গ্রাম্যসাধিপতিঃ কার্য্যো দশগ্রাম্যাস্তথা পরঃ।
দ্বিগুণায়াঃ শতস্যৈকং সহস্রস্য চ কারয়েৎ।।
যানি গ্রাম্যাণি ভোজ্যানি গ্রামিক— স্তান্যুপাশ্নিয়াৎ।
দশপস্তেন ভর্ত্তব্যস্তেনাপিদ্বিগুণাধিপঃ।

অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রামের একজন অধিপতি ছিলেন। তাঁর ওপরে দশ গ্রামের এক অধিপতি। তাঁর ওপরে বিশ গ্রামের একজন অধিপতি। এইভাবে শত গ্রামের এবং সহস্র গ্রামের এক-একজন অধিপতি থাকতেন। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ অধিকারে উৎপন্ন খাদ্যের উপযুক্ত অংশ পেতেন। রাজা নানাবিধ কর আদায় করতেন, কিন্তু করভারে প্রজাদের অবসন্ন করতেন না।

প্রজাদের ধনসম্পত্তি রক্ষাকে মহারাজ যুধিষ্ঠির কত গুরুত্ব দিতেন সেবিষয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণ ইন্দ্রপ্রস্থে এসে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, "নৃশংস নীচাশয় লোকে আমাদের গোধন হরণ করেছে। যে রাজ্য শস্যাদির ষষ্ঠ ভাগ কর। নেন অথচ প্রজাদের রক্ষা করেন না তাঁকে লোকে পাপাচারী বলে। ব্রাহ্মণের ধন চোরে নিয়ে যাচ্ছে, তার প্রতিকার কর।" অর্জুন ব্রাহ্মণদের আশ্বাস দিয়ে অস্ত্র আনতে গেলেন কিন্তু, যে গৃহে অস্ত্র ছিল সেই গৃহেই তখন দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠির বাস করছিলেন। অর্জুন সমস্যায় পড়ে ভাবলেন, যদি ব্রাহ্মণের ধনরক্ষা না করি তবে রাজা যুধিষ্ঠিরের মহা অধর্ম হবে, আর যদি নিয়মভঙ্গ করে তাঁর ঘরে যাই তবে আমাকে বনবাসে যেতে হবে। যাই হোক, আমি ধর্ম পালন করব। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের ঘরে গেলেন এবং তাঁর সম্মতিক্রমে ধনুর্বাণ নিয়ে ব্রাহ্মণদের কাছে এসে বললেন, শীঘ্র চলুন। চোরেরা দূরে যাওয়ার আগেই তাদের ধরতে হবে। অর্জুন রথারোহণে যাত্রা করে চোরদের শাস্তি দিয়ে গোধন উদ্ধার করে ব্রাহ্মণদের দিলেন এবং ফিরে এসে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমি নিয়মভঙ্গ করেছি। আজ্ঞা দিন, প্রায়শ্চিত্তের জন্য বনে যাব। যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি আমার ঘরে এসেছিলে সেজন্য আমি অসন্তুষ্ট হইনি। জ্যেষ্ঠের ঘরে কনিষ্ঠ এলে দোষ হয় না। তার বিপরীত হলেই দোষ হয়। অর্জুন বললেন, আপনাদের মুখেই শুনেছি—ধর্মাচরণে ছল করবে না। আমি আয়ুধ (অস্ত্র) স্পর্শ করে বলছি, সত্য থেকে বিচলিত হব না। তারপর অর্জুন বারো বৎসরের জন্য বনে গেলেন।

রাজার চার প্রকার মিত্র ছিল। (১) সমার্থ। অর্থাৎ যাঁর স্বার্থ রাজার স্বার্থের সমান। (২) ভজমান অর্থাৎ অনুগত। (৩) সহজ অর্থাৎ আত্মীয় (৪) কৃত্রিম অর্থাৎ অর্থ দ্বারা বশীভূত। এছাড়া রাজার পঞ্চম মিত্র হলেন ধর্মাত্মা অর্থাৎ তিনি যে পক্ষে ধর্ম দেখেন সেই পক্ষেরই সহায় হন। সংশয় স্থলে নিরপেক্ষ থাকেন। বিজয় লাভের জন্য রাজা ধর্ম ও অধর্ম দুইই অবলম্বন করতেন। আর চার প্রকার মিত্রের মধ্যে ভজমান ও সহজ-ই শ্রেষ্ঠ। অপর দুজন আশঙ্কার পাত্র। একই কার্যের জন্য দু-তিনজনকে মন্ত্রী করা হত না। কারণ, তাঁরা পরস্পরকে সইতে পারতেন না।

কোন রাজকর্মচারী যদি রাজধন চুরি করে, তবে যে লোক তা জানাবে তাকে রাজা বক্ষা করতেন। নইলে চোর রাজকর্মচারী তাকে মেরে ফেলত। যিনি লজ্জাশীল, ইন্দ্রিয় জয়ী, সত্যবাদী, সরল ও উচিতবক্তা, এমন লোকই ছিল সভাসদ হওয়ার যোগ্য। সদবংশজাত, বুদ্ধিমান, রূপবান, চতুর ও অনুরক্ত লোককে পরিজন নিযুক্ত করা হত। অপরাধীকে তার অপরাধ অনুসারে দণ্ড দেওয়া হত। ধনীর অর্থাৎ সবলের অপরাধে কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড আর দরিদ্রকে

কেবল কারাদণ্ড দেওয়া হত, তাদের অপরাধের নিরিখে। দুর্বৃত্তগণকে প্রহার করে দমন করা হত, আর সজ্জনকে মিষ্টবাক্যে এবং উপহার দিয়ে পালন করা হত। রাজা সকলেরই বিশ্বাস জন্মাতেন, কিন্তু নিজে কাউকেই বিশ্বাস করতেন না, এমনকি নিজের সন্তানকেও নয়।

যদি শত্রুর আক্রমণের ভয় উপস্থিত হয় তবে রাজা সেই ভয়ের বিষয় প্রজাদের জানিয়ে বলতেন, তোমাদের রক্ষার জন্য আমি ধন প্রার্থনা করছি। ভয় দূর হলে সেই ধন ফিরিয়ে দেব। তারাও রাজি হত। কারণ, শত্রু যদি ধন কেড়ে নেয় তাহলে তা আর ফিরে পাওয়ার আশা থাকবে না।

ক্ষত্রিয় রাজা বর্মহীন বিপক্ষকে আক্রমণ করতেন না। তিনি শঠ যোদ্ধার সঙ্গে শঠতার দ্বারা, ধার্মিক যোদ্ধার সঙ্গে ধর্মানুসারে যুদ্ধ করতেন। নিরস্ত্র বা বাহনচ্যুত শত্রুকে মারা অন্যায় বলে গণ্য হত। নিয়ম লঙ্ঘন করলে যোদ্ধা নিন্দাভাজন হতেন। স্বপক্ষ ও বিপক্ষের আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। রাত্রিকালে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে রাত্রিতেও যুদ্ধ হত। ধ্বজদণ্ড রথের ভিতর থেকে উঠত। রথী আহত হলে ধ্বজদণ্ড ধরে নিজেকে সামলাতেন। অর্জুন ও কর্ণের রথ শব্দহীন বলে বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধকালে রাজা বলতেন, "আমার লোকেরা বিপক্ষ সৈন্য বধ করছে তা আমার প্রিয়কার্য নয়। আহা, সকলেই বাঁচতে চায়।"

দেশ শাসনে রাজাদের শৈথিল্য না থাকলেও সমাজের বিশিষ্ট জনেরা এবং বিজ্ঞজনেরা যা পরামর্শ দিতেন তার বাস্তবায়ন করতে তাঁদের কুণ্ঠাবোধ করতে দেখা যায়নি। এমন একটি ঘটনার উল্লেখ সভাপর্বে—

একদিন দেবর্ষি নারদ, পারিজাত, রৈবত, সুমুখ ও সৌম্য এলেন যুধিষ্ঠিরের রাজসভায়। রাজকীয় অভ্যর্থনার পর নারদ প্রশ্নচ্ছলে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, বীর, বুদ্ধিমান, পবিত্রস্বভাব, সদবংশজাত ও অনুরক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতি করবে। পররাষ্ট্র জয় করে যে ধন-রত্ন পাওয়া যাবে তার ভাগ প্রধান যোদ্ধাদের যোগ্যতা অনুসারে দেবে। সৈন্যগণকে যথাকালে খাদ্য ও বেতন দেবে। তোমার যা আয় তার অর্ধেক বা একতৃতীয়াংশ বা একচতুর্থাংশে নিজের ব্যয় নির্বাহ করবে। গণক অর্থাৎ Accountant ও লেখক অর্থাৎ করণিক (Clerk) ও নিরীক্ষক অর্থাৎ Auditor প্রত্যহ পূর্বাহ্নে তোমাকে আয়-ব্যয়ের হিসাব দেবে। লোভী, চোর, বিদ্বেষী আর অল্পবয়স্ক লোককে কাজের ভার দেবে না। তোমার দেশে যেন বড়ো বড়ো জলপূর্ণ তড়াগ অর্থাৎ পুষ্করিণী থাকে, যাতে কৃষি যেন কেবল বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল না হয়। কৃষকদের যেন বীজ আর খাদ্যের অভাব না হয়। তারা যেন অল্প সুদে ঋণ পায়। নারীরা যেন যথাযোগ্য সম্মান পায়। মিষ্ট বাক্যে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। কিন্তু গোপনীয় বিষয় তাদের বলবে না। ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে বিবাদ হলে বিচারকরা যেন উৎকোচ বা ঘুষ নিয়ে অন্যায় বিচার না করেন। অন্ধ-মূক-পঙ্গু ও ভিক্ষুদের পিতার ন্যায় পালন করবে। নিদ্রা-আলস্য- ভয়-ক্রোধ- মৃদুতা ও দীর্ঘসূত্রিতা এই ছয় দোষ পরিহার করবে।

চার প্রকার বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতের কালে। স্বভাব-চরিত্র-কুল ও কার্য দেখে গুণবান পাত্রে কন্যাদানকে "ব্রাহ্মবিবাহ"। বর-কন্যার পরস্পরের ইচ্ছায় বিবাহকে "গন্ধর্ব-বিবাহ"। ধন দিয়ে কন্যা ক্রয় করে বিবাহকে "আসুরবিবাহ" এবং আত্মীয়বর্গকে হত্যা করে কান্নায় ভেঙে পড়া কন্যার বিবাহকে "রাক্ষসবিবাহ" বলা হয়। কন্যা ও পুত্রেরসমান অধিকার, পৈতৃক সম্পত্তিতে। অপুত্রক ব্যক্তির দৌহিত্র পুত্রের সমান অধিকারী।

বংশরক্ষা তথা দেশরক্ষার তাগিদে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন। বংশরক্ষা হল বড়ো বালাই। আবার যেখানে দেশের ভাবী শাসনকর্তার বিষয়টিও একই সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তখন "ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন" নামক অতি স্পর্শকাতর বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে হাজির হত মহাভারতের কালে। তবে এই হাজির হওয়া কিন্তু ধারাবাহিক ছিল না। বিক্ষিপ্ত এই ঘটনাটি ঘটত কালে-ভদ্রে, কচিৎ বা কদাচিৎ। মূলত রাজপরিবারের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল। রাজতন্ত্রে এই প্রথা ছিল স্বীকৃত। কারণ,রাজপ্রতিনিধি দিয়ে রাজ্যপাট বেশিদিন চালানো সম্ভব নয়। তাই এই প্রথার প্রচলন আপৎকালীন আবশ্যিক ছিল তৎকালীন সমাজে।

এখন আসা যাক, মহাভারতের কালে খাদ্যাভ্যাসের কথায়, শতাংশের হিসেবে নিরামিষাশীর সংখ্যাটা ছিল বেশি। তবে অঞ্চল ভেদে আমিষাশীর পাল্লাটাও ভারী ছিল। আনাজের তালিকায় ছিল —রাঙালু, কুমড়ো, চালকুমড়া, লাউ, বেগুন, পটল, মূলো, শিম, ইত্যাদি। শাকের তালিকায় পাওয়া যায়—শুসনি, কলমি, পুঁই, হেলেঞ্চা, কুলেখাড়া, ব্রাহ্মী, নিম ইত্যাদি। কলা, বেল, তাল, কুল, নারিকেল, সুপারি, হরীতকী, বহেড়া, আমলকি, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বাতাবি, বেদানা ইত্যাদি ছিল ফলের তালিকায়। মশলার তালিকায় ছিল—সাদা সর্ষে, তিল, লবঙ্গ, এলাচ দারুচিনি, হলুদ, পিপুল ইত্যাদি। দানা শস্যের তালিকায় ছিল—মুগ, মাষ, যব, গম, ধান, তিল, ছোলা, মটর, বরবটি বীজ প্রভৃতি।

ভাত খাওয়ার প্রচলন ছিল। তবে তা গম ও গম জাত (আটা) খাবার খাওয়া মানুষের তুলনায় কম। মূলত তিল থেকে তেল প্রস্তুত হত। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত আর যা কিছু হয়, তা সবকিছুই খেত একালের মানুষেরা। মাছের তালিকায় ছিল —রুই, মাগুর, বোয়াল, শোল,পাঁকাল, পুঁটি আর যা কিছু সামুদ্রিক মাছ। মাংসের তালিকায় ছিল— ছাগল, হরিণ, মোষ, কচ্ছপ এছাড়াও ছিল শিকার করা বনের নানারকম পাখির মংস। তবে আগুনে ঝলসানো মাংস খাওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে এ যুগে। দ্রৌপদী ছিলেন অত্যন্ত বড়ো মাপের রাঁধুনি। বনবাস কালে সূর্যদেব তাঁকে স্থালী (আজকের ভাষায় প্রেসার কুকার) দিয়েছিলেন, যেটি অল্পসময়ে অল্প আঁচে সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করত। তবে কুন্তীও এবিষয়ে পিছিয়ে ছিলেন না।

এ সময়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল "শূদ্র জাগরণ"। শুধু বাক স্বাধীনতা নয়, শূদ্র দেশ শাসনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করল। একেবারে নিয়ামকের ভূমিকায় Damage controller হিসাবে বারে বারে মহাত্মা বিদুরের অবতীর্ণ হওয়া সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার এই কালই যুগপৎ কুরুবংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, ভীষ্ম ও বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য, দ্রৌপদীর দৃঢ়তা,ব্যাসদেবের মাহাত্ম্য। পাণ্ডবগণের বিবাদের আয়তন বৃহৎ হতে পারে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, কিন্তু বিবাদের স্বরূপ বা প্রকৃতি প্রায় একই রকম থাকে সর্বত্র। সেই স্বার্থপরতা, সেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনাচিন্তা, সেই লোভ, সেই ক্ষমতালিপ্সা। এ থেকে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, রাজা-প্রজা এমনকি নিকটবর্তী দুটি রাজ্যের মুক্তি নেই। পরোক্ষভাবে দূরবর্তী রাষ্ট্রেরও প্রভাব থাকতে পারে। সমস্যার মূলে রয়েছে একক মানবচরিত্রের নৈতিক মান, মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার। সমস্যা মাত্রই তার দুটি আকার আছে। একটি সূক্ষ্মাকার, অপরটি বৃহদাকার। সমস্যার মূলে থাকে সূক্ষ্ম আকারটি। আর যৌথ বা সম্মিলিত রূপ যা আকার ও আয়তনে অতিবৃহৎ, কিন্তু তার কেন্দ্রবিন্দুতে বীজাকারে সূক্ষ্ম রূপটি বর্তমান থাকে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমাজের সমস্যার প্রাণস্পন্দনটি অনুভব করতেন। এই অনুভূতি থেকে আদর্শ সমাজ গঠনে তাঁর মনোনিবেশ। যা মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত গীতা'র এক থেকে আঠারো অধ্যায়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি আদর্শ সমাজগঠনের জন্য নিদান দিলেন—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।

অর্থাৎ তোমরা দেবগণের সম্বর্ধনা কর আর দেবগণও তাঁদের কর্তব্য দ্বারা তোমাদের মানোন্নয়ন করুন। এইভাবে পরস্পরের সম্বর্ধনার দ্বারা তোমরা পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। ভগবান এখানে "দেবান্" অর্থাৎ, "দেব" শব্দটি উপলক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এটি গুণবাচক শব্দ, জাতিবাচক নয়। এই পদটির দ্বারা মানুষ, দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ ইত্যাদি সমস্ত প্রাণীদেরই বুঝতে হবে।

মহাভারতে বলা হচ্ছে—
তৃণাসনভূমিরুদকং মধুরবাক্যঞ্চ দেয়ম্।
গৃহমাগতস্যাতিথের্সৎকার এষ এব সনাতনঃ।।

অর্থাৎ, তৃণাসন, ভূমি, জল, মধুরবাক্য—

অতিথি দেখলে ব্যাজার অর্থাৎ বিরক্ত না হয়ে এই চার বস্তুর মাধ্যমে অতিথি আপ্যায়ন করতে হবে। আর্তকে সেবা, শ্রান্তকে আসন, ক্ষুধিতকে আহার আর তৃষিতকে জল গৃহস্থের এই আচরণই পরম ধর্ম। এই প্রবাদে নির্দিষ্ট আচরণবিধিকে ভর করে আড়ে-বহরে বেড়ে উঠেছিল মহাভারতের কাল। সমাজের ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান ছিল পরিবার। একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে তাই পরিবার ধরেই এগোত সমাজগঠনের কাজ। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। আবার সমাজগঠনের একক হল মানুষ । মানবচরিত্র গঠিত হলে সমাজ গঠনের কাজটি ত্বরান্বিত হয়। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের চরিত্রকে গড়ে তোলে। মনুষত্বের উন্মেষ ঘটায়। তার মধ্যে জাগিয়ে তোলে মূল্যবোধ ও আত্মবিশ্বাস। এইগুলিই পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মনে গেঁথে দিতে পারলেই সকল সমস্যা তুলোর পাহাড়ের মতো উড়ে যাবে। তখন ব্যক্তি জীবনে স্বার্থপরতার আকর্ষণ উপেক্ষা করে পারিবারিক ও সমাজ জীবনের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার প্রেরণা লাভ করবে। আর এইভাবে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে একটি জীবন থেকে আরো আরো বহু জীবনে। এই পথে গড়ে উঠবে সুন্দর মানুষের একটি সুন্দরতর সমাজ। ক্ষুধাহীন, দারিদ্র্যহীন, শোষণহীন মহাভারতীয় সমাজগঠন ছিল সেকালের শাসকবর্গের আকাঙ্ক্ষা। ❖

তথ্যসূত্র হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশসম্পাদিত মহাভারত, সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়, কলকাতা।

লেখক—সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা আকাদেমি-র অধ্যক্ষ।

সম্পূর্ণ উপন্যাস
যোনিকীট
সর্বাণী মুখোপাধ্যায়
ছবি : রঞ্জন দত্ত

১

জনপদসখা

আঙুলে চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের আটতলা থেকে দামাল পায়ে টকাটক নেমে আসছিল ছ-ফুট দু-ইঞ্চি কাঠামোর লম্বা শরীরের ছেলেটা। 'ছেলে' বলা কি ঠিক হল? যার বয়েস এখন বত্রিশ বছর চার মাস! বত্রিশ বছরের দীর্ঘদেহী, শক্তপোক্ত, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের এমন একজনকে কি 'ছেলে' তকমা দিয়ে বালখিল্য গোছের করে দেওয়া যায়? বিশেষ করে একে! আটতলা থেকে একশো কুড়িটা সিঁড়ি অনায়াস পদক্ষেপে দল্‌তে দল্‌তে যে অতি স্মার্টলি দাপিয়ে নেমে আসছে? উঁচু তলায় উঠতে হলে লিফ্‌ট ব্যবহার করে। কিন্তু কাজ সেরে নেমে আসার সময় ইচ্ছে করেই লিফ্‌ট নেয় না। সিঁড়ি ভেঙে টকটকিয়ে নামাটা এসব সময়ে টনিকের কাজ করে। ঝিমিয়ে আসা শ্রান্ত শরীরটাকে চাঙ্গা করে তোলে। মনটাও কেমন এক বিজয়গর্বে চনচনে হয়ে ওঠে প্রতিপক্ষকে মাড়িয়ে যাওয়ার উল্লাসে। যদিও সব কাজের জায়গায় এতগুলো করে সিঁড়ি থাকে না। বাংলো, কটেজ, কি গ্রাউন্ড-ফ্লোর ফ্ল্যাট বা রুম হলে তো একেবারেই না। সেগুলো আগে থেকেই জানা থাকে। তাই এসব ক্ষেত্রে কর্মসমাধার পরের পর্বের জন্য তৈরি হয়েই আসে। তখন হাঁটে। লম্বা লম্বা পায়ে মাটি মাড়াতে মাড়াতে অনেকখানি হেঁটে নিয়ে শরীরকে ঝরঝরে করে মনকে ফুরফুরে করে সুরক্ষিত জায়গায় পার্ক করে রাখা বাইকে স্টার্ট দেয়। দ্বিতীয়ার কাস্তেফালি চাঁদের ধারালো হাসি চলকায় তার চোখে, মুখে, ঠোঁটে। আদরের একটা জবরদস্ত চাপড় দেয় বাইকে। চাবি দিয়ে লাগাম পরায়। লাফ দিয়ে উঠে সওয়ারি হয় তার পিঠে। হুকুম দেয়—"চল্‌ চৈতন!"...দ্বাদশ শতকের বীর রাজপুত রাজা 'রায় পিথোরা'—মহাবলী প্রেমিক রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের অতি বিশ্বস্ত দ্রুতগামী অশ্ব 'চৈতনা'র মতোই বাতাসে ঝড় তুলে সগর্জনে ছুটে চলে প্রায় ন-লাখ টাকার কুচকুচে তেল পিছলানো বাইক 'কাওয়াসাকি'। তার পিঠের আরোহী এ কালের 'পৃথ্বীরাজ' অকারণে হঠাৎই কেমন আতুর হয়ে ওঠে! তার বুকের ভেতর থেকে ইদানীং এক হু হু করা অদ্ভুত তেষ্টায় কেউ যেন ডাক দেয়—'চৈতন, চৈতন, আমার 'সংযুক্তা' কই?'

উত্তর মেলে না। জবাব দেয় না মহাবীর ক্ষত্রিয় রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের জীবনসাথী-মরণসাথী মহাতেজী অশ্বশ্রেষ্ঠ ঘোড়া চৈতনা—অনঙ্গদেবের দামি বাইক 'কাওয়াসাকি Z900'। চৈতনার মতোই তার মালিকের আঙুলের চাপে প্রভুর মর্জির নিশানা মাফিক ছুটে চলে দুরন্ত গতিতে। মহাবেগ অশ্বখুরের মতো তার চাকার তীব্র সঞ্চালনে, সাঁই সাঁই বাতাস-কাটা শব্দভেদী বাণের অমোঘ লক্ষ্যে, বড় আচমকা অনঙ্গের কানের পর্দা ভেদ করে ছিন্নভিন্ন করে দিতে থাকে দুটি জ্বলন্ত লৌহশলাকা---'ভ্যাজাইনাল ওয়ার্ম্‌! ভ্যাজাইনাল ওয়ার্ম্‌!'..মুহূর্তে ঢিলে হয়ে আসে দৃপ্ত বজ্রমুঠি। অজান্তেই শ্লথ হয় 'চৈতনা-কাওয়াসাকি'র দুরন্ত স্পিড। অসহ্য জ্বালায় পুড়তে পুড়তে নিষ্ফল আক্রোশে দাঁতে দাঁত ঘষে অনঙ্গ। সেই ঘর্ষণের ফুলকি বিষাক্ত ছোবলের হিস্‌হিসে গরলে আক্ষরিক অনুবাদে অস্ফুটে উচ্চারণ করে---'যোনিকীট! যোনিকীট!'—

মায়ের সাধ করে রাখা 'পৃথ্বীরাজ' নামকরণের নবীকরণ 'অনঙ্গদেব' নামটা অনেক ভেবেচিন্তে নিজের পেশার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ও নিজে-নিজেই রেখেছে। কাম ও প্রেমের দেবতা কিউপিড বা কামদেবের আরেক নাম অনঙ্গ। 'ফোরপ্লে'—অর্থাৎ কামকেলি, রতিকলা, শৃঙ্গার এবং মৈথুন—এমন আসঙ্গলিপ্সা ও যৌনতার অধীশ্বর যখন, তখন 'দেব' শব্দটা নামের সঙ্গে বসবে বইকি! ওটা অলঙ্কারের মতোই একেবারে খাপে খাপে এঁটে যাওয়া মানানসই। কে বলে পুরুষের গয়না লাগে না? সাজ লাগে না? বরাবরই লাগত, এখনো লাগে। পুরুষদের, বিশেষ করে ওর মতো পুরুষমানুষের 'দেহপট'ই তো সব! সাজসজ্জাই হোক, কি গয়নাই হোক, ওর এই দেহপটের ভেতর-বার জুড়ে কত রকমের আর কত কায়দার যে 'অলঙ্কার' আছে, তা কি কেউ জানে? ওকে দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারবে?' যদিও নাট্যসম্রাট গিরিশ ঘোষের বিখ্যাত উক্তি 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়'— কথাটা ওর বা ওর মতন পুরুষমানুষের ক্ষেত্রে খাটে না। কারণ, ও 'নট' নয়! ওর পেশা 'অভিনয়' নয়! ও অভিনয় করে না। ও বা ওর মতো যারা, তাদের অভিনয় করলে চলে না। অথচ ও এবং ওর মতো ওরাও 'পারফর্ম' করে! বাস্তব জীবনের আসল রঙ্গমঞ্চে কঠোরভাবে পারফর্ম করে পেশাগত দক্ষতায়।

—ও তাই 'অনঙ্গ' হয়েছে।

—অনঙ্গর সঙ্গে 'দেব' অলঙ্কার জুড়ে 'অনঙ্গদেব'।

—পৃথ্বীরাজ 'চৌহান' নয়—পৃথ্বীরাজ পালিতকে কামাগ্নিতে পূর্ণ আহুতি দিয়ে তার ভস্ম থেকে ফিনিক্স পাখির মতো যে স্বেচ্ছায় উঠে এসেছে 'অনঙ্গদেব' হয়ে মাত্র উনিশ বছর বয়সে,—বত্রিশটা বছর পার করে দিয়ে তার এখন এ নিয়ে ভাবালু হয়ে পড়া মানায় না।...আত্মস্থ হয়ে সচেতন হয় ও। নিজেকে চাবকে শাসন করে মনে মনে। ঢিলে হওয়া মুঠো ফের শক্ত করে বাইকে ম্যাক্সিমাম স্পিড তোলে। নিমেষে ভয়াল ঝড়ের বেগে মারাত্মক গতিতে ছুটতে থাকে 'চৈতন'—আধুনিক মডেলের 'কাওয়াসাকি Z900'—যার সওয়ারি এখন কামদেব কিউপিড স্বয়ং! মধুরাজ অনঙ্গ---মধুদীপ অনঙ্গদেব—পৃথ্বীরাজ পালিত নয়!

বাইকে সওয়ার ছ-ফুট দু-ইঞ্চির টানটান মজবুত শরীর থেকে ঠিকরে পড়ছিল এক হিলহিলে সরীসৃপ আকর্ষণ! যেমনই তীব্র জৈবিক, তেমনই ভয়ংকর জ্যান্ত! তার অদৃশ্য অজগর-প্যাঁচ পাকে পাকে জড়িয়ে নেয় মারাত্মক সম্মোহনে—নারী-পুরুষ নির্বিশেষে! অসহায় হরিণশিশুর মতো তারা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে নিরুপায় টানে।...ক্রূর হাসি খেলে অনঙ্গদেবের পুরু রসালো ঠোঁটে। ও খুব ভালো করেই জানে ওর এই বিশেষ 'কোয়ালিটি'র কথা। জানে, এই অতি বিশিষ্ট ক্ষমতা ওর জন্মায়ত্ত। এই গূঢ় সত্যিটা ও সচেতনে প্রথম টের পেয়েছে বয়েস যখন মাত্র আঠেরো প্লাস, সবে আঠেরো পুরে উনিশে পা! এরপর যতো দিন গেছে, যতো বড়ো হয়েছে বয়সের হিসেবে, আর যতো বাড়বাড়ন্ত হয়েছে শরীরটার, ততো নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছে। নিজের দেহ দিয়ে অনুভব করেছে। আর তখন থেকেই এতে শাণ দিয়ে দিয়ে ধারালো থেকে নিজেকে আরও ধারালো করে তুলেছে। এ নিয়ে চর্চা করেছে, বিদ্যার্থীর নিষ্ঠায় পড়াশোনা করেছে রীতিমতো!

সফ্‌ট পর্নো, পর্নো লিটারেচর থেকে কামশাস্ত্র—বাৎসায়নের 'কামসূত্র'! কামসূত্রের প্রতিটা অধ্যায় ওর খুঁটিয়ে পড়া! কামের চৌষট্টি কলা বা 'চৌষট্টি সমাগম' ও আত্মস্থ করেছে! অধিগত করেছে এর 'প্রয়োগ'! নানাভাবে নিরলস পরিশ্রম আর নিজেকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে করে একে কুক্ষিগত করেছে অমোঘ অস্ত্রের মতো। এই আয়ুধ ওর শরীর—ওর রক্ত-মাংস-বীর্যের পুরুষদেহ।

নিজের মনেই হাসতে হাসতে দুর্দম স্পিডে প্রায় উড়ে চলছিল অনঙ্গ। এই হাসি ওর নিজের ওপর অবিচল আস্থার এবং আত্মবিশ্বাসের গভীর প্রত্যয় থেকে উঠে আসা।—ক'জন জানে কামশাস্ত্রজ্ঞ বাৎসায়নের আসল নাম?—নিজেকেই প্রশ্ন করে ও।—ক'জন জানে এটা তাঁর গোত্র বা পদবিমাত্র? ক'জন বলতে পারবে তাঁর প্রকৃত নাম হল মল্লনাগ? মল্লনাগ বাৎসায়ন!...বাইকে তুফান তুলে ছোটে অনঙ্গ, আরও চওড়া হতে থাকে গর্বের হাসি। কারণ, এটা বিলক্ষণ জানে যে পুরুষের ক্লাসিকাল সৌন্দর্যের বিচারে ও মোটেও গ্রিক-দেবতার মতো রূপবান নয়! কোনোমতেই নয় হ্যান্ডসাম বা প্রিন্স্-চার্মিং! এমনকি সুপুরুষও নয়! বরং ঠিক তার উলটো, আশ্চর্যরকমের বৈপরীত্যের খুঁতে ভরা। কিন্তু তবু ওর মধ্যে যেটা আছে, সেটা অন্যদের মধ্যে নেই। এর না আছে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা, বা না আছে কোনো ব্যাখ্যা। এ এক দুর্মর জৈবিক লিপ্সা—আগুনের প্রতি পতঙ্গের অমোঘ অব্যর্থ আকর্ষণ!

...নিজের শরীরটাকে অণু অণু করে জানে অনঙ্গ, তিল তিল করে চেনে। ছিপছিপে নির্মেদ, চ্যাটালো চ্যাপ্টা হাড়ের শক্তপোক্ত মজবুত দীর্ঘকায় শরীর। টগবগে বলিষ্ঠ চলাফেরা। কালচে তামাটে গায়ের রঙে আলো পিছলানো চমক। ছোটোর ওপর একটু ঠেলে বেরোনো সামান্য উঁচু কপালের ধার ঘেঁষে গুলি পাকানো একমাথা কালো কোঁকড়া নিগ্রোচুল। তাতে উজ্জ্বল সোনালি হাইলাইট টাচ। চকচকে কালচে তামাটে কপাল জুড়ে ঘন অগোছালো মোটা মোটা জোড়া ভুরু। বাঁকা বাঁকা ঠাসবুনোট আঁখিপল্লবের ঘেরে সাধারণ মাঝারি আকারের চোখ। কিন্তু বড় বিচিত্র ওই চোখের মণি। পাতলা কাচের মতো নাজুক, স্বচ্ছ, হালকা-খয়েরি দুই অক্ষিগোলকের মধ্যে ঘোর কৃষ্ণনীল দুটি তীব্র জ্বলন্ত বিন্দু! একটানা তাকিয়ে থাকা যায় না চোখে চোখ রেখে! গাঢ় নীলাভ-কালো রশ্মি বিচ্ছুরিত দুই কনীনিকা তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা হয়ে আমূল এসে হৃদয়ে বেঁধে! ধরাশায়ী হতে হতে আক্রান্ত হৃৎপিণ্ড খাবি খাওয়া ধকধকানিতে জানান দেয়—'এ মরণে বড় সুখ!'...গালের কিঞ্চিৎ উজিয়ে ওঠা দুই হনুর মাঝে ঈষৎ ভারী নাক। তার নীচে ঠস্‌ঠসে পুরু দুখানা ঠোঁট—কিউপিডের ধনুক শেপ-এ ঢেউ খেলানো। এবং অতি পুরুষ্টু ওই অধর-ওষ্ঠের বর্ণ ওর চকচকে কালচে-তামাটে গায়ের রঙের সঙ্গে বিসদৃশ কনট্রাস্টে ঘোর গোলাপি, ডালিমরঙা! দেখলেই কেমন গা শিরশির করে ওঠে। কিন্তু এর আগ্রাসী টানে ধরা না দিয়ে নিস্তার নেই প্রতিপক্ষের!

আঠারো পুরে উনিশে পা—তখন থেকে আজকের বত্রিশ বছর চার মাস পর্যন্ত এই সত্যিটা খুব ভালোভাবে যাচাই করা হয়ে গেছে অনঙ্গর। বোঝা হয়ে গেছে, প্রত্যেকটা অসম খুঁত ওর চেহারায় বিপরীত রাজযোগের মতো কাজ করে। তাই বারবার করে ফাঁসে ওর প্রতিপক্ষরা। স্বেচ্ছায় উদ্গ্রীব হয়ে গলা বাড়িয়ে দেয় তারা। জেন্ডার অর্থাৎ লিঙ্গবিচারে ওর এই প্রতিপক্ষরা সবাই নারী—বয়েস, চেহারা, জাত, ধর্ম, জীবিকা নির্বিশেষে। এদের সঙ্গে অলিখিত শর্ত বা বোঝাপড়া কেবল একটাই—টাকা! এরা টাকার অঙ্কে অনঙ্গকে মিটিয়ে দেয় তাদের শরীর-সুখের দাম। পূর্ণ রতিক্রিয়া এবং যৌন-সঙ্গম শেষে অনঙ্গদেব এদের থেকে কড়ায়গণ্ডায় তুলে নেয় দেহসম্ভোগের মূল্য। ক্যাশটাকায়, হাতে হাতে। 'বার্টার সিস্টেম'-এর বিনিময় প্রথায় অনঙ্গদেব নারীকে বিক্রি করে তার সুগঠিত পুরুষ-শরীর। তার সবল-সমর্থ দেহ নিঙড়ে নানাভাবে রতিসুখ কেনে, যৌনক্ষুধা মেটায় আর্থিক সামর্থ্যে বলীয়ান নারী। 'ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই'—'লেন এবং দেন'-এর আবহমান 'বেসিক স্ট্রাকচার' বা মূল কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে চলে আসছে ফ্লেশ-ট্রেডিং'-এর যে আদিতম আদিম বাণিজ্য দেহব্যবসা—তার ক্রেতা এখানে নারী। পুরুষ এখানে পণ্য, ভোগের বস্তু।

এবং!—

এই দেহব্যবসায়ে অনঙ্গদেব এখনকার নামকরা, অত্যন্ত চড়া দামের 'জিগোলো'—হাইলি কস্টলি মেল-প্রস্টিটিউট—পুরুষ বেশ্যা। জনপদবধূ নয়,—জনপদসখা।

—"লে, রাখ্ লে"....

সরিতার হাতে তাসের পাত্তির মতো সাজানো দশটা কড়কড়ে একশো টাকার নোট! হাতপাখার স্টাইলে ওগুলো দিয়ে ওর গালে-মুখে বাতাস করতে করতে হাসছে আর জবরদস্তি করছে—"লে, লে! রাখ্ লে!..."

হতভম্ব ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। এখনো ওর বোধে কুলিয়ে উঠতে পারছে না যে খানিক আগে এই ঘরে যা ঘটে গেল, সেটা কি সত্যি? নাকি ঘোরতর কোনো দুঃস্বপ্ন যা ও জেগে জেগেই দেখছে! সেই মুহূর্তে ওর মুখের ওপর ঠাস্ করে হাজার টাকার ঝাপ্টা। নোটগুলো দিয়ে আরও দুটো ঝাপ্টা মেরে সরিতা তার খস্‌খসে হাস্কি স্বরে এবার খাঁটি বাংলায় বলে উঠল—"কী হল? টাকাটা নিচ্ছিস না কেন? এতক্ষণ ধরে গায়ে খেটেছিস, লেবার দিয়েছিস, এটা তার দাম—তোর রোজগার...নে! ধর্! হাঁদার মতো চেয়ে না থেকে নে এটা!"

দাবড়ানি সত্ত্বেও হাত পেতে টাকাটা নিতে পারছিল না ও। মাথাও কাজ করছিল না। অসাড় হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল আর শুনছিল ওর এতদিনের চেনাজানা মহিলা এক্কেবারে অচেনা হয়ে গিয়ে কেমন অনায়াসে বলে চলেছে—"এমনি এমনি কেউ কিচ্ছু দেয় না রে বোকা ছেলে! তুই-ই বা দিবি কেন, আর আমিই বা নেব কেন? আমিও নেব না, তুইও দিবি না।"...মুখের ওপর হাজার টাকার নোটের বাতাস, আর কানের লতিতে ঠোঁট লাগিয়ে তপ্ত নিঃশ্বাসে ওকে পুড়িয়ে দিতে দিতে খসখসে দানাদার গলা কাচভাঙা ঝিনঝিনে হাসিতে টুকরো টুকরো হয়ে ওকে বিঁধছিল। সেই সঙ্গে—"প্রথমবার বলে আজকে টাকা নিতে প্রবলেম হচ্ছে, পরে হবে না। আস্তে আস্তে সব শিখে যাবি। আমি আবার আসব..."

টাকাগুলো বালিশের তলায় চাপা দিয়ে রাখল। এবার শ্লথ হাতে টেনে নিয়েছে বিছানায় পড়ে থাকা কাশ্মীরি ড্রেসিং-গাউন। শরীরে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে ঝঙ্কার তুলে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল। ওর বিস্ফারিত চোখের সামনে ঢেউ তুলে দুলে উঠল সম্পূর্ণ নিরাবরণ নগ্ন নারীদেহ।

ঈষৎ ভারী, মাংসল শরীর। যে শরীর নিজের ইচ্ছেমতো ওকে নিয়ে এতক্ষণ ধরে ছিনিমিনি খেলেছে। নিপুণ হাতে খেলিয়েছে ওকেও। যে খেলার প্রত্যেকটা চাল আর গতিবিধির লাগাম ছিল তার নিজের কব্জায়। ধুরন্ধর জকির দক্ষ চালনায় একেবারে তুঙ্গ মুহূর্তে হঠাৎই আলগা করে নিয়েছে স্থূল দুই জঙ্ঘার প্রবল চাপ। নিমেষে ফেনিল উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছে ও তুমুল ভাবে। ওর আচমকা জাগিয়ে তোলা শক্ত পৌরুষ ভলকে ভলকে ঢেলে দিয়েছে তপ্ত লাভাস্রোতের মতো সমস্ত তরল। শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত নিঃশেষে খরচা করে ক্ষরণের অসহ্য আরাম আর বিবশ স্খলনে জান্তব শীৎকারে গুঙিয়েছে। জল ঝরেছে চোখ থেকে, লালা গড়িয়েছে কষ বেয়ে, চারপেয়ে আহত জানোয়ারের মতোই মুখ থুবড়ে ধসে পড়েছিল পৃথুল দুটো বুকের ওপর।...হাসছিল ওই বুকের মালিক। ওর নীচে নিজের নরম মোটা শরীরটা বিছিয়ে দিয়ে হাসছিল সরিতা চাড্ডা। হালকা হাতে চুলের মুঠি ধরে ওর মাথাটা তুলে নিয়ে আদরের ঝাঁকি দিতে দিতে কুলকুল হাসিতে জানান দিয়েছিল—''অ্যায়সাই হোতা হ্যায়...পহেলি বার...''

কথাগুলো কানে ঢুকলেও মগজে ঢুকছিল না। ওকে ধাক্কা মেরে নিজের ওপর থেকে ঠেলে ফেলে উঠে বসে সরিতা তেমনি কুলকুল করে ঝরনা হেসে জিজ্ঞেস করেছিল গোদা বাংলায়—''কি রে, ঠিক বলেছি তো—'পহেলিবার?'...''

নির্জীব দেহমনে অসাড় হয়ে বিছানায় পড়েছিল ও। জবাব দেয়নি। কিন্তু এইবার একটু একটু করে সাড় ফিরে আসতে লাগল। সিঙ্গল-বেড খাটে তেমনি উপুড় হয়ে পড়ে থেকেই এবার ও আস্তে আস্তে ভাবতে পারছিল—ঠিকই! 'এটা' তো অগুন্তিবার হয়েছে! এ পর্যন্ত নিজেকে নিজে কতবার যে 'খালি' করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু 'এইভাবে' এই প্রথম—'পহেলিবার'! এমন বিষাক্ত আরাম, এই পহেলিবার! এমন জৈবিক সুখ, এই পহেলিবার! এমন শরীরী উল্লাস, এই পহেলিবার! যেটার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না ঘটার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত...

ঘড়ঘড়ে জান্তব গোঙানিতে নিজের অজান্তেই গুঙিয়ে ডেকে উঠল—''সরিতা আন্টি!...''

ঘুরে দাঁড়াল সম্পূর্ণ নগ্ন সরিতা চাড্ডা। ড্রেসিং-গাউন হাতে এগিয়ে আসতে লাগল। চোখে-মুখে-ঠোঁটে চটুল হাসি। সেই হাসির ইলেকট্রিক শক্-এ ঝনঝনিয়ে উঠল ওর আপাদমস্তক! পায়ের নখ থেকে মাথার চুলের ডগা পর্যন্ত তীব্র শিহরনের পর শিহরন!...নজর এড়াল না সরিতার অভিজ্ঞ চোখে। ড্রেসিং-গাউন ছুড়ে ফেলল মাটিতে। ফের বিছানায় উঠে হাতের এক ঝাপটায় চিত করল ওকে। ওর গায়ের সঙ্গে নিজেকে ঠুসে আধশোয়া হয়ে বালিশের তলা থেকে বের করে আনল একশো টাকার নোটগুলো। ফের তাসের মতো সাজিয়ে হাজার টাকা দিয়ে এক এক করে বুলিয়ে যেতে লাগল পুরুষদেহের স্পর্শকাতর জায়গাগুলো—চোখের পাতা, কানের লতি, ঠোঁট, গলা, বুক, বুকের বৃন্ত, নাভিমূল, জঙ্ঘা, শিশ্ন, জননকোষ! অভিজ্ঞ হাতে অভিনব পদ্ধতিতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আবারও জাগিয়ে তুলছিল ন্যাতানো শরীর। আবারও শিউরে উঠল ও। ব্যভিচারী সুখে, অবৈধ উল্লাসে ফের থরথরিয়ে উঠল ফনফনিয়ে সা-জোয়ান হয়ে উঠতে থাকা বাড়ন্ত গড়নের তাজা দেহ। নিমেষে ঘুরে গিয়ে হ্যাঁচকা টানে টেনে নিল সরিতাকে। সদ্য নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানো যে নারী চটুল হেসে টাকার ছোঁয়া দিয়ে দিয়ে ওকে খেলাচ্ছে,—আগ্রাসী ক্ষুধায় তাকে পিষে ফেলে, ছিঁড়েখুঁড়ে, তার অভ্যন্তরের গোপনতম তপ্ত পিচ্ছিল গুহায় আবারও প্রবেশ করতে চাইল। প্রথমবার নিপুণ হাতে ওকে চালনা করে পথ দেখিয়ে যেখানে নিয়ে গিয়েছিল ওর প্রথম সম্ভোগ-দোসর, এবার নিজেই সেই গুহামুখে অনায়াসে পৌঁছে গেল। কিন্তু পারল না। একেবারে চরম মুহূর্তে ওকে বাধা দিয়ে থামিয়েছে সরিতা! তার চোখে-মুখে-ঠোঁটে ছুরির ফলার ধারালো হাসি—''বঢ়িয়া! কেয়াবাৎ! পহেলিবারেই এতটা! ঠিকই ধরেছি। ইস্ মাম্‌লে মে মেরা সোচ্ কভী গলৎ নঁহী হোতা।...লেকিন বাস্। আজ আর না—''

শক্ত কঠিন দুটো হাতের ধাক্কায় ওকে ঠেলে সরাল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাক খেয়ে নেমে গেল খাট থেকে। মার খাওয়া জান্তব গোঙানিতে ডেকে উঠল আতপ্ত গনগনে আর ফের দৃঢ় হয়ে ওঠা ছেলেটা—''সরিতা আন্টি!''

'ছেলে' নয়—ছেলে থেকে সদ্য 'পুরুষ' হয়ে ওঠা রাজু—মায়ের বয়েসি নারীর কামের আগুনে ছারখার হয়ে যে আজ আহুতি দিয়েছে তার কৌমার্য। আচম্বিতে গিলেছে রসালো 'নিষিদ্ধ ফল'। যার তীব্র মাদক রস আঠেরো পুরে উনিশে পা রাখা তরতাজা বাড়ন্ত শরীরটাকে আবার এখন দাপিয়ে খাক্ করে দিচ্ছে! উধাও প্রথম শক্, প্রথম ধাক্কা, প্রথম হতচকিত বিস্ময় আর বিহ্বলতা। উধাও প্রথম পাপবোধ, বিবেক-বুদ্ধি-সংস্কার। প্রচণ্ড বিস্ফোরটে ফেটে পড়ার জন্য ফুটন্ত আগ্নেয়গিরির মতো ফুঁসে উঠছে শরীর! ভয়ংকর ভাবে জেগে উঠে ফুটছে আর ফুঁসছে কাম আর ভোগের দুর্বার লিপ্সায়। পুরুষের ঘন কামাতুর গুরগুরে গলায় ফের ডাক দিল—''সরিতা আন্টি!''

এই ডাকে ঘাড় বেঁকিয়ে ঘুরে তাকাল তেতাল্লিশ বছরের সরিতা চাড্ডা। কাশ্মীরি ড্রেসিং-গাউনে ঢাকা পড়ে গেছে স্থূল মাংসল শরীর। তবু ঢেউ তুলে দুলে উঠল অন্তর্বাসহীন নগ্ন দেহ। দরজা থেকেই নিজের ঠোঁটে আঙুল রেখে আওয়াজ করল—''শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌!''

জানলার ফাঁক দিয়ে দুপুরের রোদ পড়ে ঝলসে উঠল মস্ত হিরের আংটি পরা তর্জনী। বুঝদার হাসির ঝিলিকে ছল্‌কে উঠল সরিতা চাড্ডার গোটা মুখ। খস্‌খসে দানাদার কণ্ঠ হুকুম করল—''সরিতা 'আন্টি' নয়! শুধু 'সরিতা'। এখন থেকে...''

অসহ্য চাপে ফেটে যেতে যেতে আঠেরো পুরে উনিশে পা-এর সদ্য পুরুষ ফের ডাক দিল—''স...সরিতা! যেও না...''

মধ্যবয়সি নারী তার কামার্ত নবীন পুরুষের কাতর আহ্বানে সাড়া দিল না। তীব্র শ্লেষে হিস্‌হিসে স্বরে বলে উঠল—''এ খেলা ফোকটে হয় না।...প্রথমবার আমার দরকারে খেটেছিস, তার দাম এখনো পর্যন্ত হাতে করে নিতে পারিসনি।...আর এবার তোর নিজের দরকারে আমাকে চাইছিস। পারবি এর দাম দিতে? আছে সেই মুরোদ? আগে হিসেব বুঝে নিতে শেখ্...''

যেন চাবুক পড়ল! বিছানায় ছিটিয়ে থাকা দশখানা একশো টাকার নোট বিবশ হাতে কুড়িয়ে নিল 'পহেলিবার' দেহ-খাটানো আদিম পুরুষ। এবার খুশির হাসি হাসল তার সঙ্গিনী আদিম নারী। কাচভাঙা হাসির টুকরো ছিটিয়ে ঝন্‌ঝনিয়ে বলল—''গুড! এটাই আজকের লেস্‌ন্। পরের বারের অ্যাডভান্স্‌ড্ পেমেন্ট হিসেবে তোলা রইল। আমি ঠিক সময় মতো আসব।''...দরজা খুলে বেরিয়ে

গেল। শব্দ না করে পাল্লাদুটো বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিল। আর!—

দামি পর্দা ঢাকা আবছা অন্ধকারে, একলা ঘরে, বিধ্বস্ত বিছানায়, হাতে ধরা হাজার টাকার নোটে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নব্য পুরুষ। নিদাঘ দুপুরে ওর বুকের ভেতরে হু হু করে একটা নির্জন ঘুঘু ডেকে চলল করুণ সুরে।

গাঢ় সবুজ রঙের ব্লাইন্ডগুলো নামিয়ে আলো-আঁধারি করে রাখা ঘরের ধপধপে নরম বিছানায় গা ঢেলে চিৎপাত হয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আরাম করছিল অনঙ্গ। গতরাতে কস্তুরী রাইয়ের আটতলার বিলাসী ফ্ল্যাটে হোল-নাইট প্যাকেজ ছিল। বড্ড ধকল হয় সারারাতের এই প্যাকেজগুলোতে। কিন্তু লাভও হয় ডবল, তিনগুণ, চারগুণ, এমনকি পাঁচগুণও! কি ক্যাশটাকায় কি দামি দামি গিফ্ট্-এ। কালও কস্তুরী রাই কড়ায়গণ্ডায় প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দেওয়ার সঙ্গে উপহার দিয়েছে দেড়লাখের 'অ্যাপ্‌ল্' আইফোন। ধনী মহিলাদের থেকে এই নিয়ে বোধহয় গোটা আটেক দামি মোবাইল জুটল। কথাটা মৃদু আপত্তিতে অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলতেই কস্তুরী রাই হেসে উঠে বলেছিল—"নাও, নাও অনঙ্গ, প্লিজ কিপ্ ইট। আমি জানি ইউ আর এক্সট্রিমলি পপুলার অ্যান্ড হাইলি ইন ডিমান্ড ইন ইওর সার্ভিস। জানি তোমার ভ্যালুড কাস্টমাররা তোমার খুবই কদর করে আর খুশি হয়ে তোমার সার্ভিস-চার্জ ছাড়াও কস্টলি গিফট্ প্রেজেন্ট করে। তবু এটা তুমি নাও। আমিও খুশি হয়ে তোমাকে দিচ্ছি, ভালোবেসে।..."

'ভালোবেসে' শব্দটা এখানে নিছক কথার কথা। তবু মুহূর্তে সতর্ক হয়ে যায় অনঙ্গ। মাথার মধ্যে আপৎকালীন পাগলাঘণ্টি বেজে ওঠে—সাবধান! সাবধান! 'খুশি হয়ে' অবধি ঠিক আছে; কিন্তু 'ভালোবেসে' কথাটা ইম্মেডিয়েটলি ডিলিট করো। এটা ব্যবসা। ব্যবসাতে 'ভালোবাসার' কোনো জায়গা নেই। বিশেষ করে এই ব্যবসায়ে এটা মারাত্মক রকমের ড্যামেজিং এবং ডেড্‌লি ডেস্ট্রাক্টিভ! সব চৌপাট হয়ে একেবারে শেষ করে দেবে! ভুলেও কখনো এ ভুলের ফাঁদে পোড়ো না!—অস্বস্তিতে কাঠ হয়ে আসা দামি শরীরকে স্বাভাবিক ফর্ম-এ ফিরিয়ে এনে অনঙ্গদেব কস্তুরী রাইকে তার পছন্দমতো করে নিপুণ পারদর্শিতায় চুমু খায়। তারপর খোলা দুই স্তনের ভাঁজে রাখে দেড়লাখি আইফোন। মুখ ডুবিয়ে আলতো করে ঠোঁটে চেপে তুলে নিয়ে ঝকঝকে দাঁতে হাসে। মুখে 'অ্যাপ্‌ল্' নিয়ে দক্ষ কায়দায় বলে—"থ্যাঙ্ক ইউ।"...পঞ্চান্ন বছরের কস্তুরী রাই কিশোরী মেয়ে হয়ে খিলখিলিয়ে হাসে। সবলে বুকের মধ্যে ওকে চেপে ধরে আধো আধো আদুরি স্বরে ফিরতি জবাব দেয়—"ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম ডার্লিং!..." তার দেহজুড়ে তিরতিরে ঢেউ ওঠে। দুই হাত নতুন করে ঘুরতে থাকে তার বুকের মধ্যে আটকে পড়া পুরুষ-শরীরে।

—শীট্! স্টুপিড অ্যাস্!...মনে মনে নিজেকে গালি দেয় অনঙ্গ। —আরও কায়দা দেখাতে যাও! হয়ে গিয়েছিল, ওয়ালেট-ভরা টাকা আর দামি 'অ্যাপ্‌ল্' নিয়ে রাতের মধ্যেই ফিরে যেতে পারতে! কিন্তু আর হবে না! এখন আবার আরেক প্রস্থ চলবে শরীরের লীলাখেলা। কন্ট্রাক্ট যে হোল-নাইট ফুল-প্যাকেজ!...মন বলে এ'কথা আর অনঙ্গদেবের শরীর বলে আরেক ভাষা। যে ভাষায় মথিত হতে হতে ওর দেহসংলগ্ন অপারক নারী অস্ফুটে কাতরাতে থাকে—"আই লিভ আই ডাই! আয়্যাম বার্নিং আয়াম ড্রাউনিং...আমি মরছি আমি বাঁচছি! আমি জ্বলছি আমি পুড়ছি, আমি ভিজছি আমি ডুবছি!...এভাবেই এভাবেই! ওহ্ ওহ্ ওহ্!..."

অনঙ্গদেব তার শক্ত কাঠামোর শরীর দিয়ে ফের সঙ্গত করে চলে। জানে, এদের আসল ক্ষমতার দৌড়। জানে, এদের সাধ্যের থেকে সাধ অনেক বেশি। এসব সময়ে অবধারিত ভাবে ওর মনের ভেতর থেকে কথা বলে ওঠে কবেকার পড়া সেই দুর্দান্ত কোটেশন—'নারীর কামনা-বাসনা সবথেকে দেরিতে বৃদ্ধ হয়; আর তারও অনেক পরে তার হৃদয়..' ঠিক এই জায়গাটাতে প্রত্যেকবারের মতন এবারও হোঁচট খায় অনঙ্গ। ওর মস্তিষ্ক বিদ্রোহ করে উঠে প্রতিবাদ জানায়—'না! নারীর হৃদয় কখনো বৃদ্ধ হয় না। বয়েস, চেহারা, শরীর, ক্ষমতা-অক্ষমতা তার কাছে কোনো ফ্যাক্টর না। নারীর হৃদয় অক্ষত যোনির মতোই চিরকুমারী। থরথর প্রথম পরশ অনাঘ্রাতা কুমারীর মতোই সে তার কৌমার্য নিয়ে জীবনভর অপেক্ষা করে...অপেক্ষা করে...আর অপেক্ষা করে...। প্রত্যেকবার কামার্ত পীড়নে, নিঠুর মর্দনে, মধুর মন্থনে, আবেশে থরথর বিহ্বল নারীর হৃদয় ধকধকিয়ে বলে—'আই লিভ আই ডাই! আয়্যাম বার্নিং আয়্যাম ড্রাউনিং! আয়্যাম ফ্লোটিং আয়্যাম মেল্টিং!'—আমার ঠোঁট, আমার বুক, আমার স্তন, আমার স্তনবৃন্ত—আমার নাভিমূল, আমার উরু, আমার জঙ্ঘা, আমার যোনি—সম্ভোগের মাদক আশ্লেষের বিষাক্ত রসে প্রজ্বলিত, নিমজ্জিত—মিথুন অত্যাচারের তীব্র যন্ত্রণার আহ্লাদে জর্জরিত—আমি জ্বলি আমি পুড়ি, আমি ভাসি আমি ডুবি, আমি বাঁচি আমি মরি—শরীরসুখের অসহ্য উল্লাসে, অসহনীয় আনন্দের শোষণে, দংশনে, পেষণে, মর্ষকামে ধর্ষপ্রেমে আমি বারবার বাঁচি, আমি বারবার মরি...

নারীর এই নিগূঢ় গুহ্য রহস্য নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে লাভ করেছে অনঙ্গদেব। আঠেরো থেকে বত্রিশ—চোদ্দো বছরের টানা অভিজ্ঞতা ওকে নানাভাবে এই শিক্ষা দিয়েছে। সমস্ত রকমের নারী ঘেঁটে, ছেনে তোলা এই উপলব্ধ জ্ঞান, এই বোধ ওকে আজকের পারঙ্গম পুরুষ করে তুলেছে। শরীরের দক্ষতায়, সামর্থ্যে, প্রয়োগে, নিপুণ কামকলায় ও তাই এখনকার সবথেকে দামি দেহবেচা মেল-প্রস্টিটিউট—যার সভ্য নাম 'এস্কর্ট'। টাকার বিনিময়ে ধনী মহিলাদের 'সবরকম' সঙ্গ দেওয়ার মহার্ঘ্য মূল্যের 'এস্কর্ট' অনঙ্গদেব।

শিলিগুড়ির সেবক রোডের মস্ত বাড়ির দোতলার শোবার ঘরে ছেলেকে জোর করে চেপে ধরে চোখ থাবড়ে গুনগুনিয়ে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে ঘুম পাড়াত মা। ছোটো ছেলে, তখনো স্কুলে ভর্তি হয়নি। দুপুরে কিছুতেই ঘুমোতে চাইত না দুরন্ত শিশু। কিন্তু মা নাছোড়বান্দা। ঘুম পাড়াবেই ছোট্ট রাজুকে। রাজু—যার ভালোনাম বা 'শুভনাম'—পৃথ্বীরাজ। একদা রাজস্থানের আজমেঢ়-নিবাসী নির্মলা শেঠ পাকেচক্রে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরে 'পালিত' বাড়ির বউ হয়ে এসে বড় সাধ করে তার পুত্রসন্তানের 'শুভনাম' রেখেছিল পৃথ্বীরাজ। বাঙালি বাড়ির রাজস্থানি বউ নির্মলা, তার বরাবরের মতো ছেড়ে আসা দেশের সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র ছিল রাজস্থানি লোরী।

'লালাবাই'—ঘুমপাড়ানি গানের গুনগুনানিতে দেশোয়ালি উচ্চারণে সে ছেলে ঘুম পাড়াত। সাড়ে আটমাসে জন্মানো, কিম্ভুত রকমের বেখাপ্পা বৃহদাকার শিশু, জন্ম থেকেই মায়ের মুখে রাজস্থানি লোরী শুনতে শুনতে বড়ো হয়েছে। শুনতে শুনতে ঘুমিয়েছে, শুনতে শুনতে জেগেছে। যে লোরীতে বারবার ঘুরেফিরে আসত আজমেঢ়ের বীর রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান আর কনৌজ-রাজকুমারী সংযুক্তার অমর প্রেমগাথা। কারণ, রাজপুত মেয়ে নির্মলা শেঠের মনের কোনায় কোথাও সুপ্ত ছিল এমনই এক বীর-প্রেমিকের বাসনা! যে তাকে একদিন রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের মতোই অতর্কিতে এসে নিজের বাহুবলে তুলে নিয়ে গিয়ে হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করবে। সেই বাসনা ব্যক্ত হত নিজের শিশু-সন্তানকে ঘুমপাড়ানি গান শোনানো লোরীর সুরে। যেটাতে ভীষণ অপ্রসন্ন হত স্বামী প্রসন্নকুমার পালিত। এই বিয়ে করতে বাধ্য হওয়া চির অপ্রসন্ন প্রসন্নকুমার বাজখাঁই গলায় শাসিয়ে উঠত—"তোমার ওই দেশোয়ালি গাঁইয়া গান আমার কানের কাছে একদম না! ফের যদি শুনি ঘাড় ধরে ফেলে দিয়ে আসব যেখান থেকে ঘাড়ে চেপেছ, সেখানে..."

ছেলে-কোলে নির্মলা বিয়ের সাড়ে আটমাসের মধ্যে বুঝে গিয়েছিল, মুখে যতোই তড়পাক, কাজে এটা কখনোই করে উঠতে পারবে না ওর বর প্রসন্ন পালিত। তাহলে তার ধড় আর মুন্ডু আলাদা হয়ে যাবে! নিজেও খুব ভালো করেই এটা জানে প্রসন্নকুমার। তবু অশান্তি চাইত না নরম স্বভাবের নির্মলা। তাই যতোটা পারত চেষ্টা করত স্বামীর কান বাঁচিয়ে গাইতে। কিন্তু রাতবিরেতে ছেলের কান্না উঠলে কী করবে? শিশুকে বুকে তুলে নিয়ে দোলাতে দোলাতে কানে গুনগুন করে শোনাত ঘুমপাড়ানি লোরীগান। দাঁত কিড়মিড় করতে করতে উঠে বালিশ নিয়ে অন্য ঘরে চলে যেত প্রসন্ন পালিত। তখন নিশ্চিন্তির হাঁফ ছেড়ে পরের পর রাজস্থানি লোরী গেয়ে ছেলে শান্ত করত বাইশ বছরের রাজপুতানি মা—স্বভূমি থেকে নির্বাসিত, নিজের সংসারে অবাঞ্ছিত, স্বামীসোহাগে বঞ্চিত, সুন্দরী নির্মলা। এখন নির্মলা পালিত।

....দেখতে দেখতে এভাবেই দামাল হয়ে উঠেছে ছেলে। মায়ের মুখে লোরী শুনতে শুনতে বড়ো হয়ে ওঠা ছেলের মনে ক্রমশ গেঁথে গেছে একটা ছবি—মহাবেগবান অশ্ব চৈতনার পিঠে সওয়ার, উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে রাজবেশে সুসজ্জিত মহারাজ পৃথ্বীরাজ চৌহান! পেছনে তার কোমর বেষ্টন করে বধূবেশে বসে আছে কনৌজরাজপুত্রী, জয়চন্দ্রের কন্যা সালঙ্কারা সংযুক্তা! আপন শৌর্যে তাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে তার বীর প্রেমিকপুরুষ, রাজা পৃথ্বীরাজ!...

মায়ের লোরীগান শুনতে শুনতে বড়ো হতে থাকা ছেলে মনে মনে এই ছবি দেখতে শিখেছে, কিন্তু ছবির মর্ম বুঝতে শেখেনি। তাই তার কচি ঠোঁট ফাঁক হয়ে ধেয়ে আসত প্রশ্নের পর প্রশ্ন।—"ওরকম করে নিয়ে যাচ্ছে কেন?"....শুনত, সুরের রেশ টেনেই মা জবাব দিচ্ছে—"বিয়ে করবে বলে..." এরপর ছেলে—"কেন বিয়ে করবে?"..এবার মায়ের গুনগুনানো উত্তর যেন চাপা কান্নার সুরে বলত—"ভালোবাসে বলে...।" ছেলে বোঝে না। ভাবে, মায়ের গলা এরকম লাগে কেন?...আর জিজ্ঞেস করা হয় না। দু-চোখ জুড়ে ঘুম নামে। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে দেখতে পায়, রাজা পৃথ্বীরাজের মুখটা খুব চেনা চেনা! বড়ো হলে ওর মুখটা যেরকম হবে, যেন অবিকল সেরকম! কিন্তু কিছুতেই দেখতে পায় না হুবহু ওর মতো দেখতে রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের পিঠসংলগ্ন রাজকুমারী সংযুক্তার মুখ! জড়ানো গলায় বলে উঠত—"সংযুক্তাকে দেখতে পাচ্ছি না!"...

সংযুক্তা বরাবরই অধরা রয়ে গেল। অধরা রয়ে গেল অবগুণ্ঠনে ঢাকা সংযুক্তার মুখ। প্রত্যেক দিন প্রত্যেক রাত ঘুমের সঙ্গে আপ্রাণ যুঝত ওই মুখখানা একবার দেখার জন্য। নিদ্রাবিবশ কাতর স্বরে মাকে প্রশ্ন করত—"আমি কেন সংযুক্তাকে কিছুতেই দেখতে পাচ্ছি না?"

মা তেমনি লোরীর সুরে গুনগুনিয়ে ছেলেকে ভরসা দিত—"পাবি রে, পাবি! সময় হলে ঠিক দেখতে পাবি! তুই যে পৃথ্বীরাজ! সময় হলেই ঠিক কাছে আসবে..."

ছোট্ট ছেলের কচি ঠোঁট ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে শেষবারের মতো ফাঁক হত—"কখন সময় হবে মা?"

নির্মলা গভীর স্নেহে ছেলের কপালে চুমু দিয়ে বলত—"বড়ো হলে, আর ভালোবাসা হলে..."

দূর থেকে ভেসে আসা সজল মেঘের মতো কথাগুলো কানে নরম ছোঁয়া দিয়ে যেত। ছোটো ছেলে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ত গভীর বিশ্বাসে। শুনতে পেত না, গুনগুনে বিলাপের মতো কান্নার সুরে মা নির্মলা পালিত যেন নিজেকেই বোঝাচ্ছে—"মেরে জীবন মে কভী পেয়ার নেহী আয়া...ইসিলিয়ে পৃথ্বীরাজ ভী নেহী আয়া...লেকিন মেরে বেটে কে জিন্দেগী মে পেয়ার জরুর আয়গা...'পৃথ্বীরাজ' মেরা পেয়ার হো না সকা...লেকিন মেরা বেটা পৃথ্বীরাজকে জীবনমে ঠিক একদিন পেয়ার আয়গা...উসকো উসকি সংযুক্তা ঠিক মিল যায়েগী।"

নরম অন্ধকার। ঝিঁঝিঁপোকা ডাকের এ.সি.। মাথার ওপর ঘুরন্ত ফ্যান। গোটা ঘর জুড়ে ঝিমঝিমে আরাম। শিথিল আলস্যে সেটা চুঁয়ে চুঁয়ে নিচ্ছিল অনঙ্গদেব। ধারালো হাসি চোঁয়াচ্ছিল ওর পুরু পুরুষালি ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। আজকাল প্রায়ই এটা ঘটছে। কাস্টমার অ্যাটেন্ড করে আসার পর, বিশেষ করে হোল-নাইট কন্ট্রাক্ট হলে, নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে বিছানায় গা এলিয়ে চোখদুটো বুজলেই স্থানকালপাত্র সব পালটে যাচ্ছে! ভুল হয়ে যায় যে এটা কলকাতা, কলকাতার বুকে সেজে ওঠা নতুন নগর রাজারহাট, যেখানে ওর সুসজ্জিত দু-কামরার ফ্ল্যাট, যার মাস্টার-বেডরুমের বিরাট কামরায়, সুদৃশ্য একার বিছানায় ও শুয়ে শুয়ে আরাম করে।...আর ওটা ছিল দিল্লি, দিল্লির পশ্ এলাকা গ্রেটার কৈলাস, যেখানে বিশাল চাড্ডা-হাউস, যে চাড্ডা-হাউসের গেস্টরুমে প্রথমবার দিল্লিতে গিয়ে উঠেছিল আঠেরো পুরে উনিশে পা দেওয়া বেঢপ্পা বাড়ন্ত শরীরের ছেলেটা; যে গেস্টরুমের বিলাসী শয্যায়, নিদাঘের এক ঘোর দুপুরের শীতল অন্ধকারে, আচমকা 'পুরুষ' হয়ে উঠেছিল! কৈশোরের গন্ধ সম্পূর্ণ ধুয়ে মুছে পূর্ণ যৌবনে অভিষিক্ত হতে না হতেই যে ছেলেটা হঠাৎই হতচকিত বিস্ময়ে তার কৌমার্য খুইয়েছিল! বিনিময়ে নগদে পেয়েছিল কড়কড়ে একহাজার টাকা! বাধ্য হয়েছিল নিতে! কেঁদেও ছিল অবুঝ এক অজানা-অচেনা কষ্টে। কিন্তু তখনো কল্পনাও করতে পারেনি কোন বিবর্তন প্রক্রিয়ায়, কোন ট্রান্সফরমেশনে, ওই মুহূর্ত থেকে ও কিসে রূপান্তরিত হল! ভবিতব্যের

হঠকারী খেলায় অনভিজ্ঞ কৌমার্যের লাশ পুড়িয়ে তার ছাই থেকে উঠে এল অবেলার পুরুষ! অসময়ের প্রথম দেহসম্ভোগে যার প্রথম দোসর হল পঁচিশ বছরের বড়ো, অসম বয়সের সরিতা চাড্ডা—মায়ের বয়েসি নারী! তেতাল্লিশ বছরের মাংসল শরীরের মাংসল চাহিদার সরিতা আন্টি!...

তাই সংযুক্তাকে আর দেখা হল না। আর এল না পৃথ্বীরাজের 'প্রেম' সংযুক্তা। মা নির্মলার আশ্বাস 'ভালোবাসা হলে' শর্তটার পূরণ হল না। ভালোবাসা 'হওয়ার' ফুরসতই মিলল না! তার অনেক আগেই হয়ে গেল প্রেমহীন কামের শরীরসর্বস্ব 'অনঙ্গদেব'! আঠেরো থেকে বত্রিশ বছর বয়েস অবধি একটানা শরীর খাটানো কস্‌ট্‌লি জিগোলো—পোশাকি নাম 'এস্কর্ট'! ঘণ্টা-দিন-রাত, ইনডোর-আউটডোর কন্ট্রাক্টের হিসেবে, পয়সাওলা মহিলাদের শরীরের চাহিদা মেটানো বিভিন্ন প্যাকেজের খেপ্‌খাটা পুরুষ।

বেলা হয়ে গেছে অনেক। গাঢ় সবুজ ব্লাইন্ডগুলোর ফাঁকফোকর গলে ছিটকে আসা টুকরো-টাকরা রোদ্দুর জানান দিচ্ছে দুপুর গড়াতে চলল। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল অনঙ্গ। এই সময়টার সঙ্গে ওর জীবনের একটা অদ্ভুত যোগ আছে! সেটা দিল্লির গ্রেটার কৈলাসের চাড্ডা-হাউসই হোক, কি শিলিগুড়ির সেবক রোডের পালিত-বাড়ি! কথাটা মাথায় আসতেই মনে হল মায়ের কথা। পৃথিবীর মধ্যে এই একজনই মহিলা আছে যার কাছে ও উদোম শিশুর মতোই স্বচ্ছন্দ। হেসে ফেলল অনঙ্গ—উদোম শিশু! আঠারো পুরে থেকে এই বত্রিশ বছর চার মাস ধরে যার পুরো জীবনটাই উদোম-কারবারে চলছে! যার কাছে 'মায়ের মতো' বা 'মায়ের বয়সি' কথাটাই মিথ্যে হয়ে গেছে। দগদগে সত্যি শুধু শরীর—ন্যাংটো উলঙ্গ শরীর! মা ওই একজনই—সেবক রোডের বাড়ির নির্মলা পালিত। যে আকুল হয়ে থাকে ছেলের জন্য। একমাত্র তার কোলেই নিশ্চিন্তে মাথা গোঁজে ছ-ফুট দু-ইঞ্চির লম্বা দেহটা। গুটিসুটি মেরে ছোট্ট হয়ে যায়। মনে মনে হলেও।...পাশে পড়ে থাকা নিজের মোবাইলটা তুলে নিল। বোতাম টিপতে গিয়েও থমকে গেল। জোর করে মাকে একটা স্মার্টফোন কিনে পাঠিয়েছে অনলাইনে। নিজের নামে নতুন সিমকার্ড নিয়ে সেটাও ক্যুরিয়ার করে ডেলিভারি করিয়েছে। কিন্তু নির্মলা কিছুতেই ব্যবহার করে না। মান্ধাতা আমলের ল্যান্ডফোনেই সে অভ্যস্ত। এই নিয়ে রাগারাগি করেছে কত! লাভ হয়নি। নির্মলা ছেলের রাগে হাসে। আহ্লাদে ভাসে। বলে—"আমার এই পুরোনো ফোনই ভালো, সুবিধে হয়, আমার মতো ক্যাবলা মানুষের কি তোদের মতন এইসব 'স্মার্ট' জিনিস মানায়?"...বকতে গিয়েও হেসে ফেলেছিল ছেলে। অবাকও হয়েছিল—এখনো মায়ের মধ্যে এমন রসবোধ আছে! নিজেকে নিয়ে এইভাবে হিউমার করতে পারে! নির্মলা তখন ছেলেকে বলছে—"তাছাড়া ওই স্মার্টফোন-টোন ব্যবহার করতে শিখলে তুই কি আর এ নিয়ে এমন বকাঝকা করতে পারবি? এটা শুনতেও যে আমার বড়ো ভালো লাগে রে! মনে হয় এই দুনিয়ায় আর কেউ না থাকুক, আমার ছেলে আছে আমার কথা ভাবার জন্যে!..."

ওর দামি মোবাইলের ভেতর দিয়ে ভেসে আসছিল মায়ের খুশির হাসি। চুপ হয়ে গিয়েছিল অনঙ্গ। অনঙ্গ নয়, রাজু! মা হাসছে, আর ওর গলার মধ্যে দলা পাকাচ্ছে বড্ড কষ্ট! খুব ইচ্ছে করছিল সেবক রোডের বাড়িতে মায়ের কাছে ছুটে যেতে। যে বাড়ি ও মন থেকে ছেঁটে ফেলে দিয়েছে বহুকাল আগেই। এরপর থেকে যখনই মাকে ফোন করেছে, ইচ্ছে করেই

রাগ দেখিয়ে বকুনি দেয়। যেটা শোনার জন্যে নির্মলা কান পেতে থাকে। আজও তাই করবে। এবার মোবাইলে ও'বাড়ির ল্যান্ডফোনের নম্বর টিপল অনঙ্গদেব। রিং হচ্ছে। মা দুপুরে ঘুমোয় না। বই পড়ে, টুকটাক এটাওটা করে। টিভিও দেখে না। নিজের মতো করে কাটায় নিঃসঙ্গ জীবন! কিন্তু কোনো খেদ নেই, নেই কোনো অভিযোগ, মা বড়ো অদ্ভুত—ভাবে অনঙ্গ।...ওদিকের রিংটোন শুনতে শুনতে অপেক্ষা করে। লম্বা বারান্দার প্যাসেজে স্ট্যান্ডে রাখা পুরোনো দিনের জাবদা কালো ল্যান্ডফোন। তার ওপর যত্ন করে ঢাকা দেওয়া মায়ের হাতের ক্রুশের কাজ করা সুন্দর কভার। নিজের ঘরে বসে দেখতে থাকে অনঙ্গ। ভেতরে ভেতরে শুরু হয় 'রাজুর' ছটফটানি। ধরছে না কেন মা? ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ধরতে তো দু-সেকেন্ডও লাগে না! বাড়িতে একমাত্র নির্মলাই ব্যবহার করে ওই ফোন। পুরোনো সেট-টা পর্যন্ত বদলায়নি 'দরকার নেই' বলে! অন্য কারুর এটা পাল্টে স্লিক্ ডিজাইনের সুন্দর মডেলের একটা নতুন সেট আনার কথা মনেও হয় না। কারুর তো এটার দরকার নেই! বাড়ির কাজের লোকেদের পর্যন্ত হাতে-হাতে এখন মোবাইল ফোন।...ভেতরটা তেতে উঠতে লাগল। বাজতে বাজতে থেমে গেল ওদিকের আওয়াজ। লাইন কেটে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সংযোগ। জেদ ধরে গেল ওর। মনে হল, মায়ের থেকেই ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কথা বলতেই হবে মায়ের সঙ্গে, এক্ষুনি! ফের বোতাম টিপল দ্রুত হাতে, অধৈর্য আঙুলের চাপ বাড়ছে প্রত্যেকটা সংখ্যায়—০৩৫৩, ২৮১...এই নম্বর ও ইচ্ছে করেই নিজের মোবাইলে রাখে না। মনে গাঁথা থাকে।

ওদিকে ফের রিং হচ্ছে! তুলেছে এইবার! সাড়া দেওয়ার আগেই এদিক থেকে ও ঝাঁঝিয়ে উঠল—"কখন থেকে ফোন করছি! ধরছিলে না কেন? কী করছিলে এতক্ষণ!"...

ওদিক থেকে বাজখাঁই গলায় জবাব এল—"ভরদুপুরে ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছ কেন? এটা মানুষের বিশ্রামের সময়! ধরো!"...

প্রসন্ন পালিত। প্রসন্নকুমার নিজেই ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে লাগল স্ত্রীর উদ্দেশে—"শুনতে পাচ্ছ না তোমার ফোন বাজছে? মরে গেছ নাকি! নাকি কালা হয়ে গেছ! যত্তো আপদ আমার সংসারে..."

চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল। অনঙ্গদেব ওর ভেতরে সদ্য মাথা তুলে ওঠা নির্মলার রাজুকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শক্ত গলায় বলে উঠল—"মায়ের সম্পর্কে ভদ্রভাবে কথা বল!"...

ওধার থেকে প্রসন্নকুমারের রোষের তীব্র ফোঁসফোঁস। তারপর ঠক্ করে পাশে রিসিভার নামিয়ে রাখার আওয়াজ। অনঙ্গদেব রাগে ফুটতে ফুটতে ভাবছিল—এই লোকটা কি কখনো ভদ্র হবে না!...কানে যাচ্ছে লোকটার তারস্বর চেঁচানি—"থাকো কোথায়? কানে শুনতে পাও না! কেটে দেব এই ফোনের লাইন! ছেলের সঙ্গে আহ্লাদ করে কথা বলা বরাবরের মতন ঘুচে যাবে! তোমার সুপুত্র আমাকে ভদ্রতা শেখাচ্ছে? ওকে সাবধান করে দিও! এই শেষবারের মতো বলে দিলাম..."

ওদিকে রিসিভার তোলার শব্দ। একেবারে স্বাভাবিক গলা নির্মলার। যেন কানেই ঢোকেনি স্বামীর কথাগুলো।—"বাথরুমে ছিলাম রে! তাই ধরতে পারিনি ফোনটা। কী হল চুপ করে আছিস কেন? কথা বল! ফোন করেছিলি কেন বাবা?"

এই 'বাবা' ডাকটা বরাবরের মতো এবারও ওকে ভিজিয়ে দিল। গনগনে রাগে ঠান্ডা জলের ঝাপটা পড়ল। হঠাৎই অকারণ অভিমান উঠে এল গলা ঠেলে—"এমনি ফোন করেছিলাম....তোমাকে ফোন করতে যে কোনো কারণ লাগে, সেটা জানতাম না। এবার থেকে কারণ ছাড়া ফোন করব না।"

ক্ষণিকের স্তব্ধতা। তারপরেই নির্মলা একেবারে অন্যরকম স্বরে বলে উঠল গাঢ় গলায়—"কী হয়েছে? কেমন আছিস তুই! ঠিক নেই, না রে?"...

রাজুর গলা চিরে বেরিয়ে আসতে চাইল—আমি ঠিক নেই মা! একদম ঠিক নেই...এটা শুধু তুমিই টের পাও—

আর অনঙ্গদেব তার পুষ্ট পুরুষালি কণ্ঠে বলল—"কিচ্ছু হয়নি। আমি ভালো আছি। একদম ঠিকঠাক আছি। চিন্তা করো না..."

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। দেখা নয়, পর্যবেক্ষণ। টান মেরে খুলে ফেলেছে পরনের শর্টস্ আর হাতকাটা গেঞ্জি। আয়নায় ফুটে উঠেছে বলিষ্ঠ, নগ্ন দেহ। যে দেহের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত একেবারে অন্যরকম। মা নির্মলা রাজস্থানি বিউটি। দোহারা ছিপছিপে; তেল পিছলানো চামড়ায় গমের সোনালি আভা, কাজলকালো মৃগনয়নিকা। কিন্তু রাজপুতানি মেয়েদের মতন হাট্টাকাট্টা নয়; বরাবরই বড় নরম আর তুলতুলে। সেই মা আজও সুন্দরী। আর প্রসন্নকুমার পালিত!—নামটা মনে আসা মাত্র আয়নার প্রতিবিম্বে কুঁচকে উঠল ওর রোমশ জোড়া-ভুরু। তার সঙ্গেও কোনো দিক দিয়েই কোথাও কোনো মিল নেই। মাঝারি হাইটের সাদামাটা সাধারণ চেহারা। গায়ের রংটা কেবল ভ্যাদভেদে সাদা। শুনেছে, ওটা পালিত বংশের পেটেন্ট। যে পেটেন্টের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই ওর চকচকে কালচে-তামাটে গাত্রবর্ণে। চোখমুখও একেবারে সাধারণ প্রসন্ন পালিতের। সেখানেও ছেলের সঙ্গে বেমিশাল অমিল।—'ছেলে!' আয়নার অনঙ্গদেবের ঠোঁটে তেতো হাসি।...প্রসন্নকুমার পালিতের একমাত্র ছেলে, পালিতবংশের সবেধন নীলমণি পৃথ্বীরাজ পালিত তার জন্ম থেকেই কোনো দিনও ওই লোকটার ছেলে হয়ে উঠতে পারেনি! ওই লোকটাও ওর 'বাবা' হয়নি কখনো। শিশুবয়সের ছেলের মুখের 'বাবা' ডাক শুনলে যে লোক চরম বিতৃষ্ণায় খেঁকিয়ে উঠত—"কানের সামনে 'বাবা বাবা' করবি না একদম! যা তোর মায়ের কাছে যা! কোত্থেকে যে এসেছে এটা!"...সভয়ে সরে যেত ছোট্ট ছেলে 'রাজু'। আস্তে আস্তে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল যেন মুখ থেকে আর 'বাবা' শব্দটা না বেরোয়।...তাই ক্রমশ প্রসন্নকুমার পালিত ওর কাছে হয়ে উঠল 'ওই লোকটা'। যার প্রতি ছোটোবেলায় ছিল নিদারুণ ভীতি, আর বড়ো হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বিতৃষ্ণা। শিশুকাল থেকে শোনা প্রসন্ন পালিতের থুতু ছেটানো ঘেন্না ওকে সারাটা জীবন ধরে তাড়িয়ে মেরেছে—'কোত্থেকে এল এটা?'

২

জ্ঞানচক্ষু

"—মোটেই ভেবো না মেল-সেক্সওয়ার্কাস্‌রা একদিন হুট করে এই ট্রেড-এ ঢুকে পড়ল! অন্য সব প্রফেশনের মতো এরও একটা

'ইনট্রো' আছে! ইনট্রোডাকশন টু মেল-প্রস্টিটিউশন..." সস্তার সিগারেটের খোলে গাঁজা ঠুসতে ঠুসতে অনঙ্গকে এই প্রাথমিক জ্ঞানটা দিয়েছিল পাক্কা অ্যামেরিকান ছেলে ডিউক স্ট্যানলি। অনঙ্গদেবের তখন কলেজের থার্ড-ইয়ার। দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ। যেখানে ও রেজিস্টারে আর খাতায়-কলমে পৃথ্বীরাজ পালিত। আর দেহব্যবসার কারবারে অনঙ্—অনঙ্দেভ্। পোক্ত আর চোস্ত্ হয়ে উঠেছে তিন বছরে। ফার্স্ট ইয়ারেই জমিয়ে ভাব হয়েছে ওরই মতো শরীরের কারবারি ডিউক স্ট্যানলির সঙ্গে এক ম্যাসাজ পার্লারে—যেখানে সে দিনে ম্যাসাজ করা 'ম্যাসিওর' আর রাতে শরীর-খাটানো 'জিগোলো।'...ডিউকই বলেছিল, ''আমাদের দেশে প্রায়ই 'আনফরচুনেট হোম সিচুয়েশন' সহ্য করতে না পেরে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা বাড়ি থেকে পালায়। তারপর 'মেজর সিটিজ্'—বড় শহরগুলোতে এসে বিপদে পড়ে—চুরি করে আনা ডলার ফুরুৎ করে ফিনিশ হয়ে গিয়ে 'নো ফুড নো শেলটার অ্যান্ড নো মানি।' তখন, বলতে পারো 'আউট অফ ফ্রাস্ট্রেশন অ্যান্ড ডেসপারেশন'—হতাশা থেকে প্রচণ্ড মরিয়া হয়ে বাঁচার জন্য আর নিজের 'টেক কেয়ার'-এর জন্যে এই ট্রেড-এ ফোর্সড্ হয়ে ঢুকে পড়ে! প্রথম প্রথম ঠিক করে বুঝতেও পারে না এই ট্রান্সফরমেশন—কিসের থেকে 'কী' হয়ে যাচ্ছে! একবার এই ট্রেড-এ ঢুকে গেলে এটা একটা অটোম্যাটিক প্রসেস। বুঝে ওঠার আগেই 'ওয়ান বিকাম্‌স্ এ জিগোলো'—আ মেল-প্রস্টিটিউট—পুরুষ বেশ্যা। বুঝেছ?..."

স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাথাটা 'হ্যাঁ' সূচক হয়ে নড়ে গিয়েছিল। ওর থেকে ভালো করে আর কে বুঝবে এটা! এই দিল্লিতেই তো এই ট্রেড-এ বড় আচমকা 'ইনট্রো' হয়ে গেছে ওর!—'ইনট্রোডাকশন টু মেল-প্রস্টিটিউশন!' কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই হয়ে গেছে শরীর খাটিয়ে টাকা-কামানো মেল-প্রস্টিটিউট—'জিগোলো'—পুরুষ বেশ্যা। প্রথম রোজগার, দশটা কড়কড়ে একশো টাকার নোটে হাজার টাকা! এখনো যার সপাট ঝাপটা, তার তীব্র গন্ধ ওর নাকেমুখে লেগে আছে। যার পর থেকে, মাত্র তিন বছরে, এই ট্রেড-এর অটোম্যাটিক প্রসেসে ও এখন পাকাপোক্ত ফুল ফ্লেজড্ জিগোলো 'অনঙ্গদেভ্'।

ডিউক স্ট্যানলি তখন নাগাড়ে বকে চলেছে—''সো, অনেক সময়েই প্রথমেই 'পভার্টি' ইজ নট দি ওনলি রিজ্‌ন যার জন্যে ছেলেরা কি লোকেরা বাধ্য হয়ে এই ট্রেড-এ আসে। অ্যামেরিকায় অনেক এজেন্সি আছে যারা এই ধরনের ছোটো ছেলে বা কমবয়েসি মেল-প্রস্টিটিউটদের নিয়ে সার্ভে করে দেখেছে যে পঁচাশি পার্সেন্টেরও বেশি হয় 'সেক্সচুয়ালাইসড্ অর ভিক্টিমাইস্‌ড্' হয়েছে কারুর না কারুর 'সেক্সুয়াল নিড্‌স্' মেটানোর জন্যে, বা বাড়ি থেকে পালিয়েছে ঘরের ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে 'প্রায়র টু জয়েনিং ইন সেক্স-ওয়ার্ক পার্মানেন্টলি'।"...গাঁজাপোরা সিগারেটে দম্ মেরে টান দিয়ে ডিউক বিজ্ঞের মতন শেষ জ্ঞানটা দিয়েছিল—''আমি নিজেই তাই—আ রান-অ্যাওয়ে বয় ফ্রম আনফরচুনেট হোম অ্যান্ড ফ্যামিলি ডিউ টু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স; অ্যান্ড দেন সেক্সুয়ালাইস্‌ড্ অর ভিক্টিমাইস্‌ড্ টু সার্ভ্ আদার্স্ সেক্সুয়াল নিড্‌স্। ...বাট্ এসব তুমি বুঝবে না, অ্যানাঙ্! তুমি পয়সাঅলা ভালো বাড়ির ছেলে, তোমার বাবা-মা তোমাকে শখ করে দিল্লিতে সেন্ট স্টিফেন্সের মতো কলেজে পড়তে পাঠিয়েছে; আনফরচুনেট হোম অ্যান্ড ফ্যামিলি আর তার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এবং অ্যাবিউসিভ গালাগালি তুমি কল্পনাও করতে পারবে না!..."

পেটের ভেতরে মুচড়িয়ে গুরগুর করে অসভ্য হাসি উঠে আসছিল। জোর করে সেটাকে ঠেলে ফেরত পাঠিয়ে মনে মনে বলে উঠেছিল, তা বটে। তা বটে। সবকিছুই সবচেয়ে আগে জানে শুধু মার্কিনমুলুক ম্যারিকা। আমাদের থার্ড-ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি ধন-নির্ধন ভালো-মন্দ যৌনপ্রমোদ বা যৌননিগ্রহ, অথবা আনফরচুনেট হোম অ্যান্ড ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স—সবকিছুতেই তোমাদের থেকে পিছিয়ে। মায় গালিগালাজ পর্যন্ত!...মুখে বলল একদম অন্য কথা।—''ডিউক, তুমি মার্কেটে নিজের নাম পাল্টে 'ডার্ক চকলেট' রেখেছ কেন? নিজের আইডেনটিটি লুকোনোর জন্যে?"....গিয়ে ঠিক জায়গা মতোই লাগল। গাঁজায় শেষ টান দিয়ে নিভে আসা জ্বলন্ত টুকরোটা পা দিয়ে মাটিতে পিষতে পিষতে সর্বাঙ্গে মেচেতা-ছোপের মার্কিন জিগোলো সদম্ভে জবাব দিল—''বিকজ্ সেক্স ইজ্ লাইক চকলেট...জুসি টেস্টি ডার্ক চকলেট!...দ্য মোর ইউ হ্যাভ ইট, দ্য মোর ইউ ওয়ান্ট ইট!...অ্যান্ড আই লাভ মাই জব্...অ্যান্ড দ্য কুইক-মানি আই আর্ন্ ইন রিটার্ন্...এ নিয়ে আমার কোনো ভণ্ডামি বা হিপোক্রিসি নেই।...তোমাদের মতন ফরচুনেট হোম অ্যান্ড পিস্‌ফুল ফ্যামিলির অফ্‌স্প্রিংস্—ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ছিটেফোঁটা আঁচ গায়ে না লাগা—মায়ের আহ্লাদে বেড়ে ওঠা—টাকা খরচ করে নর্থ্-বেঙ্গল থেকে দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে হায়ার-স্টাডি করতে আসা—বড়োলোক বাপের আদরের প্রিভিলেজ্‌ড্ ছেলে—তোমাকে তাই নিজের নাম পালটাতে হয় অ্যানাঙ্! আইডেন্টিটি লুকিয়ে 'অ্যানাঙ্গডেভ্' হতে হয় মার্কেটে! কেন তুমি এসেছ এই ট্রেড-এ?"...

হাসল অনঙ্গ জোর করে। টিপিকাল সাহেবি কেতায় চওড়া দু-কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে শ্রাগ্ করল। তাচ্ছিল্যে উচ্চারণ করল—''এমনিই; জাস্ট লাইক্ দ্যাট্..."

ফিরে তাকাল আমেরিকান সাহেব ডিউক স্ট্যানলি। আঠাশ বছরের মেল-প্রস্টিটিউট। তার থেকে প্রায় ছ-সাত বছরের ছোটো এই ইন্ডিয়ান ছেলেটার মধ্যে কী যেন একটা আছে! অদ্ভুত এক ইরেজিস্টিব্‌ল্ আকর্ষণ! ইরেস্‌পেক্টিভ অফ বোথ্ মেল অ্যান্ড ফিমেল—নারীপুরুষ নির্বিশেষে! যে কারণে ডিউক সবসময় চেষ্টা করে অনঙ্গ যেন কিছুতেই তার ধনী ক্লায়েন্ট, মাঝবয়েসি দিশি মহিলা রিচা ওয়ালিয়ার নজরে না পড়ে যায়! যে রিচা ওয়ালিয়ার দৌলতে এবং দাক্ষিণ্যে সে এতকাল ধরে নিজের মুলুক ছেড়ে এদেশে এসে আছে।...মনে মনে নিজেকে সতর্ক করল। অনঙ্গদেবের তাচ্ছিল্যের জবাব 'এমনিই; জাস্ট লাইক দ্যাট'-এর সাবধানী উত্তর দিল—''হতেই পারে...বিকজ্ দেয়ার ইজ্ 'লিট্‌ল-টু-নো-ডেটা' দ্যাট কনফার্মস্ আ ডায়রেক্ট লিংক টু দিস্ লাইন...অ্যামেরিকান এজেন্সিগুলোর সার্ভে-রিপোর্টের কথা এটা। তাই হতেই পারে যে তুমি সম্পূর্ণ তোমার নিজের ইচ্ছেয় আর চয়েসে আমাদের এই লাইনে এসেছ...যে কোনো কারণ, অথবা কোনো কারণ ছাড়াই।"...আপোস করতে ইচ্ছে করেই 'আমাদের' কথাটা উচ্চারণ করল অনাবশ্যক জোর দিয়ে। সেটা কান এড়াল না যার উদ্দেশে বলা।

হাসল অনঙ্গ। ওর বয়েস তখন একুশ চলছে। যদিও বিরাট আকৃতির জন্যে দেখায় অনেক বেশি। অনায়াসে লম্বা হাতে প্রায় বছর সাতেকের বড়ো বিদেশি ছেলের পিঠ চাপড়ে দিল—"ডোন্ট ওয়ারি বাডি! টেক ইট ইজি। কিন্তু আমি আমার নাম বদলে 'অনঙ্গদেব' হয়েছি কেন জানো? বিকজ্ ইট মিনস্ 'কিউপিড'—দ্য গড অফ প্যাশন, ডিজায়ার, অ্যাট্রাকশন অ্যান্ড কার্নাল প্লেজার—যেগুলো আমাদের এই 'মার্কেট' ধরে রাখার জন্যে খুব জরুরি—তাই না?"

জবাবের অপেক্ষা না করে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটা দিল একুশ বছরের অনঙ্—অনঙ্গদেভ্। ওর পুরু ঠোঁটের হাসিতে বিষাক্ত জ্বালা। কানে বাজছিল—'ফরচুনেট হোম অ্যান্ড পিস্‌ফুল ফ্যামিলির অফ্‌স্প্রিং...বড়োলোক বাপের আদরের প্রিভিলেজ্‌ড্ ছেলে...'

যেগুলো ক্রমশ চাপা পড়ে যাচ্ছিল এক বাজখাঁই গলার বিশ্রী চিৎকারে—'কোত্থেকে এসেছে এটা?...কোত্থেকে এল!...কোত্থেকে এসে জুটল এখানে?...'

চিৎকার করছিল প্রসন্নকুমার পালিত...

চিৎকার করছিল শিলিগুড়ির সেবক রোডের বাড়িতে...

চিৎকার করছিল ছোট্ট রাজুকে ভীত সন্ত্রস্ত তটস্থ করে...

চিৎকার করে চলছিল ছোটো থেকে ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠতে থাকা পৃথ্বীরাজের দিকে বিতৃষ্ণার থুতু ছিটিয়ে...

চিৎকার করে উঠেছিল দশ বছরের পৃথ্বীরাজ পালিতের বিস্ময়ে ফেটে পড়া, ভীত বিস্ফারিত চোখের সামনে অন্য নারীকে দল্‌তে দল্‌তে—"দূর হ! দূর হ এখান থেকে! যেখান থেকে বেরিয়েছিস মেরে পাট করে সেখানে ঢুকিয়ে দেব! কৃমিকীট কোথাকারের! ভ্যাজাইনাল ওয়ার্ম্ একটা! স্কাউন্ড্রেল যোনিকীট!"...

জ্ঞান হওয়া থেকে দেখে এসেছে যে 'বাবা' নামের লোকটা ওর আর মায়ের সঙ্গে একঘরে থাকে না। তার ঘর আলাদা। যে ঘরে ওর প্রবেশ নিষেধ। যে ঘরে মাও খুব দরকার না হলে সাড়া না দিয়ে ঢোকে না। এক্কেবারে ছোটো থেকে বুঝে গেছে 'বাবা' লোকটা ওকে একেবারে সহ্য করতে তো পারে না-ই, সেইসঙ্গে মাকেও দেখতে পারে না। ওদের মা আর ছেলের আলাদা জগৎ, আলাদা দুনিয়া। একই বাড়িতে একই ছাদের নীচে থেকেও যেখানে ওদের আর প্রসন্নকুমার পালিতের মধ্যে এক অপ্রতিরোধ্য অদৃশ্য পাঁচিল। যে পাঁচিলে শিশুকাল থেকে সমানে ঠোকর খেতে খেতে বড়ো হয়ে উঠেছে। অবোধ শিশু প্রসন্নকুমারের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেই শুনত বিকট হুংকার—"কী চাই এখানে? দূর হ! কোত্থেকে যে এল এটা!"... দৌড়ে এসে ভয়ে কাঠ হওয়া ছেলেকে সরিয়ে নিয়ে যেত মা নির্মলা। তখন স্ত্রীর ওপরে চেঁচাতে থাকত প্রসন্ন পালিত—"কতবার বলেছি না, ও যেন আমার ধারেকাছে না আসে! সামলে রাখতে পারো না তোমার ছেলেকে! এরপর একদিন রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে বলে দিলাম!" কিংবা—"হটাও আমার চোখের সামনে থেকে! সহ্য করতে পারি না। কোত্থেকে যে এল এটা! যত্তো জঞ্জাল!" একদিন আতঙ্কে নীল হয়ে গিয়েছিল ছোট্টছেলে। লম্বা বারান্দায় খেলতে খেলতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে গড়িয়ে গিয়েছিল ওই নিষিদ্ধ ঘরের চৌকাঠে। পাঁজরে জুতোসুদ্ধু পায়ের কঠিন ঠোক্করে কঁকিয়ে জেগে উঠে দেখে মুখের ওপর ঝুঁকে আছে এক ভয়ংকর দৈত্য, গনগন করছে তার ভীষণ দুটো রাগি চোখ, রক্তলাল চোখে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে দাঁত কিড়মিড় করছে—"কোত্থেকে এসেছে এটা! কোত্থেকে? নিগ্রোদের মতো চেহারা! কোথাকার নোংরা ময়লা?"...ভয়ে মরে যেতে যেতেও বাচ্চা ছেলে বুঝতে পেরেছিল, দৈত্য নয়! ওটা ওই লোকটা—'বাবা!' কী সব বলছে, তার একবর্ণও বুঝতে না পারলেও তার কাছেই আশ্রয় চেয়ে কেঁদে উঠেছিল ছোটো ছোটো দুটো হাত বাড়িয়ে—"বাবা!"...বড়ো হয়েও স্পষ্ট মনে আছে প্রসন্ন পালিতের বীভৎস চিৎকার—"খবরদার। একদম 'ব্যাবা ব্যাবা' করবি না! আর কোনোদিন যদি শুনি, মাথাটা ভেঙে দেব! বদখত্ চেহারা নিয়ে 'বাবা' বলে ডাকছে!"

...সেদিনও ছুটে এসে রক্ষা করেছিল মা; নির্মলা। অবোধ শিশু কাঁদতে কাঁদতে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কী বলে ডাকবে ওই লোকটাকে। ছেলের মাথা বুকে চেপে ধরে রুদ্ধস্বরে মা জবাব দিয়েছিল—"ডাকতে হবে না...কিচ্ছু বলে ডাকতে হবে না"...

এভাবেই বড়ো হতে হতে ক্রমশ অনেককিছুই বুঝতে পারছিল আস্তে আস্তে। বুঝতে পারছিল ওর রাজস্থানি মা আর বাঙালি বাবার বিয়েটা স্বাভাবিক নয়। পাথরের ব্যবসার জন্যে রাজস্থানে যাওয়া-আসা করত শিলিগুড়ির প্রসন্নকুমার পালিত। আশির দশকে কাঁচা টাকা ওড়া শিলিগুড়ি শহরে মা-মরা ছেলেকে সঙ্গে করে এসে কন্‌স্ট্রাকশন ব্যবসা শুরু করেছিল তার দূরদর্শী বাবা প্রফুল্লকুমার পালিত। কালে-দিনে যে ব্যবসার রাশ গিয়ে পড়েছিল একমাত্র সন্তান প্রসন্নকুমারের হাতে। তখন নতুন করে ঢেলে সেজে উঠছে নর্থ্-বেঙ্গলের শিলিগুড়ি—গজিয়ে উঠছে বাড়িঘর, দোকানপাট, গোডাউন, বাস্ট্যান্ড, ট্রাক-টার্মিনাল—যেসবের নির্মাণের সিংহভাগ বরাত জুটছে 'পালিত কনস্ট্রাকশন'-এর ভাগ্যে। যে ভাগ্য তৈরি করে নিতে শিখেছিল প্রফুল্লকুমার পালিত। হাতে ধরে শিখিয়েছিল নিজের ছেলেকে। ফুলেফেঁপে উঠেছে 'পালিত কনস্ট্রাকশন'! মাথার ওপর কাঁচা টাকার বৃষ্টি, হাতে কাঁচা পয়সার অঢেল জোর, পাথরের জন্যে রাজস্থানে যাতায়াত করা প্রসন্নকুমার জড়িয়ে পড়েছিল পাথরপ্রতিমার মতোই সুন্দরী রাজপুত মেয়ে নির্মলা শেঠের সঙ্গে। এরকম বহু মেয়ের সঙ্গেই জড়িয়েছে পয়সাঅলা ঘরের ছেলে প্রসন্নকুমার। বেরিয়েও এসেছে পয়সার জোরেই। কিন্তু এখানে ফেঁসে গেল। পয়সার জোর আর ক্ষমতা, কোনোটাই এখানে খাটল না। নির্মলা, যাকে বরাবর নরম মেয়ে বলে ভাবত, যার শরীরে রাজস্থানের রুক্ষ কাঠিন্যের বদলে ছিল পলিমাটির কোমল পেলবতা, সেই নরমসরম মেয়েই প্রসন্ন পালিতের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে রুখে দাঁড়াল। হাতেনাতে ধরিয়ে দিল। গ্রামের প্রধান, 'মুখিয়া' আর ঝকঝকে খোলা তলোয়ার হাতে ঘিরে দাঁড়ানো রাজপুতদের সামনে মুখ বুজে নির্মলাকে বিয়ে করে একেবারে তাকে সঙ্গে নিয়ে ফেরত আসতে বাধ্য হয়েছিল পালিত কনস্ট্রাকশনের ভাবী মালিক প্রসন্নকুমার। 'ভাবী' কারণ তখন তার বাবা প্রফুল্লকুমার পালিত সপাটে স্বমহিমায় বেঁচে। মেনে না নিলেও ঘরে তুলতে বাধ্য হয়েছিল বউকে। কারণ, মেয়েকে তার শ্বশুরঘরে পৌঁছতে তাদের ঘিরে নিয়ে সুদূর আজমেঢ় থেকে শিলিগুড়ির সেবক রোডের এই বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল গাঁয়ের জোয়ান মরদরা।

পরনে ট্র্যাডিশনাল রাজস্থানি পোশাক, মাথায় শিরস্ত্রাণের মতো বিশাল বিশাল রঙিন পাগড়ি, আর কোমরবন্ধে খাপে পোরা বড়ো বড়ো তলোয়ার। স্পষ্ট করে তারা জানিয়ে দিয়ে গেছিল, প্রয়োজনে খাপ-উন্মুক্ত হতে বিন্দুমাত্র সময় নেয় না রাজপুতের হাতিয়ার! এখনো নেবে না। ...তখন সেবক রোডের পালিত-প্রাসাদ সদ্য নতুন। পুরো বাড়ি ঘুরে, দেখেশুনে সন্তুষ্ট হয়ে মেয়েকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করে ফিরে গিয়েছিল তারা। যাওয়ার আগে নির্মলার কটির খাঁজে গুঁজে রাখা ছোটোখাটো ভারী ছুরিকার ধার পরখ করে নিয়ে বলেছিল—বাঙালি-বউ হয়ে যেন রাজপুতানি ছুরির কদর না ভোলে; যেন কখনো না ভোলে এই ছুরি রাজপুত মেয়ের লাজ, মান, প্রাণ! এরপর প্রফুল্লকুমার আর প্রসন্নকুমারকে দিয়েছিল চরম চেতাবনি—ভুল করেও যেন নির্মলার কোনো ক্ষতি না হয়! তাহলে এই বাড়ির ছেলের ধড় থেকে মুন্ডুটা এককোপে খসে যাবে। —বলতে বলতে খাপ থেকে কৃপাণ উন্মুক্ত করে দেখিয়েছিল তারা। মিথ্যে হুঁশিয়ারি যে নয়, সেটা বুঝে গিয়েছিল মর্মে মর্মে বাপ-ছেলে দুজনেই। আজীবন তারা ভোলেনি ধাঁ ধাঁ করে ওঠা রাজপুত-তরবারির তীব্র ঝলক!

...পালিত বাড়ির বউ হয়ে রয়ে গেল নির্মলা। থাকল বড়ো নরম-সরম হয়ে। কিন্তু তার শাড়ির ফাঁকে গুঁজে রাখা রাজস্থানি ছুরি নজর এড়ায়নি বাপ আর ছেলের। তারা কখনো জানতেও পারল না আসলে কাকে ভালোবেসে, বিশ্বাস করে, নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিল রাজপুত মেয়ে নির্মলা শেঠ! কার বীরত্ব আর প্রেম মিলেমিশে একাকার হয়ে সাকার হয়ে উঠেছিল বাঙালি তরুণ প্রসন্নকুমার পালিতের মধ্যে!—পৃথ্বীরাজ চৌহান! 'রায় পিথোরা!' চৌহান রাজবংশের বীর প্রেমিক-রাজা যে তার প্রিয় অশ্ব চৈতনার ক্ষুরে ঝড় তুলে এসে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তার প্রেম—রাজকুমারী সংযুক্তা!...কোনো দিক থেকে কোনো মিল ছিল না। কিন্তু ছোটো থেকে এদের প্রেমগাথা শুনে বড়ো হওয়া রাজপুত মেয়ের স্বপ্ন দেখায় মিল ছিল! প্রসন্নকুমারের শরীরী খেলায় সেই স্বপ্ন-দেখার বিস্তার ছিল! বাঙালি ছেলের দৈহিক উন্মত্ততায় ওই রাজকীয় প্রেমের মায়াজাল ছিল! লালসার কামুক বিহারে পরিণয়ের নিগূঢ় প্রতিশ্রুতি ছিল!...তাই বুঝতে পারেনি নির্মলা। বুঝতে যখন পারল, তখন ভেতরে ভেতরে খানখান হয়ে গিয়েও বাইরে ভাঙল না। নিজের হাতে নিজের প্রেমের গলা টিপে মারল, কিন্তু ছাড়ল না। ইস্পাত-কঠিন হয়ে, চরম অবহেলায়, পরম প্রেমহীনতায়, নির্লিপ্ত তাচ্ছিল্যে আর স্থির সংকল্পে বিয়ে করল তাকেই! উন্মুক্ত তরবারির মতোই ঝলসে উঠল রাজপুত নারী প্রতিশোধ স্পৃহায়—ছাড়ব না! কিছুতেই ছাড়ব না। যে খেলা খেলেছে আমার স্বপ্ন নিয়ে—সেই স্বপ্ন-খোয়ানোর দাম চুকিয়ে যেতে হবে সারা জীবন ধরে। কড়ায়-গণ্ডায় আমি তুলব এর শোধ!...বিয়ের ঠিক সাড়ে আটমাসে ছেলে জন্মাল। অপুষ্ট, অপরিণত শিশুর জায়গায় পূর্ণাঙ্গ বৃহদাকার বাচ্চা! সেইসঙ্গে অদ্ভুত রকমের সৃষ্টিছাড়া। ভুরু কুঁচকে উঠল সকলের, কপালে জটিল ভাঁজ। শ্বশুর-স্বামী দুজনের চোখেই কুটিল সন্দেহ। তারা প্রবল বিতৃষ্ণায় মুখ ঘুরিয়ে নিল। আকুল স্নেহে নির্মলা বুকে তুলে নিল ছেলেকে। নাম দিল 'পৃথ্বীরাজ'।

—"বিয়ের সময় তুমি প্রেগনেন্ট ছিলে?"...সদ্যোজাত ছেলেকে দেখে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিল প্রসন্নকুমার পালিত। তার বাবা প্রফুল্লকুমার পালিতের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতেও একই প্রশ্ন। যার কোনো জবাব দেয়নি নির্মলা। শুধু সন্তানকে আরো আঁকড়ে ধরেছিল বুকের সঙ্গে। রাগে গরগর্ করে উঠেছিল প্রসন্নকুমার—"কথা কানে যাচ্ছে না? এ ব্যাপারটা আমাকে জানাওনি কেন?"...নির্মলা

তাহলে এই বাড়ির ছেলের ধড় থেকে মুন্ডুটা এককোপে খসে যাবে।

নির্বাক। আরো খেপে গিয়েছিল সদ্য বাবা হওয়া প্রসন্ন পালিত। বাজখাঁই গলায় হুংকার দিয়েছিল—''এটা আমি মেনে নেব না! কিছুতেই মেনে নেব না! ওটাকে আমি...''

কথা শেষ হওয়ার আগেই খুব নরম গলায় নির্মলা বলেছিল—''মেনে নিয়েছ। নার্সিংহোমের রেজিস্টারে নিজের নাম সই করেছ। সমস্ত কাগজে তোমার সই আছে বাচ্চার বাবা হিসেবে...''

শ্বাপদের মতো শ্বদন্ত বের করে মা-ছেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েও থমকে গিয়েছিল প্রসন্ন পালিত। ঝলসে উঠেছে উন্মুক্ত কৃপাণ! ঝলসাচ্ছে তীক্ষ্মমুখ ছুরিকা! অব্যর্থ নিশানায় ঝলক দিচ্ছে রাজপুত রমণীর দুই চোখে!

নিজের অজান্তেই পায়ে পায়ে পিছু হেঁটে পিছিয়ে গিয়েছিল প্রসন্নকুমার। সরে গিয়েছিল প্রফুল্লকুমার পালিত। এরপর থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে তারা তাদের চোখমুখ আর বডি-ল্যাঙ্গুয়েজে সমানে বিষ উগরেছে। নির্মলা একদম নির্বিকার। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অতন্দ্র হয়ে সজাগ! পক্ষীমাতার মতো বিশাল দুই অদৃশ্য ডানা মেলে আগলে রাখে তার শাবককে।...বড়োলোক বাড়ির বংশধরের কোনো অভ্যর্থনা হয়নি। পালিত বংশের রীতি মেনে ছ-দিনে 'ছয়-ষষ্ঠী' পুজো করে ভেজা পাখার বাতাস দিয়ে আদরে 'ষাট ষাট' বলে বরণ করেনি কেউ। এমনকি ধনীঘরের একমাত্র নাতির মুখেভাতটুকুও হয়নি। যার পাঁচ বছর বয়েস অবধি বেঁচে ছিল বাড়ির কর্তা, ঠাকুর্দা প্রফুল্লকুমার পালিত। ছুতোনাতায় টাকার গরম জাহির করে উৎসব-আমোদের ফোয়ারা ছোটানো প্রফুল্লকুমার গরজ করে নাতির অন্নপ্রাশন পর্যন্ত দেয়নি। নির্মলা কালীবাড়ির প্রসাদ এনে ছেলের মুখে দিয়ে তাকে প্রথম ভাত খাইয়েছিল। দেখেও দেখত না শ্বশুরের ভ্যাটকানো মুখ, কোঁচকানো কপাল। শুনেও শুনত না নাতি কাছে গেলেই হাতের ঝাপটায় কাক তাড়ানোর মতো তার 'যাঃ যাঃ'। নিঃশব্দ তাচ্ছিল্যে ছেলেকে শুধু সরিয়ে নিয়ে যেত। পাত্তা দিত না স্বামীর মেজাজ আর চিৎকার। নির্লিপ্ত অবহেলায় ছেলে কোলে তুলে চলে যেত। পরোয়া করত না পাড়াপ্রতিবেশী আর বাইরের মানুষজনের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। তাদের সংশয় আর নীরব প্রশ্ন—এই ছেলে এমন সৃষ্টিছাড়া কী করে!—উত্তরে নির্মলা সকলের মুখের ওপর বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলখানা নিজের চোখের কোণে ঘষে, কাজলের কালি লাগিয়ে দিত ছেলের কপালে—নজর না লাগে! সঙ্গে প্রতীকী 'থুঃ থুঃ'। থুতু বেরোত না, কিন্তু যথাস্থানে গিয়ে লাগত।

এই জায়গা, পরিবেশ, আর বাড়ি—এখান থেকে জোর করে বেরিয়ে ছেলেদের সেরা ইংলিশ মিডিয়ামের স্কুল—শিলিগুড়ি 'ডন বসকো'। সহজ ছিল না! তবু হল নির্মলার ঠান্ডা লড়াই আর নাছোড় জেদে। ওখান থেকেই উঁচু নম্বর নিয়ে স্কুলের প্রথম ধাপ আই. সি. এস. ই—ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন; তারপর প্লাস টু-র দ্বিতীয় ধাপ আই. এস. সি—ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট; সেখান থেকে একেবারে দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ। এই শেষ ধাপটাতে পৌঁছনো সবথেকে কঠিন ছিল। একেবারে তুমুলভাবে বেঁকে বসেছিল প্রসন্ন পালিত—''এত টাকা আমি তোমার ছেলের পেছনে খরচা করতে পারব না! করব না।''...নির্মলা যুদ্ধে নামার আগেই সেই প্রথম 'ওই লোকটার' সঙ্গে সরাসরি কথা বলে উঠেছিল আঠেরো বছরের ছেলে—''পারবে, কারণ 'পালিত কনস্ট্রাকশনের' অনেক টাকা। ফ্যামিলি-বিজনেস এটা। লিগাল এয়ার হিসেবে এ টাকায় আমারও রাইট আছে।''...হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল প্রসন্নকুমার। কথা বলবে কি, রাগ করতেও ভুলে গিয়েছিল। তার থেকে প্রায় একহাত লম্বা ছেলে তখন বলছে—''আর করবেও তুমি এ টাকা খরচ। করতে হবে আমার এডুকেশনের জন্যে। কারণ লিগালি আমি এই ফ্যামিলির ছেলে। সন্দেহ থাকলে এতদিনেও ডি. এন. এ. টেস্ট করাওনি কেন?''

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিল প্রসন্নকুমার পালিত। মাটি মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে সা-জোয়ান লম্বা-চওড়া ছেলে। এ কোন ছেলে!...বুকের মধ্যে অসংখ্য ছুঁচ ফোটার তীব্র যন্ত্রণা। কুলকুল করে ঘামছে সারা শরীর। ছাইবর্ণ হয়ে আসছে ফ্যাটফেটে ফরসা রং। পড়ে যাওয়ার আগেই নরম দু-হাতের বেড়ে ঘিরে নিল কেউ। ধরে ফেলল। অনেক দূর থেকে ভেসে এল তার আর্ত চিৎকার—''রাজু! তোর বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এক্ষুনি!''...

আর—সেই মুহূর্তে!

প্রসন্নকুমারের ছাইবর্ণ মুখ দেখতে দেখতে ছেলে দেখছিল আট বছর আগের ছাই হয়ে আসা এই একই মুখ! প্রথমে ছাই, তারপরে রক্তবর্ণ। দেখছিল, দশ বছরের বালকের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন! দেখতে পাচ্ছিল, ঘোর দুপুরে আলোছায়ার কুহেলিমাখা সেই অজানা রহস্যের ঘর!

...কোনো কারণে সেদিন অসময়ে ছুটি হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির কাছেই সেবক রোডের ওপর 'ডন বসকো' স্কুলে হেঁটেই যাতায়াত করত। সেই দুপুরে লোহার গেট পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে অবাক হয়েছিল। ভর দুপুরে মস্ত লোহার গেটটা খোলা! বড় তালাটা কেমন যেন অসহায় ভাবে আধটানা হ্যাচবোল্টে অনাথের মতো ঝুলছে! ধারেকাছেও দারোয়ানের টিকির দেখা নেই!...গেট দিয়ে ঢুকে সামনের মস্ত বাগান পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিল। বাড়ির একতলার সদর দরজাটাও আধখোলা, ভেজানো। দোতলার মতোই একতলাতেও লম্বা বারান্দার ধারে সারিসারি ঘর—ড্রইংরুম, ডাইনিংরুম, স্টোররুম আর তিনটে পরপর গেস্টরুম। শেষ গেস্টরুমের পাশ দিয়ে দোতলার সিঁড়িতে উঠতে যাবে, থমকে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটানা অদ্ভুত একটা আওয়াজ আসছিল ঘরটা থেকে। কেউ যেন ব্যথায় কাতরাচ্ছে! চাপা গোঙানির শব্দ উঠছিল—''আঃ! আঃ! আঃ!''...দুপুরের নিস্তব্ধতা চিরে ক্রমশ বাড়ছিল ওই আওয়াজ! জোরদার হচ্ছিল, দ্রুতলয়ে ছুটছিল ওই শব্দ—''আঃ আঃ আঃ আঃ আঃ...''

দোতলার সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতে গিয়েও দিল না। এসে দাঁড়াল ঘরের বন্ধ দরজার সামনে। ভেতরের 'আঃ আঃ' ধ্বনি তখন প্রায় চিৎকারে পরিণত হয়েছে! ভয় পেয়ে গেল দশ বছরের ছেলে। জোরে ঠেলা দিল দরজায়। ভেতর থেকে লক্ করা ছিল না। হাঁ হয়ে সপাটে খুলে গেছিল চাপ দিয়ে বন্ধ হয়ে থাকা ভারী কাঠের পাল্লাদুটো ধড়াম করে। আর আতঙ্কে পাথর হয়ে পা দুটো জমে গিয়েছিল ওর! ভীত বিস্ফারিত চোখ দেখছিল, 'বাবা' নামের ওই লোকটা খাটের ওপর উপুড় হয়ে একজনকে ধামসাচ্ছে! প্রচণ্ড বেগে ওঠানামা করছিল তার ফটফটে সাদা সম্পূর্ণ উলঙ্গ শরীর! গায়ে একটা সুতোও নেই! আর দলিত হতে হতে, পিষ্ট হতে হতে, তার নীচে শুয়ে কাতরাচ্ছে

যে মহিলা, সে-ও সম্পূর্ণ নগ্ন! খোলা দুই হাতে আর পায়ে সে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে আছে ওই লোকটাকে আর চিৎকার করে চলেছে একই সঙ্গে!....

দরজা খোলার আওয়াজে চমকে ফিরে তাকিয়েছিল প্রসন্নকুমার পালিত। একদম রক্তশূন্য ছাইবর্ণ হয়ে গিয়েছিল তার মুখ। পরক্ষণেই ক্রোধে রক্তবর্ণ। রক্তচক্ষু মেলে ক্ষিপ্ত চিৎকার দিয়ে উঠেছিল—"দূর হ! দূর হ এখান থেকে! যেখান থেকে বেরিয়েছিস মেরে পাট করে সেখানে ঢুকিয়ে দেব! কৃমিকীট কোথাকারের! ভ্যাজাইনাল ওয়ার্ম্ একটা! স্কাউন্ড্রেল যোনিকীট!"

ওই বিকট চিৎকারই সাড় ফিরিয়ে এনেছিল। মরণপণ দৌড় দিয়েছিল দশ বছরের ছেলে। কিন্তু ওই ক্ষণমুহূর্তেই দেখতে পেয়ে গেল দ্বিতীয়জনকে! আকস্মিক ছন্দপতনে যে এদিকে মুখ ফিরিয়েছে! ঠিকরে বের হয়ে আসা চোখে ওকেই দেখছে!—কবিতা আন্টি! রঙের কারবারি হরজিৎ সিং-জির দুই পিঠোপিঠি মেয়ের বড়োজন! সরিতা আন্টির দিদি!—

দু-দুটো আকস্মিক ধাক্কায় মরণছুট ছুটে এক নিঃশ্বাসে হাঁপাতে হাঁপাতে দোতলায় উঠেই আরেক ধাক্কা। ওর দশ বছরের জীবনের সবথেকে চরম আর মর্মান্তিক। দোতলায় ওদের ঘরের সামনে পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মা! ধকধকিয়ে জ্বলছিল তার শান্ত মৃগনয়না চোখ! মায়ের এরকম দৃষ্টি কখনো দেখেনি ওর দশ বছরের জীবনে! ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেল—"মা!"...বিদ্যুৎবেগে ছেলের গালে ঠাস করে এক চড় মারল নির্মলা।—"কেন খুলতে গেলি দরজা? কেন ঢুকলি ওই ঘরে?"

মায়ের হাতে মার খাওয়া সেই প্রথম। ঘুরে পড়তে পড়তেও অবাক হয়ে মাকেই দেখছিল। নির্মলা এগিয়ে এল। ছেলের গালে দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুটে উঠেছে পাঁচ-আঙুলের ছাপ! জ্বলন্ত দৃষ্টি নিভে গেল ছেয়ে আসা বাদল-মেঘে। ছেলের গালে স্নেহেভেজা হাত বুলোতে বুলোতে বুকে টেনে নিল। মায়ের বুকের চেনা নিশ্চিন্ত আশ্রয়। মিষ্টি সোঁদা গন্ধের চেনা ঘ্রাণ। মুখ ডুবিয়ে প্রাণভরে সেই গন্ধ শুষে নিতে নিতে দশ বছরের ছেলে টের পাচ্ছিল সেখানে বন্দি হয়ে থাকা কোনো অজানা কষ্টের। উবে গেল অভিমান, মিলিয়ে গেল বিনা অপরাধে মায়ের হাতের প্রথম মারের আঘাত। ডুকরে উঠল—"আর কক্ষনো করব না মা! আর কক্ষনো দরজা খুলব না। আমি জানতাম না, ঘরে ওই লোকটা আর কবিতা আন্টি..."

কথা শেষ করতে দেয়নি নির্মলা। বুকের মধ্যে ভরা দশ বছরের ছেলের মাথাটা নিবিড় করে চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে উঠেছিল—"চুপ!"

'অনঙ্গদেব' হয়ে উঠতে উঠতে অনেকবারই মনে হয়েছে—ওর দশ বছরের ওই অঘোরী দুপুরেই পোঁতা হয়ে গিয়েছিল এই পরিণতির অমোঘ বীজ! যেটাকে খুব পটু হাতে ফাটিয়ে তার থেকে শেকড় টেনে বের করেছে ওই কবিতা আন্টিরই বোন সরিতা আন্টি। নয়তো শিলিগুড়ি থেকে সুদূর দিল্লিতে এসে এই যোগাযোগ হত না। যে শিলিগুড়ি থেকে নিজেকে আমূল উপড়ে তোলার প্রতিজ্ঞায় রেকর্ড নম্বর নিয়ে আই.এস.সি. উতরানো আঠেরো বছরের ছেলে জেদ ধরে বসেছিল দিল্লির নামকরা কলেজ সেন্ট স্টিফেন্স-এ পড়বে। সায়েন্স স্ট্রিম ছেড়ে ইংরিজিতে অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করবে। ভবিষ্যতে ইংরিজি কাগজের সাংবাদিক হবে। তাই আঠেরো বছর বয়সে ওই 'লোকটার' সঙ্গে প্রথম সরাসরি কথা বলেছিল। জানিয়ে দিয়েছিল শক্ত গলায়—"আমার এডুকেশনের জন্যে করতে হবে তোমাকে টাকা খরচ। দিতে হবে ফ্যামিলি-বিজনেস 'পালিত কনস্ট্রাকশন' থেকে। কারণ লিগালি আমি এই ফ্যামিলির ছেলে। সন্দেহ থাকলে ডি. এন. এ. টেস্ট করাওনি কেন...?"—যা শুনে অকল্পনীয় ধাক্কায় হার্টে বিষম ঘা পড়েছিল প্রসন্নকুমার পালিতের। বুকে তীব্র যন্ত্রণা আর ঘামে ভেজা শরীরে জ্ঞান হারানোর মুহূর্তে দেখতে পেল সেই দুপুরের দশ বছরের ছেলের কাছে উদোম হয়ে যাওয়া নিজেকে। সেইরকম ছাইবর্ণ মুখ নিয়ে পড়ে যেতে যেতেও স্পষ্ট দেখতে পেল আতঙ্কে কাঠ, বিস্ফারিত দৃষ্টির সেদিনের সেই ছেলে আঠেরো বছরের লম্বা-চওড়া সা-জোয়ান হয়ে আজ অকুতোভয়ে চোখে চোখ রেখে তার শোধ তুলছে। বংশছাড়া সৃষ্টিছাড়া ছেলে বুক ঠুকে উত্তরাধিকারের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তার প্রাপ্য দাবি করছে...

আসল ধাক্কাটা যে কোথায় লেগেছে, সেদিন নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিল আঠারো বছরের ছেলে। তাই ওইদিন নার্সিংহোমের ওয়েটিং-রুমে বসে মাকে করেই ফেলেছিল প্রশ্নটা। যে প্রশ্ন শুধু অন্য লোকের কেন, নিজের চোখেও চলকে উঠতে দেখত আয়নার সামনে দাঁড়ালে। মুখ ফসকে সেটাই সেদিন বাইরে বেরিয়ে এল—"আমি এরকম দেখতে কেন? —কেন এরকম আলাদা?"...

চমকে ফিরে তাকিয়েছিল নির্মলা। ছেলেকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে, চোখে চোখ বিঁধিয়ে ফিরে প্রশ্ন করেছিল তীক্ষ্ণ গলায়—"কী বলতে চাইছিস তুই? কী জানতে চাইছিস?"

চোখ সরিয়ে নিয়ে ছেলে তখন আস্তে করে একটা অন্য কথা বলে বসল—"আমার ডি. এন. এ. টেস্ট করাওনি কেন? ওই লোকটার মুখের ওপর ছুড়ে দিতে পারতে!..."

দুর্বোধ্য হেসে নির্মলা জবাব দিয়েছিল—"ঠিক সেইজন্যেই করাইনি..."

বুকটা ধক্ করে উঠে ভীষণ বেগে ছুটতে শুরু করেছিল। —তবে কি...তবে কি...তবে কি ও...!

নির্মলার ঠোঁটে নিগূঢ় হাসি—"এটাই আমার তুরুপের তাস; আর এটাই ওই লোকটার সারা জীবনের শাস্তি। এর থেকে তাকে রেহাই পেতে দেব না। সারা জীবন এটা বয়ে বেড়াবে প্রসন্ন পালিত।"

বুকের ভেতর দাপাচ্ছিল তুমুল ঝড় অনিবার্য প্রশ্ন তুলে—তাহলে তাই? তাই ও এমন অদ্ভুত! এমন বংশছাড়া সৃষ্টিছাড়া?

নির্মলা যেন ওর মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল—"ঠিক তাই। যদি জানতাম এটা 'ঠিক', তাহলে অনেক আগেই ওই পরীক্ষা করাতাম। সেই রিপোর্ট ওদের মুখের ওপর ছুড়ে মারতাম। শুধু প্রসন্ন পালিতেরই না, তার বাবা প্রফুল্ল পালিতেরও! তার লাগামছাড়া প্রশ্রয়েই তার মতোই হয়েছে তার ছেলে। নিজেও ওই একই চরিত্রের ছিল।"

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। আঠেরো বছরে, জীবন শুরু করার সন্ধিক্ষণে এ কোন নগ্ন সত্যের মুখোমুখি হতে চলেছে! কোন অনিবার্য সংকটের দিকে ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মা? অস্তিত্বের বিপুল সংকট! মায়ের মুখ থেকে ছিটকে আসা 'ঠিক' শব্দটা তির হয়ে বুকে বিঁধল।

কী 'ঠিক'? জন্মের কোন চরম 'ঠিক'-এর ওপর থেকে পর্দা সরতে চলেছে!

ছেলের উদগ্রীব মুখের দিকে চেয়ে নির্মলা ফের বলল—"হ্যাঁ, ঠিক তাই। যদি জানতাম তুই এদের কেউ না, অন্য কারুর, তাহলে আমিই নির্দ্বিধায় ওই পরীক্ষা করিয়ে তার ফলাফল মুখে ছুড়ে মেরে এদের নিশ্চিন্তি জীবনের মতো ঘুচিয়ে দিতাম। কিন্তু তুই এই পালিত বংশেরই ছেলে। প্রসন্নকুমার পালিতের সন্তান। তাই করাইনি ওই টেস্ট। নিজের সাফাই গাইবার জন্যে প্রমাণ দেখিয়ে এদের তুষ্ট হতে দিইনি। ইচ্ছে করেই সন্দেহের কাটায় বিধঁতে দিয়েছি, সংশয়ের জ্বালায় জ্বলতে দিয়েছি। বিশেষ করে ওই প্রসন্ন পালিতকে। যে আমার ভালোবাসার ফায়দা তুলতে এসেছিল; ঠকিয়ে আমার সর্বস্ব লুটে যে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, যে আমার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। এই দণ্ড তাকে সারা জীবন ধরে ভোগ করতে হবে..."

বলতে বলতে গলা ধরে এসেছিল নির্মলার। আর হতবাক হয়ে গিয়েছিল ছেলে। আঠেরো বছর বয়সে এ কোন নতুন জন্ম হল! অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একসময় জানতে চাইল—"কিন্তু এরাই যদি জোর করত ডি. এন. এ. টেস্টের জন্যে? এত সন্দেহ যখন!"

সদর্পে হাসল রাজপুত-রক্তের রমণী। দৃঢ় প্রত্যয়ে বলল—"সেইজন্যেই করাত না। এত সন্দেহ বলেই এত ভয়। পাছে বেরিয়ে পড়ে যা ভাবছে তাই! টাকা আর প্রতিপত্তির পালিত-ফ্যামিলি তখন বাইরের লোক দূরে থাক, নিজেদের কাছেই মুখ দেখাবে কী করে?"

এই বিচিত্র মায়ের দিকে একবুক ভালোবাসা আর তেমনি কষ্ট নিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ছেলে। ছেলের হাতে আদরের চাপ দিল নির্মলা। নরম গলায় বলল—"কী দেখছিস এমন করে? আমার কথা ভাবিস না। আমার অদৃষ্ট আমি নিজে তৈরি করেছি। আর তুই এরকম 'আলাদা' হলি কী করে? সেটা আমি নিজেই জানি না। তবে 'সৃষ্টিছাড়া' তুই নোস। আমাদের রাজপুত রক্তে কত রকমের যে মিশেল আছে! সেটাই হয়তো সৃষ্টির খেয়ালে তোর মধ্যে বেরিয়ে এসেছে!"

ছেলে যতো দেখছিল আর শুনছিল, ততো যেন নতুন করে চিনছিল ওর এতকালের জানা মাকে। নির্মলা তখন বলছে—"তাই তোর এই একেবারে 'অন্যরকম' হওয়াটা আমার কাছে ঈশ্বরের দান। সকলের মনে তোকে নিয়ে যে প্রশ্ন, সেটাই আমার এদের ওপর প্রতিশোধের হাতিয়ার। ভাবুক সবাই তুই শুধু আমারই ছেলে! আজীবন এই দণ্ড ভোগ করুক প্রসন্ন পালিত!"

ইচ্ছে করছিল মাকে জড়িয়ে ধরে বলে—আমি শুধু তোমারই ছেলে, মা! শুধু তোমার সন্তান!

নার্সিংহোমের ওয়েটিংরুমের স্পিকারে তখন প্রসন্নকুমার পালিতের নাম ঘোষণা করে তার বাড়ির লোককে ডাকা হচ্ছে। ত্রস্ত হয়ে তড়িঘড়ি উঠে গেল নির্মলা। তাই দেখে ছেলে হাসল। মনে মনে বলল—শুধু প্রসন্ন পালিত নয়, দণ্ড তুমিও ভোগ করছ মা! প্রসন্ন পালিতকে ভালোবাসার দণ্ড তুমি আজও ভুগে চলেছ। নিজেও জানো না, তুমি এখনো তার জন্যে কতটা কেয়ার করো!..."

উঠতে গিয়েও উঠল না। মা-ই তো গেছে! মাথাটা ভারী লাগছে। ঘনিয়ে আসছে দশ বছর বয়েসের ওই দুপুর পেরোনো, দিন ফুরোনো, অনিশ্চয় রাত।...সেই রাতে ওই ভয়ংকর লোকটা টলতে টলতে ঢুকে জড়ানো গলায় মাকে হুকুম করেছিল—"আমার ঘরে একবার আসবে। দরকার আছে।"...চোখ ফোটা থেকে ছোট্ট ছেলে বরাবর দেখে এসেছে ওদের আর ওই লোকটার ঘর আলাদা। কিন্তু আলাদা ঘরে থাকলেও মাঝে মাঝে এসে মাকে এরকম ডাকে। ওকে ঘুম পাড়িয়ে ওই ঘরে ঢোকে মা, আবার ফিরে আসে বেশ খানিকক্ষণ পরে। ওকে জড়িয়ে ধরে ঝুপ করে পাশে শুয়ে পড়ে। কিন্তু ওইসব রাতে মায়ের গায়ের চেনা মিষ্টি গন্ধটা আর পেত না। কেমন যেন অন্যরকম লাগত—বোঁটকা, বিশ্রী! ওরকম এক রাতে মায়ের হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল—"তোমার গায়ে বিচ্ছিরি গন্ধ! ও-ঘর থেকে এলেই তোমার গা দিয়ে এই বিচ্ছিরি গন্ধটা বেরোয়।"...নিঃশব্দে ছেলের পাশ থেকে উঠে গিয়েছিল নির্মলা। অত রাতে আপাদমস্তক ভিজিয়ে স্নান করে যখন আবার এসে শুলো, তখন সারা ঘরে ভুরভুর করছে চন্দন সাবানের চেনা সুবাস। মাকে জাপটে ধরে ছেলে তার বুকে মুখ ডুবিয়ে প্রাণভরে শুঁকতে শুঁকতে বলে উঠেছিল—"এখন আবার সেই মা মা গন্ধ তোমার গায়ে।"...এরপর থেকে যখনই রাতে ও-ঘরে যেতে হত, ফিরে এসে নির্মলা তার পেটেন্ট চন্দন সাবান মেখে ধারাস্নানে আগাপাশতলা ধুয়ে, তবে ছেলের পাশে এসে শুত।...কিন্তু সেই রাতে! ওই বিশ্রী দুপুরের অন্ধকার রাতে মত্ত লোকটা যখন 'দরকার আছে' বলে ডেকে গেল, তখন দশ বছরের ছেলে তার অপরিণত বুদ্ধিতে ভয়ে সিঁটিয়ে মাকে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধরেছিল—"আজকে ওই ঘরে যেও না! আজ ওই লোকটা তোমাকে মেরেই ফেলবে! দুপুরে যেমন করে কবিতা আন্টিকে মারছিল, আর কবিতা আন্টি ব্যথায় চেঁচাচ্ছিল!"...নির্মলা ওই দুপুরের মতো ছেলেকে চাপা স্বরে বলে উঠেছিল—"চুপ!" কিন্তু অন্য সব রাতের মতন যায়নি ওই ঘরে।...অনেক রাতে আবার এসেছিল ওই লোক। তার চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেছিল।—"কী হল? কথা কানে যায়নি? বলে গেলাম না, ঘরে আসতে হবে! দরকার আছে!"...নড়ে ওঠা ছেলেকে জড়িয়ে নিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়েই নির্মলা জবাব দিয়েছিল—"আজকেও দরকার আছে? এই দুপুরের পরেও?"...ক্রোধে আরও জোরে চিৎকার করে উঠেছিল প্রসন্ন পালিত—"হ্যাঁ, আছে দরকার! তোমার সুপুত্রের জন্যে দরকারটা দুপুরে মেটানো যায়নি।"...ভয়ে কাঁটা হয়ে ছেলে শুনল, মা শক্ত গলায় বলে দিল—"আমার সুপুত্রের জন্যেই এবার থেকে তোমার দরকার মেটানোর ব্যাপারটা অন্য জায়গায় সেরে এসো। ছেলে বড় হচ্ছে, বাড়ির মধ্যে এসব বন্ধ কর।"...ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো ধেয়ে এসেছিল ওই লোক। মেরেই বসবে বুঝি! আর আরও কঠিন গলায় নির্মলা হুঁশিয়ারি দিয়েছিল—"কোমরে যেটা গোঁজা আছে সেটা এতকাল পর বের করতে বাধ্য করো না!"...হঠাৎই থমকে গিয়েছিল প্রসন্নকুমার। আর না এগিয়েই দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছিল—"বটে! এত সাহস! তোমার ছেলের জন্যে আমাকে আমার বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে ব্যাপার সারতে হবে?"...ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা ছেলে শুনতে পেল মা এবার একদম স্বাভাবিক গলায় কথা বলছে—"হ্যাঁ। কারণ আমার ছেলের ভালোমন্দ আমাকে আগে দেখতে হবে বইকি!"...গর্জে উঠতে গিয়েও তেমন করে পেরে উঠল না লোকটা। তার বদলে খেঁকিয়ে উঠল—"আমার ছেলে! আমার ছেলে! গলাবাজি করে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে 'আমার ছেলে' বলতে লজ্জা করে না

তোমার?"...ছেলে অবাক হয়ে শুনল মা ঝরঝরিয়ে হাসছে আর বলছে—"ও মা! সত্যিকথা বলতে লজ্জা করবে কেন? আমারই তো ছেলে! জানো না?"...জবাব না দিয়ে নিষ্ফল ক্রোধে গজরাচ্ছিল প্রসন্নকুমার। নির্মলা তেমনি সহজ ভাবে বলে দিয়েছিল—"আজকের দিনটা ভুলবে না আমার ছেলে। আর কটা বছরের মধ্যেই সব বুঝতে পারবে। তাই আজকের রাতে আমি যদি তোমার ঘরে ঢুকি, ভবিষ্যতে ও আমাকে সম্মান করতে পারবে না। আর একটা কথা, এখন থেকে ছেলের সামনে তুমি আমাকে এভাবে ডাকবে না।"...হঠাৎই কেমন যেন বেসামাল হয়ে গিয়েছিল লোকটা। চলে গিয়েছিল নিজের ঘরে। অত ক্রোধেও অপার বিস্ময় তার—এ কোন নির্মলা!...এরপর থেকে ও-ঘরে আর তার ডাক পড়েছে কিনা ছেলে জানে না। পড়লেও টের পায়নি। তেমনই জানতে পারেনি মা আর ওই ঘরে গেছে কিনা।

...রাজস্থানি লোরীর দেহাতি সুর। নরম হাতে আস্তে আস্তে চাপড় দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে মা। বড় আরামের ঘুম!

ধড়মড় করে উঠে বসল আঠেরো বছরের পৃথ্বীরাজ পালিত। চাপড় দিয়ে ঘোর ভাঙাচ্ছে মা! এটা নার্সিংহোমের ওয়েটিংরুম! ওর মুখের ওপর ঝুঁকে দেখছে নির্মলা।—"কী হল? ঘুমিয়ে পড়লি যে হঠাৎ! শরীর খারাপ লাগছে?"

বড়ো হয়ে যাওয়া ছেলে হাসল। মায়ের কাছে কোনোদিনই ও আর বড়ো হবে না। হেসে বলল—"না, শরীর ঠিকই আছে। ঘুমোইনি; চোখ বুজে তোমাকেই দেখছিলাম।"

নির্মলা হাসছে। মুখের ওপর থেকে সরে গেছে ত্রস্ত, তটস্থ ভাব! আদর করে মাথার চুল ঘেঁটে দিল—"পাগলা ছেলে! আর হ্যাঁ, তোর বাবা এখন ঠিক আছে। বড় একটা অ্যাটাক হতে হতে হয়নি। কটা দিন এখানে থেকে রেস্ট করুক। ভয়ের কিছু নেই।"

মাকে দেখতে দেখতে ছেলে মনে মনে বলছিল—কার ভয়ের কিছু নেই? 'ওই লোকটার', না তোমার?

উজ্জ্বল মুখে ছেলেকে নিয়ে গাড়িতে উঠল নির্মলা। বলল—"দিল্লির ওই কলেজেই তুই পড়তে যাবি। এ নিয়ে চিন্তা করিস না। আর, সে বাড়িতে এলে এটা নিয়ে তার সঙ্গে কোনো অশান্তি করিস না, কেমন? যতোই হোক, হার্টের ব্যাপার তো!"

মাকে আশ্বস্ত করে মাথা নাড়ল বাধ্য ছেলে। ভাবছিল—কার দণ্ড কে ভুগছে! ভুগে চলেছে সারাটা জীবন ধরে?

—"এখানে তুই চট করে হস্টেলে জায়গা পাবি না। বিশেষ করে ছেলেদের হস্টেলে সিট খুবই কম। যা আছে, সেটাও পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশন স্টুডেন্টস আর রিসার্চ-স্কলারদের জন্যে লিমিটেড। তাদের প্রেফারেন্স আগে। তারপর তোদের মতন সদ্য কলেজে ঢোকা ছেলেদের চান্স আর প্রায় থাকেই না...।" কথাগুলো বলছিল সরিতা আন্টি। শিলিগুড়ির সেবক রোডের বাসিন্দা, রঙের ব্যবসায়ী হরজিৎ সিং-এর ছোটোমেয়ে। পালিতদের প্রতিবেশী।

তারই পাশে বসে মস্ত এয়ারকন্ডিশনড্ গাড়িতে তাদের গ্রেটার কৈলাসের বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। সরিতা সিং এখন সরিতা চাড্ডা। দিল্লির নামকরা রিয়েল-এস্টেট কম্পানির মালিক সুরিন্দর চাড্ডার স্ত্রী। প্রয়োজনীয় নম্বর থাকলেও সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে ভর্তি হওয়া থেকে যাবতীয় ব্যবস্থা সুরিন্দর চাড্ডার দৌলতেই হয়েছে। 'পালিত কনস্ট্রাকশন'-এর সঙ্গে পেইন্ট-এর কারবারি সিং-দের সম্পর্ক ব্যবসার গোড়া থেকেই। প্রসন্নকুমার পালিতের ছেলে দিল্লির কলেজে পড়তে চায় শুনে হরজিৎ সিং নিজে থেকেই তার প্রভাবশালী ছোটোজামাই সুরিন্দর চাড্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল। সুরিন্দর চাড্ডা আবার সেই দায় চাপিয়েছিল তার তুখোড় স্ত্রী, দিল্লির সোসাইটি-লেডি সরিতা চাড্ডার ঘাড়ে।

—"কী রে, কী ভাবছিস এত?"...পাশ থেকে জিজ্ঞেস করেছিল সরিতা আন্টি। জন্ম থেকে শিলিগুড়িতে থাকার জন্যে বাঙালিদের মতোই বাংলা বলে। ঝরঝরে বাংলায় বলে উঠল—"ভাবছিস জলে পড়েছিস? অতো ভাবিস না। ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। আপাতত তো আমার ওখানে ওঠ্!"

নিশ্চিন্ত হয়েছিল অনেকটা। কিন্তু পুরোটা না। সরিতা আন্টির চোখেমুখে-ঠোঁটে চিকচিক করছিল কেমন একটা চাপা হাসি। যার অর্থ পরে বুঝেছে অনঙ্গ। না, তখনো 'অনঙ্গ' হয়নি। তখনো শিলিগুড়ির গন্ধমাখা 'স্মল টাউন' ছেলে রাজু—পৃথ্বীরাজ পালিত। যার সবে তখন আঠেরো পুরে উনিশে পা।

গ্রেটার কৈলাসের বাড়ির গেস্টরুমে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল সরিতা আন্টি। সেটা সাময়িক। পার্মানেন্ট ব্যবস্থা হয়েছিল ওদের কলেজ এলাকা 'নর্থ ক্যাম্পাস'-এর কাছাকাছি কমলানগরের এক বাড়িতে পেয়িং-গেস্ট হিসেবে। এ ব্যবস্থাও সরিতা আন্টিরই। কিন্তু তখন জানায়নি ওকে। এত পয়সা, বিত্ত আর বৈভব, কিন্তু ভোগ করার কেউ নেই। সন্তান হয়নি ওদের। সুরিন্দর চাড্ডা প্রথমদিন ডিনারে বসে বলেছিল—"এখানে যতদিন আছ একদম নিজের বাড়ির মতো থাকবে। কোনো অসুবিধে হলে তোমার সরিতা আন্টিকে বলবে। লজ্জা করবে না। তুমি তো আমাদের ছেলের মতন।"...সুরিন্দর চাড্ডা প্রচণ্ড ব্যস্ত মানুষ। খেতে খেতেই এন্তার ফোন আসছিল। দেখে দেখে কল রিসিভ করছিল। একটা ফোনের পর আধ-খাওয়া প্লেট ফেলে রেখে, ওদের হাত নেড়ে, কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল। ভালো লেগেছিল মানুষটাকে। সরিতা আন্টিকে জিজ্ঞেস করল—"আঙ্কল না খেয়ে চলে গেলেন?" সরিতা চাড্ডা নির্বিকার মুখে খেতে খেতে বলেছিল—"খিদে পেলে ঠিক খেয়ে নেবে। তাও তো আজ তোর খাতিরে ডিনার-টেবিলে এসেছিল! তুই খা। আঙ্কল খেল না বলে তোর খেতে অসুবিধা হচ্ছে?"...এ আবার কেমন কথা? তাড়াতাড়ি খাওয়ায় মনোযোগ দিল। অস্বস্তিকর নীরবতা। মুখ তুলে দেখে সরিতা আন্টি ওর দিকেই চেয়ে আছে। মুখেচোখে তেমনি চাপা হাসি। চোখাচোখি হতে কেটে কেটে বলল—"অসুবিধা হলে আমাকে বল্! শুনলি না তোর আঙ্কল কী বলে গেল? তুই তো আমাদের ছেলের মতন!"...ঝিনঝিনে হাসির ফোয়ারা ছুটল সারা ঘর জুড়ে! ঘসঘসে ঘন গলার স্বর যে মুহূর্তে বদলে গিয়ে এমন তীক্ষ্ন লহরী তুলতে পারে, না শুনলে জানতেও পারত না আঠেরো বছরের ছেলে। এই সরিতা আন্টি নতুন, একেবারে নতুন! শিলিগুড়ির চেনা মেয়ে নয়!..হাসি থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর সরিতা চাড্ডা। যেন নিজের মনেই বলছে—"সুরিন্দর চাড্ডা মানুষটা ভালো। বিজ্‌নেসম্যান হিসেবে আরও ভালো। কিন্তু বড্ড বোকা! এরকম একটা লম্বা-চওড়া শক্তপোক্ত

জোয়ান ব্যাটাছেলেকে কেউ দুম করে বলে 'নিজের ছেলের মতো'? ডিসগাস্টিং!" শেষ শব্দটায় এমন একটা ছোবল ছিল, যে ও চমকে উঠল। তাই দেখে সরিতা চাড্ডা টেবিলের ওপর ঝুঁকে এসে তার ফ্যাসফেসে স্বরে আরেকটা ছোবল মারল—"আঙ্কল-আন্টি কাকা-মামা মাসি-পিসি এগুলো একেকটা ডাক—জাস্ট ডাকার নাম। ডাকলেই সেটা সম্পর্ক হয়ে যায় না। রিলেশন হয়ে যায় না। কবিতাদিদি তো তোর বাবাকে 'দাদা' বলে ডাকত—'প্রসন্নদা'। তাই বলে কি সত্যিই তার দাদা ছিল প্রসন্ন পালিত? হতে পেরেছিল দাদার মতন? নিজের চোখেই তো সব দেখেছিস! দেখিসনি?"...

আচমকা আঘাতে নীল হয়ে গেছিল সদ্য আঠেরো পার হওয়া ছেলে। অবশ হাত থেকে খসে পড়ল খাবার। বিষাক্ত নেশার মতো ঝিম ধরা চোখের সামনে ভেসে উঠল ঘোর দুপুরের সেই আলোছায়া ঘর! সেই শীৎকার! সেই আদিম সম্ভোগরত নরনারী!

সরিতা আন্টি তখন উঠে এসে, তেমনি বিষাক্ত হেসে ওর পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হাস্কি গলায় হিসহিসিয়ে বলছিল—"মতন বলে কিছু নেই। কিছু হয় না। এভরিথিং ইজ্ ফিজিকাল। পিওরলি ফিজিকাল..."

ঠিক তার পরের দুপুর!

আট বছর আগের সেই ঘোর দুপুর!—

দশ বছর বয়সের মতো আলো-আঁধারির কুহেলি মাখা আরেক গ্রহণ লাগা দুপুর!—

আচমকা এক অসম সংঘটনের প্রতিঘাতে বিলুপ্ত হয়ে গেল পৃথ্বীরাজ। ফণা তুলল আগাম ভবিষ্যতের অনঙ্গ—কিউপিড অনঙ্গদেব।

কমলানগরে পেয়িং-গেস্ট হয়ে চলে যাওয়ার আগে টানা একটা মাস গ্রেটার কৈলাসের চাড্ডা হাউস। কথায় বলে 'দিনের বেধবা, রাতের ছেনাল'—সেটা এখানে উলটো হয়ে—দিনের ছেনাল, রাতের 'এস্কর্ট'। দুপুরে সরিতা আন্টির সঙ্গে বিছানায়, আর রাতে সোসাইটি-লেডি মিসেস চাড্ডার বাহুতে বাহু গলিয়ে তাকে নিয়ে পার্টিতে পার্টিতে ঘোরা। সরিতা চাড্ডার একচেটিয়া অধিকারের জ্যান্ত প্রদর্শনী। পৃথ্বীরাজ থেকে অনঙ্গদেব-এ রূপান্তরিত হতে থাকা যৌনবস্তু। হামলে পড়ত বিগতযৌবনা বয়স্ক সব 'লেডি'। হেসে হেসে সরিতা চাড্ডা সকলকে শোনাত—"হি ইজ ইন মাই কিপিং...ওনলি ফর মাই সার্ভিস।" কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মুখে আফসোসের চুকচুক শব্দ করে, হেসে হেসেই পিছু হটত সুবেশা মহিলারা। লক্লক্ করত তাদের শরীরচোষা লোল জিভ।...নিজের অজান্তেই নেশা লেগে গেল, নেশা ধরে গেল, পোক্ত হয়ে উঠতে লাগল নেশাতুর খেলায়। ক্রমশ আলগা হয়ে আসছিল সরিতা চাড্ডার অধিকারের শক্ত মুঠি।...

কমলানগরে পাকাপাকি ভাবে উঠে গিয়ে সরিতা চাড্ডাকে যে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল, সে অনঙ্গ—পাকাপাকি ভাবে অনঙ্গদেব! কোনো না কোনো সোসাইটি-লেডির এস্কর্ট্। ভরা পার্টির মধ্যেই সরিতা চাড্ডার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অবলীলায় বলে দিয়েছিল—"আয়্যাম নট্ ইন ইওর কিপিং এনিমোর! এখন আমি পাক্কা প্রফেশনাল। ঘণ্টা হিসেবে শর্টটাইম, হোল নাইটের ফুলটাইম প্যাকেজ—সব আলাদা রেট।"

আহত সাপিনীর মতো ফুঁসে উঠে শেষ ছোবল মেরেছিল সরিতা আন্টি—"যোনিকীট! ঠিকই বলেছিল তোর বাপ প্রসন্ন পালিত!"

৩

ছল্লাছমক

কলকাতা—

'ফ্লোরিডা বার'-এ শুটিং সেরে পার্কস্ট্রিট আর ফ্রিস্কুল স্ট্রিটের ক্রসিং-এ লাল আলোয় দাঁড়িয়ে পড়েছিল গাড়িটা। ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রোডাকশন-ম্যানেজার পিন্টুদা বলে উঠেছিল—"কী ব্যাপার? মুখ বের করে এত কী দেখছিস? এই দোষও আছে নাকি?"

থতমত খেয়ে মুখ ঢুকিয়ে নিয়েছিল অনঙ্গ। পিন্টুদা তখন সামনের সিট থেকে জ্ঞান দিচ্ছে—"তবে শুধুই দেখবি। ভুলেও কখনো এখানে দাঁড়াস না! বিশেষ করে তোর এই চেহারা নিয়ে! বয়স্ক মহিলারা এসে তুলে নিয়ে যাবে।"

কলকাতা শহরের রাস্তাঘাট সম্বন্ধে তখনো সড়গড় হয়ে ওঠেনি অনঙ্গ। জিজ্ঞেস করেছিল—"কেন? এ জায়গাটা কী?"

পিন্টুদা বলেছিল—"এটা একটা ঠেক। প্রস্টিটিউটরা এখানে দাঁড়ায়—ছেলেমেয়ে বোথ্। মেয়েদের তো সাজগোজেই চেনা যায়। আর জিগোলোরা নানারকম সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে। এই ধর বিশেষ ধরনের ট্যাটু দাগায় শরীরের খোলা জায়গায়; কিংবা হাতে লাল, সাদা রুমাল বেঁধে দাঁড়ায়।...'জিগোলো' জানিস তো? 'মেল প্রস্টিটিউট'—গোদা বাংলায় পুরুষ বেশ্যা। নতুন এসেছিস ইন্ডাস্ট্রিতে, এইসব হালচাল জানিস না। তাই বলে দিলাম।"

মনে মনে প্রাণভরে হেসেছিল অনঙ্গদেব। হাতে লাল রুমাল বেঁধে দাঁড়ানো এক জিগোলোকেই ও দেখছিল মুখ বাড়িয়ে। এমনিতে কিছু বোঝা যায় না। ভালো জামাকাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ডানহাতের কব্জিতে চোখে পড়ার মতো লাল রুমালের লাল নিশান—যা অনঙ্গের শ্যেন দৃষ্টিতে এড়ায়নি।

ওর বয়েস তখন তেইশ। দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে ভালোভাবে অনার্স নিয়ে পাশ করা পৃথ্বীরাজ পালিতের ইংরিজি কাগজের সাংবাদিক হওয়া আর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু 'জিগোলো' হিসেবে অনঙ্গদেব দিল্লিতে কাটানো তিন-চার বছরে অঢেল রোজগার করেছে। এত সহজে এমন 'কুইক মানি' সাংবাদিকতার চাকরির ধারে-কাছেও জুটত না। আসলে সেই আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছে কিংবা মানসিকতা কোনোটাই আর ছিল না ততদিনে। দিল্লি শহরও একঘেয়ে হয়ে উঠে কিছু ছিল শিলিগুড়ির বাঙালি ছেলের কাছে। কিন্তু বাইরে দেখানোর মতন কিছু একটা তো করতে হবে! অনঙ্গ ওর মোটা ব্যাংক-ব্যালেন্স আর রাশি রাশি দামী উপহার নিয়ে কলকাতায় চলে এসে টলিউড-এর বাংলা ফিল্ম-ইন্ডাস্ট্রিতে ভিড়ল—যেটা ওর আসল প্রফেশনের সঙ্গে সবথেকে সুবিধেজনক 'কর্ডলাইন-প্রফেশন' এবং বেস্ট ক্যামোফ্লাজও বটে। বাইরের একটা প্রেজেনটেব্‌ল্ খোলস তো লাগেই! তাই বুদ্ধি করে ঠিক জায়গাতেই ঢুকেছিল। তবে বেশিদিন লুকোচুরির দরকার হয়নি। এখানে সমকামিতা, বাইসেক্সুয়ালিটি বা দ্বিগামী, ট্রান্সজেন্ডার ইত্যাদি বিষয় অনেক খুল্লামখুল্লা। যৌনতার টাইপ নিয়ে অত মাথা ঘামানো কি ছুৎমার্গের নাক-সিঁটকানো নেই সমাজের অন্যসব কাজের

জায়গার মতো। অনঙ্গর ষষ্ঠেন্দ্রিয় ঠিকই ইঙ্গিত দিয়েছিল। সেইসঙ্গে এটাও বুঝেছিল, ওর এই চেহারায় ধরাবাঁধা ট্র্যাডিশনাল রোল পাবে না। অন্যরকম আকৃতির মতোই অন্য ধরনের রেয়ার-টাইপ চরিত্র জুটবে, যেখানে এটা ভালো করে খাটাতে পারবে প্রডিউসার বা ডিরেক্টর। এখানেও অন্যভাবে সেই শরীর-খাটানোর ব্যাপার। তবে সিরিয়ালে বা সিনেমায় ভালো চান্স দেওয়ার নাম করে নিজেদের ভোগের জন্যে ওর শরীর খাটিয়ে ফায়দা লুটতে চেষ্টা করেছিল এখানকারও অনেকেই! পুরুষ এবং মহিলা দুই-ই। অনঙ্গ তাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিল, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা 'প্রফেশন' ওর ক্ষেত্রে। দুটোরই 'চার্জ' এবং 'রেট' আলাদা। আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে দিয়েছিল এগিয়ে আসা সম্ভাব্য কাস্টমারদের কাছে—বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রির সমকামী পয়সাঅলা পুরুষ এবং বাইসেক্সুয়ালদের; যে অনঙ্গদেব শুধু আর্থিকভাবে সক্ষম মহিলা-কাস্টমারদেরই সার্ভিস দেয় ক্যাশটাকার বিনিময়ে। অনেকেই পিছু হটেছিল, পর্দায় চান্স পাওয়ার চান্সও অনেকটাই কমে গিয়েছিল। অনঙ্গ পরোয়া করেনি। জানত ওর আসল রোজগারের জোরটা কোথায়। যে জোরে দিল্লি থেকে বেশ কয়েকজন রেগুলার ক্লায়েন্টকে কলকাতায় টেনে আনতে পেরেছে। নিজের প্রয়োজন মতো এখানে আসে তারা।...

ওকে বুঝে গিয়েছিল টলিউড ফিল্ম-ইন্ডাস্ট্রি। এ-ও বুঝেছিল, এরকম রেয়ার আর একেবারে ব্যতিক্রমী চেহারার অনস্ক্রিন চরিত্র থাকলে আখেরে লাভই হবে। ক্রমশ কদর বেড়েছে এখানেও। রুপোলি দুনিয়ায় সুযোগ পাওয়ার দরদামে নিজেকে সহজলভ্য না করার জন্য ডিমান্ড এবং সাপ্লাই থিয়োরির চিরাচরিত রেশিয়োতে অনঙ্গদেবের ডিমান্ডের পাল্লা নিজে নিজেই ভারী হয়ে উঠছিল সবদিক থেকেই! বিশেষ করে এখানকার নামকরা নায়িকা, অভিনেত্রী, মহিলা প্রোডিউসার-পরিচালক—সকলেই বাধ্য হয়ে গিলে নিয়েছিল তাদের জিভের জল। আফসোস—এ কাউকে এমনি এমনি খায় না! বরং একে খেতে হলে নগদ টাকা দিয়ে কিনতে হবে এর শরীর, এর যৌনতা।

---''জিগোলোদের একটা গোপন দুনিয়া আছে—'দ্য সিক্রেট ওয়ার্ল্ড অফ জিগোলোস্'। তার কিছু সেট-রুলস্ আছে; যেগুলো প্রত্যেক সেক্স-ওয়ার্কারকে ফলো করতে হয়। কিছু সেট-রেগুলেশনস্ আছে; যেগুলো আমাদের কখনোই করা উচিত না। যেমন ধরো, আই ফ্ল্যাটলি রিফিউস্ উইমেন হু ওয়ান্ট টু স্লিপ উইথ মি, বাট নট পে মি।...'সেট-রুল্স্'-এর এটা সবথেকে প্রাইমারি আর প্রধান শর্ত। আর রেগুলেশনস্ অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণের এক নম্বর বিধিনিষেধও এটাই! নো পে, নো সার্ভিস। যেসব মহিলা টাকা না দিয়ে ধান্দাবাজি করে আমার সঙ্গে ফোকটে শুতে চায়, তাদের আমি সোজা না করে দিই। টাকা দেবে না, সার্ভিসও পাবে না। এই ট্রেড-এ ফ্রি বলে কিছু হয় না অ্যানাঙ্! তাহলে এখানে টিকে থাকা যায় না!"... বলেছিল ডিউক স্ট্যানলি। মার্কেটের 'ডার্ক চকলেট।'

কলকাতায় চলে আসার আগের সন্ধেয় দিল্লির একটা বার-এ বসেছিল ওরা। ডিউক স্ট্যানলিকে অনঙ্গদেবের তরফ থেকে ডিনার এবং ড্রিঙ্কের বিদায়কালীন আপ্যায়ন। প্রায় সাত-আট বছরের বড় ডিউক সেদিন মন খুলে কথা বলেছিল হুইস্কি খেতে খেতে। বলেছিল—"এই ট্রেড-এ আমি তোমার অনেক আগে এসেছি। একত্রিশ বছর বয়েস হতে চলল। আর কতদিন মার্কেটে টিকে থাকতে পারব জানি না। তোমার সবে তেইশ, এখনো প্রচুর সময় আছে সামনে, সুযোগ আছে! তাছাড়া তুমি এরকম ভিশিয়াসলি অ্যাট্রাকটিভ উইথ ইয়োর ডেঞ্জারাস সেক্স-অ্যাপিল, তাই তোমাকে ভবিষ্যতের জন্যে টিপস্ হিসেবে কথাগুলো বললাম।... 'সেট-রুল্স্'-এর প্রথম নিয়মটা মেনে চললেই তোমাকে কোনোদিন ঠকতে হবে না।"

চুপ করে শুনছিল অনঙ্গ। এমনিতেই ও বেশি কথা বলে না। শুধু বাজিয়ে দেখার জন্য জিজ্ঞেস করেছিল—"কিন্তু রিচা ওয়ালিয়া? যে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে, যার কারণে তুমি এতদিন ধরে এদেশে এভাবে আছ, তার বেলা? সে যদি চায়?"

হুইস্কিতে লম্বা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা ঠক্ করে টেবিলে রাখল ডিউক। ঈষৎ জড়ানো গলায় জোর দিয়ে বলে উঠল—"নোপ্! নেভার! তার বেলাতেও না! নো ফ্রি সার্ভিস।...সে আমাকে পয়সা খরচ করে এদেশে নিয়ে এসেছে কেন? এখানে এভাবে রেখে দিয়েছে কেন? আমার 'স্পেশাল সার্ভিসের' জন্যেই তো! তাহলে সে এমন অন্যায় আবদার করবে কেন? নোয়িং ফুল্লি ওয়েল যে এটা আমার প্রফেশন! সে-ও এমন আনএথিকাল হবে না, আর

হাতে লাল রুমাল বেঁধে দাঁড়ানো এক জিগোলোকেই ও দেখছিল মুখ বাড়িয়ে।
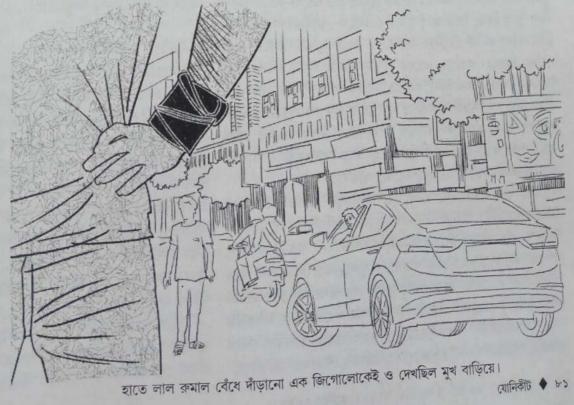
হলেও আমি দেব না। আই মাস্ট গেট পেইড ফর মাই 'স্পেশাল সার্ভিসেস' ফ্রম মাই ক্লায়েন্ট! সে যে-ই হোক না কেন...."

সেই সন্ধেয় খোলা মনে আরও অনেকগুলো দামী কথা বলেছিল ডিউক। হাসতে হাসতে স্বীকার করেছিল—"কাল বরাবরের মতো চলে যাচ্ছ বলেই বলছি, আমি এতদিন ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করেছি রিচা ওয়ালিয়ার চোখ যেন তোমার ওপর না পড়ে। করেছি সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থে। নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে। তাই, আমার পরের অ্যাডভাইস—তোমাকে রিপ্লেস করতে পারে এমন কাউকে তোমার ভ্যালুয়েব্‌ল্ কাস্টমারের থেকে দূরে রাখবে। অ্যাটলিস্ট চেষ্টা করবে...."

বয়স্ক, ঝোলা চামড়া, সাতকোট মেকআপের রিচা ওয়ালিয়া।—বোধহয় উপহাসের হাসি ফুটেছিল অনঙ্গর চোখেমুখে। তাই দেখে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠেছিল মধ্য-তিরিশ ছুঁতে যাওয়া অ্যামেরিকান জিগোলো ডিউক স্ট্যানলি।—"ওহ্ অ্যানাঙ্গ্ নো! অলওয়েজ রেসপেক্ট উইমেন হু কাম টু ইউ ফর ইয়োর 'স্পেশাল ট্রিটমেন্ট'! যত বয়েসই হোক, যেমনই দেখতে হোক, নিজেকে অ্যাট্রাকটিভ করতে যত হাস্যকর ভাবেই ড্রেস করুক কি ওভারটোন মেকআপ করুক, সবসময় মনে রাখবে সে-ই তোমার পেটের ভাত যোগাচ্ছে! তোমার সবরকম অর্থকরী প্রয়োজন মেটাচ্ছে! কাস্টমারকে সম্মান করতে শেখো অ্যানাঙ্গ্! ক্লায়েন্টকে অলওয়েজ্ রেসপেক্ট করো বিকজ শী ইজ্ দ্য ওয়ান যে তোমাকে পে করছে! টাকা দিচ্ছে!...এটা 'সেট রুল্‌স্'-এর ভীষণ দামি নিয়ম।"

লজ্জা পেয়েছিল অনঙ্গদেব। শিক্ষাও নিয়েছিল কথাগুলো থেকে। পরে বুঝেছে কী প্রচণ্ড দামি কথা বলেছিল ডিউক স্ট্যানলি! কী ভীষণ ঠিক ছিল তার প্রতিটা কথা! যেটা ওইভাবে মনে গেঁথে না দিলে হয়তো এতখানি প্রিয় হয়ে উঠতে পারত না ওর প্রত্যেক ক্লায়েন্টের কাছে! এইভাবে তাদের তৃপ্ত করতে পারত না! শিখেছিল, যৌনতাও সম্মান দিয়ে বিক্রি করতে হয়। ডিউক বলেছিল—"তুমি তো লাকি অ্যানাঙ্গ্! ভালো বাড়ির ছেলে, এত ভালো কলেজ থেকে পাশ করা কত শিক্ষিত ছেলে। তোমাকে তোমার জীবনের এই 'জিগোলো জার্নি' তোমার ফ্যামিলির থেকে লুকিয়ে রাখতে হলে, রাখো তাদের অনারে; তাদের সম্মান বজায় রাখার জন্যে। আর আমার? আমার ফ্যামিলি, আমার নিজের বাবা-মা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেত আমি শরীর খাটিয়ে রোজগার করি, তাহলে ছোটবেলা থেকেই তারা আমাকে পয়সার জন্যে ট্র্যাক করত, আমার খোঁজ করত, ঠিক খুঁজে বের করে সব কেড়ে নিয়ে যেত, যতদিন না আমি বড় হয়ে নিজেকে প্রোটেক্ট করতে পারি।"

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল অনঙ্গদেব। এতকিছুর পরেও এটা কল্পনা করতে পারেনি। ডিউক স্ট্যানলি তখন শুনিয়েছিল ওর কিশোর বয়সের এক অবাক-হওয়া অভিজ্ঞতার ঘটনা।—"জানো অ্যানাঙ্গ্, তখনো আমি এই ট্রেড-এ আসিনি। ফুলফ্লেজ্‌ড্ জিগোলো হয়ে উঠিনি। বছর চোদ্দো কি পনেরো তখন আমার বয়েস। তার অনেক আগেই বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার পর অনেকবারই জবরদস্তি যৌন- অত্যাচারের শিকার হয়েছি। খেতে-পরতে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে পেডোফিলিকরা তাদের শিশুনিগ্রহের যৌনখিদে মিটিয়েছে। খাবার পেয়েছি, পয়সাও পেয়েছি কারুর কাছে, বাধ্য হয়ে মেনেও নিয়েছি। এই করতে করতে চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সে একদিন সি-বীচের সামনে ঘুরঘুর করছি, তখন বেশ রাত, একটা বড় গাড়ি হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল। ড্রাইভ করছিল বেশ বয়স্ক এক মহিলা। সে আমাকে কোনো এক রাস্তার নাম আর ডিরেকশন জিজ্ঞেস করল। আমি বোকার মতো মাথা নেড়েছিলাম, জানি না। তখন সে আমাকে ধমক দিয়ে বলল, "জানো না তো এত রাতে এখানে ঘুরঘুর করছ কেন? ওঠো, গাড়িতে ওঠো!" আমি উঠতেই আমাকে নিয়ে হুশ্ করে আরো অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল। তারপর তার ইচ্ছেমতো আমাকে 'ব্যবহার' করে শিখিয়ে দিয়েছিল—রাতে সি-বীচে যদি কোনো মহিলা একা ড্রাইভ করে এসে রাস্তার ডিরেকশন চায়, তখন উল্টে তার কাছে লাইটার চাইতে হবে সিগারেট ধরানোর ভান করে। সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে চলে যাবে লেডি। তারপর কাজ মিটে গেলে পয়সা দিয়ে দেবে।—সেই প্রথম স্বাধীন সেক্স-ওয়ার্কার হিসেবে আমার হাতেখড়ি। বা জিগোলো হিসেবে আমার নতুন ভূমিকা। তারপর থেকে এই খেলা বহুবার বহুজনের সঙ্গে খেলেছি। ওই বয়স্ক-মহিলা আবারও এসেছে। না চেনার ভান করে রাস্তা জানতে চেয়েছে। আমিও বুঝতে না দিয়ে ঠোঁটে একটা সাদা কাঠি ঝুলিয়ে লাইটার চেয়েছি। ব্যাস, অন্ধকারে হারিয়ে গিয়ে সে রাতের রোজগার বাঁধা।".....একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে একচুমুকে হুইস্কির পুরো গ্লাস শেষ করে ডিউক সেটা অনঙ্গকে দেখিয়ে হাসছিল—"আরো ড্রিংক বলো। ফ্রি-তে কাউকে কিছু দিই না, কিন্তু তোমাকে আমার এক্সপেরিয়েন্স প্লাস অ্যাডভাইস দিচ্ছি। এটা তোমার ফেয়ারওয়েল গিফ্‌ট্। আরো অনেক কথা বাকি আছে। শুনলে তোমারই লাভ"......

লাভের জন্যে নয়, শোনার জন্যেই কান পেতে শুনছিল অনঙ্গ। ডিউক স্ট্যানলির 'ডার্ক চকলেট'-এর মতো সিক্রেট নামের 'অনঙ্গদেব'। ট্রেডমার্কের মতোন জিগোলো-মার্কেটে 'সিক্রেট নেম' থাকে। যে নামে পুরোনো আইডেন্টিটি ঢাকা পড়ে নতুন পরিচিতি গড়ে ওঠে। নিজেকে এই ট্রেড-এ নতুনভাবে চেনানোর এটা চালু প্রথা।

দেখতে দেখতে দশটা বছর!

কলকাতায় চলে এসেছিল তেইশ বছর বয়সে। এখন বত্রিশ পুরে চারমাস চলছে। শিলিগুড়ির বাড়ি ছেড়েছে যখন, তখন আঠেরো। দিল্লিতে সরিতা আন্টির দীক্ষায় নবজন্মের নবকলেবরে 'অনঙ্গদেব' হয়ে ওঠার পর শিলিগুড়িতে যেতে আর পা উঠত না। নির্মলার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করত না। অথচ, ডিউক স্ট্যানলির ভাষায়—"এখানে অনুতাপের কোনো জায়গা নেই। পুরোটা নিজের ওপর। খারাপ লাগলে বেরিয়ে যাও এই ট্রেড থেকে! বাট নো রিগ্রেটস্। রিগ্রেটস্ আর গিল্‌টি কনশান্স্—অনুতাপ আর অপরাধবোধ নিয়ে এখানে টেকা যায় না। কারণ, 'পারফর্ম' করা যায় না ঠিক করে। কোয়ালিটি নষ্ট হয়। যেটা কাস্টমার-স্যাটিসফেকশনের জন্য ভীষণ জরুরি।"

অনঙ্গদেব এটা জানে এবং মানে। ইচ্ছে করলেই সরিতা আন্টির বাড়ি থেকে কম্‌লানগরে চলে যাওয়ার পর অনায়াসে সেক্স-ট্রেড থেকে বেরিয়ে আসতে পারত। কিন্তু আসল কথাটা হল, কখনো

সেই ইচ্ছে হয়নি! শুধু কাঁচা টাকাই নয়, বহুগামিতারও একটা মাদক নেশা আছে। বহু নারীকে যৌনসুখ দিতে দিতে এরা বহুগামী 'পলিগামিস্ট' হয়ে ওঠে নিজের অজান্তেই! শুধুই যন্ত্রের মতো শুকনো সার্ভিস দেয় না, সেইসঙ্গে নিজেও ভোগ করে! অনঙ্গও করত এবং করে। বয়স্ক, মধ্যবয়স্ক, কমবয়সী—সুরূপা, কুরূপা, সুশ্রী, সাধারণ—কত যে নারীসঙ্গ হয়েছে আঠেরো থেকে বত্রিশের এই চোদ্দো বছরে তার ইয়ত্তা নেই। সেইজন্যে নেই কোনো অনুতাপ, অনুশোচনা, কিংবা অপরাধবোধ। মায়ের থেকে অনেক বেশি বয়সের মহিলার সঙ্গে বিছানায় গেছে অনায়াসে! সরিতা আন্টির দীক্ষামন্ত্র—'মতোন বলে কিছু নেই, কিছু হয় না, সবটাই ফিজিক্যাল, পিওরলি ফিজিক্যাল্'—মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গেছিল। তবু নির্মলার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর কথা ভাবলে অস্বস্তি হয়। দাঁড়াতে অসুবিধে হয়। একমাত্র তার কাছে এক অদ্ভুত সংকোচ কাজ করে। তাই এই চোদ্দোটা বছরের মধ্যে হাতেগোনা মাত্র তিন-চারবার শিলিগুড়ির বাড়িতে গেছে অনঙ্গ। মা বারবার করে ডাকলেও গিয়ে উঠতে পারত না।

ফ্ল্যাট কিনবার পর মাকেই একবার এখানে নিয়ে এসেছিল। দেখে খুশি হয়েছিল নির্মলা। কিন্তু ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিল—"সিনেমা-সিরিয়াল থেকে কত টাকা রোজগার করিস যে এত দামি ফ্ল্যাট কিনতে পারলি? তুই অভিনয়ে আসা থেকে আমি সমস্ত বাংলা সিনেমা আর সিরিয়ালে চোখ রাখি। কই, তোকে তো খুব একটা দেখা যায় না?"...ভেতরটায় হঠাৎ কেমন চাপ ধরে হাঁসফাঁস করে উঠেছিল। কিছু জবাব দিতে পারার আগেই নির্মলা আরেকটা প্রশ্ন করেছিল—"সিনেমার জন্যে 'অনঙ্গদেব' নাম নিতে হল? 'পৃথ্বীরাজ' চলত না? অত সুন্দর নাম!"...এরও উত্তর দিয়ে উঠতে পারেনি। নির্মলার নির্নিমেষ দৃষ্টির সামনে মাথা নিচু করে নিয়েছিল। মন চিৎকার করে বলতে চাইছিল—সিনেমার জন্যে নয় মা! তার অনেক আগেই তোমার পৃথ্বীরাজ শেষ হয়ে গেছে। অনঙ্গদেব হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না!...ছেলের ফ্যাকাসে মুখ, সারা শরীরে ঘাম, নজর করতে করতে এ. সি. ঘরের শিরশিরে ঠান্ডায় তেমনি শিরশিরে ঠান্ডা গলায় নির্মলা ফের বলে উঠেছিল—"কামদেবের আরেক নাম অনঙ্গদেব। প্রেম-ভালোবাসা আর ওইসবের দেবতা। যে ক'টা ছবিতে আর সিরিয়ালে এ পর্যন্ত যতটুকু কাজ করেছিস তাতে তো প্রেম-ভালোবাসার ছিটেফোঁটাও নেই!".... ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল মায়ের রাজুর।—আমার জীবনেই প্রেম-ভালোবাসার ছিটেফোঁটাও নেই মা! আসবেও না। তোমার সাধের পৃথ্বীরাজ কখনো দেখতে পাবে না তার সংযুক্তার ঘোমটা-খোলা মুখ! সে শুধুই কামের দেবতা অনঙ্গদেব!....মুখে তো বলেনি, তবু কি দেখল মা? কি শুনল! অপলক চোখে ছেলেকে মাপতে মাপতে নির্মলা হঠাৎই বলে উঠল—"আমার শিলিগুড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে দে। বাড়ি যাব। এখানে ভালো লাগছে না।"

পরে অনেক ভেবেছে অনঙ্গ। ভেবে ভেবে এর কোনো কূলকিনারা পায়নি। অথচ এমন অনেককে জানে, যারা এই দেহ-ব্যবসায়ে থেকেও বিয়ে করেছে, সন্তান হয়েছে, দিব্যি ঘরসংসার করছে আসল 'কাজ' গোপন রেখে। প্রেমিকাও আছে অনেকেরই! দিব্যি চালাচ্ছে দু-দিক বজায় রেখেই। অনঙ্গর খুব জানতে ইচ্ছে করে—পারে কী করে?

...আয়নায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে জরিপ করে। চুল পাতলা হয়ে আসছে কী? মধ্যপ্রদেশে কি চর্বির লেয়ার পড়ছে? এই প্রফেশনে টাক এবং ভুঁড়ি স্ট্রিক্টলি নিষিদ্ধ। 'সেট-রুল্‌স্ অ্যান্ড রেগুলেশন্‌স্'-এর বেসিক হুঁশিয়ারি! ডিউক স্ট্যানলির 'বাকি কথার' মধ্যে বিশেষ ভাবে ছিল—চেহারা, পোশাক এবং স্বাস্থ্য— "নো বল্ড্‌হেড অ্যান্ড পন্‌চ্-বেলি, নো শ্যাবি অর ড্যান্ডি ডেক-আপ্, অ্যান্ড অ্যাবাভ অল্—আ রক্-সলিড হেল্‌থ্।" ডিউকের দশ বছর আগের ধারাভাষ্যের এই পয়েন্টটা অনঙ্গ নিজেও অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। নামকরা জিম-এ রেগুলার এক্সারসাইজ, মাসে একবার করে হেল্‌থ্ চেক-আপ, দামী ভিটামিন এবং ক্যালশিয়াম ট্যাবলেট, তিনমাস অন্তর এইচ. আই. ভি. এবং সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিস-এর সমস্ত টেস্ট—ডায়েট চার্ট মেনে সুষম খাদ্য এবং হাইপ্রোটিন, প্রচুর ফল এবং বিশেষ ধরনের হেল্‌থ্-ফুড তো আছেই! এর সঙ্গে সঙ্গে আছে বিছানায় অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে 'ধরে' রাখার জন্যে স্টেরয়েড ওষুধ, দামী বিদেশি স্প্রে, নেপাল থেকে ইমপোর্ট হয়ে আসা 'ক্ষমতা বাড়ানো' সুগন্ধি চিউইংগাম, এবং অত্যন্ত কস্ট্‌লি হরমোনাল ইনজেকশন্। তাছাড়া আছে নিত্য ব্যবহারের সেরা কন্ডোম। প্রচুর খরচা হয়ে যায় এতসব করতে। কিন্তু 'মার্কেটে' টিকে থাকার জন্যে এগুলো করতেই হয়। আয়নার অনঙ্গ ওকে সতর্ক করে—বত্রিশ বছর পুরে চারমাস চলছে। আর কত কাল! এই দুনিয়ায় 'কুইক মানি' যেমন অঢেল, তেমনই ফুরিয়েও যায় তাড়াতাড়ি। তাই সময় থাকতে থাকতে যত পারো গুছিয়ে নাও!...ইমেজ-বিল্ডিং জামাকাপড়ে নিজেকে সেদিনের অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে তৈরি করতে করতে অনঙ্গদেব সর্বাঙ্গে দামি কোলনের ভুরভুরে গন্ধ মেখে আত্মবিশ্বাসে হাসে। দর্পণের প্রতিবিম্বকে আশ্বাস দেয়—নাঃ, এখনো বেশ কিছুদিন চলে যাবে এইভাবেই। তাও তো এইসব কোলন, বডিস্প্রে, পারফিউম আর মদ নিজের পয়সায় কিনতে হয় না! ক্যাবিনেট ভরা থাকে ক্লায়েন্টদের থেকে পাওয়া গিফ্‌ট্ দামি দামি ফরেন লিকার-এ। এসব ওর স্পেশাল-সার্ভিস ক্ষমতার স্পেশাল কোয়ালিটির প্রাইজ্ বইকি!

...মনের ভার ঝেড়ে ফেলে খুশিখুশি মেজাজে ফুরফুরে হয়ে ফ্ল্যাটের দরজা লক্ করে বেরিয়ে গেল অনঙ্গ। গতরাতের পর কস্তুরী রাই আজকেও আবার ডেকেছিল। কিন্তু সার্কুলার রোডের তোর্ষা সেন ঘণ্টা হিসেবে শর্ট-স্টে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাওয়াতে ফোনে কস্তুরী রাইকে ক্যান্সেল করে দিল। পরপর দু-দিন একজন না হয়ে দুজন হলে তো আরো ভালো। একঘেয়েমি আসে না।...গ্যারেজ-স্পেস থেকে বাইক বের করে স্টার্ট দিল অনঙ্গদেব। গর্জন করে ছুটতে লাগল তার আদরের 'কাওয়াসাকি'। রাজারহাটের ফ্ল্যাট থেকে তোর্ষা সেনের সার্কুলার রোডের বাড়ি অনেকটা পথ। বাড়িতে ডেকেছে যখন, নিশ্চয়ই তার জাহাজি হাসব্যান্ড আবার জাহাজে পাড়ি দিয়েছে। মেরিন-ইঞ্জিনিয়ার বর কলকাতায় থাকলে কখনো বাড়িতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় না তোর্ষা সেন। টানা একটা সময় ধরে তার ডাকও আসে তখন অনেক কম। ডাকলেও পাঁচতারা-সাততারা

হোটেলের ঘর বুক করে। সার্ভিস দেওয়া ছাড়াও তোর্ষার সঙ্গ পছন্দ করে অনঙ্গ। যতক্ষণের জন্যে 'বুক' করে, তার বাইরে এক মিনিটও বেশি আটকায় না। বরং দু-দশ মিনিট আগে থেকেই বলতে থাকে—"প্যাক আপ্ অনঙ্গ! টাইম আপ্!..." এই একটা ব্যাপার অদ্ভুত লাগে ওর। কলকাতার বেশিরভাগ বাঙালি কাস্টমাররাও অনঙ্গ বা অনঙ্গদেব না বলে হিন্দি স্টাইলে উচ্চারণ করে 'অনঙ্গ্, অনঙ্গ্দেভ্'।...যাকগে। দুরন্ত স্পিডে লম্বা রাস্তা পাড়ি দিতে দিতে মিটমিটিয়ে হাসে অনঙ্গদেব। গতরাতের হোল-নাইট সার্ভিসের ফুল-প্যাকেজ কভার করার পরদিনই আবার কস্তুরী রাইয়ের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফাইনাল করেনি। বলেছিল, "দেখছি..."। কস্তুরী রাই জোর দিয়েছিল, "দেখছি না, ইউ মাস্ট! আই নিড ইউ অনঙ্গ্!"...সে তো বটেই! অনঙ্গ ভাবে—একেকজনের একেকরকম 'নিড'। শুধুই শরীরের সার্কাস নয়—কথা, সঙ্গ, পরস্পরের কাছে পরস্পরের গ্রহণযোগ্যতা এবং সামঞ্জস্য—'অ্যাকসেপ্টেন্স্ অ্যান্ড কম্প্যাটিবিলিটি'র একটা মস্ত বড় ভূমিকা থাকে—যেটা মনের 'নিড'। এই 'নিড' অনুযায়ী অনঙ্গদেব ওর ক্লায়েন্টদের বিভিন্ন শ্রেণিতে নিজের মতো করে ভাগ করেছে।— মর্ষকামী, ধর্ষপ্রেমী, প্রতিশোধপরায়ণ, অবহেলিত এবং অতৃপ্ত, আত্মসংশয়ী ও অনিরাপত্তায় ভোগা; এছাড়াও আছে 'ওনলি ফান'—শুধুই মজালোটা ক্লাস, আছে ট্রান্সজেন্ডার—নারীতে রূপান্তরিত কাস্টমার, আছে 'অরজি'—মহিলাদের গ্রুপসেক্স, ইত্যাদি ইত্যাদি কত রকমের যে ভাগ! সব একত্র করে এদের নাম দিয়েছে 'পাঁচমিশেলি'। বাইক ছোটাতে ছোটাতে নিজেকে বলল—'পাঁচমিশেলি'র এই 'ওনলি ফান' টাইপদের চাহিদা ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। বুদ্ধি খাটিয়ে হ্যান্ড্ল্ করতে হয় এদের।...এখন যার কাছে যাচ্ছে, তোর্ষা সেন 'ওনলি ফান' টাইপ।—হোক, ভাবল অনঙ্গ, চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোই লাগে। কিন্তু ইদানীং একজনকে কিছুতেই 'পাঁচমিশেলি'র কোনো ক্যাটাগরিতেই ফেলতে পারছে না সেক্স-ট্রেড'-এর তুখোড় জিগোলো অনঙ্গদেব। উত্তর কলকাতার বিধবা ক্লায়েন্ট, বাহান্ন-তেপ্পান্ন বছরের সুচেতনা লাহিড়ি, গত সাত বছর ধরে ওর রেগুলার কাস্টমার। কিন্তু এখন তাকে কিছুতেই আর পাঁচমিশেলির কোনো ছকে মেলানো যাচ্ছে না। হঠাৎই বড় অদ্ভুত রকমের বেমিশাল হয়ে পড়েছে সুলোচনা লাহিড়ি।... কপালে অস্বস্তির ভাঁজ। অনঙ্গদেব অস্ফুটে বলে উঠল—'ব্যতিক্রমী'।

ফান-টাইপ তোর্ষা সেন বিশাল বড়লোক বাপের স্বেচ্ছাচারী কন্যা। মা-মরা একমাত্র মেয়ে, ছোটো থেকেই যা চেয়েছে তাই পেয়েছে, যখন যা ইচ্ছে তাই করেছে। এখন বিয়ের পর বরের ঘরে এসেও তাই করছে। মেরিন-ইঞ্জিনিয়ার বর বেশিরভাগ সময়েই জাহাজে। তার অনুপস্থিতির সুযোগে বাড়িতেই নিজের ইচ্ছে মেটায়। কোনো অভাববোধ কি অতৃপ্তি নয়—সেক্স তার প্যাশন। যৌনতা তার কাছে নেহাৎই এক প্যাশনেট খেলা এবং মজা। তোর্ষা সেন সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, বয়েস সাতাশ-আঠাশ। সগর্বে নিজেই সেটা ঘোষণা করে—'ডু আই লুক লাইক আ টোয়েন্টি-সেভেন অর টোয়েন্টি-এইট ইয়ার ওল্ড?'....এই বয়েসি ক্লায়েন্ট অনঙ্গর কমই আছে। ওর বেশিরভাগ কাস্টমারই মধ্য চল্লিশের ওপরে এবং আরো বয়স্ক। তাদের ওকে ডাকার কারণ আছে। কিন্তু তোর্ষা সেন ইচ্ছে করলেই প্রচুর পুরুষ জোটাতে পারে বিনে পয়সায়। তা না করে সে টাকা খরচ করে যৌনসুখ কেনে। হেসে হেসে বলে—"পেইড সেক্স-এর মজাই আলাদা অনঙ্গ! ভেবো না আমার বর বাইরে থাকে বলে আমি সেক্স-স্টার্ভড্! সতেরো বছর বয়েস থেকে নিজের বাড়িতে পেইড-সেক্স করে আসছি। মা নেই, বাপি ব্যস্ত মানুষ, টেরও পেত না।"...অনঙ্গ মনোযোগী ছাত্র হয়ে শুনে যায়। ওর শরীরে খেলা করে তোর্ষা সেনের হাতের দশ আঙুল। খুশি ঝলমল মুখে শোনায়—"অনেক অ্যাডমায়ারার আছে আমার, 'তু' করলেই ছুটে আসবে, আমার সঙ্গে শোওয়ার জন্যে হাপিত্যেশ করে হেদিয়ে থাকে। কিন্তু আমার পছন্দ হয় না। ট্রাই করেছি বেশ কয়েকবার। কিন্তু ওই যে—নুন ছাড়া মাখা-আলুভাতের মতন লাগে! এরা না পারে খেলতে, না পারে খেলাতে। শুধু গোগ্রাসে গাঁক গাঁক করে গিলবে, আর কতক্ষণে নিজে খালাস হবে! এটা যে একটা আর্ট, সেটাই বোঝে না!"...নুন ছাড়া মাখা-আলুভাতের উপমা শুনে অনঙ্গ হেসে উঠেছিল—"গেল! আমার প্রিয় খাদ্যবস্তুটার বারোটা বেজে গেল।"...খিলখিল করে হাসছিল তোর্ষা সেন—"আলুভাতে খেতে হবে না, স্কিলফুলি আমাকে খাও, ওয়ান অ্যান্ড ওনলি অনঙ্গদেভ্ স্কিল্!".....

তোর্ষা সেন ফান-লাভিং 'ওনলি ফান', তো কস্তুরী রাই 'অতৃপ্ত ও অবহেলিত' টাইপ। বিবাহিত জীবনে অনেককাল ধরেই স্বামীর মনোযোগ এবং শরীর, কোনোটাই পায় না। তাই বারবার অনঙ্গকে ডাকে। গাদা গাদা দামী দামী গিফ্ট্ দেয়, হরবকৎ পাঁচতারা-সাততারা হোটেলে ঘর বুক করে। বোঝে অনঙ্গদেব, বোঝে এরকম আত্মসংশয়ী এবং অনিরাপত্তায় ভোগা 'মিডলাইফ-ক্রাইসিস' মহিলাদের। এরা মেনোপজের পর হরমোনের ঘাটতির জন্যে প্রবল আইডেনটিটি-ক্রাইসিস ও ইনসিকিউরিটিতে ভোগে। টাকা দিয়ে পুরুষ কিনে তার চোখের আয়নায় নিজেকে যাচাই করতে চায়—'আমি কি সেরকম আগের মতো আছি? তেমনই অ্যাট্রাকটিভ আর সক্ষম?'—এরা জিগোলোর কাছেও লুকিয়ে লুব্রিকেন্ট ব্যবহার করে। অমৃতা বাজপেয়ী, অসীমা নিয়োগী, নিলম পুরি, জ্যোৎস্না সরকার, অন্তরা পাণ্ডে, তবসুম মালিক, মরিয়ম বিশ্বাস, নাসিমা আলম, পরভিন খাতুন, ঊষা পল্, আর কত নাম করবে? এরা এবং আরো বেশি বয়সের প্রাচীন হয়ে যাওয়া মহিলারা ওর সিংহভাগ খরিদ্দার।...জাহানারা বেগম, প্রীতম কউর, আলপনা ডাট্, মঞ্জুলা বোস, এরা আবার মর্ষকামের জলজ্যান্ত উদাহরণ। 'ম্যাসোকিস্ট'—নানারকম ভাবে শারীরিক যন্ত্রণা আর নিগ্রহ না করলে তাদের যৌনতৃপ্তি হয় না। রতিক্রিয়ার আগে এরা অনঙ্গদেবকে নিয়ে বসে রকমারি ভিডিয়ো দেখে আত্মপীড়নের। সেগুলো তাদের ওপর প্রয়োগ করে অনঙ্গ এক একজনের রুচি মতো। এরা দেখে এবং দেখায় 'ফিফ্‌টি শেড্স্ অফ গ্রে'-র মতো আধা নীলছবি—সফ্ট পর্ণ্। অনঙ্গর হাতে তুলে দেয় চাবুক। হাতে-পায়ে বেড়ি, চাবুকের ঘায়ে কামাতুর শীৎকারের ধ্বনি ওঠে।...মর্ষকামীদের ওপিঠ ধর্ষপ্রেমী। সনকা সহায়, কম্‌লা ত্রিপাঠী, রোশেনারা বানু, নহিম খুরশেদ, ইনা

ভরদ্বাজ প্রভৃতি বীভৎসরকম ধর্ষপ্রেমী—'স্যাডিস্ট'। যৌনসঙ্গমের আগে এরা ধর্ষকের নিষ্ঠুরতায় এদের পার্টনারকে বিভিন্ন উপায়ে শারীরিক অত্যাচার এবং অশ্রাব্য কথায় জর্জরিত করে যৌনতৃপ্তি পায়। বেশিরভাগ সময়েই সক্রিয় ভূমিকায় এরা নিজেরা 'অ্যাকটিভ'; পুরুষসঙ্গীকে 'প্যাসিভ' বা নিষ্ক্রিয় করে রাখে। এখন আর এদের ওর 'স্পেশাল সার্ভিস' দেয় না অনঙ্গ। পাঁচগুণ টাকা অফার করলেও না। কিন্তু এরা মনে রেখেছে ওর শরীর, ওর দৈহিক ক্ষমতা। মাঝে মাঝে এখনো যোগাযোগ করে। অনঙ্গ বুঝতে পারে এদের স্যাডিসটিক প্লেজার এবং রেপিস্ট মনোভাব ও আচরণের আসল উৎস হল প্রতিশোধস্পৃহা। পুরুষের হাতে ভোগ করা শারীরিক লাঞ্ছনা আর বিকৃত অত্যাচারের শোধ তোলে এইভাবে।....পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরিত 'ট্রান্সজেন্ডার'দের আবার যৌনখিদে মারাত্মক! মনীষা মিত্র আর অতসী ব্যানার্জি নিজেরাই এটা বলে। 'সুগার ড্যাডি' 'সুগার মাম্মি' টাইপ এরা। একই সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে প্রবল সম্ভোগ, এবং তৃপ্ত হওয়ার পরেই অপার স্নেহময়ী। তখন 'দিদি' বলে সম্বোধন করতে হয়—মনীষাদি, অতসীদি। তারাও ঘরের ছেলের মতন 'তুই-তোকারি' করে। কনকনে এ. সি. ঘরের ঠান্ডায় আঁচল দিয়ে কল্পিত ঘাম মুছিয়ে দিতে দিতে বলে—"খুব ধকল হয়েছে, না? আমাদের 'এটা' খুব বেশি। অনেক দিনের চাপা পড়ে থাকা মেয়ে-মনের আকাঙ্ক্ষা, আর মেয়ে-জন্মের মেয়ে-শরীরের চাহিদা। মিটতে আর মেটাতে অনেক সময় নেয়।" প্রথম প্রথম অনঙ্গ অবাক হত। পরে বুঝে গেছে। জন্ম থেকে পুরুষ-দেহের খাঁচায় বন্দি নারী-হৃদয়, নারীর কামনা-বাসনা। নিজের হাতে যে বন্ধনের নাড়ি কেটে নতুন করে দ্বিতীয় জন্ম নেয় এরা। তাই একই সঙ্গে পুরুষের দৈহিক শক্তি, এবং নারীর দীর্ঘ লালায়িত যৌনলিপ্সার পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে বয়ে চলে অপত্যস্নেহ। নারীতে রূপান্তরিত হয়েও সন্তান-ধারণে অক্ষমতার খেদ মেটায় মাতৃসুলভ স্নেহে। তাই উচ্চশিক্ষিত মনীষাদি অনায়াসে উচ্চারণ করেছিল—'জননী আর জায়ায় কোনো ভেদ নাই/জননী দেয় স্তন্য, জায়া দেয় মাই।'—কান গরম হয়ে উঠেছিল সাত ঘাটের জল খাওয়া, পোড় খাওয়া, পোক্ত জিগোলো অনঙ্গদেবের। বুঝতে পেরে মনীষাদি শাণিত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল—"অস্বীকার করতে পারিস? ছেলেরা মায়ের মতো বউ চায়। কখনো ভেবে দেখেছিস, কেন? কোন আদিম সত্য লুকিয়ে আছে এর ভেতরে যেটা আমরা দেখতে ভয় পাই? প্রাণপণে চোখ বন্ধ করে অস্বীকার করি!"...

একই প্রসঙ্গে অতসীদি বলেছিল—"তোরা আগাগোড়া ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া এ-কালের শিক্ষিত ছেলে। কিন্তু 'মহাভারত' পড়িসনি। পড়লে এটা বুঝতে পারতি। মনীষার ছড়া শুনে এরকম শক্‌ড্‌ বা অবাক হতিস না।"....এরপর রূপান্তরিত নারী অতসী ব্যানার্জি, ইন্ডিয়ান মিথোলজিতে ডক্টরেট, শুনিয়েছিল 'মহাভারত'-এর 'অমৃতসমান কথা'র সেই কথা যেখানে বকরূপী ধর্ম দশটি মহামূল্যবান প্রশ্নে যুধিষ্ঠিরের ধর্মজ্ঞানের পরীক্ষা নিচ্ছে; আর যুধিষ্ঠির নিঃশঙ্কচিত্তে মহাসত্যে তার উত্তর দিচ্ছে।—যার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, নিজের মা অনন্ত রূপযৌবনা কুন্তীকে দেখে পুত্র যুধিষ্ঠিরের কাম জাগে কিনা, সম্ভোগেচ্ছা হয় কিনা। অস্তিত্বের মূল ধরে নির্মম টান মারা যে ভয়ংকর জিজ্ঞাসার জবাবে যুধিষ্ঠিরের অবিচলিত নির্ভীক উত্তর ছিল—হয়তো জাগে, হয়। কিন্তু আমরা মনুষ্যকূল সেটা আমাদের জ্ঞানশলাকা দিয়ে বিদ্ধ করি। বিনাশ করি।...

ট্রান্সজেন্ডার দুই কাস্টমারের সঙ্গে দুরন্ত রতিক্রিয়া করা অনঙ্গদেব তাদেরই স্নেহের আঁচলে ঘাম মুছে, তাদের তৃষ্ণার্ত বাৎসল্যে সিক্ত হয়ে জেনেছিল এমন নিগূঢ় সত্য।

...নিজের কৌতূহলেই গ্রুপ-সেক্স বা 'অরজি' অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিত অনঙ্গ। এটা বেশি হত মুম্বাইতে। 'অরজি'র স্পেশাল ট্রিটমেন্ট-এর স্পেশাল ক্লায়েন্টস্। এক এক রাতের প্যাকেজে দশগুণ রোজগার! চোখ-ঠিকরানো বিলাসী ব্যবস্থা আর বহুমূল্যের দুর্দান্ত সব গিফ্‌ট্‌স! সেইসঙ্গে একসাথে বহুনারী গমন ও বহুগামী ভোগের অভিজ্ঞতা ও এক্সপেরিমেন্ট। দুবাই নিবাসী এন. আর. আই. জেসমিন জুবেইদ দেশে এলে মুম্বাইতে 'অরজি'র ব্যবস্থা করে যাবতীয় খরচ দিয়ে অনঙ্গকে আনায়। প্রথমবার হইহই করে ওকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল গ্রুপের মহিলারা—"ওয়েলকাম টু মুম্বাই! আ সিটি দ্যাট নেভার ফেইলস্ টু শক্ অ্যান্ড সারপ্রাইজ!"....কিন্তু উল্টে 'সারপ্রাইজ' তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল। যখন 'আরজি'র পাঁচজন মহিলাকে একসঙ্গে নিয়ে 'চিত্রসংঘাটক' আসনে 'পঞ্চনারী সুরতক্রিয়া' করেছিল অনঙ্গ। মনে মনে প্রণাম করেছিল 'কামশাস্ত্র' রচয়িতা মল্লনাগ বাৎসায়নকে। জিগোলো-জার্নিতে মল্লনাগ বাৎসায়নকে অনঙ্গ গুরু মেনেছিল একলব্যের দ্রোণ-ভজনার মতো; আর 'কামশাস্ত্র' ছিল ওর অর্জুনের লক্ষ্যভেদের অনুশীলন। জেনেছিল 'এক নায়ক পঞ্চনায়িকার সুরত রতি'—একটি পুরুষ ও পাঁচ নারীর সম্মিলিত মৈথুন! পুরুষ কীভাবে 'চিত্রসংঘাটক' আসনে 'দুই হস্তাঙ্গুলি দুই পদাঙ্গুলি ও শিশ্ন সহযোগে পঞ্চনারীতে সমভাবে সুরত ক্রীড়ায় সক্রিয়...'

এরপরেও নিজেকে ধরে রেখে আলাদা আলাদা ভাবে পাঁচজনকে 'কামসূত্র' বর্ণিত 'কার্কটক আসন' 'বেষ্টিত আসন' 'জৃম্ভিতক আসন', 'পীড়িতক আসন' ও 'উচ্ছিত্র' বা 'দাণ্ডামান আসন'-এ এক এক করে তৃপ্ত করেছিল কিউপিড-এর সার্থকনামা মধুদীপ অনঙ্গদেব।

'পদ্মিনী-শঙ্খিনী-চিত্রিণী-হস্তিনী'—

'....নারীর আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে এই প্রধান চার শ্রেণিতে ভাগ করেছে কামশাস্ত্র। 'পদ্মিনী' নারীশ্রেষ্ঠা। গাত্রবর্ণ দুধেআলতা, মধ্যমাকৃতি, দীঘলনয়না, উন্নত স্তনবৃন্ত, পদ্মকোরক সুগন্ধি যোনি, সুশীল এবং মধুর ভাষিণী। 'শঙ্খিনী' শ্বেতবর্ণা, চপল আঁখি, দীর্ঘাঙ্গী, সুতনুকা, ক্ষীণ কটি, সুস্তনী, গুরু নিতম্বিনী, নমনীয় যোনি, রমনপটু। 'চিত্রিণী' গান্ধর্বী গুণযুক্ত, ললিতকলা প্রিয়, পক্ক-গোধূম স্বর্ণাভবর্ণা, মৃগনয়নী, সুগভীর নাভিমূল, কোমল যোনি বহির্ভাগে ঈষৎ চাপা, ভেতরে প্রশস্ত। 'হস্তিনী' স্থূলকায়, কৃষ্ণবর্ণ, বর্তুলাকার চক্ষু, স্থূল নাসিকা, স্থূল ওষ্ঠ, বৃহদাকার স্তন, বিস্তৃত বৃহৎ যোনি, খাদ্য ও সম্ভোগপ্রিয়, সদা সকামা, তামসিক গুণসম্পন্ন।'....বই বন্ধ করল অনঙ্গ। এরপর আছে পুরুষাঙ্গের আকার ও যৌন সামর্থ্য অনুযায়ী পুরুষের শ্রেণিভেদ—শশক, মৃগ, বৃষ, অশ্ব। অনঙ্গদেব জানে, পুরুষের শ্রেণি বিচারে ও অশ্বশ্রেণি; রমণে শ্রেষ্ঠ হয় দীর্ঘতম সুদৃঢ় লিঙ্গের অশ্বশ্রেণির পুরুষ। নিজেকে নিয়ে ভাবে না। এই ট্রেড-এ 'কাজ' হয়ে গেলে নিজের স্বার্থ এবং সুবিধে ছাড়া অন্য ভাবনাচিন্তা নিষিদ্ধ। দশ বছর আগে ডিউক স্ট্যানলি পইপই করে বলে দিয়েছিল—"লুক্ অ্যানাঙ্গ, অলওয়েজ ভিউ ইট মোস্ট প্র্যাকটিক্যালি... ফর আস ইট্‌স্ অ্যাবাউট ওনলি আর্নিং মানি, হোয়াইল ফর আওয়ার উইমেন ক্লায়েন্টস্ ইট্‌স্ অ্যাবাউট স্যাটিসফাইং দেয়ার সেক্সুয়াল অ্যাপেটাইট—এর বাইরে গেছ কি মরেছ!" কথাগুলো এতকাল ধরে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এসেছে অনঙ্গ—যে ওর জন্যে এটা কেবল টাকা রোজগার; আর ওর ক্লায়েন্টদের জন্যে তাদের সেক্সুয়াল ডিজায়ারস্—কামনাবাসনা, নিড্ অ্যান্ড আর্জ—প্রয়োজন ও তাড়না, এবং সর্বোপরি তাদের যৌনখিদে মিটিয়ে তৃপ্ত করা—এর বাইরে কোনো কিছুকে প্রশ্রয় দেয়নি। কিন্তু!.....

ইদানীং এই 'কিন্তু'টা কুটকুট করে কামড়াচ্ছে। ভাবাচ্ছে গত কয়েক মাস ধরে। ভাবাচ্ছে সুচেতনা লাহিড়ি। যাকে এ যাবৎ অনঙ্গ তার নিজস্ব 'পাঁচমিশেলি'র সব থেকে সাধারণ এবং নিরীহ শ্রেণি 'অবহেলিত ও অতৃপ্ত'র দলে ফেলেছিল। যাকে শাস্ত্রসম্মতভাবে 'পদ্মিনী-শঙ্খিনী-চিত্রিণী-হস্তিনী'—কোনোটাতেই ফেলা যায় না আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিচারে। নির্বিরোধী ভালো কাস্টমার। বিধবা, নিঃসন্তান। উত্তর কলকাতায় নিজেদের বিশাল পুরোনো ধাঁচের বাড়ি। বাড়িতেই কাঠের ফার্নিচারের মস্ত গোডাউন। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে নিজের হাতে তুলে নিয়ে ফার্নিচারের রমরমা ব্যবসা নিজেই চালায়। ধনী এবং একেবারে নিঃসঙ্গ মহিলা। ব্যবসার দখল নিতে চাওয়া আত্মীয়স্বজন না পেরে নিজেরাই সরে গেছে বাপেরবাড়ি-শ্বশুরঘর দু'তরফ থেকেই। চেহারা একেবারে প্লেইন সাদামাটা, কিন্তু গড়ন ভালো। গত সাত বছরে মাসে একবার কি বড়জোর দু'বার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বাড়িতে ডাকত। অন্য কাস্টমারদের মতন কখনো হোটেলে কি বাইরের ট্রিপ-এও যায়নি ওকে 'এস্কর্ট' হিসাবে নিয়ে। বরাবরই সুচেতনা লাহিড়ির ক্ষেত্রে বাড়িতে 'নাইট-স্টে'র ফুল-প্যাকেজ বাঁধা। বিশেষ কোনো চাহিদা নেই, 'এটা করো ওটা করো'র ঝামেলা নেই, একরাতে একবারের বেশি দু'বারের ইচ্ছে প্রকাশ করেনি কখনো, কিন্তু শরীরের 'কাজ' মিটলে টুকটাক কথা বলে। অনঙ্গদেব সবসময় মনোযোগী শ্রোতা। কাস্টমার বিশেষে এটা হতে হয়। কথাবলা ক্লায়েন্টরা ভালো শ্রোতা চায়। প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট যখন করেছিল, ফোনে আগেই এ-কথা বলে নিয়েছিল—"আমি কিন্তু কথা বলি, গল্প করি, তাই 'নাইট-স্টে'র ফুল প্যাকেজ। শুধুই ওটার জন্যে নয়.....।" এধার থেকে অনঙ্গ নিশ্চিত করেছিল—"ঠিক আছে। নো প্রবলেম। আমার দিক থেকে কোনো সমস্যা হবে না।"....পরে, এই সাতবছরে একবারও জিজ্ঞাসাও করেনি ওর কনটাক্ট-নম্বর কীভাবে পেয়েছিল। কারণ কোনো এজেন্সির সঙ্গে ও যুক্ত ছিল না। বা নিজের সেলফোন নম্বর ছাপানো প্যামফ্লেট চিপ্‌কায়নি জনবহুল এলাকার দেওয়ালে, কি বড়ো বড়ো কমপ্লেক্সে, বা সুদৃশ্য গাছের গুঁড়িতে—যেগুলো সাধারণত বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে থাকে জিগোলোরা। নেট-এর সাইটে নেই সাইবার-ফ্রড এবং ব্ল্যাকমেলিং রিস্ক-ফ্যাক্টরের কারণে। এমনকি সাংকেতিক ভাষায় সুকৌশলী অ্যাডও দেয়নি! তাতেই যাকে বলা হয় 'ফ্লাডেড উইথ কল্‌স্'—অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে মহিলাদের ফোনের বানভাসি কি দিল্লি কি কলকাতা, জিগোলো-মার্কেটে ওর নাম রটেছে মুখে মুখে। ডিউক স্ট্যানলির মতে এই 'ওয়ার্ড অফ মাউথ্' এবং 'টেল্-টেইল' বা গালগপ্পোই হচ্ছে যোগাযোগের সব

থেকে নিরাপদ আর কার্যকর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এই বিজনেসে। বলতো, এতে 'মিনিমাম এফর্ট উইথ ম্যাক্সিমাম এফেক্ট!'

....হয়তো এভাবেই জেনেছিল সুচেতনা লাহিড়ি। এ নিয়ে মাথা ঘামায় না অনঙ্গদেব কারুর ক্ষেত্রে। ওর দরকার অ্যাপয়েন্টমেন্ট-কল্, আর কাস্টমারদের দরকার ওর 'স্পেশাল সার্ভিস।' হয়ে গেল শোধবোধ! কিন্তু ইদানীং এই একটা জায়গায় ঠিক মতো হচ্ছে না 'শোধবোধ'। গত কয়েক মাস আগে সেদিনের ওই ফোন সুচেতনা লাহিড়ি করেছিল তার রুটিন ধরে মাসে দ্বিতীয়বার। অনঙ্গ বলেছিল, "আজ হবে না।"...এরকম কথার জবাবে সচরাচর দ্বিতীয় কথা বলে না মহিলা। 'আচ্ছা' বলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন ছেড়ে দেয়। ক'দিন পর আবার অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে ফোন করে। কিন্তু সেদিন ছাড়ল না। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল— "আজ খালি নেই? অন্য কোথাও বুক্ড্ অলরেডি?"...অবাক হলেও বুঝতে না দিয়ে অনঙ্গ সহজ ভাবেই বলেছিল—"না, তা নয়।"....এবারও সামান্য চুপ; তারপর—"তাহলে? নাইট-শিফ্ট্ শুটিং আছে?"... উত্তরোত্তর বিস্মিত হয়ে এবার একশব্দে জবাব দিয়েছিল—"না।"... ফের প্রশ্ন—"তাহলে কি শরীর খারাপ?"... বিরক্ত হতে গিয়েও পারল না। কারণ সুচেতনা লাহিড়ি আজ পর্যন্ত কখনো অনুযোগ করেনি অন্যদের মতোন অ্যাপয়েন্ট না পেলে। আবার জিজ্ঞেস করল—"কী হয়েছে তাহলে?"....অধৈর্য হয়ে অনঙ্গ মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল—"কিছু হয়নি, আজকের তারিখে আমি কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিই না। দিনটা শুধু মায়ের জন্যে রাখি। এইদিনে মা যখন-তখন অনেকবার ফোন করে...." নিজেকে সামলে নিতে গিয়েও পারল না। তার আগেই রুদ্ধশ্বাস প্রশ্ন ছুটে এল—"এই দিনটা কী? এই তারিখটা কী অনঙ্গ, কী?"...সুচেতনা লাহিড়ির রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যে জবাব দেবে না ভাবার আগেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল—"এই দিনে এই তারিখে আমার মা অনেক লড়াই করে আমাকে এই দুনিয়ায় এনেছিল....।" ও'প্রান্তে থরথরিয়ে উঠেছিল গলা—"জন্মদিন? কোন সাল? সালটা বলো!"...নিজের ওপরেই প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে অনঙ্গ এবার জেনেশুনেই ঝেঁঝে বলেছিল—"বত্রিশ বছর আগে হলে যেটা হয়, ১৯৯০...।" সুচেতনা লাহিড়ি নিঃশব্দে লাইন কেটে দিল ও-ধার থেকে।

এমন কখনো হয়নি!—

ক্লায়েন্টের সঙ্গে এভাবে কখনো কথা বলেনি অনঙ্গদেব!—

কিন্তু তখন বলেছিল!—

ভেবেছিল, একটা ভালো ক্লায়েন্ট গেল!—

যায়নি!....সুচেতনা লাহিড়ির ফোন এসেছিল ক'দিন পরেই!—

অন্যসব দিনের মতো খুব স্বাভাবিকভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে নিল।—

—"স্যরি।"

পরের অ্যাপয়েন্টমেন্টের নির্দিষ্ট রাতে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল অনঙ্গদেব। এই প্রফেশনে কাস্টমারের কাছে সবসময় মডেস্টি বজায় রেখে চলতে হয়। একই সঙ্গে স্মার্ট এবং মার্জিত থাকতে হয়।....ওর 'স্যরি'র জবাবে সুচেতনা লাহিড়ি কোনো কথা না বলে চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে ছিল। অনঙ্গ অপ্রস্তুত হয়ে ফের বলেছিল—"ওভাবে কথা বলাটা সেদিন আমার উচিত হয়নি।"... তখন সুচেতনা বলে উঠল—"তাহলে যেটা উচিত সেটা আজকে হোক।"...বুঝতে না পেরে ও অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল। মৃদু হেসে মহিলা নির্দেশ দিল—"এসো আমার সঙ্গে।"....অনঙ্গ এতদিনের অভ্যাসে ড্রইংরুম পেরিয়ে ওদের 'স্পেশাল-ট্রিটমেন্টের' স্পেশাল ঘরের দিকে পা বাড়াতেই সুচেতনা লাহিড়ি ওকে থামাল—"উঁহু, উঁহু, আজ ওদিকে নয়, আজকে আগে এদিকে...." তার উঁচানো আঙুল উল্টোদিক দেখাচ্ছে।...পুরোনো দিনের বড়ো ডাইনিংরুম। মস্ত টেবিলে সাজানো রুপোর থালা, চারদিক ঘিরে সারি সারি রুপোর বাটি, একপাশে ঢাকনা দিয়ে রুপোর গ্লাসে জল, আর টেবিলভর্তি রুপোর বড় বড় বউল ঢাকাচাপা রয়েছে। পাশে পাশে রুপোর হরেকরকমের সার্ভিস-স্পুন—নানান সাইজের হাতা, চামচ!....টেবিলের শেষ মাথায় সিট-অফ-অনারের সেগুন কাঠের ভারী চেয়ারটা টেনে সুচেতনা লাহিড়ি ডাকল—"কী হল? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? এসো! বসো! সব আমি নিজের হাতে রেঁধেছি আজকে....।" বিব্রত হয়েছিল অনঙ্গ ভীষণ! রেস্তোরাঁতে 'এস্কর্ট' হয়ে একসঙ্গে গিয়ে খাওয়া, কিংবা কাস্টমারের নির্দেশে তাকে নিয়ে বড়ো হোটেলে লাঞ্চ-ডিনার করা, কি বাইরে বেড়াতে গেলে সকালের ব্রেকফাস্ট থেকে রাতের খাওয়া একসাথে সারা—এগুলো ওর কাজের মধ্যে পড়ে। কিন্তু প্রফেশনালি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বাড়িতে ডেকে এভাবে থালা সাজিয়ে খাওয়ানো, একেবারেই নিয়মের মধ্যে পড়ে না! ইতস্তত করে বলেই ফেলেছিল—"এসব কেন? আমি এতে অভ্যস্ত নই!"....পাত্তা না দিয়ে একেকটা বউল খুলে বাটিতে বাটিতে খাবার সাজাতে সাজাতে সুচেতনা বলেছিল—"অভ্যস্ত না হলেও খেতে হবে। হোল-নাইট প্যাকেজের অ্যাপয়েন্টমেন্ট। সারা রাত আমি যা বলব করতে হবে। খাওয়া দিয়ে শুরু করো...."

বসতে বাধ্য হয়েছিল অনঙ্গ। পাশে বসে নিজেও খেলো সুচেতনা লাহিড়ি। নিজের হাতে নিজের ইচ্ছেমতো পরিবেশন করছিল পদ বেছে বেছে। আঁতকে উঠে সমানে 'না না' করছিল অনঙ্গ। শেষে বলেই ফেলল—"অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলে আমি খুব লাইট ডিনার করি...নয়তো অসুবিধে হয়।"....চোখ তুলে তাকাল মহিলা। চোখে চোখ রেখে আস্তে করে জবাব দিল—"জানি; কিন্তু আজকে কোনো অসুবিধে হবে না। ভালো করে খাও। অনেককাল বাদে আজ নিজের হাতে রান্না করেছি তোমার জন্যে।"....অপ্রতিভ হয়ে হেসেছিল অনঙ্গ—"জন্মদিনের খাওয়া?"...তেমনি একভাবে চেয়ে থেকে মাথা নেড়েছিল সুচেতনা—"ধরে নাও তাই। দুজনেরই জন্মদিন! আর সেইসঙ্গে সেদিনের অনুচিত ব্যবহারের জন্যে আজকের এই উচিত কাজটা সারা!"....খাওয়া থেমে গিয়েছিল। অবাক অনঙ্গ বলে উঠেছিল—"দুজনেরই জন্মদিন! মানে আপনারও? ইশ, আগে জানলে....গিফ্ট্ পাওনা রইল আপনার।"... তেমনি অপলকে চেয়ে থেকে সুচেতনা লাহিড়ি জবাব দিল—"এখন যেটা করছ, সেটাই গিফ্ট্। ভালো করে পেট ভরে খাও। এরপরের 'সুবিধে-অসুবিধের' জন্যে চিন্তা করতে হবে না।"....কিরকম লাগছে যেন আজ

মহিলাকে—অনঙ্গ ভাবল। মুখে বলল—"বিলেটেড হ্যাপি বার্থডে দেন!" একটু যেন চমকে উঠল মহিলা—"আমাকে উইশ করছ?.....আচ্ছা, থ্যাংকিউ।"

সেই রাত থেকে একটু একটু করে পাল্টেছে সুচেতনা লাহিড়ি। ওই রাতে সাত বছরের মধ্যে এই প্রথমবার এই বাড়ির 'স্পেশাল রুমে' না গিয়ে সুচেতনার সঙ্গে তার শোবার ঘরে ঢুকেছিল অনঙ্গ। বিরাট ঘর। কিন্তু বিলাস-বৈভবে ভরা বাড়ির অন্য ঘরের তুলনায় একেবারে সাধারণ। একটা বড় খাট, একটা বড় আলমারি, একখানা ড্রেসিংটেবিল, আর একটা গোল টেবিল খাটের মাথার কাছে। তার ওপর একখানা বাঁধানো ছবির ফ্রেম। সেটার সামনে সুদৃশ্য কাচের রেকাবিতে একরাশ তাজা যুঁইফুল। ছবিটা তৎপর হাতে উল্টো করে রাখল সুচেতনা লাহিড়ি। সাধারণত ক্লায়েন্টের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো মাথা গলায় না অনঙ্গদেব তারা নিজে থেকে না চাইলে। কিন্তু সেই রাতটা অন্যরকম; অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া সাধারণ রাত নয়! অনঙ্গর কৌতূহল হয়েছিল—হাসবেন্ডের ছবি? তার চোখের সামনে....তাই চাপা দিয়ে রাখল? সুচেতনা ওদিকে বেডকভার সরিয়ে বিছানা ঝেড়ে বালিশ ঠিক করে ডাকল—"এসো, শুয়ে পড়ো, আজকে আর অন্যকিছু নয়...." বিস্ময়ে অনঙ্গ জোরেই প্রতিবাদ করে উঠেছিল—"না, না! তা হয় না। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না! আই'ল্ টেক কেয়ার অফ দ্যাট...." ফিরে তাকাল সুচেতনা লাহিড়ি। লালচে হয়ে উঠল তার সাদামাটা শ্যামলা মুখ! দপ্ করে উঠল সরু কাজলপরা সাধারণ দু-খানা চোখ। যে মুখ যে চোখ অনঙ্গর একেবারে অচেনা! শক্ত গলায় হুকুম করল— "হোল-নাইট'-এর ফুল্ প্যাকেজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছি আমি... ফুল পেমেন্ট যখন আমিই করব তখন আমি যা বলব সেটাই হবে। ভারী খাওয়া হয়েছে, এখন শুয়ে ঘুমোও।"....পাশের বালিশে মাথা দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়ল। প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছিল অনঙ্গদেবের। কখনো এরকম অস্বস্তি হয়নি ওর অস্বস্তি হচ্ছিল অনঙ্গদেবের। কখনো এরকম অস্বস্তি হয়নি ওর জিগোলো-জার্নির চোদ্দো বছরের সময়কালে! এতগুলো বছরের এতগুলো দিনে আর রাতে অগুন্তি মহিলার সঙ্গে শুয়েছে—কিন্তু কখনো এইভাবে 'পাশে' শোয়নি!

....সেই শুরু—

পরদিন পুরো পেমেন্ট করে দিয়েছিল সুচেতনা লাহিড়ি। সঙ্গে জন্মদিনের গিফট্ সোনার মোটা চেনের রিস্টলেট। দেখেই বোঝা যায় ঘরের জিনিস, এবং পুরুষ মানুষের। খুবই অস্বাচ্ছন্দ্য লাগছিল। বারবার আপত্তি করেছিল। কান দেয়নি মহিলা। তির্যক প্রশ্ন করেছিল—"ক্লায়েন্টদের থেকে গিফট্ নাও না তুমি?"...বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছিল। সুচরিতা ওর ডানহাতের কব্জিতে পরিয়ে দিয়ে খুশির গলায় বলেছিল—"বাঃ, দিব্যি ফিট করেছে!"...মরমে মরতে মরতে ফুল-পেমেন্টও নিতে হয়েছিল কড়কড়ে নোটের মোটা বান্ডিলে। ওর আপত্তি—"সার্ভিস না দিয়ে এভাবে পেমেন্ট নেওয়া যায় না"—একফুঁয়ে উড়ে গেছিল সুচেতনা লাহিড়ির কথায়— "সার্ভিস তুমি দিয়েছ। হোল-নাইট প্যাকেজের পুরো রাত কাটিয়েছ। সার্ভিস আমি আমার মতো করে নিয়েছি। এটা অন্যরকম স্পেশাল- সার্ভিস। এ নিয়ে আর একটাও কথা বলবে না।"

সেদিন আর কিছু বলতে পারেনি অনঙ্গ। ধরে নিয়েছিল, ওর জন্মদিনটা ওইভাবে পালন করল মহিলা। কিন্তু তা নয়! তখন থেকে শুরু হয়েছে অদ্ভুত আচরণ! গত কয়েক মাসে বরাবরের অভ্যেস মতো সারারাতের ফুল-প্যাকেজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছে মাসে একবার কি দু'বার; কিন্তু বরাবরের অভ্যেস একেবারে ভেঙে দিয়েছে আসল জায়গায়—যৌন-সম্পর্কে!...ওই রাতের পর থেকে যতবারই ডেকেছে, কোনোরকম শারীরিক সম্পর্ক হতে দেয়নি। প্রত্যেকবারই আগে ড্রইংরুমে নিয়ে একসঙ্গে বসে খাওয়া, নিজের হাতে পরিবেশন করে যত্ন করে খাওয়ানো, তারপর ওই নিজস্ব শোওয়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে পাশাপাশি শোওয়া। আগে থেকেই উল্টিয়ে চাপা দেওয়া থাকত গোল-টেবিলের বাঁধানো ছবি। যার সামনে গন্ধে ম ম করত রেকাবি ভরতি ভেজা টাটকা যুঁইফুল।... আগে এই বাড়িরই স্পেশাল ঘরে 'স্পেশাল-সার্ভিস' দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত অনঙ্গদেব। কিন্তু এই ঘরে ঘুম আসে না। বিনিদ্র চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে ওর বুকের ওপর একখানা হাত রেখে পরম নিশ্চিন্তে কী গভীর ঘুম ঘুমোচ্ছে সুচেতনা লাহিড়ি! আলতো করে হাতখানা সরিয়ে পাশ ফিরে শোয় অনঙ্গ। একসময় পিঠের ওপর ফের এসে পড়ে নরম হাত।

....সবথেকে অসুবিধে হয় পেমেন্ট নিতে। হোল-নাইট

'তুমনে কী হ্যায় মেরা দিল্ বরবাদ!....'

ফুল-প্যাকেজের পুরো পেমেন্ট পাইপয়সায় মিটিয়ে দেয় সুচেতনা লাহিড়ি। ওর অস্বস্তি দেখে জোর করে ধরিয়ে দিয়ে বলে—"এখন এটাই তোমার 'স্পেশাল সার্ভিস'। এটাই আমার দরকার। ক্লায়েন্টের যেটা প্রয়োজন সেটাই তুমি দিচ্ছ তোমার সময় খরচ করে। তাহলে পেমেন্ট নেবার বেলায় অসুবিধে কিসের?"

একদিক থেকে কথাটা হয়তো ঠিক। কিন্তু মেনে নিতে পারে না অনঙ্গ। সাত-সাতটা বছর ধরে টাকা দিয়ে জিগোলো-খাটানো বাহান্ন-তিপ্পান্ন বছরের পোড় খাওয়া মহিলার এখন শুধু একসঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে বুকের ওপর বা পিঠে হাত রেখে ঘুমোনো—এতেই সব মিটে যায়?....কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল। সুচেতনা লাহিড়ি হেসে জবাব দিয়েছিল—"কার যে কখন কিসে কী মেটে তা কি সে নিজেও জানে?"

শেষবার অনঙ্গ বলে দিয়েছিল—"এভাবে আমি শুধু শুধু টাকা নিয়ে যাব, এটা চলতে পারে না।"

হাসি উবে গিয়ে থমকে তাকিয়েছিল সুচেতনা। ফিরে ওকেই প্রশ্ন করেছিল—"কী ভাবে চলতে পারে তাহলে?"

ইচ্ছে করেই সব মডেস্টি সব ভদ্রতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে স্ল্যাং বলেছিল অনঙ্গ—"দেখুন, আমাদের এই গতর-খাটানো ব্যবসায় অনেক ছেনালপনা করতে হয়। ক্লায়েন্টের ডিমান্ডে তার সামনে উদোম ন্যাংটো হয়ে স্ট্রিপ্‌টিজ্ ডান্স করতে হয়, স্যাডিস্ট কাস্টমারের 'মা-মাসি' তোলা কাঁচা খিস্তি শুনতে শুনতে চাবুক খেতে হয়, ম্যাসোকিস্ট কাস্টমারকে নোংরা কথা বলতে বলতে রেপ করতে হয়, কুকুরের মতো হ্যা হ্যা করে হাঁফাতে হাঁফাতে ট্রান্সজেন্ডার-লেডি-ক্লায়েন্টকে প্রচুর সময় নিয়ে শরীর ধসিয়ে স্যাটিসফাই করতে হয়; কিন্তু হঠাৎ করে একদিন এরকম 'ঘরের মানুষ' সম্পর্ক পাতিয়ে সতীগিরির ছেনালিপনা করতে হয় না...."

দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল সরু কাজলপরা চোখদুটো। গলা চিরে বেরিয়ে এসেছিল তীক্ষ্ণ স্বর—"কী বললে! কী বললে তুমি? 'ঘরের মানুষ' সম্পর্ক পাতিয়ে সতীগিরির ছেনালিপনা?"....রাগে গনগনে মুখ, আগুনের হলকা হয়ে ঝাপটা মারল পরের কথাটা—"সম্পর্ক! অ্যাঁ? সম্পর্ক নিয়ে কথা তুললে তুমি! সম্পর্কের কী জানো তুমি? কতটুকু জানো?.....এসো তাহলে, সম্পর্ক দেখাই তোমাকে!" অনঙ্গর হাতে হ্যাঁচকা টান মেরে টানতে টানতে নিয়ে গেল ঠাকুরঘরে। তারাপীঠের তারামূর্তির ছবি দেখিয়ে বলে উঠল—"এটা খোলস, আসল শিলামূর্তিতে কি আছে জানো? নিজের স্বামী, বিষে অচৈতন্য নীলকণ্ঠ মহাদেবকে সন্তানজ্ঞানে কোলে নিয়ে স্তন্যপান করাচ্ছে বুকের অমৃতসুধায় তার চেতনা ফেরাতে...." রুদ্ধ আবেগে বুজে এল গলা—"পারবে? পারবে এই 'সম্পর্কের' ব্যাখ্যা করতে! পারবে যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস করা ওই শিলামূর্তিকে অস্বীকার করতে? পারবে 'ছেনালিপনা' বলতে ওই সম্পর্ককে?".....

অনঙ্গদেব কি বলবে জানে না। অবাক বিস্ময়ে দেখছিল অতি সাধারণ এই মহিলাকে যে সহসা অসাধারণ হয়ে উঠে উচ্চারণ করেছিল এক চরম সত্য, এক পরম উক্তি—"হতে পারে মিথ্, হতে পারে কল্পকাহিনি, কিন্তু তবু এ মিথ্ কি শেখায় জানো? শেখায়—নারী ইচ্ছে করলে একাধারে সবকিছু হতে পারে...."

সেদিন বুঝতে পারেনি অনঙ্গদেব। কোনো কথাও বলতে পারেনি। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নও মাথায় আসেনি। শুধু বড় অদ্ভুত আর অজানা লাগছিল এতদিনের চেনাজানা, সাদামাটা চেহারার সুচেতনা লাহিড়িকে। ফিরে এসেছিল নিশ্চুপে।...বাইক ছুটছিল দুরন্ত গতিতে। বাতাস-কাটা সাঁই সাঁই শব্দে অনঙ্গ শুনছিল ট্রান্সজেন্ডার নারী মনীষাদির গলা—"জননী আর জায়ায় কোনো ভেদ নাই/জননী দেয় স্তন্য, জায়া দেয়...."

অস্ফুটে, অজান্তে, অনঙ্গর বুকের ভেতর থেকে কেউ যেন বলে উঠল—বোধহয় মেয়েরাই পারে...শুধুমাত্র মেয়েরাই!

—'দিল্ কি চোটো নে মুঝে চায়ন সে রহ্‌নে না দিয়া
যব চলি সর্দ হাওয়া ম্যায়নে তুঝে ইয়াদ কিয়া
ইস্‌কো রোনা নেঁহী কি তুমনে কী হ্যায় মেরা দিল্ বরবাদ
ইস্‌কা গম্ হ্যায় কি বড়ী দের সে বরবাদ কিয়া'—

—বুকে যে চোট পড়েছে তা আমাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না....যখনই মিঠে বাতাস বইছে তোমাকে মনে পড়ছে...এর জন্য আমি কাঁদি না যে আমার দিল্ ভেঙে আমাকে একেবারে বরবাদ করে দিয়েছ....দুঃখ এটাই যে বড় দেরিতে বরবাদ করেছ....

মাথায় ঝাঁকি দিয়ে এসব শের-শায়রি দূর করে তাড়ায় অনঙ্গ। জীবনটা কাব্য নয়, কঠোর কঠিন বাস্তব। তিলে তিলে সেখানে জায়গা করে নেওয়া মধুদীপ অনঙ্গদেব কিছুতেই এভাবে নিজেকে বরবাদ হতে দেবে না। এখানে 'দিল্' বলে কিছু হয় না, এখানে কখনো 'মিঠে বাতাস' বয় না, এখানে হৃদয়ে 'চোট' পড়ে না, তাই মন এখানে 'বরবাদির' কারণ হতে পারে না।

।। পরিশিষ্ট।।

শাপমোচন

নিরন্ধ্র অন্ধকার, অন্তহীন পিচ্ছিল সুড়ঙ্গ। তার তরল গরলে সিক্ত হিল্‌হিলে ঘিনঘিনে এক সরীসৃপ। সুড়ঙ্গমুখ বেয়ে ক্রমাগত ঢুকে চলে নিকষ আঁধারে। অনন্ত তার প্রবেশ, অন্তহীন তার প্রয়াস। আদিকাল থেকে শুধু ঢুকছে, ঢুকছে, আর ঢুকছে। জানা নেই নিষ্ক্রমণের পথ। জানতে চায়নি কখনো। আগ্রাসী আকর্ষণে হাঁ-মুখ ব্যাদান করা গোপন গুহা তাকে নিমেষে গিলে নেয় অন্ধতমিস্রার গহীন অভ্যন্তরে। তল নেই কূল নেই, আদি নেই অন্ত নেই, ভয়াল কৃষ্ণগহ্বর। বুকে হাঁটা পন্নগ সরীসৃপ স্বেচ্ছায় প্রবেশ করে ওই অন্ধকূপে। সপ্তপাতালের অনিঃশেষ মহাঘোরা নিতলে নিকৃষ্ট ঘৃণ্য কীট নিরন্তর বিচরণ করে আত্মধ্বংসী উল্লাসে। নিকাশ নেই, মুক্তি নেই, পূতিগন্ধময় সুড়ঙ্গপথে শুধুই পাশবদ্ধ ক্লেদাক্ত চারণ....

আতঙ্কে ও প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে। কোনো শব্দ হয় না। অবয়বহীন সরীসৃপের মুখ নেই, ধ্বনি নেই, আছে শুধু দুর্নিবার অন্ধ রমণ! চিৎকারের পরিবর্তে ওঠে লক্ষ লক্ষ কামুক শীৎকার। আবহমানকাল ধরে রমণসুখে উল্লসিত লক্ষ লক্ষ রমণীর তীক্ষ্ণ হুলুধ্বনি। চক্ষুহীন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নিজেকে দেখে! দেখে, হাজার বছর ধরে যোনিপথ পরিক্রমণ করা এক কদাকার যোনিকীট! কায়াহীন, মস্তিষ্কহীন, হৃদয়হীন, কদর্য মাকড়!...শিউরে ওঠে—

'এই কি আমি?' এতকাল পরে নির্মম আত্মদর্শনে আপ্রাণ অন্বেষণে খোঁজে নিষ্ক্রমণের অন্তিম পথ। কত যুগযুগান্ত পরে আলোর পিপাসায় আকণ্ঠ তৃষ্ণার্ত জীবাত্মা বেরিয়ে আসে অভিশপ্ত কীটের খোলস ছেড়ে। চিরতমসাবৃত নিশ্ছিদ্র আঁধারকূপের বদ্ধ গুটিজাল কেটে মুক্তিকামনায় আলোর ঠিকানার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরে কদর্য গুটিপোকা। প্রজাপতি হয়ে ডানা মেলতে চায় ক্লেদাক্ত যোনিকীট—অনঙ্গ! অনঙ্গদেব!

বদ্ধ চোখের পাতা সাড়া দেয় হাজার হাজার ওয়াটের তীব্র কশাঘাতে। ধাঁ ধাঁ আলোয় নড়ে ওঠে বোজা চোখের মণি, কেঁপে ওঠে মুদ্রিত আঁখিপল্লব। কানে আসে ভ্রমরগুঞ্জনের মতো সম্মিলিত আওয়াজের ধ্বনি। যেন অনেকগুলো ভোমরা একসঙ্গে ডাকছে একটানা। যেন অনেকগুলো মৌমাছি একসঙ্গে গুনগুন করছে। যেন অনেকগুলো প্রজাপতি একসঙ্গে ডানা মেলছে। অনঙ্গর সর্বাঙ্গে লাগে তাদের ডানার কাঁপন। অনেক দূর থেকে, বহু মৃত নক্ষত্রের আলোকবর্ষ পার হয়ে ফিরে আসে অনঙ্গদেব।

...চারদিন চাররাত। ছিয়ানব্বই ঘণ্টা বাদে মুখ খুলল যুদ্ধ করে চলা চিকিৎসকরা।—"এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না"—বলল প্রধান নিউরো-সার্জেন। চারদিন ধরে নার্সিংহোমে বসে থাকা নির্মলাকে। ম্যাসিভ সেরিব্রাল অ্যাটাকে আক্রান্ত অনঙ্গদেবকে চারদিন আগে এখানে ভর্তি করা হয়েছে।

'দিল্ কি চোটো নে মুঝে চ্যয়ন সে রহনে না দিয়া'—

'দিল্'-এ চোট পড়েছিল। আপ্রাণ চেষ্টা করেও ধাক্কা লাগা আটকাতে পারেনি। ইদানীং কেমন খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছিল সবকিছু। আসলে খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছিল অনঙ্গ নিজেই। হাই-প্রোফাইল ক্লায়েন্টদের সঙ্গে শপিংমলে গিয়ে বিরক্ত হচ্ছিল যখন পরিচিত মানুষের মুখোমুখি হয়ে গেলে তারা ওর পরিচয় করাচ্ছে হামেশার মতো 'আত্মীয়' বলে—'আমার দিদির ছেলে'... 'আমার বোনের ছেলে'...'আমার পিসতুতো/মাসতুতো/মামাতো/খুড়তুতো ভাই'... 'আমার ভাইপো'...শুনে অপমানিত বোধ করছিল অকারণে। মুখে আসছিল—এই 'সম্পর্কগুলো' না বললেই নয়? বলা যায় না, 'চেনা' বা 'পরিচিত'?.....

তার বদলে—'তুম্‌নে কী হ্যায় মেরা দিল্ বরবাদ!....'

ক্রমশ বরবাদ হয়ে যাচ্ছিল অনঙ্গ। যে 'বরবাদি' ওকে সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে 'অনঙ্গদেবকে' বাঁচিয়ে রাখতে হলে।...ছোট্ট রাজুকে দুপুরে ঘুম পাড়ানোর জন্যে মা নির্মলা ভয় দেখাত—'ঠিক দুপুরবেলা ভূতে মারে ঢ্যালা'—আর অনঙ্গদেব প্রত্যেকবার 'ভূতের ঢ্যালা' খেয়েছে খাঁ খাঁ নির্জন দুপুরে! একের পর এক।....আবারও এক দুপুরের কালবেলায় বুকের ভেতর বেয়াড়া ঘুঘু ডাকল, মাথার মধ্যে পাগলাঘন্টি বেজে উঠল, আগুপিছু না ভেবে উঠে বসল কাওয়াসাকি Z৯০০-এর পিঠে। চাপড় দিয়ে বলল—"চল্ চৈতন, আজ সব শোধবোধ করে দিয়ে আসি।" সঙ্গে রয়েছে হোল-নাইট প্যাকেজের হিসেবে এক-একটা রাতের গোছা গোছা নোটের বান্ডিল, আর সোনার চেনের মোটা রিস্টলেট। গন্তব্য, উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ি। লক্ষ্য, সুচেতনা লাহিড়ি। বাইকে স্টার্ট দিতে দিতে দাঁতে দাঁত ঘষল—"গায়ে খেটে টাকা নেয় জিগোলো অনঙ্গদেব, ক্লায়েন্টের ঋণ রাখে না।".....

সামনে নোটের বান্ডিল আর সোনার চেন। মূর্তির মতো বসে ছিল সুচেতনা লাহিড়ি। অনঙ্গর বলা শেষ, উঠে দাঁড়িয়েছে বরাবরের মতন চলে যাওয়ার জন্য। উঠল সুচেতনাও, শক্ত মুঠিতে হাত ধরল অনঙ্গর, স্থির স্বরে বলল—"এসো, ঋণ শোধ করতে এসেছ যখন পুরোটাই করে যাও। দু-দিক থেকেই শোধবোধ হয়ে যাক....." কাচপোকার মতো টেনে নিয়ে চলল তার নিজস্ব নিরাভরণ শোওয়ার ঘরে। চেষ্টা করেও বাধা দিতে পারল না অনঙ্গ।...ভারী পর্দা ফেলা ঘরে ছায়াছায়া আবছা অন্ধকার। গোল-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ছবির দিকে আঙুল তুলে বলল— "দ্যাখো!"

সুগন্ধী ভেজা যুঁইফুলে ভরা রেকাবির সামনে ফ্রেমে বাঁধানো ছবি আজ আর উপুড় করে চাপা দেওয়া নয়—দাঁড় করানো। খট্ করে সুইচ-টেপা স্পট্ লাইটের আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠল বছর পঁচিশের ঝকঝকে তরুণ! দৃপ্ত স্বাস্থ্য, বলিষ্ঠ, নেভি'র সাদা ড্রেস পরে বাঁধানো ফ্রেমের ভেতর থেকে হাসছে। ভীষণ উজ্জ্বল, চোখ-ধাঁধানো জীবন্ত!...সুচেতনা যেন পরিচয় করাচ্ছে দু'জনের—"আমার ছেলে, একমাত্র সন্তান। একই বছরের একই দিনে এসেছ তোমরা—চৌঠা মে, ১৯৯০, শুক্রবার, তোমাদের দুজনেরই জন্মদিন। দু'জনেরই এখন বত্রিশ বছর চার মাস...."

অনঙ্গর বুকের মধ্যে আচমকা হাতুড়ির ঘা পড়ল। চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে সুদর্শন যুবাপুরুষ। নির্মল হাসিতে কিছু যেন বলছে!....বলছিল সুচেতনা লাহিড়ি। নিজের মনে বলে চলেছে—"তাই; তাই তারপর থেকে সব বদলে গেল....তাই তারপর থেকে আর পারিনি আগের মতো হতে...দিন-তারিখ-বছরটা জানার পর...."

বুকের হাতুড়ির ঘা মাথার দিকে ধেয়ে উঠছিল। শুনতে না চাইলেও অনঙ্গ বাধ্য হচ্ছে শুনতে—"তোমার মধ্যে ওকে দেখতাম, ওকে পেতাম, তোমাদের জন্মদিনে আমিও নতুন করে জন্ম নিলাম। বেরিয়ে এলাম পুরোনো খোলস ছেড়ে...."

অনঙ্গদেব বলতে চাইল—স্টপ্ স্টপ্ স্টপ্! পারল না। দ্রুতলয়ে ঝমঝমিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো বাজনা বেজে উঠল মস্তিষ্কের কোষে কোষে। তাদের ভেদ করে কানে ঢুকছে অস্ফুট কণ্ঠস্বর—"দেহের খোলস পাল্টানো যায় না, কিন্তু মনের খোলস যখন-তখন পাল্টে যায় অনঙ্গ! যৌনতার খোলস ছেড়ে নিমেষে জননী হলাম...."

এ কোন অভিশাপ? ও কেন বধির হয়ে যাচ্ছে না? কেন?

ছায়ামাখা ঘরে স্পট্-লাইটের গোল আলোর চক্রে দুরন্তভাবে জ্যান্ত হয়ে হাসছে ছেলে! তার সামনে তার মা বলছে—"জানি, এ হয় না। জানি, আমারই ভুল। জানি, তুমি মানতে পারছ না শরীর-বিহীন এই অদ্ভুত সম্পর্ক। কিন্তু আমি যে আর ওসব পারি না! আবার থাকতেও পারি না তোমাকে না দেখে। তাই ডেকে আনি অ্যাপয়েন্টমেন্টের ছুতো করে...."

মাথার মধ্যে ভীষণ ভাবে বাড়ছিল বাজনার শব্দ! তা ছাপিয়ে উঠছে প্রায় অলৌকিক ওই মৃদু স্বর—"সাত বছর আগে প্লেনক্র্যাশে

চলে গেল ছেলে। ছুটি নিয়ে বাড়ি আসছিল, এল তার ঝলসানো শরীর নিয়ে কফিন। সেই থেকে ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের পেশেন্ট আমি। মরিয়া হয়ে তখন প্রথম ডেকেছিলাম তোমাকে।...কিন্তু ওই জন্মদিনটা একেবারে বরবাদ করে দিল আমায়।"...সোনার চেনের রিস্টলেট তুলে ধরে দেখাল—"এটা ওর পঁচিশ বছরের শেষ জন্মদিনের গিফ্‌ট্। বড় শখ করে গড়িয়েছিলাম। পেছনে ওর নাম লেখা আছে—'চিরাগ'। দেখেছ? 'চিরাগ' মানে বংশের বাতি, বংশের প্রদীপ, ও ছিল আমার শেষ সলতে...."

কান-মাথা ফেটে যাচ্ছিল অনঙ্গর। আর নিতে পারছিল না। দু-হাতে চেষ্টা করল কান চাপা দিতে, মাথা চেপে ধরতে। পারল না। হাত অসাড়, শরীর অবশ, নিভে আসছে চেতনা। চরাচর জুড়ে শুধু ভয়ংকর ঝমঝমে বাজনা। সেই বাজনা ভেদ করে ভেসে এল মৃত্যুর মতো হিমশীতল কণ্ঠ—"সন্তানের সঙ্গে সর্বপ্রথম যে নারীদেহের সংযোগ, সে তার মা। যে নারীর স্তনে সে সর্বপ্রথম মুখ রাখে, সে তার নিজের মা। যে নারীর ঠোঁট তাকে প্রথম চুম্বনের স্বাদ দেয়, সে তারই নিজের মা। মায়ের যোনিপথ দিয়েই সে পৃথিবীতে আসে।...অস্বীকার করতে পারো মা-ছেলে সম্পর্কের এই সত্য? কী নাম দেবে এই সম্পর্কের? ছেনালিপনা?"....

ঝম্‌ম্ করে তুঙ্গে উঠে হঠাৎই থেমে গেল প্রলয়বাজনা। একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল মারাত্মক ধ্বনি। টং করে ছিঁড়ে গেল খেপে ওঠা সম্মিলিত বাদ্য-তাণ্ডবের প্রধান তার। মস্তিষ্কে প্রবল বিস্ফোরণ! মাথার শিরা ছিঁড়ে লুটিয়ে পড়ল অনঙ্গ। কিউপিড মধুদীপ অনঙ্গদেব।

ডাক্তারি পরিভাষায় 'ব্রেইন-স্টেম হেমারেজ'—সেরিব্রাল অ্যাটাকের সব থেকে ভয়াবহ পরিণাম। কিন্তু কোনো কষ্ট নেই, খুব ভালো আছে অনঙ্গ। এত ভালো জীবনে আর কখনো থাকেনি। ভেন্টিলেশনে নিথর শরীর, কিন্তু সবাইকে দেখতে পাচ্ছে। সকলের কথা শুনতে পাচ্ছে।...দিল্লির ডিউক স্ট্যানলি বলছে—'সেট-রুল্‌স্'-এর ভাইটাল রুল হল, চব্বিশ ঘণ্টায় দুই কি ম্যাক্সিমাম তিনজন ক্লায়েন্ট; ডিমান্ড এলেও স্ট্রেটকাট 'না'। এতে শরীর আর কোয়ালিটি অফ সার্ভিস দুই-ই নষ্ট হয়। 'ডু নট কেটার টু মোর দ্যান টু ক্লায়েন্টস্ আ ডে'—এই রুল তুমি মানোনি অ্যানাঙ্!.....

মিলিয়ে যায় ডিউক স্ট্যানলি। আসে কস্তুরী রাই। নতুন আইফোন বাড়িয়ে ধরে—এটা আরও দামী! নাও অনঙ্! আমি ভালোবেসে তোমাকে দিচ্ছি...

সার্কুলার রোডের তোর্ষা সেন খিলখিলিয়ে হাসে—লাইফ ইজ্ ফান্ অনঙ্! লাইফ ইজ্ ওনলি ফান্....

ট্রান্সজেন্ডার অতসীদি আর মনীষাদি একসঙ্গে বলে উঠল—জননী আর জায়ায় কোনো ভেদ নাই/জননী দেয় স্তন্য, জায়া দেয়.....

দুবাই নিবাসী এন. আর. আই. জেসমিন জুবেইদ এসেছে 'অরজি'র সুরতক্রিয়ার পঞ্চনারীকে সঙ্গে নিয়ে। এক এক করে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে তারা—আমি চক্ষু, আমি কর্ণ, আমি নাসিকা, আমি জিহ্বা, আমি ত্বক। জেসমিন জুবেইদ বলছে—আমি প্রাণ, আমি ষষ্ঠেন্দ্রিয়....

এগিয়ে আসছে সুচেতনা লাহিড়ি। হাতের সুদৃশ্য রেকাবিতে একরাশ ভেজা টাটকা যুঁইফুল। চতুর্দিক ম ম করে উঠল মিষ্টি গন্ধে। আকুল হয়ে ডাকছে ওকে—চিরাগ! ওঠ্ চিরাগ, ওঠ্!.....

অনঙ্গ ঘর ছাড়িয়ে করিডোর পেরিয়ে ওয়েটিংরুমে বসে থাকা মা নির্মলার সঙ্গে দেখল 'ওই লোকটা'কে! বুড়িয়ে গেছে, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ফ্যাটফ্যাটে সাদা ফরসা রং! মাকে বলছে, দুজনেরই ব্লাডগ্রুপ এ. বি. নেগেটিভ! ওরও আমারও! এত রেয়ার ব্লাডগ্রুপ কি করে এক হল?...কান পেতে শুনছে অনঙ্গ, মা বলছে, কারণ ও তোমারই ছেলে। পরীক্ষা করালে সবকিছুই মিলে যেত....

অনঙ্গ দেখল, যেন চাবুক পড়ল মুখে! বিবর্ণ বিধ্বস্ত লোকটা আস্তে আস্তে উঠল, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ওর ঘরের দিকে। আই. সি. সি. ইউ—'ইনটেনসিভ করোনারি কেয়ার ইউনিট'-এর কাচের জানলায় মুখ লাগিয়ে নির্নিমেষে চেয়ে চেয়ে দেখছে ভেন্টিলেটরে শোওয়া ছেলেকে। অনঙ্গ বলে উঠল—বাবা!...অনঙ্গ নয়, বলল রাজু—পৃথ্বীরাজ পালিত।

...চন্‌মন্ করে উঠল নিথর শরীর। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গী কাওয়াসাকি Z৯০০—স্টার্ট দেওয়া গর্জনে গজরাচ্ছে না তেজি বাইক। তার বদলে কানে আসছে অশ্বখুরের প্রবল ধ্বনি! আস্তে আস্তে 'চৈতন' হয়ে গেল কাওয়াসাকি! তেল-পিছলানো শরীর ফুলিয়ে কেশর দুলিয়ে তীক্ষ্ণ হ্রেষারবে ডাকছে তার পিঠে সওয়ার হতে।...লাফ দিয়ে 'চৈতনা'র পিঠে উঠল অনঙ্গ।...অনঙ্গ? না পৃথ্বীরাজ? চৈতনার পিঠে সওয়ারি, রাজবেশি রাজপুরুষ ফিরে তাকাল। হুবহু সেই মুখ! ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠা রাজুর মুখ। যে মুখ রাজু হামেশা দেখত মায়ের মুখে রাজস্থানী লোরী শুনতে শুনতে।...অবাক বিস্ময়ে অনঙ্গ দেখল, এসেছে সংযুক্তাও! পৃথ্বীরাজের পিঠ আঁকড়ে বসে আছে সালঙ্কারা স্বয়ংবরা সংযুক্তা। পৃথ্বীরাজের দেহসংলগ্না প্রেম, তার এতকালের অবগুণ্ঠন সরাল। তৃষ্ণার্ত অনঙ্গদেব এতদিনে দেখতে পেল প্রেমের নিখাদ মুখ। আকণ্ঠ তৃপ্তিতে প্রাণভরে দেখছিল তাকে।...নির্মল সুধারসে ভরা ওই প্রেমোজ্জ্বল মুখের সঙ্গে মা নির্মলা, সুচেতনা লাহিড়ি, অতসীদি-মনীষাদি, তোর্ষা সেন, কস্তুরী রাই, জেসমিন জুবেইদ, সুরত্‌রতির পঞ্চনারী, কবিতা আন্টি, সরিতা আন্টি, এতদিনের সম্ভোগকামী সকল কামিনী, রমণাতুর সমস্ত রমণী— সকলের মুখ ভেঙেচুরে এক হয়ে মিশে যাচ্ছিল।....

সহর্ষ হ্রেষারবে বিশাল দুই ডানা মেলে উড়াল দিল রাজঅশ্ব পক্ষীরাজ চৈতন। পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তাকে পিঠে নিয়ে, বিরাট পাখার ঝাপটায় ঝড় তুলে মেঘের ভেলার মধ্য দিয়ে বিলীন হয়ে গেল অনন্তে।

পরম আনন্দে, চরম তৃপ্তিতে, ঘুমিয়ে রইল মধুদীপ অনঙ্গদেব। ❖

নিবন্ধ

প্রেমে-অপ্রেমে সুভাষচন্দ্র

দেবাশিস পাঠক

১

একবার চোখ তুলে তাকালেন।
তারপর হাত বাড়িয়ে চেকটা নিলেন।

চেকটায় কোনো অর্থের অঙ্ক বসানো নেই। শুধু যাঁর নামে চেকটি কাটা হয়েছে, তাঁর নামটি লেখা আছে। আর আছে চেকটি যিনি দিচ্ছেন, তাঁর স্বাক্ষর।

ব্ল্যাংক চেক। ইশারাটা স্পষ্ট।

হাত বাড়িয়ে নেওয়ার সময় প্রাপকের নামটা আর একবার ভালো করে পড়ে নিলেন। নামটা স্পষ্টাক্ষরে লেখা। এমিলি শেঙ্কেল বোস।

চেকটা যিনি দিচ্ছেন, তিনি তখনো বিড়বিড় করে বলে চলেছেন, 'যে কোনো অঙ্কের টাকা আপনি বসিয়ে নিতে পারেন চেকে। কোনো দ্বিধা করবেন না। যে কোনো কারেন্সিতেও আপনি অর্থটা নিতে পারেন। সেটা নিয়েও ভাববেন না। শুধু একটাই অনুরোধ। আপনি এই সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করে দিন।'

সম্মতিপত্রটি বাড়িয়ে দিলেন বাঙালি ভদ্রলোক।

অশীতিপর বৃদ্ধা এমিলি শেঙ্কেল চেকটা নিলেন। এবং কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললেন। তার পর আস্তে আস্তে কেটে কেটে উচ্চারণ করলেন, 'ভবিষ্যতে আর কখনো আমার মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা করবেন না।'

ঘটনাটা ২১ অক্টোবর, ১৯৯৫-এর। সময়টা সকাল সাড়ে দশটার পর।

আগের দিন, অর্থাৎ ২০ অক্টোবর সকালে মেয়ে অনিতার বাড়ি থেকে ফোন করেছিলেন এমিলি। ফোন করেছিলেন সূর্যকে। সূর্য মানে সূর্যকুমার বসু। জার্মানিতেই থাকেন। তবে, এমিলি-কন্যা অনিতার মতো আউশবার্গে নয়। হামব্যুর্গে থাকেন তিনি। অমিয়নাথ বসুর ছেলে। নেতাজি সুভাষের মেজদা শরৎচন্দ্র বসুর ছেলে অমিয়নাথ। ফরোয়ার্ড ব্লকের টিকিটে আরামবাগ থেকে লোকসভার ভোটে জিতে সাংসদ হয়েছিলেন ১৯৬৭-তে। তাঁরই ছেলে সূর্যকুমার। সম্পর্কে এমিলির নাতি।

ফোনেই সূর্যকে জানিয়েছিলেন সব।

পরদিন ভারতের বিদেশমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। তিনি চান জাপানের রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত সুভাষচন্দ্রের ভস্মাবশেষ ভারতে ফেরত আনা হোক। আর সেই ব্যাপারে সম্মতি দিন এমিলি শেঙ্কেল।

ফোনেই সূর্যকুমার জানতে চান, এমিলি নিজে এ ব্যাপারে কী ভাবছেন?

এমিলির স্পষ্ট জবাব, তিনি নিজে কখনো বিমান দুর্ঘটনার গপ্পোটা বিশ্বাস করেননি। আজও করেন না। কোনোরকম নথিতে এ ব্যাপারে তিনি সই করবেন না। আর যে ছাই কোনোভাবেই তাঁর সুভাষের নয়, সেই ছাইকে সুভাষচন্দ্রের ভস্মাবশেষ বলে ভারতে আনার বা অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর সম্মতি দেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই।

পরদিন কী ঘটতে চলেছে, তখনই তার আঁচ পেয়েছিলেন সূর্য।

আসলে ব্যাপারটার শুরু ফেব্রুয়ারি মাসে। আর সেটাকে জটিলতর করে ফেলেছেন অনিতা। সুভাষ ও এমিলির একমাত্র কন্যা।

একদল জাপানি সেনা প্রস্তাবটা পেড়েছিল ভারত সরকারের কাছে। সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়েছে তারা। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে রণভূমিতে ছিল তারা, এই নস্টালজিক দ্যুতি কখনো তাদের ছেড়ে যায়নি। তারাই অনুরোধ করেছিল ভারত সরকারকে যে, রেনকোজি মন্দিরে রাখা সুভাষচন্দ্রের মৃতদেহ পোড়ানো ছাই ভারত সরকার সসম্মানে নিজ দেশে ফেরত আনুক। দেশনায়কের

ভস্মাবশেষ ভিন দেশে পড়ে আছে, এটা ভালো দেখায় না।

প্রস্তাবটা নিয়ে বৈঠকে বসলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট সচিব সহ সব গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সচিবরা। সেই বৈঠকেই ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হল তাদের আশঙ্কার কথা। ব্যাপারটা বাংলার মানুষ মোটেও ভালোভাবে নেবে না। তারা ধরেই নেবে, এসব করে, রেনকোজি মন্দিরের ছাই ভারতে এনে, তাদেরকে এমন একটা তত্ত্ব গেলানোর চেষ্টা হচ্ছে, যেটাকে তারা চিরকাল ভুয়ো তত্ত্ব বলেই জেনে ও মেনে এসেছে। সুভাষচন্দ্র বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন, এই তত্ত্বটায় সরকারি সিলমোহর দেওয়ার বন্দোবস্ত হল এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ। গোয়েন্দা বিভাগ এটাও ভারতের মন্ত্রীপরিষদকে মনে করিয়ে দিল আর একবার। ছাই দেশে নিয়ে আসার দাবি কিন্তু ভারতের কারও কাছ থেকে আসেনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ফাইল নং ১/১২০১৪/২৭/৯৩- আইএসও(ডিও)- এ নথিবদ্ধ রইল সেই বয়ান।

বিদেশমন্ত্রক ও তার মন্ত্রী কিন্তু গোয়েন্দা রিপোর্টের সঙ্গে সহমত ছিলেন না। তাঁদের মতে, নেতাজি মৃত্যুরহস্য কেন্দ্রিক বিতর্কে ইতি টানার এই হল মোক্ষম সুযোগ। এটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। নইলে কোনোদিন সাংসদরাই সরাসরি ভারত সরকারকে ছাই ফেরানোর দাবি জানিয়ে বসবে। তখন অস্বস্তি বাড়বে বই কমবে না।

পুরো বিষয়টা নিয়ে ভাবতে বসলেন প্রধানমন্ত্রী। চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। এগোলেও বিপদ। পিছোলে বিতর্ক। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করতে বললেন। মন্ত্রীসভায় সেই রিপোর্ট পেশ করা হল ৮ ফেব্রুয়ারি।

একেবারে একপেশে রিপোর্ট।

এতদিন ধরে ভারত সরকার নেতাজির মৃত্যুর বিষয়ে যে বক্তব্য জানিয়ে এসেছে, সেগুলোরই চর্বিত চর্বণ।

সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী, ১৮ আগস্ট, ১৯৪৫-এ তাইওয়ানের উত্তরাংশে অবস্থিত তাইহোকু বিমানবন্দরে ভয়ানক দুর্ঘটনার মুখে পড়ে একটি জাপানি বিমান। সেদিনের তাইহোকু আজকের তাইপেই। তাইওয়ান সেদিন জাপানের দখলে ছিল।

ওই বিমানের অন্যতম যাত্রী ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি তখন জেনে গিয়েছিলেন সিঙ্গাপুরে জাপ-সেনা মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সায়গনে ফিল্ড মার্শাল হিসাইচি তেরাউচির সঙ্গে কথা হল। সুভাষ চাইলেন, তেরাউচি তাঁকে বিমান যোগে সোভিয়েত ইউনিয়নে নিরাপদে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিন। তেরাউচি প্রস্তাবটা পাঠিয়ে দিলেন টোকিওতে। জাপ-সরকারের শীর্ষ স্তরের অনুমোদনের জন্য।

জাপান সরকার সুভাষের প্রস্তাবে সায় দিল না। ভারত থেকে ব্রিটিশ রাজ খতম করার জন্য যে সুভাষ এতদিন নাৎসি জার্মানি আর আগ্রাসন নীতির পৃষ্ঠপোষক জাপানের হাত ধরে রাখতে ইতস্তত করেননি, তিনি এখন ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের নয়া ঘাঁটি গড়বেন বলে শত্রুশিবির সোভিয়েত ইউনিয়নের হাত ধরবেন! ব্যাপারটা মোটেই মনঃপূত হল না তাদের। জাপান সুভাষ ও তাঁর বাহিনীকে এতভাবে সাহায্য করেছে, সেসব ভুলে এখন লাল রুশের সঙ্গে সখ্য স্থাপনের উদ্যোগ! পুরো ব্যাপারটাই তাদের চোখে প্রায় বিশ্বাসঘাতকতা।

জাপান যা ভাবে ভাবুক। দেশমাতৃকার প্রশ্নে কারও সাথে কোনো আপস নয়। নীতি-নৈতিকতা, সবকিছুর উর্ধ্বে ভারতমাতা।

ফলে শেষ পর্যন্ত সায়গন বিমান বন্দর থেকে একটা মিৎসুবিশি কেআই-২১ হেভি বোম্বার উড়ল আকাশে। সুভাষের সঙ্গী সেই বিমানে হবিবুর রহমান। বিশ্বস্ত অনুগামী সৈনিক।

সেই বিমান পড়ল দুর্ঘটনায়। হবিবুর বেঁচে রইলেন। নেতাজির মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। আর থার্ড ডিগ্রি পোড়া দেহ নিয়ে মারা গেলেন নেতাজি সুভাষ।

১৯৪৫-এর ১৮ অগস্ট সুভাষের দেহ পোড়া ছাই এসে পৌঁছাল টোকিও-র রেনকোজি মন্দিরে। বৌদ্ধমন্দির। বৌদ্ধদের মধ্যে যাঁরা নিচিরেন সম্প্রদায়, যাঁরা বিশ্বাস করেন কেবল পদ্মসূত্রে নিহিত মানবাত্মার মোক্ষ, তাঁদের পরিচালনাধীন এই স্বর্ণমন্দির। এক মাস পর, ১৮ সেপ্টেম্বর, মন্দির কর্তৃপক্ষ সেই ছাই সরকারিভাবে গ্রহণ করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করল।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের গোপন রিপোর্টে এসব তথ্যের পুনরুক্তি সান্নিবেশিত হল।

বিদেশমন্ত্রী তখন একজন বঙ্গসন্তান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তাঁর কাছে জানতে চাইল, সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংক্রান্ত কোনো ফাইল তাঁর দপ্তরের জিম্মায় আছে কি না। বিদেশমন্ত্রক জানিয়ে দিল, এরকম কোনো ফাইল তাদের কাছে অন্তত নেই।

এরপর থেকেই বিদেশমন্ত্রী ছুটে বেড়াতে শুরু করলেন পৃথিবীর নানা প্রান্তে। এ-দেশ থেকে সে-দেশে। নেতাজির ভূত বুঝি তাঁকে তাড়া করছিল।

এরই মধ্যে টোকিওতে ভারতের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে জাপানি বিদেশমন্ত্রীর বৈঠক।

তারপরই তিনি উড়ে গেলেন জার্মানিতে। সেখানে নেতাজি কন্যা অনিতা বসু পাফের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা। শলা-পরামর্শ।

অনিতা তাঁর মায়ের মতের উলটো পথে হাঁটলেন। বিদেশমন্ত্রীকে জানিয়ে দিলেন, তিনি রেনকোজি মন্দিরের ছাই ভারতে ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী। এ বিষয়ে ভারত সরকারকে সবরকম সাহায্য করতে তিনি প্রস্তুত।

মা বেঁচে থাকতে মেয়ের কথা তো শেষ কথা হতে পারে না।

তাই, এমিলি শেঙ্কেল বসুর সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন বিদেশমন্ত্রী।

তারপরের ঘটনা আগেই উল্লিখিত।

এমিলির বাড়ি থেকে খালি হাতে ফিরতে হল ভারতের বিদেশমন্ত্রীকে। অপমানিত হয়ে। প্রত্যাখ্যান আর অপমানের জ্বালায় মলম দিতেই যেন অনিতা আর তাঁর স্বামী ড. মার্টিন পাফ বিদেশমন্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন বাইরে কোথাও লাঞ্চটা সেরে নেওয়ার জন্য।

আর এমিলি?

তিনি বোধহয় তখন তাঁর গৃহকোণে বসে বসে রোমন্থন করছিলেন স্মৃতি। অজান্তেই বোধহয় তাঁর চোখের কোণটা ভিজে

যাচ্ছিল বার বার। নোনা জল গড়িয়ে পড়ছিল তাঁর কোঁচকানো চামড়ার গাল বেয়ে।

অশীতিপর বৃদ্ধা রোমন্থন করছিলেন পঞ্চাশ বছর আগেকার স্মৃতি।

এক নয়, দুই নয়, পঞ্চাশ বছর।

পঞ্চাশ বছর আগেকার সেই অভিশপ্ত সন্ধে।

রান্নাঘরে বসে ছিলেন এমিলি। তেমন কোনো কাজ ছিল না। বসে বসে উলের গোছা জড়িয়ে বল বানাচ্ছিলেন। ওদিকে রেডিয়োতে খবর শোনা যাচ্ছিল। রোজকার মতো। ঘরের এক কোণে বসে মা আর বোন।

সেই সময় আচমকা সম্প্রচারিত হল খবরটা।

ইন্ডিয়ান কুইসলিং সুভাষচন্দ্র বোস তাইহোকুতে এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

মা আর বোন চমকে তাকালেন এমিলির দিকে।

এমিলি আস্তে আস্তে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। পাশেই শোওয়ার ঘর। সেখানে অঘোরে ঘুমোচ্ছে অনিতা। ছোট্ট অনিতা। তিন বছরের শিশু।

অনিতার বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন।

চোখের জল আর বাঁধ মানল না। একেবারে আজকের মতো।

হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন এমিলি পঞ্চাশ বছর আগে।

আজও ফের কাঁদলেন অঝোরে।

সেসব দিনের স্মৃতি ভিড় করতে লাগল মনের ভেতর। কান্না বেরিয়ে আসতে লাগল বুক থেকে।

রেডিয়োতে খবরটা শোনার কয়েকদিন পরের ঘটনা। কঠিন যুক্তিবাদী এমিলি। তাঁর বিশ্বাসেও তখন ফাটল ধরেছে। চিড়টা একটু একটু করে চওড়া হচ্ছে।

ফলত এমিলি ছুটলেন ক্রিস্টাল গেজারের কাছে। স্ফটিক দেখে যদি তিনি জানিয়ে দিতে পারেন সুভাষ কোথায় গেছে, সুভাষ কোথায় আছে। বিফল মনোরথ হয়ে ফিরতে হল সেখান থেকে।

তারও ক-দিন পর সুভাষ এল স্বপ্নে। সুভাষ বেঁচে আছে। সুভাষ ভালো আছে। স্বপ্নের কথা খুশিতে ফলাও করে লিখে পাঠালেন ভারতে এক আত্মীয়ের কাছে।

সেদিনের পর থেকে আর কোনোদিন প্লেনে চড়েননি এমিলি। সাহস হয়নি।

কথাগুলো মনে হতেই ফের চোখে অনর্গল শ্রাবণ ধারা।

হায় সুভাষ! ওরা অঢেল টাকা দিয়ে আমাকে বলাতে চায়, তুমি নেই। রেনকোজিতে তোমার ছাই! যা মানি না, বিশ্বাস করি না, তা লোককে বলব কী করে?

ডুকরে কেঁদে উঠলেন এমিলি।

কোঁচকানো গালের চামড়ায় তখন নোনাজলের অনর্গল ধারা। পঞ্চাশ বছর তো এই কান্নাই সম্বল জীবনে তাঁর।

এমিলি ফোঁপাতে থাকেন।

২

"বেশ কিছুদিন ধরেই আমি তোমাকে লেখার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম। তুমি সহজেই বুঝতে পার, আমার মনের ভাব তোমাকে লিখে জানানো কত কঠিন।...এমন একটা দিন যায় না যেদিন আমি তোমার কথা চিন্তা করি না। তুমি সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে রয়েছে।...ভবিষ্যতে কী করা উচিত হবে আমি জানি না। আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না গত কয়েক মাস আমি কত নিঃসঙ্গবোধ করেছি এবং আমি কত দুঃখী। শুধু একটা জিনিসই আমাকে সুখী করতে পারে। কিন্তু আমি জানি না তা সম্ভব কি না।"

১৯৩৭-এর গরমকালে সুভাষের কাছ থেকে এই চিঠি পেয়েছিলেন এমিলি।

১৯৩৪-এ সুভাষ তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন। তারই স্বীকৃতি ফুটে বেরিয়েছিল 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইয়ের ভূমিকায়। ২৯ নভেম্বর, ১৯৩৪-এ লেখা সেই ভূমিকাতেই একজনের নাম করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন সুভাষচন্দ্র।

সে নাম ফ্রয়েলাইন এমিলিয়ে শেঙ্কেলের। আর ঠিক তার পরদিন থেকেই চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়ার শুরু।

প্রতিটি চিঠি পুলিশ খুলে পড়ে। সেকথা জানাতেও ভুল করেননি সুভাষ, এমিলিকে। সতর্ক করে দিয়ে লিখেছেন, "যখনই আমাকে চিঠি লিখবে মনে রাখবে আমার বন্ধুরা আমার সব চিঠি সর্বদাই খুলে পড়ে।" যে কথাটা ওই সতর্ক বার্তায় লেখা ছিল না, সেটা হল, চিঠিগুলো খুলে পড়ার পরে 'সেন্সর ও পাশ' ছাপ দেওয়া হয় তাতে। তারপর তা প্রাপকের কাছে প্রেরণ করা হয়।

কী সব দিন গেছে তখন!

কী সব দিন!

স্মৃতি জ্যোৎস্নার আলোতে আজ সেসব রুপোলি দেখালেও তখন তা ধূসর --- কিংবা কখনো

কখনো মিশমিশে কালো —বলেই মনে হত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শেষ। এমিলির অ্যাপার্টমেন্টে পা পড়েছিল ব্রিটিশ আর্মির অফিসারদের। দু-দুবার। প্রথমবার এমিলি ছিলেন বাড়িতে। ওঁর সামনেই সব কিছু তছনছ এলোমেলো করে দিয়ে সার্চ করে ওই আর্মি অফিসাররা। পরের বার এমিলি বাড়িতে ছিলেন না। ওরা সেবার ওঁর অনুপস্থিতিতেই খানাতল্লাশি চালায়। যাওয়ার সময় এমিলির ডেস্কের ওপর চোখ পড়ে ওদের। দুটো চিঠি ছিল সুভাষের। পূর্ব এশিয়া থেকে লেখা। নিয়ে চলে যায়। বলেছিল, ফেরত দিয়ে যাবে। যায়নি।

এমিলি হাতে তুলে নেন 'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল ১৯২০-১৯৩৪' বইটা। ভিয়েনার হোটেল দ্য ফ্রান্সে বসে লেখা হয়েছিল এই বইয়ের প্রিফেস। আর সেখানেই সুভাষ লিখেছিলেন, স্পষ্ট উল্লেখে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন এই বই তৈরিতে এমিলির সাহায্যের জন্য। "In conclusion– I have to express my thanks to Fraulein Emily Schenkl– who assisted me in writing this book and to all those friends who have been of help to me in many ways."

ভারতের মুক্তিযুদ্ধের একটা বিশেষ কালকে নিয়ে লেখা বই। ১৯৩৫-এ প্রকাশ মাত্রই ইংল্যান্ডে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে সেই বই ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল সরকার।

কিন্তু হলে কী হবে, প্রবাসী ভারতীয় আর ভারতপ্রেমীদের হাতে হাতে ঘুরেছিল সেই বই। উচ্ছ্বসিত রোমা রলাঁ লিখেছিলেন, ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস জানতে গেলে এই বই পড়তেই হবে।

সে সব তো অনেক পরের কথা।

প্রদীপ জ্বলে ওঠার পর চারদিক আলোকিত হওয়ার কথা।

প্রদীপ জ্বালানোর আগে তো সংগুপ্ত থাকে সলতে পাকানোর ইতিহাস।

সেই ইতিহাসেই একে অপরের কাছাকাছি এসেছিলেন এমিলি আর সুভাষ।

সন ১৯৩৪। কাল—শরৎ। স্থান—কার্লোভিভারি উপত্যকা। পাহাড়ে ঘেরা। সেখানে ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারে এসেছেন সুভষচন্দ্র। কিন্তু এখানে থাকার সময় স্বাস্থ্যোদ্ধার গৌণ হয়ে গেল। মুখ্য হয়ে দাঁড়াল ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস লেখা। সেই লেখার সূত্রেই দরকার হয়ে পড়েছিল একজন ইংরেজি জানা সেক্রেটারির।

এমিলি তখন ২৪ বছরের যুবতী। প্রথাগত শিক্ষায় অনাগ্রহ। তাই বাবা তাঁকে পাঠিয়েছিলেন খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী হতে, নানদের মঠে। চার বছর সেখানে কাটিয়েছিলেন এমিলি। একেবারে পোষায়নি। তাই সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ফের চালু করেন লেখাপড়া। শেষে স্কুলের গণ্ডি যখন পেরোলেন তখন বয়স কুড়ি ছুঁই ছুঁই।

ওদিকে তখন ইউরোপ জুড়ে মন্দা। চাকরি-বাকরির বাজার খুবই খারাপ। এমিলিও বেকার।

এরকম একটা দুঃসময়ে ভিয়েনাবাসী ডাক্তার মাথুরের সূত্রে সুভাষের সঙ্গে আলাপ। সুভাষ এমিলির চেয়ে বয়সে প্রায় ১৩ বছরের বড়ো।

ভিয়েনায় যখন এসেছেন তখন ব্রিটিশ প্রকাশনা সংস্থা লরেন্স উইশার্ট তাঁকে চুক্তিতে বেঁধে ফেলল। বই লেখার চুক্তি। সমকালের ভারতীয় রাজনীতির ওপর বইটা লিখতে হবে। আর লেখা শেষ করতে হবে এক বছরের মধ্যে।

এক বছরের ডেডলাইন। শর্টহ্যান্ড আর টাইপিং জানা একজনকে তাই খুব দরকার। তাড়াতাড়ি বই লেখা শেষ করার জন্য।

এমিলি দুটোই জানতেন। ইংরেজিতেও বেশ সড়গড়। ফলে সুভাষ সেক্রেটারি হিসেবে এমিলিকেই নিয়োগ করলেন। বেশি অপশন খোঁজা বা বাছার মতো সময় ছিল না তখন।

সুভাষের কাজে, সুভাষের সঙ্গে, এভাবেই জড়িয়ে পড়লেন এমিলি শেঙ্কেল। গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারের অবিবাহিত কন্যা।

বাবার অসুস্থতার খবর এল। দেশে ফিরতে হল সুভাষকে। তখন রোম, এথেন্স, কায়রো ঘুরে বিমান ইউরোপ থেকে কলকাতায় পৌঁছাত পাঁচদিনে। ৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৪-এ কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছালেন সুভাষচন্দ্র। তার ৪৮ ঘণ্টা আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তাঁর বাবা জানকীনাথ বসু।

পৌঁছানোর প্রায় ৭২ ঘণ্টা পরে কাগজ-কলম টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসলেন সুভাষ এমিলিকে। ৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৪-এ লেখা সেই চিঠিতে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, একজন ভারতীয় নারীর কাছে বৈধব্য কতটা বেদনাবহ।

"আমার মাকে কোনো সান্ত্বনা দেওয়া যাচ্ছে না। আমরা ভাইবোনেরা যথাসাধ্য সেই চেষ্টা করছি। পশ্চিমের একজন মানুষের পক্ষে আমাদের মনোভাব বোঝাটা একটু কষ্টকর। একজন হিন্দু স্ত্রীর জীবন তাঁর স্বামীর সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে স্বামীর অবর্তমানে তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকাটা বেশ অসহনীয়। যাইহোক, আমরা আশা করছি, উনি (সুভাষজননী) এই শোক কাটিয়ে উঠতে পারবেন।"

এই চিঠিতেই এমিলি জানলেন, কলকাতায় পৌঁছানোমাত্র সুভাষচন্দ্রকে গৃহবন্দি করেছে ব্রিটিশ সরকার। সেই সঙ্গে পরিচিত হলেন সুভাষচন্দ্রের আশঙ্কার সঙ্গে।

"ভবিষ্যতে আমি হয়তো তোমাকে চিঠি লিখতে পারব না।... আমার ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত।"

১৯৩৫-এর জানুয়ারিতে ভিয়েনায় ফিরে গেলেন সুভাষ। এমিলির জন্য নিয়ে গেলেন ধূপ। এমিলি ওটা চেয়েছিলেন। আর একটা বই। স্বামী বিবেকানন্দের 'বেদান্ত ভাবনা'। এটা এমিলি চাননি, সুভাষ নিজে থেকেই নিয়ে গিয়েছিলেন।

রোম থেকে লেখা চিঠির সূত্রে এমিলি জানলেন, মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন সুভাষ। ওই চিঠিতেই এসেছিল নির্দেশ। এমিলির কষ্ট করে ভিয়েনা স্টেশনে আসার দরকার নেই। হোটেলে পৌঁছে সুভাষ নিজেই তাঁকে ফোন করবেন।

"তুমি কি মনে কর, তোমার টেলিফোন নম্বর আমি ভুলে গিয়েছি?" কৌতুক মেশানো স্বর সুভাষের চিঠির ভাষায়।

সেই সঙ্গে হালকা উচ্ছ্বাসও। "আমার জন্মদিনের জন্য তুমি যে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছ তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আসল কথা হল, আমি নিজেই তো সেকথা ভুলে গিয়েছিলাম।"

এরপর দেশ ছেড়ে বিদেশের মাটিতে সুভাষ।

১৭ জানুয়ারি, ১৯৪১। রাতের অন্ধকারে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে মহা নিষ্ক্রমণ।

২৬ জানুয়ারি, ১৯৪১। প্রথম জানা গেল, সুভাষচন্দ্র নিখোঁজ। তারবার্তা পাঠালেন রবীন্দ্রনাথ, সুভাষের মেজদা শরৎচন্দ্র বসুর কাছে।

"Deeply concerned over Subhas's disappearance."

তার পাঠালেন গান্ধীজিও।

"Startling news about Subhas.

Please wire truth. Anxious."

আর স্বয়ং সুভাষ বার্লিনে পৌঁছানোর পর সে খবর দিলেন এমিলিকে।

"তুমি আমার কাছ থেকে এই চিঠি পেয়ে আশ্চর্য হয়ে যাবে। আরও আশ্চর্য হবে জেনে যে, আমি বার্লিন থেকে চিঠি লিখছি।"

৩ এপ্রিল, ১৯৪১-এর ওই চিঠিতেই আরও জানালেন তিনি, "আমার পাসপোর্ট আমার নামে নেই, অরল্যান্ডো মাৎসোটা নামে আছে। তাই যখন চিঠি লিখবে তখন অরল্যান্ডো মাৎসোটা বলে লিখবে।"

সেই সঙ্গে অনুরোধ।

"খুব সম্ভবত বার্লিনই আমার হেড কোয়ার্টার্স হবে। আমি ভিয়েনাতে যেতে পারব কিনা জানি না। তাই তোমাকে বার্লিনে আমার কাছে আসতে হবে। আসতে পারবে তো?"

এমিলি বার্লিনে এলেন। যোগ দিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে। সোফিয়েন স্ট্রাসের বাড়িতে শুরু হল তাঁদের যৌথ যাপন। দুজনের পরিচয় বাঁধা পড়ল স্থায়ী সম্পর্কে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে বার্লিনে বোমা পড়েছিল। মিত্র-শক্তির বোমা। সোফিয়ের স্ট্রাসের সেই বাড়িটা গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল।

তার অনেক আগেই চুরমার হয়ে গিয়েছিল এমিলি-সুভাষের দাম্পত্য। যদি সেই যৌথ যাপনকে বৈধ দাম্পত্য বলা যায়, তাহলেই।

অক্টোবর, ১৯৪২। ঠিক হল, সুভাষ বার্লিন ছাড়বেন। সুভাষ বার্লিন থেকে ভিয়েনা এলেন এমিলির সঙ্গে দেখা করবেন বলে। একে অপরকে 'গুডবাই' বললেন। ঘটনাচক্রে সে যাত্রা স্থগিত হয়ে গেল।

২৯ নভেম্বর, ১৯৪২। জন্ম নিলেন সুভাষ-এমিলির ভালোবাসার সন্তান, অনিতা।

ভিয়েনা থেকে বার্লিনে খবর এল, মেয়ে হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে এলেন ভিয়েনাতে। সঙ্গে নাম্বিয়ার।

পুরোনাম আরাথিল কানদেথ নারায়ণন নাম্বিয়ার। কেরলের মানুষ। জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই ইউরোপে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের কাজ করতে করতে কেটে গিয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫৫-১৯৫৮ জার্মানিতে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ১৯৮৬-তে পরলোক গমন করেছেন। আমৃত্যু বিশ্বাস করতেন, সুভাষচন্দ্র ছিলেন 'One-ideal man'। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিল তাঁর দিনেরবেলাকার ধ্যান, রাতের বেলাকার স্বপ্ন। আর সেই একনিষ্ঠ জীবনের একমাত্র বিচ্যুতি, সেই চিন্তায় একমাত্র ব্যতিক্রমী অবস্থান-বিন্দুতে ছিলেন এমিলি। সুভাষচন্দ্রের জীবনে 'only departure'। নাম্বিয়ার বিশ্বাস করতেন, 'He (সুভাষ) was deeply in love with her (এমিলি)."

এহেন নাম্বিয়ারের সঙ্গে সুভাষ এলেন নবজাতিকাকে দেখতে। সেটা ছিল ১৯৪৩-এর জানুয়ারি। এমিলির বয়স তখন ছয় সপ্তাহ। কয়েকটা দিন সোফিয়েন স্ট্রাসের বাড়িতেই কাটল।

৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। ভোরবেলা। বার্লিনের লেহর্টার বানহোফ থেকে সুভাষ কিল যাওয়ার ট্রেনে উঠলেন। সঙ্গে নাম্বিয়ার, আলেকজান্ডারওয়ার্থ, কেপলার এবং আবিদ হাসান।

সুভাষচন্দ্রের নির্দেশমতো ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার পরেও বেশ কয়েকদিন 'কিছুই হয়নি' এরকম ভাব দেখিয়ে সোফিয়েন স্ট্রাসের বাড়িতে কাটিয়ে দিলেন এমিলি।

একবার দেশ ছেড়েছিলেন সুভাষ, পেছনে রেখে গিয়েছিলেন প্রিয়জনে ভরা বিরাট পরিবার, অগণিত বন্ধু, ভক্ত, অনুগামী। এবার ইউরোপ ছাড়লেন। জীবনের কঠিন ঝুঁকি নিয়ে। পেছনে ফেলে রেখে গেলেন স্ত্রী আর নবজাত কন্যাকে।

আর দিয়ে গেলেন একটা চিঠি। চিঠির তারিখ ওই ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি মেজদা শরৎচন্দ্র বসু। চিঠিতে লিখলেন, "পরম পূজনীয় মেজদাদা, আজ পুনরায় আমি বিপদের পথে রওনা হইতেছি। এবার কিন্তু ঘরের দিকে। হয়তো পথের শেষ আর দেখিব না। যদি তেমন বিপদ পথের মাঝে উপস্থিত হয় তাহা হইলে ইহজীবনে আর কোনো সংবাদ দিতে পারিব না।"

চিঠির শেষে একটুকরো অনুরোধ।

"আমার অবর্তমানে আমার সহধর্মিনী ও কন্যার প্রতি একটু স্নেহ দেখাইবে—যেমন সারাজীবন আমার প্রতি করিয়াছ।"

এই চিঠিটুকুই সুভাষ-এমিলির বৈবাহিক সম্পর্কের একমাত্র নথি।

আর কোথাও কিছু নেই। কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই যে দুজনের বিয়ে হয়েছিল।

১২ এপ্রিল, ১৯৫১। সেই চিঠি ছাপা হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায়। সঙ্গের খবরে লেখা হয়েছিল, "নেতাজি এক বৎসরেরও অধিককাল সহধর্মিণীর সহিত একত্র কালযাপন করেন এবং তাঁহাদের একটি কন্যা হয়। এই শিশুটির বয়স যখন মাত্র ২৭ দিন তখনই নেতাজির জাপান যাইবার আহ্বান

আসে এবং নেতাজি জাপান অভিমুখে যাত্রা করেন।"

এই খবর প্রকাশিত হওয়ার দু-দিন পর আনন্দবাজার পত্রিকাতেই বের হল শরৎচন্দ্র বসুর পত্নী বিভাবতী বসুর বিবৃতি।

"ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, সর্দার প্যাটেল সুভাষের স্ত্রীকে আর্থিক সাহায্য দিতেছেন—ভারতের একশ্রেণির সংবাদপত্রে এই ধরনের সংবাদ প্রচার করা হইতেছে।...(কিন্তু) সুভাষের স্ত্রী কোনো আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেন নাই।...বিভিন্ন লোক মারফত সর্দার প্যাটেল অবশ্য এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিবারই সুভাষের স্ত্রী ইহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।"

১৬ এপ্রিলের আনন্দবাজার পত্রিকা। প্রকাশিত হল আজাদ হিন্দ ফৌজের উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক বিষয়ক একটি খবর। সেখানে কমিটি একটা বিবৃতি দিয়ে জানাল, "নেতাজি ১৯৪২ সালে জার্মানিতে অবস্থানের সময় ফ্রাউ শেঙ্কেলকে বিবাহ করেন।...এই দৃঢ়চেতা ও প্রীতিময়ী মহিলাকে নেতাজি তাঁহার জীবনসঙ্গিনীরূপে বাছিয়া লইয়াছিলেন, ইহা আমাদের গৌরবের বিষয়। বহু বৎসর ধরিয়া এই মহিলা... নেতাজির শক্তি ও প্রেরণার উৎস ছিলেন।"

এসব সত্ত্বেও এমিলি-সুভাষ বিবাহ বিতর্ক নিয়ে জল কম ঘোলা হয়নি।

সুভাষচন্দ্রের মতো এক অলৌকিক পুরুষের পক্ষে সাধারণ মানুষের মতো বিবাহ-সম্পর্কে আটকে পড়ার ঘটনা মেনে নিতে পারেননি অনেকেই। সেদিনও। আজকেও।

এমিলি শেঙ্কেল সুভাষচন্দ্রের ধর্মপত্নী নন। সুভাষ-এমিলির বিবাহ-রহস্য নিয়ে নানা আওয়াজ, তত্ত্ব, চিৎকৃত কুৎসা বাতাসে ভাসল। সেসব আজও ভাসছে।

যেমন নীরদচন্দ্র চৌধুরী। কিংবদন্তি বাঙালি লেখক। অক্সফোর্ডের বাসিন্দা ছিলেন। ১৯৯৬-তে বাংলা খবরের কাগজ 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর পাতায় তাঁর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সেখানে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য, "আমি ব্যক্তিগতভাবে নেতাজির দর্শনের বিরোধী। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি তাঁর সততার জন্য।"

সেইসঙ্গে এক বিস্ফোরক প্রত্যয়ী উচ্চারণ—"অনেক জাতীয় নেতার অজস্র মহিলাদের যৌন নিপীড়নের কাহিনি আমার জানা আছে। নেতাজি ছিলেন এর অনেক উর্ধ্বে। তাই তিনি মোহে একজন অস্ট্রিয়ান মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন এটা মেনে নিতে আমার দ্বিধা আছে।"

এরকম দ্বিধার আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল অসংখ্য অভিজ্ঞতা, মন্তব্য, স্মৃতি রোমন্থন।

যেমন দিলীপকুমার রায়ের মন্তব্য। "আমার বন্ধু সুভাষ"-এর পাতায় ধরা আছে সে কথা।

"(ইংল্যান্ডে তখন) মেয়েরা তার (সুভাষের) সঙ্গ পাওয়ার জন্য অধীর, অস্থির। কেবল সুভাষের রূপ আর যৌবন দেখেই যে শুধু তারা চঞ্চল হয়ে উঠত তা নয়, তাকে পাওয়া যাবে না, এই দুর্লভতার আকর্ষণও বড়ো সামান্য ছিল না।...সুভাষের প্রতি যে অনুরাগ, যে প্রশংসার গভীরতা মেয়েদের ছিল তার কণামাত্র আমরা পাইনি।"

এই দিলীপকুমার ওই গ্রন্থেই শুনিয়েছেন আর একটি আখ্যান। মহিলাঘটিত। এবং অবশ্যই সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত।

লন্ডনে দিলীপ থাকতেন একটি পরিবারের সঙ্গে। পরিবারের কর্তা-গিন্নি ফরাসি। তবে তাঁরা বিবাহিত দম্পতি নন। লিভ-ইন করছিলেন। তাঁদের মেয়েটি সুভাষ ও দিলীপের সঙ্গে মিশত, গল্প করত, খেলত। দিলীপ বলছেন, "তাকে সুভাষের বেশ ভালোই লাগত। কিন্তু তবু সুভাষ কিছুতেই ভুলতে পারত না যে মেয়েটি আসলে স্ত্রী-সমাজেরই একজন।"

লিঙ্গ পরিচয় সম্পর্কে এরকম অতি সচেতনতার কারণেই সেই 'মোহিনী রমণী'র পাশে যখন তাঁকে ছবি তোলার জন্য দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। দিলীপের মন্তব্য, "ছবিতে সুভাষ এমন বিকট গম্ভীর হয়ে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে...যেন তাকে জোর করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

এরকম অজস্র মন্তব্য অভিমত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ হয় সুভাষচন্দ্রের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি গভীর অনুরাগের কথা। সেই আদর্শের ভিত্তিভূমিতে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ স্বীকৃত, যৌন জীবন অস্বীকৃত, বিবাহ-সম্পর্ক ত্যাজ্য। এরকম একটা ধ্যান-ধারণার বুদবুদে চাপা পড়ে যায় সুভাষচন্দ্রের নিজস্ব অভিমত-অভিব্যক্তি। আড়ালে চলে যায় আত্মজীবনী 'ভারত পথিক'-এ তাঁর লেখা কথাগুলো।

এই আত্মজীবনীতে সুভাষ লিখেছেন, "রোজ রাত্রে ঘুমের আগে বা ভোরে ঘুম ভাঙার পর খানিকটা সময় আত্মচিন্তায় কাটাতাম। দুরকমের বিশ্লেষণ এর অঙ্গ ছিল- এক বর্তমানের যে আমি, তার বিশ্লেষণ,. আরেক আমার সমগ্র জীবনের বিশ্লেষণ। প্রথমটা থেকে জানা যেত আমার মনের কামনা-বাসনা আদর্শ-আকাঙ্ক্ষা; দ্বিতীয়টা থেকে আমার জীবনকে ভালো করে চিনতাম, তার বিকাশকে প্রত্যক্ষ করতাম। অতীতের ব্যকুলতার চিন্তা দিয়ে উপলব্ধি করতাম অতীতের ভ্রান্তি, ভবিষ্যতের পথ।"

এই আত্ম-বিশ্লেষণের ফল পরিণামেই তাঁর একান্ত উপলব্ধি, "যৌন প্রবৃত্তি মানুষের গভীরতম সহজাত সংস্কারগুলির মধ্যে অন্যতম। তার উপর যৌনতার ঋতু ঘুরে ফিরে আসে, কিছুদিন পরে পরে স্বপ্নের দরজা খুলে দেয়।"

এই বইটিতেই সুভাষ লিখেছেন যৌনতা ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ বিষয়ে তাঁর ঐকান্তিক উপলব্ধির কথা। কোনো রাখঢাক না করেই। অকপট উচ্চারণে।

"পার্থিব ভোগসুখ বর্জন করে কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে আমাকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। এইরকম জীবনের উপযুক্ত করে শরীর-মনকে গড়ে তুলতেও আমাকে খুব কষ্ট করতে হয়নি। কিন্তু গোলমাল বেধেছিল যৌন প্রবৃত্তি দমন করার বেলায়—মানুষের স্বাভাবিক একটি প্রবৃত্তিকে দমন করা কী মুখের কথা! কী প্রাণান্তকর দ্বন্দ্ব যে আমার সারাজীবন ধরে চলেছে তা বোঝানো যায় না।"

সুভাষ লিখছেন, "১৯১৩ সালে আমি যখন কলেজে ঢুকলাম তখন আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে আধ্যাত্মিক

উন্নতির জন্য যৌন প্রবৃত্তি দমন একান্ত প্রয়োজন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করলে বেঁচে থাকার কোনো অর্থই হয় না।"

সুভাষ 'অ্যান ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম' বা 'ভারত পথিক' লিখেছেন ১৯৩৭-এর শেষভাগ থেকে। এই অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে ধরা আছে তাঁর ছেলেবেলার কথা থেকে শুরু করে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগের বৃত্তান্ত পর্যন্ত সবকিছুর তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ। ১৯৩৪-এ এমিলির সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তখন থেকেই বদলাচ্ছিল তাঁর তাবৎ সংস্কার। লক্ষে অবিচল। কিন্তু জীবন পথের সব পাথরগুলোকে হীরক দ্যুতিতে দেখার অভ্যেস তখন পরিবর্তিত হচ্ছে। আগে দেখা হিরেগুলোর একটা-দুটো তখন নুড়ির মতো নগণ্যতা অর্জন করতে শুরু করেছে।

তাই, আত্মজীবনীর পৃষ্ঠায় সুভাষচন্দ্র স্বচ্ছ সচেতনায় প্রশ্ন তোলেন, "মানুষের স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্য এত সময় ও শক্তির অপচয়ের কোনো সার্থকতা আছে কি না এ সম্বন্ধে আজকের দিনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে। কৈশোর ও যৌবনে ব্রহ্মচর্য পালনের অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মতে যৌনচেতনাকে চিরকালের মতো সম্পূর্ণভাবে দমন করা উচিত। আমাদের শরীর ও মনের বল তো আর অপর্যাপ্ত নয়। এক্ষেত্রে যৌন প্রবৃত্তি দমনের অসাধ্যসাধনে সময় ও শক্তির এত অপচয় সত্যিই কি সমর্থনযোগ্য?"

প্রশ্ন তোলায় পর জীবন-সচেতন সুভাষের উপলব্ধি, "জীবনটাকে গোড়ার থেকে যদি আবার শুরু করা যেত তবে বোধহয় আমি কখনোই যৌন প্রবৃত্তি দমনের প্রয়োজনীয়তাকে এতখানি বড়ো করে দেখতাম না।"

স্মর্তব্য, এমিলি শেঙ্কেল তখন সুভাষের জীবনবৃত্তে এসে গিয়েছেন।

"রামকৃষ্ণ সর্বদা বলতেন সাধনার পথে সবচেয়ে বড়ো বিঘ্ন হচ্ছে কামিনী এবং কাঞ্চন। রামকৃষ্ণের এই বাণী আমি ধ্রুবসত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম।"

"রামকৃষ্ণদেবের উপদেশের সার কথা...যৌনকামনাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে সব স্ত্রীলোক সম্বন্ধেই মনে মাতৃভাব জাগে।"

এই বিশ্বাসভূমিতে সুভাষ যে আর স্থিত হতে পারছেন না, অবস্থান বদল হচ্ছে তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার সৌজন্যে। সেজন্যই আত্মজীবনীর পাতায় তিনি প্রশ্ন তোলেন, "আধ্যাত্মিক উন্নতির চাইতে জনসেবাই যার জীবনে বড়ো স্থান অধিকার করেছে তার পক্ষে ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তা কতখানি?"

এবং যে আত্মজীবনীর বেশির ভাগটাই রচিত হয়েছিল অস্ট্রিয়ার বাদগাস্টাইনে এমিলি শেঙ্কেলের সান্নিধ্যে, সেই আত্মজীবনীর অন্তিম অংশে সুভাষচন্দ্রের প্রত্যয়ী চেতনার অনুভবী-উদ্গীরণ; তাঁর 'দার্শনিক প্রতীতি' যার মূলে আছে তাঁর 'বুদ্ধিগত বিচার', 'বুদ্ধিবহির্ভূত প্রত্যক্ষ বোধ' এবং 'ব্যবহারিক বিবেচনা'র সংমিশ্রণ।

সুভাষ এখানে লিখেছেন, "আমার চারদিকে দেখতে পাই প্রেমের লীলা; নিজের ভিতরেও দেখি তারই প্রকাশ। নিজের পূর্ণতার জন্য প্রেমের প্রয়োজন বোধ করি, জীবনকে গড়ে তোলার একমাত্র ভিত্তি পাই প্রেমে।"

এই প্রেমময় সুভাষের খোঁজ কেউ করেনি। করে না।

তাই, সংশয়ী ধোঁয়ার আবর্তন এমিলি শেঙ্কলকে ভারতে আসতে দেয় না। তিনি ধর্মপত্নী না জীবনসঙ্গিনী না কি নেহাতই জালিয়াতি-জোচ্চুরি, এ নিয়ে সংশয়ের ঘূর্ণিঝড়ে ঢেকে যায় প্রেমের জ্যোৎস্না। মরা দ্বাদশীর চাঁদের মতো স্মৃতিকে সম্বল করে সুভাষ-সঙ্গিনী এমিলি মরে যান চুপিচুপি, একা একা। ১৩ মার্চ, ১৯৯৬-তে। ওই ভিয়েনাতেই। তখনো সুভাষের মেজবৌদি বিভাবতী দেবীর দেওয়া চুড়িটা পরা থাকে তাঁর হাতে।

৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩-এ সুভাষের লেখা যে চিঠি সুভাষ-এমিলির বৈবাহিক সম্পর্কের একমাত্র স্বীকৃতি কিংবা নথি, সেটা মেজদা শরৎচন্দ্র বসু পেয়েছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর। ১৯৪৮-এ। চিঠি পেয়ে সস্ত্রীক তিনি হাজির হয়েছিলেন ভিয়েনাতেই। এমিলির সঙ্গে বসু পরিবারের সুভাষ ব্যতীত অন্য কোনো সদস্যের সেই প্রথম দেখাসাক্ষাৎ।

স্মৃতিসম্বল জীবনে আচমকা আলোর ঝলকানি।

এবং নিস্তরঙ্গ একান্ত নিজস্ব জীবনে নানা কথা কুকথা বিতর্ক বিবাদের ধুলোঝড়।

প্রথম দেখা হওয়ার দিনটাতেই শরৎচন্দ্রের নির্দেশে তাঁর স্ত্রী বিভাবতী নিজের হাতের চুড়ি খুলে পরিয়ে দিয়েছিলেন এমিলির হাতে।

এমিলি তখনো সুন্দরী তন্বী।

যখন মারা গেলেন তখন এমিলির বয়স ৮৫ বছর। পৃথুলা। হাতে ছোটো হয়ে গেছে চুড়িটি।

তবু, তবুও খোলেননি। সেই স্নেহাশিসের স্মারক। মৃত্যুর সময়েও।

আর কেউই তো অন্য কোনোভাবে তাঁদের ভালোবাসার বিয়েটাকে ভালোবেসে মান্যতা দেয়নি।

হয় কেউ কিনতে চেয়েছে রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে।

নয় কেউ অস্বীকার করেছে গোঁড়া বিশ্বাসের জেদে।

মানুষ সুভাষকে মেরে ফেলেছে বিপ্লবী সুভাষের অতিমানব ভাবমূর্তি।

তার আড়ালে নিজেকে সঁপে দিয়ে মরেছেন এমিলি। একেবারে নিজের মতো করে। ❖

ফিচার

ভারতবর্ষে বয়স্ক মানুষদের অসুস্থতা—পরিসেবার প্রতিবন্ধকতা এবং প্রতিকার

ডাঃ রবীন চক্রবর্তী

শুভঙ্কর রায়, এখন ৬৭ বছর। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে বড়ো হয়ে আই আই টি থেকে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার এবং পরে আই আই এম আহমেদাবাদ থেকে এম বি এ করে এক নামজাদা মাল্টিন্যাশনাল করপোরেট কোম্পানির এগজিকিউটিভ থেকে আস্তে আস্তে ১৫ বছরের মধ্যে কোম্পানির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। ডাকাবুকো ব্যক্তিত্ব। দুনিয়াকে ডোন্ট কেয়ার ভাব। দিনে ১৮ ঘণ্টা খাটতে পারতেন। খুব খেতে ভালোবাসেন, চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়-তে বিশ্বাসী। সঙ্গে রোজ দু-প্যাকেট ফিল্টার উইলস এবং দুই থেকে তিন পেগ হুইস্কি। স্ত্রী নামকরা স্কুলের টিচার, এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে বড়ো, আমেরিকায় আই টি কোম্পানিতে প্রতিষ্ঠিত। মেয়ে বিবাহিত, ব্যাঙ্গালোরে। জামাই বিজনেস এন্টারপ্রেনার। এহেন শুভঙ্করবাবুর ৫৫ বছর বয়সে ডায়াবেটিস ধরা পড়ল। ডাক্তারের কথাবার্তা খুব একটা শোনেননি। ৫৮ বছরে হার্টের অসুখ। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয়েছে। কোম্পানির হেলথ্ ইনস্যুরেন্স ছিল, তাও খুব একটা আমল দিতেন না। তবে মানুষ হিসাবে খুব পরোপকারী। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের বিপদে-আপদে টাকাপয়সা দিয়ে বিনা দ্বিধায় সাহায্য করেছেন। নিজে খুব একটা বন্ধুবান্ধবের সাথে মেলামেশা করতেন না। ৬০ বছরে রিটায়ারমেন্ট, কিন্তু কোম্পানি তাঁকে দু-বছর এক্সটেনশন দেওয়ায় ৬২ বছরে কোম্পানির কাজকর্ম ছেড়ে বাড়িতে। স্যুট-টাই ছেড়ে জিনস আর টি-শার্ট। কিন্তু হাই ক্যালোরি ফুড সাথে স্মোকিং এবং অ্যালকোহল যথারীতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গত দু-বছর থেকে ওনার শরীর ভালো যাচ্ছে না। মাঝে মাঝেই সর্দি-জ্বর, চেস্ট ইনফেকশন, হিমোগ্লোবিন কম, রক্তে সুগার কমছে না, ইউরিয়া, ক্রিয়াটিনিন বেশি, ইউরিনের সমস্যা। চোখে কম দেখছেন, অনেক কিছু মনে রাখতে পারছেন না, অল্পেতেই রেগে যাচ্ছেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সেই অর্থে সে রকম আর যোগাযোগ নেই। সঙ্গী বলতে স্ত্রী লাবণি, সেও অসুস্থ। ছেলে মাঝেসাঝে বিদেশ থেকে আসে, মেয়ে-জামাই যেন দূরে সরে গেছে। হেলথ্ ইনস্যুরেন্স রিনিউ করতে ভুলে গেছেন গত বছর। একজন ডাকাবুকো মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানির সিনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট এখন বড়ো একাকিত্বে আছেন।

এটা কোনো গল্প নয়। একটা বাস্তব ছবি। ভারতবর্ষে এই শতাব্দীর বয়স্ক মানুষের জীবনের ছবি।

সূচনা

ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বিশেষত ৬০ বছর বয়সের বেশি মানুষের সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসঙ্ঘের আর্থসামাজিক তথ্য অনুযায়ী ২০১০ সালে ভারতবর্ষে ৬০ বছরের বেশি মানুষের সংখ্যা ছিল ৭.৫% শতাংশ, সেখানে সম্ভবত ২০২৫ সালে সেই পরিসংখ্যান দাঁড়াবে ১১.১% শতাংশ। অর্থাৎ ২০১০ সালে ভারতবর্ষে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা ছিল ৯ কোটি ১৬ লক্ষ, ২০২৫ সালে সেই সংখ্যা পৌঁছাবে ১৫ কোটি ৮৭ লক্ষতে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল বর্তমানে ২০২২ সালে প্রায় ১২ কোটি বয়স্ক মানুষের দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৯ কোটি থাকেন গ্রামাঞ্চলে এবং এক-তৃতীয়াংশ মানে তিন কোটি থাকেন শহরাঞ্চলে। এই পরিসংখ্যানের একটা বিশেষ আর্থসামাজিক তাৎপর্য আছে, যেটা ভারতবর্ষে বয়স্ক জনসাধারণের স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যপরিষেবার ব্যাপারে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক।

মানুষের বয়সের সাথে সাথে নানারকম অসুখের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এটাই স্বাভাবিক। ব্লাড প্রেশার, হার্ট, সুগার, ব্রেন, নার্ভের ব্যারাম, ডিমেনশিয়া, আর্থ্রাইটিস, সব অর্গানই দুর্বল হয়ে পড়ে। যে কোনো দেশে বয়স্ক মানুষের অসুখ-বিসুখ সমাজের

অর্থনৈতিক অবস্থাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে, এবং দেশের সামাজিক উন্নয়নের একটা উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরে।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরে সমস্ত পৃথিবীতে চিকিৎসাশাস্ত্র যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। জনস্বাস্থ্য সচেতনতা এবং জনস্বাস্থ্য উন্নতির নানারকম পরিকল্পনার বাস্তবিক রূপায়ণের ফলে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। পাশাপাশি কমিউনিকেবেল অসুখ খানিকটা কমলেও ননকমিউনিকেবেল অসুখের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। এর মধ্যে প্রধানত ব্লাড প্রেশার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, ক্যান্সার, অস্টিওআর্থাইটিস, জয়েন্টের ব্যথা, কিডনির অসুখ এবং মনের অসুখ। বয়স্ক লোকেদের মধ্যে মানসিক অবসাদ, একাকিত্ব বোধ একবিংশ শতাব্দীর একটা প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতবর্ষও এর থেকে কোনো ব্যতিক্রমী দেশ নয়।

বয়স্ক বলতে কাদের বোঝানো হয়

জাতিসঙ্ঘের তথ্য অনুযায়ী যাঁরা ৬০ বৎসরের উর্ধ্বে তাঁদের বয়স্ক বলে ধরে নেওয়া যায়। ভারত সরকারের নীতি নির্ধারক কমিটি ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে ঘোষণা করেছে ভারতে যাঁদের বয়স ৬০ এবং ৬০-এর বেশি তাঁদেরকে বয়স্ক বা সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে গণ্য করা হবে। সেইমতো তাঁরা সিনিয়র সিটিজেনদেরর জন্য নির্ধারিত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

স্বাস্থ্য এবং বয়স্ক মানুষ

বিভিন্ন স্বাস্থ্যপরিসংখ্যান থেকে প্রমাণিত, মানুষের বয়স ৬০ বা তার বেশি হলে সাধারণত শারীরিক এবং মানসিক কর্মক্ষমতা অনেকাংশে কমে যায়। স্নায়ু দুর্বল হয়, চিন্তাশক্তি, স্মৃতিশক্তি সুদৃঢ় থাকে না, চলাফেরাও অনেক স্লো হয়ে যায়। ফলস্বরূপ নানারকম অসুখ-বিসুখ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে, স্বাভাবিক কাজকর্ম করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। শারীরিক অসুস্থতার কারণে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয় যেটা মানসিকভাবে তাঁদেরকে আরো দুর্বল করে ফেলে। এছাড়া ঘন ঘন ডাক্তারের কাছে যাওয়া, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া, নিয়ম মেনে নানারকম ওষুধ-পত্তর খাওয়া, সব কিছু মিলে স্বাভাবিক জীবন চালিয়ে যাওয়া কখনো কখনো বেশ কষ্টসাধ্য। মানসিক ভাবে এঁরা ভেঙে পড়েন। এর সঙ্গে আছে মানসিক একাকিত্ব এবং অসহায়তা। সব কিছু মিলে মানুষগুলো খানিকটা পঙ্গু হয়ে পড়েন।

একবিংশ শতাব্দীর জীবনযাত্রা এবং বয়স্ক মানুষের অসুখ-বিসুখ

এই শতাব্দীর জীবনযাত্রা দ্রুত থেকে দ্রুততর। সময় কম, কাজ অনেক। একসঙ্গে প্রচুর কাজ করতে হয়। ফলে বয়স্ক মানুষদের জন্য ছেলেমেয়েরা, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধব যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। অসুখ হলে ঠিক সময়ে ডাক্তার দেখানো হয় না, হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরি হয়, চিকিৎসার খরচের ক্ষেত্রেও সাবলীলতার অভাব থাকে, যার ফলে বোধহয় বুড়ো হলে মানুষ সামাজিকভাবেও অসহায় হয়ে যায়। এমত অবস্থায় এই মানুষগুলোর মধ্যেও নিজেদের সুস্থ করার ইচ্ছাতেও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে। প্রায়ই ভাবেন কী দরকার অন্যের বোঝা হয়ে বেঁচে থাকার!

বয়সকালের নানাবিধ অসুখ
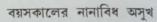
আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে বয়সকালে নানারকম অসুখ-বিসুখ হয়। সেগুলো সাধারণত এইরকম—

১) হাই ব্লাড প্রেশার বা উচ্চ রক্তচাপ।

২) ডায়াবেটিস বা ব্লাড সুগার।

৩) হার্টের অসুখ, হার্ট অ্যাটাক, অ্যারিদমিয়া, হার্ট ফেলিওর, পেসমেকার ইত্যাদি।

৪) ফুসফুসের অসুখ—যেমন, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, লাং ক্যান্সার।

৫) অন্যান্য ক্যান্সার।

৬) কিডনির সমস্যা, প্রস্টেটের সমস্যা।

৭) জয়েন্ট প্রবলেম, অস্টিওপোরোসিস, স্পন্ডালাইটিস, আর্থাইটিস, হাঁটাচলার সমস্যা।

৮) এছাড়া আছে অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা, কানে কম শোনা, চোখে কম দেখা, দাঁত নিয়ে উদ্বেগ।

৯) ভীষণ ভুলে যাওয়া, স্মরণশক্তি কমে যাওয়া।

১০) এই শতকের একটা বিরাট সমস্যা—মানসিক অসুখ, অবসাদ, একাকিত্ব।

এই সমস্ত অসুখ প্রায়ই অনেকগুলো

একসাথে থাকে। আবার একটা থেকে আরেকটা শুরু হয়। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে ভারতবর্ষে প্রায় ৫০% শতাংশ বয়স্ক মানুষেরা রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে গিয়ে পড়ে যান। তার মধ্যে ২০% শতাংশ মানুষের ফ্র্যাকচার হয়। এর প্রধান কারণ চোখে কম দেখা, কানে কম শোনা অথবা নার্ভের অসুখ থেকে ব্যালান্স ঠিক না থাকা। প্রায় ৩০% শতাংশ লোকের স্মৃতিভ্রংশ হয়ে যায়।

পলিফারমাসি বা একাধিক ওষুধের সমস্যা

বয়স্ক মানুষদের নানারকম অসুখ থাকার ফলে একসাথে অনেক ওষুধ নিতে হয়। একসঙ্গে অনেক ওষুধ নিতে গিয়ে প্রায়ই ভুল হয়। কখনো কখনো খুব প্রয়োজনীয় ওষুধ নিতে ভুল হয় আবার কখনো বা ওষুধের ওভারডোজ হয়ে যায়। এটাও একটা বিরাট সমস্যা।

অসুস্থ বয়স্ক মানুষের আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধকতা

সময়ের সাথে সাথে যেমন বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, তাঁদের মধ্যে অসুখও তেমনি বাড়ছে। কিন্তু এই শতকের আর্থসামাজিক অবস্থা বিশেষ করে ভারতবর্ষে, বয়স্ক মানুষদের জন্য উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা এখনো যথেষ্ট নয় এবং পরিষেবার ক্ষেত্রেও অনেক বাধা-বিপত্তি। আমাদের দেশে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে যে সমস্ত কারণগুলো দেখা গেছে সেগুলো প্রধানত এইরকম ঃ

১) ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে বয়স্ক মানুষেরা তুলনামূলকভাবে কম অগ্রাধিকার পায়। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

২) চিকিৎসার গুণগত মান এবং তৎপরতা, একই অসুখের ক্ষেত্রে একজন মধ্যবয়স্ক রুগিকে যতটা উন্নতমানের চিকিৎসা এবং তৎপরতার সাথে করা হয়, সেই একই অসুখে রুগি যদি বয়স্ক হন তাহলে দেখা যায় পরিষেবার মান এবং তৎপরতার একটা গুণগত তফাত থাকে। তার কারণ যে হাসপাতাল বা চিকিৎসকের আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি তা কিন্তু সবসময় নয়। বাড়ির আত্মীয়-পরিজনের দেরি করে রুগিকে নিয়ে আসা, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে গড়িমসি ভাব, অর্থনৈতিক দায়িত্ব নেওয়ার ঢিলেমি কিংবা কম খরচে চিকিৎসা করানোর ইচ্ছা ইত্যাদি ইত্যাদি। কখন অসুস্থ বয়স্ক মানুষদের চিকিৎসার ব্যাপারে পরিবারের অন্যান্যদের নিস্পৃহ মানসিকতাও থাকে।

৩) বয়স্ক মানুষদের যেহেতু একসঙ্গে একাধিক অসুখ থাকে সুতরাং অনেকগুলো অসুখ থাকলে কী ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি সঠিকভাবে গ্রহণযোগ্য সে ব্যাপারে আমাদের দেশে এখনো কোনো নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি হয়নি। তার ফলে অনেক সময় চিকিৎসা বিভ্রাট হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

৪) জেরিয়াট্রিক স্পেশালিস্ট আমাদের দেশে সেই অর্থে বিরল। প্রায় নেই বললেই চলে। আমাদের দেশে ডাক্তারি শাস্ত্রে জেরিয়াট্রিক বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য এখনও নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম গঠন করা সম্ভব হয়নি।

৫) দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য বা নিদেনপক্ষে ধরে রাখার জন্য যেহেতু বয়স্ক মানুষদের অবদান বা ভূমিকা আপাতভাবে অনেক কম, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁদেরকে দ্রুত সুস্থ করা এবং কর্মক্ষম করার প্রবণতা আমাদের সমাজে অনেকাংশেই কম।

৬) স্বাস্থ্যবীমা পরিষেবা—দেখা গেছে ভারতবর্ষে ষাটোর্ধ্ব মানুষদের স্বাস্থ্যবীমা করার ব্যাপারে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই সমস্ত মানুষজন খুব সহজেই নতুন বীমা পান না। আবার ৮০ বছরের বেশি মানুষদেরর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবীমা নতুন পাওয়া প্রায় লটারির টিকিট পাওয়ার মতো।

৭) ভারতবর্ষে ষাটোর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে বেশি। এই মানুষদের জন্য স্বাস্থ্যবীমা স্বপ্নের অতীত। সাধারণ চিকিৎসা জোটাই দুষ্কর—সঠিক চিকিৎসা অথবা স্বাস্থ্য পরিষেবা তো অনেক দূরে। আমাদের দেশে গ্রামের লোকজন এই একবিংশ শতাব্দীতেও ভাবেন যে ষাট বছর বয়স হলে মানুষ তো বুড়ো হয়ে যায়, আর কতদিনই বা বাঁচবেন! এ ধরনের ভাবনা নিঃসন্দেহে বয়স্ক মানুষদের অসুখ সারানোর ক্ষেত্রে একটা বিরাট অন্তরায়।

৮) ভারতবর্ষে সুসংঘটিত হোম কেয়ার সার্ভিসের অভাব। নেই বললেই চলে।

প্রতিকার

আধুনিক ভারতবর্ষে মানুষের গড় আয়ু ৭০ পেরিয়ে গেছে। এটা স্বাস্থ্য পরিসংখ্যানের একটা প্রগতির পরিচয়। পাশাপাশি এটাও সত্যি যে অসুস্থ বয়স্ক মানুষেরা হয়তো আমাদের দেশে পারিবারিক এবং সামাজিক বোঝা হয়ে বেঁচে থাকেন—এটা একদম কাম্য নয়। কিন্তু এর কি কোনো প্রতিকার আছে? না এটাই অবশ্যম্ভাবী? বলা কঠিন। তবে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বয়স্ক মানুষদের জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আছে সে সবের ভিত্তিতে বেশ কিছু প্রতিকার ব্যবস্থা আমাদের দেশেও সম্ভব।

১) প্রতিকারের প্রথম পদক্ষেপ হল রোগ প্রতিরোধ বা প্রিভেনশন। ৪০ বছর বয়স থেকেই লাইফ স্টাইল রেগুলেশন এবং প্রিভেনশন, যাতে বয়স বাড়লে সুস্থ থাকা যায় সেই ব্যাপারে পরিকল্পনা।

২) কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট জাতীয় খাবার কম খাওয়া। বয়স বাড়লে দিনে ১২০০ থেকে ১৫০০ ক্যালোরির বেশি নয়। নুন বা নুন জাতীয় খাবার কম, যথেষ্ট পরিমাণে ফল, দিনে দুই থেকে তিন লিটার জল যদি না কিডনির কোনো অসুখ থাকে, দুধ, ছানা, ঘরে পাতা দই, মাছ, চিনেবাদাম, কম মাংস, কম বিরিয়ানি পোলাও আর পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ইতাদি খাওয়া প্রয়োজন। তবে খাবারের মেনু কোনো অসুখ থাকলে ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ মতো নিতে হবে।

৩) স্মোকিং সম্পূর্ণ বন্ধ। অ্যালকোহল যথেষ্ট কমাতে হবে। কারণ অ্যালকোহলে প্রচুর ক্যালোরি থাকে এবং অ্যালকোহল নিজে সরাসরি নানারকম অসুখ সৃষ্টি করে।

৪) নিয়মিত হাঁটাচলার অভ্যাস। নিদেনপক্ষে দিনে ২০ থকে ৩০ মিনিট। নিজেকে কিছু একটা কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখলে বয়স্ক মানুষজন নিঃসন্দেহে সুস্থ থাকেন।

৫) বাড়িতে মেঝেতে বিশেষ ধরনের টাইলস, বাথরুমে জল শুষে নেওয়ার মতো মেঝে, এক্সট্রা হ্যান্ডেল যাতে পিছলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। সিঁড়িতে, দরজায় কিছু এক্সট্রা সাপোর্ট রাখা ভালো। হাঁটাচলার জন্য ট্রাইপড ওয়াকিং স্টিক ব্যবহার করলে রাস্তাঘাটে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

৬) সমবয়সি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করা, আড্ডা দেওয়া, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিজিকে জড়িয়ে রাখলে শরীর ও মন দুইই ভালো থাকে একাকিত্ব ভাব কমে যায়। স্কুল-কলেজের পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও শরীর সুস্থ থাকে। শিশুদের সঙ্গে মেলামেশা করলে, বাড়িতে কুকুর, বেড়াল জাতীয়

পোষ্য রাখলে মানসিক অবসাদ অনেকাংশে কমে যায়।
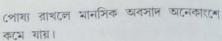
৭) একটা-আধটা হবি থাকা ভালো, যেমন ছবি আঁকা, বাগান করা, কিছু লেখালেখি করা, গান গাওয়া বা শোনা, গল্পের বই পড়া অথবা ব্যক্তিগত ডায়েরি লেখা, এসমস্ত অভ্যাস নিঃসন্দেহে মানুষকে সুস্থ রাখে।

৮) নিয়মিত ডাক্তার দেখানো এবং মাঝে মাঝেই সম্পূর্ণ হেলথ্ চেক আপ দরকার এবং ডাক্তারের উপদেশ, পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেই হবে। ওযুধপত্র নিয়ম মেনে খেতে হবে। প্রয়োজনে ডোমেস্টিক হেল্প লাগলে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বয়স্ক মানুষের নিয়মিত ভ্যাকসিন নেওয়া ভীষণ প্রয়োজন যাতে ইনফেকশন না হয়। দেশে জেরিয়াট্রিক স্পেশালিস্ট একান্তই জরুরি। ভালো হোম কেয়ার সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

৯) ভালো চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যবীমা বা হেলথ্ ইনস্যুরেন্স বিশেষ জরুরি।

১০) পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা অনেক আগে থেকেই করে রাখা দরকার। এর ফলে বয়সকালে অসুস্থ হলে যাতে অর্থের অভাবে চিকিৎসার কোনো কমতি না হয়।

পরিশেষে

যে গল্পটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, শুভঙ্কর রায় সত্যিই একজন বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান ব্যাক্তিত্ব। উনি ব্যবহারিক জীবনে সফল পুরুষ। উনি অনেকের জন্য অনেক ভালো ভালো কাজ করেছেন। কিন্তু যদি নিজের প্রতি একটু দায়িত্ববান হতেন, লাইফ স্টাইল ঠিক রেখে, সিগারেট বন্ধ করে, অ্যালকোহল কম করে, ডাক্তারের উপদেশ ঠিকমতো মেনে চলতেন, পাড়ার সবার সাথে মিলে মিশে থাকতেন, তা হলে এই ৬৭ বছর বয়সেও সুস্থ স্বাভাবিক থাকতেন এবং আনন্দে থাকতেন।

মানুষ এক সামাজিক প্রাণী। স্বাস্থ্য মানুষের সম্পদ। আবার বয়সের সাথে সাথে অসুস্থতাও অবশ্যম্ভাবী, যদিও কোনো মানুষই অসুস্থ হতে চান না। জীবনে শারীরিক স্বাস্থ্য ছাড়াও মানসিক স্বাস্থ্য আছে, পারিবারিক স্বাস্থ্য আছে, সামাজিক স্বাস্থ্য আছে, জীবনকে সুন্দরভাবে উপভোগ করার জন্য আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য আছে। একবিংশ শতাব্দী এক জটিল সময়। এই আধুনিক সভ্য ভারতবর্ষে সুন্দর স্বাস্থ্যের সংজ্ঞাও হয়তো পালটে গেছে। মানুষের জন্য মানুষের সময় কমে গেছে। কিন্তু মৃত্যু জীবনের এক অনিবার্য বাস্তব পরিণতি। সময় যাই হোক না কেন, যে পৃথিবীতে জীবন নিয়ে বসবাস, সেই পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া যেন মর্যাদাপূর্ণ হয়। স্বাস্থ্যকে সুন্দর রেখে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারাই বোধ হয় মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। সেখানেই জীবনের সার্থকতা এবং তা অসম্ভব নয়। ❖

ফিচার

বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ মস্তিষ্কের উপর কি প্রভাব ফেলতে পারে?

ড. অমিত কৃষ্ণ দে
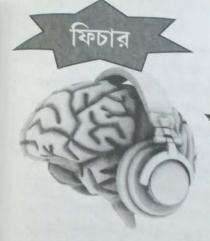
আদিমকাল থেকে মানুষ বিভিন্ন ধরনের শব্দ ব্যবহার করে এসেছে একে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। তারা যখন কথা বলতে শেখেনি তখনো তারা একজনের থেকে আরেকজনকে বিভিন্ন ধরনের শব্দের মাধ্যমে বার্তা পাঠাতে চেষ্টা করেছে। জন্তুরা যেমন তাদের ডাকের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বার্তা পাঠায়, তেমনি মানুষও চেষ্টা চালিয়ে চলেছিল কী করে শব্দের মাধ্যমে একজন আরেকজনের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে পারে। প্রথম প্রথম কাঠ, পাথর বা লোহার টুকরো দিয়ে আওয়াজ করা হত। তারপর ধীরে ধীরে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হতে শুরু করল বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র। ঢাক ও ঢোলের সাহায্যে এক জায়গা থেকে দূরে আরেক জায়গায় আওয়াজ পাঠানো হত। এই শব্দ শুনে মানুষ বুঝতে পারত কী হতে চলেছে। ঢাক বাজিয়ে যুদ্ধের বা কোনো উৎসবের ঘোষণা করা হত। এই প্রথা এখনো চলে আসছে।

আমাদের পূর্বপুরুষরা যোগাযোগ করতে এবং আবেগ প্রেরণের জন্য বাদ্যযন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন পিচ, তাল এবং টিমব্রে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সময় ব্যবহার করেছিলেন। একটি বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সংগীত বৈশিষ্ট্যগুলি একটি মানসিক মূল্য বহন করে যা সংগীতের বিবর্তন বোঝার জন্য অপরিহার্য হতে পারে। এটি ব্যাখ্যা করবে কেন গান বা গানের কথা ছাড়াও সংগীত শক্তিশালী আবেগ জাগিয়ে তুলতে পারে।

সুতরাং এখনো আমরা দূর থেকে কোনো ঢাকের আওয়াজ বা কোনো বিশেষ বাজনার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারি যে কী ধরনের অনুষ্ঠান চলছে বা কী হতে চলেছে। এর প্রধান কারণ হল আমাদের মস্তিষ্ক এই ধরনের আওয়াজকে খুব তাড়াতাড়ি কোনো এক বিশেষ ঘটনার সঙ্গে সংযোগ করে তাকে শনাক্ত করতে পারে। যেমন সানাই-এর আওয়াজ আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে কোনো একটা বিশেষ শুভ অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ হতে চলেছে। কাঁসরঘণ্টা বা শঙ্খের আওয়াজ শুনলে আমরা বুঝতে পারি যে সেখানে কোনো এক বিশেষ ধরনের শুভ অনুষ্ঠান যেমন পুজো চলছে। প্রতিটি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে কোনো না কোনো বিশেষ ঘটনা জড়িয়ে আছে এবং আমাদের মস্তিষ্ক সঙ্গে সঙ্গে তা শনাক্ত করতে পারে। আমরা ফিরে যাই কোনো এক বিশেষ স্মৃতিতে যা আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

বহু সময় আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন ধরনের সংগীতের সুর ও বাজনা আমাদের মনের উপর বিভিন্ন ধরনের প্রভাব ফেলে। কোনো এক দুঃখের সুর শোনার সঙ্গে সঙ্গে মন খারাপ হয়ে যায়, আবার কোনো একটা আনন্দের সুর মনকে ভালো করতে পারে। সিনেমাতে আমরা দেখেছি যে এই সকল বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিকে বোঝানোর জন্য। যখন কোনো কমেডির সিন আসে তখন এক ধরনের হালকা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় যা শুনলে মনে আনন্দ হয়। অন্যদিকে, কোনো একটা দুঃখের পরিস্থিতি বোঝার জন্য এমনভাবে সুর ব্যবহার করা হয় যাতে মনটা বিমর্ষ হয়ে যায়। একটি খুনের দৃশ্য বা ভয়ের দৃশ্য বোঝাবার জন্য খুব বেশি রকম জোরে এক বিশেষ ধরনের আওয়াজ ব্যবহার করা হয় যা আমাদের মনে একটা ভয় সঞ্চার করে। সুতরাং এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে কোনো একটা বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করলে তা আরও জোরালো হয়। অন্যদিকে, কোনো একটা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বিশেষ পরিস্থিতিকে তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

সংগীত মানুষের জন্য একটি বিস্তৃত উদ্দীপনা, যা আমাদের মস্তিষ্কের অনেক অঞ্চলকে সক্রিয় করে। এমনকী গানের কথা ছাড়া, সংগীতের সুর এবং ছন্দেরও একটি বড়ো প্রভাব রয়েছে। শাস্ত্রীয় সংগীত শোনার সময়, আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারি। যখন একটি জ্যা তার ক্লাইম্যাক্স পূরণ করে, তখন নোটের পিচগুলি আমাদের আবেগ বা পুরোনো স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। এই সময় মস্তিষ্কের অ্যামিগডালা অঞ্চল সক্রিয় হয়ে ওঠে। স্ট্রেস

এবং উদ্বেগ হরমোন প্রকাশ হয় এবং তখন আমরা উত্তেজিত হই। সিনেমা এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ধরনের সংগীতের সাথে নির্দিষ্ট আবেগ যুক্ত করে প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। যেমন দুঃখজনক দৃশ্যের জন্য বেহালা; যুদ্ধের দৃশ্যের জন্য তাল দিয়ে জোরে, নাটকীয় অর্কেস্ট্রাল সংগীত; মজার দৃশ্য বোঝাবার জন্য বিশেষ ধরনের বাজনার আওয়াজ, ভয় বা কোনোরকম রহস্য দৃশ্য বোঝাতে খুব উঁচু পিচ বা দ্রুত তাল, সংগীত ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

সংগীতকে সম্পূর্ণ করার জন্য দরকার হয় সুর ও বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র। এর সঙ্গে কথা ব্যবহার করলে এককেটি ভাষায় এককে ধরনের সুরের মূর্ছনা তৈরি হয়। কথার মাধ্যমে মানুষ তার চিন্তাধারার পবিত্র প্রকাশ করে কিন্তু সুর ও বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজবার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে। বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র যেমন পিয়ানো, ট্রাম্পেট, সিন্থেসাইজার, হারমোনিয়াম, তানপুরা, তবলা, ড্রাম, গিটার, বাঁশি ইত্যাদি বাজালে তার থেকে প্রকাশ পায় বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি। রাগ, ভয়, দুঃখ, আনন্দ, উত্তেজনা—একের পর এক অনুভূতি মনের মধ্যে জাগতে শুরু করে।

বাদ্যযন্ত্র মস্তিষ্কের ওপর বিভিন্ন ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। যারা কোনো না কোনো একটি বাদ্যযন্ত্র বাজায় তারা বেশ কয়েক ধরনের উপকার পেয়ে থাকে। মনোযোগ দিয়ে কোনো না কোনো একটি বাদ্যযন্ত্রকে যদি বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাজানো যায় তাহলে দেখা যাবে যে মন অনেক বেশি সতেজ হয়ে গেছে। যন্ত্রের দিকে মনোযোগ থাকার জন্য বেশ কিছুক্ষণ ধরে মাথায় চিন্তা-ভাবনা কোনোরকম কোনোভাবে প্রবেশ করতে পারে না। তার ফলে কিছুক্ষণের জন্য সুখ-দুঃখ, অশান্তি সবকিছু থেকে বিরত থাকা যায়। তৈরি হয় ধৈর্য এবং আত্মবিশ্বাস। এই কারণে শিশু বয়স থেকে কোনো একটি বাদ্যযন্ত্র শেখানো খুব বেশি দরকার। মনোসংযোগ করে দীর্ঘক্ষণ বাজনা বাজাবার অভ্যাস করলে মস্তিষ্কের সচলতা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পড়াশোনাতে অনেক বেশি মনোঃসংযোগ বাড়ে। বাজনার আওয়াজ মনকে শান্ত করে, হৃদস্পন্দনকে নিয়ন্ত্রণ করে, রক্তের উচ্চচাপ কমায় এবং স্ট্রেস হরমোনের পরিমাণ কমায়।

শুধুমাত্র শিশুদের ক্ষেত্রে নয়, বড়োদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে যাঁরা বাদ্যযন্ত্র বাজান তাঁরা অনেক ধরনের সুফল পেয়েছেন। বাজনা কিছুক্ষণের জন্য মানসিক চাপ থেকে নিস্তার দিতে পেরেছে। আইনস্টাইন নিজে বেহালা বাজাতেন এবং উনি বারবার বলতেন যে বেহালা বাজানোর ফলে তাঁর জীবনে আনন্দ এসেছে। বাজনার মধ্যে দিয়ে তিনি জীবনের বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পেয়েছেন। আসলে বাজনা বাজানোর শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কের বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়ে ও স্মৃতিশক্তির উন্নতি ঘটে, যা অঙ্ক ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য খুব বেশি প্রয়োজন। বাজনা বাজালে মস্তিষ্কের বাম ও ডান ভাগ সমনাভাবে উন্নত হয়। যেমন বেহালা বাজানোর সময় বাম হাত ও ডান হাত দুইরকম ভাবে প্রয়োগ করা হয়। এর জন্য দরকার সূক্ষ্মভাবে আঙুলের চালনা যা পরিচালনা করে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম। মস্তিষ্ক আঙুলগুলিকে চালনা করার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করতে থাকে এরপরের পদক্ষেপ কীরকম ভাবে নিতে হবে। এর সঙ্গে চোখ কান ও নাকের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে সজাগ রাখতে হয়। সুতরাং বাজনা বাজাবার সময় বাদকের মস্তিষ্ক খুব সজাগ হয়ে কাজ করতে থাকে। শুধুমাত্র পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম নয়, বাজনা বাজানোর সময় সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই কারণে বলা হয় যে বাজনা বাজালে মস্তিষ্কের খুব ভালো এক্সারসাইজ হয়। ৬০ থেকে ৮৫ বয়স্ক মানুষদের ওপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা হয়েছে যে যাঁরা এই বয়সে বেহালা বাজনা শিখতে শুরু করেছেন তাঁরা ছয় মাস পর থেকে মানসিকভাবে অনেক বেশি উন্নত বোধ করতে শুরু করেছেন। তাঁদের মনে রাখার ক্ষমতা বেড়ে গেছে ও চিন্তাভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তা পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই তুলনায় যারা বেহালা বাজাতে শেখেনি তাদের ওই ছয় মাসে কোনো মানসিক উন্নতি ঘটেনি।

স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির কিছু গবেষক ১০৩ জন বাজনা বাদকের ব্রেন ইমেজিং করে কিছু নতুন তথ্য পেয়েছেন। তাঁরা ৫০ জন সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন যাদের কোনোরকম বাজনার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। এঁরা দেখেছেন যে ১০৩ জন বাজনা বাদকের মধ্যে প্রায় ৫১ জনের মস্তিষ্ক অনেক বেশি শক্তিশালী গঠনমূলক এবং তাদের মস্তিষ্কের দুই ভাগের ভেতর যোগাযোগ ক্ষমতা অনেক বেশি প্রখর। এদের মস্তিষ্কের বিশেষ কয়েকটি জায়গা সামান্য বড়ো এবং সংগীত ও কথা বলার অংশগুলি বেশি উন্নত। এদের মধ্যে পাওয়া গেছে পরম পিচ বা পারফেক্ট পিচ যা যেকোনো ধরনের সুরকে মুহূর্তের মধ্যে শনাক্ত করতে সাহায্য করে। এই তথ্য প্রকাশ হয়েছে জার্নাল অব নিউরোসায়েন্স-এ ২০২১ সালে।

সুতরাং এর থেকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে বাজনার আওয়াজ মানুষের মনে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া শুরু করে। যে বাজায় এবং যে শোনে, তাদের দুজনেরই মনের উপর সংগীতের প্রভাব পড়ে। এই নিয়ে বর্তমানে বহু গবেষণা চলছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে সুদূর ভবিষ্যতে আরো অনেক তথ্য আবিষ্কার হয়ে পড়বে যার ফলে মানুষের মস্তিষ্ক ও তার কার্যকলাপ আরো অনেক পরিষ্কার বোঝা যাবে। ❖

পাত্রীপক্ষ

অর্পিতা সরকার

'আপনার নাম?' বেশ বিনীত স্বরেই জিজ্ঞাসা করল পার্থ বর্মণ। পেশায় ব্যাংকার হওয়ার সুবাদে নাম জীবনে কিছু কম শোনেনি ও। তবুও পাত্রী দেখতে এসে এটা জিজ্ঞাসা করতে বেশ ঘেমে উঠেছিল।

মেয়েটি সুমধুর কণ্ঠে বলল, 'প্রীতিলতা।'

পার্থ থমকে গিয়ে বলল, 'ওয়াদ্দেদর?'

প্রীতিলতা হেসে উত্তর দিল, 'না, রায়চৌধুরী।'

পার্থ বলল, 'আর ডাকনাম?'

মেয়েটা মাথা নীচু করে বলল, 'বাড়িতে সবাই মাতঙ্গিনী বলে ডাকে। আর ছোটোমামা ডাকে সরোজিনী বলে।'

একটু চমকে উঠে পার্থ বলেই ফেলল, 'কিন্তু এঁরা তো আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব। একটি মেয়ের নাম এতজনের নামে কেন বুঝলাম না।'

প্রীতিলতা হেসে বলল, 'আমিও ঠিক বুঝিনি। এমন অনেক কিছুই বুঝিনি আমি।'

পার্থ বুঝল, ডাকনামেও বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না। তার থেকে বরং প্রীতি কি সরোজ বলে ডাকতে হবে।

'আপনার শখ কী?'

প্রীতিলতা বলল, 'বই পড়া।'

যাক, একটা জায়গায় বেশ মিল আছে। না হলে এমন শাড়ি জড়ানো কাদার তাল টাইপ লাজুক স্বভাবের মেয়েদের পার্থ বিশেষ পছন্দ করে না। এদের দেখলেই মনে হয় নিজের জীবনটা অন্যের কাঁধে সমর্পণ করাই এদের জীবনের একমাত্র ও মুখ্য উদ্দেশ্য।

হয়তো অগ্নিকন্যাদের নামকরণ করে এই মেয়ের মধ্যেও সামান্য স্ফুরণ দেখতে চেয়েছিল বাড়ির লোক। তাতে যে ডাহা ফেল করেছে সেটা প্রীতিলতার নার্ভাসনেস আর আঙুল ঘষা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। পার্থর বাবার আবার এমন ঘরোয়া মেয়েই পছন্দ। তাই রবিবারের খাসির মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে ভাতঘুম ছেড়ে এই মিশনে নামতে হয়েছে।

মেয়েটা লম্বা আঁচল দিয়ে গা, পিঠ, হাত অবধি ঢেকে রেখেছে।

পার্থ বলল, 'আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে করতে পারেন।'

প্রীতিলতা মাথা নীচু করে বসে বলল, 'আমার বড়োমামা মানে চিত্তরঞ্জন দাস আপনাকে ব্যাংকে দেখেছিলেন।'

একঢোঁক জল সদ্য মুখে দিয়েছে পার্থ, আরেকটু হলেই গলায় লেগে বিষম খেয়ে বিশ্রী কাণ্ড ঘটে যেতে পারত। পার্থ ভয়ে ভয়ে বলল, 'আপনার বাকি মামাদের নাম কী?'

প্রীতিলতা হাসিমুখে বলল, 'বিনয় আমার মেজোমামা আর রাসবিহারী ছোটোমামার নাম। আমার মামার বাড়ির দাদুর বাবা একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। দাদু নিজের বাবাকে লড়তে দেখেছিলেন। তাই ছেলেমেয়েদের এমন নাম রেখেছিলেন। সঙ্গে নাতি-নাতনিদেরও।'

পার্থ ভয়ে ভয়ে বলল, 'আপনার বাবার নাম তাহলে ক্ষুদিরাম হল কী করে?'

প্রীতিলতা নরম শান্ত গলায় বলল, 'ওটা কাকতালীয়। না, ঠিক কাকতালীয় বলব না। মা-কে যারা দেখতে এসেছিল তাদের মধ্যে

দাদুর চোখে বাবা অন্তত পাঁচ নম্বর বেশি পেয়েছিল শুধু নামটার জন্য। এবং পাত্র হিসাবে অগ্রগণ্য হয়েছিল। আমার মায়ের নাম, লক্ষ্মী। মানে লক্ষ্মীবাইয়ের নাম অনুকরণে।'

প্রীতিলতার এক কাকিমা এসে পার্থর হাতে স্ন্যাকসের প্লেট আর জুসের গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'গল্প করতে করতে খেয়ে নাও।'

পার্থর কানের কাছে যেন 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' গান বাজছে... আর ও যেন আমৃত্যু অনশনে বসেছিল, ফলের রস খেয়ে সেই অনশন ভঙ্গ করতে হবে। আচমকাই গায়ের রক্ত গরম হয়ে গেল। দুশো বছর ইংরেজদের অত্যাচারের কথা মনে পড়ে এক নিঃশ্বাসে জুসটা শেষ করে ফেলল পার্থ। ওদের বাড়ির লোকজন এতক্ষণ পর্যন্ত উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। নরম মেয়েকে ব্রিটিশের হাতে ছেড়ে দিয়ে হয়তো একটু শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পার্থ এখনও উল্টোদিকের সোফাতেই বসে আছে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে তারা পার্থর বাবা-মা, ছোটোমাসির সঙ্গে গল্পে মেতেছে। প্রীতিলতা মাথা নীচু করেই বসে আছে।

পার্থর এবারে অস্বস্তি হচ্ছে। এভাবে একজন অপরিচিত মেয়ের সামনে ঘটের কলার মতো চুপ করে বসে থাকার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। গৃহকর্ত্রী পুজোর সরঞ্জাম সাজিয়ে কম্বলের আসন পেতে ব্রাহ্মণকে বসিয়ে দিয়েছেন, সামনে ঘটের কলাটিও রয়েছে। পুরুতমশাই সবই একবার করে নেড়েচেড়ে দেখছেন, শুধু ঘটের কলাটিকে বাদ দিয়ে। ধুর, এমন নরমসরম মেয়ে বাবা-মায়ের পছন্দ হতেই পারে। কিন্তু পার্থর মোটেই পছন্দ নয়। একটু স্মার্ট না হলে চলে! আজ ঝগড়া কাল ভাব না হলে আর কীসের দাম্পত্য! এ মেয়ের নাম প্রীতিলতা, সরোজিনী যাই দেওয়া হোক—এ আসলে শরৎচন্দ্রের নেহাতই নিরীহ নায়িকা। পার্থ চুপচাপ বসে আছে। প্রীতিলতাও চুপ করে জানালার দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

হঠাৎ প্রীতিলতা বলল, 'আপনার যদি কোনো কথা না থাকে তাহলে আমি দুটো কথা বলি?'

পার্থ ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই।'

প্রীতিলতা ওর চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছেন আপনি? শরীর কেমন?'

পার্থ ভাবছিল, এ আবার কেমন প্রশ্ন? প্রায় আধঘণ্টা বসে আছে ওরা। আচমকা এমন প্রশ্ন কেন?

পার্থ একটু হকচকিয়ে বলল, 'কেন বলুন তো? ভালোই তো আছি। ফাইন।'

প্রীতিলতা বলল, 'সুন্দরী মেয়ে দেখতে ভালো লাগে? মানে ধরুন ব্যাংকের কাউন্টারে বসে একঘেয়ে কাজ করছেন। সেই সময় একটা সুন্দরী মেয়ে ঢুকল, তখন হাতের জরুরি কাগজটা ছেড়ে তার দিকে কিছুক্ষণ আনমনে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে?'

পার্থ ভাবল, আমি তো ব্রিটিশ নই। আমাদের চোদ্দোগুষ্টির কেউ ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত বলেও জানি না। তাহলে প্রীতিলতা এমন বাউন্সার ছুড়ছে কেন ওর দিকে!

রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে নিতেই প্রীতিলতা এসির রিমোটটা হাতে নিয়ে আরও তিনঘর কমিয়ে আঠেরো টেম্পারেচার করে দিয়ে বলল, 'এবার ঠিক আছে? হ্যাঁ বলুন, ইচ্ছে করে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে?'

পার্থ বলল, 'আপনি হয়তো ব্যাংকের ম্যানেজারদের ঠিক কতটা কাজ করতে হয় বুঝতে পারছেন না। আপনার মতো ওষুধ কোম্পানির জব তো নয়। তাই সময়ের বড্ড অভাব।'

প্রীতিলতা বলল, 'বুঝলাম। বন্ধুরা একসঙ্গে হলে কোনো হট মেয়েকে নিয়ে গল্প করেন? মানে আলোচনা আর কী!'

পার্থ এবার সত্যিই ঘামতে শুরু করেছে, এসব কী ধরনের প্রশ্ন রে বাবা! এগুলো এমন ওপেনলি কেউ করে?

পার্থ গম্ভীর হয়ে বলল, 'না আমার বন্ধুরা সব স্ট্যান্ডার্ড। ওরা উপযাচিত হয়ে কোনো মেয়ের সঙ্গে কথাও বলে না।'

প্রীতিলতা মুচকি হেসে বলল, 'ওহ্! তার মানে আড্ডায় এই ধরনের আলোচনা হয়...রাশিয়ার বৈদেশিক গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান সের্গেই নারাস্কিন বলেছেন, "রাশিয়ার ভবিষ্যৎ এবং বিশ্বে রাশিয়ার অবস্থান এখন ঝুঁকিতে পড়েছে।

রাশিয়ার নেতা ভ্লাদিমির পুতিনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ইউক্রেন দখল করে নেওয়া এবং এর শাসন ক্ষমতায় পরিবর্তন আনা, যাতে তারা আর কখনো পশ্চিমি সামরিক জোট নেটোতে যোগ দেওয়ার আগ্রহ না দেখায়।"

আচ্ছা আচ্ছা বুঝলাম। তা ভালো।'

পার্থ যে তোতলা সেটা ও আজকেই প্রথম আবিষ্কার করল। কারণ ও প্রায় তুতলেই বলল, 'না না, এমন আলোচনা যে সবসময় হয় তা নয়। ওই সবকিছু নিয়েই হয়।'

প্রীতিলতা বলল, 'এনিওয়ে বাড়ি থেকে বাইরে বেরোনোর সময় কি লাস্ট মোমেন্টে একবার পটিতে যান? মানে সকালে ক্লিয়ার হয়েছে তবুও মনটা খচখচ করছে, আরেকবার ঘুরে আসি এমন মনে হয়?'

পার্থ রীতিমতো লজ্জা পেয়ে বলল, 'এসব প্রশ্নের মানে কী? মানে এগুলো জেনে আপনি ছেলে পছন্দ করবেন?'

প্রীতিলতা ঘাড় নেড়ে বলল, 'এটা একটা সাইকোলজিক্যাল টেস্ট বলতে পারেন। দেখুন অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা বুঝলেন কিনা। আমরা আগে থেকে চেনা-পরিচিত নই। আজই আমাদের প্রথম দেখা। এই বয়েসে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট হয় বলে আমার ধারণা নেই। হয়তো হয়, কিন্তু আমার আপনাকে দেখে তেমন কিছু ফিলিংস হল না। ওই হাওয়ায় ওড়না উড়ছে বা বুকের মধ্যে লাবডুব আওয়াজটা থমকে গেছে, এমন কিছুই ফিল করলাম না। অগত্যা প্র্যাকটিকাল হতে হল। আমরা এদিকে নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ জানানোর সুযোগটুকু পাব না, হয়তো ওদিকে বাড়ির লোকজন গলদা না বাগদা নিয়ে মন কষাকষি শুরু করে দেবে। তাই এই মূল্যবান সময়টুকুতে বুঝে নিতে চাইছি আদৌ কি আমরা ম্যাচ করব? যদি না করি তাহলে গুচ্ছের লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে, বেনারসি, পাঞ্জাবি কিনে এত খরচাপাতি করে লাভ নেই। দু-দিন পরে আবার ডিভোর্স ল-ইয়ারের পেটে যাবে বেশ কিছু টাকা। বুঝতেই তো পারছেন,

কষ্ট করে উপার্জন তো সবাই করে, তাই না? তাই অপচয় যাতে না হয় সেই চেষ্টা করছি।'

পার্থ বলল, 'বুঝলাম। কিন্তু এইটুকু সময়ে যে আমি সব সত্যি বলবই এমন গ্যারান্টি আপনাকে কে দিল প্রীতিলতা? একঘণ্টায় একটা মানুষ চিনে নেবেন এটা একটু বেশিই কষ্টকল্পনা হয়ে গেল না?'

প্রীতিলতা বলল, 'মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় শেষের ঘণ্টা পড়ে যাওয়ার পরেও আট নম্বর কোশ্চেনটা অ্যাটেন্ড করে প্রাণপণ লেখার চেষ্টা করতেন না? নাকি ভাবতেন শেষ পাঁচমিনিটে কী করে সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ এবং গুরুত্ব লিখব, তার থেকে ছেড়েই দিই। নাকি স্যারকে রিকোয়েস্ট করতেন, "প্লিজ স্যার গিভ মি ফাইভ মিনিটস।" জানবেন, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করাটা হিউম্যান সাইকোলজি। তার আগেই যারা দায়সারা করে মাঝপথে ছেড়ে দেয় তাদের জেতার মানসিকতাই নেই।'

পার্থ বলল, 'আপনাকে দেখে আমি ভেবেছিলাম আপনি নেহাতই শান্ত স্বভাবের মেয়ে!'

প্রীতিলতা বলল, 'এখন কি ভাবছেন ঘুম থেকে উঠেই কলতলায় দাঁড়িয়ে ঝগড়া করি?'

পার্থ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আরে না না। তা কেন? এখন মনে হচ্ছে বেশ স্মার্ট।'

প্রীতিলতা হেসে বলল, 'আমার মামাতো ভাই সুভাষচন্দ্র বলে, সব জিনিসের শেষ দেখে ছাড়া উচিত, চেষ্টা না করে ছেড়ে দিলে মানে তুমি হার স্বীকার করে নিলে।'

পার্থ মুহূর্তের জন্য ঘেঁটে গিয়েছিল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "তোমরা আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।" এটাই মুখস্থ ছিল এতদিন। পরমুহূর্তেই মনে পড়ে গেল, ওহ্ প্রীতিলতার দাদু তো আসল সর্বনাশটা করে গেছেন। এ সুভাষ সে সুভাষ নয়, মনে পড়তেই নিশ্চিন্ত হল।

প্রীতিলতা পার্থর হাতের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দেখেই পার্থ বলল, 'হাতে কী দেখছেন?'

প্রীতিলতা বলল, 'ট্যাটু করেছেন কিনা দেখলাম। ওই আজকাল সবার হয় না, গার্লফ্রেন্ডের নাম বীণা তারপর আচমকা ব্রেকআপের পরে সরস্বতীর ভক্ত হয়ে বীণাপাণি হয়ে যায়। তাই আর কী। আপনি যেভাবে মেয়েদের ওপরে খাপ্পা তাতে সন্দেহ হল ব্রেকআপ হয়েছে কিনা সদ্য।'

পার্থ বলল, 'হঠাৎ মেয়েদের ওপরে খাপ্পা এটা মনে হওয়ার কারণ?'

প্রীতিলতা বলল, 'এই বয়েসের সুস্থ-সবল ছেলে কাউন্টারে সুন্দরী মেয়ে এলেও দেখেন না, বন্ধুদের সঙ্গেও মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করেন না, তাই বলছিলাম।'

পার্থ হেসে বলল, 'আপনি তো দেখছি সাইকোলজি গুলে খেয়েছেন।'

প্রীতিলতা বলল, 'একটা কথা বলব? আপনার যদি আমাকে পছন্দ না হয় স্ট্রেইট বলে দেবেন। ওসব বাড়ি গিয়ে জানাচ্ছি, পরে বলব, এসব করার দরকার নেই।'

পার্থ বলল, 'আপনি তো আমার সাইকোলজিক্যাল টেস্ট করে নিলেন, আমার তো টেস্ট করা বাকি থাকল। আমরা বরং একদিন বাইরে দেখা করি। সেদিন আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব। তারপর বাড়িতে জানালেই হবে।'

সেই সময়েই বাইরে থেকে কেউ একজন ঢুকল। তাকে কেউ একটা জিজ্ঞাসা করল, 'কী গো রিক্তা, কেমন আছ? এত দেরি করে এলে?'

রিক্তা নামক ব্যক্তিটি বললেন, 'ভীষণ ভীষণ ভালো আছি গো লক্ষ্মীদি।'

প্রীতিলতা বলল, 'আমার দূরসম্পর্কের পিসি। আজকে আসার কথা ছিল। ওই যে পিসি বলল, ভীষণ ভীষণ ভালো আছি—তার মানে খারাপ থাকাটাকে ঢেকে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। নরম্যাল ভাবে ভালো আছি না বলে দু-বার ভীষণ বলে নিজের কোনো একটা দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা করছেন।

এই যে আপনি আরেকদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে চান এবং কথা বলতে চান তার মানে আপনি মাপতে চাইছেন, আমি মানুষটা আদতে কেমন? ঘরে একরকম বাইরে একরকম কিনা। ভালো ভালো। যাচাই করে নেওয়া ভালো। একটা গোটা জীবনের ব্যাপার কিনা।'

পার্থ বলে ফেলতে যাচ্ছিল, আমি ইমপ্রেসড আপনার কথাবার্তা শুনে। মানুষকে বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে। কিন্তু জিভের অতি প্রগলভতাকে কোনোমতে শাসন করে বলল, 'আপনার ইচ্ছে না থাকলে বাইরে মিট করার বিষয়টা ক্যানসেল করে দিতে পারেন।'

প্রীতিলতা বলল, 'একবার কেন? আপনি মাসখানেক আমায় নিয়ে ভাবুন, কথা বলুন, তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন। চিন্তা করবেন না, বার দুই ফোনে কথা বলে বা দেখা করে বিয়েটা না হলে আমি ফেসবুকে "স্যাড লাইফ" বলে পোস্ট নামাব না। অথবা "ভালোবেসে একা ফেলে কেন চলে গেলে—" বলে কোনো কবিতাও পোস্ট করব না। কারণ আমার কাছে আমার জীবনটা ভীষণ দামি। আর এমন ঝপাঝপ আমি প্রেমে পড়ি না। তাই নিশ্চিন্তে দেখা করা যেতে পারে।'

পার্থ বলল, 'তাহলে ফোনে কথা বলে নেব।'

প্রীতিলতা উঠে বলল, 'চলুন ওঘরে গিয়ে বাগদা না গলদার বাড়া ভাতে জল ঢেলে দিয়ে বলি, আমাদের একটু টাইম লাগবে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাতে।'

পার্থ বলল, 'আপনাকে কি আমিই প্রথম দেখতে এলাম নাকি আরও...'

প্রীতিলতা বলল, 'আরও দুজন এসেছিল। বাতিল করেছে আমায়।'

পার্থ বলল, 'কারণ?'

প্রীতিলতা হেসে বলল, 'এই যে সাইকোলজিক্যাল টেস্টের চক্করে। দুজনেরই মনে হয়েছে মেয়েদের এত বেশি প্রশ্ন করার অধিকার নেই। ছেলেরা এসেছে হাটে গরু কিনতে সুতরাং তারাই দেখেশুনে পছন্দ করে কিনবে। গরু কেন খোঁজ নেবে রাখাল কেমন? তাই বাতিল করে গেছে।'

পার্থ বলল, 'আমিও দুজনকে দেখতে গিয়েছিলাম।'

প্রীতিলতা বলল, 'তো কে ক্যান্সেল করল? মেয়েটা না আপনি!'

পার্থ একটু ভেবে বলল, 'সিচুয়েশন। একটি মেয়ের সদ্য ব্রেকআপ হয়েছে। তাই সে সাতদিনের মধ্যে বিয়ে করতে চায়। প্রাক্তনকে দেখাবে বলে। বিয়ের শর্ত একটাই, সাতদিনের মধ্যে বিয়ে করতে হবে।'

প্রীতিলতা বলল, 'তা করলেন না কেন?'

পার্থ বলল, 'আসলে আমি আমার ওয়াইফের মধ্যে আরেকটু ম্যাচিওরিটি আশা করি।'

'আর দ্বিতীয় জন?'

প্রীতিলতার প্রশ্নে পার্থ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'এটা মেয়েটিই বাতিল করেছে বলতে পারেন। বা আমি ওর শর্তে রাজি হইনি বলে।'

প্রীতিলতার চোখে কৌতূহল উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

পার্থ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বিষয়টা বড্ড এমব্যারাসিং আর কী। আমার গোঁফ আছে বলে ওঁর আপত্তি। গোঁফ কাটতে হবে বিয়ে করতে গেলে?'

প্রীতিলতা বলল, 'কেন মৃত দাদুর স্মৃতি মনে পড়ে যায়? নাকি বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ওপরে রাগ? মানে কারণটা ঠিক কী? ভীষণ ইন্টারেস্টিং তো।'

মাথা নীচু করে পার্থ বলল, 'উনি বলেছিলেন কিস করলে নাকি সুড়সুড়ি লাগবে, সেটা উনি বরদাস্ত করবেন না। তাই গোঁফ কেটে ফেললে বিয়ে হবে, না হলে নয়।'

প্রীতিলতা হো হো করে হেসে বলল, 'ইস্ এইভাবে বাদ দিল আপনাকে!'

পার্থ লজ্জিত হয়ে বলল, 'গোঁফ কেটে ফেলাই যায় কিন্তু অন্যের ইচ্ছেতে শর্ত মেনে চলতে বিরক্ত লাগে। তাই বলেছিলাম, কাটব না। তাই সে বিয়ে ক্যান্সেল করে দিল।'

প্রীতিলতা বলল, 'একদম ঠিক করেছেন।'

পার্থ বলল, 'আরেকজনকে ফোনে আমি বাতিল করেছি। মানে দেখতে যাওয়ার আগেই।'

প্রীতিলতা বলল, 'কেন সে কি আবার নাক কাটতে বলেছিল নাকি? না মানে বাধাহীন চুম্বনক্ষেত্র তৈরির উদ্দেশ্যে।'

পার্থ বলল, 'আরে না। সে মেয়ে আমায় রাত দুটোর সময় ফোন করে বলছে—ধরো রাত দুটোয় তোমায় জাগিয়ে দিয়ে বললাম, "আর ঘুমিও না, আমরা গল্প করব। তাহলে কি তুমি বিরক্ত হবে? রাগ করবে? নাকি আমায় জড়িয়ে ধরে বলবে ভালোবাসি ভালোবাসি।" দু-দিন পরপর রাত দুটোয় ফোন করেছিল মেয়েটা। তাই বাধ্য হয়ে ক্যান্সেল করে দিলাম।'

প্রীতিলতা বলল, 'ওমা, হাউ রোম্যান্টিক শি ইজ।'

পার্থ বলল, 'হ্যাঁ সুনীল গাঙ্গুলি মাথাটা পুরো খেয়ে নিয়েছে। রাত দুটোয় "ভালোবাসি ভালোবাসি" বলার পরে নেক্সট ডে অফিস গিয়ে যখন কাজে ভুল হবে আর ঝাড় খাবেন তখন বুঝবেন, রাত জেগে থাকার মাহাত্ম্য।'

প্রীতিলতা বাইরে বেরোতেই ওর মা বললেন, 'মাতঙ্গিনী, তোর কি পার্থকে পছন্দ হয়েছে? তাহলে আজকেই আংটির মাপটা নিয়ে রাখতাম।'

পার্থর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, 'আচ্ছা আপনারা বাড়িসুদ্ধ লোক ডাকনামের ঠিক কী উপকারিতার কথা জানেন?'

প্রীতিলতার ডাকনাম মাতঙ্গিনী দেওয়ার কারণ কী? সাধারণত ছোটো নাম দেওয়া হয় ডাকনাম হিসাবে। এ তো পোশাকিনাম পদ্মলোচন, ডাকনাম পদ্মনয়নের মতো হয়ে গেল।

ঠিক সেই সময় প্রীতিলতার মামা ডাকলেন, 'সরোজিনী লজ্জা পাস না, তোর মতের মূল্য আমরা দিই। যেটা মনে হচ্ছে বল।'

পার্থ হঠাৎ খেয়াল করল, ওর নিজের স্টেপিংটা কেমন কুচকাওয়াজের মতো হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক সেইসময় প্রীতিলতার বাবা বললেন, 'রাসবিহারী তুমি তাহলে কথা বলে নিও মাতঙ্গিনীর সঙ্গে।'

সর্বনাশ! পার্থর যেন মনে হচ্ছে ও একটা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আখড়ায় এসেছে। যেন এখুনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করার আদেশ দেবেন দলের নেতা।

আর কিছুক্ষণ এ বাড়িতে থাকলে আর কিছু হোক না হোক আগামীকাল ব্যাংকে গিয়ে জোনাল ম্যানেজারের গালে দুটো থাপ্পড় দিয়ে হয়তো বলেই ফেলবে, এভাবে হয় না। যারা লোন নিতে চাইছে না তাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে লোন নেওয়ানোর দায়িত্ব নিতে পারব না। এই বাড়িতে থাকলে নিজেকে স্বাধীন করতে বড্ড মন চাইছে। এমন বেপরোয়া ভয়ংকর ইচ্ছাকে দমন করতে না পারলে চাকরিটা নির্ঘাত যাবে।

প্রীতিলতার ফোন নম্বর ও ওর ফোনে সেভ করে নিয়েছে। বাড়ি ফিরে ওর সঙ্গে কথা বলবে। ক্ষুদিরাম বা লক্ষ্মীবাই সরি লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই। ওঁদের কথাগুলো কেমন একটা। আরেক পিস ফিশফ্রাই নেবে নাকি সুতানটি ছেড়ে ইংল্যান্ডে যাবে টাইপ। তুলনামূলকভাবে প্রীতিলতা অনেক স্বাভাবিক।

প্রীতিলতা ফিকফিক হাসছিল পার্থর মুখের দিকে তাকিয়ে। ফিসফিস করে বলল, 'ডোন্ট ওরি। আপনাকে কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবে না। এই বাড়ির সবাই ম্যাক্স টাইম এই মুডেই থাকে। নিজের নামের প্রতি জাস্টিফাই করতে চায় বলে কিনা জানি না। তবে আপনার বাবা কিন্তু টিপিক্যাল বাবা। মানে ওই হয় না, অনেক ছাত্রকে স্কুলে জিজ্ঞাসা করা হয়, "বড়ো হয়ে তুমি কী হতে চাও?" কেউ কেউ বলে, "বড়ো হয়ে আমি ভালো বাবা হতে চাই।" খেয়াল করে দেখাবেন তাদের মুখের মধ্যে একটা বাবাসুলভ গাম্ভীর্য তৈরি হয় সেই নাইন-টেন থেকেই। আপনার বাবাকে দেখেই আমার প্রথম এই কথাটাই মনে হয়েছে। ঠিক বাবা বাবা দেখতে।'

পার্থর এবারে হাসি সামলানো মুশকিল হচ্ছিল। কী বীভৎস বিচ্ছুটি মেয়ে! বলে কিনা বাবা হওয়ার অ্যাম্বিশন নিয়ে বড়ো হয়েছে। তবে কথাটা মন্দ বলেনি, পার্থর বাবার মধ্যে ষোলোর মধ্যে আঠেরো আনা বাবাসুলভ। তাঁর হাব-ভাবে মাঝে মাঝে মা

রেগে গিয়ে বলেন, 'তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ তুমি পার্থর বাবা। আমার নয়। আমার স্বামী। তাই বাড়ি থেকে বেরোলেই, সাবধানে যেও, ব্যাগ সামলে, হারিয়ে ফেলো না, রাস্তাঘাটে বেশি এদিক-ওদিক যাওয়ার দরকার নেই, বলে শাসন করতে পারো না একজন বছর চুয়ান্নর আধবুড়ি মহিলাকে। ঠিক যেন মনে হয় আমার স্বামী নয়, বাপ বসে আছে।'

বাবার মধ্যে অলটাইম এই বাবাসুলভ বিষয়টা ছিল। বন্ধুরা হোস্টেলে বলত, এই পার্থ, আঙ্কেল কি আন্টির সঙ্গেও এমন বাপ-সুলভ টেকনিকেই কথা বলে রে!

প্রীতিলতা মাত্র দশ মিনিট দেখেই, বাবাকে অনেকটা চিনে ফেলেছে। নাহ্, মেয়েটার হিউম্যান সাইকোলজিতে বেশ ইন্টারেস্ট আছে দেখছি। মানুষ চেনার ক্ষমতাটা মন্দ নয়।

পার্থ সংকুচিতভাবে বলল, 'আঙ্কেল, আমি আর প্রীতিলতা আরেকটু সময় চাইছি। আসলে গোটা জীবনের ব্যাপার তো। তাই নিজেরা একটু বুঝেশুনে নিতে চাইছি।'

ঘরের মধ্যে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা।

পার্থর বাবা বললেন, 'সে চেনা-বোঝার জন্য তো গোটা জীবন পড়ে আছে। পছন্দ কি পছন্দ নয় সেটা স্ট্রেট না বলার কী আছে?'

পার্থর মায়ের মুখেও উদ্বেগ।

আর প্রীতিলতার বাবা ক্ষুদিরাম আঙ্কেলের মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে সামনে পার্থ নয় স্বয়ং কিংসফোর্ড দাঁড়িয়ে আছে। এমন অদ্ভুত কথা বোধহয় উনি জীবনে প্রথম শুনলেন। দুজনে দুজনকে বিয়ের আগে চিনে নিয়ে তারপর যদি বিয়েটা না হয় তখন একজন তো কষ্ট পাবেই, তার কী হবে? এখনও ক্ষুদিরাম আঙ্কেলের ভ্রুর কোঁচ সোজা হয়নি।

পার্থকে এমন নিশ্চুপ টর্চার থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই প্রীতিলতা বলল, 'এটা আমাদের দুজনের সিদ্ধান্ত বাবা। বিয়েটা তো আমরা করব, তাই এটুকু স্বাধীনতা আশা করি আমাদের থাকবে।'

স্বাধীনতা কথাটাতে অদ্ভুত কাজ হল। আঙ্কেল আর আন্টি দুজনে একত্রে বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই। আমরা দেশের স্বাধীন নাগরিক। অনেক কষ্টে ওই লালমুখোদের কাছ থেকে আমরা সেটা ছিনিয়ে নিয়েছিলাম। কোনো অবস্থাতেই সেটা খর্ব হোক এটা চাইব না।'

পার্থ বেশ বুঝতে পারছিল গোটা ফ্যামিলি এখনও সেই পরাধীন দেশের বাসিন্দা হয়ে রয়ে গেছে। এঁরা কেউ ইংল্যান্ড-ইন্ডিয়া ম্যাচ দেখেন না। এমনকি প্রীতিলতার ছোটোমামা আইপিএল অবধি দেখেন না কারণ সেখানে ইংল্যান্ডের প্লেয়ার আছে।

প্রীতিলতা বলল, 'স্বাধীনতা কথাটা ইউজ করলেই কেল্লাফতে।'

পার্থ মুচকি হেসে বলল, 'ইন্টারেস্টিং। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি আমারও যথেষ্ট ফিলিংস আছে। কিন্তু শুধু নামের জন্য নিজেকে স্বাধীনতা সাংগ্রামী ভেবে নেওয়ার কনসেপ্টটা এখনও মাথায় ঢুকল না ম্যাডাম।'

প্রীতিলতা বলল, 'ওইটুকু তো মগজ, আর রাখবেন কোথায়? মগজাস্ত্র তো আর সকলের দখলে থাকে না!'

পার্থ বলল, 'চট করে বলুন, প্রিয় রাইটার কে?'

প্রীতিলতা বলল, 'শরৎচন্দ্র থেকে নারায়ণ সান্যাল হয়ে শীর্ষেন্দুবাবুর বাড়ি ঘুরে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইন্দ্রনীল সান্যাল থেকে সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মোটামুটি সবাই।'

পার্থ হেসে বলল, 'ব্রিলিয়ান্ট। ঐতিহাসিক পড়া হয়?'

প্রীতিলতা বলল, 'শরদিন্দু থেকে শ্রীপারাবত পড়েছি সব।'

'তাহলে এসব নিয়ে ফোনে কথা হতেই পারে।'

প্রীতিলতা হেসে বলল, 'এই একটা ব্যাপারেই তো মিল পেলাম আপনার সঙ্গে। বাকি তো সব অমিল।'

পার্থ বলল,'যেমন?'

প্রীতিলতা হেসে বলল, 'আমি কিন্তু হ্যান্ডু ছেলে দেখলে রীতিমতো তাকাই। না অপলক নয় আড়চোখে। লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও থেকে হৃত্বিক রোশন এদের পর্দায় দেখলে কেমন একটা শিরশির করে। আপনার মতো নেহাত ভালোমানুষ নই। আর আমার এই ভালোমানুষ লুকটা মায়ের দেওয়া। মা বলেছিল, পাত্রপক্ষ এলে এমন শান্ত হয়ে থাকতে হয়।'

ব্ল্যাক জিন্সের ওপরে রেড টপ পরে দাঁড়িয়ে আছে প্রীতিলতা।

পার্থ বলল, 'আজ চলি। ওই যে বাবা-মা সবাই উঠে পড়েছে।'

ওদের দুজনের মতামতের ওপরে বিষয়টা ঝুলিয়ে রাখা কারোরই ইচ্ছে ছিল না। সকলের বেশ পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। লজ বুকিং থেকে ক্যাটারিং, মেনু থেকে নমস্কারি এসব নিয়েই কথা বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আচমকা ব্যক্তিস্বাধীনতার মতো গোলমেলে কথার প্রবেশে বিষয়টা ঘেঁটে গেছে। অগত্যা মুখ বেজার করেই দু-তরফের বিদায় পর্ব শেষ হল।

দিন তিনেক পরে ফোন এল পার্থর।

'আপনার সময় হবে, তাহলে আজ কফি খেতে যাওয়া যেত।'

প্রীতিলতা বলল, 'তাহলে অফিস ছুটির পরে যাওয়া যেতে পারে।'

পার্থ ঘড়ি দেখছিল আর হাতের কাজ সারছিল। মেয়েটা যেন প্রথম দিনই ওকে ইররেস্পন্সিবল না ভাবে। টাইমের ব্যাপারে। ঠিক ছ-টায় পৌঁছাবে ক্যাফে কফিতে।

সাড়ে পাঁচটা বাজে, এবারে উঠতে হবে। আজকাল কলকাতার রাস্তায় যা জ্যাম বেড়েছে তাতে গাড়ি নিয়ে যেতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাই যত কাছেই হোক আধঘণ্টা লেগে যাবে। হাতের ফাইলগুলো অফিসের লকারে ঢুকিয়ে দিয়ে চাবিটা ঘুরিয়ে পকেটে রাখতে না রাখতেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার রাহুল এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'পার্থদা একটা মেয়ে। আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সিঁড়িতে একটা মেয়েকে দেখলাম। সে তোমায় খুঁজছে পার্থদা।'

পার্থ বলল, 'তো এতে এত চমকাবার কী আছে?'

রাহুল বলল, 'না, মানে—মেয়েটা মারাত্মক রকমের কী বলব, হট। না মানে সরি...সুন্দরী। মেয়েটা কে পার্থদা?'

রাহুলের এসব ব্যাপারে কৌতূহলের কথা ব্রাঞ্চের কারোর অজানা নয়। ছেলেটা কাজে মারাত্মক এফিশিয়েন্ট। কিন্তু মেয়ে দেখলেই ওর উত্তেজনা একটু বেড়ে যায়।

পার্থ বিরক্তির স্বরে বলল, 'আমি তো তাকে এখনও দেখিনি রাহুল, তাই জানি না।'

রাহুল বলল, 'জিজ্ঞাসা করল "পার্থ বর্মণ আছেন? ওঁকে বলুন বাইরে একজন ওঁর জন্য ওয়েট করছে।" ভাবা যায়! তোমার জন্য অমন একজন ওয়েট করছে।'

পার্থ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, অলরেডি চল্লিশ বেজে গেছে। এখন আবার কোন মেয়ে ওয়েট করছে! প্রীতিলতা নিশ্চয়ই ক্যাফেতে ওয়েট করবে। ছি ছি, ফার্স্ট ডেটে রেপুটেশনটা খারাপ হল।

বাইরে বেরিয়েই ঝটকাটা লাগল। ব্ল্যাক জিন্সের ওপরে রেড টপ পরে দাঁড়িয়ে আছে প্রীতিলতা। ওকে দেখেই চমকে উঠেছে পার্থ। সেই লম্বা হাতা ব্লাউজ আর পিঠে চাপা দিয়ে শাড়ি পরা মেয়েটার কথা মনে পড়ল।

পার্থর মুখ দেখে প্রীতিলতা বলল, 'এত চমকাচ্ছেন কেন? কফি আমন্ত্রণ জানিয়ে ভুলে গেলেন নাকি!'

পার্থ বলল, 'আরে না না। চলুন। আসলে এই পোশাকে...'

প্রীতিলতা বলল, 'সরি, শাড়ি কিন্তু আমি অকেশনালি পরি। সেদিন মেয়ের ওপরে মায়ের অধিকার, সেন্টিমেন্ট জয়ী হয়ে গিয়েছিল। তাই শাড়ি পরেছিলাম মা যেভাবে বলেছিল।'

পার্থর দিকে তাকিয়ে প্রীতিলতা বলল, 'আপনার অ্যাসিস্টেন্ট দেখলাম মহিলা সম্পর্কে বেশ ইন্টারেস্টেড। নিজের ফর্টিন ফাদার্সের পরিচয় দিয়ে দিলেন মুহূর্তে। আপনাকেও তো বেশ উৎসাহী হয়েই গিয়ে জানালেন হট একটা মেয়ে ওয়েট করছে।'

পার্থ মাথা নীচু করে বলল, 'রাহুলের বয়সটা কম তো!'

প্রীতিলতা হেসে বলল, 'বাইরে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেনে যেভাবে ঘড়িটা উল্টো পরে ছুটে বেরিয়ে এসেছেন এতেই আমি নিশ্চিন্ত হলাম। যাক মেয়েদের প্রতি আপনার নিরাসক্তি নেই।'

পার্থ কাজ করতে করতেই ঘড়িটা খুলে রেখেছিল, এটা ও প্রায়ই করে। বেরোনোর আগে পরে নেয়। আজও সেভাবেই তাড়াহুড়ো করে ঘড়িটা পরে বেরিয়ে এসেছে। প্রীতিলতা সেদিকে তাকিয়েই এমন একটা বোমা ছুড়ে দিল ওর দিকে।

পার্থ বেশ বুঝতে পারছে প্রীতিলতাকে দেখে প্রথম যে ভাবনাটা ওর মাথায় এসেছিল সেটা হল, নেহাতই আনস্মার্ট বোকা বোকা মেয়ে। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে, মেয়েটা ধোনির ফ্যান। হেলিকপ্টার শটে রীতিমতো পারদর্শী।

গাড়িতে ওর পাশে বসে সিটবেল্ট পরতে পরতে প্রীতিলতা বলল, 'একটা কথা বলুন আপনাদের কে শিখিয়েছে যে মেয়েদের সামনে গিয়ে মহিলাদের প্রতি কোনো ইন্টারেস্ট নেই বললে মেয়েরা বীভৎস খুশি হবে? এমন ভুলভাল ট্রেনিং যে সব বন্ধুদের কাছ থেকে পেয়েছেন তাদের এককাপ চা-ও আর ফ্রি-তে খাওয়াবেন না বুঝলেন? এরা ভুলভাল ইন্সট্রাকশন দেয়। আমি আপনাকে শিখিয়ে দিচ্ছি কী বলবেন!

বলবেন, চোখ থাকলে সবকিছুই দেখা যায়। তেমনি অবশ্যই দেখি, কিন্তু আপনার মতো আর দেখলাম কোথায়? এসব বলতে হবে বস।'

পার্থ হেসে ফেলে বলল, 'আপনি কি লাভগুরু নাকি? প্রেম আদৌ করেছেন নাকি বন্ধুদের ট্রেনার হিসাবেই জীবন কাটিয়ে দিলেন?'

প্রীতিলতা বলল, 'বড়ো দুর্বল জায়গায় আঘাত করলেন মিস্টার। প্রেমে বড্ড বেশি চোট পেয়েছিলাম কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে। হিস্ট্রির পার্ট-টাইমারের প্রেমে পড়েছিলাম। বলতে পারেন যাকে বলে হাবুডুবু। না না, একতরফা মোটেই নয়। সে প্রফেসরও ক্লাসে ঢুকে মুচকি মুচকি হাসতেন আমায় দেখে। কখনো তাকাতেন আনমনে। ক্লাসসুদ্ধু মেয়েরা বুঝেছিল উনি আমাকে পছন্দ করেন। আমিও সেটা ধরেই এগোচ্ছিলাম। মেইন সাবজেক্ট মানে অনার্সের সাবজেক্ট ইংলিশ বাদ দিয়ে পাসের সাবজেক্ট হিস্ট্রি পড়ে পড়ে পাগল হতে বসেছিলাম। আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যাঙ্গুইন ছিলাম যে, অনার্সে আমি ফেল করলেও হিস্ট্রিতে একশোয় আশি পেতাম।'

পার্থ সিগন্যালে গাড়ি থামিয়ে বলল, 'তারপর? সেই ভরাডুবি প্রেমের নৌকোটার হল কী? মানে সে নৌকো যে ভাসেনি সেটা তো বেশ বুঝতে পারছি। না হলে আপনি আমার গাড়িতে এই মুহূর্তে বসে থাকতেন না।'

প্রীতিলতা বলল, 'ভাসা দূরে থাক নৌকোটা একশো মিটারও চলতে পারেনি।

আমি একদিন লাঞ্চব্রেকে সাহস করে এগিয়ে গেলাম টিচার্স কমন রুমে। ওখানে গিয়েই থরথর বুকে ডাকলাম, ''অরবিন্দ স্যার...'''

পার্থ বলল, 'ইনিও ঋষি অরবিন্দ? উফ্, পারা যায় না।'

প্রীতিলতা বলল, 'আহা এই সময় কেউ নাম নিয়ে ভাবে? ওটা অতি তুচ্ছ মশাই। অরবিন্দ স্যার একমুখ হাসি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন, ''বলো প্রীতিলতা।''

আমি ওঁকে ডেকে লবিতে নিয়ে এসে বললাম, ''আর লুকোছাপা করে লাভ নেই। আমি আপনাকে পছন্দ করি।''

স্যার বললেন, ''আমিও তোমায় পছন্দ করি।''

আমি বললাম, ''আমি আপনাকে ভালোবাসি।''

স্যার বললেন, ''আমি আমৃত্যু চিরকুমার থাকব মা-কে কথা দিয়েছি। তাই বিবাহ বা প্রেম এসব আমি করতে পারব না প্রীতিলতা।''

আমি বললাম, ''তাহলে ক্লাসে তাকাতেন কেন?''

উনি বললেন, ''তাকাতে কোনো বাধা নেই। শুধু প্রেম আর বিয়েতে বাধা।''

আজব ক্যারেক্টার বুঝলেন। তারপর যখন মাস্টার্স করছি তখন একদিন মেট্রোতে দেখা স্যারের সঙ্গে। উনি সন্ন্যাস ছেড়ে রীতিমতো বিয়ে করেছেন। সুন্দরী বউকে বগলদাবা করে দাঁড়িয়েছিলেন। আমায় দেখে বললেন, ''এই যে আমার ছাত্রী প্রীতিলতা। ভারী মিষ্টি মেয়ে।''

আমার ইচ্ছে করছিল বলি, ''স্যার ইনি কি আপনার সাধনসঙ্গিনী?''

স্যার তার আগেই বললেন, ''আমাদের সেই ক্লাস এইট থেকে প্রেম বুঝলে প্রীতিলতা। বিয়েটা করলাম গতবছর।''

ভাবুন একবার, কত বড়ো নচ্ছার লোক।'

পার্থ হাসতে হাসতেই গাড়ি পার্ক করিয়ে বলল, 'ইন্টারেস্টিং কিন্তু। আপনাকে রীতিমতো মুরগি করে দিল। লোকটার এলেম আছে বলতে হবে। আপনাকে বোকা বানানো যার-তার কম্ম নয়।'

কফি খেতে খেতে পার্থ বলল, 'তাহলে সাইকোলজিক্যাল অ্যানালিসিস করে কী বের করলেন আমার সম্পর্কে? সেটাই তো শোনা হল না।'

প্রীতিলতা বলল, 'বলব?'

পার্থ কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, 'বলুন।'

'আপনি বেশ কয়েকটা মিথ্যে বলেছেন নিজের সম্পর্কে। 'আপনি বেশ কয়েকটা মিথ্যে বলেছেন নিজের সম্পর্কে।

'আপনি বেশ কয়েকটা মিথ্যে বলেছেন নিজের সম্পর্কে। মেয়েদের প্রতি আপনার একেবারেই ইন্টারেস্ট নেই। নেহাত বাড়িতে বিয়ের প্রেশার দিচ্ছে তাই মেয়ে দেখতে আসা; এটা ডাহা মিথ্যে। আপনার নিজের যথেষ্ট ইচ্ছে আছে। শুধু ইচ্ছে নয়, রীতিমতো চয়েসও আছে। যাকে-তাকে বিয়ে করবেন এমন নয়। শাড়ি জড়ানো আনস্মার্ট প্রীতিলতাকে দেখে ওইজন্যই আপনার বাঁ দিকের ভ্রুটা বিরক্তিতে একটু বেঁকে গিয়েছিল। আপনাদের পাড়ার অনন্যা নামের এক সুন্দরীর প্রতি আপনার মারাত্মক দুর্বলতা ছিল এককালে। হাতে না হোক ঘরের কোনো একটা কোণে একবার বড়ো হাতের A লিখে রেখে দিয়েছিলেন। অনন্যা আপনাকে পাত্তা দেয়নি। কারণ সে অলরেডি এনগেজড ছিল। সেই কথা জানতে পেরে গুড বয় পার্থ একদিন বেশ ড্রিংক করেছিল। দুঃখ ভোলার চেষ্টা করেছিল। তারপর বাবার কাছ থেকে উত্তম-মধ্যম অপমানিত হয়ে আর জীবনে ওসব দিকে হাঁটেননি। তবে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, বিয়ে করলে অনন্যার মতো স্মার্ট আর সুন্দরী বিয়ে করবেন। তাই আমায় এক নজরে দেখে মনে হয়েছিল, স্বাধীনতার আগের এমন বস্তুকে নিয়ে আপনি করবেনটা কী!'

পার্থর কফির কাপ পড়ে আছে টেবিলে। ও চুমুক দিতে ভুলে গেছে।

প্রীতিলতা ওয়েটারকে ডেকে আর-এক কাপ কফি দিতে বলল। হেসে বলল, 'কফিটা তো চুমুক দিতেই ভুলে গেছেন।'

পার্থ সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলল, 'এসব ইনফর্মেশন আপনি কোথায় পেলেন? মানে কীভাবে পেলেন?'

প্রীতিলতা হেসে বলল, 'হোমওয়ার্ক না করেই স্কুলে ঢুকে যাওয়ার মেয়ে আমি নই।

আপনি এমনিতে বেশ সরল মনের। কিপ্টে নন। প্রায়ই ক্লাবের বন্ধুদের খাওয়ান। আমাকে দেখে গিয়ে ওদের বলেছেন, ''শাড়ি না পরে হট প্যান্ট পরলে মেয়েটাকে বেশি মানাবে।'''

পার্থ গরম কফিতে চুমুক দিয়ে জিভের ডগা পুড়িয়ে ফেলেছে। এমন বাউন্সার খেতে খেতে নিজের নাম ভুলে যাবে পার্থ। আচমকাই হয়তো নিজেকে লর্ড কর্নওয়ালিস ভাবতে শুরু করবে। প্রীতিলতা যেভাবে ওকে নিয়ে লোফালুফি করছে তাতে ওর নিজেকে ব্রিটিশ ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না। ঠিক যেমন আট-হাত ধুতি-পরিয়েরা কোট-টাইকে একসময় নাস্তানাবুদ করে দেশে ফেরত পাঠিয়েছিল তেমনই নামের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা নিয়েই পার্থকে বলে বলে ঘায়েল করছে প্রীতিলতা।

এই মেয়েকে ও আনস্মার্ট বলে বাতিল করবে ভেবেছিল, এখন তো অন্য কারণে বাদ দিতে হবে। এর কাছে যেভাবে ধরা পড়ে যাচ্ছে ও তাতে ভবিষ্যতে সংসারে ঘোর বিপদ ডেকে আনবে।

পার্থর ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখটা দেখে মুচকি হেসে প্রীতিলতা বলল, 'এত টেনশন করবেন না। আপনার বন্ধুরা অনেকেই চায় আপনার উনত্রিশের স্ট্রং উইকেটটা ডাউন হয়ে যাক। তারাই আপনার সঙ্গে এসব বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমায় ফেসবুকের ইনবক্সে মেসেজ করে এসব তথ্য দিয়েছে। আপনার বেশির ভাগ বন্ধুরা তো বিয়ে করে ওই সন্ধের দিকে আড্ডায় এসেই বলে, ''দেখ ব্রো, এ জীবনের পাপ যদি এই জীবনেই স্খলন করে স্বর্গে যেতে চাস তাহলে অবশ্যই একটা বিয়ে করে নে। বিশ্বাস কর, ওর থেকে বড়ো পাপ আর কিছু নেই। জানবি বিয়ে করে নিয়েছিস মানে এ জীবনের পুরুষ জন্মের পাপ তুই মিটিয়ে ফেললি।''

সেখানে আপনি ফুরফুরে মেজাজে অফিস করে আড্ডায় যান। হাতে বাজারের ব্যাগ থাকে না। বউয়ের আয়রন করা শাড়ির

প্যাকেট থাকে না। তাই আপনাকে হিংসে করবে না তো কাকে করবে? সেইজন্যই এরা আপনার বিয়েটা যাতে আমার সঙ্গে হয় সেজন্য আমার সব প্রশ্নের উত্তর বাধ্য ছেলের মতো দিচ্ছিল। আর বারবার বলছিল, আপনি ছেলে খুব ভালো। বিয়েটা যেন আমি করি।'

পার্থ হাঁ হওয়া মুখটা বন্ধ করে বলল, 'আমি একবার মাত্র ওদের আপনার ছবি দেখিয়েছি আর নামটা বলেছি। তাতেই ফেসবুকে আপনাকে খুঁজে নিল? বাপ রে! এত কর্মদক্ষতা তো পাড়ার সরস্বতী পুজোর সময় দেখা যায় না!'

প্রীতিলতা হেসে বলল, 'এনিওয়ে যা খোঁজখবর পেলাম তাতে মানুষটা আপনি মন্দ নন। মোটামুটি আপনার বন্ধুদের কনফারেন্স কলের জিস্ট মতো হিসেব করে বুঝলাম, আপনি মানুষটা একটু শান্তিপ্রিয়। ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। মানে টিভির রিমোট আমার হাতেই থাকবে, আমিই হচ্ছি গডফাদার টাইপ নন। তাই এ বিয়েতে আমার তেমন আপত্তি নেই। আপনি আমার সম্পর্কে হোম ওয়ার্ক করুন। তারপর জানাবেন। বাবা আরেকজন পাত্র সামনের সপ্তাহে আনবে বলছিল। আমি বারণ করেছি। দেখুন মশাই আমি মেইন লাইনে চলতে চলতে আচমকা কর্ড লাইনে উঠে যেতে শিখিনি। আপাতত আমার মনে সাময়িকভাবেও আপনার বাস। সেখানের দরজায় তালা না ঝুলিয়েই আরেকটা দরজা ওপেন করার মতো মাল্টি ট্যালেন্টেড আমি নই।

আপনি ''না'' বলে দিলে তখন এ পর্বের শেষে এন্ড লিখে দিয়ে অন্য পর্বে ইন করব।'

পার্থ বলল, 'আপনার কী মনে হচ্ছে... আমার কি এ সম্পর্কে এগোনো উচিত?'

প্রীতিলতা চিকেন নাগেটসে কামড় দিয়ে বলল, 'এর উত্তর আমি দেব কী করে বলুন তো! আপনি ফোন আ ফ্রেন্ড বা ফিফটি ফিফটি অপশন নিতে পারেন।'

পার্থ হেসে বলল, 'আমার নাম কিন্তু পার্থই থাকবে, পাল্টে মহাত্মা গান্ধী রাখতে পারব না।'

প্রীতিলতা বলল, 'আপনি আমায় প্রীতি ডাকতে পারেন। কোনো তাড়া নেই। আপনি ভেবেচিন্তে জানাবেন। ধরুন আপনারা পাঁচজনে মিলে ফুচকা খেতে গেছেন। ফুচকাওয়ালা বলল, ''ঝাল কেমন দেব?''

দেখবেন দলের বাঙাল ছেলেটি লাফিয়ে বলবে, ''বেশি বেশি। কান দিয়ে যেন হাওয়া বাইর হয়, এমন ঝাল দিয়েন।''

আপনি তখন কাঁচুমাচু করে বলার চেষ্টা করছিলেন, মাঝামাঝি দিন। বাকিরাও হয়তো আপনার দলেই ছিল। কিন্তু ওই ছেলেটির ''ঝাল বেশি খাবি না, বাচ্চা নাকি তোরা? ঘটি তোরা মিষ্টি ফুচকা খা...'' এসব শোনার ভয়ে চুপ করে গেলেন।

তারপর আর কী? নাকের জলে চোখের জলে হয়ে আসল আনন্দটাই মাঠে মারা গেল। তাই নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিন। এ তো দুটো মিষ্টি খেয়ে নিলে কমে যাবে। কিন্তু জীবনটা তো সহজ নয়। বিয়েটা আপনার, তাই আমি নয় এই সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে।'

পার্থ চেয়েছিল প্রীতিলতাকে ওদের বাড়িতে ড্রপ করে দিয়ে আসতে। প্রীতিলতা রাজি হয়নি। বলেছিল, 'বাবা-মা দেখলে অকারণ সম্পর্কটাকে বাড়াতে চাইবে। আমি চাই বাইরের কোনো প্রেশার ছাড়া আপনি সিদ্ধান্ত নিন।'

পার্থ নিজের বাড়িতে ঢুকতেই বাবা বললেন, 'তাহলে তুই প্রীতিলতার বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নিলি? ক্ষুদিরামবাবু আজ কল করেছিলেন। ওঁরা অন্য পাত্র আনবেন মেয়ের জন্য।

যদি রাজি না থাকিস তাহলে অযথা ঝুলিয়ে রেখে তো লাভ নেই।'

পার্থ বলতেই যাচ্ছিল, ''ওই স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের সঙ্গে বিয়ে করা কি ঠিক হচ্ছে? এরা নিজেদের নাম নিয়ে রীতিমতো অবসেসড। সবাই যেন রিয়েল চরিত্রে বিলং করে। ওর ছোটোমামার কথাবার্তা তো পুরো ভাষণের মতো। যেন মুক্তি আন্দোলনের নেতা। ওঁদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কাটানো কিন্তু সত্যিই কঠিন। অদ্ভুত একটা জগতে বাস করে ওই পরিবারের লোকজন। তাই 'না' বলে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।''

পার্থর মা বললেন, 'আমার তো বাপু মেয়েটাকে খুবই পছন্দ হয়েছে। যেমন দেখতে তেমনই সুন্দর কথা।'

বাবা বললেন, 'তাছাড়া প্রীতিলতা চাকরিও করে ভালোই। বেশ ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে। আমারও পছন্দ।'

পাশ থেকে জেঠিমা বললেন, 'আমার তো ছবি দেখেই পছন্দ হয়েছিল।'

জ্যেঠু গম্ভীর গলায় বললেন, 'আশা করি পার্থরও পছন্দই হয়েছে। এমন মেয়েকে অকারণে অপছন্দ হতে যাবেই বা কেন?'

পার্থ ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ আমারও পছন্দ হয়েছে।'

নিজের ঘরে ঢোকার আগেই শুনতে পেল ফোনে বাবা বেশ জোরে জোরে বলছেন, 'হ্যাঁ ক্ষুদিরামবাবু, মেয়ে আমাদের সকলের খুব পছন্দ।'

নিজের ঘরে ঢুকতেই হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ ঢুকল, 'আপনাকে বলেছিলাম নিজেই নিজের ফুচকার ঝাল ঠিক করুন, তা নয় সকলের কথাতে রাজি হয়ে গেলেন?'

পার্থ শুধু লিখল, 'জিভটাকে পাল্টে ফেলছি। এবার থেকে ঝাল খেয়ে যেন কষ্ট না হয়।'

হোয়াটসঅ্যাপ ডিপিতে প্রীতিলতার একটা মিষ্টি ছবির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, ''এ জন্মের কোটা পূরণ করতে আমি প্রস্তুত।''❖

সম্পূর্ণ উপন্যাস
নিষ্ক্রমণ
নবকুমার বসু
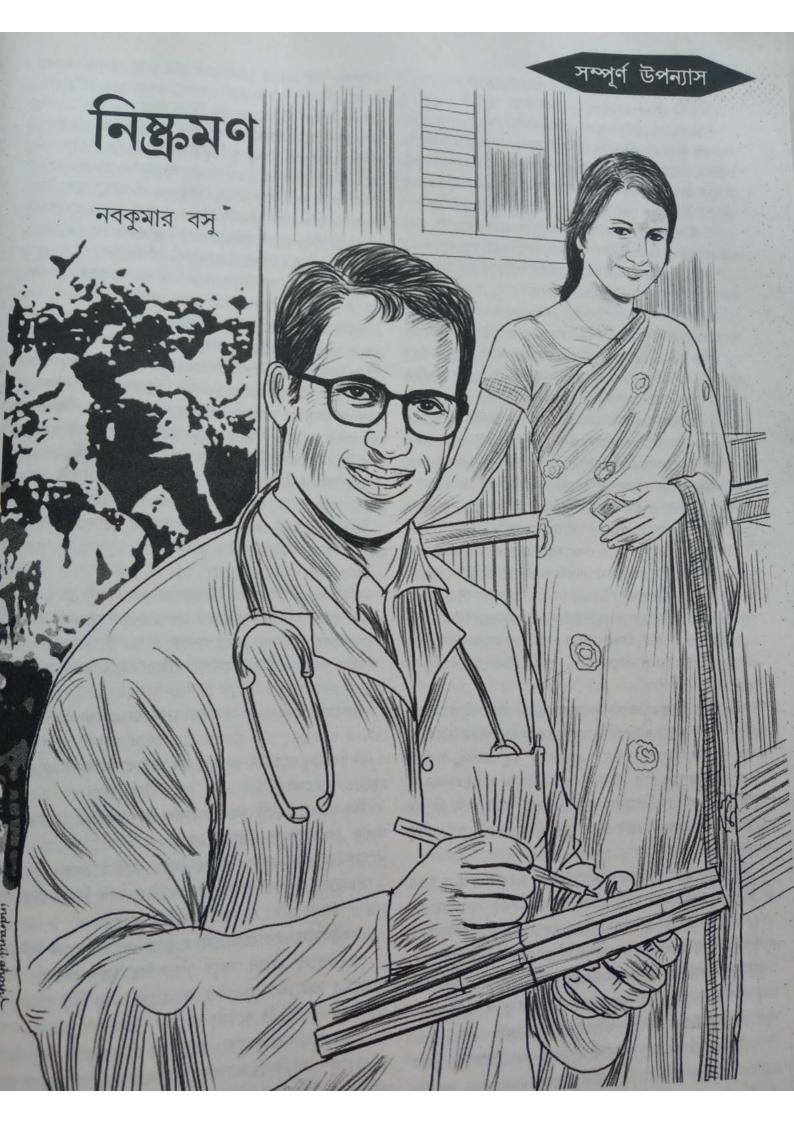
কপাল আর বুকের কাছে দু-হাত জড়ো করে প্রার্থনা সারলেন শ্যামলেন্দু।

চিরকালীন অভ্যাস। অভ্যাস, নাকি সংস্কার? যেটাই হোক, নামে কিছু যায়-আসে না। নামের থেকে মিনিট দুয়েকের সামান্য নিবেদনটুকু, যাকে প্রার্থনা বলা হয়, কোথাও যেন তার জন্য একটুখানি তুষ্টি অনুভূত হয়। আর কিছু না, ওইটুকুই। সত্যি বলতে কি, তুষ্টির তো আর কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না! শারীরিক হলে তবু নাহয় কথা ছিল। মানসিক তুষ্টি নেহাতই এক অনুভূতি ছাড়া আর কী! বলা যায় ভালোলাগার অনুভূতি। একটু মনের জোরও হয়তো।

অথচ ওই দু-মিনিট প্রার্থনার সময় তিনি সত্যি কি নির্দিষ্ট কোনো কথা বলেন? মন্ত্রোচ্চারণ করেন শ্যামলেন্দু!

নাহ্ তার কোনো ঠিক নেই। সেই বহুকাল আগে...বোধহয় তেরো-চোদ্দো বছর বয়সে উপনয়নের পরে বাধ্য হয়ে কিছু সংস্কৃত মন্ত্র মুখস্থ করতে হয়েছিল। তার মধ্যে সকালে ঘুম থেকে উঠে সূর্যপ্রণাম, আর দিনে একবার করে গায়ত্রী জপ করতে হয়েছিল কিছুদিন। থ্যাঙ্ক গড...ওসব নিয়মনীতি খুব বেশিদিন ধরে রাখতে হয়নি। কেউ জোরও করেনি। পইতে বা উপবীত হিসেবে কয়েকগাছি সুতো তারপরেও কিছুদিন বুক-পিঠ আর কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলত। ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে যার কোনো বোধ নেই, থাকার কারণও নেই, তার কাছে কয়েকগাছি সুতোর স্বীকৃতির কীই-বা দাম!

কালের নিয়মে তাও গেছে। একমাত্র 'মুখোপাধ্যায়' পদবিতে বংশ-পরিচয়টুকু যাহোক থেকে গেছে।

সংক্ষিপ্ত প্রার্থনাটুকু সেরে চেম্বারের বাইরে এলেন শ্যামলেন্দু। ফেব্রুয়ারির শেষে সকালের আলোয় এখনও তাপের ঝাঁঝ মেশেনি, বরং হালকা হাওয়ায় সামান্য হিমেলভাব মিশে রয়েছে। সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। আটটা থেকে নার্সিংহোম-এর স্টাফদের শিফ্ট বদল হয়। অধিকাংশই নার্সিংস্টাফ, নয়তো আয়াদের আসা-যাওয়া চলে এইসময়। নাইটস্টাফরা ফিরে যাবে, ডে-ডিউটির মেয়েরা জয়েন করবে।

সাধারণত নিজের কোনো রুগির অপারেশন থাকলেই শ্যামলেন্দু সেদিন সকাল-সকাল একবার নীচেয় আসেন। অপারেশনের সময়টাও একটা ব্যাপার। দুপুরবেলা কিংবা এমার্জেন্সি কিছু থাকলে, সকালে নামার কিংবা সময়ের ঠিক রাখা যায় না। তবে সকাল সাড়ে আটটা-নটায় অপারেশন করাটাই পছন্দ করেন তিনি...বিশেষ করে যদি আবার অপেক্ষাকৃত একটু বড়ো অপারেশন বা জটিল কিছু থাকে।

নিজেদের তৈরি প্রতিষ্ঠান বলেই অবশ্য শ্যামলেন্দু এখনও প্রায়ই নিজের পছন্দের সময়টা ধরে রাখতে পারেন। কিন্তু সব সময় হয় না। কেননা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে, অন্যান্য ডাক্তারদের সুবিধের দিকেও নজর রাখতে হয় বইকি! চোখের ডাক্তার স্বপ্না পাল যখন অপারেশন করেন, সকাল থেকে একেবারে ঘণ্টাতিনেকের জন্য অপারেশন থিয়েটার বুক করেন। পর পর অপারেশন করেন পাঁচ থেকে আটজন রুগির। অধিকাংশই ক্যাটারাক্ট অবশ্য।

সেই সময়েই শ্যামলেন্দুর কোনো কেস করার থাকলে, তাঁকে সময়ের ব্যাপারে অ্যাডজাস্ট করতেই হয়। এমনও হয় কখনও, শ্যামলেন্দু অন্য কোনো নার্সিংহোমে রুগি ভর্তি এবং অপারেশন করেন। রুগিদের পছন্দ অনুযায়ীও অবশ্য কখনো সাড়া দিতে হয়... সেসবই জীবিকা বা পেশার দায় কিংবা নিয়ম।

তবে নিজেদের জায়গায় কাজ করার কিছু অতিরিক্ত সুবিধে তো থাকেই। সময় ছাড়াও অনেক কিছু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই যেমন আজ অপারেশনের ঘণ্টাখানেক আগেই, নীচেয় এসে, একটু প্রার্থনা বা ঠাকুর প্রণাম সেরে, রুগিকেও একবার দেখে নিতে পারলেন। দুটো কথা বললেন...কেমন আছেন...রাতে ঘুমিয়েছেন তো...! সামান্য এটুকু সৌজন্য বা কথোপকথনের কিছু মূল্য আছে। রুগির ভালো লাগে, ডাক্তারও নিশ্চিন্ত হন।

রুগির সঙ্গে দেখা করে এসে আবার চেম্বারে ঢুকলেন শ্যামলেন্দু। সঠিক বলতে গেলে অবশ্য রোগিণী।

আলট্রাসোনোগ্রাফির প্লেটগুলো নিজে আর একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে চাইলেন। গলব্লাডার-লিভার-প্যাংক্রিয়াস-এর সোনোগ্রাম। রেডিয়োলজিস্ট দেখে রিপোর্ট দিয়েছেন ঠিকই— 'গলব্লাডার প্যাকড় উইথ স্টোন...' ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও আর কিছু আছে কিনা, সবসময়ই নিজে একবার চেক করেন শ্যামলেন্দু। এসবই বিদেশে কাজ করার সময় থেকে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। একেবারে শিক্ষানবিশি পর্যায় থেকে বিলেতে শিখিয়েছিল, অন্যরা সবকিছু দেখেশুনে নিলেও এবং দিলেও, সার্জেন হিসেবে যতটা সম্ভব তুমি নিজে দেখে নেবে। হয়তো 'অধিকন্তু ন দোষায়'... এভাবেও ভাবা যায়।

ভিউবক্স-এ প্লেট রেখে শ্যামলেন্দু আলো জ্বেলেছেন, তখনই প্রশান্ত চেম্বারের বাইরে থেকে ডাকল।

স্যার একটু ভেতরে আসব?

নার্সিংহোমের অপারেশন থিয়েটারের সাহায্যকারী বা ওটি বয় হলেও প্রশান্ত আসলে সবদিকে নজর রাখে। শান্ত এবং ভদ্র।

শ্যামলেন্দু ডাকলেন।—হ্যাঁ প্রশান্ত এসো। কী ব্যাপার?

ডক্টর সোম একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন...পৌঁছোতে মিনিট পনেরো দেরি হবে।

শ্যামলেন্দু হাসলেন।—তার মানে সকাল থেকে অন্য কোনো কেস-এ রয়েছেন!

সেসব কিছু বলেননি আমায়...শুধু আপনাকে কিংবা ম্যাডামকে জানাতে বলেছেন।

ঠিক আছে...। একটু থেমে শ্যামলেন্দু যোগ করলেন, ফেরার জন্য আবার তাড়াহুড়ো না করলেই হয়।...

আসছি স্যার। প্রশান্ত চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল।

শ্যামলেন্দু বুঝতে পারছিলেন, নার্সিংহোমের শিফ্ট চেঞ্জ-এর ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। প্রশান্তও যথারীতি ব্যস্ত।

আলট্রাসাউন্ড-এর প্লেটগুলো তখনও চোখের ওপর ভাসছে। অনেকগুলো স্টোন আছে পিত্তথলির মধ্যে সন্দেহ নেই। রিপোর্টেও তাই লিখেছে। কিন্তু তা ছাড়াও আর কিছু আছে কি! এই ভাবনাও ডাক্তারি অভিজ্ঞতার ফল। সবসময়ই ভেবে দেখো, যা দেখা যাচ্ছে এবং বোঝা যাচ্ছে, তা ছাড়াও আর কিছু আছে বা থাকতে পারে কিনা! সন্দেহবাতিক হওয়া নয়, কিন্তু সন্দেহ হলে অনুসন্ধিৎসু হওয়াটা সার্জেনদের পক্ষে ভালো।

শ্যামলেন্দু খেয়াল করেছেন, কলকাতার নামকরা প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির রিপোর্টগুলোও আজকাল যেন কীরকম একটা জটিল ভাষায় লেখে। সবাই ইংরিজিতেই রিপোর্ট দেয়, কিন্তু অর্থটা কেমন ধোঁয়াটে মনে হয়। আইনি ভাষার মারপ্যাঁচের মতো...কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেন এরকম হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে এভাবে রিপোর্ট লেখে।

যাই হোক, এসবই বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার টেকনিক বা সীমাবদ্ধতা। সবাই নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে চলতে চায়। দেশে ডাক্তারি পেশায় থাকতে গেলে এসব নিয়েই চলতে হবে। এমনিতেই ডাক্তাররা কখনোই নিজের সব মনে হওয়ার কথা খোলাখুলি রুগিদের বলতে পারে না। হয়তো উচিতও না। নানান ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে। হয় বাড়িয়ে বলছে বা ভয় দেখাচ্ছে ডাক্তার, নয়তো কনফিডেন্স কম...দু-রকমই ভাবতে পারে।

যাই হোক অপারেশনের সময় সবই স্বচক্ষে দেখে নিতে হবে শ্যামলেন্দুকে।

চেম্বারের বাইরে এসে দেখলেন, নার্সিংস্টাফদের আসা-যাওয়া চলছে। কেউ কেউ আবার হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেয়ে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে, তাও খেয়াল করলেন। অথচ তা হওয়ার কোনো কারণ নেই। আসলে ওই...তিনি যে শুধু চিকিৎসক বা সার্জেন তাই না, 'শুকতারা' নার্সিংহোমের ওনার বা মালিকও তো! 'মালিক' শব্দটার মধ্যেই কোথায় যেন একটু প্রভুত্ব ফলানোর মতো ভুরু তোলার ব্যাপার আছে। তোমরা আমার অধীন।

নাহ্ শ্যামলেন্দুর নিজের কিংবা তাঁর স্ত্রী অ্যাঞ্জেলা কারুরই সেরকম মানসিকতা নেই। বরং তার উল্টোটাই আছে। একটা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চালাতে গেলে, জড়িত সকলকেই নিজের কাজটুকু ঠিকমতো করতে হবে। আর সেই নিরিখে দেখতে গেলে, ডাক্তার থেকে ওয়ার্ডবয় পর্যন্ত সকলেই তো স্টাফ। দায়িত্বের তফাত আছে, রকমফের আছে। তাহলে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের মতো জায়গায়, ওপর থেকে নীচতলার সব কর্মীদের দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়েই অসুস্থ রুগির সুস্থ হয়ে ওঠা এবং চিকিৎসালয়ের সুনাম টিঁকে থাকে। সেই হিসাবে তাঁরা সকলেই তো সহকর্মী।

দশ বছর আগে অবশ্য শ্যামলেন্দু যখন বিলেত থেকে ফিরে এসে এই 'শুকতারা' নার্সিংহোম শুরু করেছিলেন, তখন এসব ভাবনাও ছিল না, অভিজ্ঞতাও ছিল না। বরং অ্যাঞ্জেলার সে তুলনায় ডেভনশায়ার য়্যুনিভার্সিটি হাসপাতালের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে, ওয়ার্ড ম্যানেজার-এর কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল অনেক বেশি। নার্সিংস্টাফ হিসাবে ওয়ার্ড ম্যানেজার-এর দায়িত্বই সব থেকে বেশি বলে মনে করা হত ও দেশে।

সত্যি বলতে কি, শুকতারা নার্সিংহোমের তো অন্যতম স্তম্ভই হচ্ছে অ্যাঞ্জেলা মুখার্জি।

নামেই তাঁর পরিচয়ের অনেকটা স্পষ্ট। প্রথম নাম অ্যাঞ্জেলা থেকে অ্যাঞ্জি, স্বভাবতই পশ্চিমি দেশের বিদেশিনি এবং হ্যাঁ শ্বেতাঙ্গিনীও। পদবি ছিল প্যারোট। বেশ আশ্চর্যের কথাই বটে, আমাদের দেশের মতোই সুদূর ইয়োরোপেও মানুষের পদবি আর পরিচিতির মধ্যে অনেক সময়ই পশু-পাখির নাম থেকে শুরু করে বংশানুক্রমিক জীবিকার নামও প্রতিফলিত হয়। কে জানে, হয়তো পৃথিবীব্যাপী মনুষ্যজাতির ভাবনার সাযুজ্যই এহেন প্রতিফলন ঘটায়! যাক সে কথা।

মিস্ অ্যাঞ্জেলা প্যারোট অবশ্য স্বেচ্ছায়ই স্বামীর পদবি গ্রহণ করে মিসেস অ্যাঞ্জেলা মুখোপাধ্যায় তথা মুখার্জিতে পরিবর্তিত নাকি রূপান্তরিত হয়েছিলেন এবং তাও আজ সতেরো-আঠারো বছর আগেকার কথা তো বটেই। আসলে মানুষে-মানুষে হার্দিক সম্পর্কের ব্যাপ্তি আর রসায়ন হয়তো আবহমান কাল ধরেই ভৌগোলিক সীমানাকে অগ্রাহ্য করেছে। তরুণ শল্যচিকিৎসক তথা সার্জেন শ্যামলেন্দু মুখার্জি; পরিপূর্ণভাবেই ভারতীয় বঙ্গসন্তানের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের পরিণতিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গিনী অ্যাঞ্জেলা প্যারোট। যমজ সন্তানের জনক-জননীও হয়েছিলেন মুখার্জি দম্পতি ওদেশে থাকাকালীন। একইসঙ্গে রানু ও শানু যথাক্রমে কন্যা ও পুত্রের জন্ম হয়েছিল ডেভনশায়ারে।

অথচ সত্যি কি তখনো কোনোদিন শ্যামলেন্দু বা অ্যাঞ্জেলার ভাবনার আকাশে কোনো 'শুকতারা'র অস্তিত্ব ছিল!

না শুধু শুকতারা কেন! এমনকী এই ভারতবর্ষের বঙ্গদেশ, কলকাতা শহরেই ফিরে আসা, জীবনযাপনের সূচনা, জীবিকায় স্থিতু হওয়ার কোনো আবছা ছবিও কি আঁকা ছিল?

আজ এত বছর পরেও সেই বিস্মিত প্রশ্নের অভিঘাতে অবাক হয়ে যান শ্যামলেন্দু। কী বিচিত্র, অজানা বিস্ময় আর আবছায়া মাখা কুয়াশায় ভরা এ জীবন! কোন উৎস থেকে কোন মোহনার দিকে যায় কে বলতে পারে!

নতুন বাড়ির সিঁড়ির দিক থেকে একটি স্নিগ্ধ, পরিচিত, সুগন্ধের আভাস পেয়ে সামান্য সচেতন হলেন শ্যামলেন্দু। এই গন্ধ শুধু তাঁর না, নার্সিংহোমের অন্যান্য স্টাফ, রেসিডেন্ট ডাক্তার, সিস্টার-নার্স-ক্লার্ক...সকলেরই পরিচিত। অ্যাঞ্জেলা যখনই শুকতারার লাগোয়া নতুন বাড়ি থেকে নার্সিংহোমে ঢোকেন, এই সুগন্ধের আবহ তিনি সঙ্গে নিয়েই আসেন। একইসঙ্গে তাঁর শান্ত ব্যক্তিত্ব, মিষ্টি কণ্ঠের সম্ভাষণ এবং ব্যতিক্রমী অথচ আন্তরিক, বর্ণময় রূপচ্ছটায়, বিনয়ী আচরণে সকলেই যেন স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গীকারে ধরে নেয়, এতক্ষণে একটি দিনের প্রকৃত কর্মোদ্যমের সূচনা হল। এতক্ষণ একটা ঢিলেঢালা প্রস্তুতি চলছিল...এবার 'ম্যাডাম' এসে পড়েছেন। সচেতন হতে হবে না, কিন্তু সতর্ক হতে হবে সবাইকে। ম্যাডাম কখনই কাউকে উচ্চকিত কণ্ঠে কিছু বলেন না। তিরস্কার করাও তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। অথচ তাঁর উপস্থিতি একটা ডিসিপ্লিনের আবহ রচনা করে—যা একটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক প্রয়োজন।

চেম্বারের সামনে শ্যামলেন্দুকে দেখে আগে সেদিকে এগিয়ে গেলেন অ্যাঞ্জেলা।

স্নান সেরে আসা এবং নিয়মিত ভঙ্গিতে শাড়ি পরিহিতা শ্বেতাঙ্গিনী অ্যাঞ্জেলা স্বয়ং যেন এক শুদ্ধতার প্রতীক। আজ তিনি হালকা সবুজ বর্ণের মোলায়েম তাঁতের শাড়ির সঙ্গে একই রঙের হাতকাটা জামা পরেছেন। তাঁর স্বচ্ছন্দ চলনই বলে দেয় শাড়ি পরায় রীতিমতো অভ্যস্ত তিনি। শুকতারা-র যাবতীয় কর্মীবৃন্দই জানেন, 'ম্যাডাম' মেমসাহেব হলেও, একমাত্র ধবধবে সাদা গায়ের রং

ব্যতীত, তাঁর আচার-ব্যবহার থেকে শুরু করে খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত...সবটাই একেবারে ঘরোয়া বঙ্গনারীর উদাহরণের মতো। হ্যাঁ, তাঁর চোখের তারাটি অবশ্য সমুদ্রনীল। কিন্তু মুখের ভাষাটি যে দিনে দিনে এমনই সাবলীল বাংলায় রূপান্তরিত হতে পারে, তা যেন প্রকৃতই বিস্ময় এখনও অনেকের কাছে। প্রায়শ এমনও ঘটে, অজানা-অচেনা কেউ প্রথম দর্শনে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, খুব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া থেকেই নিজেদের মতো ইংরিজিতে শুরু করেন।

ম্যাডাম বুঝতেই পারেন, দোষটা তাঁদের না। তাঁরই গাত্রবর্ণ, তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ বছর বয়েসের শরীর, স্বাস্থ্য, নীল চোখের তারা, ধূসর বাদামি ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা কেশরাশি...এই সবেরই সম্মিলিত দর্শন প্রতিক্রিয়া তাঁদের ভাষাকে ইংরিজিতে পরিণত করে। না, তিনি অপ্রতিভ হন না। বরং যথাসম্ভব সপ্রতিভ থেকেই, প্রথম নমস্কার-শব্দ উচ্চারণের পরেই স্মিত হাসির সঙ্গে প্রাঞ্জল বাংলায় ধরিয়ে দেন, ইংরিজিতে নয়, আমার সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলতে পারেন। এটুকুর পরে আরও একটি ধাপ এগিয়ে যোগ করে দেন নিজে থেকেই, আমি বাঙালি...বাঙালি ব্রাহ্মণ...।

তখন অপ্রতিভ বোধ করেন সেই অজানা-অচেনা কেউ-ই।

আর তাঁদের অস্বস্তিকর...ওহ্...আচ্ছা...সরি উচ্চারণের মধ্যেই অ্যাঞ্জেলা আবার পরিষ্কার বাংলায় বলেন, না-না, এতে সরি বলার কোনো কারণ ঘটেনি...একদিন সত্যিই তো আমি ইংল্যান্ডের বিদেশিনি ছিলাম। কিন্তু চেহারা তো আর বদল হয় না, তবে আসলে আমি এখন পুরোপুরি ভারতীয় এবং বাঙালি। আমার স্বামী ডাক্তার শ্যামলেন্দু মুখোপাধ্যায়...আমি অ্যাঞ্জেলা।

এই অভিজ্ঞতা অবশ্য শুধু শুকতারা নার্সিংহোমে না, রাস্তাঘাট-যানবাহন, বাজারে-দোকানেও হয়েছে অ্যাঞ্জেলার। প্রথম-প্রথম খুব স্বাভাবিক কারণেই বাংলার সঙ্গে ইংরিজি টান এবং উচ্চারণের জড়তা মিশে থাকত...যদিও সেটা কখনোই সিনেমা-থিয়েটারের সাহেবদের কৃত্রিম বাংলা উচ্চারণের মতো ছিল না। বরং তিনি আস্তে আস্তে, কেটে কেটে সঠিক উচ্চারণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন একেবারে প্রথম থেকে। প্রথম থেকে অর্থ, যখন তাঁরা কলকাতাতেই স্থিতু হওয়া সাব্যস্ত করেন।

সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং টানাপোড়েনটা যে খুব সহজসাধ্য ছিল এমন নয়। যাইহোক।

তবে বিগত একটা যুগ সময়ে অ্যাঞ্জেলা যে নিজেকে আমূল বদলে ফেলেছেন তাইতে কোনো সন্দেহ নেই। আসলে বদলানোর প্রয়োজনটা তিনি অনুভব করেছিলেন নিজের ভেতর থেকে। বুঝেছিলেন, যে দেশে জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবং যেখানে জীবিকা নির্বাহ-ও করতে হবে, উভয় কারণেই সেখানে সম্পৃক্ত হতে হবে। শুধু ভাষা শেখা নয়, কেননা কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতো ভাষা রপ্ত করা বরং অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু জীবনযাপনের জন্য বেশি দরকার সেই দেশ, সমাজ এবং মানুষজনের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। তাদের আবেগ, মানসিকতা, চাওয়া- পাওয়া- প্রত্যাশা-বেদনা-সুখদুঃখ...ইত্যাদি বুঝে নেওয়া, তার শরিক হওয়া।

আরো একটু তলিয়ে ভেবেছিলেন অ্যাঞ্জেলা, যে, শ্যামলেন্দুর চিকিৎসা জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং চিকিৎসালয় তৈরি করারই পরিকল্পনা যেখানে তাঁদের, সেক্ষেত্রে স্থানীয় এবং দেশীয় সংস্কৃতি জানা-বোঝার ভূমিকা অপরিহার্য-ই বলা উচিত। প্রাতিষ্ঠানিক কাজ করা, আর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি। যেকোনো কিছুই গড়ে তোলার জন্য শুধু জ্ঞানের ভূমিকাই যথেষ্ট নয়। অনুভূতি এবং ভালোবাসা অনস্বীকার্য। সুতরাং ভাষা-আবেগ- সংস্কৃতি-মানসিকতার হদিশ পাওয়াই তো সেই চাবিকাঠি...নাকি আঠা, যা দিয়ে তৈরি হয় নির্মাণ, সম্পর্ক। গড়ে ওঠে ভালোবাসাও।

অ্যাঞ্জেলা ভালোবাসতে শুরু করেছিলেন এই দেশ, শহর আর তার মানুষজনকে...তাদের হর্ষ-দুঃখ-আনন্দ, সীমাবদ্ধতাকেও। তা না-হলে সত্যি কি আজকের এই 'শুকতারা মেডিকেয়ার সেন্টার' গড়ে উঠত! আর...একটু একটু করে সেই গড়ে ওঠার সঙ্গেই টের পেয়েছেন, তিনি ভালোবাসতে শুরু করেছেন এই প্রতিষ্ঠানটিকেও।

স্বামীর কাছাকাছি হয়ে অ্যাঞ্জেলা বললেন, গুডমর্নিং স্যাম... মর্নিংওয়াক সেরে এসেছ?

এইসব ছোটোখাটো সাহেবিয়ানাগুলো, বিশেষ করে শ্যামলেন্দুর সঙ্গে, কখনোই পরিত্যাগ করেননি অ্যাঞ্জেলা। এমনিতেই 'স্যাম' এমন একটি নাম, যা অতি প্রচলিত এবং জনপ্রিয় ইংল্যান্ডে। তার ওপর খটোমটো নাম ছেঁটে ছোটো করার প্রবণতা ইংরিজিতে প্রবল। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় বঙ্গসন্তানরা শ্যামলেন্দু-সম্রাট- সমরজিৎ বা শ্যামাপদ...যাই হোন না কেন, তাঁরা উচ্চশিক্ষার্থে বিলাতযাত্রার পরে, সে দেশে 'স্যাম' নামে অভিহিত হবেন, তা ধরে নেওয়াই উচিত।

শ্যামলেন্দুও স্যাম হয়েছেন বহু বছর আগেই। ডেভনশায়ারের অ্যাঞ্জেলা তথা অ্যাঞ্জি আজকে বলে তো নয়...যুবক সার্জেনটিকে স্যাম-নামে ডেকে আসছেন সেই কবে থেকেই। আর...গুডমর্নিং, মর্নিংওয়াক ইত্যাদি তো নেহাতই আন্তর্জাতিক শব্দ হিসাবেই পরিচিত হয়ে গেছে। কিছু কিছু মাধ্যমবান্ধব আঁতেল অবশ্য ইদানীং তাঁদের ভাষাজ্ঞান অথবা প্রেম প্রদর্শনের জন্য সুপ্রভাত, প্রাতঃভ্রমণ-জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেন বলায় অথবা লেখায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা বেশ বোকা-বোকা শোনায়। কিন্তু শুকতারার অ্যাঞ্জেলা মুখার্জি অবশ্য ওসব জানেন না। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ আর উচ্চারণেই কথা বলেন। দেখানোর জন্য ইংরিজি-বাংলা শব্দ চয়নের সচেতনতা তাঁর নেই-ই।

তাছাড়া বঙ্গীয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও সকালবেলা গুডমর্নিং জানানোর বা সম্ভাষণের রীতি নেই। তাইতে খুব একটা কিছু যায়- আসেও না। কিন্তু অ্যাঞ্জেলা স্বতঃস্ফূর্ত সেদিক দিয়েও। তাঁর স্বাভাবিক, সহজাত আচরণ থেকে বিচ্যুত হওয়ারও কোনো কারণ নেই। দিনে দিনে সেটুকু সাহেবি শিষ্টাচারের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন শ্যামলেন্দুও। অ্যাঞ্জির গুডমর্নিং বলাটা খুব স্বাভাবিক তাঁর কাছে।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ...সে তো বেশ কিছুক্ষণ আগেই।

আজ একটু আর্লি নীচেয় এসেছিলে তুমি?

মে বি...ঘুম ভেঙে গিয়েছিল...তারপর আর শুয়ে থাকিনি। তোমাকেও ডাকিনি।

ভালো করেছিলে। রানু-শানুর স্কুল ছুটি...আমারও রিল্যাক্স করার অপারচুনিটি। চেম্বারের মুখ থেকে একটু ঘুরে অ্যাঞ্জেলা বললেন, ন-টাতেই শুরু করবে তো?

শ্যামলেন্দু দু-পা এগিয়ে এসেও বললেন, তাই তো ভেবে রেখেছিলাম...রূপকদার নাকি একটু দেরি হবে আসতে।

সামান্য বিরক্তির রেখা ফুটল অ্যাঞ্জেলার মুখে।—সকাল ন-টার কেস...তাও দেরি!

কী বলব বলো...!

নিশ্চয়ই আরো সকালে কোনো কেস অ্যাক্সেপ্ট করেছেন! ডক্টর সোম তো ছাড়তে চান না...।

জানি না...কোনো এমার্জেন্সিও থাকতে পারে...পার্টিকুলারলি সিজারিয়ান সেকশন...।

নেভার মাইন্ড। তোমার অ্যাসিস্ট্যান্টদের বলা আছে তো?

হ্যাঁ...অতীশ আর নাসিমা আসবে...। তুমি থাকছ তো থিয়েটারে? উই মে নিড য়্যু টু-উ।

তোমরা স্টার্ট কোরো...আমি একটু রাউন্ড দিয়ে এসে জয়েন করব।

ওকে।—হালকা হেসে, মাথা ঝাঁকিয়ে পাশ ফিরলেন শ্যামলেন্দু।

এবার নতুন বাড়ির চারতলায় চলে যাবেন তিনি। স্নান সারবেন। হালকা ব্রেকফাস্ট খেয়ে আবার নেমে আসবেন। সময়টা প্রতিদিন মোটামুটি ঠিকই থাকে। তবে কাজের তারতম্য হয়। সেই অনুযায়ী বেরুনোরও আগে-পরে হয়। যেদিন নিজেদের নার্সিংহোমেই অপারেশন থাকে, সেদিন দেরি করে হাসপাতালে পৌঁছান, সেভাবেই ব্যবস্থা করা থাকে। সপ্তাহে দু-দিন একটি বেসরকারি হাসপাতালের আউটডোরে রুগি দেখেন শ্যামলেন্দু, একদিন থাকে থিয়েটার লিস্ট অর্থাৎ অপারেশন।

নিজের প্রাইভেট প্র্যাকটিস, অপারেশন ইত্যাদি এমনভাবে আয়োজন করেন, যাতে হাসপাতালের কাজের দিন এবং সময়ের ব্যাঘাত না ঘটে। দুপুর থেকে বিকেল প্রায়ই কিছুটা ফাঁকা সময় থাকে অবশ্য। আজ বুধবার শ্যামলেন্দুর, যাকে বলে, হাসপাতাল থেকে অফ-ডে। সকালবেলা ন-টার সময় অপারেশন রেখেছেন সেইজন্য। বেরুনোর তাড়া নেই।

স্নান সারার জন্য দোতলায় যেতে যেতে ভাবলেন, অ্যানেসথেটিস্ট যখন দেরি করেই আসছে, তখন ছেলেমেয়ের সঙ্গে সেই সময়টুকু কাটানোই সব থেকে ভালো। কেননা, যে কোনো কারণেই হোক, আজ রানু-শানুর স্কুল ছুটি। খুব বেশি তো সুযোগ হয় না আজকাল ছেলেমেয়ের সঙ্গে আড্ডা-গল্প-বকর বকর করার! দেখতে-দেখতে বড়ো হয়ে যাচ্ছে দুজন...সময় বসে থাকছে না। পনেরো পার হয়ে ষোলোয় পড়েছে ভাইবোন...। এ বছর পুজোর আগেই মাধ্যমিকের সমতুল্য জি সি এস সি—পরীক্ষা ভাইবোনের। ইন্টারন্যাশানাল স্কুলে ইংল্যান্ডের সিস্টেমই ফলো করে এখনও। সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী বা বিদেশ- বিভুঁইয়ে যাতায়াত করতে হয় যেসব অফিসারদের, তাঁদের ছেলেমেয়েরা ভর্তি হয় ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে।

শ্যামলেন্দুরা নিজেদের দেশে বসবাস করার ব্যাপারে প্রথমদিকে সংশয়াচ্ছন্ন ছিলেন। রানু-শানুকে তাই গোড়ার থেকেই ওই স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। দেখতে-দেখতেই এতগুলো বছর চলে গেল। স্কুল আর বদলানো হয়নি। দরকারও হয়নি। এবার তো স্কুল শেষ হওয়ারই সময় হয়ে এল। একটা সুবিধে হয়েছিল—জন্ম থেকে ইংল্যান্ডে থাকায়, ইংরিজিতে পড়া বা কথাবার্তা বলায় কোনো সমস্যা হয়নি। আবার দেশে থাকতে থাকতে এবং দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাংলা নেওয়ায়, তাইতেও লিখতে-পড়তে অসুবিধে হয়নি। দুই ভাষা এবং কালচারেই বেশ সড়গড় ভাইবোন।

তার থেকেও বড় কথা অবশ্য, মেমসাহেব মা স্বয়ং যেখানে দিনে দিনে ভারতীয় বাঙালি বধূতে রূপান্তরিত হয়েছেন (হতে চেয়েছেন বলেই অবশ্য), ছেলেমেয়ের সেখানে বাঙালি না-হয়ে উপায় আছে!

আর শ্যামলেন্দু বরাবরই এসব ব্যাপারে নির্বিকার না-হলেও, অ্যাঞ্জেলার ওপরে নির্ভরশীল, তাইতে কোনো সন্দেহ নেই। এও এক বিচিত্র রসায়ন তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে। ঘর-গৃহস্থালির ব্যাপার, সংসার চালানো, ছেলেমেয়ের পড়াশোনার ব্যাপার....তার সঙ্গে খেলাধুলো-মেলামেশা-গান শেখা...প্রায় সব ব্যাপারেই অ্যাঞ্জেলার সিদ্ধান্তকে স্বাগত এবং সমর্থন জানিয়েছেন শ্যামলেন্দু এবং এমনভাবেই যাতে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণেরও প্রশ্ন ওঠেনি কোনোদিন।

বরং অতীতে কখনো মাঝেমধ্যে অ্যাঞ্জেলাই স্বামীকে জিজ্ঞেস করেছেন, আচ্ছা স্যাম, টেল মি ওয়ান থিং, একটা ব্যাপার আমি নোটিশ করেছি, আমাদের ঘরবাড়ি-সংসার-ফ্যামিলি-ছেলেমেয়ে... এসব ব্যাপারে তুমি কখনই খুব একটা মতামত দাও না...আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে তখন হয়তো বলো। কেন বলো তো? তোমার নিজে থেকে কিছু বলার থাকে না?

সাধারণত স্ত্রীর সঙ্গে এ ধরনের ঢিলেঢালা কথাবার্তা বলার সুযোগ খুব একটা হয় না। কারণও অতি স্পষ্ট। চিকিৎসক হিসেবে নিজের জীবিকা তো আছেই। প্রথমদিকে সার্জেন হিসাবে পরিচিতি অর্জন করার সময় সেরকম ব্যস্ততা, ছোটাছুটি না-থাকলেও, ক্রমশ অবশ্যই তা বেড়েছে শ্যামলেন্দুর। হাসপাতালে যাতায়াত, অন্যান্য চিকিৎসকদের রেফারেন্স ইত্যাদির মাধ্যমে পরিচয়, চেনাজানা হতে শুরু করলেও, বিশেষ করে সার্জেনদের খ্যাতি ছড়াতে শুরু করে, কোনো রুগির অপারেশন করার পরে, সেই রুগি বা রোগিণী এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে। কেননা অপারেশনের খবর চাউর হয় অনেক বেশি। সার্জেনের নামও তখন বিজ্ঞাপিত হতে শুরু করে তাদের মাধ্যমে। অবশ্য সুনাম-দুর্নাম দুটিই হতে পারে যদিও।

শ্যামলেন্দুর সৌভাগ্যই বলা উচিত। তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি হয়েছিল। অখ্যাতির বিষয় তেমন শোনা যায়নি। ব্যস্ততাও বেড়েছিল। তা সত্ত্বেও দুজনের ঘরোয়া কথাবার্তার সুযোগ একেবারে হত না, তা নয়। চেম্বার সেরে যেদিন তাড়াতাড়ি ফিরতে পারতেন শ্যামলেন্দু, সেদিনই কিঞ্চিৎ পানীয় সহযোগে নিজেদের কথা হত...এখনও হয়।

তাছাড়া শুধু শ্যামলেন্দুর বলেই তো না, সময় পেতে হবে অ্যাঞ্জেলাকেও। কাজের দায়িত্ব তাঁর ওপরেও কম না। ঘর-সংসার তো বটেই, তার ওপর একটা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ

প্রশাসন মূলত তাঁকেই দেখতে হয়। সত্যি বলতে কি নিজের দেশ ইংল্যান্ড ছেড়ে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতায় জীবনযাপন করতে এসে, এ দেশের নার্সিংহোম বিষয়টা বুঝতেই বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল অ্যাঞ্জেলার। এখানে 'নার্সিংহোম' বলতে যে পুরো হাসপাতালেরই একটি ছোটো সংস্করণ বোঝায়...যাকে বলা যেতে পারে 'মিনি হাসপাতাল'—এই ধারণাটাই তাঁর ছিল না। কেননা ইংল্যান্ডে নার্সিংহোম বলতে যে ধরনের আয়োজন এবং ব্যবস্থাপনার কথা ভাবা হয়, তার সঙ্গে এদেশের অনেকটাই তফাত।

ওদেশের নার্সিংহোমে রুগিদের থাকার ব্যবস্থা এবং তথাকথিত নার্সিং কেয়ার ব্যাপারটাই মুখ্য। এবং সেই অনুযায়ী যতখানি চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন, সেটুকুই আয়োজন করা থাকে। চিকিৎসার জন্য রুগি ভর্তি করা, অপারেশন, অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা....ইত্যাদির সুযোগ নার্সিংহোমের না, হাসপাতালের দায়িত্ব। ব্যবস্থাপনার অনেকটাও সরকারি, কেননা ওদেশে জনসাধারণের চিকিৎসার প্রায় সব দায়িত্বই বহন করে সরকার।

কলকাতা শহরে ব্যক্তিগত মালিকানায় নার্সিংহোম নামক প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপকতা অনুমান করতে করতেই অ্যাঞ্জেলা বুঝেছিলেন, তাঁর ওপর প্রশাসনিক দায়িত্বভারও কতখানি। আরও বুঝেছিলেন, এহেন একটি প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য যা দরকার, তা হচ্ছে, একইসঙ্গে একটি চিকিৎসালয় এবং একটি হোটেল-এর সর্বাঙ্গীণ আয়োজন রাখা।

দিনে দিনে অবশ্য সেই আয়োজন এবং দায়িত্বভার উভয়ই মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন অ্যাঞ্জেলা। আর শ্যামলেন্দুর শুধু যে সেইসব দিকে নজর থাকত তাই না, বিশ্বাস এবং কৃতজ্ঞতায় নির্ভরও করতেন স্ত্রীর ওপর। সুতরাং অ্যাঞ্জেলার কথা শুনে হেসে বলেছিলেন, কে বলল থাকে না! মতামত, বলার কথা সবই থাকে মাইডিয়ার।

তাহলে বলো না কেন?

সেইসময় গ্লাসে আরও কিছুটা রেড ওয়াইন ঢেলে নিতেন শ্যামলেন্দু। তারপর বলতেন, আমি বলার আগেই যদি দেখি এবং বুঝতে পারি, তোমার ভাবনা আর ডিসিশনের সঙ্গে আমি একমত, তাহলে আর বলব কেন!

অ্যাঞ্জেলা বলেন, মঝেমাঝে তা-ও বোলো...দ্যাট গিভস্ মি কনফিডেন্স, মেন্টাল সাপোর্ট।

আমার এক্সপ্রেশনে বুঝতে পারো না?

পারি বলেই তো...এরপর সঠিক শব্দটা খুঁজে না পেয়ে একটু থমকে যেতেন অ্যাঞ্জেলা। আর শ্যামলেন্দু তখন ধরিয়ে দেন, 'সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করি না'...তাই তো?

ইয়েস, দ্যাটস্ ট্রু। তারপরেও আর একটু যোগ করেন অ্যাঞ্জেলা, এক্সপ্রেশনকেও মাঝেমাঝে লাউড হতে হয়।

রিয়্যালি! এই বলে হয়তো হঠাৎই অ্যাঞ্জেলাকে কাছে টেনে এনে সশব্দে চুম্বন করেছেন শ্যামলেন্দু। তারপর বলেছেন, লাউড হল?

অ্যাঞ্জেলা খুশিই হতেন। তারপরেও বলতেন, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমার কৈফিয়ত দেওয়ার কিছু নেই...তাহলেও কাউকে তো আমার কথাগুলো মাঝেমাঝে বলতে ইচ্ছে করে...। বাবা যতদিন ছিলেন, ততদিন অ্যাটলিস্ট আরও একজন কেউ...।

অফকোর্স...আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট।...তবে খুব পার্সোনাল ব্যাপার ছাড়া, মাঝে মাঝে তুমি দিদি-জামাইবাবু কিংবা আমার কাজিনদের সঙ্গেও তো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারো। শ্যামলেন্দু বাবার কথা ইচ্ছে করে এড়িয়ে যান।

পারি স্যাম। ইনফ্যাক্ট মাঝে মাঝে দেখা হলে নানান কথাও হয়। কিন্তু...টু বি ফ্র্যাংক...আমার সঙ্গে কলকাতায় অনেকেরই ইদানীং মতামত, অ্যাক্টিভিটিজ...মেলে না।

ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। যেটা ঠিক মনে করবে, তাই করবে। অন্যদের সঙ্গে মেলার কী দরকার? কথা বলা মানে তো শুধু মতের মিল হওয়া নয়!

সেইজন্যই আমার রেস্পনসিবিলিটি বেশি পড়ে যায় অ্যান্ড আই নিড ইয়োর সাপোর্ট...।

সেটা অলওয়েজ আছে অ্যাঞ্জি...। ঠিক না হলে, কিংবা ঠিক মনে না করলে আমি নিশ্চয়ই বলব।

একটু আবেগপ্রবণ হয়ে অ্যাঞ্জেলা কখনও বলেন, ইন্ডিয়ায় আসার পরে যতদিন বাবা ছিলেন, আই ইউজড টু ফিল...তুমি ছাড়াও আর একজন আছেন, আমাকে গাইড করার জন্য, অ্যাডভাইস দেওয়ার জন্য। যদিও বাবার নেচারও তোমার মতোই ছিল...মুখে কখনই খুব একটা কিছু বলতেন না।

শ্যামলেন্দু হেসে বলতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি ঠিকই বুঝতে পারতে...সাম ওয়ান ইজ দেয়ার...।

নিশ্চয়ই...সেই জন্যই তো বাবাকে আমি এত বেশি মিস করি...।

বাবার কথাতে সামান্য উদাস হতেন শ্যামলেন্দুও। একটু চুপ করে থেকে বলতেন, সত্যি দ্যাখো...লাইফ কী অদ্ভুত! তুমি কত দূর দেশের...কত অন্যরকম কালচার, হেরিটেজ, এনভায়র্নমেন্ট থেকে এলে ইন্ডিয়ায়...জীবনযাপন করতে শুরু করলে...তারপর যাকে চিনতে না, জানতে না...সেরকম একজনই চলে যাওয়ার পরে মিস করছ...।

আই রিয়্যালি ডু স্যাম।

আই নো। মানুষের মন সত্যি কীরকম বদলে যায় বলো...!

অ্যাঞ্জেলা বলেন, আসলে ভালোবাসলে মানুষ পারে না, এরকম কিছু বোধহয় না।

ভালোবাসা আর ইচ্ছের জোর থাকাটাও ইম্পর্টান্ট। আমি জানি তোমার তা আছে।

আমিও সবসময় সেটা ভাবতে চাই স্যাম। তা না হলে পার্মানেন্ট্‌লি ইন্ডিয়ায় এসে থাকতে পারতাম না।

শ্যামলেন্দু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতেন, ঠিকই। তাহলেও পার্মানেন্ট্ কথাটাকে অত ইম্পর্টান্স দিও না।

মাথা দুলিয়ে সামান্য হাসতেন অ্যাঞ্জেলা। বলতেন, কেন তোমার কি ডাউট আছে?

সত্যি সত্যি পার্মানেন্ট্ বলে কি কিছু হয়?

এ কথার গুরুত্ব অ্যাঞ্জেলা যে অনুভব করেন না বা করতেন না তা নয়। কিন্তু পরিবেশটাকে ভারী না-করার জন্যই বলতেন, ইয়েস, হয়। আমি ইন্ডিয়াতে পার্মানেন্ট্‌লি থাকব...দিস্ ইজ মাই ডিসিশন। সেটা কি সত্যি না?

শুকতারা নার্সিংহোমের তো অন্যতম স্তম্ভই হচ্ছে অ্যাঞ্জেলা মুখার্জি।

শ্যামলেন্দু তর্কে যেতেন না। বলতেন, সেটা অবশ্যই সত্যি বটে।

অ্যাঞ্জেলা ছোট্ট করে ধরিয়ে দিতেন, ফিলজফি নিয়ে আমার কোনো হেডেক নেই। পার্মানেন্ট্ মানে পাকাপাকি...।

পাঁচরকম ভাবনা আর কিছুক্ষণ রানুর সঙ্গে বকবক করতেই শ্যামলেন্দু দেখলেন সময় হয়ে যাচ্ছে। আর বেশি রিল্যাক্সড্ হয়ে গেলে, এরপরে তিনিই লেট হবেন। মনটা তবু ঝরঝরে লাগল। অ্যানেসথেটিস্ট দেরি করে আসার জন্য অন্তত মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় তো কাটানো গেল! শানুকে অবশ্য ধরা গেল না। সকালেই বেরিয়ে পড়েছে। ওর নাকি সিজনের লাস্ট ক্রিকেট ম্যাচ ঠিক করাই ছিল আজ দেশবন্ধু পার্ক-এ। কিটস্ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে মা-কে বলে।

স্নান সারতে বাথরুমে ঢুকে গেলেন শ্যামলেন্দু। ন-টা বাজতে আর বেশি দেরি নেই।

শ্যামলেন্দু যখন তথাকথিত 'উচ্চশিক্ষার্থে বিলাত যাত্রা' করেছিলেন, তখনও নতুন শতাব্দীর ভোরের আলো ঠিকমতো ফোটেনি...আসছি-আসব করছে। বিংশ শতাব্দীর জগদ্দল পাথর সরতে আড়াই-তিন বছর দেরি তখনও। কিন্তু 'ডাক্তার হলেই বিলেত যেতে হবে' এই অলিখিত আপ্তবাক্য তখনই বেশ পড়তির দিকে। তার পেছনে অবশ্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানাবিধ কারণের বাঁধন ছিল। তার মধ্যে সোজা কথায় একটি অকাট্য যুক্তি এই যে, দেশ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে একটা ডাক্তার তৈরি করে; তারপর সেই ডাক্তার দেশের কাজে না লেগে, বিদেশে চলে গেলে, দেশের কী লাভ! বরং ক্ষতি।

কিন্তু কথা থাকে তারপরেও।

দেশ বা দেশের সরকার প্রভূত খরচ করে যে ডাক্তার প্রোডিউস করছে, তাদের কি সরকারিভাবে সদ্ব্যবহার করতে পারছে? এই কথা উঠলেই, নানান ঝামেলা, তর্কাতর্কি, কথা কাটাকাটি, রাজনীতি... কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক...একগাদা সমস্যা আর বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। কিন্তু তারমধ্যেও কয়েকটা স্পষ্ট এবং বাস্তব বিষয় উদ্ঘাটিত হয়। যেমন, সব গভর্নমেন্ট সব সময়েই বলে থাকে—সরকারি লেভেলে যথেষ্ট কাজের সুযোগ থাকলেও, ডাক্তাররা ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের

অভাবের জন্য সেই সুযোগ গ্রহণ করে না। বহু সরকারি ডাক্তারের পদ খালি পড়ে থাকে, ডাক্তাররা জয়েন করে না।

প্রথমত এই কথা আংশিক সত্য। দ্বিতীয়ত সত্যের মধ্যেও অপলাপ বা ভেজাল আছে।

বহু ইচ্ছুক ডাক্তার সরকারি কাজে যোগ দিতে চাইলেও, চাকরি পায় না। কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর বেশ কিছুদিন পরে পরে বিজ্ঞাপন দেয় এবং ডাক্তারদের আহ্বান জানায় আবেদন করার জন্য। ইঞ্জিনিয়ারদের মতো 'ক্যাম্পাস সিলেকশন' ডাক্তারদের হয় না। যদি হত, সরকারি-বেসরকারি উভয় উদ্যোগেই অনেক ডাক্তার কাজ করতে যেত। কিন্তু তার বদলে, পাশ করা ডাক্তাররা হাউসস্টাফশিপ-এর কাজ শেষ হয়ে গেলে, এলোমেলোভাবে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়। কেউ ছপ্পড় খুলে প্র্যাকটিসে বসে, কেউ চাকরির জন্য ছোটে, কেউ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট-এ চান্স পাবে কিনা তার জন্য দৌড়ঝাঁপ করে...আবার কেউ কেউ উঞ্ছবৃত্তি, ধান্দাবাজির লাইন ধরে। একটা গ্রুপ বিদেশে যাওয়ার সুযোগসন্ধান করে।

এ ছাড়াও যারা শেষ পর্যন্ত সরকারি ডাক্তারের কাজে বহাল হয়, তাদের অনেকেরই অভিযোগ, নেহাত কোনো শহরে হাসপাতাল বা জেলা সদরের হাসপাতাল ছাড়া, অধিকাংশ প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি হেলথ কেয়ার সেন্টারে, ডাক্তারি করার মতো ন্যূনতম ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা পরিকাঠামো বা ব্যবস্থা নেই। ওষুধ নেই, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা নেই, বেড নেই, নার্স-ওয়ার্ডবয়রা ফাঁকিবাজ, জমাদার চুল্লু খেয়ে পড়ে থাকে, অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া খাটে...। এসবের পরেও যা এবং যতটুকু পরিষেবা দেওয়া যেতে পারত, সেখানে মাতব্বরি করে পাড়ার রংবাজ-মস্তান-তোলাবাজ, ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলের স্থানীয় চোর-গুন্ডারা। ডাক্তারকে শিখণ্ডী সাজিয়ে, হেলথ সেন্টার অথবা মফস্‌সলি হাসপাতাল নিয়ে ব্যবসা করে তারা। দিনে দিনে ডাক্তারও পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে...এবং সরকারি হাসপাতালে নাম থাকলেও, প্রাইভেট প্র্যাকটিসে বসে যায়।

প্র্যাকটিসে জমে গেলে ডাক্তার আর নড়তে চায় না সেখান থেকে। অনেক সময় চাকরিও ছেড়ে দেয়।

এর মধ্যে আবার স্পেশালিস্ট বা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ব্যাপার আছে। স্পেশালিস্টরা প্রতিষ্ঠান ছাড়া কাজ করবেন কোথায়? প্রতিষ্ঠান মানে তো হাসপাতাল। তা হতে পারে সরকারি কিংবা বেসরকারি। সরকারি হাসপাতাল বড়ো শহরের মধ্যে কিংবা যেখানে মেডিকেল কলেজ রয়েছে তার সঙ্গে যদি যুক্ত হয়, সেখানে মোটামুটি কাজ হয়। অন্যান্য জায়গায়, স্পেশালিটি বা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল বলে বিজ্ঞাপন করা হয়, কিন্তু স্পেশালিস্ট ডাক্তার কাজ করতে গিয়ে দেখে, (সরকারি হাসপাতালে) পরিকাঠামো নেই। সে কী করে উন্নত কাজ, অপারেশনের ঝুঁকি নেবে! আর বেসরকারি জায়গায় টাকাপয়সার হিসেব আছে।

এসবের পরে আবার আমাদের দেশীয় সামাজিকতা, সংস্কৃতি, অর্থনীতিরও দুরন্ত প্রভাব কাজ করে ডাক্তারদের ওপর। প্রথমত, ডাক্তার হলেই সে বড়োলোক হবে, গাড়ি চড়বে...এ জাতীয় একটা ইম্প্রেশন গড়ে দেওয়া হয় প্রথম থেকে এবং ডাক্তারও সেই মানসিকতা পোষণ করে...এমনকী ছাত্রাবস্থা থেকেই।...

তো যাই হোক...এসব কথা আর সাতকাহন করে বলে কী হবে! কিন্তু একটা কথা ঠিক, নতুন শতাব্দী আসতে আসতে এই একটি ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে যে, ডাক্তারদের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার্থে বিলাতযাত্রার প্রবণতা অপেক্ষাকৃতভাবে কমে গেছে।

এই কমে যাওয়ার পেছনেও অবশ্য একাধিক কারণ এবং টানাপোড়েন আছে। এটা ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই যে, আমাদের দেশীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে বলে, ডাক্তাররা আর বিলেত যেতে চাইছে না। এটা অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা, তা বলা যায়। অতীতের থেকে উন্নত হয়েছে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা...পড়াশোনা, ট্রেনিং ইত্যাদি।

কিন্তু উন্নতির অনেকটাই হয়েছে বেসরকারি প্রকল্পের জন্য। কেন?

কেননা বেসরকারি সংস্থারা খুব ভালো বুঝেছে, হেলথ্-এর চেয়ে বড় বিজনেস আর অন্য কিছুতে হয় না। এবং তা সফল হওয়ার সব থেকে বড়ো কারণ হচ্ছে, অপ্রতুল সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা—যা অধিকাংশে ব্যর্থতারই নামান্তর। এর পেছনে আমাদের দেশীয় এবং প্রায় স্বীকৃত কারণ হচ্ছে কোরাপশন বা দুর্নীতি। এমনিতেই জন বিস্ফোরণ আমাদের দেশের যেকোনো উন্নতিকে টেনে নীচেয় নামায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যতখানি হওয়ার কথা এবং সুযোগ আছে, তাকে পর্যুদস্ত করে প্রবল দুর্নীতি।

বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাই আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত মানুষের মূল ভরসা এখন। সুতরাং তাদেরও প্রয়োজন ডাক্তার। যত ডাক্তার দেশে উৎপাদিত হচ্ছে, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেই তারা ট্রেনিং পাচ্ছে এবং কাজও করছে। তার ওপর একটা সময় ডাক্তারদের বিলেত যাওয়া ঠেকাতে, সরকারি বিলিতি ডিগ্রি-ডিপ্লোমা অস্বীকৃত বা ডিরেকগনাইজ করতে শুরু করল...যদিও তার প্রভাব অবশ্য ডাক্তারের খ্যাতি ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। সরকার বাতিল করলেও, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের টেনে নেয়।

আর একটি বিষয় হল, বিলেত থেকেও, বিশেষ করে, এশিয়ান ডাক্তারদের কাজ করার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বহিরাগত ডাক্তারদের তাদের দেশে কাজ করার ছাড়পত্র দেওয়ার আগে, একইসঙ্গে ইংরিজি ভাষা এবং ডাক্তারি মানের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করল।

সব মিলিয়েই নতুন শতাব্দী আসার আগেই যা দাঁড়াল, তা হচ্ছে, ইচ্ছে থাকলেও ডাক্তারদের বিলাতযাত্রার সংখ্যা কমে যেতে লাগল। না, বন্ধ হল না। কেননা বিলিতি ডাক্তারির ট্রেনিং এবং ডিগ্রির মোহ বা গুরুত্ব কোনোটাই কমে যাওয়ার কারণ ছিল না। একথাও অনস্বীকার্য, সাধারণভাবে বিলিতি ট্রেনিং এবং ডাক্তারি শিক্ষার মান উন্নত। সুতরাং অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় নিজের কৈশোরকাল থেকেই কিঞ্চিৎ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হলেও, পুত্রকে বিলেতে কাজ করতে এবং শিখতে-পড়তে যাওয়ার ব্যাপারে, শুধু যে উৎসাহী ছিলেন তাই না, নিজের ইচ্ছার কথা জানাতেও দ্বিধা করেননি।

অথচ ডাক্তারি পাশ করার পর থেকেই শ্যামলেন্দুর ধারণা হয়েছিল, বাবা কখনই তাঁকে বিলেতে যাওয়ার কথা ভাবতে

বলবেন না। এমনিতেও বছর তিন আগে মা সুপ্রভা চলে যাওয়ার পরে, এত বড়ো বাড়িতে তাঁরা দুটি প্রাণী মোটে। দিদি বিয়ের পরে মুম্বাই চলে গেছে, তাও সাত-আট বছর হয়ে গেছে। ওখানেই সেটেলড। কলকাতায় ফিরবে না। অমৃতেন্দুর খুড়তুতো বোন রাধাপিসি এ বাড়িতে থাকলেও, শ্যামলেন্দুরও মানসিক প্রস্তুতি এমনই ছিল যে, বাবাকে একা ছেড়ে তিনি আর দূরে কোথাও যাবেন না। নেহাত বিশেষ কোনো ট্রেনিং নেওয়ার জন্য যদি দরকার হয়, তাহলেও ব্যাঙ্গালোর-মুম্বাই-ভেলোরে গেলেই চলবে, এবং সেক্ষেত্রে দু-একমাস অন্তর বাড়িতে ঘুরে যাওয়ারও কোনো সমস্যা থাকবে না।

তারপর শেষ পর্যন্ত তো কলকাতাতেই প্র্যাকটিস করবেন... এবং সার্জেন হবেন সেটা তো পাশ করার পর থেকেই প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। হাউসসার্জেনশিপ শেষ হতে হতেই স্নাতকোত্তর এম. এস কোর্সে ভর্তির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে চান্স-ও পেয়ে গিয়েছিলেন। ভবিষ্যতে কসবা রাজডাঙার এই বাড়িতে নার্সিংহোম করা যেতে পারে, প্রচ্ছন্নভাবে এই ভাবনা এবং কিছুটা মানসিক প্রস্তুতিও ছিল বলা যায়। কথাবার্তার মধ্যে অমৃতেন্দু নিজেও তেমন আভাস দিয়েছেন।

কিন্তু এম. এস ফাইনাল পরীক্ষার পরে অমৃতেন্দু নিজে থেকেই যে ছেলেকে বিদেশযাত্রার পরামর্শ দিতে পারেন, শ্যামলেন্দু তা ভাবেননি। বরং এবার নার্সিংহোম তৈরির ভাবনা বাস্তবায়িত হতে পারে, সেইসবই তাঁর মাথায় ছিল।

এম. এস পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়নি তখনও। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওই পরীক্ষাটিতে প্রথমবারেই পাশ করে বেরিয়ে আসা নেহাতই বিরল ঘটনা। শ্যামলেন্দু বরাবরের কৃতী ছাত্র। তা সত্ত্বেও নিশ্চিত না স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন কি না। না-হলেও কিছু করার নেই, আবার বসতে হবে। কেননা এম. এস ডিগ্রি না পেলে, সার্জেনের স্বীকৃতি পাবেন না।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে কথাটা খুব সহজভাবেই উত্থাপন করলেন অমৃতেন্দু। ছেলেকে বরাবর বাবু নামে সম্বোধন করেন অমৃতেন্দু।

বললেন, বাবু...তোর এম. এস পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুনোর সময় হয়ে এল না!

একবার মুখ তুলে বাবার দিকে দেখে, আবার খবরের কাগজে চোখ রাখল শ্যামলেন্দু। বলল, দাঁড়াও...আরও মাস দুয়েক লাগবে মনে হয়। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল পরীক্ষাগুলোর রেজাল্ট বেরুতে দেরি হয়।

কফিতে চুমুক দিলেন অমৃতেন্দু। বললেন, তার মানে...জুন মাস হবে!

মনে হয়...জুনের মাঝামাঝি তো বটেই।

তবে...পরীক্ষা হওয়ার পরেই তোরা মোটামুটি জানতে পারিস না...ক-জন পাশ করল...!

ওই জানার কোনো ভরসা নেই বাবা...। আটজন এগ্‌জামিনারের ছ-জনই এক্সটারন্যাল। তাঁরা যদি রিভিউ করতে চান, ফাইনাল রেজাল্ট সই করার আগে...তখন আবার...। এমনিতেই টুয়েন্টি পার্সেন্টের মতো পাশ করে। তারমধ্যে কে থাকে না-থাকে...।

শ্যামলেন্দুর কথার মধ্যেই অমৃতেন্দু বললেন, তার মানে...তুই কিছু একটা জানিস...তাই তো?

শ্যামলেন্দু হেসে ফেলল।—ওটাকে পুরো জানা বলে না। এম. এস, এম. ডি পরীক্ষায় প্রথমবার ফেল করাটাই নিয়ম...অ্যাটলিস্ট আমাদের ক্যালকাটা য়্যুনিভার্সিটিতে।

তা হতে পারে। তবে আমার আবার মনে হয় অনেকের জন্য ফার্স্ট চান্স ইজ দ্য বেস্ট চান্স।

সেটাও খানিকটা ঠিক বলেছ। কেননা ফার্স্ট চান্সে ভয় এবং নার্ভাসনেস কম থাকে...কেননা জানেই তো ফেল করবে।

ছেলের হাসির মধ্যেই অমৃতেন্দু বললেন, আমার ধারণা তুই বেরিয়ে যাবি।

কেন ভাবছ?

ওই...যেটা বললি! ভয়-নার্ভাসনেস-এর বদলে স্মার্টনেস কিন্তু কাজে দেয়...দ্যাট কাউন্টস। তুই পড়াশোনা করেছিস...।

দেখা যাক...আয়াম নট ওয়ারিড।

থেমে গিয়েও আবার মুখ তুলল শ্যামলেন্দু। বলল, সে যাই হোক...তুমি খোঁজ নিচ্ছ কেন হঠাৎ?

অমৃতেন্দু আবার কফির কাপে চুমুক দিলেন। নামিয়ে রেখে বললেন, ভাবছিলাম...বিদেশ-টিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে খোঁজখবর আর প্রিপারেশনগুলো এই মাস দুয়েকের মধ্যে সেরে ফেললেই ভালো হত না?

শ্যামলেন্দু একইসঙ্গে বিস্ময়-কৌতুক-হাসির ভাব...সব মিশিয়ে অবাক হয়ে তাকাল বাবার দিকে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, বিদেশ-টিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে মানে?

মানে...আগে আগে যেরকম বলা হত...উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশযাত্রা...।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমি বিদেশ যাব...তোমায় কে বলল?

কে আর বলবে! আমি নিজেই বলছি।

শ্যামলেন্দু তারপরেও হালকাভাবে বলল, বিদেশ বলতে যদি তুমি বম্বে-চেন্নাই-ব্যাঙ্গালোর মিন করো...

না-না তা আমি মিন করছি না...।

তাহলে কি ইংল্যান্ড-আমেরিকার কথা বলছ?

অমৃতেন্দু মাথা নেড়ে বললেন, ডাক্তারি ব্যাপারে আমেরিকার কথা বলব না। বরং হায়ার স্টাডিজ, ট্রেনিং আর ফেলোশিপ-এর জন্য এখনও ইংল্যান্ডে যাওয়ার কথাই ভাবা উচিত।

শ্যামলেন্দু একটু চুপ করে রইল প্রথমে। তারপর হাসি অথচ হাসি না এরকম একটা অভিব্যক্তির মুখে বলল, বাবা...তুমি সত্যি চাও আমি...সেই যেমন চলত...উচ্চশিক্ষার্থে বিলাতযাত্রা...সেই কথা ভাবব?

পট থেকে আর একটু গরম কফি ঢেলে নিতে নিতে অমৃতেন্দু বললেন, হ্যাঁ...না চাইলে বলব কেন! তুই-ও এখন থেকে না-ভাবলে চলবে?

দাঁড়াও-দাঁড়াও, শ্যামলেন্দু হাত তুলে বলল, ভাবনার আগে ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করে নিই।

তা কর। তবে ভাবনাটাকেও আর ফেলে রাখিস না...খোঁজখবর, যোগাযোগ...চিঠি লেখা, ই-মেল অনেক ব্যাপার আছে। এখন তো আবার একটা ফরম্যাল পরীক্ষা দেওয়ারও ব্যাপার আছে শুনেছি।

সে সব হবে। কিন্তু আমার তো এতদিন ধারণা ছিল, তুমি বেশ কট্টর ন্যাশানালিস্ট মানুষ।

তাইতে কী হয়েছে! জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মানে কি বিদেশে না-যাওয়া?

তা বলছি না। শ্যামলেন্দু আমতা-আমতা করে বলল, কিন্তু বিলেতে পড়তে যাওয়ার ব্যাপারে, বিশেষ করে এখনকার সময়ে, আমার মনে হয়েছিল তোমার সায় নেই। হয়তো সেরকম দরকারও নেই...।

অমৃতেন্দু একটু সময় নিয়ে বললেন, বিদেশে যাওয়ার দরকার সবসময়ই আছে...এবং আমারও যথেষ্ট সায় আছে।

কিন্তু কখনো বলোনি তো সেকথা!

সঠিক সময়ে বলব বলেই ভেবে রেখেছিলাম। তোর মা বেঁচে থাকলে...হয়তো আগেই জেনে যেতিস।

আমি তো তোমাকে একা রেখে ইংল্যান্ডে যাওয়ার ভাবনাটাকেই পাত্তা দিইনি।

একা আবার কী? কলকাতায় কেউ একলা থাকে! রাধা তো এমনিতেই আছে...এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে লোকজনের যাতায়াতও লেগেই আছে...। তা ছাড়া বিদেশে গেলে তুই-ও তো একলাই যাবি।

এখন কিন্তু বাবা...দেশেও আমাদের যেসব ফেসিলিটিজ...

থামিয়ে দিয়ে অমৃতেন্দু বললেন, শোন বাবু...নিজের দেশটাকে ভালো করে দেখা, বোঝা আর কমপেয়ার করার জন্যই বেশি করে বিদেশে যাওয়ার দরকার। সেখানে কাজ করা, মেলামেশা, জীবনযাপন করে আসার দরকার। টুরিস্ট-এর মতো ঘুরে এলেও হয় না। তা ছাড়া আমি তোকে যে শুধু পড়াশোনা আর কাজ শেখার জন্য বিলেত যেতে বলব, তাও না। অন্য দেশে, অন্য কালচার-ভাষা-মানুষজন-আবহাওয়া, এসবের মধ্যে গিয়ে থাকলে, মনের প্রসারতা, ভাবনার ব্যাপ্তি, নজর...এসবেরই নানান পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আর পরিবর্তনগুলো যদি খুব বেশি প্রভাবিত করে?

করলে করবে।

শ্যামলেন্দু হেসে বলল, তারপর যদি আর দেশে ফিরে আসতে ইচ্ছে না করে?

অমৃতেন্দু বললেন, একটা মানুষের ম্যাচিউওরিটির লক্ষণ সেটাই, যখন সে জীবন সম্বন্ধে সঠিক ডিসিশন নিতে পারে। আর যেকোনো পরিবর্তন কাকে, কতটা, কীভাবে ইনফ্লুয়েন্স করবে, সেটা তো নির্ভর করে তার ভ্যালুজ, কালচার, টেনাসিটির ওপর। তার ভালো-মন্দ দু-দিকই আছে...সে নিজেই ঠিক করবে কোনটা গ্রহণ করবে।

আমার অবশ্য...যদি যাই-ও, থেকে যাওয়ার ইচ্ছে কোনোদিন হবে না। পারবই না থাকতে।

ওসব ভাবনা থাক এখন। আমি বরাবর ভেবেছি, বিলেতের ন্যাশানাল হেলথ্ সার্ভিসে সব ডাক্তারদের কিছুদিন কাজ করতে পারলে ভালো হত। ওদের সিস্টেম-ডিসিপ্লিন-ভ্যালুজ-টিচিং-ট্রেনিং...সবকটা এখনও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশে ভালো কাজ হয় না, কৃতী ডাক্তার নেই, সেকথা বলছি না। কিন্তু সময়, সুযোগ থাকতে-থাকতে যদি ঘুরে-দেখে-কাজ করে, কাজ শিখে আসতে পারিস, আমার ধারণা...ভালো হবে সবদিক দিয়ে।

শ্যামলেন্দু মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে বলল, তুমি তো আমার প্ল্যান-প্রোগ্রাম...ভাবনাচিন্তা সব গুলিয়ে দিলে বাবা!

অমৃতেন্দু হাসলেন, বললেন, কেন? কী এমন প্ল্যান-প্রোগ্রাম তোর যে গুলিয়ে দিলাম!

সাতাশ পেরিয়ে আঠাশ বছরে পড়ব বাবা..।

অমৃতেন্দু থামিয়ে দেওয়ার মতো বললেন, সেইজন্যই তো বলছি...খোঁজখবর নে...।

বাবার পরের কথাগুলো শ্যামলেন্দুর আর কানে গেল না। মনে হল জীবন সম্বন্ধে ভাবনাই যেন একটা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কোনোদিন ইংল্যান্ডে যাওয়ার একটা সূক্ষ্ম ভাবনা যে মনে ছিল না, এমন না। কিন্তু তার থেকে বেশি যেটা ছিল, তা হচ্ছে দেশেরই অন্য কোথাও দিল্লি-চণ্ডীগড় কিংবা ভেলোরে এম. সি. এইচ পড়তে যাওয়া...এবং সেইসূত্রে সার্জারির মধ্যেই আরও বিশেষ কোনো ট্রেনিং নিয়ে আসা...যেমন ল্যাপারোস্কোপিক কিংবা রোবোটিক সার্জারি ইত্যাদি।

না, সরকারি চাকরি নিয়ে কোনো গঞ্জ-মফস্সলের হাসপাতালে কাজ করতে যাওয়ার ভাবনাকে কখনো গুরুত্ব দেয়নি শ্যামলেন্দু। অমৃতেন্দু নিজেও একেবারে সেই প্রথম জীবনের পরে (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়েও) আর চাকরি করেননি। কাজেকর্মে যাতায়াত করতেন তৎকালীন বিহারের জামশেদপুর ধলভূমগড়...একেবারে রাঁচি, হাজারিবাগ পর্যন্ত। তখন থেকেই পাহাড়ি অঞ্চল লিজ নিয়ে ব্যবসা করার বিষয়টা মাথায় আসে। পাথর তথা স্টোনচিপস্-এর ব্যবসা। কয়েক বছরের মধ্যেই বুঝেছিলেন, এই ব্যবসায় শুধু যে লক্ষ্মীলাভ, বাড়ি-গাড়ি করে ফেলা, তাই না, বেশ কিছু স্থানীয় দুঃস্থ মানুষকে শ্রমজীবীর মর্যাদা দেওয়া যাবে। একইসঙ্গে মাঝেমধ্যে শহর কলকাতার বাইরে, শুনশান-ফাঁকা-পাহাড়ি-জঙ্গুলে এলাকায় বাস করাও যাবে।

ধলভূমগড় গঞ্জের, যাকে বলে, আউটস্কার্ট-এই নিজের বাংলো আর অফিস করেছিলেন অমৃতেন্দু। দিনে দিনে লোকজন, মেশিনপত্র... এমনকী সংক্ষিপ্ত রেল-যোগাযোগও করেছিলেন...। মুখার্জি এন্টারপ্রাইজ-এর পাথর আর স্টোনচিপস্ চালান হত পশ্চিমবঙ্গ অতিক্রম করেও অন্যান্য রাজ্যে। মালগাড়ির ওয়াগনে বড়ো বড়ো করে লেখা থাকত এম আর ই দুটো অক্ষর।

কসবা রাজডাঙার ছোটো বাড়ি-সহ সাড়ে সাত কাঠার জমিও তখনই কিনেছিলেন অমৃতেন্দু...সেই ষাটের দশকের শেষদিকে। পুরোনো বাড়ির ভোল পালটে তৈরি করে নেওয়া হয়েছিল বাসোপযোগী তিনতলা অট্টালিকা। খোলা উঠোন, বাগান, গ্যারাজ ছিল তারপরেও। হয়তো ভবিষ্যতের কথা ভেবেই ফাঁকা রেখে দিয়েছিলেন। অতঃপর শ্যামলেন্দু যখন কৃতী ছাত্র হিসাবেই ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিল, তখন থেকেই কি ভবিষ্যতে কোনোদিন একটা

চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ভাবনা অমৃতেন্দুর মাথায় ছিল! নাহ্ সেসব কিছুই তখনই আলোচনা করেননি...এমনকী তার অনেকদিন পরেও না।

ভাবনার ইচ্ছে আর অবকাশ ছিল না শ্যামলেন্দুরও। সেই বয়সে, ছাত্রাবস্থায় থাকার কথাও না।

মনে আছে শুধু, ধলভূমগড়ে বছরে দু-একবার করে বেড়াতে যাওয়ার আকর্ষণ ছিল তীব্র। কী অপূর্ব সুন্দর জায়গা যে ছিল তখন! হাওড়া থেকে ট্রেন কিংবা এসপ্ল্যানেড থেকে দূরপাল্লার বাসেও যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। থাকা, খাওয়া-দাওয়া, ধারেকাছে বেড়ানোর কোনোই সমস্যা ছিল না তখন। রহড়াগোড়া-বেলপাহাড়ি-গালুডি-হাতিবাড়ি, সুবর্ণরেখা নদীর ধারে ধারে আরও কত জায়গা... শিমুলতলা-ঘাটশিলা-মধুপুর-গিরিডি পর্যন্তও কতবার চলে গেছে জিপ নিয়ে...পরবর্তীকালে বন্ধুদের নিয়েও...।

পাশ করার বছরখানেকের মধ্যে, ক্যান্সারে মা-এর মৃত্যুই যেন গত দু-আড়াই বছরে অনেকটা বড়ো করে দিল শ্যামলেন্দুকে। ভাগ্যিস সুপ্রীতির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল মা-এর মৃত্যুর বছর দুই আগে...নয়তো একা অমৃতেন্দু কতটা সব ভার সামলাতে পারতেন সন্দেহ ছিল। প্রায় মধ্যপঞ্চাশে তাঁর তো তখন ব্যস্ততাও চূড়ান্ত। প্রতি মাসেই কয়েকদিন করে গিয়ে থাকতেন ধলভূমগড়ের বাংলোয়...সেটাই ছিল তাঁর দ্বিতীয় ঠিকানা। তা সত্ত্বেও শ্যামলেন্দু জানে, মা-এর চিকিৎসার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনি বাবা...এমনকী বম্বের ব্রিচক্যান্ডি হাসপাতালেও নিয়ে গিয়েছিলেন অমৃতেন্দু...সে ক্ষমতাও তাঁর ছিল।

শ্যামলেন্দু জানে, খুব সিরিয়াস ধরনের ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছিল সুপ্রভার, তার ওপর গ্রেড থ্রি...লিম্ফ গ্ল্যান্ড থেকে মেটাস্টেসিস্ হয়েছিল লিভারে...তারপর জন্ডিস এবং অ্যাসাইটিস (পেটে জল জমা) হয়ে মারা যান সুপ্রভা।

সত্যি সত্যিই ভেঙে পড়েছিলেন অমৃতেন্দু। আর তখন থেকেই একটু একটু করে ধলভূমগড়ের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে শুরু করেছিলেন। বাংলো-বাগান সবই রাখা ছিল কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য দু-তিনজনের হাতেই ব্যবসা ছেড়ে দিচ্ছিলেন। ইদানীং মাসে একবারের বেশি আর যান না ধলভূমগড়ে।

রাধাপিসি যেন সত্যি ঈশ্বরপ্রেরিত। একা বিধবা মানুষ। অমৃতেন্দুর সঙ্গে ছোটোবেলা থেকে পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতোই সম্পর্ক ছিল। বর্ধমানের অবস্থাপন্ন পরিবারের বউ হলেও, মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে নিঃসঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন শ্বশুরবাড়িতে। তাঁদের দিক থেকে অবশ্য রাধাপিসিকে বাড়ির বউ হিসেবে সম্মানিত ভূমিকায় রাখার ত্রুটি ছিল না কোনো। অর্থনৈতিক ভাবেও রাধাপিসি শুধু তখন না...এখনও যথেষ্ট সুরক্ষিত। একইসঙ্গে শিক্ষা, রুচি এবং আত্মসম্মানবোধ সম্পন্না মহিলা। বর্ধমান থেকে কলকাতায় কয়েকবার আসা-যাওয়ার মধ্যেই, বিশেষ করে, সুপ্রভার মৃত্যুর পরে, কীভাবে যেন পুরোনো ভাই-বোনের সম্পর্কই ভদ্রমহিলার ঠিকানা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল কসবায়। নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিলেন অমৃতেন্দুই না শুধু...শ্যামলেন্দুও।

কিছুক্ষণের নৈঃশব্দ্য অতিক্রম করে অমৃতেন্দুই আবার বললেন, হ্যাঁরে, কী হল! তোকে কি বিলেত যাওয়ার কথা ভাবতে বলে খুব আতান্তরে ফেলে দিলাম!

শ্যামলেন্দু হেসে বলল, ঠিক তা নয়...সাজেশনটা তো ভালোই দিয়েছ এবং রাইট ইন টাইম।

তাহলে আর ভাবছিস কেন? আমার জন্য চিন্তা করিস না...তুই কয়েক বছর বিলেতে থাকার সময়ে আমার কিছু হবে না...বরং আমারও সুযোগ হবে ওই সময় ঘুরে আসার।

শ্যামলেন্দু কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রাধা বেরিয়ে এসেছিলেন তখনই। কোনো ভূমিকা ছাড়াই বললেন, তোদের বাপ-ছেলের কথা শুনছিলাম তখন থেকেই...।

অমৃতেন্দু বললেন, তাহলে বল রাধু...আমি কি অযৌক্তিক কিছু সাজেস্ট করেছি বাবুকে?

কসবার রাজডাঙা বড় শান্ত নিবিড় জায়গা। বড়ো বড়ো গাছপালার ছায়ায় পথঘাট ঢাকা থাকে এখনও। অমৃতেন্দু ইচ্ছে করেই একটু বেশি জমিওয়ালা সম্পত্তি কিনতে চেয়েছিলেন। কাঁঠাল, নিম ছাড়াও শিউলি আর কাঠচাঁপার গাছ ছিল বলে তাঁর পছন্দ হয়েছিল ওই জায়গা। হয়তো ভবিষ্যতের কোনো ভাবনাও ছিল। বাড়ি, জায়গা পছন্দ হয়েছিল সুপ্রভারও।

পুরোনো দোতলা বাড়ির বেশ কিছুটা রেখেই অমৃতেন্দু নিজের প্ল্যান অনুযায়ী সুন্দর তিনতলা বাড়ি তৈরি করে নিয়েছিলেন। একতলা ভাড়া দিয়েছিলেন প্রায় বন্ধুস্থানীয় এক অধ্যাপককে। দরকার কিছু ছিল না ভাড়া দেওয়ার। নিজেদেরও প্রয়োজন ছিল না। সত্যি বলতে কি সুপ্রভা চলে যাওয়ার পরে এখন একতলার সেই অরবিন্দবাবুরাও প্রায় তাঁদের আত্মীয়সমই বলা যায়। হয়তো আর খুব বেশিদিন থাকবেন না...নিজেরা ফ্ল্যাট কিনে চলে যাবেন ভাবছেন।

কসবার চেহারাও যে বদলাচ্ছে অমৃতেন্দু টের পান। ইস্টার্ন বাইপাস রাস্তাটা নাকি কলকাতার পূর্ব আর দক্ষিণ জুড়ে দেবে ভবিষ্যতে। কিছু গাড়ি চলাচল শুরু হয়েছে এখনই পার্ক সার্কাসের দিক থেকে যাদবপুর পর্যন্ত। তার মধ্যেই কসবা অঞ্চলের জমির দামও হু হু করে বাড়তে শুরু করেছে। বেশ কয়েকটা ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরির উদ্যোগও শুরু হয়েছে অমৃতেন্দু জানেন। তাহলেও রাজডাঙায় তাঁদের এলাকার পরিবেশটা এখনও ভালোই বলা উচিত। খোলামেলা ভাব আছে। আলো-বাতাস যাতায়াত করে যথেষ্ট। এই বৈশাখ মাসেও পাখা না চালিয়ে দোতলার বারান্দায় দিব্যি বসতে পারেন। গাছের ছায়া এসে পড়ে।

শ্যামলেন্দু খেয়াল করল রাধাপিসি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন টেবিলের আর একধারে।

অমৃতেন্দুর কথার সূত্রেই বসতে বসতে বললেন, না, অযৌক্তিক কেন হবে! সুযোগ থাকলে ডাক্তার হয়ে বিলেত যাবে...এর থেকে ভালো আর কী হয়!

শ্যামলেন্দু বলল, পিসি...ডাক্তার হয়েছি চার বছর হয়ে গেল...!

সে আমি জানি। পাশ করার পরে চার বছর তো কিছুই না... তারপর তুই আবার সার্জেন হতে যাচ্ছিস...।

তারজন্য অবশ্য সময় লাগবে গো...। শ্যামলেন্দু

বলল।—আরো পড়াশোনা, ট্রেনিং...কাজ শিখতে হবে। হাতের কাজ তো!

রাধা বললেন, সেইজন্যই তো আমিও তোর বাবাকে সাপোর্ট করছি...বিলেত যাওয়ার এটাই ঠিক সময়...।

অমৃতেন্দু সমর্থন পেয়ে বলে উঠলেন, দেখেছিস!...একটু থেমে বললেন, তোর মা বেঁচে থাকলেও এই কথাই বলত।

রাধা বললেন, তবে আমি আর একটা প্র্যাক্টিক্যাল দিকের কথাও বলব...হয়তো সুপ্রভাও থাকলে বলত।

অমৃতেন্দু চশমার ওপর দিয়ে তাকালেন।—সেটা কী বল তো!

দু-এক মুহূর্ত সময় নিয়ে রাধা বললেন,...মানে...বাবুর কোনো গার্লফ্রেন্ড আছে কি না জানি না। তবে থাক বা না-থাক যেটাই হোক, বিলেত যাওয়ার আগে...আমি বলি...শুভকাজটা সেরে... সঙ্গে বউ নিয়ে যাওয়াই ভালো।

অমৃতেন্দু মাথা দুলিয়ে বলে উঠলেন, এটা তো দারুণ বলেছিস রাধু...! মাথায় আসা উচিত ছিল।

শ্যামলেন্দু বলল, ওরে বাবা...এখন বিয়ে! তাহলে আর বিলেত গিয়েই বা কী হবে! এফ আর সি এস-এর জন্য পড়ব... ট্রেনিং জব করব...নাকি বউ সামলাব?

রাধা বললেন, কিন্তু তার আগের কথাটার উত্তর দিলি না?

কোনটা পিসি? গার্লফ্রেন্ড? শ্যামলেন্দু হেসে বলল, পাশ করেই হাউসস্টাফ, তারপর এম. এস-এর জন্য পড়া...এর মধ্যে মা চলে গেল...কোথায় সময় পেলাম বলো!

গার্লফ্রেন্ড-এর জন্য সময় কি আর বলে-কয়ে আসে! হওয়ার থাকলে আপনি হত।

না পিসি...আমার সত্যিই সময় হয়নি ওসব দিকে নজর দেওয়ার। তা বলে তোমরা কিন্তু এখনই উদ্যোগ নিও না।...

অমৃতেন্দু বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তুই এখন আগে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে খোঁজখবরগুলো নে...ফেলে রাখিস না।

রাধা বললেন, তোকে আর একটা কথা বলি বাবু। বউকে সামলানোর কথা বললি তো! আজকাল তার উলটোটাও কিন্তু চোখে পড়ে। বরকে তো বটেই, আরও অনেক কিছু বউ-ই সামলায়।

তা...মিথ্যে বলোনি পিসি। তবে আমার জন্য এসব ভাবনা এখনই কোরো না তোমরা।...

বিলেত যাওয়ার জন্য ডাক্তারদের পরীক্ষায় বসতে হয় জানা ছিল শ্যামলেন্দুর। কিন্তু যাওয়ারই যখন কোনো পরিকল্পনা নেই, তখন আর বিশদ খোঁজ নিয়ে কী হবে—এই মানসিকতা থেকেই আর এগোয়নি। ইচ্ছে করলেই অবশ্য খোঁজখবর নিতে পারত। এম. এস পরীক্ষার পরে তো এমনিতেই কিছুটা ঢিলেঢালা সময় কাটছে। নিয়মিত ক্লাস করা বা হাসপাতালে কাজ করতে যেতে হয় না। প্রায়ই অবশ্য চেনাজানা স্যার কিংবা সিনিয়র দাদা সার্জেনদের ডাক আসে শ্যামলেন্দুর কাছে...এবং সেটা তাঁদের কোনো অপারেশনে তথাকথিত 'অ্যাসিস্ট' করার জন্য।

ব্যাপারটা ভালোই। একইসঙ্গে কাজকর্মের মধ্যে থাকা, শেখা এবং কিছু উপার্জনও হয়।

এবার তার সঙ্গে যুক্ত হল ইংল্যান্ডে যাওয়ার ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া, কেননা অমৃতেন্দু যেভাবেই হোক ওকে যে উৎসাহিত করেছেন তাইতে সন্দেহ নেই। পৃথিবী আগের থেকে ছোটো হয়ে গেছে, কথাটা শোনা যায় বটে। সেক্ষেত্রে শ্যামলেন্দুর আরও কিছু শিক্ষানবিশির জন্য মুম্বাই-চেন্নাইয়ের বদলে যদি উন্নত আর একটি অন্য দেশে কাজ শেখা এবং পড়াশোনার সুযোগ পাওয়া যায়, তাহলে এখনই তার উপযুক্ত সময়। কেননা, শেষ পর্যন্ত তার জীবিকা নির্বাহ এবং কর্মজীবন যে কলকাতাতে তথা দেশেই অতিবাহিত হবে, তাইতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাবার সঙ্গে আলোচনাকালে আরো কতকগুলো যুক্তিও মনে ধরেছে শ্যামলেন্দুর।

অমৃতেন্দু বলেছিলেন, আমি তোকে কখনও বিদেশে জীবনযাপন করার কথা বলছি না বাবু। কিন্তু বিদেশে যাওয়ার দরকার আছে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবনা আর কর্মক্ষেত্রের উৎকর্ষতা, সিস্টেম, ম্যানেজমেন্ট...এইসবের কম্পারিজন্-এর জন্য। তুলনা না করলে, তুই বুঝবি কী করে যে, তোর অবস্থানটা কোথায়!

শ্যামলেন্দু মাথা নেড়ে বলেছিল, হ্যাঁ...ঠিকই বলেছ।

অমৃতেন্দু বলেন, আমি কিন্তু কখনোই বলি না, বিলেত-আমেরিকায় সব ভালো, আর আমাদের এখানে সব যাচ্ছেতাই। তা কখনো হতেই পারে না। কিন্তু কোনো কোনো দেশে, কিছু কিছু ব্যাপার, আমাদের দেশের থেকে ভালো, উন্নত। যদি আমাদের সুযোগ থাকে, তাহলে সময় থাকতে আমাদের সেগুলোকে অন্তত দেখে- শুনে, বুঝে আসতে পারলে ভালো।

শ্যামলেন্দুর মনে ধরেছিল কথাগুলো।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পরে বলেছিল, অনেকে না গিয়ে, না দেখে, না বুঝে, নিজেদের পুরোনো ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে এখনও এই যুগেও এমন সব মন্তব্য করে, তাকে বোকামি আর একপেশেই বলা যায়।

আসলে তারাই কুয়োর ব্যাং। যে-কোনোকিছুর সমালোচনা করতে গেলে, কিংবা মন্তব্য করতে গেলে, আগে তো তার সম্পর্কে জানতে হবে! তা নয়তো সব ব্যাপারটাই তো হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে আবার হীনম্মন্যতা থেকেও অনেক কথা বলে। ডাক্তারি ব্যাপারে তো বিশেষ করেই ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির ব্যবস্থা দেখে আসা উচিত।

শ্যামলেন্দু বলল, ডাক্তারদের তো তবু যাতায়াতের সুযোগ আছে...হয়। কিন্তু অন্যান্য প্রোফেশনের অনেককেও দেখেছি, যেন বড্ড বেশি আত্মতুষ্ট...পৃথিবীটার ব্যাপ্তি বৈচিত্র নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই...অথচ কথা বলতে গেলে...।

অমৃতেন্দু থামিয়ে দিয়ে বলেন, অত ভেবে লাভ নেই। যে-কোনো কারুর কাছে তার নিজের দেশের থেকে সুন্দর তো আর কিছু হতে পারে না, কেননা সেটা তার জন্মভূমি। সেই কারণে একটা প্রবল আবেগ মিশে থাকে। কিন্তু সেই আবেগ দিয়ে তো গোটা বিশ্বকে বিচার করা যায় না...সেখানে প্র্যাক্টিক্যাল হতে হয়। প্র্যাক্টিক্যাল হলে সমালোচনা করতে তো হবেই। সমালোচনা মানেই তো খারাপ না, ভালো-মন্দ দুই-ই থাকে। সীমাবদ্ধতাকে মানতে পারাও তো শিক্ষা।

শ্যামলেন্দু বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলল মাস দুয়ের মধ্যেই।

একটা সন্দেহ হচ্ছে...ইটস নট ওনলি স্টোন।

প্ল্যাব (PLAB—Professional and Linguistic Assessment Board) টেস্ট-এর কথা আগেই জানা ছিল। যেসব ডাক্তাররা ইংল্যান্ডে গিয়ে ডাক্তারি করতে চায়, তারা উপযুক্ত মানের কিনা তারই যাচাই করা হয় এই টেস্টে। দুটি পর্ব। প্রথমটি মূলত ভাষা সম্পর্কিত। কথা বলা এবং ওদেশের কথা বোঝার টেস্ট। এই পর্ব দেশেই করা যায় এবং তার সাফল্যের ফলাফল নিয়ে ভিসা পাওয়া এবং দ্বিতীয় পর্ব ওদেশে গিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। টেস্ট দেওয়ার জন্য ফিজ্ আছে।

প্ল্যাব-টেস্ট-এ পাশ করলে ইংল্যান্ডের স্বাস্থ্যদপ্তরে কাজ করা, পড়াশোনা সবকিছুরই ছাড়পত্র পাওয়া যায়।

শ্যামলেন্দু জানত ওর পক্ষে ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এমনকিছু কঠিন ব্যাপার হবে না। কোথাও একটু আত্মাভিমানে লাগারই কথা, কেননা, নিজের দেশে কৃতকার্য হওয়ার পরে আবার টেস্ট দেওয়ার কথা ভেবে। কিন্তু ও ব্যাপারে সত্যি তো কিছু বলার নেই। দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং পাশ করা ডাক্তারদের মান সম্বন্ধে অন্য দেশ কেন, নিজের দেশের মানুষজনও কি পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন! অন্তত এক শ্রেণির ডাক্তারের ওপর কি ভরসা করা যায়!

বিদেশযাত্রার আয়োজনের মধ্যেই ভবিষ্যৎ ভাবনার আলোচনাও শুরু হয়েছিল।

কসবা রাজডাঙার মতো জায়গায় অদূর ভবিষ্যতে চিকিৎসালয় নির্মাণ নিয়ে মাঝেমধ্যেই কথাবার্তা হচ্ছিল অমৃতেন্দুর সঙ্গে। ছেলেকে জানিয়েছিলেন, অনেকদিন আগে থাকতেই তিনি এমন পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখেছিলেন...এমনকী এখনও বাড়ির সঙ্গে প্রায় সাড়ে চার কাঠা জমি রয়েছে, সেখানে নতুন কনস্ট্রাকশন-এর ভাবনাও তাঁর মাথায় আছে।

নানান ভাবনা, পরিকল্পনা নিয়েই এক বর্ষার সন্ধ্যায় লন্ডনের উদ্দেশে পাড়ি দিল শ্যামলেন্দু।

শাওয়ারের জলে ভিজতে ভিজতেও নিজেকে সচেতন করলেন শ্যামলেন্দু। অ্যানেসথেটিস্ট ডাক্তার সোম দেরি করে

আসবেন বলে কিছু অতিরিক্ত সময় পাওয়া গেছে অপারেশন শুরুর আগে। তাহলেও বেশি রিল্যাক্সড না হয়ে যাওয়াই ভালো। আসলে পনেরো মিনিট বলা মানে, ডাক্তার সোম আধঘণ্টার আগে আসতে পারবেন না। তার মানে অপারেশনের সময় ন-টা বলা থাকলেও, শুরু হতে হতে সেই দশটাই হয়ে যাবে।

তাহলেও মোটামুটি ঠিক আছে সময়ের দিক থেকে। অপারেশনের পরে রুগিকে অজ্ঞানের ঘোর থেকে ফিরিয়ে এনে বেড-এ দিতে দিতে লাঞ্চ-এর সময় হয়ে যাবে...মানে সাড়ে বারোটা-একটা। বেরোনোর তাড়া নেই শ্যামলেন্দুর। অন্যদিন হলে, কিংবা অন্য কোথাও আর কোনো কাজ থাকলে মুশকিল হত। অপারেশন মানেই একটা টিমওয়ার্ক। একটা চেন-এর মতো চলতে থাকে সব কিছু। একজনের সমস্যা হলেই অন্যদেরও পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। আবার অপারেশনের মতো একটা দায়িত্বের কাজে, সবসময় সবকিছু সময়মতো চলবেই, তা ধরে নেওয়া যায় না।

অজ্ঞানবাবুদের নিয়ে অবশ্য সার্জেনদের মাঝে-মধ্যে কিঞ্চিৎ বেশিই বিব্রত হতে হয়।

না, শ্যামলেন্দু তা নিয়ে খুব বেশি ভাবেন না। একটু ওঁদের দিকটাও ভাবতে হয় বইকি! বিভিন্ন সার্জেনদের ডাকের ওপর ওঁদের প্র্যাকটিস, রোজগার নির্ভর করে...তা সে জেনারেল সার্জেন, অর্থোপেডিক, গাইনি, ইএনটি...যাই হোক না কেন। অপারেশনের সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, সাধারণত তার আগে-পরে অ্যানেসথেটিস্টদের সেরকম কোনো দায়িত্ব থাকে না। সার্জেনদের তুলনায় তাঁদের খ্যাতি, ইনকামও স্বাভাবিকভাবেই কম। অপারেশনের শতকরা কুড়ি ভাগ মতো ফিজ্ বরাদ্দ থাকে অ্যানেসথেটিস্ট-এর জন্য। সুতরাং সুযোগ থাকলেই তাঁরা অন্যান্য সার্জেনদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করেন এবং মাঝেমধ্যে সময়ের টানাটানি পড়ে যায়। একটু মানিয়ে নিয়ে চলতেই হয়। নয়তো তাঁরা কিঞ্চিৎ হীনম্মন্যতায় ভোগেন।

সার্জেনদের অবশ্য ডিগ্রি পেলেই এবং বিলেত থেকে ঘুরে এসে বসলেই প্র্যাকটিস জমে যাবে এমন না।

প্রথম কথা পড়াশোনা করে কঠোর পরীক্ষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেতে শ্রম এবং মেধা খরচ করতে হয়। তার আগে-পরেও হাতেকলমে ধারাবাহিক কাজ করতে করতে শেখা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শুধু পড়াশোনা অর্থাৎ থিয়োরিটিক্যাল জ্ঞান থাকলেই কেউ সার্জেন হয় না—। তাকে একইসঙ্গে শরীরের অন্ধিসন্ধি জেনে, ব্যাধির চরিত্র বুঝে, তারপর কাটা-ছেঁড়া এবং মেরামতের নিখুঁত টেকনিক জানতে হয়। শরীরের অভ্যন্তরীণ এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি, অরগ্যান সম্পর্কে সার্জেনের সম্যক ধারণা এবং বিকল হলে তার পরিবর্তিত রূপ সম্পর্কেও অবহিত হতে হয়। শরীরের স্বাভাবিক এবং অসুস্থ কোনো অংশের মধ্যে চরিত্রগত তফাত কী এবং কতখানি বুঝতে হয় শল্যচিকিৎসককে।

সেই বোঝার ওপরেই নির্ভর করে তাঁর সিদ্ধান্ত—কতটা কেটে বাদ দিতে হবে এবং কতটা রাখতে হবে এবং রাখার পরেও নিশ্চিত হতে হবে সেই অংশের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা সম্পর্কে। নেহাত সহজ ব্যাপার নয়।

আর সেই কর্মকুশলতা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে গিয়ে বয়সও যে বসে থাকবে না, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং পূর্ণ আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করে সার্জেন হতে হতে বয়স অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। জীবন্ত মানুষের শরীরে ছুরি দিয়ে কাটা, রক্তপাত এবং আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়াকে সাময়িকভাবে উপেক্ষা করে, অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসুস্থ অংশ কেটে বাদ দেওয়ার কারিগর শল্যচিকিৎসক। সেই কারিগরির উদ্বেগ, উৎকণ্ঠাও কি কম!

শ্যামলেন্দু বুঝতে পারেন, একইসঙ্গে জ্ঞান-মেধা-মনুষ্যত্ব এবং অভিজ্ঞতা ব্যতীত শল্যচিকিৎসক হওয়া সম্ভব না। হয়তো অন্যান্য জীবিকার ক্ষেত্রেও এ জাতীয় গুণের সমাহার জরুরি, তা সত্ত্বেও সার্জেনের ভূমিকা, তাঁর কর্মক্ষেত্রে জীবিকাকেও সম্ভবত অতিক্রম করে যায়, কেননা তাঁর কারিগরি বিদ্যা ফলিত হয় জীবন্ত মনুষ্য শরীরের ওপর। তাঁর ফলিত জ্ঞানের অভাব কিংবা কর্মনৈপুণ্যের গাফিলতিতে যা হতে পারে, তার নাম প্রাণসংশয়। সুতরাং এক অর্থে প্রাণ হাতে নিয়ে কাজ করতে হয় সার্জেনকে। তাঁর মধ্যে শিল্পীর আবেগ নয়, প্রাণের বাস্তবতাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। তুলনাহীন সে দায়িত্ব।

অথচ জ্ঞান মেধা অভিজ্ঞতা কৌশল নিয়ে কাজ করতে করতে কিছু মানুষ অভ্যস্তই হয়ে ওঠেন এহেন কাজে। মানুষের শরীরে কাটা-ছেঁড়া, বাদ দেওয়া, জোড়া লাগানোর মতো আপাত-অশান্তির কাজই হয়ে ওঠে তাঁর ব্রত, জীবিকা। যে ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করে একজন হত্যা করতে পারে, সেই অস্ত্রর উপযুক্ত ব্যবহারেই ঘটে রোগমুক্তি, জীবনের প্রত্যাশা। মাঝে মাঝেই শ্যামলেন্দুর মনে হয়, সার্জেনের কাজটা যেন তারের ওপর দিয়ে হাঁটা...এদিক-ওদিক হওয়ার উপায় নেই। সত্যি কী বিপজ্জনক আর ঝুঁকির!

স্নান সেরে ঘরে এলেন শ্যামলেন্দু। খেয়াল করলেন দেয়ালঘড়িতে প্রায় সাড়ে নটা।

নাহ্ এখনও নীচে থেকে অর্থাৎ পুরোনো বাড়ি থেকে ডাক আসেনি...যার অর্থ অ্যানেসথেটিস্ট ডাক্তার সোম এখনও এসে পৌঁছোননি। অবশ্য এই নতুন বাড়ির ব্যালকনি থেকে মুখ বাড়ালে শ্যামলেন্দু নিজেই দেখতে পেতেন, শুকতারা নার্সিংহোমের ড্রাইভওয়েতে ডাক্তার সোমের চেনা গাড়ি রয়েছে কিনা! রাজডাঙায় নিজেদের পুরোনো বাড়ির সংলগ্ন ফাঁকা জমিতে এই নতুন বাড়ি তৈরির সময়েই, শ্যামলেন্দু বলে রেখেছিলেন, বাড়ির ডিজাইন যেন এমনভাবে করা হয়, যাতে প্রতিটি ফ্লোর-এর ব্যালকনি থেকে নার্সিংহোমের গেট এবং ড্রাইভওয়ে পর্যন্ত দেখা যায়।

স্নানের পরে প্রতিদিন নিজেদের শোওয়ার ঘরে রাখা বাবা-মার ছবিতে প্রণাম করা অভ্যাস শ্যামলেন্দুর। সকালে হাঁটতে যাওয়ার আগে বা পরে যেমন একবার পুরোনো বাড়ির চেম্বারে ঠাকুর আর মায়ের ছবির সামনে একটু প্রার্থনা করেন, তেমনই স্নান সেরে এসে নিত্যদিন প্রণাম করেন বাবা-মার ছবি দেখে। হয়তো নেহাতই অভ্যাস...নাকি সংস্কার, নাকি তুষ্টি! ব্যাখ্যাটা শ্যামলেন্দুর কাছেও নেই। আশ্চর্য যে শ্যামলেন্দুর অভ্যাস দেখতে দেখতে, বিদেশিনি বধূ অ্যাঞ্জেলাও ইদানীং স্নানের পরে অমৃতেন্দু এবং সুপ্রভার ছবি দেখে হাতজোড় করে প্রণাম করেন। অথচ সুপ্রভাকে তিনি তো

কোনোদিন চোখেও দেখেননি। শ্যামলেন্দুর সঙ্গে দেখা হওয়ার কত বছর আগেই তো প্রয়াত হয়েছেন সুপ্রভা।

অমৃতেন্দুকে অ্যাঞ্জেলা অবশ্যই দেখেছেন ঘনিষ্ঠভাবে...এমনকী সম্বোধনও করতেন 'বাবা'-বলে। কলকাতায় বাড়ির বউ হিসাবে আসার আগেই অ্যাঞ্জেলা অমৃতেন্দুকে দেখেছিলেন ইংল্যান্ডে... ডেভনশায়ারে। তারপর তো বেশ কয়েক বছরই...।

আগে আগে কখনও অ্যাঞ্জেলা দু-একবার প্রশ্নও করেছেন শ্যামলেন্দুকে।

বাবা-মার ছবি দেখে তুমি প্রণাম করো কেন স্যাম?

শ্যামলেন্দু সদুত্তর দিতে পারেননি...হয়তো দেওয়া যায় না বলেই। কিন্তু সত্যি কথাই বলেছেন, রিয়্যালি ডোন্ট নো। কিন্তু কোথাও একটা ভালো লাগে।

ইয়েস আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। ভালোলাগার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, আমি তাও জানি।

শ্যামলেন্দু মাথা নাড়েন।—আরও একটা ব্যাপার আছে অ্যাঞ্জি।

তাই? কী বলো।

আমরা যে কাজই করি, তাইতে সফল হতে চাই। তাই না?

ইয়েস...অফকোর্স।

কিন্তু একটা জিনিস ভেবে দ্যাখো, তুমি যতই কাজ জানো, এফিসিয়েন্ট হও, সিনসিয়ারলি কাজ করো না কেন...শেষ পর্যন্ত তুমি সাকসেসফুল হবে কি হবে না, তার কোনো গ্যারান্টি নেই। আছে?

অ্যাঞ্জেলা একটু চিন্তিত মাথা নেড়ে বলেন, হওয়াটাই উচিত, তবে গ্যারান্টি নেই তাও ঠিক। এবং স্যাম...সেটা যে শুধু তোমার মতো সার্জেনদের ক্ষেত্রে তাই নয়। ভেবে দেখলে, জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে, যেকোনো জীবিকার ক্ষেত্রেও।

অ্যাবসল্যুটলি রাইট। কিন্তু তাহলে বলো, গ্যারান্টি নেই কেন? তুমি তো ফাঁকি দাওনি কোথাও? তা সত্ত্বেও...।

ব্যাড লাক ছাড়া আর কী বলব স্যাম!

ঠিক তাই। লাক বলো, কিংবা সীমাবদ্ধতা বলো, কিংবা অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল এরর বলো...কিছু একটা ব্যাপার আছে, যা অনেক সময় আমাদের প্রত্যাশার সঙ্গে মেলে না। কিন্তু কেন মেলে না, সেটা আমাদের জ্ঞান, বোধবুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যাও করতে পারি না। ঠিক কি না বলো!

ঠিক বলেছ। সব ঘটনা কিংবা প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা যায় না।

অথচ তার যে একটা অদৃশ্য শক্তি বা পাওয়ার আছে, তা কি তাহলে অস্বীকার করা যায়?

না...অস্বীকার তো করা যায় না!

একটু হেসে শ্যামলেন্দু বলেন, আমি আসলে ওই শক্তিটাকে প্রণাম করি অ্যাঞ্জি। মনে মনে বলি, রক্ষা করো।

কিন্তু...তুমি তো ঘরে বাবা-মার ছবি, আর চেম্বারে ঠাকুর আর শ্রীমাকে প্রণাম করো...।

ওঁদের ছবির মধ্যে দিয়ে আমি সেই শক্তিকে অনুভব করতে চাই...মাথা নীচু করি তাঁর কাছেই। আমাদের যে সীমাবদ্ধতা, আমাদের যা কিছু ব্যাখ্যা এবং নিয়ন্ত্রণের উর্ধ্বে—আমি প্রণাম করতে চাই তাদেরই।

তার মানে স্যাম...ধরো ওখানে বাবা-মা, ঠাকুরের ছবির বদলে যদি...একটা সুন্দর কোনো দৃশ্য বা এভারেস্ট-এর ছবি, কিংবা একটা মেপ্‌ল গাছ, দুটি শিশু, একগুচ্ছ ফুল, একটা উড়ন্ত বিমান...একটা...।

হ্যাঁ অ্যাঞ্জি...হয়তো যেকোনো কিছুই থাকতে পারত...একটা ঠাকুর, একটা যিশু, একটা শিবলিঙ্গ...একটা চাঁদ-তারা...কিংবা যা কিছু তুমি বললে...যেকোনো কিছু থাকলেও চলত...কেননা, আমাদের কালচার হচ্ছে কোনো একটা আকার বা অবয়বের দিকে তাকিয়ে, তাকে পরম শক্তিরূপে কল্পনা করে নিজের শ্রদ্ধা জানানো এবং একইসঙ্গে যাতে নিজের সীমাবদ্ধতাকে, দুর্বলতাকে, অতিক্রম করতে পারি, তার জন্য প্রার্থনা করা।

তাহলে বাবা-মায়ের ছবি...!

ছবির মধ্যে দিয়ে আমি বাবা-মার অস্তিত্ব অনুভব করি, এবং সেটাই আমার কাছে সব থেকে বড়ো চেনা এবং সত্য মনে হয়। পাহাড়-অরণ্য-ফুল-দেবদেবতা...সবকিছুর থেকে বেশি। মনে করি ওই সত্যটাই আমার সেই শক্তির আধার...।

তার মানে কি ভগবান? গড?

আই ডোন্ট্ নো...মানুষের তো কতকিছুই অজানা আছে!

তুমি তো বিজ্ঞানের সাধনা করো স্যাম...। বিজ্ঞান কি ভগবানের অস্তিত্বকে মানে?

ভগবান বলে কিছু নেই, তাও কি বিজ্ঞান বলেছে কখনও? বিজ্ঞান ভগবানকে খুঁজে পায়নি।

তুমি কি খোঁজার চেষ্টা করো?

আমার বোধহয় এখনও সেই সময় হয়নি অ্যাঞ্জি...। কখনও হলে, হয়তো করব। তবে কী নামে তা জানি না।

যারা বাবা-মাকে ভালোবাসে না, তারা কী করবে স্যাম?

তারা নেহাতই অভাগা। তাহলেও তাদের প্রার্থনা করতে হবে। দেয়ালের সামনে বসেও করতে পারে। আমাদের দেশে ব্রাহ্মরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করে। তাদের ছবি, ঠাকুর, প্রতিমা কিচ্ছু নেই...আকারহীন কিছু একটা...।

আমি কি যিশু আর মেরির একটা ছবি রেখে প্রার্থনা করতে পারি স্যাম?

অফকোর্স মাই ডার্লিং...এটা আবার আমাকে জিজ্ঞেস করতে হয়...! যা তোমার ইচ্ছে...।

ইন্টারকম-এ একবার ডিংডং শব্দেই সংবিৎ ফিরল শ্যামলেন্দুর। এটা অপারেশন থিয়েটার থেকে এত্তেলা পাঠানো হয়েছে তাঁর কাছে। অর্থাৎ ডাক্তার সোম এসে পড়েছেন...। জামা-প্যান্ট গলিয়ে নিতে নিতে শ্যামলেন্দু ভাবলেন, বাড়ির লাগোয়া নার্সিংহোম থাকার কত সুবিধে! ভাবনার ভেলায় ভাসতে ভাসতে অন্য কোথাও চলে গেলেও, কাজের জায়গায় পৌঁছোতে সময় লাগবে না। বাবা-মার ছবি দেখতে দেখতে কতকিছু ভাবনা...স্মৃতি রোমন্থনও হয়ে গেল।

নিশ্চয়ই অতীশ আর নাসিমাও এসেছে এবং তৈরি হয়ে ওটি-তে ঢুকেছে। কিন্তু অজ্ঞান হওয়ার আগে একবার রুগি...এক্ষেত্রে অবশ্য রোগিণীর সঙ্গে সার্জেনের দেখা হওয়াটা নিয়মের মতো। শ্যামলেন্দু ওটির দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে, সবাইয়ের উদ্দেশে তাঁর উপস্থিতি জানান দেওয়ার মতো বললেন, গুড মর্নিং...চলো আমি আসছি।...

পোশাক বদলে নিলেন শ্যামলেন্দু। সবুজ রঙের পাজামা, ফতুয়া। একই রঙের টুপি এবং মাস্ক।

অপারেশন থিয়েটারের বাইরেই একটু বড়ো সার্জেনস রুম। একদিকে ভারী পর্দা টানা পোশাক বদলানোর জায়গা। পর্দা সরিয়ে দিলেই পুরো একটানা ঘর। এই ঘরেরই আর একদিকে পাশাপাশি দুজনের রীতিমতো ঘষে ঘষে কনুই থেকে আঙুল পর্যন্ত হাত ধোওয়া...যাকে ডাক্তারি ভাষায় স্ক্রাব করা বলে, তার জায়গা।

হাত ধোওয়ার আগেই একবার ওটি-র ভেতরে ঢুকলেন শ্যামলেন্দু। রোগিণীকে মুখ দেখাতে হবে, ডাক্তার সোমকেও।

বলতে বলতেই ঢুকলেন, রূপকদা খুব বেশি তাড়াহুড়ো করতে হয়নি তো?

না ভাই...ঠিক আছে। রুগির মাথার দিক থেকে ডাক্তার সোম একটু নরম গলায় বললেন, দেবিকা রায়ের একটা এমার্জেন্সি সিজারিয়ান ছিল। তোমার এখানে কেস রয়েছে বলেই আর আপত্তি করিনি...দেবিকা বলেছিল, দরকার হলে ও-ই তোমাকে ফোন করবে একটু ডিলে করার জন্য...।

তার কোনো দরকার হয়নি দাদা...উই আর অল ওকে।

রুগির কাছে...ওটি টেবিল-এর সামনে এগিয়ে গেলেন শ্যামলেন্দু। মুখ থেকে মাস্ক নামিয়ে বললেন, মিসেস ঘোষাল...ঠিক আছেন তো! নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়বেন এবার...ঠিক আছে!

হ্যাঁ ডাক্তার মুখার্জি...। সকালে আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম...চোখটা বোধহয় একটু হলদে লাগছিল...।

ঠিকই দেখেছেন...আমি সেটা খেয়াল করেছি...তবে এখন ওসব নিয়ে আর ভাববেন না...ঘুমোন এবার।

নাসিমা এবং অতীশকে বললেন, তোমরা রেডি তো...আমি স্ক্রাব করে আসছি।

ওটির বাইরে যেতে গিয়েও, শ্যামলেন্দু একবার ঘুরে গেলেন রুগির মাথার দিকে। কিছু কথা বললেন ডাক্তার রূপক সোমের সঙ্গে। বোধহয় স্যালাইনের মধ্যে কোনো বিশেষ একটা ওষুধ দিতে বললেন...সম্ভবত ভিটামিন-কে। রুগির চোখে সামান্য জন্ডিসের ছোঁয়ায় শ্যামলেন্দু কি একটু উৎকণ্ঠিত! ইতিপূর্বে আলট্রা সোনোগ্রাফির প্লেট দেখতে দেখতেও সকালবেলা তাঁর ভুরু কুঁচকে উঠেছিল কয়েকবার। গলব্লাডারে স্টোন ছাড়া আরও অন্য কোনো সমস্যার ছায়া আছে কিনা...!

রুগির বাড়ির লোকদের অবশ্য সেসব কথা সপ্তাহখানেক আগেই জানিয়েছিলেন শ্যামলেন্দু। যেকোনো সন্দেহের কথা, বিশেষত অপারেশনের আগে, আত্মজনদের জানানোটাই রীতি। তাঁরা যথারীতি অপারেশনের সম্মতি দিয়েছেন সব জানার পরেই। ঠিকই করেছেন, কেননা...যা-ই থাক বা না-থাক, মিসেস ঘোষাল-এর অপারেশন করাটা যে জরুরি, ফেলে রাখা যাবে না, তাইতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাত ধুয়ে, গাউন পরে থিয়েটারে ঢুকে গেলেন শ্যামলেন্দু। সেই দশটাই বেজে গেল অপারেশন শুরু করতে করতে।...

নিজে সার্জেন বলেই এবং বেশ কয়েক বছর বিদেশের হাসপাতালে কাজ করার অভিজ্ঞতায় শ্যামলেন্দু প্রথম থেকে ভেবে রেখেছিলেন, যদি কখনো নিজের নার্সিংহোম কিংবা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে অপারেশন থিয়েটারটা অন্তত তাঁর মনের মতো করে তৈরি করবেন। কলকাতার অধিকাংশ মাঝারি গোছের বেসরকারি চিকিৎসালয়ে সেই ব্যবস্থা করা যায় না। কেননা, যাকে বলে স্থান সংকুলান, অর্থাৎ জায়গা পাওয়ার সঙ্গে আপোস করতে হয়।

একথা অস্বীকার করার প্রশ্ন নেই যে, চিকিৎসালয় হলেও, ব্যক্তিগত উদ্যোগে তা যখন গড়ে তোলা হয়, তা ব্যবসার জন্যই করা হয় প্রাথমিকভাবে। কিন্তু যেকোনো ব্যবসার পেছনেই সেবা করা বা দেওয়ার মানসিকতা না-থাকলে তা যেমন দাঁড়ায় না, স্বাস্থ্য ব্যবসার ক্ষেত্রে সেই মানসিকতা অবশ্যই আরো প্রবল হওয়া উচিত এবং দরকার। শ্যামলেন্দু সেই ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন বরাবর। সেই মানসিকতাও গড়ে উঠেছিল পারিবারিক সংস্কৃতি থেকে।

অমৃতেন্দু-সুপ্রভাকে আজন্ম শ্যামলেন্দু দেখেছেন উদার, নির্লোভী মানুষ হিসাবে। প্রথম জীবনে চাকরির পরে অমৃতেন্দু যখন ব্যবসার দিকে ঝুঁকেছিলেন, প্রথম থেকেই অতিরিক্ত উপার্জন, নিজের কোম্পানি তৈরি করার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় রেখেছিলেন কিছু সামাজিক কাজ এবং উন্নতিরও। ধলভূমগড়ের স্থানীয় দুঃস্থ মানুষদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। আশেপাশের অনুন্নত, অনুর্বর, পাথুরে গ্রামাঞ্চলের মানুষকে উৎসাহিতও করেছিলেন একটু একটু করে জীবনযাপনের মান উন্নত করার জন্য। স্কুলের ব্যবস্থা করেছিলেন। তা ছাড়া যেসব উঁচু পাহাড়ি জায়গা থেকে তাঁর ব্যবসার জন্য পাথর কেটে আনা হত, পরবর্তীকালে সেইসব সমতল জায়গাকেই চাষের উপযুক্ত করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। জলের জন্য বড়ো পাতকুয়ো কাটিয়ে দিয়েছিলেন বেশ কয়েকটি। একটা সময় মুখার্জি এন্টারপ্রাইজ-এর কর্মীরা তাদের গ্রামকে নামই দিয়েছিল অমৃতনগর...যদিও সেটা প্রচলিত ছিল তাদের মুখে মুখে। শ্যামলেন্দু এসবই দেখেছিলেন ছোটোবেলা থেকে।

বড়ো হয়ে ডাক্তারি পাশ করার পরেও দেখেছিলেন, বাবা দিনে দিনে কেমন ভেঙে পড়েছিলেন মা চলে যাওয়ার পরে। ক্রমশ ব্যবসাও গুটিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু স্থানীয় বিশ্বস্ত লোকের ওপরেই নির্ভর করেছিলেন। এখনও ধলভূমগড়ের বাংলো এবং ইউক্যালিপটাস, শাল, নিম আর করবী ফুলের গাছ যেমন ছিল রয়েছে বাংলোর হাতায়। বছর তিনেক আগে প্রয়াত হওয়ার সময়েও অমৃতেন্দু বলেছিলেন, মুখার্জি এন্টারপ্রাইজ না থাকলেও, ধলভূমগড়ের ওই দেড় বিঘা জমি আর বাংলোটা বিক্রি না করলেই ভালো। কিছু না-হোক ভবিষ্যতে কোনোদিন কলকাতার বাইরে গিয়ে কয়েকদিন থাকতে ইচ্ছে করলে, নিজেদের একটা জায়গা থাকবে।...

পিত্তথলি তথা গলব্লাডার অপারেশনের জন্য বড়ো করে পেট কাটার দিন এখন বিগতপ্রায়।

শুধু তাই বা কেন, পেটের ভেতরের যে কোনো ছোটো-মাঝারি-বড়ো অপারেশনের প্রয়োজনে ইদানীং ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতিই অনেক বেশি জনপ্রিয় এবং রুগির পক্ষে কম কষ্টকর। শরীর সুস্থ হয়ে ওঠে দ্রুত, নামমাত্র কাটাছেঁড়ার জন্য রক্তপাত থেকে শুরু করে ব্যথা-যন্ত্রণা-বিছানায় শুয়ে থাকা...সবই অপেক্ষাকৃত সীমিত হয়ে আসে।

অপারেশনের বিশেষ অংশ বা অঙ্গ এবং তার অবস্থান অনুযায়ী পেটের উপরিভাগে কয়েকটি ছিদ্র করা হয়, রুগিকে অজ্ঞান করার পরে। অতঃপর টিউব-এর মতো ল্যাপারোস্কোপ যন্ত্র পেটের ভিতরে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং দক্ষ হাতের নিয়ন্ত্রণে তার সম্মুখভাগ চালিত করে নিয়ে যাওয়া হয় অপারেশন করার সঠিক অরগ্যান এবং জায়গায়। বাইরে থেকে যন্ত্রের লেন্স-এ চোখ লাগিয়ে, সার্জেন তার অগ্রভাগকে ব্যবহার করতে পারেন অভ্যন্তরীণ কাটাকাটি, বাদ দেওয়া, রক্তপাত বন্ধ করা, অপ্রয়োজনীয় অংশকে পার্শ্বস্থ টিউব মারফত বার করে দেওয়া...ইত্যাদি যাবতীয় কাজের জন্য। বলা বাহুল্য ল্যাপারোস্কোপ টিউব যন্ত্রের মধ্যেই ভিতরে দেখতে পাওয়ার মতো উজ্জ্বল, নির্দিষ্ট আলো ফেলার বন্দোবস্তও আছে।

গলব্লাডার, বিশেষত ভারতীয় এবং মধ্যবয়সি বঙ্গনারীদের ক্ষেত্রে, প্রায়শই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে...সম্ভবত তাঁদের খাদ্যাভ্যাসের জন্য। বিভিন্ন ধরনের পাথরের আধার হয়ে ওঠে পিত্তথলিটি। অপারেশন ছাড়া নিরাময়ের উপায় থাকে না। সাম্প্রতিক কালে সেই অপারেশনেরই সংক্ষিপ্ত এবং জনপ্রিয় নাম—ল্যাপকোলি। অর্থাৎ ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতিতে পিত্তথলি বাদ দেওয়া...কোলি-শব্দ কোলিসিস্টেক্টমি (Cholecystectomy) নামের সংক্ষিপ্ত ডাক্তারি পরিভাষা...যাই হোক...। শল্যচিকিৎসকদের ক্ষেত্রে অবশ্য কথা থাকে তারপরেও। অভিজ্ঞতা তাঁদের চালিত করে পদ্ধতি নির্বাচনের জন্য।

প্রথমত ওই পদ্ধতিতে সব ক্ষেত্রে গলব্লাডার অপারেশন করা যায় না। যন্ত্রের সীমাবদ্ধতা আছে। গলব্লাডারের আকৃতি, আয়তন, পাথরের সাইজ, সংখ্যা, বিচারের প্রয়োজন হয়। স্টোন ব্যতীত অন্য সমস্যা আছে কিনা এবং কাছাকাছি অন্যান্য কোনো অরগ্যানের আর কিছু সমস্যা আছে কিনা এবং তা ল্যাপারোস্কোপের নির্দিষ্ট দৃশ্যমানতায় বোঝা সম্ভব কিনা, কিংবা অতিরিক্ত কিছু করার প্রয়োজন আছে কি না...ইত্যাদি বিষয়ে ভাবতে হবে। রুগির চেহারা, স্থূলতার বিষয় ভাবতে হয়। সামনাসামনি চোখের দেখায়, অনেক সময় অনেককিছু দৃশ্যমান হয়। সন্দেহ হয়। সন্দেহ অনুসন্ধানকে তীব্র করে। মন সজাগ রাখতে হয়। মন যা জানে না, চোখ সহজে তাকে দেখতে পায় না। শল্যচিকিৎসককে, সুতরাং সন্দেহপ্রবণ হতে হয় আগে থাকতে। কোন রুগির ক্ষেত্রে কোন অপারেশন, কী পদ্ধতিতে অপারেশন...ইত্যাদির আগাম সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাঁকে... সেই অনুযায়ী ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের দায় থাকে তাঁর।

শ্যামলেন্দু খেয়াল করেছেন, এসব আলোচনাকালে রুগি বা রোগিণী ছাড়া, তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, পরিচিতজনদেরও বিশেষ ভূমিকা থাকে। তাঁরা কখনও বুদ্ধিদীপ্ত, কখনও কৌতূহলী বা সমালোচক আবার কখনও অল্পবিদ্যা ভয়ংকরীও হতে পারেন। যথারীতি শ্রীমতী চিত্রা ঘোষালের ক্ষেত্রেও শ্যামলেন্দু কয়েকদিন আগে তাঁর পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে অপারেশনের বিভিন্ন দিক, পদ্ধতি, অজ্ঞান করার বিষয়...ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেছিলেন। পঞ্চাশোর্ধ্ব ভদ্রমহিলার শারীরিক স্থূলতা, অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট এবং খুব হালকা একটু জন্ডিসের সম্ভাবনা...সবদিক নিয়েই আলোচনা করেছিলেন। আর...এইসব বিষয়গুলোই তিনি এখনও, অতীতে ইংল্যান্ডে কাজ করার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী করেন। অতঃপর সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করতে বলেন।

শ্যামলেন্দু বুঝেছিলেন শ্রীমতী ঘোষাল ধনী পরিবারের মহিলা। সাধারণত এহেন পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসার জন্য কলকাতার তথাকথিত অভিজাত বেসরকারি হাসপাতালেই যেতে চান। 'শুকতারা মেডিকেয়ার সেন্টার' তথা নার্সিংহোম সে তুলনায় অপেক্ষাকৃত মধ্যবিত্তদের চিকিৎসালয়। কিন্তু বাইপাস-এর কাছে গরফা থেকে ঘোষালদের যাতায়াতের সুবিধার জন্যই তাঁরা শেষ পর্যন্ত শুকতারা-তেই ভর্তি এবং অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

শ্যামলেন্দু প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, শ্রীমতী ঘোষালের গলব্লাডার অপারেশনের ক্ষেত্রে তিনি ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতি ব্যবহার করবেন না, যদিও ইদানীং সেটা জনপ্রিয় পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত। ভদ্রমহিলার স্বামী, ইলেকট্রনিক গুডস্-এর ব্যবসাদার জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কেন বলুন তো?

শ্যামলেন্দু তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এবং কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন।

মিস্টার ঘোষাল তারপরেও বলেছিলেন, ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতিতে স্ত্রীর অপারেশন হবে...সেটাই তারা আশা করেছিলেন।

শ্যামলেন্দু বললেন, তিনি নিজেও তাই ভেবেছিলেন...কিন্তু সিদ্ধান্ত বদল করেছেন সবদিক চিন্তা করে।

আপনি কি গলব্লাডারের স্টোন ছাড়া আরো কিছু সমস্যা আছে কিনা ভাবছেন?

শ্যামলেন্দু একটু ঘুরিয়ে বললেন, আসলে ল্যাপারোস্কোপ দিয়ে পেটের ভেতরে দেখার কিছু লিমিটেশন তো আছেই...অপেক্ষাকৃত রোগা পেশেন্ট হলে অসুবিধে হত না। আপনার মিসেস্-এর ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যন্ত্র দিয়ে দেখার ততটা সুবিধে হবে না।

শ্যামলেন্দু মুখে আর ভদ্রমহিলার বিশাল ভুঁড়ির কথা উল্লেখ করলেন না। একইসঙ্গে অতিরিক্ত মেদবহুল শরীরে অন্যান্য সমস্যার সম্ভাবনার কথা বলেও লাভ নেই, বুঝতে পারলেন। তা সত্ত্বেও ভরসা দেওয়ার মতো বললেন, চিন্তা করবেন না...আগেকার দিনে যেরকম অনেকটা অ্যাবডোমেন ওপেন করা হত...এখন আমরা তার থেকে অনেক ছোটো ইনসিশন দিয়েই অপারেশন করি...তার রেজাল্টও ভালোই হয়।

একজন সুবেশ এবং সপ্রতিভ ভদ্রলোক বললেন, আমি অবশ্য দীপঙ্করদা...আই মিন ডক্টর দীপঙ্কর দাশগুপ্ত...চেনেন তো?

শ্যামলেন্দু মুখ তুলে তাকালেন ভদ্রলোকের দিকে।—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই...সিনিয়র সার্জেন...।

দীপঙ্করদাকে তো পনেরো-কুড়ি বছর ধরেই দেখে আসছি...শুধু ল্যাপকোলি করতে। বাই দ্য ওয়ে, আমি শ্রীমন্ত লাহিড়ি।...

মাথা নাড়লেন শ্যামলেন্দু। বললেন, সেটা ওঁর ডিসিশন।

আবার ভদ্রলোক বললেন, ওঁর মতো সার্জেনের ডিসিশনের একটা ভ্যালুজ তো আছেই...। তিনিই যখন সব কেস...!

ভদ্রলোকের কথায় শ্যামলেন্দুর প্রতি সামান্য তাচ্ছিল্যের ইংগিতটুকু অপ্রকাশিত রইল না। সুতরাং তাঁর কথার মধ্যেই শ্যামলেন্দু বললেন, আপনি কি ডাক্তার? তাহলে কয়েকটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

উত্তর দিলেন মিস্টার ঘোষাল। বললেন, না-না শ্রীমন্ত আমার ভায়েরা। ও হচ্ছে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ।

শ্রীমন্ত ভদ্রলোক গলা খাদে নামিয়ে বললেন, আমি মার্ক অ্যান্ড স্টুয়ার্ট ফারমাসিউটিক্যাল কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার। এখনকার সব বিখ্যাত ডাক্তারদের সঙ্গেই আমার একটা অন্যরকম সম্পর্ক তো...সেইজন্যই দীপঙ্করদার কথা...।

হালকা হাসির ভাব করে শ্যামলেন্দু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি ডাক্তার হলে অপারেশন সংক্রান্ত ডিসিশন নিয়ে কথা বলা যেত। দীপঙ্করদা আমার কলেজেরই দাদা, যথেষ্ট পরিচিত অনেকদিনের, খুব ভালো সার্জেন। ইদানীং বয়েস হয়ে গেছে এই যা। তবে আমরা সার্জেনরা নন-মেডিকেল লোকের সঙ্গে রুগির অপারেশন নিয়ে তো খুব একটা আলোচনা করতে পারি না! তাঁদের পক্ষে বোঝাও মুশকিল। তবে...য়্যু ক্যান ডেফিনিট্‌লি ফিল ফ্রি টু ডিসকাস্ এভরিথিং উইথ ডক্টর দাশগুপ্ত...আমার ওপেন অপারেশনের ডিসিশনের কথাও জানাতে পারেন...তারপর উনি যদি...।

মিস্টার ঘোষাল থামিয়ে দিয়ে বললেন, ওসবের কোনো প্রশ্নই ওঠে না ডক্টর মুখার্জি...। আমার স্ত্রী এই 'শুকতারা'তেই ভর্তি হবেন এবং আপনার ডিসিশনই ফাইনাল...। এখানে আমাদের সুবিধে অনেক বেশি।

সত্যিই বিরক্তবোধ করেছিলেন শ্যামলেন্দু।

কিছু কিছু মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ বা নার্স বা ফার্মাসিস্ট... যাঁরা জীবিকায় চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে থাকেন, তাঁদের সম্পর্কে বরাবরই কিঞ্চিৎ সচেতন থাকেন তিনি। হয়তো অনেক চিকিৎসকও। এই ধরনের জীবিকার নারী-পুরুষদের অনেকে ডাক্তারদের সাহচর্যে আসার সুযোগ পেতে পেতে, নিজেদের ভূমিকা সম্বন্ধে বড়ো ধারণা করে ফেলেন এবং নিজেদের সীমাবদ্ধতার বিষয় ভুলে যান। মাঝখান থেকে অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী হয়ে তারা চিকিৎসার ব্যাপারে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে...চিকিৎসকেরও বিরক্তি উৎপাদন করে।

একবার শ্যামলেন্দু প্রায় স্থির করেই ফেলেছিলেন, চিত্রা ঘোষালের অপারেশন করবেন না।

করলেও উডল্যান্ড অথবা বেলেভ্যু-র মতো খরচসাপেক্ষ জায়গায় ভর্তি হতে বলবেন। কিন্তু না, সিদ্ধান্ত বদল করতেই হয়েছিল ওঁদের অনুরোধে। 'শুকতারা'তে অপারেশন করানোর সুবিধেগুলো ব্যবসায়ী পরিবারটি ভালোই বুঝেছিল।

প্রথমত ওঁদের গরফা থেকে রাজডাঙার দূরত্ব নেহাতই কম। ভেতরের রাস্তা দিয়ে এমনকী হেঁটেও যাতায়াত সম্ভব। সুতরাং গাড়িঘোড়া, জ্যাম...ইত্যাদির সমস্যা ভোগ করতে হবে না। দ্বিতীয়ত ডাক্তার মুখার্জির স্ত্রী মেমসাহেব এবং নার্সিংহোমের মেট্রন তিনি। এ খবরও অনেকের জানা যে শুকতারা নার্সিংহোমে রুগিদের দেখাশোনা, যত্নের ত্রুটি হয় না। বিগত প্রায় বছর দশেকে স্থানীয় কিছু চিকিৎসক এবং রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও, ও ব্যাপারে বদনাম রটেনি।

অনেক রুগিদের কাছে ডাক্তারবাবুর অবস্থানও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। শুকতারা নার্সিংহোমের লাগোয়া বাড়িতেই শ্যামলেন্দু সপরিবারে বাস করেন, এটা তাঁদের মানসিক অবলম্বন দেয়। অ্যাঞ্জেলার ভূমিকাও সুবিদিত। শুকতারা যে স্থানীয় বেশ কয়েকজন চিকিৎসক এবং রাজনৈতিক মদতপুষ্ট দালালদের তথাকথিত 'কাটমানি' সিস্টেমকে গুরুত্ব এবং পাত্তা না দিয়ে, নিজেদের মতো চলছে, তার পিছনে অ্যাঞ্জেলার ব্যতিক্রমী ভূমিকা এবং ব্যক্তিত্ব ক্রিয়াশীল, তা অনেকে জানে। বাধা সৃষ্টির চেষ্টা হয়নি, কিংবা এখনও মাঝেমধ্যে হয় না, তা বলা যায় না। তা সত্ত্বেও কসবার শুকতারা নিজের মতোই টিঁকে আছে। চব্বিশ ঘণ্টার মেডিকেল অফিসার থাকা ছাড়াও, শ্যামলেন্দু-অ্যাঞ্জেলার উপস্থিতি শুকতারা-র সুনামের একটি কারণ।

শ্যামলেন্দু ইনসিশন দিয়ে মহিলার অ্যাবডোমেন ওপেন করতে করতেই দেখলেন, শুধু চর্বির স্তরই প্রায় তিন ইঞ্চি পুরু। সত্যি কী ভাগ্যিস ল্যাপারোস্কোপিক অপারেশনের ঝুঁকি নেননি! দুজন সহকারী নিয়ে অপারেশন করতে গিয়েও শ্যামলেন্দু বুঝতে পারছিলেন, শুধু চর্বির স্তর টেনে সরিয়ে রাখতেই একজন সহকারীর দুটি হাত ব্যস্ত থাকছে।

তাইতেও অবশ্য তাঁর পাথরসুদ্ধ পিত্তথলি অপারেশন করে বার করে আনার অসুবিধে হত না। কিন্তু শ্যামলেন্দুর অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সচেতন হয়ে উঠল, পেটের মধ্যে গলব্লাডারটি আঙুল দিয়ে অনুভব করে এবং তার চেহারা দেখে। পিত্তথলিটি যেন শক্ত, তার আবরণ কিঞ্চিৎ মোটা হয়ে গেছে। বর্ণ হয়েছে ফ্যাকাশে। তাঁর অভিজ্ঞতা যেন অন্য কোনো জটিলতার ইংগিত দিচ্ছে মনে হল...এবং সূক্ষ্মভাবে তেমন সম্ভাবনার প্রশ্ন তাঁর মাথায় কি আগেও আসেনি!

যথারীতি অ্যাঞ্জেলা ওটির মধ্যে থেকে সবই লক্ষ করছিলেন। অনেক সময়ই অতিরিক্ত সাহায্যের প্রয়োজন হলে তিনিও তৈরি হয়ে নেন এবং অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন। শ্যামলেন্দুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, দক্ষ নার্স অনুমান করেছেন, শ্যামলেন্দু বিশেষ কিছু সন্দেহ করেছেন রোগিণীর পেটের ভেতরে। হয়তো অতীশ এবং নাসিমা দুজন অ্যাসিস্টেন্ট-ও বুঝেছে, স্যার সতর্ক হয়েছেন কোনো ব্যাপারে...এবং সম্ভবত তা খারাপ কিছু।

মুখে মাস্ক লাগানো অবস্থাতে এগিয়ে গেলেন অ্যাঞ্জেলা।—স্যাম, ইজ এভরিথিং ওকে?

সামান্য মুখ তুললেন শ্যামলেন্দু।—একটা সন্দেহ হচ্ছে...ইটস নট ওনলি স্টোন।

আর কী মনে হচ্ছে?

মনে হচ্ছে কয়েকটা গ্ল্যান্ড রয়েছে...বাইলডাক্ট (পিত্তনালি) ইজ থিক্...সাইনগুলো ভালো না।

ম্যালিগন্যান্সি (ক্যান্সার) ভাবছ?

দেয়ার ইজ স্ট্রং পসিবিলিটি। পেশেন্টের জন্ডিসটাও বাড়ছিল। পেটে ফ্লুইড রয়েছে।

আমি কি জয়েন করব তোমাদের সঙ্গে?

হ্যাঁ তাহলেই ভালো হয়...কেননা...মনে হচ্ছে আর একটু বড়ো করে ওপেন করতে হবে।

অ্যাঞ্জেলা হাত ধুতে যাওয়ার মধ্যেই অ্যানেসথেটিস্ট ডক্টর সোম বললেন, শ্যামলেন্দু...আমার দিক থেকে এখনও কোনো অসুবিধে নেই...তবে গলব্লাডার, বাইলডাক্ট বা প্যাংক্রিয়াসে যদি কোনো গ্রোথ

(ক্যান্সার) আছে মনে করো...দুটো ইউনিট ব্লাড এনে রাখলে ভালো হয়...। তুমি বললে ব্যবস্থা করে রাখব।

শ্যামলেন্দু বললেন, অ্যাবসল্যুটলি রাইট। পেশেন্ট পার্টি বাইরে আছে...প্রশান্তকে দিয়ে আপনি ওদের কাছে স্যাম্পেল পাঠিয়ে দিন...।

সোম বললেন, য়্যু ক্যারি অন...পার্টির সঙ্গে আমি নিজেই একবার বাইরে গিয়ে কথা বলে নেব।

শ্যামলেন্দু নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। ডাক্তারের কথায় বাড়ির লোক গুরুত্ব দেবেন।

অ্যাঞ্জেলা এসে অপারেশনে যোগ দেওয়ার পরে, আর একটু ভালোভাবে পেশেন্টের পেটের ভেতরে দেখে স্পষ্টই বুঝলেন, তাঁর সন্দেহ এবং অনুমান মিথ্যে না। গলব্লাডার, পিত্তনালি ছাড়াও ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছে প্যাংক্রিয়াসের মাথার কাছেও।

এক থেকে সওয়া এক ঘন্টার অপারেশন শেষ হতে তিন ঘন্টা লাগল। যা এবং যতটা সম্ভব বাদ দিলেন শ্যামলেন্দু।

নাহ্...তারপরেও ভরসা করার মতো কিছু ছিল না। কেননা মিসেস ঘোষালের লিভারও আক্রান্ত হয়েছিল নিশ্চয়ই...যদিও তা খুব স্পষ্টভাবে চোখে দেখা যায়নি। অপারেশন করে বাদ দেওয়া সব অরগ্যানই বায়োপ্সি করতে পাঠালেন শ্যামলেন্দু।

বিলেতে জীবনযাপনের সময় হিসেব করতে গিয়ে কেমন অবাক হয়ে গেল শ্যামলেন্দু। এই তো জুলাই মাসে পৌঁছেছিল। এর মধ্যে আট-ন মাস সময় কেটে গেল! মনে হচ্ছে যেন এই সেদিন...ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ-এর জাম্বোজেট ছেড়েছিল কলকাতা থেকে। মাঝরাতের উড়ান। দু-ঘন্টায় দিল্লি পৌঁছেছিল। কিন্তু প্যাসেঞ্জারদের নামতে দেয়নি। নতুন যাত্রীরা উঠেছিল দিল্লি থেকে এবং প্রায় ভর্তি হয়ে গিয়েছিল বিশাল বিমান। তারপর ছাড়তে ছাড়তে প্রায় ভোররাত। একটানা উড়ে এসে এবং সময়ের ব্যবধান হিসেব করে, আবার সকাল সাড়ে সাতটাতেই লন্ডন হিথরো বিমানবন্দরে নেমেছিল।

জীবনে প্রথম এত দীর্ঘ উড়ানে শামিল হয়েছিল শ্যামলেন্দু। তার ওপর সম্পূর্ণ নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ, ভাষা-আবহাওয়া... কী নয়! মনে আছে, কেমন একটা ঘোরের মধ্যে কেটেছিল প্লেন থেকে নেমে বাইরে আসতে আসতে। প্রথমেই মনে হয়েছিল, কী পরিচ্ছন্ন আর ডিসিপ্লিনড। অনেকটা হেঁটে আসতে হয়েছিল ইমিগ্রেশনের ছাড়পত্র পেতে তথা পাসপোর্টে ছাপ মারার জন্য। টানা দীর্ঘ করিডরের দু-পাশে স্বচ্ছ দেওয়াল। বাইরে দৃশ্যমান কখনো শহরের রাস্তাঘাট, কখনো সুদূরে বিস্তৃত এলাহি বিমানবন্দর। বোধহয় মিনিট দশ সময় লেগেছিল ভারী রাকস্যাক আর পুলঅন হ্যান্ডব্যাগ টেনে নিয়ে ইমিগ্রেশন চত্বরে পৌঁছাতে। তারপরেই অবাক হয়েছিল লাইনবন্দি এক একটি রো আর কয়েকশো মানুষকে পাসপোর্ট হাতে কিউ-তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। মনে হয়েছিল, এই জনসমুদ্রের লাইন অতিক্রম করে যখন ও ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে পৌঁছাবে এবং তার জন্য যা সময় লাগবে, ততক্ষণ কি শ্যামলেন্দুকে রিসিভ

স্বামীর কাছাকাছি হয়ে অ্যাঞ্জেলা বললেন, গুডমর্নিং স্যাম... মর্নিংওয়াক সেরে এসেছ?

করতে আসা অভিজিৎদা বাইরে অপেক্ষা করবে!

কেমন একটা হিমশীতল আশংকার স্রোত যেন বয়ে গিয়েছিল শরীরের মধ্যে দিয়ে। বাইরে গিয়ে কাউকে দেখতে না পেলে, ও যাবে কোথায়! কোনদিকে, কার কাছে?...এই দীর্ঘ লাইন কি আড়াই-তিন ঘন্টাতেও ফুরোবে!

এমনিতেই অভিজিৎদা তথা ডাক্তার অভিজিৎ বেরা লন্ডনের বাসিন্দা নয়...বাইরে এসেক্স-এর দিকে কোথাও চাকরি করে। কিন্তু অতীত পরিচয় এবং কৃতজ্ঞতাসূত্রে শ্যামলেন্দুকে রিসিভ করা এবং প্রথম তিনদিন আশ্রয় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আর কিছু না... অসমের শিলচরবাসী অভিজিৎ একটা সময়ে কলেজ হস্টেল থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরে, শ্যামলেন্দু বাবা-মাকে বলে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ ওকে নিজেদের বাড়িতে এনে রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

অভিজিৎ তা ভোলেনি। কিন্তু সে পাশ করার পরেই, যাহোক-তাহোক করে ইংল্যান্ডে চলে গিয়েছিল।

শ্যামলেন্দুর আসার খবরাখবর পেয়ে, অভিজিৎ সেই পুরোনো কৃতজ্ঞতার একটুখানি শোধ করতে চেয়েছিল।

কিন্তু হিথরো বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন লাইন দেখে শ্যামলেন্দুর সে আশা-ভরসা উবে গেল। বিকল্প হিসাবে একমাত্র ওয়াই এম সি এ—বলে একটি প্রতিষ্ঠানের নাম ছাড়া আর কিছুই মনে এল না। কিছু করার নেই। সাহেবদের সঙ্গে কথা বলে, নিজের বিপদের কথা জানিয়ে কিছু যে একটা ব্যবস্থা করবে, তারও অসুবিধা আছে...কেননা ও শুনে এসেছে লন্ডন বড্ড ব্যস্ত শহর...দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে লোকের কথা শোনার সময় হয় না কারুর। কী করবে এখন!

আশ্চর্য...লাইনের কাছে এসেই শ্যামলেন্দু দেখল চার-পাঁচজন য়্যুনিফর্ম পরা নারীপুরুষ যাত্রীদের এদেশে আসার প্রাথমিক উদ্দেশ্যের কথা জিজ্ঞেস করছেন এবং সেই মতো এদিক-ওদিক লাইনে দাঁড়াবার নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছেন। যথারীতি শ্যামলেন্দুকে একজন জিজ্ঞেস করলেন। ও খুব দ্রুত বুদ্ধি খাটিয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, ডক্টর ফ্রম ইন্ডিয়া, প্ল্যাব টেস্ট...এগজামিনেশন...। নিশ্চয়ই ব্যাপারটা পরিচিত। কেননা মুহূর্তে সাহেব বাঁদিকের একটা রো দেখিয়ে দিলেন হাত দিয়ে। শ্যামলেন্দু যথারীতি থ্যাংক য়্যু বলতে ভুলে গেল। কিন্তু এগিয়ে দেখল, লাইনটায় ভিড় বলতে প্রায় কিছুই নেই। সোজা এগিয়ে চলে গেছে ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে। অফিসারেরও যেন সবই জানা। ওর পাসপোর্ট দেখল, ক্যামেরার দিকে তাকাতে বলল। তারপরে পাসপোর্টে ছাপ মেরে গেট-এর দিকে দেখিয়ে দিল।

দশ মিনিটও লাগল না। অন্য যাত্রীদের ফলো করে নীচের কনভেয়ার বেল্ট-এর কাছে পৌঁছে গেল শ্যামলেন্দু। ততক্ষণে লাগেজ আসতে শুরু করেছে। মিনিট পনেরো বড়োজোর। সুটকেস এসে গেল। ওই তো সামনেই ট্রলি রাখা আছে। হ্যান্ডব্যাগ, সুটকেস নিয়ে দিব্যি গ্রিনচ্যানেল পার করে বাইরে চলে এল।

মনে মনে বলল, এই সকালের মধ্যে এত যাত্রী...তাও এত সুষ্ঠু ব্যবস্থা! একটা দেশকে এমনি কি উন্নত বলে! কত কী শুনেছিল—এর-ওর-তার মুখে! এশিয়ান লোক দেখলেই হ্যারাস করে, হাজারটা প্রশ্ন করে পাসপোর্টে ছাপ দেওয়ার আগে। ব্যাগ, সুটকেস খুলে চেক করে, কুকুর দিয়ে শোঁকায়, কোনো জিনিস অপছন্দ হলেই ফেলে দেয়...। নাহ্...সব বাজে কথা।

বাইরে রেলিং-এর উলটো দিকে সার-সার মানুষ। শ্যামলেন্দুর মনে হল, তাইতো...সবই যে নিজের দেশের মানুষ মনে হচ্ছে! সাদা লোকজন প্রায় দেখাই যাচ্ছে না! অবশ্য তাই তো হওয়ার কথা। যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন, সবাই তো এই সকালে কাউকে না কাউকে রিসিভ করতেই এসেছেন এবং এই প্লেন এসে পৌঁছেছে ইন্ডিয়া থেকে...সুতরাং...।

একটা চেনা আর আন্তরিক কণ্ঠ শ্যামলেন্দুকে মুহূর্তেই নিশ্চিন্ত করে দিল।

শ্যামল...ধীরেসুস্থে বেরিয়ে আয়...চিন্তা করিস না আমি আছি...।

ভিড়ের মধ্যে কাউকে দেখতে পেল না শ্যামলেন্দু। কিন্তু এই মুহূর্তে শুধু টের পেল বাংলা ভাষাটা সত্যি কী মধুর!

কয়েক মিনিটের মধ্যে মাঝারি মাপের যে লোকটা শ্যামলেন্দুকে জড়িয়ে ধরল, সে-ই যে অভিজিৎ বেরা...সেটা বুঝতেই যেন কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল শ্যামলেন্দুর। মাত্র বছর তিনের মধ্যে মানুষ এত বদলে যায়! এ যে রীতিমতো ঝকঝকে, ফর্সা, স্মার্ট একটা লোক এবং মুখে ইংরিজি বুলি!

ওয়েলকাম টু দ্য কুইনস ল্যান্ড শ্যামল...হোয়ার সান নেভার সেটস্।

তুমি অভিজিৎদাই তো? শ্যামলেন্দু বলেই ফেলল।—ভিড়ের মধ্যে থেকে না ডাকলে তো খুঁজেই পেতাম না তোমায়! এত বদলে গেলে কী করে? এ তো সাহেব মনে হচ্ছে...!

বিলেতের জলহাওয়া লাগুক...তোকেও সাহেব মনে হবে।

না বাবা...আমি তার আগেই পালাব।

দাঁড়া...সদ্য নেমেছিস...। আগে রেস্ট নে, বুঝেশুনে দ্যাখ...কাজ কর...পালাবার কথা ভাববার অনেক সুযোগ পাবি।

কিছুটা অবাক বিস্ময় নিয়েই চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল শ্যামলেন্দু। তার মধ্যেই অভিজিতের গলা শুনল আবার। ইতিমধ্যে ওরা একটা বড়ো কফিশপ-এর মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল বাইরের রাস্তায় বেরোনোর আগে।

চেয়ার টেনে, পাশে বসতে বসতে অভিজিৎ বলল, আগে আমার প্ল্যান তোকে একটু বলে নিই শ্যামল। যেখানে যেখানে তোর মনে হবে কিছু জিজ্ঞেস করার, আমায় থামিয়ে প্রশ্ন করিস। এখানে আগে এককাপ করে কফি খেয়ে আমরা বেরুব। তোর কাছে জেনে নিই, তুই অন্য কোথাও যাওয়ার প্ল্যান করিসনি তো...আই মিন... আমি ছাড়া আর কারুর সঙ্গে, অন্য কোথাও যাবি কিংবা যেতে পারিস, সেরকম কোনো পসিবিলিটি?

শ্যামলেন্দু হেসে বলল, বিলেতে আমার তিনকুলে কেউ আছে বলে শুনিনি...তোমার ভরসাতেই এসেছি...যেখানে নিয়ে যাবে, যা করতে বলবে, তাই করব। শুধু প্ল্যাব টেস্টটা দিয়ে, কাজ করতে চাই অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিব্‌ল।

অভিজিৎ বলল, ঠিক দু-মিনিট সময় দে আমায়। কফিটা নিয়ে বসে...সব ডিটেল দেব তোকে।

শ্যামলেন্দুর চোখ যাচ্ছিল বারবার হিথরো এয়ারপোর্টের বিশাল লবি-র চতুর্দিকে। একইসঙ্গে আপনা-আপনি মনে পড়ে যাচ্ছিল কলকাতা বিমানবন্দরের বাইরের চেহারাটা। গাড়ি-ট্যাক্সি-দালাল-ভিখারির ভিড়...লাগেজের দিকে নজর রাখা...। এখানেও ভিড় নেহাত কম না...বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন বাড়ছে। অথচ সবকিছু দেখেই মনে হচ্ছে, কোথায় যেন একটা ছন্দ আছে সবকিছুর মধ্যে। তা ছাড়া হইচই, চিৎকার নেই। আমাদের দেশটা কেন এমন হয় না!

অভিজিৎ একটা ট্রে নিয়ে এসে বসল। সঙ্গে কফি-দুধ-চিনি... মোটা বিস্কুট (কুকিজ্)। নিজেই পট থেকে কাগজের বড়ো কাপে মিশিয়ে এগিয়ে দিল শ্যামলেন্দুর দিকে। নিজেও নিল। চুমুক দিয়ে কথা শুরু করল।

সংক্ষেপে অভিজিৎ যা বলল তা এইরকম

অভিজিৎ এখন ওর বউসুদ্ধু লন্ডনের বাইরে ব্যাসিলডন বলে

একটা জায়গায় থাকে। ছোটো বাড়িও কিনেছে...যদিও মাসে মাসে মর্টগেজ দেয় বাড়ি ভাড়ার মতো। ধারেকাছের একটা সার্জারিতে ও জিপি-র কাজ করে। মাইনেপত্র খারাপ না। একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িও আছে। ওর জীবনে প্রত্যাশা খুব বেশি না, তবে ভবিষ্যতে বড়ো বাড়ি কিনবে ছেলেপুলে হলে। ব্যাসিলডন জায়গাটা পড়ে এসেকস্-এ। হিথরো থেকে যেতে দেড়ঘণ্টার মতো সময় লাগবে। এদেশের লোকেরা শহরতলি বা সাবার্ব বলে, কিন্তু অভিজিৎদের জায়গাটা খুবই পছন্দের। বিলেতের সব জায়গায় সব ফেসিলিটিজ পাওয়া যায়...সেইজন্য ওদের কাছে ব্যাসিলডন অতি চমৎকার জায়গা।

শ্যামলেন্দু আপাতত তিন-চারদিন বা এক সপ্তাহ অভিজিতের কাছে থাকবে। সংকোচ করার কোনো কারণ নেই...কেননা একেবারে প্রথমবার বিদেশ-বিভুঁইয়ে এলে সবাইকে এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। একবার PLAB পাশ করে কাজ পেয়ে গেলেই পরিস্থিতি বদলে যাবে। তখন এই একই কাজ শ্যামলেন্দু করবে আর একজনের জন্য।

শ্যামলেন্দুর PLAB টেস্ট-এর সেকেন্ড পার্ট (প্রথম পর্ব ও কলকাতা থেকে পাশ করেই এসেছে) পরীক্ষার তারিখ ঠিক করে রেখেছে অভিজিৎ এবং তার ফিজ্ জমা দিয়েছে। টাকা ফেরত দেওয়ার তাড়া নেই। শ্যামল চাকরি করে মাইনে পেয়ে দিলেই হবে। এখনও তিন সপ্তাহ দেরি আছে পরীক্ষার। কয়েকদিন শ্যামলেন্দু একটু ধাতস্থ হওয়ার পরে, অভিজিৎ ওকে একটা প্রাইভেট হস্টেল-এর মতো জায়গায় নিয়ে যাবে, যেখানে ও থাকবে। সেখানে পড়াশোনার এবং অন্যান্য আরও পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা, কথাবার্তার সুযোগ পাবে। এসব জায়গায় খরচপত্র অপেক্ষাকৃত কম...সবাই এভাবেই থাকে।

একবার সেকেন্ড পার্ট পাশ করলেই, ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন নম্বর পেয়ে যাবে এবং তারপরেই জার্নাল দেখে এ দেশের যেকোনো হাসপাতালে কাজের আবেদন করতে পারবে। অভিজিতের ধারণা, শ্যামলেন্দু যেভাবে তৈরি হয়ে এসেছে দেশ থেকে এবং এম. এস পাশ করে এসেছে বলে, PLAB পাশ করা এবং চাকরি পাওয়া কোনোটাতেই ওর সমস্যা হবে না।

এদেশের সব হাসপাতালেই পড়াশোনার নিয়মিত সিস্টেম আছে। আলাদা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কলেজ নেই।

সুতরাং কে, কোন লাইনে যেতে চায়, আরও কী পরীক্ষা দিতে চায়...সবই হাসপাতালে কাজ করতে করতে বুঝে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে হাউসসার্জেনের কাজই করতে হবে—কোনো সিনিয়র কনসালট্যান্ট-এর আন্ডারে। তিনি অথবা তাঁরাই ওর কাজ এবং কোয়ালিটির বিচার করতে পারবেন। সেই অনুযায়ী গাইড করতে পারবেন নতুন কাজের আবেদন করার জন্য। এইসব কাজের সঙ্গেই পরীক্ষার জন্য পড়াশোনাও চলতে থাকবে।...

অভিজিতের হন্ডা গাড়িটা নেহাত ছোটো না। পেছনের ডিকিতেই শ্যামলেন্দুর সব লাগেজ ঢুকে গেছে। ওরা দুজনে সামনে বসেছে এবং মোটরওয়ে দিয়ে চলেছে অভিজিতের বাড়ির দিকে। শ্যামলেন্দু ওর কথা শুনতে শুনতেই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছিল বাইরে। এখন সামার ইংল্যান্ডে। আজ আবহাওয়াও চমৎকার। রৌদ্রকরোজ্জ্বল। যেদিকে তাকাচ্ছে ওর মনে হচ্ছিল, সেদিকেই যেন পিকচার পোস্টকার্ড-এর মতো ছবি দেশটায়।

অভিজিৎ গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, এবার তোর কী কী জিজ্ঞাস্য আছে বল...যতটা পারব উত্তর দেব।

শ্যামলেন্দু বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতেই বলল, আজ তো মঙ্গলবার...তোমার কাজের ক্ষতি হল তো আমার জন্য?

না ক্ষতি হবে না। আজ আর কাল দু-দিন ছুটি নিয়েছি আমি সার্জারি থেকে...সেটা আবার সানডে অনকল করে পুষিয়ে দেব। এই দুটো দিন তোর সঙ্গে থাকব। তারপর শনিবার তোকে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে আসব।

শ্যামলেন্দু হেসে বলল, অভিজিৎদা এর থেকে ভালো বন্দোবস্ত আর কী হতে পারে! যা উপকার করলে...!

বাজে বকিস্ না। অভিজিৎ বলল। উপকারের কথা যদি বলিস, তুই-মাসিমা-মেসোমশাই তো আমার জীবনটাকেই আজ থেকে ছ-সাত বছর আগে পালটে দিয়েছিলি...তা নয়তো বিলেতের বদলে গাঁয়ে চাষ করতাম এখন।

কী যে বলো অভিজিৎদা। তোমার জীবন তুমি নিজেই বদলেছিলে।

আসলে কী জানিস, নিজের ভুল নিজে থেকে বুঝতে না পারলে, তাকে শোধরানো যায় না। তোদের কসবার বাড়িতে, তোদের সঙ্গে থেকে আমার সেই বোঝার সুযোগ হয়েছিল। আমার জীবনে ওটা যে কত বড়ো ব্যাপার ছিল...!

আচ্ছা বাদ দাও। বাবা খুব নিশ্চিন্ত যে আমি তোমার কাছে এসে উঠব।

তুই একটু স্টেবল হলেই, এরপরে মেসোমশাইকে নিয়ে আসব।

তোমার কী মনে হয়...আমি চাকরি-বাকরি পাব? এফ আর সি এস করতে পারব?

তোকে বলে রাখছি, লিখে রাখ। চার থেকে ছ-সপ্তাহের মধ্যে তুই জব পেয়ে যাবি। আর দেড় বছরের মধ্যে তোর ফেলোশিপ-এর পার্ট-ওয়ান, পার্ট-টু দুটোই হয়ে যাবে।

কী করে বলছ এত শিওর হয়ে?

তোর যে ক্যারিকুলাম ভাইটি (বায়োডাটা) পাঠিয়েছিস, সেটা পড়েই বলছি।

কিন্তু আমার তো এখনও PLAB টেস্ট-এর সেকেন্ড পার্ট-ই হয়নি!

বললাম তো...তুই ফার্স্ট চান্সেই বেরিয়ে যাবি...দেখে নিস। তিন সপ্তাহের মধ্যে রেজাল্ট জেনে যাবি।

বাবা সবসময় বলে ফার্স্ট চান্সটাই বেস্ট চান্স...।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অভিজিৎ বলেছিল, আর একটা ব্যাপার এদেশে দেখবি, তুই যদি কোনো সাহেব কনসালট্যান্ট-এর সঙ্গে কাজ করিস, এরা অনেক বেশি ফেয়ার অ্যান্ড অনেস্ট। তোকে সুযোগ দেবে কাজ করার, শেখাবে ভালো করে এবং অ্যাপ্রিশিয়েট করবে...যেটা অনেকসময় ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি বা অন্য এশিয়ান কনসালট্যান্টরা করে না। আর মিডল-ইস্ট-এর লোক হলে তো কথাই নেই...ওরা সব নিজেদের দেশের লোককে ঢোকানোর চেষ্টা করে...।

আজ অনেকদিন পরে সাউথ হ্যাম্পটন-এর হাসপাতাল ক্যান্টিনে লাঞ্চ খেতে খেতে পুরোনো কথাগুলো মনে পড়ছিল শ্যামলেন্দুর। সত্যি যা যা বলেছিল অভিজিৎ, প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল ওর ক্ষেত্রে। একটা ব্যাপার ও বুঝেছিল, দেশ থেকে যদি কিছুটা পড়াশোনা করে এদেশে আসা যায়, তাহলে কাজের প্রচুর সুযোগ পাওয়া যায় ইংল্যান্ডে...সত্যি বলতে কি যা নিজের দেশে পাওয়া সম্ভব না। আমাদের দেশ অনেক বড়ো হলেও, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে গিয়ে পড়াশোনা করা এবং বিশেষ করে সার্জারি শেখার মতো সুযোগ এখনও যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। আর নিজের রাজ্যে প্রতিযোগিতা এত বেশি, সেখানে হাতেকলমে কাজ করার জন্য লাইন দিয়ে বসে থাকতে হয়...তাও আবার অনেকরকম অব্যবস্থা এবং প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে। জনসংখ্যার তুলনায় হাসপাতালই বা কোথায়!

ইতিমধ্যে ছ-মাসের হাউসজব করা হয়ে গেছে শ্যামলেন্দুর। তার থেকে বড়ো কথা, এফ আর সি এস-এর ফার্স্ট পার্ট পরীক্ষাতেও ও পাশ করে গেছে। সম্ভবত আর কয়েক মাসের মধ্যে ফেলোশিপ সম্পূর্ণ করে, ও নতুন কাজ এবং নতুন হাসপাতালে জয়েন করবে। অভিজিতের কথা অনুযায়ী, এই আট-ন মাসে শ্যামলেন্দু বুঝেছে, সাহেবদের মধ্যে এখনও একটা সততা আছে যা গুণের কদর করে। তার জন্য কোনোরকম তদ্বির-তদারক, একে-তাকে ধরা কিংবা রাজনৈতিক পুশ...কিচ্ছু দরকার হয় না।

ও এখন কাজ করে মিস্টার ডেভিড হ্যানকক নামে একজন সিনিয়র শল্যচিকিৎসকের কাছে বা তত্ত্বাবধানে। সার্জেনরা এদেশে সবাই 'মিস্টার' অথবা 'মিস বা মিসেস' নামে পরিচিত হন। তাঁদের নামের আগে ডক্টর থাকে না। সেই মিস্টার হ্যানকক ছ-মাস শ্যামলেন্দুর কাজকর্ম এবং পড়াশোনা দেখে, ওকে বলে দিয়েছেন— যেন ফেলোশিপ-এর ফাইনাল পরীক্ষার জন্য ও তৈরি হয়। একইসঙ্গে বলেছেন, এই হাসপাতালে ওর কাজের সময়সীমা উত্তীর্ণ না-হলেও, ও যেন আরও বড়ো জায়গা হিসাবে ডেভন য়্যুনিভার্সিটি হাসপাতালে রেজিস্ট্রার পোস্ট-এর কাজের জন্য আবেদন করে। সেখানে ওর কাজের সুযোগ আরও বেশি হবে... এবং ও যেন মিস্টার হ্যানকক-এর নাম উল্লেখ করে নিজের রেফারি হিসেবে।

শ্যামলেন্দু বুঝেছিল, এর থেকে বড়ো সুযোগ ওর জীবনে আর আসবে না।

ইতিমধ্যে বছর ঘুরে গিয়ে আবার বসন্ত সমাগত রানির দেশে। মার্চ-এর শেষদিক থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, গাছে গাছে পাতা আর ফুল ফুটতে শুরু করেছে। মেঘের স্তর সরে গিয়ে মাঝেমধ্যেই গভীর নীলাকাশ দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। গত বছর জুলাই মাসে যখন এসেছিল, তখন ছিল সামার এদেশে। চারটে ঋতু এখানে। সামার-এর পরেই অটাম, তারপর উইন্টার। দেশটা ডুবে গিয়েছিল ঠান্ডা-অন্ধকার, বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়ায়। সত্যি সে এক গভীর একঘেয়ে আর দুর্বিষহ সময়। অভিজিৎ মাঝেমধ্যেই টেলিফোন করে কথা বলত, আর মনের জোর দিত শ্যামলেন্দুকে।

জীবনে কতকগুলো উপকারও যেন সেধেই এসেছিল এই এক বছরে।

শ্যামলেন্দু নিজেই টের পায়, ও এখন কতখানি স্বাবলম্বী এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। হাসপাতালে শল্যচিকিৎসার কাজের সঙ্গে সঙ্গেই, ঘর-গৃহস্থালির কতরকম কাজও দিব্যি শিখে ফেলেছে। হাসপাতালের একটা সিঙ্গলরুম ফ্ল্যাটে ও থাকে। সপ্তাহে একদিন ডোমেস্টিক মহিলা এসে ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। কিন্তু বাকি সব কাজ—বাজার করা, রান্না করা, জামাকাপড় কাচা-ইস্তিরি-গোছানো, তুলে রাখা...সবই নিজে করে। গাড়ি চালানো কলকাতায় শিখলেও চালাত কমই। এদেশে এসে এরমধ্যে কয়েকটা লেসন্ নিয়ে লাইসেন্স পেয়েছে। একটা মোটামুটি গোছের টয়োটা-গাড়িও কিনে নিয়েছে। নিজেই চালায়। পরিবহন নিজের হাতে না-থাকলে এদেশে স্বাধীনতা থাকে না।

আর একটা ব্যাপার টের পায় শ্যামলেন্দু। ও যে দিকটায় প্রথম থেকে রয়েছে, সেটা ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক। এদিকে ভারতীয় বা বাংলাদেশি, পাকিস্তানি মানুষের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। দেশটার রুচি-পরিচ্ছন্নতা-সভ্যতার দিক দিয়েও যেন এদিকটা উন্নত। তবে সুযোগ-সুবিধা, রাস্তাঘাট...সবই অবশ্য সমমানের।

মিস্টার হ্যানকক একদিন সকালে আউটডোর-এর পরে শ্যামলেন্দুকে ডেকে বললেন, স্যাম...তোমার সঙ্গে কথা আছে। ঘরে এসো...তোমার কেরিয়ারের ব্যাপারে আমি যা ভেবেছি তা নিয়ে ডিসকাস করব।

কয়েক মিনিট পরে ডেভিড হ্যানকক-এর ঘরে এসে শ্যামলেন্দু দেখল, ওর তথাকথিত বস্ নিজেই কফি বানাচ্ছে। দীর্ঘদেহী মানুষ ডেভিড, পাঁচের কোঠায় হবে বয়েস। সবসময় কাজের মধ্যে থাকতে ভালোবাসেন। সিনিয়র সার্জেন হওয়া সত্ত্বেও, কাজের ব্যাপারে কোনো বাছবিচার নেই ভদ্রলোকের। রুগির ট্রলি ঠেলে নিয়ে আসা, স্যালাইন চালানো, জুনিয়র ডাক্তার-নার্স-ওটি বয়-দের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা, সব মিলিয়েই তাঁর উপস্থিতি সব জায়গায় সুন্দর সহজ পরিবেশ রচনা করে। তেমনই কাজে দড়।

শ্যামলেন্দুকে ঢুকতে দেখেই বললেন, কাম ইন মাই ডিয়ার, টেক সিট।—বলতে বলতেই ট্রে গুছিয়ে নিয়ে নিজেও এসে বসলেন এবং আবার বললেন, এক্ষুনি তোমার কোনো কাজের ব্যস্ততা নেই তো?

শ্যামলেন্দু বলল, আয়াম অলরাইট। পরে একবার ওয়ার্ডে যাব...দুজন নতুন পেশেন্টকে দেখতে।

কথা বলতে বলতে দেখল, মিস্টার হ্যানকক ট্রে-র মধ্যে স্যান্ডুইচ, বিস্কুট ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছেন এরমধ্যেই। নিজে একটা প্লেট নেওয়ার সঙ্গে শ্যামলেন্দুর দিকেও একটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, স্টার্ট করো খেতে...ডোন্ট ওয়ারি...বিফ নেই, এগুলো চিকেন-স্যান্ডুইচ উইথ স্যালাড অ্যান্ড মাস্টার্ড।

শ্যামলেন্দু হেসে বলল, আমি খাই না বটে, তবে কোনো প্রেজুডিসও নেই।

দু-চার মিনিট অন্য কথার পরে হ্যানকক বললেন, স্যাম, আমাদের এই হাসপাতালে তোমার অগস্ট পর্যন্ত জব রয়েছে। তুমি চাইলে, আমি তারপরেও সেটা এক্সটেন্ড করে দিতে পারি ম্যানেজমেন্টকে বলে। তুমি কী চাও?

বিগত সাত-আট মাসে শ্যামলেন্দু বুঝেছে, আপাতত এদেশে

ডেভিড হ্যানকক প্রায় ওর অভিভাবকেরই ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এবং সে-ব্যাপারে ভদ্রলোকের উদারতার কোনো তুলনা হয় না। সুতরাং ও সহজভাবে নিজের মনের কথাই বলল, আপনি আমাকে যেভাবে গাইড করবেন...যেটা করলে ভালো হয়, আমি তাই করব।

হ্যানকক হেসে বললেন, তুমি বেশ বড়ো দায়িত্ব দিলে আমাকে...কিন্তু যাই হোক, আমি তাইতে সম্মানিত বোধ করছি। আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট...কিন্তু তার আগে আমার একটু জানা দরকার...অ্যাবাউট ইয়োর ফ্যামিলি এবং তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, কতদিন এদেশে থাকবে, কোনো সুপার স্পেশালিটি করতে চাও কি না...।

শ্যামলেন্দু যথাসম্ভব ওর ব্যক্তিজীবনের কথা জানাল, এবং শেষ পর্যন্ত আরও কয়েক বছর থেকে দেশে অবশ্যই ফিরে যাবে, সে কথাও স্পষ্ট করে বলল। এটাও বলল, ও একজন সফল এবং কমপ্লিট সার্জেন হতে চায় এবং দেশে ফিরে কাজ করবে।

মিস্টার হ্যানকক বললেন, তোমাকে আমি যতটুকু দেখেছি, তোমার কাজের ধরন যতটা বুঝেছি...তার সঙ্গেই তোমার টেম্পারমেন্ট, রিলেশন উইথ আদার স্টাফ, তোমার হাতের কাজ, আঙুলের শেপ, টিশ্যু রেসপেক্ট অ্যান্ড ইয়োর নলেজ, সব মিলে আমার কোনো ডাউট নেই যে তুমি একজন কৃতী সার্জেন হবে। যদি দেশে ফিরে না যেতে, তাহলে এদেশেও ভবিষ্যতে তুমি একজন নামকরা, সফল সার্জেন হতে পারতে। কিন্তু ও ব্যাপারে আমি তোমাকে জোর করব না।

শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করল, তাহলে আমি কি এই সাউথ হ্যাম্পটন-এই কন্টিনিউ করব...নাকি...?

হ্যানকক বললেন, না। আমি তোমার ব্যাপারে একটা প্ল্যান ভেবেছি অলরেডি। তুমি যাতে আরও বেশি এবং ভালোভাবে কাজ করতে এবং শিখতে পারো, তার জন্য ডেভনশায়ার হসপিটালের সিনিয়র কনসালট্যান্ট মার্টিন উড-এর সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা তোমাকে বিভিন্ন ব্রাঞ্চ-এ কাজ করার জন্য একটানা পাঁচ বছরের জব অফার করতে পারে। আর তুমি তো জানোই, এটাই হচ্ছে ইংল্যান্ডের সব থেকে দীর্ঘ এবং ভালো সার্জিক্যাল ট্রেনিং-এর কাজ। যখন শেষ করে বেরুবে, তখন যেকোনো বড়ো প্রতিষ্ঠান তোমাকে সার্জেন হিসেবে লুফে নিতে চাইবে।

শ্যামলেন্দু আপ্লুত হয়ে বলল, আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

হ্যানকক বললেন, ওহ্ কামন স্যাম...এসবই তোমার নিজস্ব গুণের জন্য। কিন্তু তার জন্য এখনও তোমার কাজ আছে। তুমি আগামী জুলাই পর্যন্ত এখানে থাকবে এবং বাই দ্যাট টাইম, য়্যু মাস্ট কমপ্লিট ইয়োর ফেলোশিপ। এফ আর সি এস হয়ে গেলেই তুমি ডেভনশায়ারে অ্যাপ্লাই করতে পারবে অ্যান্ড আয়াম শ্যিওর য়্যু গেট দ্য জব।

দিনগুলো যে কী দ্রুত কেটে যেতে লাগল ভাবলে অবাক হয় শ্যামলেন্দু।

সত্যি এফ আর সি এস ফাইনাল পার্ট পাশ করতে ওর মোটেও বেগ পেতে হয়নি। অবশ্য এটাও ঠিক সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে, যাকে বলে, আদাজল খেয়েই আবার পড়াশোনা করেছিল...দেশে এম. এস পরীক্ষার মতোই। তার সঙ্গে এটাও বুঝেছিল, এবারই আসলে ওর হাত পাকানোর বড় সুযোগ আসন্ন। ডেভন য়্যুনিভার্সিটি হাসপাতালে যথাসময়েই আবেদন করেছিল, এবং যথারীতি মিস্টার হ্যানকক-এর কথামতো, তারা লুফেই নিয়েছিল কৃতী ভারতীয় যুবকটিকে।

মাঝখানে মাত্র একবারই দেশে গিয়েছিল শ্যামলেন্দু। দেখতে-দেখতেই তিন সপ্তাহ সময় কেটে গিয়েছিল। বেশি সময় অতিবাহিত করেছিল বাবার সঙ্গেই। ভবিষ্যতের আলোচনাও যেন দিশা পাচ্ছিল তখন থেকে। অমৃতেন্দু অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়র, প্ল্যান করেছিলেন পড়ে থাকা জমিতে কীভাবে নতুন কন্সট্রাকশন করা যাবে। আর মা-এর ডাকনাম 'শুকতারা' তখন থেকেই যেন ঘুরে ঘুরে আসত শ্যামলেন্দুর মাথায়, মনে।

কিন্তু রাধাপিসি বারবার মনে করাতেন অমৃতেন্দুকে, যে ছেলের ত্রিশ বছর বয়স হতে চলল। সুযোগ্যা পাত্রী দেখে বাবুর বিয়েটা এবার অবশ্যই দেওয়ার দরকার এবং উচিত। শ্যামলেন্দু হাসি ছাড়া আর কীই বা বলতে পারে! মনে মনে ভেবেছে, সেই সুদূর বিদেশে এক নীলনয়না, স্বর্ণকেশী যুবতীর সঙ্গে তার যে হৃদয় বিনিময়ের ঘটনা, কিছুদিন ধরে একটা পরিণতির দিকে যেতে চাইছে, সে খবর কি এখনও রাধাপিসি কিংবা বাবাকে জানানোর সময় হয়েছে?

চিত্রা ঘোষালের অপারেশনের পরেও পরিস্থিতি যথেষ্ট সিরিয়াস তা বোঝাই যাচ্ছিল। থিয়েটার থেকে অপারেশন সেরে একটু আগেই বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন শ্যামলেন্দু। চেম্বারে গিয়ে বাড়ির লোক, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে কীভাবে ক্যান্সার ছড়িয়ে গেছে পেটের মধ্যে।

অতিরিক্তভাবে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য দুটি ল্যাবরেটরিতে বায়োপ্সি করতে পাঠিয়েছিলেন। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই প্রাথমিক রিপোর্ট এসে পৌঁছাল। প্রায় কাছাকাছি রিপোর্টই লিখেছে দু-জায়গা থেকে। গলব্লাডার ভর্তি মিশ্র ধরনের পাথর থাকলেও, ক্যান্সার পজিটিভ। সম্ভবত ক্যান্সারের উৎপত্তি প্যাংক্রিয়াস থেকে এবং লিভারে ছড়িয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পরবর্তী রিপোর্টে বিশদ জানানো হবে।

শ্যামলেন্দু সবই জানতেন। নার্সিংহোমের অন্যান্য স্টাফরাও জানে দোতলার ঘরে একজন খুব সিরিয়াস রোগিণী ভর্তি আছেন... যাঁর অবস্থা এখন-তখন বলেই মনে করা হচ্ছে। পোস্ট অপারেটিভ উন্নতির আশা কম।

নতুন বাড়ির দোতলায় শ্রীমতী ঘোষালকে একটি সিঙ্গল রুমে রাখা হয়েছে। তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা স্পেশাল নার্স-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অ্যাঞ্জেলা স্বয়ং বিলেতের সিনিয়র নার্স ছিলেন, শুকতারা নার্সিংহোমেরও তিনি মেট্রন। সেই কারণে স্পেশাল ডিউটি করতে আসা কলকাতার নার্সদের সম্বন্ধে তিনি একটু বেশি সতর্ক। কেননা এত বছর কলকাতায় থাকতে থাকতে তিনি বেশ ভালোই বোঝেন, সাদা ড্রেস পরে আসা তথাকথিত এইসব নার্সদের প্রকৃতই যথেষ্ট ট্রেনিং এবং অভিজ্ঞতা নেই।

একটু-আধটু লেখাপড়া জানা আয়ারাই কালক্রমে ফিটফাট হয়ে, কোনো-না-কোনো সংস্থা থেকে নার্সের ডিউটি করতে চলে আসে।

শ্রীমতী ঘোষালের জন্য তিনি প্রথম থেকেই সতর্ক হয়েছেন, কেননা অপারেশনের পর থেকেই তাঁর স্যালাইন একবারও বন্ধ করা হয়নি, যেহেতু তাঁর ক্ষেত্রে মুখে খাওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি এখনও। স্যালাইন চললেই রুগির খেয়াল রাখতে হয় অনেক বেশি, হিসাব রাখতে হয় জলীয় পদার্থের ইনপুট-আউটপুট নিয়ে। ক্যান্সারের রুগি, সুতরাং ক্যাথিটারও আছে। সেদিকেও নার্সকে খেয়াল রাখতে হবে—যাতে ইনফেকশন না হয়।

এসব ক্ষেত্রে দক্ষিণী নার্সদের অপেক্ষাকৃত বেশি পছন্দ করেন অ্যাঞ্জেলা। ওরা কাজ জানে এবং আন্তরিকভাবে কাজও করে।

অপারেশনের পর থেকেই লীলা আর দেবিকা নামের দুটি সাউথ ইন্ডিয়ান মেয়ে শ্রীমতী ঘোষালের ডিউটি করছে বারো ঘণ্টা করে। অতীশ ছাড়া আরও দুজন আর এম ও, সুদর্শন এবং জয়াও আছে। ওরা দুজনেই ওড়িয়া, ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতায় পোস্ট- গ্র্যাজুয়েট পড়তে এসেছে। তিনজনেই সময় ভাগাভাগি করে ডিউটি করে। ওরা সবাই জানে মিসেস ঘোষালের কন্ডিশন সিরিয়াস। অতীশ তো অপারেশনের সময়েই অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল। বিশেষভাবে খেয়াল রাখছে ওরাও।...

শ্যামলেন্দু বিলেত থেকে পাকাপাকি দেশে ফিরে আসবার আগেই, কসবার বাড়িতে নার্সিংহোম করার পরিকল্পনা সেরে ফেলেছিলেন। আলাপ-আলোচনা করেছিলেন অমৃতেন্দুর সঙ্গেও। নতুন বাড়ির কন্সট্রাকশন এমনভাবেই করা হয়েছিল, যাতে দুই বাড়ির মধ্যে সহজে যাতায়াত করা যায়, আবার কিছুটা পৃথকভাব বা আইসোলেশনও থাকে। উদ্দেশ্য ছিল, যেহেতু কাজের জায়গা আর বাসস্থান একই চত্বরের মধ্যে, সেইহেতু সুবিধা এবং অসুবিধা দুটোর মধ্যেই যেন একটা ভারসাম্য থাকে।

অমৃতেন্দু অতীতের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ছেলেকে বলেছিলেন, তুই যদি আমাকে একটা মোটামুটি আইডিয়া দিস...তোরা কোথায় এবং কী কী করতে চাস, তাহলে আমি একটা বাড়ির প্ল্যান করতে পারি আগে থাকতে।

শ্যামলেন্দু তখনও ইংল্যান্ডেই ছিলেন এবং ততদিনে বিবাহিত, যমজ পুত্র-কন্যার পিতা। অমৃতেন্দুও নাতি-নাতনির আকর্ষণে তখন তৃতীয়বারের জন্য পুত্র ও পুত্রবধূর কাছে ছিলেন। পিতা-পুত্রের এবং পুত্রবধূর সঙ্গেও আলোচনা চলত প্রায়ই। কেননা অ্যাঞ্জেলাও তখন কলকাতায় ঘুরে গেছে দুবার এবং পরবর্তী জীবনযাপনের ব্যাপারেও মনস্থির করে ফেলেছিল।

বাবার কথা শুনে শ্যামলেন্দু বলেছিল, কিন্তু বাবা, তার আগে আমার জানার দরকার, আমাদের যতটা জমি আছে, তারমধ্যে মোটামুটি কত স্কোয়ার ফুটের বাড়ি এবং কটা ফ্লোর আমরা করতে পারব।

অমৃতেন্দু বলেছিলেন, ধরে নে, গ্যারাজ এবং একটা মাঝারি সাইজের শিফট্-এর জন্য জমি ছেড়ে রাখলেও, আড়াই হাজার স্কোয়ার ফুটের নতুন বাড়ি করা যাবে। তাছাড়া আমি খোঁজ নিয়েছি, রাজডাঙা এলাকায় আমাদের যা জমি আছে, তাইতে চারটে ফ্লোর হেসে-খেলে করা যাবে।

কর্পোরেশন থেকে প্ল্যান স্যাংশন করাতে হবে তো?

নিশ্চয়ই।

তার জন্য ঘুষ দিতে হবে না?

সব কিছু নিয়ম মেনে করলে, না-দেওয়ারই কথা। তবে ওই... খুঁত খুঁজে বার করার তো অসুবিধে থাকে না। বিশেষ করে যদি আবার নার্সিংহোম জাতীয় কিছু করার ব্যাপার হয়, তখন প্ল্যান-স্যাংশনের বাবুদের নীতিবোধ তীব্র হয়ে ওঠে আর কি!

শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করেছিল, আমাদের পুরোনো বাড়ির এরিয়া কতটা?

খুব বেশি না, অমৃতেন্দু বললেন, দেড় হাজারের মতো হবে।

তার মানে...আমরা নার্সিংহোম করলে, এক-একটা ফ্লোর প্রায় চার হাজার স্কোয়ার ফুট হতে পারে...। নট ব্যাড।

আসলে জায়গাকে কীরকমভাবে ব্যবহার করা হবে, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

এগজ্যাক্টলি। আর নার্সিংহোমের ক্ষেত্রে সেটা আরও বেশি করে ভাববার দরকার বাবা...কেননা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, অপারেশন, ক্লিনিক, প্যাথল্যাব, চেম্বার...এই সব যেখানে থাকবে, সেখানে ঠিকমতো স্পেস ইউটিলাইজেশন খুব ইম্পর্টান্ট।

অমৃতেন্দু বললেন, তারপর ধর, এক্স-রে মেশিন, ঘরে ঘরে এসি, ওটিতে আলোর ব্যবস্থা...ইত্যাদির জন্য অতিরিক্ত ইলেকট্রিক কানেকশন নিতে হবে। আমাদের ড্রেনেজ সিস্টেমকে নতুনভাবে অ্যারেঞ্জ করতে হবে। কর্পোরেশনের এক্সট্রা জলের লাইন নিতে হবে। টেলিফোনেরও এক্সট্রা ল্যান্ডলাইনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে...।

শ্যামলেন্দুর সবসুদ্ধ সাড়ে পাঁচ বছর বিলেতবাস সেরে ফিরে আসার আগেই, নার্সিংহোম সংক্রান্ত আলোচনা প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছিল বাবার সঙ্গে। শুধু আলোচনাই বা কেন, শ্যামলেন্দু সপরিবারে ফিরে আসার আগে, কসবা রাজডাঙায় নতুন বাড়ির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল জোর কদমে। প্রাথমিক আয়োজন এবং তারজন্য যথারীতি আমাদের দেশীয় যে-সমস্ত বিশেষ অলিখিত ঝামেলা পোয়াতে হয়, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-নাগরিক-সামাজিক অত্যাচার, তঞ্চকতা, বাধার অনিবার্য সম্মুখীন হতে হয়...সেই সবই সামলেছিলেন অমৃতেন্দু। নতুন বাড়ি তৈরির কাজ এগিয়ে গিয়েছিল অনেকটাই।

স্থানীয় এলাকায় খবরও ছড়িয়ে পড়েছিল মানুষের মুখে মুখে। এবং বলা বাহুল্য, সব মানুষ এবং কাছেপিঠের সব চিকিৎসকরা যে খুশি হয়েছিলেন এমন নয়।...একজন প্রতিযোগী কোমর বেঁধে মাঠে নামলে কে-ই বা খুশি হবে! আবার এটাও ঠিক, পাড়ার মধ্যে, রাস্তার ওপরে একটা বড়ো চিকিৎসালয় হওয়ার খবরে অনেকে খুশিও হয়েছিলেন। আশান্বিত বোধ করেছিলেন।

প্রথম থেকে শ্যামলেন্দুর একটা ভাবনা ছিল সুন্দর অপারেশন থিয়েটার তৈরি করার। আর সেই অনুযায়ী প্ল্যান করা হয়েছিল নতুন বাড়ির একতলার মধ্যেই অন্যান্য ঘরের থেকে আলাদা করে এবং দুই ধাপ উঁচু করেই ওটি-কমপ্লেক্স তৈরি করা হবে। কিন্তু ওটির সঙ্গে অন্যান্য যেসব আয়োজন...যেমন অটোক্লেভ করা, লন্ড্রি এবং ড্রেস

চেঞ্জ, নার্সদের যাতায়াত...এই সবগুলোই পেছনদিকে যাতায়াতের মাধ্যমে পুরোনো বাড়ির একতলায় করা হবে। আর এম ও-দের ঘর এবং রুগিদের থাকার জায়গা, ওয়ার্ড কিংবা সিঙ্গল রুম...সবই হবে পুরোনো-নতুন দুই বাড়ি মিলিয়ে। পরিচ্ছন্ন কিচেন থাকবে পুরোনো বাড়ির দোতলায় এবং নতুন বাড়ি তৈরি করার সময়েই সেইসব রেনভেশন করা হবে।

ওটি-কমপ্লেক্স-এর বাইরেই থাকবে শ্যামলেন্দুর চেম্বার, কনসাল্টেশন রুম, এবং একেবারে বাইরের দিকে রুগি এবং বাড়ির লোকদের বসার জায়গা, তথা ওয়েটিং রুম। লাগোয়া দুই বাড়ির মাঝখানে ফাঁকা উঠোন থাকবে। গাড়ি যাতায়াত করতে পারবে কিন্তু দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াবার সুযোগ থাকবে না। ভিজিটরদের গাড়ি পার্ক করতে হবে নার্সিংহোমের বাইরে। কিছু না হোক, এখনও শুকতারা নার্সিংহোমের মধ্যেই একটি নিম এবং একটি কাঠচাঁপার গাছ বাঁচিয়ে রাখা গেছে, এত সব ব্যবস্থার পরেও।

কিন্তু অমৃতেন্দু বলেছিলেন, কাজ শুরু করে দাও। সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে কাজ করবে—ওভাবে ভাবলে হবে না।

বাসস্থানের সবটাই হয়েছে নতুন বাড়ির তিন এবং চারতলায়। জায়গার অভাব হয়নি। অমৃতেন্দু যদিও পুরোনো বাড়ির দোতলা থেকে সরে আসতে চাননি প্রথমে, কিন্তু পরে শ্যামলেন্দুর যুক্তিই মেনে নিয়েছিলেন। যদিও পুরোনো বাড়ি অবশ্য শুধু নামেই। রেনভেশন এবং রং করার পরে দুই বাড়ির চেহারাই একইরকম ঝকঝকে। হ্যাঁ, শ্যামলেন্দুর বিদেশে রোজগার করা অর্থ যথাসম্ভব খরচ এবং তার সঙ্গে ব্যাংক লোন, উভয় মিলিয়েই বাড়ি এবং চিকিৎসালয় তৈরি হয়েছিল।

শ্যামলেন্দু সপরিবারে বাস করেন চারতলায়। চারটি ঘর, তিনটি বাথরুম, টয়লেট, কিচেন ছাড়াও ব্যালকনি...সব মিলিয়ে চারটি প্রাণীর জন্য জায়গার অভাব নেই। ইদানীং তিনতলাটির ব্যবহার নিয়েই নতুন ভাবনা শুরু হয়েছে। অমৃতেন্দু, রাধাপিসি ছিলেন রীতিমতো হাত-পা ছড়িয়ে; আবার চারতলার সদস্যদেরও ইচ্ছামতো যাতায়াত ছিল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুদেরও আসা-যাওয়া সবটাই ছিল প্রায় তিনতলায়। অমৃতেন্দু প্রয়াত হয়েছেন দু-বছর হয়ে গেছে। রাধাপিসির অবস্থাটা শ্যামলেন্দু-অ্যাঞ্জেলা উভয়েই বুঝতে পারে এবং সম্মান করে তাঁর মতামত। একা হয়ে গেছেন তো বটেই। আবার শ্যামলেন্দু-অ্যাঞ্জেলা ছাড়া রানু-শানুর আকর্ষণও তাঁর কম না। ওদের কাছেও রাধাপিসির ভূমিকা ঘনিষ্ঠতমই বলা উচিত।

ইদানীং প্রায়ই রাধাপিসি বর্ধমানে শ্বশুরালয়ে চলে যান। আবার কিছুদিন পরে ফিরে না-এসেও পারেন না। সম্প্রতি বেশ কয়েক সপ্তাহ রামপুরহাটে মেয়ের কাছে গিয়েছিলেন। সেখানে নাকি বেশ ভালোই লেগেছে। সুতরাং তিনতলার কিছুটা অংশ ইদানীং নার্সিংহোমের অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অ্যাঞ্জেলাও কম্পুটার নিয়ে কাজকর্ম করেন।

আজকের শুকতারা নার্সিংহোমের চেহারা, স্বাচ্ছন্দ্য, সুযোগ-সুবিধা...কোনোটাই একদিনে হয়নি অবশ্য। শ্যামলেন্দুরা যখন সপরিবারে ফিরেছিলেন, তখন বাড়ির কাজ অনেকটা হয়ে গেলেও, এক একটি তলা...বিশেষ করে তিন এবং চারতলার অভ্যন্তরীণ অনেক কাজ বাকি ছিল। ছেলেমেয়েরাও ছোটো ছিল, অ্যাঞ্জেলাও নতুন। অথচ একটু একটু করে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল তখনই।

শ্যামলেন্দুর ইচ্ছে ছিল, আরও কিছুটা গুছিয়ে...ঠিকমতো নার্সিংকেয়ার, বেড-এর ব্যবস্থা, রিকভারিরুম, পোস্ট-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট, অন্যান্য স্পেশালিস্ট ডাক্তারদের ব্যবস্থা...ইত্যাদি করে নিয়ে তারপর নার্সিংহোম স্টার্ট করা।

কিন্তু অমৃতেন্দু বলেছিলেন, কাজ শুরু করে দাও। সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে কাজ করবে—ওভাবে ভাবলে হবে না। যতটা ব্যবস্থা হয়েছে, তার মধ্যে যতটা করা সম্ভব...রুগি দেখা, অপারেশন করা, রুগি ভর্তি করা...চালু করে দিতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গেই ডেভেলাপমেন্টের কাজও চালিয়ে যেতে হবে। চিন্তা করিস না... এভাবেই কাজ করতে হয়। একসঙ্গে সবকিছু নিয়েই চলতে হয়।

শ্যামলেন্দু বুঝেছিল, বাবার কথাই ঠিক। সময় বয়ে যায়। কোনো একটার জন্য আর একটাকে বসিয়ে রাখা যায় না। আর এভাবেই

সেই তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ার সব থেকে বড়ো উপকার হয়েছিল, পরিবারের কারোরই নতুন দেশে এসে, পরিবেশ পারিপার্শ্বিক, আবহাওয়া-কালচার...কোনো কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উৎকণ্ঠা খুব বেশি সহ্য করতে হয়নি। ডিপ্রেশনেরও সুযোগ হয়নি। রানু-শানু অ্যাডজাস্ট করে ফেলেছিল দ্রুত। ওদের সঙ্গ দিয়েছিলেন অমৃতেন্দু স্বয়ং।

আজও যে কোনো একটা টেনশন, দুর্ভাবনার সময় বাবার কথা মনে হয় শ্যামলেন্দুর। মিস্ করে অমৃতেন্দুকে।

আবার বাবা যে জীবনযাপনের গোড়াটা শক্ত করে দিয়ে গেছে, সেটাও স্মরণ করে বারবার।

আজ শুক্রবার। উল্টোডাঙা আর বেলেঘাটার মাঝখানে বাইপাস থেকে একটু ভেতরে সামারিটান হাসপাতালের আউটডোর আর ওয়ার্ড রাউন্ড থাকে শ্যামলেন্দুর। সকালবেলাটা অন্য কাজ রাখেন না। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পর থেকেই সামারিটান-এর সঙ্গে যুক্ত আছেন। নিতান্ত কম পারিশ্রমিকে ওখানে কাজ করতে পছন্দও করেন। ওটুকু তাঁর সেবাধর্মের তুষ্টি।

এখনও তেমন গরম পড়েনি, তাই মাঝেমাঝে নিজেই গাড়ি চালান শ্যামলেন্দু। সাধারণত বাইরে থেকে ফিরে আসার পরে এবং ওপরে যাওয়ার আগে, নার্সিংহোমের রুগিদের একবার খবর নিয়ে যান...প্রয়োজন হলে দেখেও যান। আর এম ও কিংবা নার্সদের সঙ্গে কথা বলেন। কোনো অপারেশন থাকলে অবশ্য ওটি-তে চলে যান।

আজ গাড়ি থেকে নেমে সোজা দোতলায় চলে গেলেন শ্যামলেন্দু চিত্রা ঘোষালকে দেখতে। ওয়েটিং রুমে কিছু লোক বসে আছেন।...দেবিকা নামের মেয়েটি ডিউটি করছে জানেন, তা সত্ত্বেও বাইরে থেকে দরজায় টোকা দিয়ে বললেন, দেবিকা দিস ইজ ডক্টর মুখার্জি...মে আই কাম ইন?

সামান্য সংকুচিত কেরালিয়ান মেয়েটি নিজেই এগিয়ে এল।—ওহ্ ইয়েস্...প্লিজ কাম ইন স্যার।

বেড-এর কাছে এগিয়ে গেলেন শ্যামলেন্দু। শান্তভাবেই শুয়ে আছেন মিসেস ঘোষাল। ড্রিপ চলছে। চোখ বোজা। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছে বুক-পেট। পর্দা টানা থাকাতেই আলো কম ঘরের মধ্যে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দেখলেন শ্যামলেন্দু। বিছানার পাশে খাটের নীচের দিকে প্লাস্টিকের ইউরিন ব্যাগের দিকে তাকালেন। বেশ ডার্ক রং ইউরিনের।

দেবিকা ফাইল নিয়ে আসতেই শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন মনে হচ্ছে মিসেস ঘোষাল?

নো চেঞ্জ স্যার...একইরকম...।

কোনো রেসপন্ড করছেন? কথা বলেছেন?

না স্যার...দু-একবার চোখ খুলেছেন...কিন্তু খুবই ড্রাউজি...।

ব্যথা-যন্ত্রণা...কষ্ট হচ্ছে মনে হয়েছে...এনি ডিস্‌কমফর্ট?

ডোন্ট থিংক স্যার...সেরকম কোনো এক্সপ্রেশন নোটিস করিনি।

অ্যানেসথেটিস্ট ডক্টর সোম কি এসেছিলেন দেখতে?

ইয়েস স্যার...অ্যারাউন্ড টেন-ও ক্লক। ড্রিপ রেজিম ঠিক করে দিয়ে গেছেন...ভিটামিনস্ দিতে বলেছেন। একটা ব্লাড স্যাম্পেল পাঠাতে বলেছিলেন ইউরিয়া-ইলেক্ট্রোমাইটস আর হিমোগ্লোবিন দেখার জন্য। পাঠানো হয়েছে।

একটা হালকা শ্বাস ছাড়লেন শ্যামলেন্দু। রুগি ভালো নেই। মনে হল অ্যাসাইটিস (পেটে জল)-টা বেড়েছে। হয়তো সেইজন্য একটু শ্বাসকষ্টও বেড়েছে। চোখের পাতা তুলে দেখলেন। জন্ডিস ডিপ হয়েছে আর একটু। ইউরিনেও তার প্রতিফলন রয়েছে। নার্সকে বললেন, বিছানার মাথার দিক আর একটু উঁচু করে দিতে এবং একটু অক্সিজেন দিতে। আর খুব একটা কিছু করার নেই এই মুহূর্তে। অঙ্কোলজিস্ট দেখে গেছেন গতকাল। কেমোথেরাপি দেওয়ার কথা ভাবছেন...কিন্তু ডিটেল বায়োপ্সি রিপোর্ট পাওয়ার পরে ঠিক করবেন, কোন ওষুধ, কতটা দেওয়া যাবে...ইত্যাদি। শ্যামলেন্দু কোনো আশা দেখছেন না।

রুগি দেখে বেরিয়ে এলেন শ্যামলেন্দু। প্রত্যক্ষভাবে কিছু করার নেই এখনই। কিন্তু বিদেশে চিকিৎসার ধরন অনুযায়ী এমন অবস্থায় যা দরকার তা হচ্ছে রুগিকে যথাসম্ভব কষ্ট এবং ব্যথা-যন্ত্রণাহীন অবস্থায় রাখা। সেসব ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আরও ছ-সাতজন রুগি ভর্তি আছেন শুকতারাতে...একজন বাদে সবই অন্যান্য ডাক্তারের। মেডিসিন অথবা গাইনি পেশেন্ট। দুপুরবেলা অর্থোপেডিক সার্জেন তাপস চক্রবর্তীর কেস আছে— ফ্র্যাকচার নেক অব ফিমার। এক্স-রে কন্ট্রোলে অপারেশন হবে। নিশ্চয়ই অ্যাঞ্জেলা থিয়েটারে সব দেখাশোনা করছেন। খুব একটা ভিড় থাকে না লাঞ্চটাইমে।

শ্যামলেন্দু নীচেয় আসতেই জনা তিনেক লোক এগিয়ে এল ভিজিটারস রুম থেকে। প্রথমজনের পরনে ছাই রঙের সাফারি স্যুট। মুখটা সামান্য চেনা কি শ্যামলেন্দুর! বাকি দুজন অবশ্যই অচেনা। একজনের পরনে জিনস্ আর টি-শার্ট, হাতে চেন, চেহারায় রুক্ষতা। অন্যজন পরে আছে পাজামা, গুরুপাঞ্জাবি, হাতে গোটা কয়েক আংটি, চোখে চশমা, পুরুষ্ট গোঁফ।

সাফারি স্যুট এগিয়ে এসে বললেন, আমার রুগির ব্যাপারে একটু কথা বলব আপনার সঙ্গে।

সামান্য হাসির ভাব করল লোকটি। দাঁত দেখে মনে হল বোধহয় পান অথবা পানমশলা জাতীয় কিছু খেয়ে থাকেন। কিন্তু শ্যামলেন্দু বিরক্তবোধ করলেন অন্য কারণে। কোনো সম্বোধন না-করে এবং নিজের পরিচয় না দিয়ে, অজানা-অচেনা কেউ যদি কথা বলতে আসে, প্রথমেই মনে হয় লোকটির ভদ্রতাবোধ এবং সৌজন্য কোনোটাই নেই। তার ওপর অনুমতির আগেই প্রস্তাব!

ঘুরে তাকালেন শ্যামলেন্দু তাঁর থেকে অপেক্ষাকৃত বেঁটে লোকটির দিকে। ভুরু কোঁচকানো মুখেই বললেন, আপনার রুগি! আপনি কে বলুন তো...চিনতে পারলাম না। রুগিই বা কে?

জিনস্ আর হাতে চেন উত্তর দিল।—এঁকেই চেনেন না স্যার...কসবায় নার্সিংহোম চালাচ্ছেন! ইনি হচ্ছেন হালতুর বিধান রায়। দেবদত্ত সামন্ত...দেবু ডাক্তার বলেই লোকে জানে।

শ্যামলেন্দু একইরকমভাবে বললেন, আপনিই বা কে? আপনাকেও তো দেখেছি বলে...।

আমরা ছোটো মোটো মানুষ স্যার...বিলেত-আমেরিকা থেকে আসিনি। একটু সমাজ সেবা-টেবা করি, এলাকায় পল্টু দত্ত-বলে মানুষ চেনে। পাশের গুরুপাঞ্জাবি আর চশমার দিকে হাত দেখিয়ে

বলল, দাদার পরিচয়টাও দিয়ে দিই। পালপাড়ার কাউন্সিলর বিদ্যুৎ বর্মন। না চিনলেও, চিনে রাখুন...রাজডাঙায় নার্সিংহোম চালাচ্ছেন... কাজে লাগবে। আমরা সবাই লোকাল।

অসম্ভব বিরক্ত এবং কিছুটা অপমানিতও বোধ করলেন শ্যামলেন্দু। বিগত সাত-আট বছরে এধরনের লোকজনকে একেবারে চেনেন না, এমন না। কেননা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বলতে ইদানীং এই এক শ্রেণির মানুষজন, ভাষা-পোশাক-আচরণ-ই অধিক এবং পরিচিত হয়ে উঠেছে, তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এদের সঙ্গে সবাইকে গলাগলি করে চলতে হবে। শ্যামলেন্দু নিজেও কসবার-ই ছেলে, বড়ো হয়ে উঠেছেন এই শহরে। এ শহরের অন্য শ্রেণিও তাঁর অপরিচিত নয়।

জিনস্ পল্টুর কোনো কথাকেই গুরুত্ব না দিয়ে শ্যামলেন্দু তাকালেন সাফারির দিকে। ইতিমধ্যে প্রশান্ত এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পাশে, বোধহয় কৌতূহলী হয়েছিল তিনজন আগন্তুককে দেখে এবং তাদের শরীরের ভাষায়।

সাফারিকে শ্যামলেন্দু বললেন, ওহ্ আচ্ছা...আপনি ডাক্তার! কিন্তু আপনার রুগিটি কে? এখানে ভর্তি আছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ...সেইজন্যই তো আসা...তা নয়তো কে আর এসময় চেম্বার ছেড়ে ফালতু হ্যাজাতে আসে বলুন! আমি ওই ঘোষালদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান...চিত্রা ঘোষাল তো ভর্তি আছেন এখানে। সে ব্যাপারেই খোঁজ নিতে এসেছি।

বুঝলাম। কিন্তু রুগি তো আপনার রেফারেন্সে আসেননি এখানে। একটা কনফিডেন্সিয়ালিটির ব্যাপার আছে তো...!

সামন্ত বলল, অত সাহেবি কেতা এখানে চলে না স্যার... ডাক্তারে-ডাক্তারে আবার ঢাক ঢাক গুড়গুড় কী আছে! তাও যদি আপনি জানতে চান, একটা ফোন করে ঘোষালদের কাছ থেকে জেনে নিন, দেবু সামন্তকে তারা চেনে কি না!

প্রশান্ত পাশ থেকে হঠাৎ বলল, স্যার, আমি কি ওঁদের ফোন নম্বরটা নিয়ে আসব?

শ্যামলেন্দু হাত তুলে প্রশান্তকে নিরস্ত করলেন। তারপর সামন্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কী জানতে চান রুগি সম্পর্কে?

মাথা দুলিয়ে সামন্ত বলল, কেস তো ঘেঁটে বসে আছে শুনলাম। এবার আপনি কী বলতে চান...কীভাবে সামলাবেন?

আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন বলুন তো?

এবার সেই গুরুপাঞ্জাবি কাউন্সিলর এগিয়ে এল। সামন্তর উদ্দেশেই বলল, দেবুদা কেসটা আমি হ্যান্ডেল করব?

সামন্ত বলল, দাঁড়াও, দরকার হলে করবে তো বটেই। তার আগে ডাক্তারে-ডাক্তারে একবার...।

সামান্য অসহিষ্ণু হয়ে শ্যামলেন্দু বললেন, হোয়াট ইজ দিস? আপনি কী জানতে চান বলুন না!

বলব বলেই তো আসা। সামন্ত নাক চুলকে যোগ করল, এখানে দাঁড়িয়েই বলব?

শ্যামলেন্দু দ্রুত প্রশান্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, এঁকে আমার চেম্বারে নিয়ে যাও তো! অন্যদিকে কাউন্সিলরকে বললেন, আপনারা ভিজিটরস রুমে গিয়ে বসুন। রুগির ব্যাপারে আপনাদের সামনে কথা হবে না। প্রাইভেসির ব্যাপার আছে।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, জনপ্রতিনিধিকে অস্বীকার করাটা ঠিক করছেন ডাক্তারবাবু? রুগি তো আপনার মা-এর ভোগে!

এসব কী বলছেন...একজন সিরিয়াস পেশেন্ট সম্পর্কে?

সিরিয়াস বলেই তো বললুম। জনপ্রতিনিধির হেলপ্ ছাড়া বাঁচতে পারবেন?

সামন্ত বলল, আচ্ছা তোমরা বোসো গিয়ে...চা খাও...আগে আমি একটু বুঝি কেসটা কী!

শ্যামলেন্দু চেম্বারে ঢুকতে ঢুকতেই বললেন, আপনি কেসটা বুঝবেন কী করে...আপনি ওঁর প্রবলেমটা জানেন?

সামন্ত ভুঁড়ির ওপর টাইট সাফারির বোতাম ঠিক করে বসল। তারপর বলল, দেখুন ডাক্তার মুখার্জি, সাতাশ বছর প্র্যাকটিস করছি, অত হেলাফেলা করে কথা বলবেন না। গলব্লাডারের স্টোন আমাকে বোঝাতে আসবেন না। সার্জেন আর অপারেশনও আমি কম দেখিনি। অনেক সার্জেনকেই দাঁড় করিয়েছে এই সামন্ত...এখনও তারা তেল মারে।

শ্যামলেন্দু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে, সামন্ত লোকটিকে নিরীক্ষণ করলেন। এ ধরনের কিছু দালাল ডাক্তারের কথা তিনি শুনেছেন বটে। এরা গ্রামগঞ্জ, শহরতলি এবং বিশেষ করে সরকারি হাসপাতাল থেকে রুগি ভাঙিয়ে আনে। তারপর বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, নার্সিংহোমে নিয়ে যায়—ভালো চিকিৎসার টোপ দিয়ে। টাকাপয়সার রফা করে। নার্সিংহোমের গাইনি এবং সার্জারির অসাধু ডাক্তারদের সঙ্গে এদের কমিশন এবং পার্সেন্টেজের হিসেব থাকে। লোকাল মস্তান-রংবাজ-নেতা-তোলাবাজদের সঙ্গেও আঁতাত আর হিসেব থাকে। যেসব ডাক্তাররা এদের ফাঁদে পা না দেয়, যেমন শ্যামলেন্দু, তাদের ওপর এরা চাপ সৃষ্টি করে। প্র্যাকটিস ভাঙানোর চেষ্টা করে, ভয় দেখায়, শাসায়, বদনাম করে এবং ক্ষতি করার চেষ্টা করে সর্বতোভাবে।

এরা প্রায় একটি মাফিয়াচক্র। যে রাজনৈতিক দল সরকার চালায়, তাদের সমর্থক হয়েই এরা এলাকার প্রতিষ্ঠিতদের ওপর জুলুমবাজি করে। নানানভাবে প্রভাবিত করে এবং নিয়মিত টাকা খায়। এক শ্রেণির ডাক্তাররাও লোভে এবং রোজগারের জন্য এদের মদত দেয়।

শ্যামলেন্দু বললেন, আপনি এসব কথা আমাকে বলছেন কেন?

বলছি...তার কারণ, কসবায় নার্সিংহোম করেও আপনি আমায় পাত্তা দিচ্ছেন না...তাই। তার ওপর রুগিও আমার।

কিন্তু আপনার নাম কেউ বলেনি, রেফারেন্স-ও দেয়নি।

আপনি কি খোঁজ নিয়েছিলেন? জানতে চেয়েছিলেন ঘোষালদের কাছে?

তার তো কোনো প্রয়োজন হয়নি...।

সামন্ত হেসে বলল, এবার হবে। গলব্লাডারের পাথর বার করতে গিয়ে, রুগি যদি টেঁসে যায়, পাবলিক আপনাকে ছাড়বে... নাকি কাউন্সিলর ধূপধুনো দিয়ে পুজো করবে! আমিই বা রুগির বাড়ির লোককে কী বলব! এসব ভেবে দ্যাখেননি?

শ্যামলেন্দু সোজা তাকিয়ে বললেন, আপনি কি জানেন, রুগি গলস্টোন নিয়ে ভর্তি হলেও, ওঁর প্যাংক্রিয়েটিক ক্যানসার বেরিয়েছে,

তাও গ্রেড থ্রি এবং লিভারে মেটাস্টেসিস...জন্ডিস রয়েছে, অ্যাসাইটিস...। ভেরি পুওরলি।

সেসব যাইহোক...গলব্লাডার অপারেশন করতে গিয়ে রুগিকে মেরে ফেলেছেন...এটাই তো আসল কথা!

না, সেটা আসল কথা নয়। রুগি ক্রিটিক্যাল কেননা তিনি অ্যাডভান্সড ক্যানসারে ভুগছেন এবং অপারেশন করতে গিয়ে তা ধরা পড়েছে।...

কিন্তু রুগি মরে গেলে আমরা তো সেই কথাটাই বলব। পাড়ায়, এলাকায়...সোসাইটিতে, পার্টির ছেলেরা থেকে শুরু করে নেতা পর্যন্ত...কসবা-পালপাড়া-হালতু-মুকুন্দপুর ছেড়ে বালিগঞ্জ-ঢাকুরিয়াতেও খবর ছড়াবে। সেটা কি ভালো হবে?

আপনি কি আমায় ব্ল্যাকমেল করতে এসেছেন? কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? আমি আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করি...বুঝলেন!

সামন্ত উত্তর দেওয়ার আগেই...সম্ভবত প্রশান্তর মুখে কিছু শুনেই অ্যাঞ্জেলা সেই মুহূর্তে হাজির হলেন চেম্বারে। আর শাড়ি পরা মেমসাহেবকে দেখেই একটা বিগলিত হাসি মেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সামন্ত। মুখে মধু ঢেলে বলল, কাম ইন...ম্যাডাম, কাম ইন। গুড আফটারনুন...।

শ্যামলেন্দুর দিকে তাকালেন অ্যাঞ্জেলা।—হোয়াট ইজ গোয়িং অন স্যাম? হু ইজ দিস জেন্টেলম্যান?

সামন্তই উত্তর দিল।—আই অ্যাম লোকাল জিপি ম্যাডাম...ডক্টর সামন্ত। মিসেস ঘোষাল ইজ মাই পেশেন্ট।

অ্যাঞ্জেলা পরিষ্কার বাংলায় বললেন, আপনার পেশেন্ট কেন হবে? উনি ডক্টর মুখার্জির আন্ডারে ভর্তি হয়েছেন...পরশুদিন অপারেশন হয়েছে...ক্যানসার ডিটেক্টেড হয়েছে...ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন।

সবই জানি ম্যাডাম। সামন্ত বলল। তবে পাবলিক বলছে অপারেশন করতে গিয়েই নাকি গোলমাল হয়েছে...।

দ্যাট ইজ অ্যাবসল্যুটলি বোগাস...বাড়ির লোকদের আমরা জানিয়েছি...।

ঠিক আছে...দেখুন তাহলে এরপরে কী দাঁড়ায়! রুগি মরে গেলে কিন্তু আমরা ছেড়ে কথা বলব না। বাড়ির লোকদের কী বুঝিয়েছেন জানি না। কিন্তু আমাদের তো একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে...তাই আগেভাগে বলতে এসেছিলাম...। মাত্র কয়েক বছর ব্যবসায় নেমেছেন তো...এখানকার নিয়মকানুন জানেন না এখনও... ঠিক আছে, আসি।

অ্যাঞ্জেলা চোখমুখ লাল করে বলে ফেললেন, হাউ ডেয়ার য়্যু! একজন ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট নিয়ে আমাদের ব্ল্যাকমেল করছেন?

সামন্ত বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করে বলল, এখনও কিছু করিনি ম্যাডাম...কিন্তু আমার পেশেন্ট মরে গেলে করব।

আপনি কী ভাবছেন...আমরা হেল্পলেস? দেশে গভর্নমেন্ট আছে, পুলিশ আছে, আইন আছে।

এটা বিলেত-আমেরিকা নয় ম্যাডাম। সবই আছে...তাই আমরাও আছি। আপনাদের বুঝতে একটু দেরি হচ্ছে...এই আর কি! টেক কেয়ার। হোপ উই শ্যাল মিট এগেন...নমস্কার...কেমন!

একটা অদ্ভুত হতাশায়, অবসাদে, বিমর্ষতায় মনটা ডুবে রইল শ্যামলেন্দুর। মিসেস ঘোষালের জন্য মনটা এমনিতেই খারাপ... অথচ কিছু করার নেই। তার ওপর কয়েকটা হৃদয়হীন মানুষের এই আচরণ...শাসানি! ভাবা যায়! মানুষের অসুখ, মৃত্যু নিয়েও এরা ব্যবসা করে!

কোথায় সহানুভূতি জানাবে এমন একটা ট্রাজিক পরিণতির জন্য...তা নয়...!

এসব লোক ডাক্তার বলেও নিজের পরিচয় দেয়! শুধু তাই বা কেন! দিব্যি প্র্যাকটিস করে খাচ্ছে...আর সঙ্গে কাউন্সিলর আর পাড়ার মস্তান নিয়ে থ্রেট করতে আসছে নার্সিংহোমে। এই মূল্যবোধ আমাদের সমাজের একাংশের!

এদের কি কোনো ধারণা আছে, যে-কোনো কারণেই কোনো সার্জেনের একজন রুগি মারা গেলে তিনি নিজে কতখানি বিদ্ধ হন! কতখানি উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা, বিমর্ষতার মধ্যে দিয়ে তাঁকে যেতে হয়! যে-কোনো চিকিৎসকেরই হওয়ার কথা। সার্জেনদের হয়তো অপেক্ষাকৃত বেশি, কেননা তাঁদের ঝুঁকিটা বেশি নিতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রুগি মারা যাবে, এ সত্যকেও না-মেনে উপায় কী! এবং সেই প্রতিটি মৃত্যুর কিছুটা বেদনা কি ডাক্তারকেও সহ্য করতে হয় না? অথচ জীবিকার দায়ে এবং প্রয়োজনে তাঁর সেই বেদনা প্রকাশের উপায় নেই। যে-কারণে সহানুভূতির প্রয়োজন তাঁরও।

দীর্ঘকাল বিদেশে শিক্ষানবিশির পর্যায়েই শ্যামলেন্দু জেনেছিলেন, শল্যচিকিৎসকদের হতে হয় সর্বাপেক্ষা সচেতন, স্পর্শকাতর আর অনুভূতিশীল, কেননা তাঁরা চিকিৎসার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করেন। বাঁশ দিয়ে যেমন বানানো যেতে পারে—লাঠি অথবা বাঁশি, অস্ত্রও তেমন হয়ে উঠতে পারে মারণাস্ত্র কিংবা আরোগ্যের চাবিকাঠি।

শ্রীমতী চিত্রা ঘোষালের অপারেশনের আগেই নিজের সন্দেহের আভাস দিয়েছিলেন শ্যামলেন্দু। বাড়ির লোকদের জানিয়েছিলেন, কেন তিনি ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতিতে অপারেশন করবেন না। শ্রীমন্ত নামের ওঁদের সেই মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আত্মীয় ভদ্রলোকটি তাই নিয়ে বোকার মতো কিছু মন্তব্যও করেছিলেন। সমাজে এ ধরনের অর্ধশিক্ষিত মানুষরা যে বিপজ্জনক—তাইতে সন্দেহ নেই। কেননা তারা নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞের মতামতকে প্রভাবিত করতে পারে। ডাক্তারি ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনা বেশি প্রবল, যেহেতু বিভিন্ন ডাক্তারদের সঙ্গেই মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভরা ব্যবসায়িক কারণে সম্পর্ক রচনা করতে চান। সেইসূত্রে কখনো কখনো নিজেকে সমগোত্রীয় ভেবে বসেন...খ্যাতনামা চিকিৎসকদের নামোচ্চারণ করে নিজের পরিচয় জাহির করেন। নিজের ভাবনাকে তাঁদের নামে চালিয়েও দিতে চান ক্ষেত্রবিশেষে। শ্রীমন্ত লাহিড়ি তেমনই এক চরিত্র।

আকস্মিকভাবেই শ্যামলেন্দুর মাথায় আসে, কিছুক্ষণ আগেই অযাচিত তিনটি লোকের আগমন এবং যে ঘটনা ঘটল, তার পেছনেও তথাকথিত মেডিকেল রেপ লোকটির কোনো ভূমিকা নেই তো? নাহ্, সেই ভাবনার রুচি নেই শ্যামলেন্দুর। বরং শ্রীমতী ঘোষালের অনিবার্য ক্রমাবনতিই শুকতারা-য় একটি বিমর্ষতার আবহ রচনা করেছে।

পরের দিন ভোররাতেই প্রয়াত হলেন চিত্রা ঘোষাল।

ব্যস্ত এবং কাজের দেশে সময় যে দ্রুত কেটে যায় তাইতে কোনো সন্দেহ নেই।

কথাটা ভাবতে ভাবতেই যেন একটু দার্শনিক হয়ে উঠল শ্যামলেন্দু। আড়াই বছর বিলেতবাসের পরে, ইদানীং নিজের এই দর্শন-প্রবণতা নিয়েও কি ও ভাবে? আগে তো সময়, ব্যস্ততা, জীবনযাপন, ভবিষ্যৎ...এসব নিয়ে যখন-তখন ভাবনা ভাবতে হত না। এখন মাঝেমধ্যে মনে হয়, দার্শনিক অথবা গুরুত্বপূর্ণ, যে ক্যাটাগরিতেই ফেলা যাক, ভাবনাগুলো যে বাস্তব, তা মানতেই হচ্ছে।

বড়ো বড়ো চিকেন লেগ-পিসগুলোর ওপরে ইয়োগার্ট (দই) আর তন্দুরি মশলা মাখাতে-মাখাতে শ্যামলেন্দু ভাবল, এইসব ভাবনা-চিন্তার যাতায়াতই কি ওর প্রেমে পড়ার জন্য? প্রেম কি বাস্তবতার দিকেও অঙ্গুলিনির্দেশ করে!

তার মানে ব্যাপারটা সত্যি কি তাই দাঁড়াল যে, ডেভন-এর কুইন এলিজাবেথ হাসপাতালের সার্জিক্যাল ডিপার্টমেন্টের রেজিস্ট্রার মিস্টার মুখার্জি, ক্লিনিক্যাল নার্স স্পেশালিস্ট মিস্ অ্যাঞ্জেলা প্যারট-এর প্রেমে পড়েছে!

হাসপাতাল ফ্ল্যাটের কিচেনে কাজ করতে করতে একা একাই হেসে ফেলল শ্যামলেন্দু। এ কী অদ্ভুত মানুষের মন রে ভাই! কোথায় ইন্ডিয়ার ওয়েস্টবেঙ্গলে, কলকাতার মধ্যে কসবা-রাজডাঙার ছেলে শ্যামলেন্দু মুখোপাধ্যায়, আর কোথায় চেলটেনহ্যাম-এর মধ্যবিত্ত পরিবারের ঝকঝকে মেমসাহেব মেয়ে অ্যাঞ্জেলা প্যারট... বছরখানেক আগে যারা একে অপরকে প্রায় চিনতই না...কিংবা বলা যায় সদ্য চিনতে শুরু করেছিল, আজ তারাই এতটা কাছে এসে পড়েছে যে...নাহ্ অস্বীকার করে লাভ নেই যে, দুজনেই গড়ে ওঠা সম্পর্কের পরিণতি নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে!

শ্যামলেন্দুর তো কেবলই কিশোরকুমারের গাওয়া সেই গানটা... এ কেয়া হুয়া, কব হুয়া, ক্যায়সে হুয়া...এখনও মনের মধ্যে গুনগুনোয়। যত ভাবে, তত আশ্চর্য হয়। আর ভালো লাগে সেই আশ্চর্য হওয়াটাই। কেননা অ্যাঞ্জেলা হয়ে উঠেছে এক নিবিড় অনুভূতি, ওর উপস্থিতি যেন এক স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ উচ্ছ্বাস, মিষ্টি সুবাস...দৃষ্টিতে প্রীতিময় আকর্ষণের প্রতিশ্রুতি।

দেখতে দেখতে প্রায় পনেরো মাস হতে চলল শ্যামলেন্দু সাউথ হ্যাম্পটন থেকে চলে এসেছে ডেভন-এ। মিস্টার হ্যানকক সত্যিই অভিভাবকের মতো ওকে, যাকে বলে, গাইড করেছিলেন। তখন পরীক্ষায় পাশ করে এফ আর সি এস হওয়াটা ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট। তারপরেই ডেভন-এর য়ুনিভার্সিটি হাসপাতাল কুইন এলিজাবেথ-এ কাজ করতে এসেই বুঝেছিল, এবার যেন ও টেমস্ নদী ছেড়ে আটলান্টিক-এর কূলে এসে পড়েছে। নেহাত হাসপাতাল না, ডেভনশায়ারের এই হাসপাতাল একটা ছোটোখাটো শহর। অনেকসময় এক থেকে অন্য ডিপার্টমেন্টে যাওয়ার জন্য হাসপাতাল পরিবহন ব্যবহার করতেই হয়।

মনে আছে শ্যামলেন্দুর, লন্ডন য়ুনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে সেন্ট জর্জেস মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালে ওর ফাইনাল পরীক্ষা হয়েছিল। বছরখানেক এদেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিল তখন। একটা বিষয় বুঝতে পেরেছিল, এদেশে পরীক্ষায় পাশ করে এফ আর সি এস হওয়া এবং সার্জেনের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য শুধু জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়। তার সঙ্গে দরকার অ্যাটিটিউড। শরীরের ভাষা, কথা বলা, প্রেজেন্টেশন, রুগির সঙ্গে আচরণ, অপারেশনের সময় যত্ন, অন্যান্য স্টাফদের সঙ্গে ব্যবহার...ইত্যাদি অনেক বিষয়ের দিকেই নজর দেওয়া হয়। কিন্তু সচেতনভাবে পরীক্ষার্থী সেসব জানতে পারে না।

শ্যামলেন্দুর মনে হত, ঠিক এইখানেই আমাদের দেশের ট্রেনিং, পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদির সঙ্গে এদেশের তফাত। জ্ঞান এবং কাজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে একজন চিকিৎসকের মানসিকতা, মূল্যবোধকেও এরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করে। আর একটা ব্যাপারেও এরা গুরুত্ব দেয়। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে, ফল প্রকাশের জন্য প্রার্থীদের উৎকণ্ঠায় বসিয়ে রাখে না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রকাশ করে দেয়।

মোটরওয়ে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ফিরতে ফিরতে শ্যামলেন্দুর মনে পড়েছিল মা-বাবাকে। কলকাতা শহর, ছোটোবেলার বন্ধু, বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়ার দিন, ধলভূমগড়ের কোয়্যারি, বাংলো...পাহাড়ি রাস্তা-জঙ্গল-সুবর্ণরেখা নদী...জিপ নিয়ে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে রাঁচি-ঘাটশিলা-টাটানগরে বেরিয়ে পড়া...দিদির বিয়ে...মা-এর মৃত্যু। বাবার একা হয়ে যাওয়া, রাধাপিসির কসবায় এসে থাকা...তারপর এদেশে আসা থেকে অভিজিৎদার কথাও যেন ছবির মতো পর পর মনে আসছিল।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে সন্ধে নামার পরেও আকাশ গাঢ় নীল হয়ে থাকে এদেশে। সাড়ে আটটার পরে মোটরওয়ের অফিসফেরত গাড়ির সংখ্যা কমে গিয়েছিল, অথচ গেরুয়া আলোয় মায়াময় হয়ে ছিল প্রকৃতি। গাড়ি ছুটে চলেছিল দুরন্ত গতিতে। মনের মধ্যে প্রাপ্তি আর স্বপ্নপূরণের আনন্দ সত্ত্বেও কোথাও একটা শূন্যতা অনুভূত হচ্ছিল শ্যামলেন্দুর।

পরের দিন সকালে প্রথমেই বাড়িতে ফোন করেছিল। আর বাবাকে সুসংবাদটা দিতে গিয়েই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল। অমৃতেন্দু একটু সময় দিয়েছিলেন দূরদেশে একা-থাকা ছেলের আবেগ সামলাতে। হয়তো নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন নিজেকেও।

তারপরেই বলেছিলেন, খুব ভালো খবর...তোর মা থাকলে আরও খুশি হত।

কিন্তু শ্যামলেন্দু বাবার বাস্তববোধের পরিচয় পেয়েছিল, পরের কথাটাতেই। অমৃতেন্দু বললেন, কিন্তু এখনই তাড়াহুড়ো করে ফিরে আসার কথা ভাবিস না কিন্তু...বরং এবার রিল্যাক্সড হয়ে কিছুদিন কাজকর্ম কর।

কিন্তু একবার বাড়ি না গেলে ভালো লাগছে না বাবা।

তাইতে অসুবিধের কী আছে! তবে পুজোর সময় আসতে বারণ করব...কাজকর্ম, যোগাযোগ, দেখা-সাক্ষাৎ কিচ্ছু করা যায় না।

দু-বছর কলকাতার পুজো দেখিনি...ভাবতে পারো!

কিচ্ছু ক্ষতি হয়নি তাইতে...আরও অনেক দেখবি। বরং ওদেশের...লন্ডনের পুজো দেখতে যাস।

তাহলে একেবারে শীতের সময়...।

বেশ তো তাই আয়।...এই যে তোর রাধাপিসি ওপাশ থেকে ইংগিতে কিছু একটা বলতে চাইছে।

শ্যামলেন্দু হাসল। আমি জানি রাধাপিসি কী বলছে।

তুই নিশ্চিন্ত থাক। তোর সঙ্গে আলোচনা না করে, তোর ওপর কিছু চাপিয়ে দেব না।

আমার চাপ নেওয়ার ক্ষমতা হলে তোমায় জানাব বাবা।

সে ঠিক আছে। তবে মাঝেমধ্যে শুভাকাঙ্ক্ষীদের মতামতও শুনতে হয়।

তোমার সঙ্গে অন্য আলোচনা আছে...ফিউচারের জন্য।

দেশে আয়, তখন ভাবা যাবে। কন্সট্রাকশন-এর কথা আমার মাথায় আছে।

আর শোনো বাবা...এবার তুমি এদেশে বেড়াতে আসার কথা ভাবো...সামনের এপ্রিল-মে-তে।

শ্যামলেন্দু ফোন করেছিল অভিজিৎ বেরাকে-ও।

উচ্ছ্বসিত অভিজিৎ প্রথমেই বলল, তোকে কী বলেছিলাম শ্যামল মনে আছে?

একদম...যা যা বলেছিলে মিলে গেছে।

আসলে কী জানিস...তোর ভ্যালুজগুলো সলিড ছিল। আমি তো দেড়মাসের ওপর তোদের বাড়িতে ছিলাম। তাইতে অনেক কিছু বুঝেছিলাম। একসঙ্গে থাকলে চেনাজানা অনেক বেশি হয়। তোরা আমার জীবনটাকে বদলে দিয়েছিলি।

তুমি আমাদের ভালোবেসেছ অনেক।

অভিজিৎ হেসে বলল, আবার ভালোবাসলে জোর করা যায় জানিস তো?

তা তো বটেই। তুমি কোনো জোর খাটাবে নাকি আমার ওপর?

ঠিক ধরেছিস। কাকুকে বলব তোর জন্য ইমিডিয়েটলি পাত্রী দেখতে। এদেশে আর তোকে ছেড়ে রাখা যাবে না।

শোনো অভিজিৎদা, ধরারও কেউ থাকতে হবে তো!

তোকে ধরার অভাব হবে এদেশে! হিরোর মতো প্রায় ছ-ফুট চেহারা তোর, এম এস, এফ আর সি এস, দেশে প্রতিষ্ঠিত, সদ্বংশের ছেলে, মনের দিক থেকে উদার...

থাক...এবার থামো...।

আচ্ছা, কবে ব্যাসিলডন আসবি বল, পার্টি করব। তোর বউদিও মুখিয়ে আছে...ভাইপোকেও তো দেখিসনি!

খুব শিগগিরই আসব অভিজিৎদা...কাজের ব্যাপারটা ঠিক করে নিয়েই জানাব তোমায়।

হাসপাতালে যেতেই, হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেও দু-হাতে জড়িয়ে ধরে হাগ করলেন মিস্টার হ্যানকক।—কনগ্রাচুলেশনস্ স্যাম।

প্রায় পায়ে হাত দিয়ে প্রণামের মতোই ভঙ্গি করল শ্যামলেন্দু। বলল, আপনার উৎসাহ আমার খুব কাজে লেগেছে।

য়্যু নো স্যাম, হ্যানকক বললেন, কাউকে-কাউকে দেখে, কথা শুনে এবং কিছুটা একসঙ্গে কাজ করলে, চেনা যায় অন্যরকমভাবে। আমি তোমার সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড হয়েছিলাম, যখন তুমি একেবারে প্রথমদিকে সেমিনারে কথা বলেছিলে...তোমার ভ্যালুজ এবং নলেজ আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করেছিলাম। য়্যু আর এ ফুলফ্লেজেড সার্জেন নাউ।

কিন্তু আমার তো এখনও অনেক কাজ শেখা বাকি মিস্টার হ্যানকক।

এই আর্জটাই তোমাকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে স্যাম...আমি তোমার নতুন কাজের কথা ভেবেছি।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেদিন হ্যানকক-এর সঙ্গে কথা হয়েছিল শ্যামলেন্দুর। একটা ব্যাপার ও লক্ষ করেছিল, দেশে খ্যাতিমান মানুষরাও অন্য কেউ কৃতিত্বের দাবিদার হয়ে উঠলে, মন খুলে প্রশংসা করতে পারে না। তাকে প্রতিযোগী ভাবতে শুরু করে। সেদিক দিয়ে সাহেবরা অধিকাংশই অন্যরকম। এরা গুণের কদর করে। শ্যামলেন্দু স্পষ্ট করেই জানিয়েছিল, কোনো কারণেই শেষ পর্যন্ত ও এদেশে থাকবে না। ইন্ডিয়াতে প্রচুর অসুবিধে, ঝামেলা, অশিক্ষা, জনসংখ্যার আধিক্য, ধুলো-গরম...থাকলেও ও সেই থার্ড ওয়ার্ল্ড-এই ফিরে যেতে চায়।

হ্যানকক বলেছিলেন, আমারও তাই মনে হয়। তা ছাড়া এখন আর ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড, থার্ড ওয়ার্ল্ড এভাবে ভাবাই উচিত না। আসলে কী জানো স্যাম, সো-কলড থার্ড ওয়ার্ল্ড যদি সাফার করে...উন্নত দেশেও তার প্রভাব পড়তে বাধ্য।

সেইজন্যই নিজেকে গ্লোবাল সিটিজেন বলে ভাবতে পারলে আমি খুশি হতাম।

তুমি যে ভাবছ সেটাও অনেকখানি। কেন জানো? মানুষের ভাবনার প্রতিফলন ঘটে তার চারপাশে...তার কর্মে।

আমি কতটা পারব তা জানি না। কিন্তু আমি চিকিৎসালয় তৈরি করব দেশে...আমার বাবা-ও তাই চান।

আমার শুভকামনা থাকবে...তোমাদের সেই চিকিৎসালয়ের জন্য।

কিন্তু আমাকে আরও তৈরি হতে হবে। আরও কাজ শিখতে চাই।

ডেভন-এর কুইন এলিজাবেথ য়্যুনিভার্সিটি হাসপাতালে তোমার সিভি দেওয়া আছে...মার্টিন উড তোমাকে এক্সপেক্ট করছেন এনি ডে...এনি টাইম।

আমি কি এখানে থাকলেই আরও বেশি কাজের সুযোগ পেতাম না!

ডেভন-এ গেলে বুঝতে পারবে...কেন তোমাকে সেখানে পাঠাতে চেয়েছি।...

কুইন এলিজাবেথ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের ব্যাপ্তি দেখে সত্যিই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল শ্যামলেন্দুর। জেনারেল সার্জারি ছাড়াও ভ্যাসকুলার, কার্ডিওথোরাসিক, নিউরো, পেডিয়াট্রিক... প্রতিটি আলাদা শাখায় কাজ করার এবং শেখার সুযোগ প্রচুর সেখানে। বিভাগীয় প্রধান প্রায় ষাট বছরের অধ্যাপক-সার্জেন মার্টিন উড-এর সঙ্গে দেখা করেই শ্যামলেন্দু বুঝেছিল, ডেভিড হ্যানকক ওর অনেকটা পরিচয়ই প্রোফেসরকে দিয়ে রেখেছেন। ও জানতে পেরেছিল, পাঁচ বছরের রোটেশনাল জব শুরু হবে আগামী

ফেব্রুয়ারি মাস থেকে। শ্যামলেন্দু তার জন্য আবেদন করতে পারে। ও তাইতে রাজি হয়েছিল।

মার্টিন উড সেইসঙ্গেই বলেছিলেন, ইচ্ছে করলে তার দু-মাস আগেই তুমি এখানে জয়েন করতে পারো...আজ আ লোকাস (অস্থায়ী কাজের জন্য)। তার সুবিধে এই যে, পাঁচ বছরের রোটেশন জব পাওয়ার সম্ভাবনায় তুমি এক পা এগিয়ে থাকতে পারবে, কেননা তখন তুমি 'ইন্টারনাল ক্যান্ডিডেট' হিসেবে গণ্য হবে... হাসপাতালটাও পরিচিত হয়ে উঠবে ততদিনে।

শ্যামলেন্দু বুঝেছিল, এর থেকে বড়ো সুযোগ আর হবে না। মনে মনে এই বিশ্বাসও ছিল যে একটানা পাঁচ বছর কাজ করার জব ও পাবে। সুতরাং দেশে যাওয়ার সময়টা নভেম্বর মাসেই করতে হয়েছিল, কেননা কুইন এলিজাবেথ-এ অতিরিক্ত দু-মাস কাজের সুযোগ ও ছাড়তে চায়নি। বড়ো কিছু পাওয়ার সম্ভাবনায় দু-একটা ছোট আশা বিসর্জন দিতেই হয়।

প্রোফেসর উড-কে কেন কে জানে, শেষ পর্যন্ত স্যার বলতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে শ্যামলেন্দু।

এটাও খেয়াল করেছে, বয়স্ক ঋজু পণ্ডিত মানুষটা তাইতে আপত্তিও করেননি। বলা যায় না মনে মনে হয়তো খুশিই হয়েছিলেন।

দেখতে দেখতে বছরও ঘুরে গেল ডেভনে। তার মধ্যেই প্রোফেসর খোঁজ নিয়েছেন, শ্যামলেন্দুর বিশেষ কোনো শাখার দিকে যাওয়ার ইচ্ছে বা পরিকল্পনা আছে কিনা।

শ্যামলেন্দু বলেছিল, দেশে ফিরে কাজ করব...নিজের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব। স্পেশালাইজড সেন্টার তৈরি করার সামর্থ্য হবে না। সেইজন্য জেনারাল সার্জারি প্র্যাকটিসই করব।

প্রোফেসর বলেছিলেন, বেশ ভালো। কিন্তু জেনারাল সার্জেনের দায়িত্বই সব থেকে বেশি। কেননা তাকে সব বিষয়েই জানতে হয়।

আমাদের দেশে সেই দায়িত্ব নেওয়াটাই বেশি দরকার স্যার। একটা বিষয়ে স্পেশালিস্ট হওয়ার থেকে সব বিষয় জানা বেশি দরকার।

মার্টিন উড খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাহলে সবকটা বিভাগে অন্তত ছ-মাস করে তুমি কাজ করো—তারপরে শেষ দু-বছর একটানা জেনারেল সার্জারি করবে। মূলত অ্যাবডমিনাল।

আরও বলেছিলেন, পাঁচ বছর পরে তুমি সম্পূর্ণ তৈরি সার্জেন হিসেবে দেশে ফিরতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস।

ইতিমধ্যে শ্যামলেন্দু ডেভন-এ আসার ছ-মাসের মধ্যেই অমৃতেন্দু ঘুরে গিয়েছিলেন রানির দেশে। সত্যিই মুগ্ধ দেশ দেখে। দেড় মাস ছিলেন। আর তখনই জুনিয়র ডাক্তারদের ছোটো এককামরা ফ্ল্যাট-এর বদলে, দু-কামরার এই ফার্নিশড কোয়ার্টার্স-টা হাসপাতাল থেকে ভাড়া নিয়েছিল শ্যামলেন্দু। যদিও একা মানুষ, তাহলেও সিনিয়র রেজিস্ট্রার হিসাবে, নিজের পরিচিতিকে একটু অন্যরকমভাবে খুঁজে পেতে চেয়েছিল। ভাড়া অপেক্ষাকৃত বেশি, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাইভেসির তুষ্টির জন্য সেই খরচটুকু দরকার বলেই মনে হয়েছিল। তাছাড়া কাজের তুষ্টির ব্যাপারেও কোনো প্রশ্ন ওঠে না এখানে আসার পরে।

অথচ বেশ কয়েক মাস পর থেকেই শ্যামলেন্দুর মনে হতে শুরু করেছিল, সত্যি কি ডেভন-এ ও একা-ই?

মানুষে-মানুষে সম্পর্কের অনুভূতি বোধ সংজ্ঞা—কখন যে বদলে যেতে থাকে, কেউ কি হিসেব রাখতে পারে!

জেনারেল সার্জারি ডিপার্টমেন্টের ওয়ার্ড ম্যানেজার অ্যাঞ্জেলা প্যারটকে শ্যামলেন্দু তো প্রথম থেকেই চিনেছে...এমনকী সেই লোকাস করার সময় থেকেই। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারি থেকে যখন পাঁচ বছরের রোটেশনাল জব পেয়েছিল, প্রোফেসর উড একদিন ওকে ডেকে একেবারে ফরম্যালি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে। কারণ আর কিছু না, ওয়ার্ড এবং হাসপাতালের যে-সমস্ত প্রশাসনিক দিক ম্যানেজার দেখাশোনা করে, সিনিয়র রেজিস্ট্রার-এরও সেইসব ব্যাপারে সম্যক ধারণা থাকার দরকার। দায়িত্বশীল পদে কাজ জানার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক দিকের গুরুত্ব না-বুঝলে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। সেক্ষেত্রে ওয়ার্ড ম্যানেজার নার্সদের কাছ থেকে ডাক্তারেরও প্রাথমিকভাবে অনেক কিছু শেখার থাকে।

শ্যামলেন্দু বুঝেছিল, এইভাবে শিক্ষা দেওয়ার সিস্টেমের জন্যই শেষ পর্যন্ত কৃতী ও দায়িত্ববান হয়ে ওঠা যায় এবং পরবর্তীকালে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা আহরিত হয় সর্বতোভাবে। অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে যোগাযোগের ঘনিষ্ঠতার সেই শুরু।

কিন্তু অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে বন্ধুত্বটা কি শেষ পর্যন্ত শুধু সেই হাসপাতালের কাজ, প্রশাসন, ওয়ার্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল?

শুকতারার গেট ভেঙে ঢুকে পড়ছে
একদল সশস্ত্র, উচ্চকিত, দুর্বিনীত লোক

বিকেল পাঁচটার পরে কাজ সেরে অনেকেই হাঁটতে হাঁটতে কারপার্ক পর্যন্ত আসে। দূরত্বটা নেহাত কম না, কিন্তু ভালো আবহাওয়ায় দশ-বারো মিনিটের বাগানের মধ্যে দিয়ে ওই হেঁটে আসাটা অনেকের কাছেই কাজের শেষে ঝরঝরে হয়ে ওঠার টনিকের মতো। ওয়ার্ড থেকে একসঙ্গেই বেরিয়ে এসেছিল দুজনে। কী কথা হচ্ছিল কে জানে, কিন্তু পাশাপাশি হাঁটার মধ্যে অ্যাঞ্জেলার গা থেকে সেই মারাত্মক গন্ধটাই কি শ্যামলেন্দুকে প্রবলভাবে সচেতন করে দিয়েছিল! আর তার সঙ্গে সেই শব্দ করা একটা নির্ভেজাল হাসি! মনে নেই, কী নিয়ে কথা হচ্ছিল...হয়তো পরের দিনের অপারেশন লিস্ট, কিংবা কোনো কলিগ-এর বিয়ে, কিংবা প্রধানমন্ত্রীর ইন্ডিয়া ট্যুর। অথবা কিছু এটা চলছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তাইতে মন ছিল না শ্যামলেন্দুর। ও ভাসছিল অন্য কোনো ভাবনায়, অনুভবে।

বিশাল ছড়ানো বাগানে এপ্রিলের গোলাপ-টিউলিপ-চেরি ব্লসমের সমারোহ। সদ্য বড়ো হয়ে যাওয়া দিনে বিকেলের মায়া আলোয় ভাসছে চরাচর। মেঘেরা ফিরে গিয়ে আকাশকে উদোম, নীলে ছেড়ে দিয়েছে। হাওয়ায় এখনও হিমেল ভাব। সেসব তোয়াক্কা না করেই ব্যস্ত পাখির ঝাঁক বেরিয়ে পড়েছে গাছের কোটর থেকে।

বাঁকানো সরু পথের মধ্যেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল অ্যাঞ্জেলা, একেবারে শ্যামলেন্দুর বুকের কাছাকাছি।

স্যাম...আমি কী বললাম, তুমি কিচ্ছু শোনোনি। আর য়্যু থিংকিং সামথিং ডিফারেন্ট?

ন্-না...নট রিয়্যালি। সত্যি কথাটা বলতে পারল না শ্যামলেন্দু। কিন্তু সেই গন্ধটা এবং হঠাৎ এত কাছে এসে পড়া ঝকঝকে, সুডৌল, ধারালো যুবতীটির সান্নিধ্যে অবশ ভাবটাও কাটাতে পারল না। বোধহয় বেড়েই গেল।

নিঃসংকোচে নিজের পেলব সুন্দর ফর্সা হাতে শ্যামলেন্দুর বুক স্পর্শ করল অ্যাঞ্জেলা।—স্যাম...এনিথিং রং?

কী বলবে শ্যামলেন্দু! কোনো ধারণা নেই, কেমন করে, কোন ভাষায় এই মুহূর্তের মুগ্ধতাকে প্রকাশ করতে হয়। অথচ কিছু বলতে হবে।—

বলল, না...না তো...এভরিথিং ইজ ফাইন।

তাহলে তুমি এত আনমনা কেন?

আনমনা? কই না তো!

আমি কি তাহলে অনেক কথা বলে ফেলেছি...এবং তুমি কিছুই শোনোনি!

তা নয়...আয়্যাম সরি অ্যাঞ্জি...তুমি ভীষণ ভালো কথা বলো।

সামান্য হাসির সঙ্গে ভুরু কুঁচকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা। বিকেলের আলোয় ধবধবে গায়ের রঙে লালিমার দীপ্তি। সোনালি চুলের ঢালে একটা ঝাঁকানি খেলিয়ে বলল, রিয়্যালি! তাহলে শোনোনি কেন?

না-না শুনেছি। কিন্তু ভুলে গেছি। আসলে...বোধহয় আমি তোমাকে দেখছিলাম।

আমাকে? আমাকে তুমি তো অলমোস্ট প্রতিদিনই দ্যাখো...।

দ্যাটস ট্রু। কিন্তু এরকমভাবে বাগানে...ফুলের মধ্যে...আসলে এখন তো স্প্রিং মানে বসন্তকাল...তুমি খুব প্রিটি।

অ্যাঞ্জেলা শব্দ করে হাসল।—প্রিটি? এতদিন পরে মনে হল?

ইয়েস...তুমি খুব বিউটিফুল।

একইসঙ্গে খুশি আর অবাক ভাব নিয়ে অ্যাঞ্জেলা তাকাল ওর মুখের দিকে। বলল, তোমার গার্লফ্রেন্ড-এর চেয়েও?

আমার গার্লফ্রেন্ড! থাকলে তবে তো কম্পেয়ার করতে পারতাম।

কী বলছ? তুমি একটা সিনিয়র রেজিস্ট্রার, সার্জেন। তোমার গার্লফ্রেন্ড নেই...এটা হতে পারে?

কেন পারে না? সার্জেন, সিনিয়র রেজিস্ট্রার...এগুলো কি গার্লফ্রেন্ড থাকার শর্ত, নাকি কমপালশন!

অ্যাঞ্জেলার হাসি আর তার সঙ্গেই মাথা নাড়া, দুইয়ে মিলে যেন কী একটা বার্তা ছড়িয়ে দিল অশান্ত বসন্তের হাওয়ায়। তারপর বলল, না...তা নয় বটে। তবে দিস ইজ আ বিট আনকমন।

হতে পারে। শ্যামলেন্দু হেসে বলল, কিন্তু আসল কথা... গার্লফ্রেন্ড-এর ভাবনাটাই মাথায় আসেনি...সময় হয়নি।

আবারও অবাক চোখের নীল তারা ঘুরিয়ে অ্যাঞ্জেলা তাকাল ওর মুখের দিকে। কিছু খুঁজে দেখল কি? হঠাৎ শ্যামলেন্দুর জ্যাকেটটা টেনে ধরে, সরু পথ ছেড়ে নেমে এল বাগানের সবুজ ছাঁটা ঘাসের কার্পেটের ওপর। সামান্য এগিয়েই একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ল ওকে নিয়ে। বলল, তুমি কেরিয়ার, কোয়ালিফিকেশন নিয়ে খুব ডেডিকেটেড ছিলে?

আমাদের ভ্যালুজগুলো একটু অন্যরকম হয় অ্যাঞ্জেলা। সেগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে যায়...ফ্যামিলি...বাবা-মা থেকে...দেশ থেকে।

কীরকম ভ্যালুজ?

আগে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। হয়তো তোমাকে সেটা বোঝাতে পারব না। তোমরা মানুষ হও অন্যরকম ভাবে...স্বাচ্ছন্দ্যে... সবরকমের স্বাধীনতা গ্রহণ করতে করতে তোমরা বড়ো হও...।

সবায়ের জীবন, বড়ো হয়ে ওঠা একরকম না-ও হতে পারে স্যাম।

ব্যতিক্রম তো থাকেই।

আমার নিজের কেরিয়ার নিজেকে তৈরি করতে হয়েছে। ফাইনান্সিয়াল সমস্যা ছিল না, বাট আই ওয়াজ অ্যালোন।

নিশ্চয়ই তোমার বাবা-মা-র...আই মিন...বিচ্ছেদ...!

আনফরচুনেটলি সেটাই সত্যি। বাবা-মা দুজনেই খুব ভালো ছিল, কিন্তু পার্সোনালিটির ক্ল্যাশ হত সবসময়। আলটিমেটলি ওঁরা সেপারেটেড এবং ডিভোর্সড হয়ে যান। আমি একা ছিলাম বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে...সেরকমই থেকে গেছি। কিন্তু আমি আমার কাজ খুব এনজয় করি...সাতাশ বছরের মধ্যে ওয়ার্ড ম্যানেজার হয়ে গেছি...আই লাভ মিউজিক...আই...।

কীভাবে যেন কথার পৃষ্ঠে কথা...তারপরেও দুজনের কথার বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল সেদিন। অ্যাঞ্জেলা বলে গিয়েছিল জীবনের কথা...দুঃখ আনন্দ হতাশা বেদনা প্রাপ্তি। একাকিত্ব তুষ্টির কথা। শ্যামলেন্দু বলেছিল দেশের কথা, কলকাতার কথা। দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছিল একসময়...হিমেল বসন্তের আকাশে তারা ফুটে উঠেছিল...। একসময় উঠতেই হয়েছিল।

উঠে আবার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছিল দুজনা। কথা

কমে এসেছিল, কিন্তু অন্য কিছু একটা রসায়ন ঘটে চলেছিল।

যার যার ঘরে ফিরতে হবে। শ্যামলেন্দু জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথায় থাকো অ্যাঞ্জেলা?

বেশি দূরে না স্যাম...দেড়মাইল হবে...কিংফিশার পার্ক।

বাহ্ বেশ ভালো তো! কাজের জায়গার কাছেই। হেঁটেও যাওয়া যায় তো!

হ্যাঁ তা যায়। আমি যাই মাঝেমাঝে। কিন্তু অনেকের পক্ষে হাঁটাপথ পার হতেও কষ্ট হতে পারে...সময় লাগে।

আলো-আঁধারির মধ্যে শ্যামলেন্দু তাকিয়েছিল সুরূপা বান্ধবীটির দিকে।...ওর কথার উত্তর শুনে। মনে মনে হাতড়েছিল। ওটা কি শুধু কথারই উত্তর ছিল? নাকি কিছু অন্তর্নিহিত ইংগিত ছিল ওই ভাষা আর উচ্চারণের মধ্যে!

মনে মনে প্রশংসা করেছিল কথাটা ভাবতে ভাবতে। একটা আহ্বানের আভাস রয়েছে কি অ্যাঞ্জেলার কথায়?

একটু পরে বলেছিল, তা বটে...তবে পথ অতিক্রম করতে করতে পথের শেষ কোথায় সে ভাবনাও তো থাকে, তাই না?

অ্যাঞ্জেলা দিব্যি সুন্দর করে হাসল।—অতিক্রমের ইচ্ছেটা বড়ো কথা স্যাম...শেষে একটা ঠিকানা থাকেই।

ঠিকানা সত্যিই পেয়ে গিয়েছিল শ্যামলেন্দু। তার হদিসও দিয়ে রেখেছিল অ্যাঞ্জেলা। ও নির্বিঘ্নে, নিঃসংকোচে পথ অতিক্রম করেছিল। তারপর যত ঘনিষ্ঠ হয়েছে, তত অবাক হয়েছে। খুশি হয়েছে, কৃতজ্ঞও বোধ করেছে। প্রবাসী জীবনের আড়াই বছরের মধ্যে...না দিকভ্রান্ত নয়, কীভাবে যেন দিক পরিবর্তন হয়ে গেল জীবনের। দিনে দিনে শ্যামলেন্দুর শুধু না, অ্যাঞ্জেলারও মনে হয়েছে, পৃথিবীর সব দেশে, মহাদেশে, মানুষের জাতি-ধর্ম, বর্ণ-ভাষা-আবহাওয়া-সংস্কৃতি যেমনই হোক, তাদের যাবতীয় মানুষি আবেগ, সুখ-দুঃখ আনন্দ-হতাশা প্রেম-গ্লানি, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি জয়-পরাজয়ের বোধ, শোক, উচ্ছ্বাস...সবই প্রায় একরকম। বাইরের বাঁধন, নিয়মনীতি, আইনকানুন...সব ভেসে যায়, ভেঙে যায়, মনের আর অন্তরের টানে। সেখানেই থেমে থাকে না জীবন। মনের টান, আবেগ ছড়িয়ে পড়ে শরীরে। জীবনে জীবন যোগ হয়। প্রকৃতির সম্পর্ক নিবিড়তর হয়ে ওঠে।

ডিনার-এর আয়োজন করতে করতেই সময়ের ব্যাপারে সচেতন হল শ্যামলেন্দু।

বাইরে ঝকঝকে দিনের আলো থাকলেও আসলে সময়ের হিসেবে রাত আটটা এখন। অভিজিৎ এই প্রথম আসবে শ্যামলেন্দুর কাছে। উইক-এন্ড একসঙ্গে কাটাবে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে অ্যাঞ্জির সঙ্গে পরিচিত হওয়া। অ্যাঞ্জেলাও এসে পড়বে যেকোনো মুহূর্তে। শ্যামলেন্দু মুখার্জির এই ফ্ল্যাট ইদানীং অ্যাঞ্জেলা প্যারট-এরও নিয়মিত যাতায়াতের জায়গা, তা হাসপাতালেরও অনেকেরই জানা। কিন্তু নাহ্, মানুষের অত সময় নেই যে, কে কার সঙ্গে মিশছে, থাকছে, শুচ্ছে তাই নিয়ে ভাববার, আলোচনা করার।

তবে মার্টিন উড-কে অবশ্যই জানিয়েছে শ্যামলেন্দু অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে। বোঝা গেছে অধ্যাপক খুশিই হয়েছেন। রবার্ট হ্যানকক-কেও বলেছে শ্যামলেন্দু। বলতে গেলে তিনিও পিতৃসম ওর কাছে। ভারতীয় এবং বঙ্গসন্তান কম ইংল্যান্ডের এদিকে, অপেক্ষাকৃত সাদা মানুষেরই আধিক্য। শ্যামলেন্দুকেও স্বাভাবিকভাবে নিত্য বঙ্গসংস্কৃতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় না। কিন্তু দেশটার নিবিড় সৌন্দর্য-দর্শন আর ইতিহাস অ্যাঞ্জেলা ওকে দেখিয়েছে ঘুরে ঘুরে।

চেলটেনহ্যাম-এর বাড়িতে বাবার কাছে অ্যাঞ্জেলা নিয়ে গেছে শ্যামলেন্দুকে। আলাপ করিয়ে দিয়েছে। মেয়ের মুখে খুশির ছটা, তুষ্টি আর আনন্দের প্রকাশ দেখে মিস্টার প্যারট পড়ে নিয়েছেন উভয়ের সম্পর্ক আর ঘনিষ্ঠতা।

অভিজিৎ অনেকটাই স্থানীয় অভিভাবক তথা বন্ধুর মতোই শ্যামলেন্দুর কাছে। আরও দুজন বন্ধু আসবে আজ ডিনারে।

কয়েকজন মিলে আজ পরামর্শ করা হবে, স্যাম-অ্যাঞ্জির সম্পর্কের পরিণতি নিয়ে দেশে অমৃতেন্দুকে জানাবার ব্যাপারে। শ্যামলেন্দু জানে বাবা অখুশি কিছু না। কিন্তু খুশির পাত্রটা পূর্ণ করার জন্যই ও বাবাকে আবার আসতে বলবে এদেশে।

আয়োজন খুব বেশি কিছু না। তন্দুরি চিকেন, বয়েলড্ ভেজিটেব্ল, গার্লিক ব্রেড আর পাইনঅ্যাপ্‌ল আইসক্রিম। ওয়াইন তো আছেই। দ্রুত হাতে টেবিল সাজাতে সাজাতেই দরজা খোলার শব্দ পেল শ্যামলেন্দু।

সেইসঙ্গেই মিষ্টি কণ্ঠস্বর ভেসে এল।—আয়াম হিয়ার স্যাম...। ও টের পেল, হার্টবিট বাড়ছে।

শনি-রবি ছুটির দিন বলেই নার্সিংহোমে ভিজিটরদের যাতায়াত অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। সেটাও আবার নির্ভর করে কতজন রুগি ভর্তি আছে তার ওপর। এখনও পর্যন্ত পুরোনো আর নতুন বাড়ি মিলিয়ে পনেরোটা বেড শুকতারায়। সব সময় যে ভর্তি থাকে তা নয়। আবার কোনো কোনো সময় নেহাত প্রয়োজনে একটা-দুটো অতিরিক্ত বেড-এর ব্যবস্থাও করতে হয় তথাকথিত এমার্জেন্সির জন্য...কখনও প্রিয় পরিচিতদের অনুরোধেও।

আজ শনিবার হলেও কোথাও একটা বিষণ্ণতার আবহ ছড়িয়ে আছে শুকতারা নার্সিংহোমের সর্বত্র। বসন্ত সন্ধ্যা, ঝিরঝির হাওয়া বইছে। অথচ একটা মন খারাপের আবহ দুই বিল্ডিং-এর আশপাশে। বাইরের উঠোন, কারপার্ক, গাছতলাতেও মাঝে মাঝে কয়েকজনের কথোপকথন যেন আজ নির্জনতা আর নিস্তব্ধতাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। একটি মৃত্যুর অভিঘাত আজ ম্লান করে রেখেছে নার্সিংহোমের পরিবেশ থেকে আলোর উজ্জ্বলতাকেও। থম্ ধরানো নীরবতা বিরাজ করছে। সবাই আস্তে কথা বলছে।

চিকিৎসা কেন্দ্রে মৃত্যু হয় না, হবে না, এমন না। বিগত কয়েক বছরে শুকতারাতেও অসুস্থ রুগির মৃত্যু হয়নি এমন না। অধিকাংশ অবশ্য বয়স্ক কিংবা বয়স্কা...এবং মেডিসিন-এর রোগীই প্রয়াত হন। অনেক সময় বাড়ির লোকেরা শেষ মুহূর্তে রুগিকে নিয়ে আসেন, যখন আর বাড়িতে ম্যানেজ করতে পারেন না। তাঁরা জেনেবুঝেই আসেন, রুগির অবস্থা ভালো না।

অপ্রত্যাশিত মৃত্যু নার্সিংহোমে সাধারণত কমই হয়। তাহলেও একেবারে হয় না এমন না।

এক ধরনের অসুস্থতা নিয়ে ভর্তি হওয়ার পরে, চিকিৎসা চলাকালীন নতুন কোনো সিরিয়াস সমস্যা হতেই পারে। আবার

পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ভর্তি হওয়ার পরে কখনও বড় অসুখ ডায়াগনসিস্ হতে পারে। বাড়ির লোকজন তখন নার্সিংহোমে রেখেই চিকিৎসা করাতে চান। সেরকম রুগিরা মারা যেতেই পারেন।

আসলে বেসরকারি এবং মাঝারি মাপের চিকিৎসালয়গুলো সবসময়ই রুগি ভর্তির ব্যাপারে কিঞ্চিৎ সতর্ক থাকে। নিজেদের প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা কতটা আছে বা না-আছে এবং তার দ্বারা কী ধরনের এবং কতখানি চিকিৎসা করা সম্ভব—এই বোধটুকু তাঁদের রাখতেই হয়। তা সত্ত্বেও পরিস্থিতির পরিবর্তন হতেই পারে। হয়তো বিরল, তাহলেও যেখানেই অসুস্থতা এবং অসুস্থ মানুষদের আনাগোনা, সেখানে ঝুঁকি এবং জরুরি অবস্থা যেকোনো সময় উদ্ভূত হতেই পারে। কখনো-সখনো মানুষ দিশাহারা হয়েও, নার্সিংহোমে ছুটে আসেন...এমনকী পথ দুর্ঘটনায় মারাত্মক ভাবে আহত কাউকে নিয়েও মানুষ ছুটে আসেন স্থানীয় চিকিৎসালয়ে, এবং যদিও বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের কোনো দায়িত্ব থাকে না, তা সত্ত্বেও নেহাত মানবিক কারণেই তখন তাঁদের কিছু না কিছু চিকিৎসার আয়োজন করতেই হয়। তার জন্য আবার বিপদেও পড়তে হয়।

আসলে বেসরকারি চিকিৎসালয়গুলি তাদের প্রতিষ্ঠানে মৃত্যু এড়াতে চাইবে, সেটাই স্বাভাবিক।

আবার চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে মাঝে-মধ্যে মৃত্যু ঘটবে, সেটাও একইরকম স্বাভাবিক। এড়াবার উপায় নেই।

কিন্তু এই স্বাভাবিকত্বের মধ্যেই কিছু কিছু মানুষি আবেগ ও প্রবণতা, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কখনো এমনভাবে সময়কে প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত এবং জটিল করে তোলে, যে, বিশেষ করে, বেসরকারি সংস্থার পক্ষে তার মোকাবিলা করা অসম্ভব এবং প্রাণান্তকর হয়ে ওঠে। যে-কোনো মৃত্যুর ঘটনার মতো হৃদয়বিদারক, বেদনাময় আর কী হতে পারে! অথচ সেই ঘটনাকে না-মেনেও কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু মানতে গেলেও তার কারণ সম্পর্কে ক্ষোভ, যুক্তিতর্ক, পরিস্থিতি, চিকিৎসা...নানান প্রশ্নের যাতায়াত চলতে থাকে। আবর্তিত হয় আবেগ। আবেগ থেকে সৃষ্টি হয় অস্থিরতা। অস্থিরতা পর্যবসিত হয় কখনো কষ্টে-বেদনায়-শোকে। আবার কখনো ক্রোধে-ক্ষোভে-উন্মত্ততায়। পেছনে কখনও উস্কানিমূলক অভিসন্ধিও থাকে। কিন্তু শিক্ষা, সামাজিক সহনশীলতা ও বাস্তবতা, মানুষের আবেগ, অস্থিরতা ও যুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমিত করবে সেটাই প্রত্যাশিত।

দুর্ভাগ্যবশত বঙ্গসংস্কৃতি প্রায়শই সেই প্রত্যাশার বিপরীতে হাঁটে, আর মানুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সংঘবদ্ধ বৃহৎ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে, সরকারি হাসপাতালে, নিরাপত্তা এবং অবলম্বনের কিছু না কিছু আয়োজন থাকে। বেসরকারি এবং মাঝারি অথবা ছোটোখাটো চিকিৎসালয়ে তার কোনো ব্যবস্থাই থাকে না। অথচ তাঁদের বিরল ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে। মৃত্যু এবং তজ্জনিত ক্ষোভ- ক্রোধ, উন্মত্ত বহিঃপ্রকাশের আবহের সম্মুখীন হওয়াও সম্ভব। তাঁরা সতর্ক আর সচেতন থাকার চেষ্টা করেন প্রথম থেকে। তাই স্বাভাবিক তাঁদের পক্ষে। বিপদে কিংবা বিরোধিতায় তাঁদের পাশে কে দাঁড়াবে! সাধারণত কেউ না।

যে কোনো প্রতিষ্ঠানই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে সামাজিক প্রয়োজনে ও মানুষের সৌজন্যে। শুকতারা তার ব্যতিক্রম নয়।

শ্রীমতী চিত্রা ঘোষালের মৃত্যু খুব একটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। তা সত্ত্বেও মাত্র মধ্যপঞ্চাশে কোনো রুগির মৃত্যু, মহিলা-পুরুষ যাই হোন, মেনে নিতে কষ্ট হয়, সময় লাগে। অথচ মৃত্যুর কারণ যখন ছড়িয়ে পড়া ক্যানসার, তখন না মেনেই বা উপায় কী! অপারেশনের আগেই শ্যামলেন্দুর সন্দেহ অমূলক ছিল না।

গলব্লাডারে পাথর বলা হলেও, অতিরিক্ত কিছু জটিল আশংকার সম্ভাবনা তাঁর মাথায় এসেছিল বারবার। তাঁর অতীত অভিজ্ঞতাই এহেন সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। পেটের ভেতরে অপ্রত্যাশিত জটিলতার সন্ধান পাওয়া যে নেহাত বিরল, তা নয়। বিশেষ করে পাথর ছাড়াও দু-একটি অন্য অসুস্থতার লক্ষণ...ক্ষুধামান্দ্য, জন্ডিস, ক্লান্তি...শ্যামলেন্দুকে সতর্ক করেছিল। অপারেশনের আগে আত্মীয়স্বজনকে তার আভাস দিয়েছিলেন।

অপারেশনের পরে যথাসম্ভব স্পষ্ট এবং বোঝানোর মতো করেই দুর্ভাগ্যের শিকার হওয়া রোগিণীর অবস্থা ব্যাখ্যা করেছিলেন বাড়ির লোকজনের কাছে। তাঁদের ওয়াকিবহাল করেছিলেন ক্যানসারের অভ্যন্তরীণ বিস্তৃতির বিষয়েও। শ্যামলেন্দু জানতেন, রুগির প্রিয়জনদের কাছে 'খারাপ খবর' পরিবেশনের কিছু রীতি, পদ্ধতি বা নিয়ম আছে। বিদেশে এ বিষয়ে 'ব্রেকিং দ্য ব্যাড নিউজ' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও আছে, যা পাঠ করা ও জানা যে- কোনো চিকিৎসকেরই জরুরি কর্তব্য।

শ্যামলেন্দু যথাসাধ্য সেই রীতি মেনেই এবং সহনশীল উপায়ে শ্রীমতী ঘোষালের ক্যানসারের খবর দিয়েছিলেন পরিবারের সদস্যদের। যেহেতু অপারেশনের আগেও তিনি তাঁর সন্দেহের আভাস দিয়েছিলেন, সুতরাং আশা করেছিলেন, আত্মীয়স্বজনদের কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি থাকবে। অথচ কথা বলতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল, অন্তত দু-একজন পারিবারিক সদস্যদের কথায় যেন বাঁকা সুর। কিছু করার ছিল না শ্যামলেন্দুর। অনিবার্য দুঃসংবাদ সহ্যের ক্ষমতা সব মানুষের এক হয় না।

আবার চিকিৎসকেরও এই দায় অবশ্যম্ভাবী। দুঃসংবাদ তাঁকে জানাতেই হয়।

কিন্তু পরিস্থিতি জটিল ও বিপজ্জনক হয় তখনই, যখন কিছু মানুষ চিকিৎসককে নিজেদের অজ্ঞতা অথবা আবেগের বশে অবিশ্বাস করেন। ঈর্ষা বা হীনম্মন্যতা, কিংবা কারুর জীবিকাগত স্বার্থ, প্রতিযোগিতার কারণেও কখনো চিকিৎসকের বিরোধিতা করা হয়। আবার চিকিৎসা বিভ্রাট কিংবা চিকিৎসকের ভুলভ্রান্তিও যে কখনো ঘটে না এমন নয়। খুঁজতে হয় আসল কারণটি।

শ্যামলেন্দু টের পেয়েছিলেন শ্রীমতী ঘোষালের পরিবারের দু-একজন সদস্য, বিশেষ করে তাঁদের আত্মীয় সেই মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ ভদ্রলোক, শ্রীমন্ত, যেন প্রথম থেকেই কিছুটা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিলেন। অপারেশনের আগেও অচিকিৎসক এই ভদ্রলোক নিজেকে জাহির করার বোকাচালাকি করেছিলেন, শ্যামলেন্দুর মনে ছিল।

শ্রীমতী ঘোষালের স্বামীকে শ্যামলেন্দু বলেছিলেন, আপনাদের বোধহয় মনে আছে, আমি ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতিতে শ্রীমতী

ঘোষালের অপারেশন করব না, সেটা আপনাদের জানিয়েছিলাম।

অপারেশন সেরে এসে চেম্বারে বসেই শ্যামলেন্দু কথা বলেছিলেন বাড়ির লোকজনের সঙ্গে। তিন-চারজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দুজন মহিলাও উপস্থিত ছিলেন চেম্বারে। পেটের ভেতরে ক্যানসারের অস্তিত্বের বিষয় ততক্ষণে জানিয়েছিলেন শ্যামলেন্দু।

মিস্টার ঘোষাল বললেন, হ্যাঁ মনে আছে...বলেছিলেন। কিন্তু কারণটা ততখানি বুঝিনি।

শ্যামলেন্দু বলেছিলেন, মাথায় একটা সন্দেহের বিষয় এসেছিল। যে কারণে ল্যাপারোস্কোপিক অপারেশনের লিমিটেশন না রেখে, ওপেন অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যাতে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়।

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, আমরা ওসব বুঝিনি ডক্টর মুখার্জি। ক্যানসার হলেও এতটা ছড়িয়ে যাবে...তা ভাবিনি।

শ্যামলেন্দু বললেন, সন্দেহটা সঠিক না-হলে আমিই সব থেকে খুশি হতাম।

কিন্তু আপনি যে ক্যানসার সন্দেহ করেছেন, সে কথা তো আমাদের বলেননি!—কথাটা বললেন শ্রীমন্ত।

শ্যামলেন্দু শান্তভাবে বললেন, ক্যানসারের মতো অসুখের কথা নিশ্চিত না হয়ে বলা যায় না মিস্টার লাহিড়ী।

তাহলে বায়োপ্সি রিপোর্ট না দেখে...এখনই বা আপনি ক্যানসার বলছেন কী করে?

কারণ অপারেশন করার সময় সবটাই যে আমি চোখের সামনে দেখেছি। তাই দেখার পরেই বলছি।

চোখে দেখেই কি ক্যানসার বলা যায় ডক্টর মুখার্জি?—শ্রীমন্তর প্রশ্নে অবিশ্বাস ফুটে উঠল।

শ্যামলেন্দু বললেন, না-গেলে...আপনার কি মনে হয় সেই ঝুঁকিটা আমি নিতাম? চোখের দেখা এবং হাতের অনুভবে আমাদের একটা প্রাথমিক ডায়াগনসিস করতে হয়।

কিন্তু আমরা তো জানি, বায়োপ্সি করেই ক্যানসার কনফার্ম করা হয়।

আপনার জানাটা আংশিকভাবে সত্যি। মাইক্রোস্কোপিক স্টাডি করে ক্যানসার ডায়াগনসিস করা হয় ঠিকই। কিন্তু ম্যাক্রোস্কোপিক স্টাডি বলে একটা ব্যাপার আছে। যেটার মানে, চোখে দেখে বুঝতে পারা এবং সেটা সার্জেন-এর পক্ষেই সম্ভব।

কিছু একটা বলতেই হবে, এভাবেই শ্রীমন্ত লাহিড়ী আবার বললেন, তার মানে...বায়োপ্সি রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত শতকরা একশোভাগ শ্যিওর হয়ে ক্যানসার বলা যাচ্ছে না...তাই দাঁড়াচ্ছে!

শ্যামলেন্দু স্পষ্ট তাকিয়ে বললেন, আমার স্বচক্ষে দেখার ব্যাপারটা যদি অস্বীকার করতে চান, তাহলে কিছু বলার নেই।

এক মহিলার চাপা কণ্ঠস্বর কানে এল শ্যামলেন্দুর।—ওই জন্যই বলেছিলুম...বড়ো জায়গায় গিয়ে অপারেশন করাতে...জামাইবাবু কিছুতে শুনল না...মেজদিও মেমসাহেব নার্স দেখে গলে গেল...! এবার ঠেলা সামলাও...!

অপর মহিলা বললেন, আমাদের পাড়ার ডাক্তার দেবু সামন্ত তো প্রথম থেকেই এখানে আসতে বারণ করেছিল...এদের নাকি বড্ড বেশি ঠাটবাট...গড়িয়াহাটের কাছে ও ব্যবস্থা করে দেবে বলেছিল...।

শ্যামলেন্দু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই মিস্টার ঘোষাল বললেন, আপনি বলছেন ভালোই স্প্রেড করেছে!

শ্যামলেন্দু বললেন, হ্যাঁ...লিভারের মধ্যে এবং বেশ কিছু গ্ল্যান্ডে-ও।—এটা আমাদের হিসেবে গ্রেড থ্রি ক্যানসার...। তার ওপর অ্যাসাইটিস্...অর্থাৎ পেটে জল জমেছে...।

লাইফ এক্সপেক্টেন্সি কতদিন মনে হয় আপনার?

শ্যামলেন্দু একটা শ্বাস ফেলে মাথা নেড়েছিলেন।—বলা মুশকিল...আমি আপনাদের কোনো হোপ দিতে পারছি না...এইরকম অ্যাডভান্সড্ স্টেজ অব ক্যানসারে দেওয়া যায় না...ভেরি আনফরচুনেট...।

এখন তাহলে আমাদের কী করা উচিত?

আপনারা আর কী করবেন! আমরা চেষ্টা করব পেশেন্টকে যথাসম্ভব কম্ফর্টেবল রাখার...আশা করছি পরশু শুক্রবারের মধ্যে বায়োপ্সি রিপোর্ট এসে যাবে। তার মধ্যে অঙ্কোলজিস্ট...ক্যানসার স্পেশালিস্ট দেখতে আসবেন...।

প্রায় মিনিট পনেরো পেশেন্ট পার্টির সঙ্গে সেদিন কথা বলেছিলেন শ্যামলেন্দু। কিন্তু টের পাচ্ছিলেন, ওরা ফুঁসছে ভেতরে ভেতরে।

গতকাল বায়োপ্সি রিপোর্টও চলে এসেছিল সময়মতো। শ্যামলেন্দু যা যা বলেছিলেন সবকিছুরই উল্লেখ ছিল সেই রিপোর্টে। আরও বিস্তৃত রিপোর্ট-ও আসবে। কিন্তু শ্রীমতী ঘোষালের অবস্থার যে অবনতি হচ্ছিল এবং ক্রমশ কোমায় চলে যাচ্ছিলেন, তার সমস্ত লক্ষণই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে করার কিছু ছিল না। তাঁর অবশ্য কোনো কষ্টও ছিল না।

তারমধ্যেই গতকাল দুপুরের সেই তিনটি লোকের আবির্ভাব... একজন ডাক্তার দেবু সামন্ত, কে একজন কাউন্সিলর, আর একজন পল্টু না কে পাড়ার মস্তান...এদের কথা মনে পড়লেই অপমানে, অশান্তিতে গা রি রি করছিল শ্যামলেন্দুর। রুগির কথা ভেবে নিজেকে যথাসাধ্য শান্ত এবং নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। অথচ তার মধ্যেও বারবার মাথায় এসেছে, এ কোন সমাজ, কোন শহরে আমরা বাস করি, যেখানে শয়তান-মূর্খ-দুর্বৃত্তরা শাসাতে আসে একজন কৃতী চিকিৎসককে! সমস্ত সামাজিক নিয়মকানুন মানা সত্ত্বেও, প্রভূত পরিমাণ কর দেওয়ার পরেও, নেহাত নাগরিক হিসেবেই বা কি নিরাপত্তা আছে! কে দেবে সেই নিরাপত্তা? একজন ঈর্ষাকাতর তথাকথিত ডাক্তার, পাড়ার কাউন্সিলর আর মস্তান নিয়ে চলে আসে চিকিৎসালয়ের ডাক্তারকে অপমান করতে আর শাসাতে! কোন অধিকারে? কীসের যোগ্যতায় শ্যামলেন্দুকে প্রশ্ন করার সাহস পায় এই দুর্বৃত্তরা?

আসলে শ্যামলেন্দুও জানেন, তাঁর এলাকার রক্ষকরাই ভক্ষক সেজে বসে আছে নিভৃতে, গোপনে। অনেকদিন ধরেই তারা সুযোগের সন্ধানে শকুনের দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে, কেননা, নার্সিংহোম করলেও মাসে মাসে থানায় গিয়ে খাম দিয়ে আসেন না শুকতারার মালিক। এলাকার মস্তান, রংবাজ, তোলাবাজ নেতা-মন্ত্রী-কাউন্সিলরদের ডেকে মদ-মাংসর পার্টি দেন না বাড়ির ছাদে। অথচ কয়েক বছরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শুকতারা-র সুনাম, শ্যামলেন্দুর

প্র্যাকটিস। অমৃতেন্দু চলে যাওয়ার পরেই নতুন প্রজন্মের দুর্বৃত্তরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে আরও। শুকতারা নার্সিংহোম ছাড়াও তাদের নজরে আছে মেমসাহেব নার্স অ্যাঞ্জেলা মুখার্জি এবং শ্যামলেন্দুর সুন্দরী তরুণী কন্যা রানু-ও। রাজডাঙা, কসবায় তাঁরা ব্যতিক্রমী মানুষ।

কিন্তু মাথা উঁচু করেই থাকেন শ্যামলেন্দু। ভোররাতে মারা গেলেন চিত্রা ঘোষাল।

আর এম ও ডাক্তার সুদর্শন রাউত ডেথ সার্টিফিকেট লিখে রেখেছিল। অন্যান্য কাগজপত্র এবং ফরম্যালিটিজ...সব সেরে রেখেছিল। স্পেশাল ডিউটির নার্স দেবিকা সকালবেলা টেলিফোন করে শ্রীমতী ঘোষালের মৃত্যুসংবাদ জানিয়েছিল—রোগিণীর বাড়িতে...যদিও আগের দিন রাতেই তাঁরা জেনে গিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যু নেহাত কিছু সময়ের অপেক্ষা। নার্সিংহোম থেকে তাঁদের রাত্রে থাকার আহ্বান জানানো হয়েছিল। তাইতে কেউ সাড়া দেননি।

শনিবার আংশিক ছুটির দিন বলেই বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন, কিছু পাড়ার লোকও এসেছিলেন প্রয়াত শ্রীমতী ঘোষালের মরদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য। শুকতারা-র এলাকার মধ্যেই যাতায়াতের বড়ো গেট ছাড়া, তথাকথিত পুরোনো বাড়ির পাশে আরও একটি ফটকও ব্যবহার করা হয় নানান কাজে। সাধারণত মরদেহ রাখা হয় ওইদিকের একটি ঘরেই। ওদিক থেকে বেরুনোর ব্যবস্থাও সহজ হয়।

বেলা সাড়ে বারোটার মধ্যেই শুকতারা থেকে চিত্রা ঘোষালের মরদেহ তাঁদের গরফা রোডের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন আত্মীয়-স্বজনরা। স্বাভাবিকভাবেই নার্সিংহোমে একটা সাময়িক চাঞ্চল্য হয়ই মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময়। মানুষের স্বাভাবিক আবেগ প্রবল হয়ে ওঠে। ক্রমশ তা থিতিয়েও যায় দু-এক ঘণ্টা পরে। একটা অনিবার্য অবসাদ ঘিরে থাকে একটি মৃত্যুর অনুষঙ্গে।

আরও ছ-সাতজন রুগি ভর্তি রয়েছেন শুকতারা-তে। প্রাথমিকভাবে খারাপ লাগে তাঁদেরও। অথচ জীবনমৃত্যুর এই অনিবার্যতা মানতে বাধ্য সকলেই। একটি বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এইরকম পরিস্থিতিতে। তা হচ্ছে নার্সিংহোমের বিল পেমেন্ট সংক্রান্ত। সাধারণত অগ্রিম কিছু টাকাপয়সা দেওয়া থাকে। বাকি পেমেন্ট হয় রুগির ছুটির সময়। কিন্তু মৃত্যুর আবহে টাকা-পয়সার প্রসঙ্গ খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। উত্থাপন করা যায় না। শ্রীমতী ঘোষালের ক্ষেত্রেও করা যায়নি। ওঁরাও সৌজন্য বা ভদ্রতা, কৃতজ্ঞতার ধার ধারেননি।

আশা করা যায়, মৃতের দাহকার্য ইত্যাদির পরে পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ এসে বকেয়া মিটিয়ে দিয়ে যাবেন। অতীতে অন্য রুগিদের ক্ষেত্রেও সেরকম ঘটেছে। শোকাবহ ঘটনা ঘটলেও বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। নার্সিংহোম-এর খরচপত্র ব্যতীত, অন্যান্য চিকিৎসক, নার্স, ল্যাবরেটরি...ইত্যাদির ফিজ মেটানোর ব্যাপার থাকে।

শনিবারের চেম্বার এবং দু-তিনজন ফলোআপ রুগি দেখে তিনতলায় ফিরে গেলেন শ্যামলেন্দু। অ্যাঞ্জেলা চলে এসেছেন আগেই। সকাল থেকে আজ সারাদিনটাই কেমন এক উৎসাহহীন, বিষণ্ণতার মধ্যেই কেটে গেল। চিকিৎসক হলেও মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাস, আবেগ, ভালোবাসা থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো কারণ নেই। যুক্তি দিয়েও সব সময় নিজেকে নিস্পৃহ করে রাখা যায় না।

অ্যাঞ্জেলা শ্যামলেন্দুকে দেখে আসছেন সেই ডেভন-এর কুইন এলিজাবেথ হাসপাতাল থেকে। খুব কম দিন হল না...ষোলো-সতেরো বছর তো বটেই। কৃতী, কর্তব্যপরায়ণ মানুষ। পরিশ্রমী, আবেগপরায়ণও। নিজে সার্জেন, কিন্তু ছেলেমেয়ের একটু কেটে গেলে, আঘাত লাগলে বড্ড বেশি উতলা হয়ে পড়েন। শ্রীমতী ঘোষালের মৃত্যুতে বেশ মন খারাপ হয়েছে শ্যামলেন্দুর। একইসঙ্গে গতকাল তিনটি লোকের অসভ্যতা, দুর্ব্যবহার, শাসানিতেও বিদ্ধ এবং অপমানিত হয়েছেন, অ্যাঞ্জেলা বুঝতে পারেন। বিগত আট-দশ বছরের ভারতীয় তথা পশ্চিমবঙ্গীয় কলকাতার অভিজ্ঞতায় তিনি বিদেশিনি হয়েও অবশ্য এখন বুঝতে পারেন, রাজনীতি তথা দুর্নীতির প্রভাব কীভাবে এই রাজ্য এবং শহরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। যে কোনো কাজ, কাজের প্রতিক্রিয়া এবং বিচার এখানে করা হয় রাজনৈতিক দলের সমর্থন এবং বিরোধিতার নিরিখে। রাজনৈতিক দলের সমর্থক অপরাধ করলেও দিব্যি নিষ্কৃতি পেয়ে যায়।

স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাসীন দলের বিচার বা মতামত প্রাধান্য পাবে, তা এমনকী ভুল হলেও। সেই সুযোগ নেয় শয়তানরা।

অ্যাঞ্জেলা এখন বাংলা বলতে তো পারেন বটেই। পড়তেও পারেন। মাঝেমাঝেই সংবাদপত্র পাঠ করতে করতে তিনি অবাক এবং বিভ্রান্ত বোধ করেন, নিরপেক্ষতার বদলে তাদের একপেশে মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ দেখে। একইরকম মানসিকতার প্রকাশ ও প্রদর্শন চলে দূরদর্শনের পর্দায়। কয়েক মিনিটের সংবাদপত্র পাঠ অথবা দূরদর্শনের সংবাদ চ্যানেল দেখলেই, যে-কোনো মানুষ মুহূর্তে বুঝে যান, সেই সংবাদপত্র অথবা চ্যানেলটি কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক। এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই অধিকাংশ মানুষ ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাভোগের জন্য, নীতি বিসর্জন দিয়ে, ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ করে। অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দলকে সমর্থন দেখানোর উদ্যোগ নেয়...এমনকী মনে মনে তাদের আচরণবিধি ও কর্মপন্থা অপছন্দ করলেও। এরা সুযোগসন্ধানী, নীতিহীন মানুষ। মানুষের এই বিবেকহীন, নীতিহীন, স্বার্থসর্বস্ব মানসিকতায় চূড়ান্ত বিভ্রান্ত বোধ করেন অ্যাঞ্জেলা। ভারতবর্ষে জীবনযাপন করতে আসার সিদ্ধান্ত তাঁর জীবনের সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। শ্যামলেন্দুর সঙ্গে সম্পর্ক, জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত এবং যমজ সন্তানের মা-বাবা হওয়ার ঘটনা, প্রতিটি একজন বিদেশিনি হিসাবে তাঁর জীবনের আশ্চর্যজনক অধ্যায় হলেও, শেষ পর্যন্ত দেশ ছেড়ে চলে আসা এবং কলকাতায় বাকি জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত, সত্যি বলতে কি অবাক করেছিল শ্যামলেন্দুকে।

অ্যাঞ্জেলা তখনই...সেই ডেভন-এর কুইন এলিজাবেথ হাসপাতালের ফ্ল্যাটে শ্যামলেন্দুকে বলেছিল, ভালোবাসলে মানুষ পারে না, এমন কোনো কাজ নেই। আমি তোমার সঙ্গে কলকাতায় চলে যাব স্যাম।

উভয়ের সম্পর্কের রসায়ন তখন গড়িয়ে গিয়েছিল অনেকখানি। অ্যাঞ্জেলা প্যারট-এর যাতায়াত প্রায় নিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্যাম মুখার্জির ফ্ল্যাটে। প্রায়শ রাত্রিবাসও করত অ্যাঞ্জেলা। ছুটির সময় মাঝেমাঝে অ্যাঞ্জেলার পৈতৃক বাড়ি চেলটেনহ্যাম-এ শ্যামলেন্দুও

চলে যেতেন, বসবাস করতেন। মিস্টার প্যারট অবস্থাপন্ন অথচ মধ্যবিত্ত মানুষ, সম্ভবত খুশি হয়েছিলেন, একজন ভারতীয় চিকিৎসককে তাঁর কন্যা জীবনসঙ্গী নির্বাচন করেছে বলে। সম্পর্কের নিরিখে, বিবাহ নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু শ্যামলেন্দুর ছিল। নিজের সংস্কৃতি, সংস্কার, পরিবার...সব কটি পরিচয়ের সঙ্গেই, অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে তার সম্পর্ক বিবাহে স্বীকৃত হবে, সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে তার মধ্যে কোনো দ্বিমত ছিল না।

সুতরাং ভিনদেশি মেমসাহেব প্রেমিকার কথা শুনে শ্যামলেন্দু বলেছিল, কথাটা ভেবে বলছ ডার্লিং?

শ্যামলেন্দুকে অবাক করে অ্যাঞ্জেলা বলল, ভালোবাসার সঙ্গে একটা কমিটমেন্ট থাকে স্যাম। আমি যদি তোমাকে সত্যি ভালোবেসে থাকি, তার সব থেকে বড়ো কমিটমেন্ট হচ্ছে তোমার সঙ্গে জীবনযাপন...জায়গাটা ইম্পর্টান্ট নয়।

কমিটমেন্ট যদি টিঁকে না থাকে?

তাহলে তো ভালোবাসাটাই মিথ্যে হয়ে যায় স্যাম।

একটু চুপ করে থেকে শ্যামলেন্দু বলল, অ্যাঞ্জি...আমি জানি তুমি বিশ্বাস করো যে আই লাভ য়্যু।

ইয়েস স্যাম...আই ডু।

কিন্তু আমার একটা কমিটমেন্ট আছে, দেশে ফিরে যাওয়ার।

আমি তো সেটাও জানি স্যাম। তোমার কমিটমেন্টটাকে আমি রেসপেক্টও করি। সুতরাং জীবনযাপন, ভালোবাসা, কমিটমেন্ট, রেসপেক্ট...সবকটা ধরে রাখার জন্যই তো আমরা ইন্ডিয়া যাব... কলকাতায় জীবনযাপন করব।

শ্যামলেন্দু কিছুটা অবাক হয়েই তাকিয়েছিল বিদেশিনি প্রেমিকার দিকে। আর তখনই অ্যাঞ্জেলা আর একটা দারুণ কথা বলেছিল খুব স্বাভাবিকভাবে। ও বলল, লুক স্যাম...ইটস নট আ বিগ স্যাক্রিফাইস অর এনিথিং লাইক দ্যাট...এটা খুব স্বাভাবিক যে, তুমি যেখানে থেকে, কাজ করে সুখী হবে, আমি তোমার সঙ্গে সেখানেই থাকব, অ্যাডজাস্ট করব।

শ্যামলেন্দু তারপরেও বলল, সব ব্যাপারটাই কি তাহলে একতরফা...তোমার দিক থেকে হয়ে যাচ্ছে না?

না, হচ্ছে না। কেননা তুমি ভারতীয় জেনেও আমি তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছি। আমি তোমায় আপরুটেড করতে চাই না।

কিন্তু তোমাকে তো আপরুটেড হতে হবে!

আমি সেই চ্যালেঞ্জটা নেব বলেই মানসিকভাবে তৈরি হয়েছি। তখন আর আপরুটেড মনে হবে না।

যদি সেটা খুব ডিফিকাল্ট মনে হয় একটা সময়?

অ্যাঞ্জেলা হেসে বলেছিল, বাই দ্যাট টাইম...কোনো কিছু আমার একার থাকবে না স্যাম।

কথাটার গুরুত্ব বুঝে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল শ্যামলেন্দু। একইসঙ্গে আপ্লুত এবং মুগ্ধ।

কিছুক্ষণ পরে বলল, আমার বাবাকে এই খবরটা এখনই জানাবার দরকার। কেন জানো? আমার মা চলে যাওয়ার পর থেকে, বাবা আমার জীবন আর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

অ্যাঞ্জেলা বলেছিল, শুধু জানিয়ে কী হবে স্যাম! উই নীড টু মিট।

এখনই আর কী করা যাবে?

তোমার বাবাকে ইংল্যান্ডে আসতে বলো...নয়তো...চলো আমরা দুজনে ইন্ডিয়া যাই। কথার চেয়েও সামনাসামনি দেখা, কয়েকদিনের মেলামেশা, একসঙ্গে থাকা...এসবের মধ্যে দিয়ে চেনাজানা অনেক বেশি হয়।

শ্যামলেন্দুকে অবাক করেছিল অ্যাঞ্জেলা। অমৃতেন্দুকে যা এবং যতটুকু জানাবার ও জানিয়েছিল। কিন্তু তারপরের যা কিছু... অমৃতেন্দুকে দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ডে আনাবার আয়োজন, সব করেছিল অ্যাঞ্জেলা। নিজেরা যাওয়ার থেকে অমৃতেন্দুকে বিলেতে নিয়ে আসাটা যে সবদিক থেকে বেশি কার্যকর হবে, সেটাই ভেবেছিল অ্যাঞ্জেলা। সত্যি সত্যি তাই হয়েছিল।
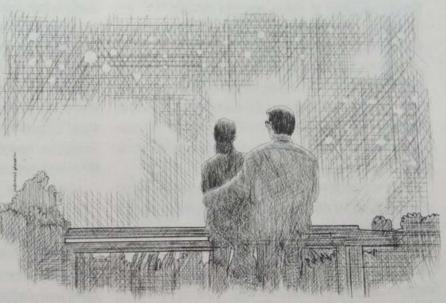
অ্যাঞ্জেলা বলল, ভালোবাসার সঙ্গে একটা কমিটমেন্ট থাকে স্যাম

একটা আনুষ্ঠানিক বিবাহের আয়োজনও তখন করা হয়েছিল অমৃতেন্দুর ইচ্ছানুসারে।

অতঃপর কলকাতায় বছর দুই পরে যখন শ্যামলেন্দু-অ্যাঞ্জেলার বিবাহোপলক্ষে তথাকথিত পার্টি হয়েছিল টলি ক্লাবে...তখন রাজু- শানু প্রায় এক বছরের যমজ ভাইবোন। সপ্তাহ তিন পরে আবার ডেভন ফিরে গিয়েছিল সবাই। নাহ অমৃতেন্দু কখনও জোর করেননি কিংবা রাজডাঙায় ফিরে যাওয়ার জন্য পীড়াপিড়ি করেননি ছেলেকে। মাঝখানে আরও একবার দেশে ঘুরে গিয়েছিল শ্যামলেন্দু। সপরিবারে। শুকতারা

নির্মাণের ভাবনা তখন বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল বাস্তবের দিকে।

নতুন শতাব্দীর প্রথম দশক উত্তীর্ণ হওয়ার কয়েক বছর আগেই শ্যামলেন্দুর সপরিবারে পুনর্বাসন হয়েছিল কলকাতায়।...

আগামীকাল রবিবার...ছুটির দিন।

সকালবেলা একটু দেরি করে ঘুম থেকে ওঠার অনিয়ম করা যেতেই পারে। রানু-শানুও ওঠে বেলা করে। আজ শনিবার কোথাও বেরুনোর প্রোগ্রামও করা হয়নি। রাতের খাওয়ার পরে শুকতারা-র চারতলায় ছেলেমেয়ে সহ একটা সিনেমা দেখার আয়োজনই সব থেকে ভালো প্রোগ্রাম হতে পারে। শ্যামলেন্দুকে তিনতলায় ডাকতে গেলেন অ্যাঞ্জেলা। নিশ্চয়ই কম্প্যুটার নিয়ে বসেছেন।...

সামান্য অবাক হলেন অ্যাঞ্জেলা। কম্প্যুটার-এর পাশে রাখা বিছানায় শুয়ে রয়েছেন শ্যামলেন্দু। রাত ন-টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার মানুষ নন শ্যামলেন্দু। শব্দ না করেই পাশে বসলেন। শরীর ঠিক আছে তো!

হ্যাঁ...শরীর ঠিকই আছে। স্ত্রীর বসার শব্দ এবং অনুভবেই নড়েচড়ে উঠলেন শ্যামলেন্দু। সামান্য একটু সলজ্জ ভাব। বললেন, জার্নালে একটা আর্টিকল লেখার কথা ভাবছিলাম...কিন্তু আজ কিছুতেই মন বসছে না...রাদার এগজস্টেড লাগছে।

অ্যাঞ্জেলা মাথা নাড়লেন।—আজ সবায়েরই মন খারাপ...কিন্তু কখনও-সখনও এরকম তো হবেই!

একটু চুপ করে থেকে শ্যামলেন্দু বললেন, মিসেস ঘোষালের মৃত্যু নয়...আমি অ্যাফেক্টেড হয়েছি...গতকাল ওই তিনটে লোকের স্পর্ধা, অসভ্যতা আর কথাবার্তায়...। শ্রম-শিক্ষা-বিশ্বাস-মূল্যবোধ নিয়ে...কী করলাম সারাজীবন!

আই নো স্যাম। কিন্তু তোমার মন, সেন্টিমেন্ট, অনুভূতির কোনো মূল্য নেই ওদের কাছে।

একটা শ্বাস ফেলে শ্যামলেন্দু চুপ করে রইলেন। তখনও তাঁদের জানা ছিল না, পরের দিন সকালে কী নৃশংস উন্মাদনায়, পৈশাচিক আচরণে, অকথ্য ভাষায় কিছু স্থানীয় মস্তান, তোলাবাজ আর তথাকথিত রাজনৈতিক পান্ডা, গুন্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হবেন তাঁরা এবং শুকতারা নার্সিংহোমের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ...এমনকী বিধ্বস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঘরবাড়ি, সম্পত্তি।

শ্যামলেন্দু বুঝতে পারেন, বিগত দুই দশকে এই ধলভূমগড় সাবডিভিশনও কত বদলে গেছে। শুধু ধলভূমগড়-ই বা কেন, কাছেপিঠের মোসাবনি-ঘাটশিলা-চাকুলিয়া-বহড়াগোড়ারও রাস্তাঘাট, দোকানপাট, বাড়িঘরের চেহারা-চরিত্র অন্যরকম হয়ে গেছে। এমনকী আগের সেই মানুষজন...তাদের পোশাক-আশাক, আচরণ-কথাবার্তা, মুখের এবং শরীরের ভাষাও আজ অন্যরকম। আগে সবকিছুর মধ্যে একটা ফাঁকা-শান্ত-গ্রাম্য-প্রাকৃতিকভাব মিশে থাকত। মানুষজন ছিল সরল, একটু লাজুক প্রকৃতির, আর সব সময়েই যেন শহুরে শিক্ষিত মানুষদের একটু সমীহ করে চলার প্রবণতা।

এখন একটা গঞ্জের নাগরিকভাব এসে গেছে এদিককার জায়গাগুলোয়। কোনো কিছুই ঠিক প্ল্যানমাফিক, নাগরিক উন্নতির জন্য করা হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং খামচা-খামচা করে, যে-ই যখন সুযোগ পেয়েছে, যেন খানিকটা করে কিছু একটা ব্যবসায়িক ধান্দা করে নিয়েছে। তাই এইসব গঞ্জ-মফস্সলের চেহারায় একটা খাপছাড়া গ্রাম্য আর শহুরে কালচারের টানাপোড়েন খুব চোখে পড়ে শ্যামলেন্দুর। হয়তো কোনো গরু-মোষের খাটালের গায়েই একটা ঝকঝকে কম্প্যুটার আর টেলিভিশনের দোকান। কাঁচা ড্রেনের পাশে লাল-নীল আলো জ্বালানো চাইনিজ রেস্টোরেন্ট। কিংবা গম খেতের মধ্যে চারদিকে পাঁচিল তুলে, বড় লোহার গেটের মধ্যে একটা চারতলা ফ্ল্যাটবাড়ি। তার গায়েই বিউটি পার্লার। রাস্তাঘাটও নতুন হয়েছে, কিন্তু বেশ ভাঙাচোরা...তার মধ্যেই চলেছে অটো, চকচকে গাড়ি, ম্যাটাডোর আবার গরুর গাড়িও।

সে তুলনায় ধলভূমগড় টাউন থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার উত্তরে, কংসাবতী তথা কাঁসাই নদীর ধারে বামনিশোল, বাসাঝোর, ঘসিডি কিংবা আমদা গ্রামগুলোর পরিবেশ এখনও অনেক বেশি আগের মতো আছে বলেই শ্যামলেন্দুর ধারণা। ধলভূমগড় টাউনের কাছে পুরোনো ব্যবসা এবং বড়ো বাংলো থাকলেও, বাবা যে কংসাবতী আর সুবর্ণরেখার জংশনের কাছাকাছি খেতজমি আর টালিখোলার ঘর করে রেখেছিলেন শ্যামলেন্দুর জানা ছিল। নেহাত ছোটো জায়গা তো নয়! সাড়ে তিন বিঘার ওপর।

আগে গরুর গাড়ি ছাড়া কিছুই যেত না। এখন গাড়ি যাতায়াতের রাস্তা করেছে পঞ্চায়েত থেকে। আর একটা কাজ করেছে ঝাড়খণ্ড সরকার, যে খেতিজমিতে কোনো আরবান ডেভেলাপমেন্ট (অর্থাৎ শহুরে উন্নতির জন্য জমি বিক্রি) করা যাবে না। জমি বিক্রি করলেও সেখানে আবার কোনো চাষবাসই করতে হবে। ধলভূমগড় থেকে নিজে গাড়ি চালিয়েই সেই নরসিংগড়-যুগিশোল-আমদার দিকে গিয়েছিলেন শ্যামলেন্দু। তারমধ্যেই বাসাঝোরের খেতজমি আর টালিখোলার ঘরই ভালো লাগল।

চারদিকে ফাঁকা আর সবুজ খেত। কোনোটা হালকা, কোনোটা গভীর, কোনোটা পাঁশুটে সবুজ আর হলদের মিশ্রণ। তার মধ্যে মাঝে মাঝেই টালিখোলা কিংবা গোলপাতার ঘর...ঘর না-বলে ঝুপড়ি বলাই ভালো। গ্রাম্য চাষিদের বসবাসের জায়গা। কাছাকাছি গ্রাম থেকে গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তায় সাইকেল চলে, ভ্যান রিকশা চলে। গাড়ির মালিকরা এখনও ওসবদিকে যাওয়ার ভরসা পায় না। বিদ্যুৎ এসেছে, ডিপ টিউবওয়েল হয়েছে। ঝিরঝিরিয়ে হাওয়া বয় ধান, সরষে আর মশুরি খেতের ওপর দিয়ে। ষষ্ঠঋতুর আলো-হাওয়া-মেঘ-বৃষ্টি এখনও বাসাঝোরের প্রকৃতিকে মায়াময়, নিবিড়, শান্ত করে রেখেছে। কংসাবতীর জল তিরতির করে বয়ে যায় সারা বছর, বর্ষায় ফুলেফেঁপে ওঠে।

শ্যামলেন্দু খোঁজ নিয়েছেন, মোসাবনি আর চাকুলিয়ার কাছে দু-দিন হাট বসে সপ্তায়। মঙ্গল আর শুক্রবার। চার কিলোমিটার পথ। কলকাতা ছেড়ে ধলভূমগড়ে থাকাই মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু না, সেই কলেজজীবন...এমনকী সদ্য পাশ করার পরের সেই ধলভূমগড় আর নেই। কলকাতার থেকে আলাদা বটে। এ রাজ্যও আলাদা। একসময় ছিল সিংভূম জেলা, বিহার রাজ্যের। এখন ঝাড়খণ্ড। তাহলেও যে হতাশা-অভিমান-অপমান-ভাঙন-বুকের যন্ত্রণা নিয়ে

শেষ পর্যন্ত নিজের জন্মভূমি ছেড়ে চলে আসা, তার থেকে মুক্তি পাওয়ার মতো নির্জনতা আর ধলভূমগড়ে নেই। কোয়ারির পুরোনো কর্মচারীরাই বাসাঝোরে নিয়ে গিয়েছিলেন অতীতের মালিকপুত্র ডাক্তারবাবুকে। সেখানেই ঠিকানা নিশ্চিত হয়ে গেল শ্যামলেন্দুর।...ধলভূমগড়ের পাথর কোম্পানি এম-ই অর্থাৎ মুখার্জি এন্টারপ্রাইজ অনেক দিয়েছিল অমৃতেন্দুকে। এখনও দেয় শ্যামলেন্দুকে।

কসবা রাজডাঙার বাড়ি তো বটেই, পরবর্তীকালে শুকতারা নার্সিংহোম আর সপরিবারে শ্যামলেন্দুর বসবাসের জন্য বানানো নতুন বাড়ি তৈরিতেও কোনো ফাঁক রাখতে চাননি অমৃতেন্দু...যদিও তখন শ্যামলেন্দুরও অর্থাভাবের কোনো কারণ ছিল না। অমৃতেন্দু পুরোনো দিনের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার...স্থপতির মতো উদ্যোগ নিয়েই জমানো টাকার সদ্ব্যবহার করেছিলেন ঝাঁ-চকচকে নতুন বাড়ি তৈরি করে। চিকিৎসালয় হবে, সেই ভাবনা মাথায় রেখেই নতুন বাড়ির পত্তন।

কিন্তু শুধু বাড়ি হলেই হয় না। চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে তুলতে আরও হাজারটা আয়োজন করতে হয়। টাকার প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। সাত-আট বছর বিদেশে আহরণ করা উদ্বৃত্তের সবটুকুই শ্যামলেন্দু নিবেদনের মতো খরচ করেছিলেন, মা-এর নামে চিকিৎসালয় করার জন্য। সবটাই সম্ভব হয়েছিল অ্যাঞ্জেলার সম্পূর্ণ নতুন জীবনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানসিকতা এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে। আর কসবার মতো জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল ঝকঝকে সাদাবাড়ি—শুকতারা মেডিকেয়ার সেন্টার। বালিগঞ্জ থেকে বাইপাস-এর দিকে যেতে কসবা তখন সদ্য অভিজাত অঞ্চলের তকমা পেতে শুরু করেছে...একের পর এক বহুতল হর্ম্য নির্মাণ হচ্ছে, অফিস-মল-রেস্টোরেন্ট তৈরি হচ্ছে, কর্পোরেট হাউজ-এর ঠিকানা হচ্ছে।

তার মধ্যেই অন্য এক ধরনের পরিচিতি আর আভিজাত্য নিয়ে দাঁড়িয়েছিল শুকতারা। নিজেদের মতো করেই নিজেরা।

তখন থেকেই কি কিছু স্থানীয় মানুষ, ব্যবসাদার, তথাকথিত রাজনৈতিক নারীপুরুষ (যাদের নেতা বা নেত্রী নামে অভিহিত করা উচিত না), কাউন্সিলর, তোলাবাজদের চোখ টাটিয়েছিল? এমনকী ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল কিছু স্থানীয় চিকিৎসক ও কাছেপিঠের অন্যান্য চিকিৎসাকেন্দ্রের দালালরা? কিংবা কিছু স্বভাব-হিংসুটে, পরশ্রীকাতর বঙ্গসন্তানরাও?

যে-কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে তো বটেই, এমনকী নার্সিংহোম থেকেও, তার আগে থাকতে 'শান্তিচাঁদা' নামে নিয়মিত টাকা আদায় রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাজার রকম সরকারি কর এবং ঘুষের পরেও শান্তিচাঁদা কেন প্রতিমাসে? স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মী, রংবাজ- মস্তান, শনি ঠাকুরের ঠেক-এ বসা হাতে বালা-কানে দুল-কপালে ফোঁটা পাড়াতুতো রক্ষকদের পরিষ্কার বক্তব্য ছিল, কী যে বলেন স্যার/ দাদা/কাকু...এই যে শান্তিতে পাড়ায় বাস করছেন, তার জন্য সামান্য কিছু...।

বিনীতভাবেই নিজেদের ভূমিকা পালন করেছিলেন শ্যামলেন্দুরা। কসবারই ছেলে তিনি। সাধারণ মূল্যবোধ নিয়েই মধ্যবিত্ত জীবনযাপন করেছেন। পড়াশোনা করেছেন। শল্যচিকিৎসক হয়ে বিদেশ গেছেন। কৃতী হয়েই ফিরে এসেছেন স্বদেশে। সরকারি চিকিৎসা-বিভাগ তাঁর কর্মক্ষেত্র হতে পারে না, জেনে-বুঝেই শুরু করেছেন আপন জীবিকা...প্রাণপাত করেছেন। করবেন বলেই মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছিলেন—বিদেশের লোভনীয় হাতছানি উপেক্ষা করে। তাঁকে পূর্ণ সমর্থন আর সম্মান জানিয়েছিলেন বিদেশিনি স্ত্রী। অ্যাঞ্জেলা প্যারট থেকে অ্যাঞ্জেলা মুখার্জি হয়ে সর্বতোভাবে জড়িয়েছিলেন এই দেশ, এই শহর, মানুষজন আর জীবিকার সঙ্গে। শিক্ষা আর রুচিগতভাবেই প্রথম থেকে প্রশ্রয় দেননি, কথায়-কথায় শোষণ আর সুযোগ গ্রহণের অত্যাচারকে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, বিপন্নবোধ করেছেন উভয়ে, উৎকণ্ঠায় পড়েছেন। আবার উঠেও দাঁড়িয়েছেন। প্রতিষ্ঠা পেয়েছে শুকতারা।

কাজের ওপর আস্থা, মানুষের প্রতি বিশ্বাস, শ্যামলেন্দু জানতেন ধরে রাখলে, জীবনে হারাবার কিছু নেই।

সত্যি কি কোথাও ধাক্কা খেয়ে গেল সেই বোধবিশ্বাস! তোলপাড় চলেছিল মনের মধ্যে। এখনও চলে। তার মধ্যেই কখন প্রায় একটি বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। বাসাঝোরের খেতি-জমিতে শীতের ফসল এখন শেষের দিকে। আর মাসখানেকের মধ্যে তাপ বৃদ্ধি পাবে। তার মধ্যেই ফুলকপি-বাঁধাকপি-ওলকপি- পালং আর ধনেপাতার শিষ যথাসম্ভব ব্যবহারের পরেই উপড়ে ফেলে দিতে হবে। মাটি বেশি শুকনোর আগেই নিড়েন দিয়ে চৌরস করে নিতে হবে। ডিপ টিউবওয়েলের জলের লেভেল বেশি নীচে নামার আগে ডেঙ্গোডাঁটা, কুমড়ো আর বেগুনের চারা বসিয়ে দিতে হবে, মাচা বেঁধে দিতে হবে চিচিঙ্গা আর বরবটির, আল কেটে দিতে হবে লংকা চারার গায়ে গায়ে...এসবই এখন শিখে গেছেন শ্যামলেন্দু। অ্যাঞ্জেলাও। তিনজন মালি তথা মুনিশ তথা চাষি কাজ করে ডাগদারবাবু আর মেমসাহেবের কোঠিতে এবং তাঁদের সঙ্গে।

তাছাড়াও কাজ আছে মেমসাহেব আর ডাক্তারবাবুর। ডাক্তারি-মাস্টারি দুই-ই করতে হয় গাঁয়ে, গাঁয়ের বাইরেও।

মুসাবনির গুরুবান্দা হাটে দু-দিনের ইস্কুল হয়—ছেলেমেয়ে-বাচ্চা-বুড়ো-বুড়ি সব্বাইকে নিয়ে...ওই মঙ্গল-শুক্র হাটের দিনেই। গাছতলার ইস্কুলের মাস্টার আর মাস্টারনি তাঁরা দুজনেই। অসুখ-বিসুখ হলেও দেখে দেন। কিন্তু হাসপাতালের কাজ থেকে পুরোপুরি ছাড়ান পাননি শ্যামলেন্দু...কিংবা সবটা ছাড়েননি তাও বলা যায়।

টাটানগর মেডিকেল কলেজ আর হাসপাতালে যান মাসে দু-দিন।

গাঁয়ের রাস্তা পেরিয়ে তেত্রিশ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে যেতে সওয়া এক ঘণ্টার ওপর সময় লাগে গাড়িতে। সকালে গিয়ে ফিরতে সন্ধে হয়ে যায়। তবু যান, ভালো লাগে কাজ করতে। ছাত্র পড়ান, রুগি দেখেন, অপারেশন করেন। মাঝে মাঝে সঙ্গী হন স্ত্রী অ্যাঞ্জেলা-ও। অবস্থা যেরকমই হোক, তবু হাসপাতাল-রুগি-ওয়ার্ড-ওটির আকর্ষণ তাঁকেও টানে।

আমরা কি খুব দ্রুত ডিসিশন নিলাম অ্যাঞ্জি?

সেই গত ফাল্গুন মাসে শুকতারা নার্সিংহোম আক্রান্ত আর শ্যামলেন্দু এবং আরও দুজন স্টাফ আহত এবং রক্তাক্ত হওয়ার তিনদিন পরে...তখনও একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন শ্যামলেন্দু। কিন্তু

সিদ্ধান্ত...বলা উচিত প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখনই। নাহ্...এই শহরে আর কোনোদিনই তিনি রুগি দেখবেন না, অপারেশন করবেন না। ছেড়ে চলে যাবেন।

শুকতারা-র দুই বাড়িতেই তখন একটা স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। স্থানীয় অঞ্চলের গুন্ডা-মস্তান, রাজনীতির ছত্রছায়ায় থাকা এবং সুবিধা ভোগ করা কর্মী, হুলিগান (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) এবং তাদের পরোক্ষভাবে মদত দিয়ে চলা তথাকথিত শান্তিপূর্ণ অথবা ঈর্ষাকাতর নাগরিকবৃন্দ তার তিনদিন আগে যা ক্ষতি করার করে দিয়ে গেছে। সেদিন ছিল রবিবার। ছ-সাতজন রুগি তখনও ভর্তি ছিলেন। এই তিনদিনে ক্রমশ তাঁদেরও ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তারপর থেকে ফাঁকা হয়ে রয়েছে শুকতারা। প্রশান্তসহ কয়েকজন নিয়মিত স্টাফ ছাড়া আর অন্যদের যাতায়াত নেই। যে কয়েকজন চিকিৎসক এখানে রুগি দেখতেন এবং শ্যামলেন্দু স্বয়ং, সকলেরই চেম্বার বন্ধ। নোটিস টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে—যে-কোনো রকম রুগি দেখা, ভর্তি করা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা...সবই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বুধবার দুপুরবেলা সেই ঘোরের মধ্যেই কখন তলিয়ে গিয়েছিলেন শ্যামলেন্দু। কপালের ডানদিকে পাঁচটা স্টিচ্ পড়েছে... তখনও ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে। শুয়েছিলেন নিজেদের চারতলার ঘরে। নিজেই উঠে ঘড়ি দেখলেন। বিকেল চারটে বাজে। পাশেই শুয়েছিলেন অ্যাঞ্জেলা—শারীরিক-মানসিক ধকলে বিধ্বস্ত...ঘুমিয়েই পড়েছিলেন। পাশ ফিরে দেখলেন শ্যামলেন্দু বিদেশিনি স্ত্রীর দিকে... একটু বয়সের ভার ইদানীং শরীরে...তবু টানটান। ধরা যায় না প্রায় মধ্যচল্লিশ বয়স।

সামান্য শব্দেই উঠে বসেছিলেন অ্যাঞ্জেলা। একইসঙ্গে মায়া-উদ্বেগ-দুর্ভাবনা তাঁকে সচকিত করে রেখেছে তিনদিন ধরে।

আর য়্যু অলরাইট স্যাম!

স্ত্রীর কাঁধে হাত দিলেন শ্যামলেন্দু।—আয়াম ফাইন অ্যাঞ্জি... ফিজিক্যালি নাথিং রং...ঠিক আছি।

একটা এম আর আই করাবে না?

দরকার নেই। হলে নিশ্চয়ই করাতাম...সুজিতকে বললেই গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যেত।

খুব ব্যথা এখনও?

স্ক্যালপ্ ল্যাসারেশন হয়েছে...স্টিচ আছে...একটু ব্যথা থাকবে। নাথিং সিরিয়াস। হিল করে যাবে কয়েকদিনে।

আসল যে কথাটা শ্যামলেন্দু বললেন না, সেটা হচ্ছে—যে ব্যথা আমার হচ্ছে সেটা মাথা ফাটা বা স্টিচের জন্য না। ব্যথা আমার মনের মধ্যে...আমার কাজ-বিশ্বাস-পরিচিতি-সম্মান-শ্রমের ওপর যে আঘাত, সে ব্যথা সহজে যাবে না অ্যাঞ্জি...সেই যন্ত্রণা আমাকে টলিয়ে দিয়েছে, নাড়িয়ে দিয়েছে, ভেঙে দিয়েছে...। এ কথা অ্যাঞ্জেলাকে বলা উচিত হবে না। ওর কষ্ট বেড়ে যাবে, অথচ কিছু করতে পারবে না। নিজে কষ্ট পাওয়া একরকম। অসহায়ভাবে অন্যের কষ্ট দেখা আরও কষ্টকর।

কিন্তু এবার মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন শ্যামলেন্দু। ছেড়ে চলে যাবেন এ শহর। কলকাতা আর তাঁর নিজের জায়গা নয়। এ এক অজানা, অচেনা, হৃদয়হীন, অকরুণ, স্বার্থসর্বস্ব শহর। এর প্রতিবাদী চরিত্রের মধ্যেও স্বার্থ আর ভণ্ডামির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সাত-আট বছর ধরে নানান ছোটোখাটো ঝামেলা, গণ্ডগোল, অত্যাচার, শোষণ, তঞ্চকতা, প্রবঞ্চনা, অসদাচরণ...তিনি সামলেছেন, সহ্য করেছেন। বাবা-মা-এর কাছ থেকেই সেই শিক্ষা পেয়েছেন—সহ্য করতে হয়। মানিয়ে চলতে হয়। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে নেই। একপেশে ভাবনা মানুষকে প্রান্তবাসী করে দেয়। অনেককিছু, অনেকদিক, অনেকের কথা ভাবতে হয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে। সব মানুষ একরকম নয়। তলিয়ে ভাবতে হবে বিপদ-আপদের সময়, কেন এমন ঘটল? অন্যের দোষ, ভুল, অসভ্যতা, অন্যায্য দাবি, দুর্বিনীত হয়ে ওঠার সমালোচনা, প্রতিবাদের আগে নিজের দিকে তাকাও...সমালোচনা করো।

নিজের ব্যাপারে মানুষ বড্ড বেশি উদাসীন। কেবল ভাবে আমিই ঠিক।

জন্ম থেকে শুনতে শুনতে কীভাবে যেন অভ্যস্তই হয়ে উঠেছেন, আজকের এই মধ্যবয়সি মানুষটা। একইসঙ্গে মূল্যবোধ আর ভালোবাসা নিয়ে গড়ে ওঠা জীবনটায় বাধা পাননি, ধাক্কা খাননি এমন না। কিন্তু কাটিয়ে উঠেছেন, সহ্য করেছেন। জীবন অকরুণ হয়নি, বরং দু-হাতে ফিরিয়েই দিয়েছে। তা না হলে আজ শুকতারা থেকে শুরু করে অ্যাঞ্জেলা, রানু-শানু...!

কিন্তু এবারের ধাক্কা তাঁর পায়ের তলার মাটি কাঁপিয়ে দিয়েছে। মানুষের ওপর বিশ্বাস...নাকি বাঙালি জাতির প্রতি...!

তাসত্ত্বেও এই তিনদিনে টের পেয়েছেন, স্রোতে গা-ভাসানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেই তিনি...তাঁর প্রতিষ্ঠান, পরিবার, প্র্যাকটিস... সবই নিরাপদ হয়ে উঠতে পারে। সেদিন ঘটনার সময় মাত্র দশ মিনিট হাঁটাপথের দূরত্বে থাকা যে সামাজিক সুরক্ষাবাহিনীর দপ্তর, অর্থাৎ পুলিশ স্টেশন, যেখান থেকে আক্রমণের সংবাদ পেয়েও এমন রক্ষীও এসে পৌঁছাননি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে, আজ দিনে তিন থেকে চারবার তাঁরা খোঁজ নিচ্ছেন...এমনকী শুকতারা-র চত্বরে জিপ রেখে অভয় দানের উদ্দেশ্যে এপাশ-ওপাশ ঘুরে দেখছেন। কথা বলার উদ্যোগ নিয়েছেন শ্যামলেন্দুর সঙ্গে। চিঠি পাঠিয়েছেন।

একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে...কিছু অসংযত...বহিরাগত মানুষের ক্ষুব্ধ আচরণের বহিঃপ্রকাশে...কিন্তু প্রশাসন আপনাদের পক্ষে এবং কিছুতেই আইনভঙ্গকারীদের প্রশ্রয় দেবে না...আমরা আপনাদের নাগরিক সুরক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ...।

একটি সুপরিচিত, প্রতিষ্ঠিত, চিকিৎসাকেন্দ্র যাতে সুষ্ঠুভাবে আবার কাজকর্ম করতে পারে, তা দেখাই আমাদের কর্তব্য... প্রয়োজনবোধে শুকতারা নার্সিংহোমের নিরাপত্তা নিয়ে একটি শান্তিকমিটিও গঠন করা যেতে পারে...যেখানে থানার বড়বাবুও...।

শ্যামলেন্দু পড়েছেন, শুনেছেন। আর প্রতিটি শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ-ও অনুধাবন করেছেন।...কিন্তু আর নয়।

বারবার সেই রবিবার বেলা সাড়ে দশটায় অকস্মাৎ মারমুখী আক্রমণের বিভীষিকা তাঁকে আবারও আতংকগ্রস্ত, অসহায়, নিরস্ত্র শিকারে পরিণত করেছে...কেঁপে উঠেছেন, বিহ্বল হয়েছেন...স্ত্রী, পুত্র, কন্যার জন্য অস্থির আবেগে যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে উঠেছেন।

...প্রথম কয়েক মিনিট কিছুই বুঝতে পারেননি শ্যামলেন্দু সেদিন। শুধু চমকে উঠেছিলেন হঠাৎ শোরগোল শুনে।

ছুটির দিন...মনমেজাজ একটু খারাপই ছিল। শ্রীমতী ঘোষালের অপ্রত্যাশিত ক্যানসারের বিস্তৃতি এবং লিভারের মধ্যেও ছড়িয়ে যাওয়ায় অপারেশনের রেজাল্ট কী হতে পারে তাঁর কিছুটা আন্দাজ ছিল। সেইসঙ্গেই দুর্বিনীত এবং অশিক্ষিত তিনটি লোকের হানা দেওয়ার ঘটনা, অপমানকর কথা বলার অভিঘাত তাঁকে বিদ্ধ করেছিল। ওদের উদ্দেশ্যও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু সবমিলে এক দুরন্ত ষড়যন্ত্র এবং শুকতারাকে বিধ্বস্ত বিপন্ন এবং সপরিবারে তাঁদেরও আক্রমণ করা হতে পারে...এতটা ভাবতে পারেননি। পাবার কোনো কারণও ছিল না, কেননা তিনি বোঝেন, কোনো চিকিৎসক শতকরা একশোজনকে তুষ্ট করতে পারেন না। তা ছাড়া আবেগের কাছে অনেকসময় যুক্তি হার মানে, সেটাও ঠিক। তা সত্ত্বেও শুকতারা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল। শোষক আর তোলাবাজদের তা সহ্য হয়নি।...শানু যথারীতি খেলতে চলে গিয়েছিল। ব্রেকফাস্ট টেবিলেই পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ, পড়াশোনা নিয়ে কথা হচ্ছিল...শানু নাকি ইংল্যান্ডেই এ-লেভেল পড়তে যেতে চায়, বিশেষ করে ওর ক্রিকেট-প্রীতির জন্য...কিন্তু রানু বাবা-মা-র কাছেই থাকতে চায়। মনে হয় একেবারে মা-এর মতোই ওর ডিটারমিনেশন...শ্যামলেন্দুকে ছেড়ে থাকবে না...।

হঠাৎই শোরগোল কানে আসে নীচে থেকে। নাহ্ রাস্তার না। শুকতারার গেট ভেঙে ঢুকে পড়ছে একদল সশস্ত্র, উচ্চকিত, দুর্বিনীত লোক...কিছু বস্তিবাসী, মারকুটে, মস্তান এবং গুরুপাঞ্জাবি পরা কিছু রকবাজগোছের ছেলেছোকরাও। অনেকের হাতে লাঠি, রড, লোহার চেন। তারা চিৎকার করছে, গালাগালি দিচ্ছে...ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও...শুকতারার ব্যবসা আর ধান্দাবাজি...চলবে না চলবে না...মানুষ মারার অপারেশন বন্ধ কর...। বলতে বলতে হুড়মুড় করে জনা চল্লিশ লোক, কয়েকজন মহিলাও ঢুকে পড়েছে নার্সিংহোমের ভেতরে...। প্রবল উত্তেজনায় বেরিয়ে এসেছে স্টাফরা, নার্স, আর এম ও সুদর্শন।

চিৎকার শুনেই ব্যালকনিতে ছুটে গেছেন শ্যামলেন্দু। নীচে থেকে তাঁকে দেখতে পেয়েই কয়েকজন চিৎকার করে উঠল, এই শালা, শুয়োরের বাচ্চা শ্যামল মুখার্জি...নেমে আয় বাঞ্চোত...পুঁতে ফেলব আজ...।

হাতে-পায়ে কাঁপুনি টের পেলেন শ্যামলেন্দু। ভয়ে নয়, অপমানে, গালাগালির ভাষায়। ছুটে বেরিয়ে গেলেন। কসবা, রাজডাঙার মানুষ আজ তাঁকে শুয়োরের বাচ্চা বলছে! মানুষ মারার ডাক্তার বলছে! নাকি যারা বলছে, তাদের ডেকে এনেছে, সেদিনের যে লোকগুলো তাঁকে শাসাতে এসেছিল তারা! এই অঞ্চলের তোলাবাজ, মস্তান আর শাসক দলের সমর্থক, প্রশাসনের মদত পাওয়া গুন্ডা-রকবাজ-ছ্যাঁচড়ারা আজ একটা ছুতো ধরে আক্রমণ করেছে আর ভয় দেখাতে এসেছে শুকতারা-তে, যারা নিয়মিত তোলা আর হিস্যা পেতে ব্যর্থ হয়েছে শ্যামলেন্দুর কাছ থেকে! আজ তারা বদলা নিতে এসেছে একটা ছুতো করে!

চেম্বারের সামনে নেমে এলেন শ্যামলেন্দু। উন্মত্ত পশুর মতো একদল মানুষ তখন ভাঙচুর শুরু করেছে নার্সিংহোমের ঘরবাড়ি... ঝন্ ঝন্ শব্দে ভেঙে পড়ছে জানলার কাচ...বিধ্বস্ত হয়েছে বাগান, গাড়ি, পাথর ছুড়ছে দোতলার দিকে। ছ-সাতজন একসঙ্গে তেড়ে এল শ্যামলেন্দুর দিকে। সরে না গিয়ে টানটান দাঁড়ালেন পশুরূপী একদল মানুষের সামনে। চিৎকার করে বললেন, এ কী করছেন আপনারা...জানেন না এখানে রুগিরা ভর্তি রয়েছেন...লজ্জা করে না আপনাদের চিৎকার করছেন, গালাগালি করছেন...কে আপনাদের গুন্ডামি করার অধিকার দিয়েছে এখানে! ভাবছেন সব মেনে নেব আমরা! সাহস থাকে আমার সঙ্গে কথা বলুন...এগিয়ে আসুন আমার সামনে।

ভিড় আর গোলমালের মধ্যে থেকে হঠাৎ শোনা গেল একটা অশ্লীল শব্দ এবং সেইসঙ্গেই...শালা খানকির বাচ্চা...অপারেশন করতে গিয়ে চিত্রা ঘোষালকে মেরে ফেলেছিস...আবার রোয়াব দেখাচ্ছিস (চার অক্ষর)...আজ তোরই অপারেশন করে দেব...! একটা বড়ো ইটের টুকরো এসে লাগল শ্যামলেন্দুর কপালের ডানদিকে ভুরুর ওপরে, তারপর ছিটকে গিয়ে পড়ল চেম্বারের কাচের দরজায়। রক্ত ঝরে পড়ছে দরদর করে। আর সেই মুহূর্তেই আর সহ্য করতে না পেরে একটা লাঠি হাতে প্রশান্ত ছুটে গিয়ে ধরল সেই ছেলেটাকে যে শ্যামলেন্দুকে গালাগালি করে ইট ছুড়েছিল। কিন্তু একা ও পারবে কেন!

গুন্ডা-মস্তানরা সংখ্যায় অনেক বেশি। মুহূর্তের মধ্যে মার খেয়ে রক্তাক্ত হল প্রশান্ত। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

শ্যামলেন্দুকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে গেল আর এম ও সুদর্শন আর নার্স। দুই বাড়ির দোতলা থেকে রুগি আর নার্সিংহোমের স্টাফরাও তখন বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে...যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা শুকতারায়...। ভাঙনের শব্দ, চিৎকার, গালাগালি। খবর গিয়েছিল থানায়।

নাহ্ থানা কিংবা পুলিশের লোক কেউ আসেনি। পাড়া থেকেও মানুষজন কেউ ছুটে আসেনি যখন শুকতারায় ভাঙচুর চলছিল... পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল মস্তান-গুন্ডাদের ভয়ে মানুষ নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আক্রমণ আর ধ্বংসলীলা দেখেছে।

দু-দিন তিনদিন ধরে শুধু ছটফট করেছিলেন শ্যামলেন্দু। প্রতি মুহূর্তে আশংকিত বোধ করেছেন স্ত্রী, ছেলেমেয়ের জন্য। আর বারবার মনে হয়েছে, এত অপমান! এত গালাগালি! এসবই প্রাপ্য ছিল সারা জীবনের মূল্যবোধ ধরে রাখার পরে?

এদেশে নার্সিংহোমে মারপিট, ভাঙচুরের কথা শ্যামলেন্দু জানেন না, শোনেননি, এমন না।

কিন্তু শুকতারা-ও যে টার্গেট হতে পারে, কখনো ভাবেননি। সামান্য বচসা, কথা কাটাকাটি...তাও মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। রাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয়। কেউ সামান্য অশালীন আচরণ করলেও শ্যামলেন্দু প্রশ্রয় দেন না। নার্সিংহোমের স্টাফদের আচরণবিধি সম্পর্কে রীতিমতো কঠোর তিনি এবং অ্যাঞ্জেলা। কিন্তু সবকিছুর পরেও কী হল!

মানুষ এত হৃদয়হীন-মারমুখী-হিংস্র হতে পারে! বাঙালি জাতি কবে থেকে এত অসহিষ্ণু পাশবিক হয়ে গেল? প্রকাশ্য দিনের আলোয় এই আক্রমণ, নোংরা ভাষাপ্রয়োগ, হিংসার প্রকাশ কলকাতা শহরের মধ্যে! এ কোন বিজনপুরী?

মনে মনে স্থির নিশ্চিত হয়েছিলেন শ্যামলেন্দু...নাহ্ আর ধীরস্থির হয়ে, শান্তভাবে এখানে তিনি কাজ করতে পারবেন না। অনেক বছর ধরে সাধনা করার মতো যে জীবন আর জীবিকায় তিনি স্থিতু হয়েছিলেন, তা কেড়ে নিয়েছে এই সময়, এই শহর।

কপালের আঘাত, সেলাই, যন্ত্রণা কিছুই তাঁকে কাবু করেনি... তিনি শক্তসমর্থ মানুষ।

কিন্তু মানসিকভাবে তিনি বিপর্যস্ত, বিপন্ন, বিধ্বস্ত আর চূড়ান্ত অপমানিত হয়েছেন জীবনে এই প্রথম। বাবা-মা তুলে তাঁকে গালিগালাজ করেছে কিছু লোক। এটা তিনি নিতে পারছেন না, পারবেনও না। মাটি সরে গেছে তাঁর পায়ের নীচে থেকে। এ মাটি তাঁর অচেনা।

এটাও জানেন শ্যামলেন্দু, এখনও অন্ধকারে শ্বাপদের মতো ওত পেতে বসে আছে শয়তান আর মস্তানের দল...মেরুদণ্ডহীন সেইসব প্রাণীরা, যাদের একবার তু-তু করে ডাকলেই, এসে সমঝোতা করবে তাঁর সঙ্গে। ক্ষমা প্রার্থনা করবে সেদিনের ঘটনা নিয়ে। আসলে মনে মনে ভাববে, শ্যামলেন্দু ভয় পেয়ে এতদিনে তাদের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে চান...তারপর...।

না, শ্যামলেন্দু তা করতে পারবেন না। করবেন না।

বিভিন্ন দিক থেকে সমস্যা সমাধান করার, মিটিয়ে নেওয়ার বার্তা আসছে তাঁর কাছে...যা হওয়ার হয়ে গেছে...এরকম তো হয়ই...তার মধ্যেও কাজ তো করতেই হবে...নার্সিংহোম তো বন্ধ হয়ে পড়ে থাকতে পারে না...। আসুন সবাই মিলে বসি এবার...।

শ্যামলেন্দু পরিষ্কার টের পেয়েছেন, এটাই আসল বার্তা— আপনার সঙ্গে আমরাও আছি...আমরা থাকলে আপনার কোনো টেনশন নেই...কোনো সমস্যা নেই...পয়সা কামান, আরামে থাকুন। শুধু আমাদেরও একটু দেখুন এই আর কি...! বুঝছেন না কেন স্যার...এটাই তো সিস্টেম এখন! মেমসাহেব বউ, গুড ফ্যামিলি... ভালো করে গুছিয়ে আছেন পৈতৃক সম্পত্তিতে, দেদার কামাচ্ছেন...। সব ঠিক আছে...কিন্তু আমাদেরই বা বাদ দিয়ে চলবেন কেন! কিছু শেয়ার তো দিতেই হয়...!

ধলভূমগড়ে গিয়ে জীবনযাপনের প্রস্তাবে একটুও আপত্তি করেননি অ্যাঞ্জেলা।

বলেছিলেন, ডেভন ছেড়ে চলে এসেছিলাম স্যাম...তোমার সঙ্গে দুনিয়ার কোথাওই গিয়ে থাকতে আমার আপত্তি নেই।

শুকতারা বন্ধ। হাতে অঢেল সময় শ্যামলেন্দুর-অ্যাঞ্জেলার। নার্সিংহোমের তিন-চারজন পার্মানেন্ট স্টাফকে তাঁরা চলে যেতে বলেননি। না, অর্থনৈতিক দিক থেকে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বিপন্ন নন। ধনসম্পত্তি আছে ইংল্যান্ডেও। অ্যাঞ্জেলার বাবা মিস্টার প্যারট ধনী মানুষ, তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী অ্যাঞ্জেলা। রানু-শানু দুই নাতি-নাতনিও তাঁর প্রিয়।

একবার সপরিবারেই আবার ইংল্যান্ড ফিরে যাওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল।

কিন্তু শ্যামলেন্দু ভেবে দেখেছিলেন, তিনি পারবেন না দেশ ছেড়ে পাকাপাকি থাকতে। দরকারই বা কী! তাঁকে টানবে শিকড়ের টান। দেশের হাওয়া জল মাটি, মেঘ বৃষ্টি...কত ভালো মানুষজনও রয়েছে...। এখনও পাথরের ব্যবসার ত্রিশ শতাংশ রোজগার আছে শ্যামলেন্দুর নিজেরই। ভবিষ্যতে এই বাড়ি নিয়েও কত কী ভাবা যেতে পারে।

রানু-শানু ইংল্যান্ডে চলে যাবে। জন্মসূত্রে ওরা ব্রিটিশ...ওদের থাকা, পড়াশোনার কোনো সমস্যা নেই ওদেশে। রানু আপত্তি করেছিল প্রথমে। শ্যামলেন্দু কথা দিয়েছেন, মেয়ের খারাপ লাগলেই তিনি গিয়ে হাজির হবেন। পৃথিবী অনেক ছোটো এখন...সব মানুষই গ্লোবাল সিটিজেন।

আজ ছ-মাস হয়ে গেল, ছেলেমেয়ে দুজনেই বিলেতে। যাওয়ার আগে কিছুদিন ওরা ধলভূমগড়, মোসাবনি, মউভাণ্ডার আর বাসাঝোরার গ্রামের বাড়িতেও থেকে গেছে। মানুষজন প্রকৃতি গাছপালা খেত নদী দেখে দুজনেই খুশি। শ্যামলেন্দু ওদের বলেছেন, দ্যাখ, আমি সত্যি কত ভাগ্যবান মানুষ! সব পেয়েছি জীবনে। পৃথিবীরও কতটা দেখেছি। আজ নতুন করে আবার চোখ খুলে গেছে। নিজের দেশের আর একটা দিক দেখার সুযোগ এসেছে সামনে। সবার কি আসে! হয়তো কিছুটা টানাপোড়েন গেল। কিন্তু সবকিছুর একটা ভালো দিক আছে। শহরে ডাক্তারি জীবনের বদ্ধতা থেকে হয়তো এভাবেই মুক্তি পেয়ে গেলাম!

অ্যাঞ্জেলার স্বভাবের মধ্যেই যে একটা গড়ে তোলার আগ্রহ আছে, শ্যামলেন্দু অনেকদিন ধরেই জানেন। বাসাঝোরের সাড়ে তিন বিঘা জমির মধ্যেই ইদানীং প্রায় এক ফার্মহাউজ গড়ে তুলেছেন তিনি। সবজি খেত ছাড়াও কলম করা ফলের গাছ লাগানো হয়েছে দূরে, দূরে। পাঁচ-ছটা গরু এবং দুটো মোষ পোষা হয়েছে। নিজেদের প্রয়োজন ছাড়া দুধ যায় অন্যত্র। গরমের দেশ, তাই বৃষ্টির জল ধরে রাখার এক অভিনব পদ্ধতিও গ্রহণ করা হয়েছে...মাটির নীচে বিশাল বড়ো ট্যাংক বানিয়ে। গাছপালা আর সবুজ খেতের মধ্যে বাসাঝোরার গ্রামে নতুন ঠিকানা হয়ে উঠেছে মেমসাহেব আর ডাক্তারবাবুর কোঠি (কুঠি)।

শীতের শেষদিকে মাঝে মাঝেই উত্তরের হাওয়া যেন দিকভ্রান্ত হয়ে দামাল ছোটাছুটি করে। অশান্ত বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে দূরে, গ্রামের প্রান্তে বড়ো বড়ো গাছগুলোর মাথায়। পত্রহীন গাছে একটা-দুটো করে লাল-হলুদের আভাস জেগে উঠছে। আকাশ গভীর নীল আর শান্ত চরাচর এখানে। দূর পাহাড়ের গায়ে শাল-মহুয়ার মাথা ছাড়িয়ে এখনও গোধূলির শেষে তারা ফুটতে দেখা যায় বাসাঝোরার আকাশে। জ্বলজ্বল করে আপন অস্তিত্বে এক ব্যতিক্রমী শুকতারা-ও।

শ্যামলেন্দু মাঝেমাঝে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকেন সেই তারার দিকে। শুকতারা তো শুধু তাঁর কর্মক্ষেত্রই ছিল না। ওই নামের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন তাঁর জন্মদাত্রী...তাঁর মা-ও। কাউকেই কি কোনোদিন ছাড়তে পারবেন শ্যামলেন্দু! একটা দীর্ঘশ্বাস তবু বারবার বেরিয়ে আসতে চায় তাঁর বুক খালি করে। অ্যাঞ্জেলাও তা টের পান। তা সত্ত্বেও শহর ছেড়ে বহু দূরে চলে আসা গ্রাম্যজীবন অর্থবহ হয়ে ওঠে...বাসাঝোরার প্রকৃতি তাঁদের আপন করে নেয়।...❖

ছবি : পুণ্যব্রত পত্রী

শুনেছি আমাদের ছোটো পিসিমা দেখতে একেবারেই ভালো ছিলেন না। বেশ কালো, পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি মোটে হাইট, মুখটা নাকি নেংটি ইঁদুরের মতো, গলার স্বরও কেমন কিচিমিচি মতো। আমার বড়ো জ্যাঠামশাই বলতেন, মনুটার নির্ঘাৎ ইঁদুর বংশে জন্ম। তা জ্যাঠামশাই বলতেই পারেন, কেননা তিনি ছিলেন টকটকে ফরসা, স্বাস্থ্যবান, এতখানি লম্বা-চওড়া একটি দশাসই অট্টহাস্য মানুষ। রাঙা পিসিমাও অমনি সুন্দরী। নরম তুলতুলে চেহারার জন্যে তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল পাঁকী, ফুল পিসিমাও চলনসই। বড়ো পিসিমা অত লম্বা-চওড়া না হলেও, এই বয়সেও দুধের মতো ফরসা। আমার বাবা ফরসার দিকেই, একটু বেঁটে, কিন্তু চমৎকার কাটা কাটা মুখচোখ। 'শুনেছি' কথাটা আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা জানি না। না করে থাকলে খেয়াল করুন। আমি যে এঁদের দেখিনি তা নয়। কিন্তু বছর পাঁচেক বোধহয় বয়স তখন, আমার দেখা ওঁদের দেখার সঙ্গে একেবারে মিলত না। আমি অবাক হয়ে শুনতাম ওঁরা ছোটো পিসিমাকে খারাপ-দেখতে বলছেন। আমি দেখতাম ছোটো পিসিমা এক অবাক সুন্দরী। রাঙার মতন গরম গরম নয়, কেমন ঠান্ডা ঠান্ডা ওই পাঁকেরই মতো। গরমের দিনে ছোটো পিসির গা ঘেঁষে বসো, আরাম পাবে। আর রাঙা পিসি বাপের বাড়ি এলেই কী দাপট যে তাঁর! তাঁর যমজ ছেলেদের নাম বাঘ-ভাল্লুক, তারা এসেই আমার পুতুল ভেঙে দিত। তারপর সারা দিন ধরে চলত সেই পুতুল জোড়া দেওয়ার কাজ। ফুল পিসিমা তো থাকতেন সেই রাঁচিতে। খুব কম আসতেন। আর এলেই রাঁচির প্রশংসা আর আমাদের কলকাতার নিন্দে। রাঁচিতে নাকি উদ্বাস্তু মোটে নেই। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন। লোকও তো বেশি নয়। কলকাতাতে কি মানুষে থাকে? ম্যাগো! বড় পিসিমা বিধবা মানুষ, থাকতেন এলাহাবাদ। অনেক বড়ো সংসার। আসতে পারতেন না। কিন্তু এলে অনেকদিন করে থেকে যেতেন। আর সেই সময়টা তাঁর শুচিবাইয়ের জেরে প্রাণান্ত হত আমাদের। হাত ধুয়ে ধুয়ে হাতে হাজা হবার জোগাড়। ঠাকুরদামশাই ছোটো পিসিমাকে বীণাপাণি পরদা স্কুলে পাঠাতেন তো বটেই। বাড়িতে ওস্তাদ রেখে গান শেখাবারও ব্যবস্থা করেন। তাঁদের ধারণা ছিল রূপের অভাব গুণ দিয়ে পূর্ণ করতে হবে। তবেই ভালো পাত্র উড়ে এসে পড়বে। অনুনাসিক স্বরে ছোটো পিসিমা একরকমের ওস্তাদি গান করতেন বটে কিন্তু তা আমাদের মোটেই ভালো লাগত না। আমার মনে হত, ছোটো পিসিমার সব ভালো ওই গানটুকু ছাড়া। অনেক সময়ে সন্ধেবেলায় ওস্তাদজি এসে তাঁর ছাত্রীকে তালিম দিতে বসলে আমি মায়ের কাছে নাকি সুরে ঘ্যান ঘ্যান করতে শুরু করতাম। ও মা, ছাত্রীকে বলো না 'তেরে নুম' জাঁল্লা দিয়ে নীচে ফেলে দিতে।

যাঁর সম্পর্কে এত কথা হচ্ছে সেই ছোটো পিসিমা কিন্তু এইসব বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলেন। কিছুতেই যেন তাঁর কিছু এসে যেত না। কী যে এত ভাবতেন, কোন লোকে যে উধাও হয়ে থাকতেন, ভগবান জানেন।

—ও মনু, একটু পরিবেশন করে দিয়ে যা না মা...

—যাই মা, সঙ্গে সঙ্গে সাড়া এল, ঠাকুমা একটু অপেক্ষা করে বিরক্ত সুরে বললেন—কী বলব এ মেয়েকে? আঠারো মাসে বচ্ছর—ফাস্ট ব্যাচ গিয়ে সেকেন ব্যাচ বসবার সময় হয়ে গেল...তা তিনি আজও আসচেন, কালও আসচেন।

তা, সেকেন্ড ব্যাচ বসবার সময়ে ছোটো পিসিমা এসে গেলেন। এবং ছোটোদের পাতে বেশ করে নিমবেগুন আর বড়োদের পাতে গাঁদাল পাতা দেওয়া শিঙি মাছের ঝোল দিয়ে বসে রইলেন। ঠাকুমার মাথায় হাত। শেষে সিদ্ধান্তে এলেন—মেয়েটা একেবারে উদোমাদা।

আমার জেঠিমা বলতেন—ও সব কিছু নয় মা। মনুর বিয়েটা এবার দিয়ে দিন। বিয়ের বয়স তো সেই কবেই হয়ে গেছে...

—তোমার শউর ঠাকুরকে বলগে যাও বড়ো বউমা, তিনি তো কোট ধরে আচেন, মেয়ে কালো বলে তাকে বিদ্যে দিগগজ না করে ছাড়বেন নে। কুটুমপক্ষ লক্ষ্মী না হোক, সরস্বতী ঠাকুর তো পাবে! নমো নমো করে তুলে নিয়ে যাবেখন।

—আহ মা, আমার মা প্রতিবাদ করতেন আস্তে করে, সে কাছে-পিঠেই কোথাও আছে। এমন করে বলবেন না। দিদি, তুমি কী গোও? চুপ করো না!

ইতিমধ্যে ছোটো পিসিমা ভালো করে হাত ধুয়ে এসেছেন। তাঁর ধারণা ঠাকুমা শুচিবেয়ে মানুষ, তিনি ধরে নিয়েছেন ছোটো পিসিমা হাত-টাত ধোননি। তাই রাগারাগি করছেন।

এসেটেসে সব শুনে ছোটো পিসিমা একগাল হেসে বললেন—ঠিক আছে। বাচ্চারা তেতো খাবে না এই তো কথা! সেদ্দ ঝোল খাবে। বুঝেছি, এই দিই।

এবার বড়ো কাতলা মাছের মুড়োখানা তিনি কুট্টিকাকার পাতে পাস করে দিলেন। ঠাকুমা আর পারলেন না, ছুটে এসে খুন্তির বাড়ি দিয়ে দিলেন মেয়ের পিঠে এক ঘা—বলে মুড়োখানা কাত্তিকের জন্যে আলাদা করে তুলে রাখলুম আর তুই পোড়ারমুখি সেটা কুট্টিকে দিয়ে দিলি?

কাত্তিক হচ্ছে ঠাকুমার প্রিয় ছেলে, কোলপোঁছা ছোটোটি, যদিও তার গোঁফ-দাড়ি সবই গজিয়ে গেছে। কুট্টিকাকা অপ্রস্তুত হয়ে বলল—আরে আমি ওটা ছুঁয়ে দেখিনি, নে তো কাত্তিক, তুলে নে।

যা যা, তুই তোর সেলাই-ফোঁড়াই করগে যা, আর পরিবেশন কত্তে হবে না। ঠাকুমা রেগেমেগে বললেন।

ছোটো পিসিমা একটু বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে কখন চলে গেছেন কেউ আর খেয়াল করে না। শেষ পর্যন্ত ঠাকুমা এবং পাড়া-প্রতিবেশীর বাক্যবাণ সইতে না পেরে ঠাকুর্দা সংকল্পচ্যুত হলেন, এবং কোনোমতে গ্র্যাজুয়েশনের গণ্ডি পার করেই ছোটো মেয়ের বিয়ের ঠিক করে ফেললেন।

আমার তখন ওই সাত-আট বছর বয়স হবে, তেমন কিছু মনে নেই। খালি শুনতে পেতুম, কালো মেয়ে বলে ঠাকুর্দাকে নাকি অনেক টাকা বরপণ দিতে হয়েছে, গয়নাগাটিও প্রচুর। তার ওপর একশো সত্তরখানা ঢাকাই শাড়ি নমস্কারি বাবদ। আর সেই জন্যেই বিয়েবাড়িতে রোশনাই নেই তেমন, নহবত বসেনি, মাছ মোটে দু-রকম, মিষ্টিও দু-রকম বই নেই, এ বাড়ির সিগনেচার রাবড়ি হয়নি।

আর তেমন কিছু মনে নেই, কিন্তু বরটি অর্থাৎ পিসেমশাইটিকে ভালোই মনে আছে। খুব অদ্ভুতদর্শন বলে মনে হয়েছিল আমার। হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। পরে শুনেছি মানুষটির বীরভূমের দিকে নাকি ইটভাটার ব্যবসা আছে। কারবার ফলাও করতে টাকার দরকার ছিল, তাইতেই বিরাট একটা ডাউরি নিয়ে গ্র্যাজুয়েট মনু মিত্তিরকে তিনি বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলেন। কে যেন বলতে বলতে গেল, এ তো মনুর চেয়েও এক কাঠি সরেস রে, ডাউরিটা তো ওরই দেওয়ার কথা! ম্যাট্রিক ফেল পিসেমশাই কিন্তু পিসিমার চেয়েও এক পোঁছ কালো। কোন দিকে তাকিয়ে আছেন বোঝা যায় না। পায়ের কিছু একটা ডিফেক্ট আছে, চললে বোঝা যায়। কিন্তু পিসিমার ডবল লম্বা, বেশ হাঁকডাক করনেওয়ালা, হাট্টাকাট্টা। ঠাকুমা নিভৃতে খুব কান্নাকাটি করেছিলেন নাকি। মনুর জন্যে এর চেয়ে ভালো বর পেলে না? আমার গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। তাতে ঠাকুরদা বলেন—যেমন তাড়া করলে! রয়ে-বসে ধীরে-সুস্থে যে পাঁচটা দেখব শুনব সে উপায় তুমি রেখেছিলে গিন্নি?

এরপর ছোটো পিসিমাকে খুব মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসতে দেখতাম। বদলের মধ্যে আরো অন্যমনস্ক। একটা

মনুর বিয়েটা এবার দিয়ে দিন
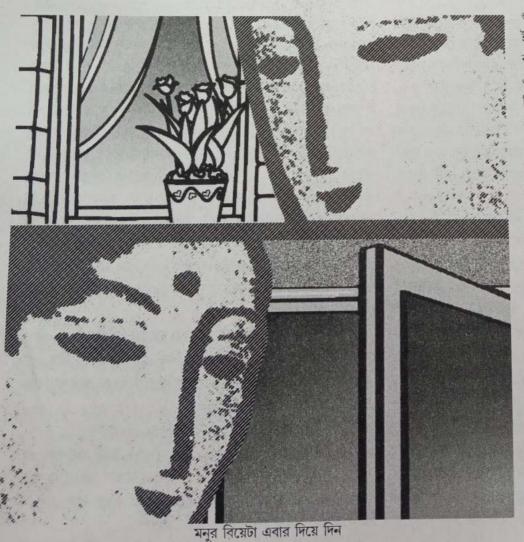
জিনিসেই আগ্রহ, সেটা হল গান। নিজেও থেকে থেকে গুনগুন করেন, আমাদেরও গাইতে বলেন। আমার জেঠতুতো দিদি বেশ ভালো গান শিখেছিল। সন্ধেবেলা হারমোনিয়াম নিয়ে বসত। বেশ আসর হত গানের। ছোটো পিসিমা গা ধুয়ে কস্তাপেড়ে শাড়িটি পরে এসে বসতেন। দেখলে মনে হত এইবার তিনি একটা মনের মতো কিছু পেয়েছেন। একটার পর একটা ফরমাশ করতেন ছোটো পিসিমা—ওরে তিন্নি ভালো করে একটা রবীন্দ্রসংগীত গা তো দেখি। তিন্নিদি সবে অন্তরা অবধি পৌঁছেছে, ছোটো পিসিমা ছটফট করতে করতে বলে উঠলেন— পান্নালালের শ্যামাসংগীত তুলেছিস নাকি রে অনু, ধর দিকিনি একটা।

—ওঃ পিসিমা, তিন্নির গানটা শেষ হতে দাও।

তিন্নিদি রাগ করে বলত—দূর, আমি আর গাইব না।

অনুপমদা হয়তো একটা শ্যামাসংগীত ধরেছে ভাব দিয়ে, কিছুক্ষণ পরেই ছোটো পিসিমা অন্যমনে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর খুরখুর খুরখুর করে ঘর থেকে বেরিয়ে কোথায় চলে গেলেন ভগবান জানেন। কাজে কাজেই গানের আসর বসাতে আমাদের আর উৎসাহ হত না। যদিও ছোটো পিসিমা রোজই আমাদের গাইতে বলতেন, নিজেও গলা মিলিয়ে মাঝে মাঝে গেয়ে উঠতেন। রেওয়াজি গলা, শিখেছেনও অনেক গান। আমরা তখন ধরে বসতাম—ছোটো পিসিমা, তুমি একটা গাও বরং।

তো ছোটো পিসিমা একখানা গেয়ে উঠলেন। আমাদের ফরমায়েশি তুমি আর আমি মার্কা একখানা আধুনিক। গলাটা নাকিমতো হলেও তাঁর গলায় কাজ খুব, আধুনিক তো খুবই খোলে। উনি বেশ খেলিয়েই গাইছিলেন, কিন্তু সঞ্চারীতে এসে চুপ করে গেলেন—আর গাইব না। টুলু গা বরং। কী যে হল, একেবারে গুম।

ঠিক আছে, টুলটুলদিদি গাইছে—আজ কি তাহার বারতা পেল রে কিশলয়, ওরে ও কিশলয়, ওরা কার কথা কয় রে বনময়! মুখড়া শেষ হল না, পিসিমা গুনগুন করতে করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সবচেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেত গাইয়ে নিজে। ওই গানেরই ফরমাশ দিয়ে পিসিমা গান শুরু হতে না হতেই পগার পার? ভালো লাগেনি, না কি? টুলটুলদিদি কাঁদো কাঁদো স্বরে জিজ্ঞেস করে—

—কীরে? গানটা কি ভুলভাল গাইলুম, না সুরে লাগল না? ছোটো পিসিমা যে উঠে গেল?

আমরাও কি আর ভ্যাবাচ্যাকা খাইনি। গান বেশ জমে উঠেছিল। কেউ কিছু বুঝতে পারিনি।

আমার সাহস একটু বেশি। একদিন ছোটো পিসিমা উঠে যাওয়ার একটু পরেই আমি উঠে যাই। আজ একটা হেস্তনেস্ত করবই।

পাশের ঘরটা জেঠিমার। তিনি এখন রান্নাঘরে ব্যস্ত, কাজেই ঘর ফাঁকা। দেখি, দূরে জানলার গরাদ ধরে ছোটো পিসিমা দাঁড়িয়ে আছেন। কাছাকাছি গিয়ে বলি—ও ছোটোপি, তুমি কেন উঠে এলে? টুলটুলদি তো কেঁদে ফেলেছে। পিসিমা এমন চমকে উঠেছেন যেন কাছাকাছি বাজ পড়েছে। আমার দিকে ফাঁকা চোখে চেয়ে বললেন—হ্যাঁরে বুলবুল তুই শুনতে পাসনি না?

—কী শুনব?

—কে যেন, ওই গানটাই গাইছিল, সব সময়ে এমনি হয়। কেউ একটা গান ধরল, হয় তো আমি নিজেই ধরেছি, কে কোনখান থেকে সেটা গেয়ে উঠল, আর সে যে কী মনকাড়া প্রাণকাড়া, না শুনে পারি না। খুব মন দিয়ে শুনতে হয়, নইলে—মিলিয়ে যায়।

—এখনো শুনতে পাচ্ছো? আমি অবাক হয়ে বলি।

—পাচ্ছিলুম, তুই এসে কথা বললি, ব্যাস ঘোরটা ভেঙে গেল।

কাউকে কিছু বলি না। নিজেই সাত-পাঁচ ভাবতে বসি। মনে হয় এটা পিসিমার গোপন কথা, পিসিমা সে কথা বলেননি, কিন্তু কথাটা আর কারুর কাছে প্রকাশও তো তিনি করেননি! গোপনীয়তাটা রক্ষা করা আমার উচিত।

বছর দুই-তিন পরের কথা। একদিন বাড়িতে হইহই। কী? না পিসিমার শ্বশুরবাড়ি থেকে তাঁর দেওর কী সব খবর নিয়ে এসেছে।

বছর উনিশ-কুড়ির ছেলেটি। গাঁয়ের ছেলে, একটু তো গ্রাম্য হবেই। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—বউদি কথা বলছে না। দাদাও কান্নাকাটি করছে। আমরা কিচ্ছু বুজতে পারছি না, বেয়াইজেঠু।

ঠাকুর্দা বললেন—তা, ডাক্তার ডাকো, লোক্যাল ডাক্তারে না হলে হাসপাতালে দিতে হবে।

—ডেকেছিলুম তো। ডাক্তারবাবু বললেন—এ আমাদের কেস না।

—মানে?

—মানেটাই তো বুজতে পারলুম না। একটু চলুন আপনারা। আমরা খুব আতান্তরে পড়েছি।

বাবা বললেন—ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। বুলি, তোর মাকে তৈরি হয়ে নিতে বল। ওকে যদি কিছু বলে।

আমি বাবার হাত ধরে ঝুলে পড়ি,—আমিও যাব, অঝোরে কাঁদতে থাকি।

সকলেই জানে ছোটোপিকে আমি একটু বেশি ভালোবাসি, আর বাবাও আমাকে একটু বেশিই...বাবা বললেন—চলুক, বুলবুলিটা যদি ওর মুখে বুলি ফোটাতে পারে।

দেখলাম। দেখলাম ছোটো পিসিমা পিঠ সোজা করে জোড়াসনে বসে আছেন, চোখদুটো বোজা। মুখটা যে কী অপূর্ব দেখাচ্ছে, বলে বোঝাতে পারব না, হাতদুটো কোলের ওপর জোড় করা। আর আমার হাট্টাকাট্টা পিসেমশাই সামনে বসা, দু-হাত জোড়, চোখ দিয়ে অনর্গল জল পড়ছে। মা আর বাবা পরস্পরের দিকে চাইলেন একবার, আমি বুঝে গেলাম, ছোটো পিসিমা সেই অশ্রুত সংগীত শুনতে পাচ্ছেন। এখন আর কারো গাওয়া গানের সুর ধরে তাঁকে আসতে হচ্ছে না। ❖

গল্প

প্রেম

সমীর গোস্বামী

ছবি : সুব্রত পত্রী
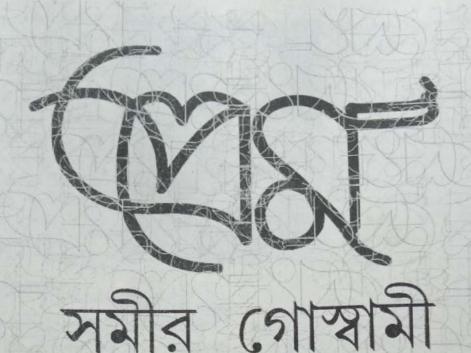
পারমিতার বিয়ের দিন অরিন্দম সকাল থেকে ঘরে ঢুকে বসেছিল। আর বেরোয়নি।

ছোটো গ্রাম। সকাল থেকেই হইচই, শাঁখ-উলুর যত আওয়াজ ভেসে আসছে, অরিন্দম ততই মনমরা হয়ে পড়ছে।

ক্রমে সন্ধে নামল। মা এসে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁরে কী ব্যাপার? চুপ করে সারাদিন শুয়ে কাটাচ্ছিস? রেডি হ। নেমন্তন্নে যাবি না?"

কী আর উত্তর দেবে অরিন্দম। বলল, "আমার শরীরটা ভালো নেই। তোমরা যাও।"

—তা কী করে হয়? ডাক্তারবাবু নিজে এসে সকলকে নেমন্তন্ন করে গেছেন। না গেলে ভালো দেখায় নাকি?

অরিন্দম একটু প্রায় ঝাঁঝের সুরে বলল, "বলছি আমার শরীর ভালো নেই।"

মা কী আর বলবেন? একটু চুপ করে থেকে বললেন, "ঠিক আছে। তাহলে আমরা সকলে যাচ্ছি।"

রাত্রে ফিরে আসার সময় অরিন্দমের জন্যে খাবার নিয়ে এসেছিল। বাবা বলল, "জানিস, ডাক্তারবাবু নিজে প্যাক করিয়ে দিলেন।"

খেতে অরিন্দমের একেবারেই ভালো লাগছিল না। কিছুটা নেড়েচেড়ে সবসুদ্ধ মুড়ে ফেলে দিল।

অরিন্দমের কানে গেল, পোশাক পাল্টাতে পাল্টাতে মা-বোনেরা আলোচনা করছে, "কী সুন্দর লাগছিল মেয়েটাকে। সাক্ষাৎ যেন লক্ষ্মী প্রতিমা।"

পরদিন সকাল হতেই অরিন্দম আনমনে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় দু-কিলোমিটার দূরে আকন্দপুরে চলে গিয়েছিল। জায়গাটা একটা গঞ্জ। অরিন্দম সেখানে একটা চায়ের দোকানে চুপচাপ বসে দু-তিন কাপ চা-ই খেয়ে ফেলল।

মাঝে মাঝে চেনা লোক ওকে জিজ্ঞেস করছে, "কী ব্যাপার! সাতসকালে এখানে?" অরিন্দমের ভালো লাগছিল না। একটু মুচকি হেসে বা মামুলি দু-একটা উত্তর দিতে দিতে, হঠাৎই চোখে পড়ল ফুল দিয়ে সাজানো বর-কনের গাড়ি। অরিন্দম যা ভেবেছে তাই। ওরই মধ্যে পারমিতাকে এক ঝলক দেখতে পেল। মনে মনে বলল, সত্যি বিয়ের সাজে কী অপূর্ব দেখতে লাগছে ওকে।

অরিন্দম মনে মনে ভাবছে, "ও তো চিরকালই সুন্দরী। কিন্তু বিয়ের পিঁড়িতে বসে বা গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সময় কি একটুও ওর কথা পারমিতার মনে পড়ল না?"

চুপ করে আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে অরিন্দম বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

পারমিতার সঙ্গে ওর পরিচয়—সে এক গল্প।

বাল্যপ্রেম সম্বন্ধে অরিন্দম অনেক আলোচনা শোনে, আর মনে মনে হাসে। আরে ও নিজেই তো তার সাক্ষী।

অরিন্দমরা কলকাতাতেই থাকত। কিন্তু বাবা দীর্ঘদিন অসুখে ভোগার পরে ডাক্তার সম্পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন। বাবা লম্বা ছুটিতে থাকার ফলে 'উইদাউট পে' হয়ে গেছেন। সংসার চলবে কী করে? ব্যয় বিশাল, আয় শূন্য। অগত্যা সিদ্ধান্ত নিতে হল, শহরের পাততাড়ি গুটিয়ে দেশের বাড়িতে চলে যাওয়ার। সেখানে যৌথ পরিবারে থাকা। অর্থের প্রয়োজন নেই। জমির আয় থেকেই সব খরচা চলে।

যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। কয়েকদিনের মধ্যেই ওরা গ্রামে পৌঁছে গেল। দু-চারদিন ভালোই কাটল, ভাই-বোনেদের সঙ্গে খেলে।

অরিন্দম তখনও স্কুলে পড়ে না। কাকা একদিন সকালে চা খেতে বসে কথা তুললেন, "আরে ছেলেগুলোকে তো এখানকার স্কুলে ভর্তি করে দিলে হয়। মাসে একটাকা তো মোটে মাইনে।"

অরিন্দমের মা-ও সোৎসাহে লাফিয়ে উঠলেন—"ঠিক বলেছ ঠাকুরপো। তুমিই গিয়ে ভর্তি করে দিয়ে এসো।"

মর্নিং স্কুল। পরদিন সকালে কাকা অরিন্দম আর ওর ভাইকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। অরিন্দম ক্লাস থ্রি, আর ওর ভাই ক্লাস টু। সেশন শুরু হবার পরে প্রায় মাসদুয়েক ক্লাস হয়ে গিয়েছিল। তবে তিরিশ বছর আগের কথা। আর গ্রামের স্কুল। তার ওপর কাকা গ্রামে কিছুটা মাতব্বর জাতীয় ছিলেন। ফলে ভর্তি হতে কোনো সমস্যাই হল না।

হেডমাস্টার বললেন, "আজই ক্লাসে গিয়ে বসুক। যেহেতু আগে স্কুলে যায়নি, আজ বই-খাতা ছাড়াই গিয়ে ধাতস্থ হোক। কাল থেকে বই-খাতা নিয়ে আসবে।"

অরিন্দম ক্লাসে গিয়ে দেখে, ঘর-ভর্তি ওরই বয়সি ছেলে-মেয়ে। অত ছেলে-মেয়ের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়ে, অরিন্দম একটু হকচকিয়েই গিয়েছিল। ক্লাসে তখন মাস্টার ছিলেন না। ও কোথায় বসবে বুঝতে পারছে না। দরজা দিয়ে ঢুকে বোকার মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

হঠাৎ দেখে গোপেশ্বর চেঁচাচ্ছে, "এদিকে আয়, এদিকে আয়।"

গোপেশ্বরকে পেয়ে অরিন্দম একটু ভরসা পেল। গোপেশ্বর ওর চেনা। বিকেলে একসঙ্গে খেলে। গোপেশ্বর পাশের ছেলেদের ঠেলেঠুলে বসার একটু জায়গা করে দিল। অরিন্দমের শুধু সেইদিনই নয়, পাকাপাকি ওখানে বসার জায়গা হয়ে গেল।

দু-চারদিন স্কুলজীবন কাটতে না কাটতেই অরিন্দম একটু পোক্ত হয়ে গেছে।

আজকে মনে পড়লে, অরিন্দম বুঝতে পারে সেই সময়ও গ্রামের স্কুলের ছেলেমেয়েগুলো ছিল বেশ পাকা। কয়েকটি গেছো ছেলে সব ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বর-বউ সম্পর্ক পাতিয়ে দিয়েছে। আর সারাক্ষণ তাই নিয়ে একে, অপরকে খেপিয়ে মারছে।

হঠাৎই ওদের খেয়াল হল, অরিন্দমের বউ হবে পারমিতা।

পারমিতাকে ওরা গ্রামেরই কোনো ছেলের সঙ্গে জুড়ে দিতে ভয় পেয়েছিল। কারণ পারমিতা অধীর ডাক্তারের মেয়ে। গ্রামের একমাত্র পাশ করা ডাক্তার। তখন গ্রামে ডাক্তারদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ। ডাক্তারবাবু খাকি হাফপ্যান্ট, হাঁটু ছুঁই ছুঁই খাকি মোজা, মাথায় হ্যাট, পেছনে হেঁটে বাক্স নিয়ে সহিস সহ ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করতেন। রাস্তার লোকেরা পথ ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে নমস্কার করত।

সেহেন ডাক্তারবাবুর মেয়ের সঙ্গে গ্রাম্য ছেলেকে বর হিসেবে মনোনীত করা যায়নি।

অরিন্দমের সঙ্গে পারমিতাকে জুড়ে দেওয়ার পেছনে যথেষ্ট কারণ ছিল।

অরিন্দমকে বেছে নেওয়ার কারণ হচ্ছে সে সরাসরি কলকাতা থেকে এসেছে। কলকাতাতেই তার জন্ম এবং আট বছর কেটেছে। কলকাতাকে গ্রামের ছেলেমেয়েরা তখন প্রায় লন্ডনের সমকক্ষ বলে মনে করত।

গ্রামে লাইট এসেছে অনেক বছর পরে। তখন ছিল হ্যারিকেনের আলো। পালা-পার্বণে হ্যাজাক বলে একটু উজ্জ্বল আলো জ্বালানো হত। কাঁচা রাস্তা। অল্প বৃষ্টিতেই রাস্তায় কাদা হয়ে পিছল হয়ে যেত। যানবাহন বলতে ভরসা গরুর গাড়ি। না হলে পায়ে হাঁটা। তখনকার লোকেদের পায়ে হেঁটে কয়েক মাইল যাওয়া কোনো ব্যাপারই না।

এহেন জায়গায় কলকাতার অরিন্দমের সঙ্গে ছাড়া ডাক্তারবাবুর মেয়েকে কার সঙ্গেই বা দেওয়া যায়?

সবাই যখন নতুন জুড়ি নিয়ে চেঁচাত, ওরা দুজনেই তখন লজ্জা পেতো। পারমিতা লজ্জা পেলে ওর ফর্সা গাল দুটো লাল হয়ে যেত। অরিন্দমও মিটিমিটি লাজুক হাসত। এর মধ্যে একদিন কেলেঙ্কারি হল।

সবাই মিলে অরিন্দম আর পারমিতাকে খেপাচ্ছিল। অরিন্দমের পাশে বসা গোপেশ্বরই বেশি। পারমিতা গ্রামের গাছের ছোটো খেজুর খাচ্ছিল। গোপেশ্বর ক্রমাগত পেছনে লাগছিল বলে, পারমিতা ওকে খেজুরের বিচিটা ছুঁড়ে মারতে গেল। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ঢুকে গেল অরিন্দমের বুকপকেটে। আর যায় কোথায়! ক্লাসে এমন হুল্লোড়, চেঁচামেচি যে ক্লাস টিচার ছুটে এলেন। মজার চেঁচানি দেখে, সবাইকে চুপ করে থাকতে বলে চলে গেলেন।

এদিকে পারমিতা লজ্জায় বেঞ্চে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়েছে। অরিন্দম সলজ্জ হাসিসহ পকেট থেকে খেজুরের বিচিটা বার করে ফেলে দিল।

দুজনের যে প্রথম কী করে কথা হল, সেকথা আর অরিন্দমের মনে নেই।

দুজনের বাড়ি ছিল স্কুলের কাছেই। টিফিনে যাদের বাড়ি কাছে, তারা সবাই বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসত। কিন্তু দুজনের মধ্যে ভাব হয়ে যাওয়ার পরে, দুজনেই টিফিনে বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিল। অরিন্দম সকালেই খাবার নিয়ে আসতে শুরু করল।

পারমিতার খাবার টিফিনের সময় তাদের বাড়ির এক কাজের লোক নিয়ে আসত। ওরা দুজন একসঙ্গে বসে খেতে খেতে গল্প করত। কারণ ক্লাস তখন ফাঁকা। ছুটির পরেও যখন সবাই বাড়িমুখো, তখনও ওরা পাঁচ-দশ মিনিট গল্প করে বাড়ির দিকে যেত।

কয়েকদিন পরে ওরা দুজন বিকেলেও দেখা করা শুরু করল। আগে অরিন্দম বিকেলে ভাই-বোনেদের সঙ্গে ছোটাছুটি করে খেলত। পরে অপেক্ষা করত কখন পারমিতা আসবে!

অরিন্দমের খুব পছন্দের একটা বড়ো ও মোটা পেনসিল ছিল। সচরাচর ওরকম পেনসিল দেখা যায় না। কলকাতা থেকে কিনেছিল। একদিন হঠাৎ সেটা হারিয়ে গেলে অরিন্দম তো খুঁজলই, পারমিতাও তন্ন তন্ন করে স্কুলে খুঁজল। পাওয়া গেল না বলে শুধু অরিন্দমের নয়, পারমিতার মনও খুব খারাপ।

বছর প্রায় শেষ হবার মুখে, অরিন্দমের বাবার অফিসে জয়েন করার সময় হয়ে গেল। ওরা গ্রামের পাততাড়ি গুটিয়ে আবার ফিরে এল কলকাতায়।

বছর শেষ হয়ে গেলে, অরিন্দম কলকাতার স্কুলে ক্লাস ফোরে ভর্তি হল।

অনেকদিন আর গ্রামে যাওয়া হয় না। অরিন্দমের বাবার ছুটি সব শেষ হয়ে গেছে। ওরা গেল সেই দুর্গাপুজোর সময়।

অরিন্দম ভাই-বোন সহ সপ্তমীর সকাল থেকেই ঠাকুরবাড়ির পুজো দালানে। গ্রামের বন্ধুরা সবাই একেবারে মাতোয়ারা। কতদিন পর দেখা! পারমিতার কথা অরিন্দমের মনে আসেনি।

মনে এল সন্ধেবেলায়। পারমিতা যখন মা-কাকিমাদের সঙ্গে ঠাকুর দালানে এসেছে আরতি দেখতে তখন দুজনের চোখাচোখি হতেই, দুজনেই আবার লজ্জায় আড়ষ্ট।

কিছুক্ষণ পরে অরিন্দম এগিয়ে গিয়ে কথা বলল। আরো আশ্চর্য

ওইটুকু বয়সেই ওরা দুজন দুজনকে 'তুই' করে কথা বলতে পারত না। 'তুমি'-ই বলত।

একবার কথা বলতেই দুজনেই গলে জল। দুজনেরই আরতি দেখা বন্ধ। পুজোর কটা দিন রোজ সন্ধেতেই দেখা হতে লাগল নিয়মিত।

দুজনেরই তখন ক্লাস ফোর। সরকারি বই। ফলে দুজনেরই এক বই। কিন্তু অরিন্দম অত শক্ত শক্ত বই কী করে পড়ছে, তার জন্য পারমিতার বিস্ময়ের শেষ থাকত না।

দুর্গাপুজোর পরে আবার কলকাতায় ফিরে আসার পালা। দুজনেরই মন খারাপ।

এভাবে সময় এগোতে থাকে। অরিন্দমদের গ্রামে যাতায়াত সারা বছরে দু-একবার। তখন প্রেম এখনকার মতন প্রকাশ্যে করা যেত না। সমাজে নিন্দনীয় বিষয়। মহিলা মহলে মুখরোচক আলোচনা চলবে। অভিভাবকদের চোখে গুরুতর অপরাধ।

চিঠির চল থাকলেও, অরিন্দমের দেওয়ার উপায় নেই। ডাক মারফত পাঠালে কার হাতে পড়বে ঠিক নেই। মোবাইল তো দূরের কথা, ল্যান্ডফোনই গোটা তল্লাটে মেলা ভার।

তবে গ্রামে গেলে দুজনেরই দেখা করার আপ্রাণ প্রয়াস থাকত। কারণ সবটাই তো লুকিয়ে-চুরিয়ে।

পারমিতারা থাকত পশ্চিমপাড়ায়। ওদিকটা ছিল একটু ফাঁকা। গ্রামের অন্য জায়গার চেয়ে নিরিবিলি। অরিন্দম ওদের পাড়ায় যেত বিকেল আর সন্ধ্যার প্রাক্কালে। কারণ ভর সন্ধ্যায় একা মেয়ে বাইরে যাবার বাড়ি থেকে অনুমতি পাবে না।

দেখা করাটাও হাস্যকর। পারমিতা অরিন্দমদের গ্রামে আসার খবর লোকমুখে পেয়ে যেত। কিন্তু ওদের পাড়ায় গিয়ে অরিন্দমকে কিছুক্ষণ ঘুর ঘুর করতে হত, যতক্ষণ না গোপেশ্বর সেখানে আসছে। অন্য কাউকে বলা যাবে না। তাহলে পাঁচকান হয়ে যাবে। গোপেশ্বরের ওই সময় পারমিতার বাড়িতে যাওয়াটাই ছিল একটা সিগন্যাল। পারমিতা বুঝে যেত আগমনবার্তা। দু-একটা মামুলি কথা বলে গোপেশ্বর বেরিয়ে এসে বলত, "যা, কাজ করে দিয়েছি।"

এর জন্য গোপেশ্বর কম পেছনে লাগত না। মাঝে মাঝে ওকে খাওয়াতে হত। তবে তখন এতরকম খাবার দোকান ছিল না বলে রক্ষে। শুধু ছিল দুটো মিষ্টির দোকান। সোনা ময়রার দোকানটাই ভালো। ওর দোকানেরই মিষ্টি খাওয়াতে হত।

পারমিতাকে দেখেই অরিন্দম বুঝতে পারত একটু সেজে এসেছে। মানে শাড়ি পাল্টে, চুল আঁচড়ে আসা। পারমিতা আগে ফ্রক পরত। প্রথম যেবার অরিন্দম ওকে শাড়ি পরে দেখল, সে কী ভালো লাগা! অরিন্দম ভুলতে পারে না।

দেখা হওয়ার মুহূর্তে পারমিতার চোখে-মুখে লেগে যেত আনন্দের ছটা। প্রথমে কারোর মুখেই কথা নেই। দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে মুখে মিটিমিটি হাসি নিয়ে।

তারপর দুজনে আবোল-তাবোল বকে ফিরে আসত। বেশিক্ষণ থাকার উপায় নেই। তাতেই যে দুজনার কী ভালো লাগত!

অরিন্দমদের সাকুল্যে তিন-চারদিন গ্রামে থাকা। তারমধ্যে বড়জোর দেখা হত দিন দুয়েক।

একবার অরিন্দম জোর করে মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়েছিল। পারমিতার কপট রাগ, "এই কী হচ্ছে কী? লোকে দেখে ফেলবে না?"

আরেকবারের কথা। পারমিতাদের বাড়ির দিকে যেতে যেতে দেখে মুখার্জি কাকাদের বাগানে বেড়ার ধারেই গোলাপ ফুটে রয়েছে। কী মনে হল, অরিন্দম এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফুলটা ছিঁড়ে নিল।

এগিয়ে যাওয়ার একটু পরেই, গোপেশ্বর হাজির। অরিন্দম তাড়াতাড়ি ফুলটা পেছনে লুকিয়ে নিল।

গোপেশ্বর যথারীতি ওদের বাড়িতে ঢুকে কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল, "আসছে।"

পারমিতা এলে অরিন্দম গোলাপটা ওর খোঁপায় দিতে চেষ্টা করছিল। পারমিতা, "ধ্যাৎ, দিতে জানে না। দাও, আমাকে দাও" বলে কেড়ে নিতে গিয়ে, অরিন্দমের আঙুল পারমিতার গালে ছুঁয়ে গেল। স্পর্শে যেন দুজনের শরীরেই বিদ্যুৎ খেলে গেল।

পারমিতা চুপচাপ গোলাপটা নিজের খোঁপায় লাগিয়ে নিয়েছে।

অরিন্দম চোখ ফেরাতে পারে না। থাকতে না পেরে সেদিনই অরিন্দম সেই প্রথম বলে ফেলল, "আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। তুমি?"

পারমিতার সারা মুখ লাল। "জানি না," বলে মুখে সলজ্জ হাসি নিয়ে ছুটে পালাল।

কিন্তু কোনো কথাই চাপা থাকে না। আসতে-যেতে অনেকেরই কয়েকবার বিষয়টা চোখে পড়েছে।

স্বভাবতই পারমিতার বাবা-মায়েরও কানে পৌঁছেছিল। পারমিতার বাড়ি থেকে একা বেরোনো বন্ধ। নির্দেশ হল, কখনো বেরোতে হলে কাজের মেয়েটি সঙ্গে যাবে।

অরিন্দমদের আবার গ্রামে যেতে প্রায় বছর পার। অনেকদিন দেখা বা খবর নেই। গিয়ে সেদিনই গোপেশ্বরকে ধরল, "দেখা করিয়ে দে।" গোপেশ্বর বলে, "ধ্যুৎ, ওর তো তিনদিন পরে বিয়ে।"

অরিন্দম তাও নাছোড়বান্দা।—"একবার গিয়ে বল আমি অপেক্ষা করছি। একবার দেখা করুক।"

গোপেশ্বর নিমরাজি ছিল। অরিন্দম প্রায় ওকে জবরদস্তি পাঠাল।

অরিন্দমের আর তর সইছে না। উৎকণ্ঠা নিয়ে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে। গোপেশ্বর একটু পরেই ফিরে এসে বলল, "অনেক করে ইশারা করেছি। জানি না কী হবে।" বলেই নিজের কাজে চলে গেল।

পারমিতা অরিন্দমের কথার মান রেখেছিল। ওদের দরজায় একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে ভেতরে চলে গেল। অরিন্দমের সঙ্গে দূর থেকে চোখাচোখি হল।

ভেতরে চলে গেলে, অরিন্দম একটু স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরল। কীরকম যেন বেহুঁশ হয়ে। কোনোদিকে যেন খেয়াল নেই।

মাঝখানে দুটো দিন যে কী করে কেটে গেল, কে জানে। অরিন্দম সব কিছুই করছে চরম নিরুৎসাহভাবে।

এর মধ্যে খবর পেয়ে ডাক্তারবাবু ও তাঁর স্ত্রী এসে অরিন্দমের বাবা-মাকে সপরিবারে নেমন্তন্ন করে গেছেন। অরিন্দমকে দেখতে পেয়ে, ওকেও বলেছেন, "অরিন্দম যেও।" অরিন্দম ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

বিয়ের দিনটা যে অরিন্দম কী করে কাটাল, সেটা অরিন্দমই জানে। নিজের মনের মধ্যে কেবলই ভেসে উঠছে ও যদি সন্ধেবেলায় পারমিতার পাশে পিঁড়েতে বসত, তাহলে কেমন লাগত।

বিয়ের পরের দিন পারমিতা শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। ওইদিন বিকেলেই অরিন্দমরা আবার কলকাতায়।

বছর দুয়েক পরে অরিন্দমেরও বিয়ে হল ঘটা করে। অরিন্দমের বউ কাকলি সাধারণ ঘরের খুবই ভালো মেয়ে।

অরিন্দম শান্তিতেই সংসার করছে। একটি ছেলে অভিরূপ ক্লাস ফাইভে পড়ে।

একদিন অফিস থেকে ফিরে, দুজনে চা খেতে বসে স্ত্রীকে বলল, "জানলে আমাদের অফিসের তপনরা বেড়াতে গেছে। আমি ঠিক করেছি আমরাও কেদার-বদ্রী ঘুরে আসব। বয়স বেড়ে গেলে, আর পারব না।"

কাকলির উত্তর, "কবে নাগাদ যাবে?"

"ভাবছি মাস চারেক পরে রওনা দেব। কারণ ওইসময় অভিরূপের গরমের ছুটিটা পড়বে।"

অরিন্দমের পরিকল্পনায় কাকলিও খুশি। তাহলেও জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁগো, অত দূরে যেতে পারব তো?"

অরিন্দমের সোজা উত্তর, "কেন পারব না? সবাই যাচ্ছে।" দিন কয়েক পর থেকেই অরিন্দম বেজায় ব্যস্ত ট্রেনের রিজার্ভেশন, হোটেল বুকিং ইত্যাদি কাজে।

কাকলিও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা করে গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। ওরা ঠিক করেছে প্রথমেই কেদারনাথ যাবে। সেখান থেকে গাড়িতে বদ্রীনাথ। অর্থাৎ আগে কঠিন যাত্রাগুলো সেরে নেবে। তারপরে হরিদ্বার-হৃষীকেশ।

দেখতে দেখতে পরিকল্পনামতো পৌঁছে গেল কেদারনাথ। সারাটা রাস্তা অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে ওরা একেবারে মুগ্ধ।

পরদিন সকাল থেকে কেদারনাথ মন্দিরে দর্শন ও পুজো দেবার জন্য অরিন্দম সপরিবারে লাইনে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘ লাইন। চারদিকে তাকিয়ে সকলেই সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করছেন।

হঠাৎই অরিন্দমের চোখ গেল এক মহিলার দিকে। লাইনে ওদের থেকে তিন-চারজনের আগে। চেনা লাগছে। কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছে না। ভদ্রমহিলাও বারে বারে অরিন্দমের দিকে তাকাচ্ছেন। বয়সের ছাপ দুজনের ওপর দিয়েই বয়ে গেছে।

ভদ্রমহিলা হঠাৎ পিছিয়ে এসে অরিন্দমের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারাও বাঙালি? কলকাতা থেকে আসছেন?"

—হ্যাঁ। আপনারা?—কাকলির উত্তর।

—আমরাও।

দুই মহিলা গল্প জুড়ে দিলেন। এক ফাঁকে দুজনে দুজনের স্বামীকে পরিচয় করানোর পালা।

ভদ্রমহিলা ওঁর স্বামীকে দেখিয়ে বললেন, "আমার স্বামী। ভাস্কর।"

কাকলিও স্বামীকে পরিচয় করাল, "এই যে অরিন্দম। আমার স্বামী।"

আর সন্দেহ রইল না। ভদ্রমহিলা সটান অরিন্দমের কাছে এসে নিজের পরিচয় দিলেন—"আমি পারমিতা।"

অরিন্দমের মুখটা যেন আষাঢ়ের মেঘের মতো হয়ে গেল। আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করল—"কেমন আছ?"

"কেমন দেখছ?"—পারমিতার পাল্টা প্রশ্ন।

—ভালোই তো।

—তাহলে ভালোই।

কাকলি অবাক। "আরে তোমরা দুজনকে চেনো?"

—আমরা তো একই গ্রামের—পারমিতাই উত্তর দিল।

এমন সময় পারমিতার স্বামী ডাক দিল—"এই, আমাদের মন্দিরের ভেতরে ঢুকতে হবে।"

—"হ্যাঁ, যাই" বলে ঘুরে অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, "আসি।"

অরিন্দম কোনো উত্তর দিতে পারল না। শুধু ঘাড় নাড়ল।

কাকলি অরিন্দমকে নিরীক্ষণ করে বলল,—"কী হল তুমি যে একেবারে মোহিত হয়ে গেলে। লাইন তো এগিয়ে যাচ্ছে। এগোও।"❖

গল্প

লীলাবতী

সমীরণ মণ্ডল

সকাল বেলা খবরের কাগজের পাতায় খবরের হেডিং "ধর্ষিত ধর্ষক"।

মুহূর্তে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সোসাল মিডিয়ার বিভিন্ন মাধ্যমে। কাগজের সমস্ত সংস্করণ শেষ। ট্রেনে-বাসে অফিসে রেস্তোরাঁয় এমনকি সেরেস্তাতেও ওই একই আলোচনা। হবেই তো! এত উলটপুরাণের গল্প। কাগজের পাতায় প্রায় প্রতিদিনই প্রকাশিত হয় ধর্ষিতার লাঞ্ছনার খবর। আজ কিনা পুরো উল্টো কেস। ধর্ষক লাঞ্ছিত! তিন তিনজন ধর্ষক ধর্ষিত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। তাও কিনা একটিমাত্র সুন্দরী তরুণীর হাতে! নাম লীলাবতী।

ঘটনাটা শোনার জন্য উদগ্রীব সবাই। রটেও যাচ্ছে চারিদিকে। তবে বিভিন্ন ভাবে। কথায় আছে—"গল্পের গরু গাছে ওঠে"।

লীলাবতী সমাদ্দার। তবে আশেপাশে সবাই লীলাবতী সমঝদার বলেই জানে। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। বছর তিরিশের কাছাকাছি বয়স। এখনো অবিবাহিত। মা বাবা দুজনেই চলে গেছেন উপরে। নিজের বলতে কাঠাদুয়েক জায়গার উপর তিন কামরার একখানা বাড়ি। একাই থাকে লীলাবতী। বিয়ে পাশ করার পর কলকাতার কোন এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করে। চেহারা মজবুত। দেখতেও বিশেষ খারাপ নয়। তাছাড়া বর্তমান আধুনিক প্রসাধনের সুবাদে ঘযে মেজে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে সে। পুরুষের চোখে তো বটেই, সেই সঙ্গে ওর সমবয়সী মেয়েদের কাছেও।

বাড়ি মফস্‌সলে। তবে মফস্‌সল হলেও এলাকায় লোক বসতি খুব একটা কম নয়। ইদানিং বেশ কিছু ফ্ল্যাট বাড়িও গড়ে উঠেছে এলাকায়। লীলাবতীর বাড়ির পাশের জমিটাতেও একটা নতুন ছোটো ফ্ল্যাটবাড়ির কাছ চলছে। যে প্রমোটার কাজটা করছেন তিনি লীলাবতীর কাছেও এসেছিলেন। প্রস্তাব রেখেছিলেন লীলাবতীর বাড়িটা ভেঙে পাশের জমির সঙ্গে বড়ো ফ্ল্যাট করবার। কিন্তু লীলাবতীর শর্ত প্রমোটার মেনে নিতে পারেননি। তাই নিয়ে ঝামেলাও কম হয়নি। প্রমোটার শাসিয়ে ছিলেন লীলাবতীকে। কিন্তু লীলাবতী তাতেও ভয় পায়নি। অবশ্য পরে সবকিছু মিটে গিয়েছিল। মানে মিটিয়ে নিয়েছিলেন প্রমোটার। তারপর কাজ চলছে তো প্রায় দুবছর। যে সব মিস্ত্রিরা কাজ করছে তাদের দু-একজনের সঙ্গে আলাপও হয়েছে লীলাবতীর। লীলাবতী নিজের বাড়িতে ছোটো খাটো কিছু কাজও ওদের দিয়েই করিয়ে নিয়েছে। মিস্ত্রিরা সবাই মুর্শিদাবাদের মানুষ। আনসার আলী ওদের হেড মিস্ত্রি। বেশ দশাসই চেহারা। বছর ছত্রিশের আশেপাশে বয়স। তার সঙ্গেও কথা হয়েছে লীলাবতীর। কথাবার্তা বেশ ভদ্র মানুষটার। তাই যাতায়াতের পথে যখনই দেখা হয় সাধারণ কথাবার্তা হয়েই থাকে। আনসার আলী লীলাবতীকে দিদিমণি বলে। আর লীলাবতী আনসারকে বলে আলীদাদা। অন্য মিস্ত্রিদেরও লীলাবতীর মুখ চেনা হয়ে গেছে। কিন্তু এক দুজন ছাড়া সকলকে সেইভাবে নামে নামে চেনা হয়ে ওঠেনি। ওদের মধ্যে একজনই কেবল হিন্দু। মদন পোদ্দার। বয়সে সেই বোধহয় সবার বড়ো। মাঝে মাঝে সেই লীলাবতীর বাড়িতে যায় প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে। লীলাবতীও পছন্দ করে লোকটাকে। মিস্ত্রিরা সকলেই ওকে কাকা বলে। লীলাবতীও ডাকে মদনকাকা বলে। ঘরে ভালো কিছু খাবার বেশি হলে মদনকাকাকেই ডেকে দিয়ে দেয় সে। শৌখিন মানুষ লীলাবতী। একতলা বাড়িটা খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। ছুটির দিনে ছাদে লাগানো ফুল গাছে জল দেয় লীলাবতী। মিস্ত্রিরা দেখে। রঙ বেরঙের গাছ আর ফুলে ভরা ওর ছাদ। একজন মালি ছাড়া দুজন কাজের মাসি আছে। তারা নিয়ম করে যত্ন নেয় বাগানের।

দু-বছরের বেশি সময় ধরে ফ্ল্যাটবাড়ির মিস্ত্রিরা ওকে দেখছে। বাড়ি তৈরির শুরু থেকে সেই তাঁবু গেড়ে বসেছিল ওরা, তারপর একতলার ছাদ গড়ে তাঁবু ভেঙে তার নিচে চলে এসেছে। এখন চারতলায় ছাদের কাজ হচ্ছে। তখন থেকেই আছে সবাই।

একা অত বড়ো বাড়িটাতে থাকে মেয়েটা। বিশেষ কোনো ব্যাটা ছেলেকে আসতে দেখেনি কেউ। ভালো সাজগোজ করে রোজ অফিসে যায়, আবার ফিরেও আসে। কখনো কখনো অনেক রাত হয়। তবে ঘরে ফেরে না এমন খুব একটা হয় না। মিস্ত্রিরা সবই দেখে।

তাদের মধ্যে কথাও হয় লীলাবতীকে নিয়ে। কেউ কেউ মদনকাকাকেই বলে, কি গো কাকা! মেয়ের বিয়ে দেবে না! দেখো না আমাদের কাউকে পছন্দ হয় কিনা! মদনকাকা জবাব দেয় না। শুধু হাসে।

রাত তিনটে নাগাদ ফোন এসেছিল থানার ল্যান্ডলাইনে। মহিলা কণ্ঠ। লীলাবতীর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বলেছিল, তার খুব বিপদ। কিছু দুষ্কৃতি লীলাবতীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। পুলিশ যেন তাড়াতাড়ি চলে আসে।

ফোন পাওয়ার পর তড়িঘড়ি থানার ডিউটি অফিসার তার দলবল নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল লীলাবতীর বাড়িতে। কিন্তু লীলাবতীকে পাওয়া যায়নি। পাওয়া গিয়েছিল লীলাবতীর তিনটে ঘরে তিনজনকে। বাবর আলী, মন্টু সেখ আর আনসার আলী। তিনজনই তিন ঘরের বিছানায় বিবস্ত্র অবস্থায় শুয়ে ছিল। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়। রক্তে ভিজে যাচ্ছিল ওদের বিছানা। কিন্তু চিৎকার করার বা উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই শরীরে। গোটা শরীরের কোথাও আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই। শুধু তিনজনেরই যৌনাঙ্গে একই রকম ভাবে ক্ষত। সেখান থেকেই ঝরছে রক্ত। আনসার আলীর অবস্থা আরও খারাপ। তার যৌনাঙ্গে শুধু ক্ষতই নয়। পুরো যৌনাঙ্গটাই কাটা। বাড়ির কোথাও সেটা খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাড়ির কোনো জিনিসপত্র অগোছালো হয়নি। যা যেভাবে সাজানো গোছানো ছিল সবই সেভাবেই আছে বলে মনে হল। শুধু লীলাবতী নেই।

পুলিশ তিনজনকেই অ্যারেস্ট করে। কিন্তু থানায় নয়। নিয়ে যায় হসপিটালে। সিল করে দেয় লীলাবতীর বাড়ি। খবর নিয়ে জানতে পারে তিনজনের মধ্যে আনসার আলী পাশের নির্মীয়মান ফ্ল্যাটের হেড মিস্ত্রি। বাকি দুজন, বাবর আলী আর মন্টু সেখ মিস্ত্রিদের বা এলাকার কেউ নয়। বহিরাগত। ওইদিন রাতে আনসার আলীর আমন্ত্রণে ওরা এসেছিল খাওয়া-দাওয়া করতে।

সেদিন ছিল রবিবার। সকাল থেকে সারাদিন জোরকদমে কাজ হয়েছে ফ্ল্যাটে। চারতলায় ছাদ ঢালাইয়ের কাজ। আনসার আলীদের শেষ কাজ। বড়ো ঢালাই মেসিন এসেছে। সোমবার থেকে ওদের ছুটি। এরপর অন্য মিস্ত্রিরা আসবে ফ্ল্যাট ফিনিশিং-এর জন্য। তাই কাজ শেষে অঢেল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। মাছ-মাংস-মদ কোনো কিছুর অভাব রাখেননি প্রমোটারবাবু। আনসার আলীর কাজে তিনি খুব খুশি। তাই বিদায় কালে এই ব্যবস্থা। সেই খাওয়াতেই বাবর আর মন্টু ছিল আনসার আলীর অতিথি। ওরাও খেয়েছে পেট পুরে। তবে মাছ-মাংসের থেকে মদই বেশি।

পরে ফরেন্সিক দল এসেছে লীলাবতীর বাড়িতে। সিল খুলে নমুনা সংগ্রহ করেছে তারা। কিন্তু বাথরুমের হ্যাঙ্গারে লীলাবতীর একটা রক্তমাখা বাহারি রাত্রিকালীন পোশাক ছাড়া তেমন সন্দেহজনক কিছুই তারা পায়নি।

লীলাবতীর অনেক খোঁজখবর নিয়েছে পুলিশ। কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া যায়নি। এমনকি অফিসে অফিসে খবর নিয়েছে। তাতেও লাভ হয়নি। মিস্ত্রিদের প্রত্যেককে এক এক করে থানায় এনে পৃথক বয়ান নিয়েছে পুলিশ। কেউ কিছু বলতে পারেনি। শুধু মদনকাকা বলেছে তার অপরাধের কথা। বলেছে গভীর রাতে আনসার তাকে ঘুম থেকে তুলে লীলাবতীর বাড়িতে নিয়ে যায়। পেট খারাপের ওষুধের জন্য লীলাবতীকে ডাকতে বলে। লীলাবতী সাড়া দিয়ে একটু অপেক্ষা করতে বলে। তারপর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে মদনকাকাকে চলে যেতে বলে আর ওরা যে এখানে এসেছে সেটা কাউকে জানালে লাশ ফেলে দেওয়ার হুমকি দেয়। মদনকাকা ভয়ে চলে আসে। পুলিশ জানতে চায় ওই তিনজন ছাড়া দলে আর কেউ ছিল কিনা। মদনকাকা বলে, না। সে আর কাউকে দেখেনি।

বারবার জেরা করা হয়েছিল বাবর আলী, মন্টু সেখ আর আনসার আলীকে। তারা কেউই লীলাবতীর সন্ধান দিতে পারেনি। শুধু নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করে নিয়েছে। আর বলেছে, ধর্ষণ করতে এসে তারাই মেয়েটার কাছে ধর্ষিত হয়ে গেছে। মেয়েটা তাদের যৌনাঙ্গ নিয়ে ইচ্ছেমতো যা খুশি করেছে। তারা প্রতিবাদ করতে চাইলেও তা করতে পারেনি। কারণ সে শক্তি তাদের শরীরে ছিল না। পুলিশ বিস্মিত হয়েছে। এমন ঘটনা তাদের কাছে এই প্রথম। তাই জানতে চেয়েছে কি করে সম্ভব হল সেটা!

ওরা তিনজনই বলেছে সেদিন রাতের ঘটনার কথা। এবং তিনজনের মুখ থেকে শোনা গেছে একই গল্প।

দরজা খুলতেই ওরা তিনজনেই ঢুকে পড়েছিল লীলাবতীর ঘরে। জোর করে ঘরের মেঝেতে চেপে ধরেছিল লীলাবতীকে। লীলাবতী প্রথমে চমকে গিয়েছিল। চিৎকার করতে যাচ্ছিল কিন্তু করেনি। শুধু বলেছিল, আলীদাদা তুমি!

আনসার আলীর চোখে তখন লালসার আগুন জ্বলছিল। সে কোনো উত্তর দেয়নি। বরং মুখ চেপে ধরেছিল লীলাবতীর। লীলাবতী আস্তে করে হাত সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, জোর করবার দরকার নেই। সে এমনিতেই তাদের সঙ্গে বিছানা সঙ্গী হবে। তবে একসাথে নয়। পৃথক ভাবে এবং আলাদা ঘরে। আরও বলেছিল, বিছানায় যাওয়ার আগে তিনজনকেই ওষুধ খেতে হবে এবং ও নিজেও ওষুধ খাবে। তাতে নাকি দৈহিক মিলনে বেশি আনন্দ পাওয়া যাবে আর গর্ভধারণের ভয়ও থাকবে না। সেইমতো লীলাবতীর সঙ্গে ওরা ওষুধ খেয়েছিল আর রাজি হয়েছিল আলাদা ঘরে যেতে। কিন্তু ওষুধ খাওয়ার একটু পরেই ওরা শরীরের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বিছানা থেকে ওঠার বা কথা বলার ইচ্ছেটুকুও ছিল না ওদের। একটা অদ্ভুত নেশায় শরীরে কেটে যাওয়ার যন্ত্রণাও অনুভূত হয়নি।

লীলাবতী কথা রেখেছিল। একটু সময় নিয়ে রাত্রিকালীন বাহারি পোশাক পরে প্রথমে ঢুকেছিল আনসার আলীর ঘরে। তারপর এক এক করে বাবর আলী আর মন্টু সেখের ঘরেও এসেছিল। ইচ্ছেমতো খেলেছিল ওদের সঙ্গে। তারপর কখন যে কি ঘটে গিয়েছিল ওরা জানে না। যখন ভালো করে চেতনা ফিরল তখন ওরা হসপিটালের বিছানায়। লীলাবতীর হদিস আর মেলেনি। তবে পুলিশ জানতে পেরেছিল লীলাবতী কোনো নির্দিষ্ট অফিসে চাকরি করত না। সে শহরের বড়ো বড়ো হোটেলের চাহিদাবতী যৌনকর্মী ছিল। পরে দেখা গিয়েছিল লীলাবতীর বাড়িটা পার্শ্ববর্তী নির্মীয়মান ফ্ল্যাটের সঙ্গে জুড়ে প্রমোটার একটা কমিউনিটি হল বানিয়েছিল। তবে প্রমোটার অকৃতজ্ঞ ছিল। সে ফ্ল্যাট বাড়িটার নাম দিয়েছিল, "লীলাবতী"। আজও আছে সেই নামটা। ❖

বড়ো গল্প

গৌরগোপালের মৃত্যু হোক

অমর মিত্র

ছবি : ইন্দ্রনীল ঘোষ
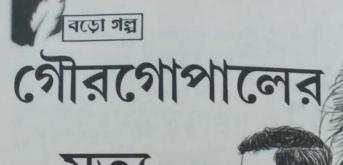
লেখক বিমলেশ বসু এসেছেন কলকাতা থেকে। এই গাড়ি থেকে নামলেন। বছর সত্তর হবেন, কিন্তু শরীর ভাঙেনি। মাথার চুল সাদা, তবে যে ছবি তাঁর বইয়ে দেখা যায় তা থেকে আলাদা। সেই ছবি বছর কুড়ি আগের। তখন তাঁর প্রথম পুরস্কার এল। তারপর তিনি অনেক পেয়েছেন। বিদেশ গেছেন, দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়েছেন। তিনি প্রায়ই বলেন, আমি কি এমন হব ভেবেছিলাম? সাধারণ কেরাণি বা ছোটোমাপের আমলা হয়ে জীবন কাটানোর কথা ছিল। বড়োজোর অধ্যাপক। অবসরের পর কী করতেন তা জানেন না। মানুষ কি জানে কোথায় তার ভবিষ্যৎ নিহিত আছে? মানুষের জীবন গড়ে দেয় তার ভবিতব্য। তাই কি? তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছেন। লেখার জন্য ত্যাগ করেছেন কম না। মনে করেছিলেন সাহিত্য নিয়েই জীবন কাটাবেন, তা তাঁর সফলতা আসুক বা না আসুক। তাঁর সঙ্গে কতজন লিখতে এসেছিলেন। অনেকেই তো থেমে গেছেন। হারিয়ে গেছেন। তিনি কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন, ওই সব উপন্যাস লিখবেন! এখন কি এক এক সময়ে মনে হয় না, এসব তিনি লেখেননি, অন্য কেউ লিখেছেন। লেখক লেখেন না, ঈশ্বর লেখেন। সাহিত্যই তাঁর ঈশ্বর। দেবদ্বিজে তাঁর ভক্তি নেই, আবার অশ্রদ্ধাও নেই। তিনি মনে করেন প্রতিদিনই তিনি সরস্বতীর আরাধনা করেন।

লেখকের সাক্ষাৎ করতে এসেছে যুবক। যুবকের বয়স বছর ত্রিশ। শীর্ণকায়। মাথা ভর্তি কালো চুল। উচ্চতায় পাঁচ ফুট দুই কি তিন ইঞ্চি হবে। মুখখানি চৌকো মতো। চোখদুটি গোলাকার। চশমা নেই। ধূসর একটি ট্রাউজার এবং সাদা-কালো চেক শার্ট। শার্ট ইন করা নয়। পায়ে শু নেই। চটি। ধুলোয় ভরা পা। যুবক ঘুরঘুর করছিল এদিক-ওদিক। সে এসেছে এই জেলারই অনেকটা দূর থেকে। কোন ভোরে বেরিয়েছে। বাস ধরেছে। সেই বাস ধুঁকতে ধুঁকতে এই শহরে এসে পৌঁছেছে সকাল ন-টা নাগাদ। তারপর একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। তাও এই শহরের আর এক প্রান্তে। অনেকটা দূর। পায়ে হেঁটে গিয়েছিল। পায়ে হাঁটা তার অভ্যাস। গাঁয়ের ছেলে। পায়ে হাঁটতেই হয়। এখন কম, আগে বেশি হাঁটতে হত। তারপর ঘুরতে ঘুরতে নিজের কলেজে। কলেজ ছেড়েছে কম দিন না। তবুও টান আছে। কলেজ এক স্বপ্ন। কত বন্ধু, বান্ধবী, হইহই, আড্ডা, পিকনিক, অস্ফুট প্রেমের আভাস, বিনিদ্র রাত। আকাশ তখন অনেক নীল ছিল। বাতাস তখন অনেক

নরম ছিল। এক বিঘেতে বেশি ধান হত। সে চাষিবাড়ির ছেলে। মনে হয়, শুখায় মরত না ধান, সম্বৎসরের খোরাকি হয়ে বিক্রি করাও যেত। এখন সেই দিন নেই। বাতাসের সেই নরম ভাব, আকাশের সেই নীল রং এখন ফিকে হয়ে গেছে পুরোটাই।

লেখক এসেছেন এই কলেজে লেকচার দিতে। ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর সাক্ষাৎকার নেবে। সদ্য বিদেশ থেকে এসেছেন এমন এক সম্মান নিয়ে যা সাম্প্রতিককালে কেউ পেয়েছে বলে জানা যায়নি। আমাদের ভাষায় তো নয়ই। বলেইছি যে যুবক এই কলেজে পড়ত। তা বছর দশ আগের গ্রাজুয়েট। পোস্ট গ্রাজুয়েট হতে পারেনি। কলকাতায় কিংবা এই শহরে থেকে পড়তে হত এম এ। সে বাংলায় অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেছিল। তারপর বি টি পড়েছিল। কিন্তু স্কুল মাস্টারি হয়নি। পরপর পরীক্ষায় বসেছে, হয়নি। কেন হয়নি জানে না। বুঝতে পারে না। সব উত্তরই তো ঠিক লিখেছিল, কিন্তু প্যানেলে নাম আসেনি। পরে শুনতে পায় পরীক্ষা দিয়ে চাকরি হয় না, চাকরি বিক্রি হচ্ছে অনেক টাকায়। বেতন তো কম নয়। এই তো ক-বছর আগের কথা। আট লাখ, দশ লাখ, পনেরো লাখ। সে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছিল। চাকরিই জীবন বদল করে দিতে পারে। চাষের জমি বেচতে হয়েছিল। ধার করতে হয়েছিল। মায়ের গয়না নিতে হয়েছিল। জমি যা ছিল তা সব বেচে দিলেও আট লাখ হত না। চাষের জমি তার একার নয়। দুই ভাই দুই বোনের অংশ আছে। নিজের অংশ বিক্রি করে দিয়েছে। অবশেষে প্রাইমারি স্কুলের চাকরি হয়েছে। জয়েন করেছে। মাইনের টাকা থেকে ধার শোধ করছে খেপে খেপে। পাশের গ্রাম করগুার ডাক্তার বলাই মাজির ছেলে সুবল টাকা দেয়নি। তাদের ক্ষমতা আছে, কিন্তু তার বাবা সায় দেয়নি। ফলে চাকরি পায়নি। ইন্টারভিউ দিয়েছিল, সব উত্তর দিয়েছিল। তবু হয়নি। সুবল আপশোশ করেছিল। টাকা দিলেই হত। বেতন থেকে টাকা উঠে আসতে আর ক-বছর। তা সত্যি। কিন্তু এখন এই যুবকের ঘুম নেই। সুবল নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়। যারা টাকা দেয়নি, প্যানেলে থেকে চাকরি পায়নি, তারা আদালতে গেছে। সুবলও আছে তাদের ভিতরে। কোর্ট অনেক চাকরি বাতিল করে দিচ্ছে। কেরানির চাকরি বাতিলের আদেশনামা বেরিয়ে গেছে। তাদের গ্রামের অভিজিৎ মাইতি এ মাসের মাইনে পায়নি। ছ-মাস চাকরি করেছে। অভিজিৎ প্যানেলের বাইরে থেকে পরীক্ষা না দিয়ে চাকরি পেয়েছিল। সব ফাঁস হয়ে গেছে। অভি খুব ছুটছে। অভির ঠাকুরদা ছিল প্রধান। বাবা ঠিকেদার গণেশ মাজি। ওদের জমি কম না। কেউ কেউ বলছে, ঠিকেদারের টাকা গেছে, ঠিক তুলে নেবে সরকারি কাজ করে। অভির দাদা সমীর মাজি আগে এক পার্টি করত, এখন সরকারি দল করে। সমীর মাজিই ভাইয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এমন হতে পারে টাকা দিতে হয়নি। কিন্তু গোলগ্রাম, কুলিয়া, চন্দনপুর, আকালপৌষ... সব গাঁয়ের ছেলেদের কেউ কেউ টাকা দিয়েছিল। সকলের নিয়োগ বাতিল হয়ে গেছে। কে টাকা নিয়েছিল এই মেদিনীপুরে, তাকে কে খুঁজে বের করবে ? যুবকের চাকরি এখনো আছে। কতদিন থাকবে জানে না। ক্লাস ফোরের ছেলেদের পড়ায়, বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদীর বাঁকে...। নদী ভাঙছে। নদী বাঁধ ভাঙছে। হু হু করে জল ঢুকছে। ভাদ্রের ভরা সবুজ ধানখেত ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে উন্মত্ত জলরাশির ভিতরে। নিঃশব্দ হাঁমুখের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম। লেখক বিমলেশ বসুর জগজ্জননী গল্পে এমনই আছে তাদের কাঁসাই নদী ভাঙনের কথা। লেখকের মুখোমুখি হতেই আসা। যুবক এখন উদ্দেশ্যহীন ঘুরছে কলেজ কম্পাউন্ডে।

বিমলেশ বসুকে নিয়ে কলেজের বাংলার স্যার রাজীব রায় ঘুরছেন। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কলেজের সব দেখাচ্ছেন। রাজীব স্যার কবিতা লেখেন যে তা জানে যুবক। যুবকের নাম গৌরগোপাল। সে গোপাল বর্জন করেছে। গৌর মাজি নামে নিজের পরিচয় দেয়। তাদের সঙ্গে ধ্রুব মাজির পরিবারের দূরের সম্পর্ক ছিল। এখন ফিকে হতে হতে মুছে গেছে। ধ্রুব মাজির কথা বলা হয়নি এখনো। গৌরগোপালের মুখোমুখি হলেন রাজীব রায়। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু বলবে?"

"না স্যার, আমি ওঁর কথা শুনতে এসেছি।" গৌরগোপাল বলল।

ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালেন বিমলেশ বসু। মাথায় সাড়ে পাঁচ ফুট। সৌম্যদর্শন ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁকে দেখছেন, চোখে কী যেন ফুটে উঠছে, বিস্ময়ের আলো। তা হবে কেন? তাঁর বিস্ময় আসবে কোথা থেকে? তাকে তিনি কোনোকালেই দ্যাখেননি। চেনার কথা নয়। গাঁয়ের চাষিবাড়ির ছেলে। তার পরিবারে সে-ই প্রথম গ্রাজুয়েট। গৌর লেখকের সঙ্গে কথা বলতে এগোয়, তখন দুই ছাত্রী এসে দাঁড়াল লেখকের সামনে। প্রণাম করল। তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। গৌর সরে দাঁড়ায়। যুবতীদের কথা শেষই হতে চায় না। লেখক তাদের বাদ দিয়ে এই ধূসরিত এক যুবকের দিকে মন দেবেন কেন? স্যারের মধ্যাহ্নভোজন হবে, তারপর বক্তৃতা। তিনি তাঁর সাহিত্যজীবন নিয়ে বলবেন। যুবক সেই কথা শুনতেই এসেছে। তাঁর জীবন ব্যাপ্ত, অনেক অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ, তাই-ই শুনেছে সে।

গৌরের পিঠে হাত। ঘুরে দাঁড়াতে দেখল, রামচন্দ্র সরকার। আকালপৌষে বাড়ি। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আছেন মেদিনীপুর কালেক্টরেটে। বয়স হয়েছে। অবসরের হয়তো বছর কয়েক বাকি আছে। রামচন্দ্রদার বাড়ি সে কয়েকবার গেছে আকালপৌষে। উদ্দেশ্য সরকারি চাকরির পরীক্ষা দেবে। কিন্তু বিষয় অত সহজ নয়। অনেক পড়তে হবে। ভারতীয় সংবিধান, অঙ্ক, আইনের প্রাথমিক পাঠ। এরপর ইংরেজি জ্ঞান থাকতে হবে খুব ভালো। সাক্ষাৎকার নেবে ইংরেজি ভাষায়। সে চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। ইংরেজিতে কাঁচা। কোনো রকমে পাশ করে গেছে। আর ইংরেজিতে কথাবার্তা বলা তার পক্ষে অসম্ভব। ভয় করে খুব। যদি গ্রামারে ভুল হয়! টেন্স ঠিক না হয়! গৌর জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছেন রামচন্দ্রদা?"

রামচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখানে?"

"হোয়াটসঅ্যাপে একটা চিঠি পেলাম, আমি তো এক্স-স্টুডেন্ট।" গৌর জবাব দিল।

"কী করছ এখন?" অভিভাবকের মতো জিজ্ঞেস করলেন রামচন্দ্র।

গৌর বলতে বলতে বলল না প্রাইমারি টিচার। খবরের কাগজ, টিভিতে খুব আলোচনা হচ্ছে, পঞ্চায়েত বসাচ্ছে সব টিভি কোম্পানি। টিচার শুনলে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। কবে পেলে, কোথায় পেলে, পাশের গ্রামেই পেলে? কত রকম কথা উঠে আসতে পারে। মানুষ সন্দেহ করতে ভালোবাসে। রামচন্দ্র স্যার তার ব্যতিক্রম হবেন না। যুবক বলল, "টিউশনি করি।"

"ডব্লিউ বি সি এস দিলে না?" রামচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন।

"না স্যার হবে না, অঙ্ক, ইংলিশ কঠিন।"

"কঠিন কিছু না, ক্লার্কশিপ দিতে পারতে।" রামচন্দ্র বললেন।

গৌর বলল, "আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

"ফোন করে এসো, হাল ছেড়ে দিলে হবে?"

গৌরকে আরো বোঝাতে চাইছিলেন রামচন্দ্র কিন্তু গৌর প্রসঙ্গ বদলে দিল, বলল, "আপনি কি জানেন দাদা, উনি আমাদের গ্রামে ছিলেন তেইশ বছর বয়সে।"

"তখন উনি লেখক ছিলেন না।" রামচন্দ্র বললেন।

গৌর বলল, প্রথম গল্প আমাদের গ্রামে বসে লিখেছিলেন।

"কে বলল?" রামচন্দ্র বললেন, "এসব কথা সত্যি বলে মনে হয় না।"

"বলাইকাকু বলে, তখন উনি সক্কালে উঠে লিখতে বসতেন, ওদের একটা কাছারি ঘর ছিল, সেখানে প্রায় ছ-মাস ছিলেন প্রায়, বর্ষাকাল পুরো, আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা বলে তাকে, পুলিশ খুঁজছিল।"

"ওঁর কি তা মনে আছে?" রামচন্দ্র বলেন, "কিন্তু এসব কথা শুনিনি।"

"ভুলে যায় মানুষ!" বলল গৌর, "বলাইকাকুর সব মনে আছে।

রামচন্দ্র বললেন, "এমন হতে পারে তুমি যার কথা ভেবে এসেছ, তিনি উনি নন।"

"সুবলের বাবা বলাইকাকু বলল, সেই বিমলেশ কি না খোঁজ নিয়ে আয় তো।"

"সে কী করে জানল ইনিই সে?"

"বলাইকাকু ওঁর গল্প করে, কিন্তু ইনিই তিনি কি না তা জানে না, ছবি দেখে চেনা যায় না, অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে।"

রামচন্দ্র বললেন, "লেখকরা শুধু ঘোরেন, তাঁদের কি সব মনে থাকার কথা, যা কিছু ভেবে নিলে হল?"

"ওঁর লেখায় আমাদের এদিকের কথা আছে। বিনবিন করে বলল গৌরগোপাল।

"নেই, ওসব আমরা ভাবি।" রামচন্দ্র তাঁর ডেপুটির ক্ষমতায় কথাটা বললেন। গৌরগোপাল বুঝল, রামচন্দ্র পড়েননি বিমলেশ বসুকে। পড়েননি কেননা ডেপুটির না পড়লেও কথা বলা চলে। চুপ করে থাকে। তখন রামচন্দ্র বললেন, "আমার কবিতার বই দাদাকে দেব।"

"আপনার সঙ্গে পরিচয় আছে?" গৌর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। তারপর ভাবল, অবাক হওয়ার কারণ নেই। উনি তো ডব্লিউ বি সি এস, সিনিয়র ডেপুটি, ওঁর সঙ্গে কত লোকের আলাপ থাকবে। কত বিশিষ্টজন ওঁর চেনা সে কী করে জানবে?

রামচন্দ্র বললেন, "কেন পরিচয় থাকবে না, কলকাতায় ওঁর বাড়ি বেশ কয়েকবার গিয়েছি, আড্ডা মেরেছি, সল্টলেকে।"

"কেন গেলেন?" বোকার মতো জিজ্ঞেস করল গৌরগোপাল।

"লেখকের বাড়ি যায় তো মানুষ, আড্ডা হয় খুব ভালো, আমাদের ভালোই আড্ডা হচ্ছিল, কিন্তু এর ভিতরে টিভির লোক এসে গেল।"

"আপনি গ্রামের নাম বলেছিলেন?" গৌর জিজ্ঞেস করল।

"না, জেলার কথা বলেছিলাম, আমার এক বন্ধু বেলগাছিয়া থাকে, সে-ই সব কথা বলেছিল।" রামচন্দ্র বললেন, "আমি ওঁর একটি উপন্যাস নিয়ে কথা বললাম, ওই যে নির্বাসিতা।"

"আচ্ছা, ওটা আমার খুব ভালো লাগেনি," বলতে বলতে গৌর দেখল স্যার আসছেন তার দিকে। স্যার বিমলেশ বসু। গৌর ঘুরে দেখল রামচন্দ্রদা রাজীব স্যারের সঙ্গে কথা বলছেন। গৌর বিমলেশ স্যারের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু হয়তো এগোতে সাহস পাচ্ছে না। বিমলেশ বসু গৌরগোপালের সামনে এসে দাঁড়ালেন, "আপনি?"

"আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলব স্যার।" গৌর বিনীত স্বরে বলল।

"বাড়ি এই জেলায়?" বিমলেশ জিজ্ঞেস করলেন।

গৌর বলল, "হ্যাঁ, তবে শহর থেকে বেশ দূরে, গ্রাম।"

"কোন জায়গা?" বিমলেশ জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনি কি চিনবেন, আষাঢ়ি-দ-র কাছে।" গৌর বলল।

"আষাঢ়ি-দ মানে ডেবরা থানা? জিজ্ঞেস করলেন লেখক।

"ইয়েস স্যার, আপনি জানেন, আপনার মনে আছে?" গৌর শিহরিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"আষাঢ়ি-দ-তেই বাড়ি?" বিমলেশ কৌতূহলী হলেন।

"না, একটু ভিতরে। বিমর্ষ মুখে বলল গৌর। তাদের গ্রাম এত ভিতরে যে বলা যায় না গুছিয়ে। কিন্তু ইনি তো জানবেন, ইনিই তো সে। ধ্রুব মাজির কমরেড।

"ভিতরে মানে লোয়াদা, কাঁসাই নদীর ধারে?" হেসে জিজ্ঞেস করলেন লেখক বিমলেশ বসু।

"না স্যার, আরো ভিতরে, নদীর ওপারে।" যুবক গৌরগোপাল বলল।

"নদীর উপরে ব্রিজ হয়েছে?" লেখক জিজ্ঞেস করলেন।

"ছ-মাস চালু হয়েছে স্যার।" গৌর বলল।

"তাহলে বাস একদম ব্রিজ পেরিয়ে ভিতরে চলে যায়, গোলগ্রাম অবধি?" লেখক সবই চেনেন বুঝতে পারল গৌর। চিনবেন,

কিছুই ভোলেননি মনে হতে লাগল গৌরের। অবিকল মনে রেখেছেন, এইটা আশ্চর্য ঘটনা।

"না অনেক ভিতরে যায়, সেই ত্রিলোচনপুর পেরিয়ে সোনামুই খাল অবধি।" গৌর বলল, "খালের ওপারে দাসপুর।"

"তোমার বাড়ি?" মানুষটা হাইওয়ে থেকে আষাঢ়ি-দ, লোয়াদা, গোলগ্রাম হয়ে আরো ভিতরে যাত্রা করেছেন গৌরগোপালের সঙ্গে। আসলে যাচাই করতেই গৌর আষাঢ়ি-দ-র কথা বলেছিল। তার মনে হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আগের কথা মনে রাখা সম্ভব নয়।

"আজ্ঞে কুলিয়া, করণ্ডা, ত্রিলোচনপুর।" গৌর বলল, "করণ্ডার গায়ে কুলিয়া।"

তিনি বললেন, "যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই, ধ্রুব মাজি পাঠিয়েছে?"

"ধ্রুব মাজি, তিনি তো বেঁচে নেই।" অবাক গৌরগোপাল বলল, "অনেক বছর আগে মারা গেছেন, পুলিশ তাঁকে মেরে দিয়েছিল, শহিদ বেদি আছে করণ্ডার মুখে, বাস স্টপে।"

চুপ করে থাকলেন বিমলেশ, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তাঁর কথা তুমি জানো?"

গৌর বলল, "শুনেছি, বিপ্লবী ছিলেন।"

"বেঁচে থাকলে আমার বয়স হত।" বললেন লেখক বিমলেশ বসু।

গৌর বলল, "বেঁচে থাকলে একশো বছর বাঁচতেন।"

"দীর্ঘায়ু হত হয়তো।" বিড়বিড় করে বললেন বিমলেশ।

গৌর বলল, "আমার ঠাকুদ্দা একশো এক বছরে মারা যান, আমাদের ওদিকে নব্বই-পঁচানব্বইয়ের মানুষ হেঁটে চলে বেড়ায়, আমরা অত বাঁচব না মনে হয়।"

"বীরভূমে তিনবার গুলি খেয়ে বেঁচে গিয়েছিল ধ্রুব মাজি।" মাথা নামান মানুষটি।

"আমাদের ওদিকে মানুষ সত্যিই দীর্ঘায়ু হয়।" গৌর বলে, "আপনার করণ্ডার বলাই মাজির কথা মনে আছে? কোয়াক ডাক্তার।"

তিনি প্রসঙ্গে না গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাকে দেখেই চমকে উঠেছি আমি, কেন বলো তো, মনে হচ্ছিল কাঁসাই নদীর ওপারের মানুষ কেউ আসবেই হয়তো, তুমিই সে।"

"আপনি ছিলেন করণ্ডায়?"

"সামান্য কয়েক মাস, বর্ষায় বেরোতে পারিনি, অগম্য হয়ে গিয়েছিল জায়গাটা।" অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন লেখক, "ভুলেই গেছিলাম সব, মেদিনীপুরে এসে মনে পড়ে গেল।"

লেখকরা এমনি হন। ভুলে যান আবার মনেও নিয়ে আসেন। তাঁদের মনের ভিতরে সব সময় নানা সময় চলাফেরা করে। গৌর চুপ করে থাকল। রাজীব রায় এসে বিমলেশকে ডাকলেন, "স্যার লাঞ্চ রেডি, লাঞ্চের পর প্রোগ্রাম শুরু হবে।"

বিমলেশ জিজ্ঞেস করলেন গৌরকে, "তুমি খেয়েছ?"

"হ্যাঁ, আপনি যান।"

রাজীব রায় চলে গেলেন বিমলেশকে নিয়ে। যেতে যেতে বিমলেশ একবার পিছনে ফিরলেন। হাসলেন হয়তো। গৌর চলল অন্যদিকে। তার কাঁধে একটি ঝোলা ব্যাগ। ব্যাগের ভিতরে একটি বই। পাণ্ডুলিপি। একটি পত্রিকা। মুড়ির প্যাকেট। সে হাত ভিতরে ঢুকিয়ে ছুঁয়ে দেখল। উষ্ণতার স্পর্শ। যেন ভিতরে কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে আছে কোনো জীবিত প্রাণী। গৌরের সঙ্গে দেখা হল অমিত দত্তর। অমিত এই শহরের যুবক। পৈতৃক ব্যবসা আছে। জিজ্ঞেস করল, "আরে গৌর, কতদিন বাদে দেখা, কী করছিস?"

গৌর না ভেবেই বলল, "বিয়ে করছি নেক্সট ইয়ারে।"

"এখনো বিয়ে করিসনি, আর কবে করবি?" জিজ্ঞেস করল অমিত।

"একত্রিশ-বত্রিশ তেমন বয়স নয়, কলকাতায় পোস্টিং পেয়ে বিয়ে করছি, তোর ঠিকানা দে, কার্ড পাঠাব।" গৌর হেসে বলল। তাকিয়ে আছে অমিতের মুখের দিকে। কেমন হয় প্রতিক্রিয়া।

অমিত জিজ্ঞেস করে, "বিয়ে কলকাতায় না গ্রামে হবে?"

"কলকাতায়, আমার বউ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।" গৌর বলল, "তোর ব্যবসা কেমন চলছে?"

"ভালো না, কনস্ট্রাকশনের বিজনেস তো।" বলল অমিত, "তবে সামলে নেব ঠিক। তুই কি ডেপুটি?"

গৌর বলল, "না, কলেজে পড়াই।"

"মানে প্রফেসর!" অমিতের দুই চোখ স্ফীতাকার হয়ে গেল, "কোথায় পড়াস, এই কলেজে তো না।"

"না, আমি মালদায় ছিলাম, তার আগে কোচবিহার কলেজে, সবে কলকাতার দেশবন্ধু কলেজে বদলি হয়ে এসে মনে হল বিয়ে করা উচিত, তুই?" গৌর বেশ গুছিয়ে কথাগুলি বলতে থাকে। অমিতকে দেখেই এই বানানো কথা তার মুখে এসে গেল। অমিত এক বদমায়েশ ছেলে। কলেজে তাকে কম হেনস্থা করেনি। অমিতকে দেখে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। শয়তান। ও লেখক বিমলেশ বসুর লেখা পড়েছে নাকি? ও বইয়ের ধার ধারে না কোনোদিন। বই থেকে টুকে পাশ করেছে। জালি ছেলে। এখানে কেন?

"বলতে গেলে কলেজ থেকে বেরিয়েই বিয়ে করলাম ছ-বছর আগে বিয়ে, টেকেনি, কেস চলছে," বলল অমিত, "খারাপ মেয়েছেলে, তাড়িয়ে দিয়েছি, যে টাকা আর গয়না দেবে বলেছিল শ্বশুর, দেয়নি।"

"মামলা চলছে, ডিভোর্স না হলে বিয়ে করতে পারবি না তো।" গৌর বলে।

অমিত বলল, "না, পারব না, সেও পারবে না। আরে পুরুষ লোকের কি মেয়েছেলের অভাব, আমার আছে দুটো কচি, টাকায় বশ।"

গৌর বলল, "তুই কি লেকচার শুনতে এলি?"

"দেখতে এলাম, শুনেছি আমাদের গ্রামে নাকি লুকিয়ে ছিল লোকটা, নক্সাল থেকে লেখক হয়েছে, আমাদের গ্রাম,

পায়রাচালি, সাঁকরাইল ব্লক, যদি সুযোগ হয় জিজ্ঞেস করব কথাটা সত্যি কি না।"

গৌরগোপাল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল অমিত দত্তর দিকে। তাহলে করগুায় কবে? সাঁকরাইলের আগে না পরে? সাঁকরাইল থানার পাশে গোপীবল্লভপুর থানা। সাঁকরাইলের সুবর্ণরেখা নদীর ওপারে নয়াগ্রাম থানা। সব ছিল বিপ্লবীদের ঘাঁটি। লেখক বিপ্লব করতে ঘর ছেড়েছিলেন। তখনই ধ্রুব মাজির সঙ্গে আলাপ হয়। যুবক অপেক্ষা করতে লাগল। সিমেন্টে বাঁধানো কদম গাছের গোড়ায় গিয়ে বসল। ঝোলার ভিতর থেকে ক্যারিব্যাগে ভরা মুড়ি আর বাদামের মিশ্রণ বের করে মুখে দেয়। বাড়ি থেকে গুছিয়ে এনেছে।

দুই

লেখক বিমলেশ বসু অন্যমনা হয়ে পড়ছিলেন বারবার। যুবকটিকে যেন চেনা মনে হচ্ছে। ধ্রুব মাজির এই বয়স ছিল। ধ্রুব মাজি প্রায় এমনিই ছিল। প্রথম দেখায় তিনি চমকে উঠেছিলেন। কে ও? ধ্রুব? ধ্রুব কী করে হবে? পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে যে। বয়স তো থেমে থাকে না। তবে? হ্যাঁ, সত্যিই এসেছে সে সেই ধ্রুব মাজির গ্রাম থেকে।

ধ্রুব মাজি আর তিনি একসঙ্গে ছিলেন বীরভূম। ওহ, সে এক দিন গেছে! পুলিশের তাড়ায় ধ্রুব মাজি আর তিনি পালিয়ে এসেছিলেন আষাঢ়ি-দ হয়ে লোয়াদায় কংসাবতী নদীর তীরে। তারপর নদী পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে করগুা, তা প্রায় সাত মাইল হবে। ধুলোউড়ি রাস্তা, ছায়ায় ভরা বট, অশ্বত্থ। আবার অনেকটা পথ আকাশের নীচ দিয়েই। দু-পাশে ধু ধু ধান মাঠ, তখন মাটি ভেজেনি। বর্ষা নামুক। বীরভূমের লাল মাটির সঙ্গে তফাত অনেক। এদিকটা একেবারে কাদামাটি, নদীর ধারটা বালিমাটি, তারপর এঁটেল মাটি। ধ্রুব মাজি তাকে সব বলেছিল যেতে যেতে। তখন আকাশে মেঘ এসেছে। মেঘের ছায়ায় তারা হাঁটছিল করগুার পথে। মেঘই ধ্রুবকে গ্রামে ফিরিয়েছিল। চাষবাস আরম্ভ হবে, সে চাষিবাড়ির ছেলে। চাষের সময় কি গাঁয়ের বাইরে থাকতে পারে? জমি তাকে টানছিল। বিমলেশ একবার বলতে চেয়েছিল, বিপ্লবীর অত পিছুটান থাকতে নেই। ধ্রুব মাজি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, "বর্ষাকালটা নিশ্চিন্ত, পুলিশ, মিলিটারির সাধ্য নেই এদিকে ঢোকে, জল নামুক, দ্যাখ কী হয়।"

মনে পড়ে সেবার খুব ভালো বর্ষা হয়েছিল। করগুায় ফিরেছিল ধ্রুব মাজি চাষ করতেই। আর নিরাপদে থাকা যাবে। বিপ্লবের নেশা কাটছিল হয়তো। আবার না হতেও পারে। জমি আর মেঘ এমনই যে তা দেখে চাষার ছেলের মন নিজের গাঁয়ের দিকে ফিরবেই। তা তো প্রতিবিপ্লবী কাজ নয়। অন্ন বিনে মানুষ বাঁচে না।

ধ্রুব চাষবাসে নেমে পড়ল জখম পা সারিয়ে। বিমলেশ মনে করতে পারে, সেই যে তখন একফসলি গ্রাম, শ্যালো টিউবওয়েলে মাটির নীচ থেকে জল তুলে দ্বিফসলি হচ্ছে। ধ্রুব মাজি বলল, "থেকে যা বিমল, থেকে যা, এখেনে পুলিশ আসবে না, এক পশলা বৃষ্টি হলে এমন কাদা, সাত মাইল আসতে হলে উনপঞ্চাশ দুগুনে আটানব্বইবার আছাড় খেতে হবে।" বর্ষা থেকে শরৎ পার হয়ে হেমন্ত অবধি করগুা নিরাপদ। বাইরের কে এল পুলিশ খোঁজ পায় না। করগুার রাস্তার এঁটেল মাটির কাদায় পা ডুবে গিয়ে আটকে যেত। সামনে যে হাঁটবে, মাটি টেনে ধরবে পা। টেনে তুলতে গেলে ভারসাম্য রাখা যাবে না। বর্ষায় সাইকেল অকেজো। তখনো বর্ষা নামেনি। ধ্রুব মাজির খুড়তুতো ভাই বলাই রোগী দেখতে গিয়েছিল তিন গাঁ পার হয়ে কাঁটাগেড়্যা মৌজায়। বৃষ্টি নামল বিকেলে। সাইকেল কাঁধে করে তাকে ফিরতে হয়েছিল। ধ্রুব মাজির গ্রামে রাস্তা এখন পাকা হয়েছে। নদীর উপরে ব্রিজ। বিমলেশ ভাবছে, তখন যদি এমন হত, সে বাঁচত না। ধ্রুব মাজিও না। একমাত্র গরুর গাড়ি সম্বল। কাদা শুকিয়ে, সেই মাটি ধুলো হতে সময় লাগত অনেক, শীতের মাঝামাঝি হয়ে যেত। তখন হয়তো বিডিওর লজ্ঝড়ে জিপ আসত। বিডিও কথা দিতে আসত। রাস্তার কাজ

সেই দিন শরতের মায়াবী আলোয় ভেসেছিল সব দিক।
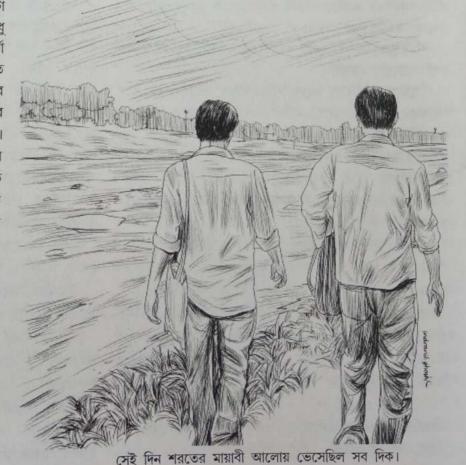
আরম্ভ হবে শিগগির। টেন্ডার ডাকা হবে মার্চের ভিতরেই। বিডিও চলে গিয়ে আবার সব ঘুমতে লাগল। সেখানে সে বেশ ভালো ছিল। তার কাজ নেই। দু-বেলা খাওয়ার চিন্তা নেই। ধ্রুব মাজির পরিবারে ধান-চাল ছিল। দু-বেলা ভাত, আলুসেদ্ধ পিঁয়াজ, লঙ্কা সর্ষের তেল দিয়ে মাখা, মুসুর ডাল, আর আলু পোস্ত, ঝিঙেপোস্ত খেয়ে ঘুমিয়ে আলস্যি ছাড়িয়ে বেশ দিন যাচ্ছিল। তখনই তার মনে হয়েছিল লেখে। সে উপার্জন করে না, একটা পরিবার তাকে আগলে রেখেছে নিজেদের মতো করে, বলেছে পৌষ সংক্রান্তির পর ছাড়বে। বাবা-দাদারা জেনে গিয়েছিল সে নিরাপদে আছে। কলকাতা থেকে চেষ্টা করা হচ্ছিল সব কেস থেকে তাকে মুক্ত করে বাড়ি ফেরাতে। কলকাতায় সে থাকতে পারেনি। কলকাতায় ফিরে সে চলে গিয়েছিল ভাগলপুর। সেই শরৎচন্দ্র, বনফুল, বিভূতিভূষণের বড়োবাসা, পথের পাঁচালি রচনা, গঙ্গা...সব তাকে লেখক করে তুলেছে। ভাগলপুর তার জীবনের এক বড়ো পর্ব। ভাগলপুরের মাটিই তাকে লেখক করেছে। কিন্তু প্রথম লেখাটি এই জেলায় আত্মগোপন করে লেখা হয়েছিল।

এমনই ভেবে রেখেছে বিমলেশ। এই জেলা তাকে লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এমন কিছু বলবে। এই শহরেও কিছুদিন আত্মগোপন করেছিল। মিশন কম্পাউন্ড, জনৈক অধীর সেনগুপ্তর বাড়ি। তাঁদের একটি পুত্র ঘরছাড়া ছিল। তাঁদের বাড়িতে এক কমরেড তাকে দিয়ে এসেছিল। কিছু দূরেই জেলখানা। তার সতীর্থরা সেখানে বন্দি ষয়ে আছে। কয়েকজন জেল ভাঙতে গিয়ে মার খেয়েছিল বিস্তর। একজন নিহত হয়েছিল। অধীর সেনগুপ্ত তাকে দু-দিন রেখে পাঠিয়ে দিয়েছিল আরো পশ্চিমে পায়রাচালি গ্রামে। সে ছিল টিলা আর জঙ্গলে আকীর্ণ এক গ্রাম। অনেক ভিতরে। সেখান থেকেই ধ্রুব মাজি তাকে নিয়ে যায় করগুা গ্রামে। ধ্রুবর সঙ্গেই সে ছিল বীরভূম-সাঁওতাল পরগনা সীমান্তের এক আদিবাসী গ্রামে। পুলিশ তাদের তাড়া করছিল। তারাও এখান থেকে ওখানে ঘুরছিল।

এই সময়েই কি মোহভঙ্গ হয়েছিল তাদের দুজনেরই? কিন্তু কলকাতা তখন ফেরা যাবে না। এনকাউন্টারের নামে হত্যালীলা চলছিল কলকাতায়। পুলিশ তার কাজ করছিল নির্দয় হয়ে। ধ্রুব মাজির প্রস্তাবে সে রাজি হয়েছিল। পায়রাচালি নিরাপদ ছিল না। পাথুরে মাটির এলাকা। পুলিশের গাড়ি আসা-যাওয়া করত। তারা করগুা গিয়ে বেঁচেছিল।

ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে ঘিরে বসেছে, "স্যার, আপনার প্রথম গল্প নিয়ে বলুন।"

"কী করে যেন লেখা হয়ে গিয়েছিল।" বিমলেশ বললেন।

"তা কি হয় স্যার, আপনি কি আগে লেখেননি?" একটি কচিমুখ জিজ্ঞেস করল।

"না লিখিনি, লেখার কথা ভাবিনি।" বললেন বিমলেশ।

"তাহলে কীভাবে হল?" জিজ্ঞেস করল আর একজন।

বিমলেশ বললেন, "ধ্রুব মাজি জানত।"

"কে তিনি?" সেই কচিমুখ জিজ্ঞেস করল।

বিমলেশ গাঢ় স্বরে বললেন, "কমরেড, এখানে সে খবর নিতে পাঠিয়েছে, আমিই সে কি না, আমি ভাবছিলাম ধ্রুব মাজি আসবে আমার কথা শুনে, আমার জ্বরের সময় সারারাত জলপটি দিয়েছিল।"

হল ভর্তি হয়ে আছে জলে ধোয়া নির্মল মুখে। যেমন উজ্জ্বল চোখ, তেমনি তাদের উৎসাহ। সকলে যেন ফুটছে। শুধু সে, সেই বিমর্ষ যুবক, সে চুপ, সে প্রায় মিশে গেছে এত যুবক-যুবতীর ভিতর। সে আছে, কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছেন না বিমলেশ। বিমলেশ খুঁজছেন, কই সে? চলে গেল নাকি ? তার গ্রামে সেই যে বর্ষার শুরুতে গিয়েছিলেন যুবক বিমলেশ, পৌষ সংক্রান্তির অনেক আগেই, কার্তিকেই ফিরেছিলেন কলকাতা। তখন ধান কাটা শুরু হয়েছিল সবে। সারাদিন ঝমর ঝমর শব্দ কাটা ধানের আটি বাঁকে করে নিয়ে আসছে সকলে। ধ্রুবও। ধ্রুব মাজি বলেছিল, সংক্রান্তি কাটিয়ে যাও বিমল। না, সে খবর পেয়েছিল, গোয়েন্দা দপ্তর ও লালবাজারের সঙ্গে বাবা ব্যবস্থা করেছে। কলকাতা ফিরে সে হাজিরা দেবে লালবাজারে। কাগজপত্রে সই করে চলে যাবে ভাগলপুর। পশ্চিমবঙ্গে থাকা হবে না। পশ্চিমবঙ্গে থাকলে তার কমরেডরাই তাকে মেরে দেবে। কিংবা সরকারি ক্ষমতায় বলীয়ান যুব বাহিনী। কলকাতায় সে আত্মগোপন করেছিল একটি মাস। তারপর ভাগলপুরের ট্রেনে উঠে বসে। যাওয়ার আগে করগুায় লেখা গল্প একটি পত্রিকায় পাঠিয়ে দেয়। সেই গল্প তিন মাস বাদে ছাপা হয়েছিল। খুব সুনাম কুড়িয়েছিল। বাংলা গল্পে বহুদিন বাদে আশ্চর্য এক গ্রাম ফুটে উঠেছিল। জগজ্জননী ছিল গল্পের নাম। সেই গল্পের পর তাকে আবার লিখতে চিঠি দেন সম্পাদক। সে-ই শুরু। বিমলেশ জিজ্ঞেস করলেন, "জগজ্জননী পড়েছ তোমরা কেউ?"

সকলে চুপ। তিনি আশা করেছিলেন কেউ না কেউ বলবে। নাহলে সেই যুবক। যুবকটি কই?

একজন বলল, সে অনেকদিন আগে পড়েছে, তত মনে নেই, বন্যা ছিল সেই গল্পে।

অধ্যাপক রাজীব রায় বললেন, "স্যার, আপনি কি 'জগজ্জননী' গল্প থেকে একটু পড়ে শোনাবেন?"

বিমলেশ হতাশ হয়েছেন । গল্পটি বিখ্যাত হয়েছিল সেই সময়। এখনো পড়তে শিহরন হয়, এ কথা বলে অনেক তরুণ লেখক। গল্পটি নিয়ে শর্ট ফিল্ম হয়েছে। অনূদিত হয়েছে পাঁচটি ভাষায়। কিন্তু এই নবীন প্রজন্ম পড়েনি। তাঁর মনে পড়ে সেই ভয়ানক বন্যার কথা। কংসাবতী নদীর বাঁধ ভেঙে জল ধেয়ে আসছিল। তখন শরৎকাল। পুজোর ঢাক নিশ্চয় কলকাতায় বেজেছিল, কিন্তু সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাজেনি। পুজো আসছে। সেই সময়, সেই দিন শরতের মায়াবী আলোয় ভেসেছিল সব দিক। ধ্রুব মাজিদের বাড়ির সামনে দিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা। রাস্তা গেছে পুব থেকে পশ্চিমে। আর উত্তরে ধানখেত। বিঘার পর বিঘা জমিতে ধানের চারা বাতাসে দুলছে।

সবুজ আর সবুজ। আশ্বিন এসেছে সবে। ধানের থোড়ে দুধ আসতে আরম্ভ করেছে। ধ্রুব মাজিদের জমিতে ধান রুয়েছিল শহরের ছেলে বিমলেশ। ধানের আঁটি, ব্যান তার হাতে দিয়ে ধ্রুব বুঝিয়ে দিয়েছিল কীভাবে কাদার ভিতরে ধান রুয়ে যেতে হয়। তার একটা শৃঙ্খলা আছে। বিমলেশ একদিন ঘণ্টাখানেক জমিতে থেকে উঠে এসেছিলেন। কোমর বাঁকিয়ে ঝুঁকে থাকতে হয়। তিনি পারেননি। কিন্তু একটি সারি তো রুয়েছিলেন। বিরল এক অভিজ্ঞতা ছিল তা।

সবুজ প্রান্তরের যেন শেষ ছিল না। বহুদূরে গ্রাম ছায়া। ওদিকের গ্রামের নাম আকালপৌষ। এই নামটি এসেছিল কীভাবে? কোন পৌষ মাসে আকাল হয়েছিল? বাংলা সন ১৩৫০-এর মন্বন্তর দেখা ধ্রুব মাজির বাবা অনন্ত মাজি বেঁচে ছিলেন তখনো। ওই গ্রামে সকলে দীর্ঘায়ু হয়। তিনি বলতে পারেননি। তিনি ছোটোবেলা থেকে আকালপৌষের নাম জানেন। তাহলে কি আনন্দমঠ উপন্যাসে বর্ণিত বাংলা সন ১১৭৬-এর মন্বন্তরে গ্রামের নাম অমন হয়ে গেল? অনন্ত মাজি চাষিবাসি মানুষ, ১১৭৬-এর মন্বন্তরের কথা পড়েননি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে। গ্রামে একটি পাঠাগার ছিল। সেখান থেকে বই এনে পড়ে শুনিয়েছিল বিমলেশ। শুনতে শুনতে অনন্ত মাজির চোখে জল। বলেছিলেন, "তাই হবে বাপ, তখন হয়তো নাম হয়েছিল আকালপৌষ। এদিকে একটা গাঁ আছে, আউশগাঁ। আউশ ধান হয় ভালো। এদিকে একটা গাঁ আছে, বৌডুবি। বৌ ডুবেছিল বড়ো দিঘিতে। এমনি সব আছে। আছে। হ্যাঁ বাপ, করণ্ডা মানে হল কী?"

"করণ্ড মানে মৌচাক। আবার ফুলের সাজি হয় জেঠামশায়।" বলেছিল বিমলেশ।

"তাহলে মৌচাক হবে, এখেনের মানুষের ভিতরে মধু আছে বলা যায় কেনে।"

বিমলেশ বলেছিল, "হ্যাঁ তাই।"

"মানুষের হুল নাই বলতি পার?"

"না, নেই।" বলেছিল বিমলেশ।

বুড়ো বলেছিল, "হবে হয়তো, তবে মানুষের হুল নাই তা সত্যি না বাপ।"

কথাগুলো অবিকল মনে আছে বিমলেশের। লিখবে ভেবেছিল। লিখতে পারেনি। কেন পারেনি বলতে পারবে না। কথাগুলি মনের ভিতরে লুকিয়ে থাকে। এক এক সময় বেরিয়ে এসে আবার হারিয়ে যায়। এখন কেন মনে পড়ল জানেন না। মিলিয়ে যাক আবার।

সেই অবারিত প্রায় ধানখেতের দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে যেত। এক সকালে বিজয় মিদদে যে ছিল অনন্ত মাজির ভাই খাজনা আদায়ের তসিলদার গোপেন্দ্র মাজির খাজনার খাতা বওয়া কর্মচারী, সে চিৎকার করে উঠল, "হুই দ্যাখেন বাবু, গেল গেল সব গেল, বানা আসতেছে, বানা।"

সেই সবুজ খেত ক্রমশ সাদা হয়ে যাচ্ছিল। কাঁসাই নদীর বাঁধ ভেঙেছিল এপারে। এমনটা নাকি ক-বছর আগে ঘটেছিল। এই আশ্বিন মাসে। এই সময় পশ্চিমে বৃষ্টি হলে নদীতে হড়কা বান নামে। সেই বানে বাঁধ ভেঙে প্লাবিত করে দিয়েছিল গ্রামের পর গ্রাম। জগজ্জননী গল্প তখন লেখা। জননীর ঘর ভেসে গেছে, উঁচু রাস্তায় তার আশ্রয়। জল না নামলে ধান সব যাবে। পরের সনে খাওয়া হবে কী? জল নেমেছিল ক-দিনের ভিতর। উলটো দিকে দাসপুরের ক্যানেল টেনে নিয়েছিল। বিমলেশ বললেন, "যার পড়ার ইচ্ছে সে বই থেকে পড়ে নেবে।"

যুবককে দেখতে পেলেন বিমলেশ, সে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে। বহু পুরাতন সেই দৃষ্টি রেখা। ধ্রুব মাজি। পঞ্চাশ বছর ধরে তাকিয়ে আছে সে। বিমলেশ মাথা নামিয়ে নিলেন। সেবার জল নামার পর, রাস্তাঘাট শুকোলে তিনি কলকাতা ফিরেছিলেন ধ্রুব মাজিকে গ্রামে রেখে। আবার দেখা হবে কমরেড। ধ্রুব মাজি কেন, অনেকে বলেছিল সংক্রান্তি কাটিয়ে যেতে। কিন্তু আশ্বিনের পর কার্তিক, তারপর অঘ্রান, পৌষ। অনেক দিন, অনেক দিন। বাড়ি টানছিল। ধ্রুব মাজির বাবা অনন্ত মাজির কাছে চিঠি এসেছিল। সেও অনন্ত মাজিকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছিল। যুবককে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কিছু বলবে?"

যুবক মাথা নাড়ল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "আপনিই তাহলে তিনি।"

"হ্যাঁ আমিই সে।" বললেন বিমলেশ।

"আমার বিশ্বাস হয় না।" যুবক বলল।

"কেন হয় না?" জিজ্ঞেস করলেন বিমলেশ।

যুবক বলল, "বলতে পারব না।"

বিমলেশ উপস্থিত অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বললেন, "ধ্রুব মাজির করণ্ডা গ্রাম থেকে এসেছে, যেখানে বসেই আমি বন্যার পরে 'জগজ্জননী' গল্প লিখেছিলাম, কী নাম আপনার?"

গৌরগোপাল নিজের পরিচয় দিল। সে যে প্রাক্তনী তা বলতে ভুলল না। শুনতে শুনতে বিমলেশ জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু বলবেন?"

বলাইদা জিজ্ঞেস করছিল, "আপনিই সে কিনা, ডাঃ বলাই মাজি, ধ্রুব মাজির খুড়তুতো ভাই।"

"তুমি কী বলবে ফিরে?" বিমলেশ জিজ্ঞেস করলেন।

"বলুন কী বলব?" গৌর জিজ্ঞেস করল।

"তোমার যেমন মনে হয় বলবে।" বিমলেশ বললেন।

এরপর সভা কেমন স্তিমিত হয়ে গেল। আলো মরে গেল আচমকা। নিঃশব্দে প্রশ্নোত্তর পর্ব হল। জমেনি তেমন। সভা শেষ হলে গৌরগোপাল তাঁর ঠিকানা চায়। ফোন নং। ই-মেল। বিমলেশ তাঁর কার্ড দিলেন।

তিন

গৌরগোপাল শেষ বাস বাবা ত্রিলোচন এক্সপ্রেসে ফিরবে। একটু আগেই টারমিনাসে চলে গিয়েছিল। তখন বাস ফাঁকা। সবে পৌনে পাঁচটা। অফিস-আদালতের লোক আসবে সময় মতো। তারা নিত্যযাত্রী। তাদের আসন বাঁধা। কন্ডাকটরকে

জিজ্ঞেস করে জানালার ধারে জায়গা পেয়ে গেল গৌর। বেলা চারটেয় কলেজের প্রোগ্রাম শেষ। লেখক কলকাতায় চলে গেলেন। ত্রিলোচন এক্সপ্রেস বাস ছাড়ে জেলার বাস টারমিনাস থেকে। সেখান থেকে নানা দিকে বাস যায়, দক্ষিণে, উত্তরে, পুবে, পশ্চিমে। দিঘা, পাঁশকুড়া, ঘাটাল, ঝাড়গ্রম, হলদিয়া, সব দিকে। ঝাড়গ্রাম এখন আলাদা জেলা, হলদিয়াও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। লেখক যখন ছিলেন এ জেলায়, সব এক জেলা। বাস ছাড়তে ছাড়তে পৌনে ছটা। জানালার ধারে বসে গৌরগোপাল ঘুমিয়ে পড়বে ভাবছিল। সেই কোন সকালে বেরিয়েছে মুড়ি, পিঁয়াজ, আলুর তরকারি খেয়ে, দুপুরেও মুড়ি, ছোলা, বাদাম। কলেজ থেকে প্যাকেট দিয়েছিল। তা খেয়েছে বাসে বসে। গজা, কেক, সন্দেশ আর একটি লাড্ডু। এখন সে ঘুমতে চাইছিল। পরিকল্পনা তেমন ছিল। কিন্তু একটু বাদে বাসে উঠে এল শুভ। শুভদীপ কলকাতায় চাকরির জন্য ধর্নায় গিয়েছিল একবার। তখন তাদের জমির ধান উঠে গেছে। তিনদিন ছিল। এবার জেলায় শুরু করবে শুনেছে। থাকে গোলগ্রাম। তারপর কুলিয়া, মিঞাপাড়া, করগুা, শিবতলা, ত্রিলোচনপুর। তার গন্তব্য শিবতলা। করগুার উত্তরে এক স্টপেজ। মৌজা করগুাই। শুভদীপ তাকে হাত তুলল। গৌর হাত নাড়ে। কোথায় এসেছিলি, নিতাই রায়ের খোঁজে?

পাশাপাশি সিট। তিনটি সিটের শেষটি শুভদীপের। অন্য জায়গায় বসতে পারত, কিন্তু এই সিটেই বসল। বলল, নিতাই নাকি দিল্লি পালিয়েছে?

গৌর এবারও মন্তব্য করল না। শুভদীপ কথা বলতে চাইছে। আর সে কথা গৌরের আকাঙ্ক্ষিত নয়। শুভদীপ মামলা, ধর্না নিয়ে কথা বলবে। নিতাই রায়ের জোচ্চুরি নিয়ে কথা বলবে। তাতে সায় দিয়ে যেতে হবে তাকে। গৌর আর শুভর মধ্যে বসেছেন এক বয়স্ক মানুষ। ক্লান্ত। নামবেন লোয়াদা। এঁকে চেনে গৌর। লোয়াদা থেকে এক মাইল পশ্চিমে। হেঁটে যেতে হবে তাঁকে। মেদিনীপুর কোর্টের মুহুরি। তিনি বিরক্ত হচ্ছিলেন শুভর কথায়। গৌর কথা বললে, দু-দিকের কথায় বিদ্ধ হবেন তিনি। শুভ বুঝেও বোঝে না, বলল, লিস্ট করা হচ্ছে জানিস।

গৌর চোখ বুঁজল। সে চুপ করে থাকলে শুভদীপ থামবে। নানারকম বলতে বলতে শুভদীপ থামল অবশেষে। শুভদীপের নাম ছিল নাকি প্যানেলে কিন্তু চাকরি হয়নি। শুভদীপের নাম ছিল কি ছিল না, সে বিষয় পরিষ্কার নয়। কত নম্বরে ছিল, তা বলে না। কিন্তু ছিল। চাকরি হয়নি। প্যানেলে নাম থাকলেই যে চাকরি হবে, এমন কথা নয়। কত ভ্যাকান্সি, তার উপর নির্ভর করবে। এদের অনেকে আবার দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার পরীক্ষা দিয়েছে চাকুরিরত অবস্থায়। কারণ ভালো জাগ্যায় পোস্টিং তার বড়ো কারণ। রেজাল্ট ভালো হলে তা হবে। এতে কী হয় ভালো ছেলেরা চাকরি বদল করে, অমেধাবী ছেলেরা চাকরি পায় না। এমন আইন হতে পারে তো, কেউ একবার পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেলে, ফের ওই চাকরির পরীক্ষায় বসতে পারবে না। এমন আইন থাকলে গৌরের চাকরি হয়ে যেত হয়তো। শুভদীপেরও। এমন একজন আছে সুদাম মণ্ডল। তিনবার পরীক্ষা দিয়ে তিনবারই উত্তীর্ণ। এখন দাসপুর ইস্কুলে চাকরি করে। সোনামুই খাল পেরিয়েই ওপারে। খালের উপর ব্রিজ হয়েছে। টোটোয় চেপে ইস্কুলে যায় স্যার সুদাম মণ্ডল। প্রথমে চাকরি পেয়েছিল রামজীবনপুর তাঁতিপাড়া হাই ইস্কুলে। দূর ছিল বেশ। থাকতে হত সেখানে। পরে হল ডেবরা মাড়োতলা। শেষবারে দাসপুর। যতবার রেজাল্ট বেরিয়েছে, সে আগের ইস্কুল ছেড়ে নতুন জায়গায় জয়েন করেছে। একটা করে পদ খালি হয়েছে। কিন্তু সেখানে কেউ ঢুকতে পারেনি। ইস তেমন জায়গায় যদি গৌর ঢুকতে পারত, সে চলে যেত রামজীবনপুর, শালবনি, লালগড়, যে কোনো জায়গায়। গৌর ঘুমিয়ে পড়ছিল। ঘুমের ভিতরে লেখককে দেখল। তিনি তার সঙ্গে করগুা এসেছেন। এলেন কখন? তাঁর হাতে ফুল দিচ্ছেন বলাই মাজি। বলাইকাকা। বলাইকাকা আর লেখক খুব হাসছেন। সে ভেবেছিল বইয়ে সই করিয়ে আনবে।

লেখকের দিকে বই বাড়িয়ে দিয়েছে বলাই মাজি। লেখক সই করছেন, কলম ঘষছেন। কী সুন্দর কলম! সোনার কলম। লেখক বলছেন সোনার কলম দিয়েছেন এক পাঠিকা। তিনি থাকেন সিয়াটলে। সিয়াটল গিয়েছিলেন তিনি। খুব ঠান্ডার দেশ। তাপমাত্রা বাড়েই না একেবারে। লেখক এসব বলেছেন কলেজের লেকচারে। সেই সোনার নিব শুকিয়ে গেছে। কালি বের হচ্ছে না। স্যার স্যার স্যার, এই নিন। কলম খুঁজতে লাগল গৌর। গৌরের কলম কোথায় গেল? ব্যাগের ভিতরে শুধু মুড়ি। মুড়ির প্যাকেট ফেটে গেছে। গৌরের ডট পেন গেল কোথায়। না পেয়ে গৌর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। সোনার নিব ঝকঝক করছে, কিন্তু কালি নেই। বলাই মাজি বলল, মাস্টারি পেয়েছিস আর কলম ত্যাগ করেছিস! লেখক হা হা করে হাসতে লাগলেন। ঘুমটা ভেঙে গেল। বাসের ভিতর অন্ধকার। বাস ছুটছে হাইওয়ে দিয়ে। বড়োবড়ো স্টপেজ। বাসের ভিতরে অখণ্ড নীরবতা। জানালা দিয়ে বাতাস ঢুকছে প্রবল। সেই বাতাস চৈত্রের। গৌর বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল। একেবারে কালো পর্দা ফেলে দিয়েছে কেউ যেন। আকাশে মেঘ আছে মনে হয়। তারা দেখা যাচ্ছে না। সে আবার চোখ বুজল। মুখের উপর ঝাপ্টা মারতে লাগল বাতাসের পর বাতাস। শুভদীপ চাকরি পায়নি। পেত না। প্যানেলে তার নাম ছিল না। যাদের নাম ছিল না, তারা পেলে সে পাবে না কেন? কিন্তু পাবে কীভাবে? সে তো নিতাই রায়ের কাছে যায়নি। নিতাই রায়ই চাকরি করে দেওয়ার লোক। গৌরকে তো দিয়েছে। শুভ ঘুমচ্ছে নিশ্চিন্তে। সে নিজে পাবে না, কাউকে নিতেও দেবে না। আমি না পেলে তুমি পাবে কেন? শুভর বাড়ির অবস্থা ভালো। চাষজমি অনেক। পাকা দোতলা দালান। মোটর সাইকেল আছে। সে চাষবাস দ্যাখে আর মামলা করে। জমির মামলা কম নয়। দিনরাত বি এল এল আর ও, অফিস, বিডিও অফিস ঘুরে বেড়ায়। এর ভিতরে হাতখরচের জন্য একটি চাকরি পেলে হত তার। বাতাসের ঝাপটার ভিতরে এইসব ভাবতে

ভাবতে ঘুমিয়ে পড়তে লাগল গৌর। ঘুম যখন আসবে, ডেবরা চকে এসে দাঁড়ায়। আলো ঝলমল ডেবরা। এখান থেকে ডাইনে মাড়োতলা যাবে গাড়ি। না, এই গাড়ি নয়। অন্য গাড়ি। পিছন পিছন আসছে। তারা সোজা গিয়ে আষাঢ়ির মোড় থেকে বামে ঘুরবে। শুভ জেগে উঠেছে, বলল, গৌর ঘুমালি ?

না, একটু আর কী। গৌর সামান্য কথায় কথা শেষ করতে চাইছিল। কিন্তু শুভ সে পাত্র নয়। তাদের মধ্যকার ব্যক্তি নেমে গেলেন। গৌর জিজ্ঞেস করল, এখেনে, আপনি না লোয়াদায় নামেন? কোন গ্রাম?

ধ্রুব বুঝিয়ে দিয়েছিল কীভাবে কাদার ভিতরে ধান রুয়ে যেতে হয়।

লক্ষ্মীপুর, এখেনে আহ্লাদি গ্রামে মেয়ের বাড়ি, সামনে, ভ্যানে গেলে একটুখানি। বলে হাসলেন তিনি। লম্বা, রোগা। হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। প্যান্ট-শার্ট। মাথা ভরা টাক। জায়গাটা খালি হয়ে গেল অচিন্বিতেই। উনি লোয়াদা অবধি তো যেতেনই। তারপর নদী ব্রিজ পেরিয়ে গোলগ্রাম একটুখানি। গোলগ্রামে নেমে যেত শুভদীপ। তার সঙ্গে কথা বলার ফুরসত হত না। এখন বকর বকর করবে। তাকে উত্ত্যক্ত করবে। বলবে, মামলায় সে টাকা দিয়েছে। ঠিক সেই কথা বলবে। ও এইচ এস পেরিয়ে আর পড়েনি। প্রাইমারির চাকরিতে এইচ এস লাগে। সুতরাং ওর চাকরি পাওয়ার হক আছে। আছেই। পরীক্ষায় বসেছে মানে চাকরি পাবে। ডেবরা থেকে লোক উঠল। ধুতি-পাঞ্জাবি, মাথায় গান্ধী টুপি, চোখে চশমা, লম্বা এবং ভারী, যাকে বলে দশাসই চেহারা। অনেকটা জায়গা নেন। আশ্চর্য, শুভদীপ সরে এল না। তিনি তাদের দুজনের মাঝখানে বসলেন। মাঝখানে এসে বসায়, খুব ঠেসে গেল গৌর। সকলে সকলকে চেনে। গ্রাম-মফস্‌সলে এমনই হয় প্রায়। ইনি ত্রিলোচনপুরের কমলাক্ষ গুছাইত। একবার ঘুষ দিতে গিয়ে বি এল এল আর ও অফিসে ধরা পড়েছিলেন। তারপর আবার থানায় টাকা দিয়ে দু-দিন হাজত খেটে মুক্তি। এঁদের জমি আছে অনেক। পুকুর, আমবাগান, শালী জমি, ডাঙা জমি, সব রকম। জমি ভেস্ট হচ্ছিল, তা আটকাতে গিয়ে ঘুষ। অফিসার তেড়িয়া ছিল। থানায় খবর দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু অফিসার টিকতে পারেনি। বদলি হয়ে গেছে। আর কমলাক্ষ কাকার জমি রক্ষা হয়েছে। লোকটা খুব মামলাবাজ। সিটে বসে দু-দিকের দুজনকে দেখল ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। তারপর গুম হয়ে বসে থাকল। আর মিনিট চল্লিশ, তারপর আজকের মতো থামবে বাস। কাল সকালে বেরোবে আবার। সকালে গিয়ে দুপুরে আসে, আবার ছেড়ে রাতে ফেরে। আর আছে বাবা মহাদেব এক্সপ্রেস। সেই বাস উলটো চলে। এক সপ্তাহ অন্তর দুই বাসের চলাচল বদল হয়। শুভদীপ আবার জেগে উঠছে, জিজ্ঞেস করল, "তোকে কি সমন পাঠিয়েছে?"

জবাব দেয় না গৌর। বরং বাইরে তাকিয়ে থাকে। বাস ছাড়ল। কথাটা আবার জিজ্ঞেস করল শুভদীপ। লোককে উত্ত্যক্ত করেই ওর আনন্দ। তখন কমলাক্ষ গুছাইত তাকে ঠেলা মারল, "এই গৌর, গৌর তো, তুমি করণ্ডায় থাকো তো, জিজ্ঞেস করছে তোমাকে।"

গৌর বলল, "করুক।"

গুছাইত জিজ্ঞেস করল, "কীসের সমন?"

গৌর নয়, শুভদীপ বলল, "আদালতের সমন।"

"সমন তো আদালতের হয়, কোন আদালত?"

গৌর চোখ বুজে আছে। চোখ বুজলে কি কথা শোনা যাবে না? তবু চোখ বন্ধ করে রইল। তখন গুছাইত আর শুভদীপ বাক্য বিনিময় করে যাচ্ছে গৌরকে নিয়ে। কমলাক্ষ গুছাইত লোকটা মামলাবাজ, থানা-পুলিশ, আইন-আদালত সম্পর্কে ওর অনেক অভিজ্ঞতা। তাই তার প্রশ্নে শুভদীপ বলল, "জেলা আদালতেও গেছে কেসটা।"

"কী কেস বলো দেখি।"

"আজ্ঞে ঘুষ দিয়ে চাকরি।" শুভদীপ বলল।

"সে তো কলকাতায় হচ্ছে।"

"ওই কলকাতায়, সেখান থেকে কেস জেলা আদালতেই পাঠাবে।"

গুছাইত বলল, "ফৌজদারি হবে, সেকশন কত দিয়েছে?"

"জানি না।" শুভদীপ মাথা নাড়ে।

"সমন না এলে জানা যাবে না, ফৌজদারি মামলা খতরনাক,

দেওয়ানিতে জেল হবে না, জমির টাইটেল বদল হবে, তোমারটা আমার, ফৌজদারিতে হাজতবাস, পুলিশের মার, সব হয়।"

"জেল হবে বলছেন!" শুভদীপের গলা নেমে গেল, 'অতটা হবে?" শুভদীপ অতটা চায় না। চাকরি চলে যাক, কিন্তু জেল হাজত হবে কেন, তা ঠিক মনে হচ্ছে না।

গুছাইত মশায় বললেন, "হবে, আমার ক-দিন হয়েছিল ফলস মামলায়, কিন্তু দু-দিন হাজত হল, শেষে পুলিশ ক্ষমা চেয়ে ছেড়ে দিল, পরে অফিসার বদলি হয়ে গেল মিথ্যে অভিযোগে পাবলিককে হয়রানির জন্য।"

শুভদীপ বলল, "চাকরি চলে যাবে এই পর্যন্ত শুনেছি।"

"সেইটা আলাদা কেস, ঘুষ আলাদা কেস।"

"ঘুষ আর চাকরি পাওয়া এক নয়?' শুভদীপ বিস্মিত, আবার বলল, "ঘুষেই তো চাকরি।"

"ঘুষ দেওয়া অপরাধ, ঘুষ নেওয়াও অপরাধ, সব ফৌজদারি মামলার অন্তর্ভুক্ত।"

"ঘুষ দিয়ে চাকরি পাওয়া অপরাধ নয়?"

'না, কোয়ালিফিকেশন থাকলে চাকরি যাবে না, কিন্তু ঘুষ দেওয়ার জন্য শাস্তি হবে।" গুছাইত মশায় বললেন।

চুপ করে গেল শুভদীপ। গুছাইত মশায় সব কিছুকে গুলিয়ে দিতে ওস্তাদ। কী বলছেন, কী বলছেন না তা ধরা কঠিন। ঘুষের জন্য শাস্তি হবে, জেল হাজত, ফাঁসি, জরিমানা, কিন্তু চাকরি তার থাকবে। অদ্ভুত। এইসব কথার কিছু কিছু গৌরের কানে গেল। সে সহ্য করতে পারছিল না। কিন্তু উপায় কী। তবু শুভদীপ থামল গৌরের অজ্ঞাত কারণে। তারপর গাড়ি আষাঢ়ির মোড় থেকে ঘুরল। হাইওয়ের অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে প্রবেশ করল। দূরে দূরে গ্রাম একখানি, মাঝে নাড়ায় ভরে ধান কাটা মাঠ। গ্রাম চেনা যায় হেরিকেন কিংবা টেমির আলোয়। বাস তার হেডলাইট জ্বালিয়ে ছুটছিল। এখন আর যাত্রী নেই। যা আছে তা নামতে নামতে বাস ফাঁকা হয়ে যাবে ত্রিলোচনপুরে গুছাইত মশায় নেমে গেলে। লোয়াদায় প্যাসেঞ্জার নামে, কিছু ওঠে, সারাদিন ব্যবসা করে বাড়ি ফিরতে এই শেষ বাস। ব্রিজ পার করে গোলগ্রামের অন্ধকারে নামে শুভদীপ। গৌর ঘুমের ভান করে চোখ বুজে রয়েছে। তারপর সেই যাত্রা শেষ হল। সে করগুায় নেমে মোবাইল ফোনে সময় দেখল। আটটা বাজতে কুড়ি মিনিট। এখন টিভিতে 'ও আমার ময়না রে' সিরিয়াল। বলাই মাজি দ্যাখেন না টিভি। অবসরে বই পড়েন। বইয়ে তাঁর খুব নেশা। ইচ্ছে ছিল মেদিনীপুর গিয়ে লেখক বিমলেশ বসুর সঙ্গে দেখা করেন। চিনলেও চিনতে পারেন। ভুলে কি যেতে পারেন? বলাই বলেন, ভুলতে পারবেন না লেখক।

বলাই মাজির বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করল গৌর। নিজের বাড়ি মানে একা বসে মোবাইলে খুটখাট। বাড়িতে জেনে গেছে, সে বিপদে পড়েছে। তাতে মা ছাড়া আর কেউ তার পক্ষে নেই। সকলে শুভদীপের মতো চায় চাকরিটা তার চলে যাক। চিলের মতো সাঁ করে ডানা ভাসিয়ে নেমে আসবে অন্য চাকুরিপ্রার্থীরা। আগে কত চিল ছিল, এখন অজ্ঞাত কারণে অদৃশ্য হয়েছে। না কি আছে, আকাশেই সারাদিন কেঁদে বেড়ায়। জীবনানন্দ দাস পড়তে তার খুব ভালো লাগে। এই ভিজে মেঘের দুপুরে তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে। হায় চিল। সোনালি ডানার চিল। বিমলেশ বসুর একটা গল্প আছে ঈগল নিয়ে। সোনালি ঈগল। পশ্চিমের এক পাহাড়ি এলাকার কাহিনি। দারুণ গল্প। এই রকম ভাবতে ভাবতে গৌর চলেছে বলাই মাজির বাড়ি। এক একদিন তাঁর সঙ্গে গৌরের কথা হয় বিমলেশ বসুর গল্প, উপন্যাস নিয়ে। বলাই মাজির বাড়ির কুলি রাস্তায় আলো আছে। কিন্তু সেই ময়লা টিউবের আলো রাস্তা অবধি নামে না। ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে গৌর। পথ দেখে দেখে চলল। হুঁ, বলাই মাজি বসে আছেন তাঁর পাকা বাড়ির গ্রিল-আঁটা বারান্দায়। গৌর ডাকল, "বলাইকাকা।"

বলাই উঠে গ্রিলের তালা খুললেন, বললেন, "লাস্ট বাসের হর্ন শুনলাম, ভাবলাম তুই হয়তো কাল আসবি।"

না, খবরটা দিয়ে যাই। বলে গৌর বসল বেতের চেয়ারে। বলাই বিজলি বাতির আলোয় দেখলেন গৌরের মুখখানি শুকনো। সন্ধে সাতটার টিভির খবরে দেখলেন বনগাঁর এক রঞ্জনের খোঁজ করছেন বিচারক। সে প্রচুর চাকরি দিয়েছে। মহামারির জ্বরের মতো সব ছড়িয়ে পড়ছে। হুল্লোড় লেগে গেছে। এমন তো হয়, কবে হয়নি? একটা সময় ছিল ইস্কুল নিজেরাই পত্তন করে সরকারের সম্মতি আনলে হয়ে গেল। তার জন্য ব্লক, মহকুমা, স্কুল পরিদর্শক থেকে জেলা পরিদর্শক সকলকে তোয়াজ করতে হত। তোয়াজ মানে টাকার থলে। তাঁরা ঠিক রিপোর্ট দিলেই স্কুল অ্যাপ্রুভ হবে। টিচারকে মাইনে দেবে সরকার। সেও কি সোজা পথ ছিল? বলাই জিজ্ঞেস করলেন, "সারাদিন খাসনি মনে হয়?"

"হ্যাঁ, খেয়েছি, কিন্তু যাওয়াটা বেকার হল। গৌর গলায় আক্ষেপ ফুটিয়ে বলল।

বলাই জিজ্ঞেস করলেন, "কেন তিনি কি আসেননি?"

"এসেছেন, আসবেন না কেন, কিন্তু তিনি নন।"

বলাই বললেন, "সেই বিমলেশ নন, ধ্রুব মাজির কমরেড।"

না বলাইকাকা, তিনি নন, বললেন, তিনি ভাগলপুরে বড়ো হয়েছেন, কলকাতায় এসেছিলেন এম এ পাশ করে চাকরি খুঁজতে, ভাগলপুরেই বড়ো হয়েছেন, তাঁর বাবা ডাক্তার ছিলেন...।"

বলাই মাজি অবাক। বললেন, "না তো, বিমলেশ বসুর বাবা সরকারি অফিসার ছিলেন, উচ্চপদস্থ, তা আমরা জানতাম, ওদের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে, পাকিস্তান হলে এপারে চলে আসে, কলকাতায় একটি বাড়ি পেয়েছিল বিনিময় করে, সব আমি জানি, ওর জন্ম এপারে।"

মাথা নাড়ে গৌর, ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে। ঢকঢক করে জল খায়। জল বুকে পড়ে বোতলের কোণ থেকে গড়িয়ে। জামার হাতা দিয়ে মুছে নেয় তা। বলে, "ওঁরা ভাগলপুরের লোক, ভাগলপুরে কত বড়ো বড়ো

লেখকের জন্ম, বনফুল, দিব্যেন্দু পালিত। বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে বসেই লিখেছিলেন 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের মামাবাড়ি ভাগলপুরে। শ্রীকান্ত উপন্যাসে...।"

বলাই হাত তুললেন, বললেন, 'এসব তো সকলে জানে, ক-দিন আগেই ভাগলপুর নিয়ে একটা লেখা বেরিয়েছিল খবরের কাগজে। তাতে এসব ছিল।"

গৌর বলল, "উনি বক্তৃতায় যা বললেন, তা বললাম।"

"উনি এইসব বললেন, আগের সপ্তাহের খবরের কাগজের রিপোর্ট?"

"বললেন তো।"

"তাহলে জগজ্জননী গল্প?"

"গল্প কত রকমে লেখা হয়, কল্পনা, লোকের কাছে শুনে, আমি অবশ্য জিজ্ঞেস করিনি ওই গল্প সম্পর্কে।" গৌরগোপাল বলল।

"আমরা তাহলে ভুল ভেবেছি?" বলাই মাজির গলায় নৈরাশ্য।

"হ্যাঁ, উনি আমাদের জেলায় কয়েকবার এসেছেন মাত্র, একবার ঝাড়গ্রাম কলেজে, একবার বেলদা কলেজে, একবার সবং কলেজে, আর আসেননি।" গৌর কথাটা বলে নিশ্চিন্ত হল।

"ধ্রুব মাজির নাম করেছিলি?"

"হ্যাঁ, চিনতে পারলেন না।" গৌর বলল।

কথা আর বেশিদূর এগোয় না। একসময় বলাই মাজির মনে হয়, মিথ্যে কথা বলছে গৌর। গৌর হয়তো যায়নি। সেই সন্দেহ প্রকাশ করলেন বলাই। তাতে গৌর বলল, "আমি মিথ্যে বলব কেন, এই দেখুন লেখক স্যারের কার্ড।"

কার্ড হাতে নিলেন বলাই। কী মনে করে মেল ঠিকানা টুকে নিলেন ডায়েরিতে। গৌর দেখল। তারপর একসময় উঠল। ফিরতে ফিরতে ভাবছিল, এতখানি মিথ্যে বলল কেন? তার কী স্বার্থ? লেখকের অনুরাগী বলে? বলাই মাজি তার কথা বিশ্বাস করেনি স্পষ্টত। না করুক। গৌরের যা মনে হয়েছে বলেছে। লেখকের প্রতি তার যেমন অনুরাগ আছে, ধ্রুব মাজির প্রতিও আছে।

চার

কলকাতায় ফিরে দিন সাত বাদে ইমেলে একটি চিঠি পান বিমলেশ। প্রেরক গৌরগোপাল মাজি। সে লিখেছে—

শ্রীচরণেষু,

আমার পিতার নাম ধ্রুব মাজি। তিনি ২০০৯ সালের ১৪-ই নভেম্বর গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। করণ্ডায় নন, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল নন্দীগ্রামে। তিনি কৃষিজমি রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। না, তিনি বিপ্লবী ধ্রুব মাজি নন, যিনি আমার জন্মের বহু পূর্বে করণ্ডা গ্রামে পৌষ মাসে গুলিবিদ্ধ হন এবং মারা যান। আমাদের গ্রামে অনেক ধ্রুব। ঘরে ঘরে একটি ধ্রুব, ধ্রুব মাজিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সতীর্থ বিমলেশ বসুকে নহে। বিমলেশ বসু তাঁহার 'জগজ্জননী' গল্প লইয়া করণ্ডা ত্যাগ করিবার পর পরই পুলিশ ঢোকে গ্রামে। তখন রাস্তা শুখা হইয়া গিয়াছিল। ধ্রুব মাজি রক্ষা পান নাই। মহাশয়, বলাই মাজি ডাক্তার যিনি এখন আপনারই বয়সি অথবা কিঞ্চিৎ বড়ো, তিনি জানিতে চান, আপনিই সে কি না। আপনি সে নন, আমি তাহা বলিয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়াছি। আপনি কি আমাকে লইয়া লিখিবেন, পাঁচ লাখ টাকা দিয়াছিলাম একটি জলাশয় এবং ধানজমি বিক্রয় করিয়া, ধার করিয়া, মায়ের গহনা বন্ধক দিয়া, চাকরি করিলাম এক বছর দুই মাস। অতঃপর সে চাকরি চলিয়া গেল প্রায়। হেড মাস্টার বলিয়াছেন কোর্ট নাকি রায় দিয়াছে এমন। আমি অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম, কথাটি সত্য। অসৎ উপায়ে চাকরি জোগাড় করিয়াছিলাম। যখন উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ধরনায় বসিয়াছিল কলিকাতায়, তখন আমি বেতন পাইতেছিলাম। হাইকোর্ট বলিয়াছে বেতন ফেরত দিতে হইবে। কীভাবে তাহা সম্ভব হইবে জানি না। টাকা একবার হাত হইতে বাহির হইয়া গেলে, ফেরত আসে না। গ্রামের যিনি টাকা লইয়াছিলেন, তিনি বেপাত্তা হইয়াছেন। শুনিয়াছিলাম মেদিনীপুর শহরে তাঁহার আশ্রয়। খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই ঠিকানায় গিয়া পাই নাই। তিনি দেখা দেন নাই। পরিবারের লোক কহিল কলকাতা গিয়াছেন।

আপনার জগজ্জননী গল্প আমি পড়িয়াছি। মনে হইয়াছে বন্যার যে চিত্র আপনি আঁকিয়াছিলেন, তাহা অনন্য। ক্ষুধার্ত পার্বতী তাহার অভুক্ত সন্তানদিগকে লইয়া জগজ্জননীর রূপ ধরিল মহাপ্রকৃতির ভিতর, ইহা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু ধ্রুব মাজির মৃত্যুর কথা যখন বলাই ডাক্তার বলেন, জগজ্জননী মুছিয়া যায় মন থেকে। বলাই ডাক্তার বলেন, আপনি সময় মতো করণ্ডা গ্রাম হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, হায় ধ্রুব মাজি কেন গ্রামে রহিয়া গিয়াছিল? ইহার কোনো উত্তর নাই।

প্রণাম নিবেন।
বিনয়াবত
গৌরগোপাল মাজি।

মেল ডিলিট করে দেবেন? মেল ডিলিট করে দিলেও চিঠি তো রয়ে যাবে। প্রেরকের মেলে থাকবেই। মেল থাকল। তিনি দু-দিন ভাবলেন। ধ্রুব মাজির গ্রাম থেকে চলে আসার পর তিনি ভাগলপুর গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। কোনো যোগাযোগ ছিল না। এতদিন বাদে জানলেন ধ্রুব মাজি পুলিশের গুলিতে নিজের গ্রামেই হত হয়েছিল। তিনি চলে আসার দিন কয়েকের ভিতর তা ঘটেছিল। এই ঘটনা কি আকস্মিক? পুলিশ কি তাঁর চলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল? উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী বিমলেশের বাবার যোগাযোগ ছিল কম নয়। এমন ব্যবস্থাই কি করা হয়েছিল? তিনি কি জানেন না কিছুই, আন্দাজ করেছিলেন, কিন্তু মনে স্থান দেন নাই। অথচ এইটি সত্য যে ছটি মাস আত্মগোপন করেছিলেন যে গ্রামে, যে কমরেডের বাড়ি, চাষি পরিবারে, তার খোঁজ নেননি। নেওয়ার কথা মনে হয়নি। এখন কি জীবনের সেই হারিয়ে থাকা সময়কে উদ্ধার করবেন? চিঠির উত্তর দেবেন? নাকি চিঠি পড়ে থাকবে, মেল ডিলিট

করলে রিপ্লাই দেওয়া হবে না আর। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন। অতি সংক্ষিপ্ত।

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পেয়েছি। আপনার দুর্ভাগ্য আমাকে আন্দোলিত করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার কিছু করার নেই। অসততার পক্ষে কী করে কথা বলি? ধ্রুব মাজির মৃত্যুসংবাদ আমি পাই নাই। আমি সেই সময় ভাগলপুরে ছিলাম। ভাগলপুর আমাকে লেখক করেছে।

নমস্কার নেবেন।
বিমলেশ বসু।

এর ক-দিন বাদে বিমলেশ একটি মেল পেলেন। প্রেরক বলাই মাজি। তাঁর মনে পড়ল, সেই কোয়াক ডাক্তারের কথা। সহজে ডাক্তারি শিক্ষা বই পড়ে চিকিৎসক হয়েছিলেন। গ্রামে গ্রামে চিকিৎসা করে বেড়াতেন তিনি। তাঁর চেয়ে একটু বড়ো হবেন। তাহলে এখন সত্তর পার। বাহাত্তর-তিয়াত্তর হবে মনে হয়।

মেলটি এমন।

শ্রী বিমলেশ বসু।

মহাশয়,

আমাকে আপনার মনে আছে কি না বলিতে পারি না। আপনি গৌরগোপালকে বলিয়াছেন, আপনি কখনো এই জেলায় আসেন নাই। তাহলে আপনি কি তিনি নন, যিনি আমাদের করগুা গ্রামে ছ-টি মাস পুলিশের ভয়ে আত্মগোপন করিয়া ছিলেন। বিশ্বাস হয় না। আপনি যতই বলুন, আপনি তিনি নন, আপনি শহিদ বিপ্লবী ধ্রুব মাজির সহিত এই গ্রামে আসেন নাই, আমি তাহা মানি না। আপনার গল্পে আপনি সেই সব চিহ্ন রাখিয়াছেন। প্রত্যেক অপরাধী কিছু কিছু ভুল করে, অপরাধের চিহ্ন রাখিয়া যায়, যা দিয়ে গোয়েন্দা এবং পুলিশ তাহাকে শনাক্ত করিতে পারে। গোয়েন্দা কাহিনিতে তাহাই পড়িয়াছি। আপনি যাহা কহিয়াছেন গৌরগোপাল মাজিকে, তা সত্য নহে, তাহা হইলে জগজ্জননী গল্প কীভাবে রচিত হইল? তাহার ভিতরে আমাদের গ্রাম, আমাদের নদী কীভাবে রহিল, বলিবেন কি? একটি কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিই, আপনি সেই কার্তিক মাসে ধান কাটার মরসুমে করগুা ত্যাগ করিলেন, তাহার দু-দিন বাদে পুলিশ প্রবেশ করিল গ্রামে। ধানকাটা চলিতেছিল। পাকা ধানের ভিতর ধ্রুব মাজি শহিদ হইলেন। নিরস্ত্র যুবককে হত্যা করিল পুলিশ। আপনি কি ইহা জানিয়া গিয়াছিলেন? চিঠি আসিয়াছিল মনে হয়। কী হইয়াছিল তাহা আপনার চেয়ে বেশি কে জানিবে? আমি গৌরগোপালের কথা মানি না। গৌরগোপাল সত্য কহে নাই অথবা তাহাকে আপনি সত্য কহেন নাই।

আমার চিঠির সদুত্তর না পাইলে আপনাকে আমি পরিত্যাগ করিব। বই আর পড়িব না।

নমস্কার লইবেন।
ইতি
বলাই মাজি, গ্রাম করগুা।

বিমলেশের চতুর্দিক দুলে উঠল। রাত অনেক। বিমলেশ উদ্বিগ্ন হলেন। বলাই মাজিরা ভোলেনি। তিনি ভাবছিলেন কী উত্তর দেবেন। হ্যাঁ, তিনি করগুায় আত্মগোপন করেছিলেন, কিন্তু ধ্রুব মাজির মৃত্যুসংবাদ তাঁকে কেউ দেয়নি। তিনি ভাগলপুরে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। পাঁচ বছরের উপর ছিলেন বাংলা থেকে দূরে। বি এ এবং এম এ করেছিলেন ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন ধীরে ধীরে। তিনি ভাগলপুর থেকে কলকাতায় আসা বিখ্যাত লেখকদের সঙ্ঘে প্রবেশ করেছিলেন ক্রমশ। এটি বাংলা সাহিত্যের একটি ব্র্যান্ড।

শরৎচন্দ্র, বনফুল, বিচিত্রা সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে দিব্যেন্দু পালিত, সকলেই ভাগলপুরের সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি তাই হলেন। সেই পরিচয় থেকে বেরিয়ে আসতে চাননি। কিন্তু ইতিহাস তো মিথ্যে হয়ে যায় না। যতই তুমি লুকোতে চাও, ইতিহাস, ইতিহাসই। যা সত্য, তা সত্যই থাকবে। ধ্রুব মাজির মৃত্যু হতে পারে, তা কি তিনি জানতেন না? জানতেন হয়তো না, কিন্তু সম্ভাবনা যে ছিল তা অনুমান করেছিলেন। তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা হয়েছিল ধ্রুব মাজির প্রাণের পরিবর্তে। তিনি ভেবেছিলেন সে গ্রেপ্তার হবে। কিন্তু অদম্য যুবক প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল হয়তো।

বিমলেশ উত্তর লিখতে লাগলেন,

শ্রী বলাই মাজি,

মাননীয়েষু,

ধ্রুব মাজির মৃত্যুসংবাদ আমি পাইনি, কারণ দূর ভাগলপুরে অজ্ঞাতবাসে গিয়েছিলাম। ধ্রুব মাজির মৃত্যু অতীব বেদনাদায়ক। আপনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তা একান্তই আপনার। কিন্তু আমি যে ভাগলপুর থেকেই পাঁচ...।

তিনি লিখতে পারলেন না। মেলের উত্তর দিলেন না। কারণ একটি মিথ্যেকে চাপা দিতে অনেক মিথ্যে রচনা করতে হয়।

এরপর ক-দিন চুপচাপ। বিমলেশ বসু গেলেন দিল্লি। সাহিত্য সম্মেলন। দিল্লিতে থাকাকালীন তিনি আবার চিঠি পেলেন। গৌরগোপাল লিখেছে।

শ্রীচরণেষু,

আশা করি সুস্থ আছেন। বলাই ডাক্তার আপনার বই পড়ে বলেছেন, এ সেই বিমলেশ হতেই হবে। তিনি আপনাকে মেল করবেন। মেলে সব জানাবেন।

বলাই মাজি কীভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তা আমার জানা নাই। আমি তাঁহাকে কিছু বলি নাই। বরং ভাগলপুরের কথা বলিয়াছিলাম। আপনি ভাগলপুরে বেড়ে ওঠা লেখক। কিন্তু আপনার শ্রেষ্ঠ গল্পের বইটি আমি বলাই ডাক্তারকে দিয়াছিলাম। সেখানে জগজ্জননী গল্পে এইসব অঞ্চলের কথা আছে। আকালপৌষ, আকুলিয়া, গোলগ্রাম ইত্যাদি এবং কংসাবতী নদীর কথা আছে। আমি কেন মিথ্যা কথা বলিয়াছি তা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। আমি চুপ করিয়া

ছিলাম। আমার খেয়াল হয়নি আপনার লেখা গল্পে এইসব অঞ্চল অনেকবার উচ্চারিত। বলাই ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ধ্রুব মাজির মৃত্যুসংবাদ আপনি কেন পান নাই? তাঁর মেলের উত্তর পান নাই তিনি। তিনি বলিতেছেন, কমরেড, ছ-মাস অন্ন ধ্বংস করিয়াছেন, ছ-মাস যত্নে ছিলেন, চিকিৎসা পাইয়াছেন, কিন্তু করণ্ডা থেকে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আর খোঁজ নেননি কেন? আপনি গ্রাম ত্যাগ করিবার পরপর পুলিশ কেন ঢুকিল গ্রামে? পথঘাট শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল দিন কুড়ি আগে।

ঘাতক পুলিশ কি অপেক্ষা করিতেছিল আপনার নিষ্ক্রমণের? ইহা আমার কথা নহে। আমার তখন জন্ম হয় নাই, ইহা বলাই ডাক্তারের কথা। তিনি কোয়াক চিকিৎসক হইলেও গরিব মানুষের কাছ থেকে চিকিৎসা খরচ নেন না। তিনি এখনো সাইকেলে গ্রাম-গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে যান। আমাদের এই অঞ্চলে মানুষ দীর্ঘায়ু হইত। বলাই ডাক্তার বলেন, ধ্রুব মাজি বাঁচিয়া থাকিলে একশো বছর অবশ্যই বাঁচিতেন। আপনি কি সত্যই জানিতেন না মৃত্যুসংবাদ? আপনি কি সত্যই জানিতেন না পুলিশ গ্রামে ঢুকিবে? আপনি যথাযথ উত্তর দিবেন আশা করি। বলাই মাজি উত্তর চান। ধ্রুব মাজির মৃত্যু হইবে, তা আপনি জানিতেন, ইহাই বলাই মাজির অনুমান।
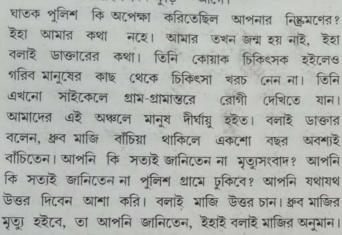
আমাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে পারে শুনিতেছি। মহামান্য আদালত সেই নির্দেশ দিবেন শুনিতেছি। গ্রেপ্তার এড়াইতে আবার কিছু দিতে হইবে শুনিতেছি। ইতিমধ্যে সেই প্রস্তাব পাইয়াছি। পুলিশ রিপোর্ট দিবে নট ফাউন্ড। কী আমাদের ভবিষ্যৎ জানি না। কিন্তু যতদিন গ্রেপ্তার না হই, বলাই ডাক্তারের কথার জবাব দিতে হইবে আমাকে এবং আপনাকে। আমি আপনার অনুরাগী। প্রায় দশ বছর যাবৎ আপনার লেখা পড়িতেছি। আপনার গল্প এবং উপন্যাসে নিজের জীবন খুঁজি। কিন্তু সেই জীবন এই এক অসৎ ব্যক্তির জীবন নয়। চাকরি না হইলে আমার কী হইবে? গ্রামে পাকা রাস্তা, নদীর উপর ব্রিজ হওয়ায় সেই করণ্ডা, আকালপৌষ, গোলগ্রাম বদলাইয়া গিয়াছে। গ্রামে প্রবেশ করিতে কার্তিক মাস অবধি অপেক্ষা করিবে না পুলিশ। যে কোনোদিন যে কোনো সময় পুলিশ আসিতে পারে। দিনে, রাতে, মধ্যরাতে। এসে যে কোনো সাক্ষীকে উধাও করিয়া দিতে পারে। মহামান্য আদালতে আমি সত্য বই মিথ্যা বলিব না। সত্য কথন এই সময়ে আমার কর্তব্য। চাকরি পাইতে যাহা করিয়াছি, তাহা সৎ ব্যক্তির কর্ম নহে। কিন্তু না করিয়া উপায় ছিল না। আপনার কি এমন সময় আসিয়াছিল এই জীবনে?

আমি ভুল করিয়াছি। কিন্তু ভুল না করিয়া উপায় ছিল না। চাকরি আমার দরকার খুব। যে কৃষিজমি আছে, তা ভাগাভাগি করিয়া যেটুকু ভাগে পড়িবে, তাহা দিয়া জীবন চলিবে না। আমি নিজ হাতে চাষ করিতে পারি না, যেমন পারিতেন শহীদ ধ্রুব মাজি। এখন আমি অপেক্ষা করিতেছি কত রাতে পুলিশ আসিয়া বাড়ি ঘিরিয়া ফেলে। আমি হয়তো বাঁচিব না, কারণ আমি আদালতে সত্য কহিব। কাহাকে জমি বিক্রি করিয়া কাহাকে টাকা দিয়াছি, তাহা কহিব আদালতে। ধর্মাবতার আমি অপরাধী। টাকা দিয়াছি অমুকচন্দ্র অমুককে। আপনি বলাই মাজির প্রশ্নের উত্তর দিবেন আশা করি। আমি আপনার অনুরাগী। শ্রদ্ধাশীল। বলাই মাজির কথা মিথ্যা হউক।
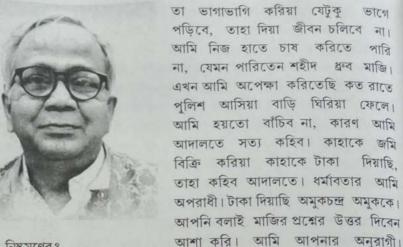
প্রণামলইবেন।

গৌরগোপাল।

দিল্লিতে পাঁচতারা হোটেলে ছিলেন বিমলেশ। একা। সাহিত্য সম্মেলন শেষ হল। বই স্বাক্ষর অনুষ্ঠান শেষ হল। সেলফি, অটোগ্রাফ সব শেষ হল। আগামীকাল দুপুরে কলকাতার উড়ান। তিনি তাঁর বড়ো অ্যান্ড্রয়েড ফোন বন্ধ করলেন। ডিনার হয়ে গেছে। একা একা শুয়ে তাঁর মনে হল, বলাই মাজি এবং গৌরগোপালকে ব্লক করবেন। মেল কি ব্লক করা যায়? তিনি আর উত্তর দেবেন না। বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলেন না। উঠে জল খেয়ে ব্যালকনিতে এলেন। ব্যালকনিতে বসে নিঝুম শহরের আকাশে তাকিয়ে ছিলেন বিমলেশ। তখন অনেক দূরে, সেই আষাঢ়ি-দ, লোয়াদা, কাঁসাই নদী, গোলগ্রাম, আকালপৌষ, আকুলিয়া, করণ্ডায় পৌঁছে গিয়ে লেখক দেখলেন, সেই যুবক, তার বয়স বাড়তে বাড়তে অনেক হয়ে গেছে। সত্যের ভারে নুয়ে গেছে অনেক। সে মেল পাঠিয়েই যাচ্ছে। ধ্রুব মাজি বেঁচে থাকলে এমনটি হত না। সে লিখছে, ধ্রুব মাজিকে নিয়ে লেখক কেন পালাইয়া যান নাই করণ্ডা গ্রাম হইতে? ক্ষুব্ধ হলেন বিমলেশ। মনে হল, তাহলে এখন গৌরগোপালের মৃত্যু হোক। এত কথা বলছে কেন সে? তাহলে বলাই মাজির মৃত্যু হোক। এদের কেউই সত্য বই মিথ্যে কহিবে না। সুতরাং এদের মৃত্যু হোক। সেই যে লোকটা চাকরি দেবে বলে অনেক টাকা নিয়ে শহরে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে, সেই লোকটাই ঘাতক পাঠাবে। পাকা রাস্তা, নদীর উপরে সেতু, ঘাতকের কাজ সহজ করে দিয়েছে। লেখক তাঁর অজ্ঞাতে আর একটি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। মনে মনে বললেন, তাহলে গৌরগোপালের মৃত্যু হোক। সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ লুপ্ত হোক। সব সত্যের অবসান হোক। আর বলাই মাজি, সে আর কতদিন বাঁচবে? মহামারি এখনো যায়নি। মহামারি তাকে খেয়ে নিক। ❖

খাদের ধারে দুজন

বিনোদ ঘোষাল
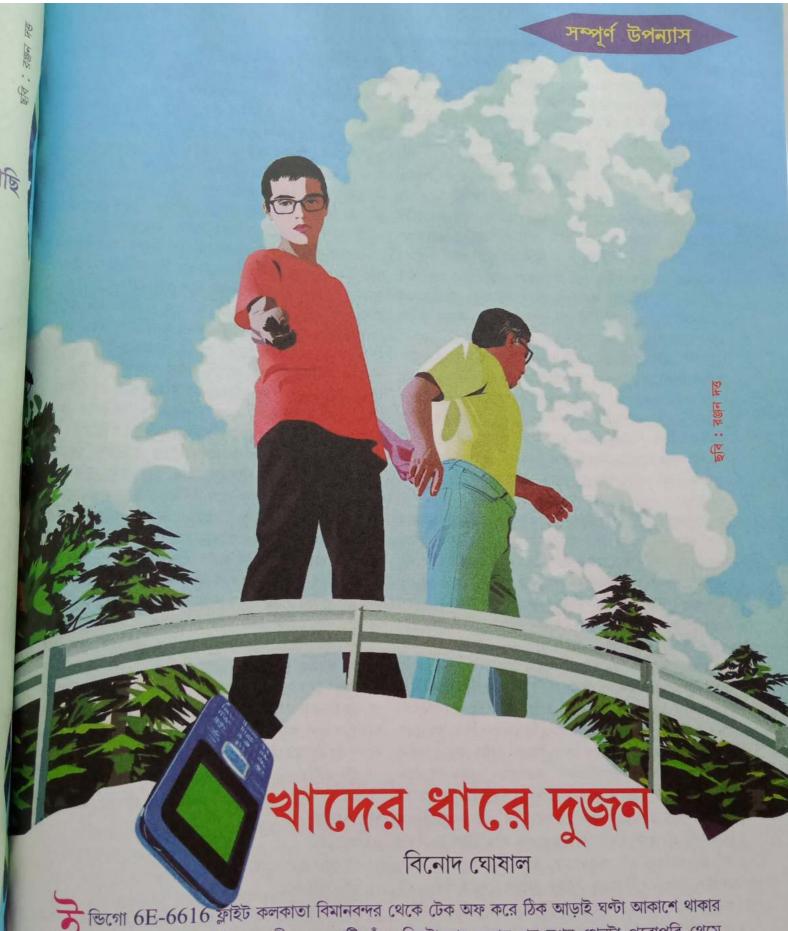
ইন্ডিগো 6E-6616 ফ্লাইট কলকাতা বিমানবন্দর থেকে টেক অফ করে ঠিক আড়াই ঘণ্টা আকাশে থাকার পর বেলা তিনটে কুড়িতে চণ্ডীগড়ের মাটি ছুঁল। কিছুটা রান করার পর যখন প্লেনটা পুরোপুরি থেমে গেল, তখন যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরে যাত্রীদের নিজের সিটে বসে থাকার অনুরোধ করা হলেও অনেকেই সেই অনুরোধ গ্রাহ্য করলেন না। খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নিজের হ্যান্ড লাগেজ নামাতে। যেন নামিয়েই তিনি ছুটে বেরিয়ে যাবেন।

কিন্তু প্লেন যে ট্রেন বা বাস নয়, সেটা অনেকে জেনেও মানতে চান না। লাগেজ হাতে নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। এই ব্যাপারটা বরাবরই খুব হাস্যকর এবং বিরক্তিকর মনে হয় অনিরুদ্ধর। ছাব্বিশ নম্বর রো-এর উইন্ডো সিটে যে ভদ্রলোক বসেছিলেন তিনিও সেই ক্যাটাগরির। উঠে দাঁড়িয়ে অনীক এবং অনিরুদ্ধকে সরিয়ে তিনি হন্তদন্ত হয়ে বেরোলেন তারপর নিজের হ্যান্ডব্যাগ টেনে বার করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। লোকটার কাণ্ড দেখে অনীক অনিরুদ্ধর দিকে তাকিয়ে খুব অল্প হাসল। অনীককে খুব সামান্য হলেও হাসতে দেখে ভালো লাগল অনিরুদ্ধর। ছেলেটা হাসে না। আগে কাঁদত, এখন কাঁদেও না। হাসির থেকে কান্না ওর বেশি প্রয়োজন। নইলে ভেতরে জমে ওঠা পাথরের টুকরোগুলো কোনোদিন গলবে না, বরং দিনে দিনে তা বড়ো হতে থাকবে। অনিরুদ্ধ লম্বা শ্বাস নিলেন। আপাতত পাঁচটা দিন দাদু আর নাতিতে মিলে একটু অন্যরকম সময় কাটানো। হয়তো এই অন্যরকমটুকু অনিরুদ্ধর নিজের এবং অনীকের জীবন কিছুটা বদলে দিতে পারে। কে জানে...!

এই ফ্লাইটে অনিরুদ্ধর পরিচিত রয়েছেন কয়েকজন। পাঁচ-ছয়জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বাংলা থেকে বারোজনের আসার কথা। তাদের সঙ্গেও নিশ্চয়ই দেখা হবে। অনেকদিন পর আবার একটু নিজের জগতের মানুষদের সঙ্গে দেখা। তবে এই ট্যুরটা অনিরুদ্ধ শুধু নিজের জন্য বাছেননি, পৌত্র অনীকের জন্য বিশেষ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবারের প্রোগ্রামট্যুরটা তিনি নেবেন। জীবনকে আবার একটু নড়াচড়া করানোর সময় হয়েছে।

প্লেনের দুইদিকের দরজাই খুলে গেল। একে একে যাত্রীরা নামতে শুরু করলেন। প্লেনে কেউ কাউকে ঠেলে পাশ দিয়ে বেরোতে পারেন না। সেই স্পেস নেই। ধীরে-সুস্থে বেরোতে হয়। বেরোনোর পর দুই নাম্বার বেল্ট থেকে অনিরুদ্ধ এবং অনীক লাগেজ কালেক্ট করে ওরা পৌঁছল ভারতীয় সাহিত্য পরিষদের হেল্প ডেস্কে। সেখানে ততক্ষণে প্রায় জনা তিরিশেক লেখক—কবি জমায়েত হয়েছেন। সকলেরই গন্তব্য সিমলা।

ব্যাপারটা হল আগামীকাল অর্থাৎ আঠেরোই জুন থেকে কুড়ি জুন মোট তিনদিন সিমলার রিজে আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসবের আয়োজন করেছে ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ। দেশ-বিদেশ থেকে প্রায় তিনশো কবি-লেখক-শিল্পী আসছেন এই বিশাল সাহিত্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে। প্রবীণ থেকে নবীন নানা ভাষার কবি-সাহিত্যিক- নাট্যকার আরও অনেকে আসছেন। বাংলা থেকে কবি-সাহিত্যিক- চলচ্চিত্রকার ইত্যাদি মিলিয়ে মোট বারোজন আমন্ত্রিত হয়েছেন এই প্রেসটিজিয়াস ফেস্টিভালে। ভারতের সংস্কৃতিমন্ত্রকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সাহিত্য পরিষদ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। মাস দেড়েক আগে পরিষদের দিল্লির অফিস থেকে যখন এই অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে ফোনকলটা এসেছিল তখন অনিরুদ্ধ সম্মতি দেওয়ার আগে দু-দিন সময় চেয়েছিলেন। আসলে বছর দুয়েক ধরে তিনি নিজেকে ঘরের মধ্যে প্রায় বন্দি করেই ফেলেছিলেন। নইলে আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি অনিরুদ্ধ মিত্র একটা সময় একা সারাবছর ধরে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হিল্লিদিল্লি করে বেড়াতেন। কলকাতার সাহিত্যসভাগুলিতে এক ডাক দিলেই ছুটতেন। আঠেরোটি কাব্যগ্রন্থ এবং দুটি উপন্যাস এবং তিনটি কবিতা সম্পর্কিত প্রবন্ধ-গ্রন্থের লেখক অনিরুদ্ধ মিত্র বাংলা কাব্যজগতের এক সুপ্রসিদ্ধ নাম। বিপুল জনপ্রিয়তা তাঁর নেই তবে বিদগ্ধমহলে তিনি যথেষ্ট চর্চিত। তাঁর ঝুলিতে আকাদেমি সহ বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সরকারি এবং বেসরকারি পুরস্কার রয়েছে। সাহিত্য পরিষদের পূর্বাঞ্চলের শাখার তিনি একসময় এক্সিকিউটিভ বোর্ডের মেম্বারও ছিলেন বছর কয়েক।

ফোনটা রেখে দেওয়ার পর অনিরুদ্ধ অনেক ভেবেছিলেন তাঁর এই প্রোগ্রামে যোগ দেওয়া উচিত কি না। তার থেকেও বড়ো কথা অনীক, যাকে অনিরুদ্ধ নিক বলে ডাকেন সে যেতে রাজি হবে কি না। এবারের ট্যুরে নাতিকে না নিয়ে তাঁর পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব ছিল না। নিকও তার দাদুর মতো গত দুই বছর ধরে নিজেকে পুরো গুটিয়ে নিয়েছে। ক্লাস নাইনে পড়া মাত্র পনেরো বছর বয়েসি অনীক গত দুই বছরে যেন আরও কুড়ি বছর বয়স বাড়িয়ে ফেলেছে। স্কুলে যায় ঠিকই কিন্তু কারও সঙ্গেই কথা বলে না। স্কুলের প্রিন্সিপাল বেশ কয়েকবার অনিরুদ্ধকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, অনীকের এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু অনিরুদ্ধ কোনো সমাধান খুঁজে পাননি। কীভাবে তিনি তাঁর প্রিয় নাতিটিকে আবার জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনবেন তা বুঝতে পারতেন না। অনীক এমনিতে ছোটো থেকেই ইন্ট্রোভার্ট কিন্তু শেষ দুই বছরে ওর মুখ থেকে সামান্য কথাটুকুও জীবন আচমকা কেড়ে নিয়েছে। স্কুলে যায় আসে এইটুকুই, তারপর সারাদিন নিজের ঘরের ভেতর চুপ। অনিরুদ্ধ টানা একদিন ভেবেছিলেন তার পরের দিন রাতে খেতে বসে অনীককে বলেছিলেন, নিক তোমার সঙ্গে একটা কথা রয়েছে আমার।

নিক রুটি ছিঁড়ে ডিমের ঝোলে ডুবিয়ে টুকরোটা মুখে নিয়ে অপেক্ষা করছিল দাদুর কথার।

আমার কাছে সাহিত্য পরিষদ থেকে ফোন এসেছিল। সিমলায় খুব বড়ো একটা সাহিত্য-সম্মেলন হতে চলেছে। শুধু সাহিত্য নয়, আরও অন্যান্য অনুষ্ঠানও থাকবে। তিনদিনের অনুষ্ঠান। এতটুকু বলার পর থেমেছিলেন অনিরুদ্ধ।

আর অনীক শুধু চুপ করে শুনছিল।

অনিরুদ্ধ আবার বলেছিলেন, আমার ইচ্ছা এই প্রোগ্রামটা আমরা অ্যাটেন্ড করি।

আমরা?

হ্যাঁ তুমি এবং আমি দুজনেই।

আমি কী করব?

আমরা দুজনে ঘুরব। তিনদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই একদিনই আমার প্রোগ্রাম থাকবে। বাকিদিনগুলো ফ্রি। আমার মনে হয় ওখানে আমাদের ভালো লাগবে।

অনীক চুপ ছিল।

অনিরুদ্ধ বলেছিলেন, ওঁরা আগামীকাল আমাকে ফোন করবেন। কাল আমাকে জানাতে হবে আমি যাব কি যাব না। আমি তোমার সম্মতির অপেক্ষা করছি।

কিন্তু আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না নি।

অনীককে অনিরুদ্ধ যেমন 'নিক' বলে ডাকেন, অনীকও ছোটোবেলা থেকে তার দাদুকে শুধু 'নি' বলে ডাকে। এটা অনিরুদ্ধই শিখিয়েছিলেন। আসলে অনিরুদ্ধর একমাত্র পুত্র অনীকের বাবার নাম অনির্বাণ। অনিরুদ্ধ, অনির্বাণ এবং অনীক। তিনজনেরই নামের শুরু অনি দিয়ে। অনিরুদ্ধ ছেলের ডাকনাম দিয়েছিলেন অনি, ফলে নাতিকেও অনি বলে ডাকা যায় না, সেইজন্য অ বাদ দিয়ে শুধু নিক আর নাতিকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন খবরদার সে যেন দাদু বলে না ডাকে। দাদু ডাকলেই লোকজন ঝুপ করে বুড়ো হয়ে টুপ করে মরে যায়। তাই নো দাদু। শুধু 'নি'। তাই মিত্র বাড়িতে তিন পুরুষের ডাকনাম যথাক্রমে নি, অনি এবং নিক। অনিরুদ্ধ নিজের ছেলে অনির্বাণকে কোনোদিন তুই বলে ডাকেননি, বরাবর তুমি বলেছেন, নাতিকেও তুমিই বলেন।

আমার কি ওখানে ভালো লাগবে?

লাগতেও পারে। না লাগলে দুজনে ফিরে আসব।

আমাকে কি তোমাদের প্রোগ্রামে অ্যালাও করবে?

কাল ফোন এলে কথা বলব। তোমাকে ছেড়ে তো আমি কোথাও যাব না নিক।

আবার ঘরজুড়ে নৈঃশব্দ্য, দুই বছর ধরে এই বাড়িটাকে নিস্তব্ধতা কালো চাদরের মতো ঢেকে রেখেছে।

অনীক আর কিছু বলেনি। অনিরুদ্ধ বুঝেছিলেন নিকের অমত নেই। আসলে ছেলেটির কোনো জেদ নেই। বড়ো ভালো তাঁর এই নাতিটি। শুধু ভাগ্যটাই...

পরের দিন দিল্লির অফিস থেকে ফোন এসেছিল এবং অনিরুদ্ধ বলেছিলেন তিনি এই প্রোগ্রামে যেতে রাজি রয়েছেন, তবে সঙ্গে তাঁর গ্র্যান্ডসন যাবে। পরিষদ থেকে জানানো হয়েছিল তাদের কোনো অসুবিধা নেই, তবে ফ্লাইটের টিকিট এবং হোটেলের এক্সট্রা পার্সনের খরচ অনিরুদ্ধকে বহন করতে হবে। অনিরুদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। ফ্লাইটের টিকিট উনিই কেটেছিলেন দুজনের। তাঁর নিজেরটা পরে রিইম্বার্স করে নেবেন। যাওয়ার দিন যত এগিয়ে আসছিল অনিরুদ্ধ ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজিত হচ্ছিলেন। দূরের ট্যুরে তিনি জীবনে বহুবার গিয়েছেন। কিন্তু এইবারের ট্যুরটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। তাঁর মন বলছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ এবারের যাওয়াটা। খুবই দরকারি।

পরিষদের স্টাফরা খুব ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করছিলেন গেস্টদের গাড়ির অ্যারেঞ্জ করছিলেন। এয়ারপোর্টের বাইরে বেরোতেই বাইরের প্রচণ্ড গরম টের পেল সকলে। তীব্র গরম হাওয়া বইছে। অনিরুদ্ধ অনীককে বললেন, লু বইছে, শিগগির রুমাল দিয়ে নাকটা ঢাকো।

অনীক তাই করল। চামড়া জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া গরম। অনীকের হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা চুল্লিতে তো এর থেকেও ঢের বেশি গরম থাকে, যাতে মানুষ পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু চুল্লিতে ঢোকানো মানুষের যদি একটু সেন্সও অবশিষ্ট থাকে, কিংবা আগুনের তাপে কোনো ঘোষিত মৃতদেহ আচমকাই প্রাণ ফিরে পায় তখন? সে চিৎকার করলেও বাইরের কেউ তখন শুনতে পাবে না কেননা চুল্লির দরজা ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। কী অসহায় ভয়ংকর অবস্থা! একটা মানুষ জ্যান্ত পুড়ে গেল! ওহ!

আবার সেই আবোল-তাবোল ভাবনাগুলো মাথার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কিছুতেই এর থেকে কি মুক্তি নেই? কোনোদিন মুক্তি পাবে না?

নিক।

দাদুর ডাকে অনীক সামান্য চমকে উঠে তাকাল।

কী ভাবছ?

না কিছু না।

গেস্টরা গাড়িতে উঠছেন। এক একটি গাড়িতে তিন-চারজন করে। সব পার্টিসিপেন্ট একই হোটেলে যাবেন না। অনিরুদ্ধর জন্য যে হোটেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার নাম ধ্রুব। হোটেলটা লক্করবাজারে। সিমলায় আগে কোনোদিন অনীক এবং অনিরুদ্ধ কেউই আসেননি। ওঁদের জন্য একটা সুইফট ডিজায়ার গাড়ি দেওয়া হল। ওঁদের সহযাত্রী হলেন দুলারাম সিনহা। সামনের সিটে অনীক বসল। অনিরুদ্ধ আর দুলারামজি পিছনের সিটে। গাড়ির এয়ারকন্ডিশনে যেন ধড়ে প্রাণ এল। এয়ারপোর্ট পেরোনোর পর দুলারামজির সঙ্গে আলাপ শুরু হল। দুলারাম থাকেন লখ্নৌতে। একটি কলেজে সংস্কৃত পড়ান এবং সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লেখেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলাপ জমে গেল। দুলারামজি গত সাতদিন ধরে কলকাতাতেই ছিলেন। একটি প্রোজেক্টের জন্য কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে তাঁকে প্রতিদিন যাতায়াত করতে হচ্ছে। এই অনুষ্ঠান শেষে তিনি আবার কলকাতাতেই ফিরবেন।

অনিরুদ্ধর বেশ লাগছিল দুলারামজির সঙ্গে কথা বলতে। চণ্ডীগড়ের রাস্তাঘাট ঝকঝকে। ট্রাফিক জ্যাম নেই। দ্রুতবেগে গাড়ি চলছে। এখন বিকেল সাড়ে চারটে। কড়া রোদ। অনীকের ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না। ওর সারাক্ষণই ঘুম পায়, এই বয়সেই শরীরে অপরিসীম ক্লান্তি। চারিদিকটা অচেনা। কতদিন...কত যুগ পর ও যেন বাইরের পৃথিবীকে দেখছে মনে হল। মনের ভেতরে খুব ছোটো একটা ভালোলাগার অনুভূতি উঁকি দিতেই মুহূর্তে বিষণ্ণতায় মন ভরে উঠল ওর। অনিরুদ্ধ কীভাবে যেন তাঁর প্রিয় নাতিটির প্রতি মুহূর্তের অনুভূতিকে টের পান। উনি বললেন, নিক, তোমার কি খিদে পেয়েছে?

না পায়নি।

ঠিক আছে। রাস্তায় আমরা ভালো কোনো রেস্টুরেন্টে খেয়ে নেব।

প্লেনে দুজনে দুটো স্যান্ডুইচ খেয়েছিল। তাতে এতক্ষণ পেট ভর্তি থাকার কথা নয়। ড্রাইভারকে অনিরুদ্ধ বললেন রাস্তায় কোনো ভালো রেস্তোরাঁ থাকলে থামতে। কিছু খেয়ে নেবেন।

দুলারামজি বাংলা সাহিত্যের প্রবল ভক্ত। তবে আধুনিক সাহিত্য বিশেষ পড়া নেই। উনি স্বীকার করলেন অনিরুদ্ধ মিত্র-র নাম শুনেছেন কিন্তু লেখা পড়ার সৌভাগ্য হয়নি।

একশো কিলোমিটারের ওপর রাস্তা। পৌঁছোতে সন্ধে হয়ে যাবে। ভালো লাগছে অনিরুদ্ধর। কতদিন পর আবার একটু সাহিত্য নিয়ে কথা। দুলারামজি কালিদাসের ভক্ত। মাঝেমাঝেই কালিদাসের কবিতা আওড়াচ্ছেন। বেশ লাগছে শুনতে। পথে একটি ধাবার সামনে ড্রাইভারজি গাড়ি দাঁড় করালেন। মকাই কা রোটি এবং সর্ষো কা শাক এবং ঘন দুধের চা দিয়ে দারুণ খাওয়া হল। অনীকের খাওয়া হয়ে গেছিল। ও গেল বেসিনে হাত ধুতে। দুলারামজি অনিরুদ্ধকে তখন জিজ্ঞাসা করলেন, ও কি আপনার গ্র্যান্ডসন?

অনিরুদ্ধ বললেন, হ্যাঁ। ওর নাম অনীক, ক্লাস নাইনে পড়ে।

নাতিকে নিয়ে দাদু বেড়াতে এসেছেন এটা কিন্তু দারুণ কম্বিনেশন। ওর বাবা-মা আসতে পারেননি?

অনিরুদ্ধ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, না। ওরা আউট অফ স্টেশন।

ওহ আচ্ছা। দাদু এবং নাতির এমন বন্ধুত্ব কিন্তু দেখা যায় না। ভেরি গুড। খুব খুশিমনেই বললেন দুলারাম।

অনিরুদ্ধ মৃদু হাসলেন শুধু।

খাওয়া শেষে আবার রওনা। পাহাড় শুরু হয়ে গেছিল। তবে ঠান্ডা নেই। সন্ধে সাতটার সময়ও দিব্যি দিনের আলো। প্রায় পৌনে আটটা নাগাদ অন্ধকার নামল। সিমলায় ঢোকার আগে উল্টোদিকের পাহাড় থেকে শহরটাকে দেখে মনে হচ্ছিল লাখে লাখে তারা যেন মাটিতে নেমে এসেছে। অপূর্ব সুন্দর। অনিরুদ্ধ অনীককে বললেন, নিক দেখো।

অনীক সেদিকে তাকাল। তারপর কী খেয়াল হতে হাতে ধরে থাকা মোবাইল তুলে ধরে একটা ছবি নিল সেই দৃশ্যের। অনিরুদ্ধ এটা দেখে খুব খুশি হলেন। অনীক বহুকাল পর আবার কোনো ছবি তুলল। মিনিট কুড়ির মধ্যে গাড়ি হোটেল ধ্রুবতে পৌঁছে গেল। এখন একটু ঠান্ডা লাগছে। যদিও গায়ে গরমজামা দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। রিসেপশনে ফর্মালিটিজ মিটিয়ে অনীক আর অনিরুদ্ধ রুমের চাবি নিল। একশো চার নাম্বার রুম। হোটেলটার টপ মানে ফোর্থফ্লোর রাস্তার পাশেই। টপফ্লোরেই রিসেপশন। বাকি ফ্লোরগুলো পাহাড়ের ঢালে। মানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হবে হোটেলটা মাত্র একতলা। কিন্তু আসলে পাঁচতলা। লিফটে ফার্স্টফ্লোরে নেমে নিজেদের রুমে ঢুকল। মস্ত বড়ো ঘর। ফোর্থস্টার হোটেল। টয়লেটে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে পোশাক বদলে ওরা আর রেস্ট নিল না। ফোর্থফ্লোরে ডাইনিং হলে ডিনার করতে চলে গেল। সারাদিনের ধকল। এখন ক্লান্তি শরীর জুড়ে। আজ খেয়েদেয়েই ঘুম দিতে হবে। কাল সকাল দশটায় অনুষ্ঠান শুরু।

*　　　*　　　*

সকালে ঘুম ভাঙার পর অনিরুদ্ধ দেখলেন অনীক রুমের মস্ত কাচের জানলার সামনে চুপ করে বসে রয়েছে। অবশ্য জানলা বলা ভুল হবে, কাচের দেওয়াল বললেই ভালো। পুরোটাই কাচ। মোট তিনটে জানলা, মাঝেরটা সবচেয়ে বড়ো। ওটা খোলা-বন্ধ করা যায় না। ওর দুইপাশে ছোটো মাপের দুটো পাল্লা দেওয়া জানলা। কাচের ওইপারে সবুজ পাহাড়ের সারি আর সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে। সকালে চোখ মেলে এমন দৃশ্য দেখলে মন ভরে যায়। অনীক সেই দৃশ্যের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে রয়েছে। ওর কোলের ওপর রাখা মোবাইল। এই মোবাইলটা ওর বাবার। অনির্বাণের মোবাইলের শখ ছিল। তিন-চারখানা মোবাইল ছিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করত। এই ফোনটা অনির্বাণের প্রিয় ছিল, যদিও পরে ব্যবহার করত না। অনীক মাঝেমাঝে বাবার এই মোবাইলটা নিয়ে এটা-ওটার ছবি তুলত। এই সময়ের বাচ্চারা খুব দ্রুত টেকনোলজি বুঝে যায়। মোবাইলে ছবি তুলে তা কীভাবে এডিট করতে হবে তা নিজেই শিখে নিয়েছিল। পড়াশোনা ছাড়া অনীকের দুটো শখ—গিটার বাজানো আর মোবাইলে ছবি তোলা। কিছু দুই-তিন মিনিটের ভিডিয়ো বানিয়েছিল। যেগুলোর মধ্যে ওর নিজস্ব ভাবনা ছিল। অনিরুদ্ধ উৎসাহ দিতেন ওকে। গত দুই বছরে অনীক গিটার বা মোবাইল কোনোটায় হাত দেয়নি। এবারে অনিরুদ্ধর ইচ্ছা ছিল ও গিটার এবং মোবাইল নিয়ে আসুক। অনীক প্রথমে রাজি হয়নি। তারপর মোবাইল নিতে রাজি হয়েছিল প্রয়োজনের জন্য কিন্তু গিটার নেয়নি। অনিরুদ্ধ কোনোদিন কাউকে কোনো ব্যাপারে জোরাজুরি করেন না, সেটা ওর স্বভাববিরুদ্ধ।

অনীককে বললেন, গুডমর্নিং।

অনীকও বলল, মর্নিং।

কখন উঠলে?

অনেকক্ষণ।

কেন, ঘুম হয়নি?

হয়েছিল, ভোরবেলা ভেঙে গেল।

কেমন বাইরেটা?

সুন্দর। বলে একটু চুপ করল অনীক। তারপর বলল, ভালো।

অনিরুদ্ধ বুঝলেন অনীকের সত্যিই ভালো লেগেছে।

চা খেয়েছ?

না, তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এবার বানাব।

রুমে কেটলি, চা-কফির পাউচ রয়েছে কিন্তু অনিরুদ্ধ নিজের স্পেশাল দার্জিলিং চা ছাড়া খান না। বাইরে গেলেও ওই চায়েরই পাউচপ্যাক ক্যারি করেন।

অনীক ইলেকট্রিক কেটলিতে দুইকাপ জল ঢেলে সুইচ অন করল তারপর অনিরুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার লিফ এনেছ?

হ্যাঁ। আমার হ্যান্ডব্যাগের একেবারে সামনের খাপে রয়েছে।

অনীক দাদুর ব্যাগ থেকে দুটো দার্জিলিং চায়ের পাউচ বার করল। তারপর গরম জল দুটো কাপে ঢেলে পাউচ দুটো ডুবিয়ে অনিরুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে চা কি এখানে দেব?

না টেবিলে রাখো, আমি আসছি।

গায়ের ওপরে চাপানো সাদা চাদরটা সরিয়ে অনিরুদ্ধ উঠলেন। বেডসাইড টেবিলের ওপরে রাখা রিস্টওয়াচে দেখলেন সকাল সাতটা দশ। কাল গভীর ঘুম হয়েছে। টয়লেট থেকে ফিরে অনীকের পাশের চেয়ারটায় গিয়ে বসলেন। টেবিলের ওপরে রাখা ধোঁয়াওঠা চায়ের কাপ তুলে নিলেন।

অনীক জিজ্ঞাসা করল, আমাদের কখন বেরোতে হবে?

শোনো নিক। তোমাকে আবারও বলছি অনুষ্ঠান যে তোমাকে অ্যাটেন্ড করতেই হবে এমন নয়। তোমার ইচ্ছা হলে তুমি অ্যাটেন্ড

করবে, অন্যথায় তোমার যেখানে খুশি ঘুরে বেড়িও। আমি তোমার কাছে কিছু টাকা দিয়ে রাখছি। তোমার মতো খরচ কোরো।

তোমাদের প্রোগ্রাম শিডিউলটা আমি দেখলাম। কিছু ভালো প্রোগ্রাম রয়েছে।

কোথায় পেলে শিডিউল?

এই টেবিলের ওপরেই রাখা ছিল। বোধহয় তোমাদের অর্গানাইজাররাই রেখে দিয়েছেন।

হুঁ তাই হবে।

তোমার প্রোগ্রামটা পরশুদিন বেলা বারোটায়। গুলজারের প্রোগ্রামও ওইদিনেই বিকেল চারটের সময়। গুলজারের সঙ্গে বিশাল ভরদ্বাজও থাকছেন।

বাহ। আর কোনো তোমার পছন্দের প্রোগ্রাম রয়েছে?

আপাতত না।

তুমি কি আজকের ওপেনিং সেরিমনি অ্যাটেন্ড করতে চাও?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে। বলে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন অনিরুদ্ধ। তারপর আবারও বললেন, আমি আবারও তোমাকে বলছি। সাহিত্যানুষ্ঠানে এসেছি মানে সারাক্ষণ এখানেই থাকতে হবে তা কিন্তু নয়। আমিও থাকব না। আমরা ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াব।

অনীক দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা শুনল, তারপর বলল, নি, আমাদের কি ভালো লাগবে?

লাগতেও তো পারে। এই সামনের দৃশ্যটা তোমার কেমন লাগছে?

ভালো।

তাহলে বাকিটাও হয়তো ভালো লাগবে। লেট্স্ সি।

আর ভালো না লাগলে?

না লাগলে ফিরে যাব।

তারপর দুজনেই চুপ করে বসে সামনের সবুজ পাহাড়ের সারির দিকে তাকিয়ে রইল। ঝলমলে রোদ উঠেছে। এক পাহাড়ের ছায়া আরেক পাহাড়ে পড়েছে। পৌনে আটটা নাগাদ ইন্টারকম বেজে উঠল। অনীক বলল, তুমি বোসো আমি দেখছি। উঠে গিয়ে ফোন রিসিভ করল ও। ওকে থ্যাঙ্কস বলে রেখে দিয়ে অনিরুদ্ধকে বলল, ব্রেকফাস্ট আটটা থেকে শুরু হবে জানাল। আর দশটায় গাড়ি আসবে প্রোগ্রাম ভেনুতে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

আচ্ছা। তাহলে নটা নাগাদ খেতে যাব।

হুঁ। তুমি কি টয়লেটে যাবে?

না তুমি যেতে পারো। পারলে একবারে স্নান সেরে নাও। ভালো লাগবে।

ঠিক আছে। বলে চায়ের কাপদুটো নিল অনীক। টয়লেটের বেসিনে ধুয়ে যথাস্থানে রেখে দিল। তারপর টয়লেটে ঢুকে পড়ল।

এই বয়েসেই ছেলেটা বড়ো গোছানো পরিপাটি। ওর নিজের ঘরটাও সুন্দর করে গুছিয়ে রাখে। এই স্বভাবটা অনিরুদ্ধর নিজেরও রয়েছে। বরাবর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসেন। সাধারণত কবি-সাহিত্যিকরা একটু অগোছালো, আলুথালু প্রকৃতির হয়, অনিরুদ্ধ তার বিপরীত। স্ত্রী অতসী চিরকালের মতো বিদায় নিয়েছিলেন অসময়ে। কিন্তু দীর্ঘ বছর ধরে তিনি নিজেদের ঘরটিকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখেন। বিছানার চাদর টানটান করে পাতা। ঘরের প্রতিটি জিনিস নির্দিষ্ট জায়গায়। লেখার টেবিলটিও সুন্দরভাবে গোছানো। বইয়ের তিনটে আলমারিতে প্রতিটি বই গুছিয়ে বিষয়ানুগভাবে রাখা। পিডব্লুডি-তে চাকরি করতেন। যতদিন চাকরি করেছেন নিজের কাজটিও নিষ্ঠাভরে করেছেন। আসি যাই মাইনা পাই করেননি। বাকি সময়ে চলেছে সাহিত্যচর্চা। সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়ে গিয়েছিল ইশকুলবয়স হতেই। পাড়ার লাইব্রেরি, স্কুলের লাইব্রেরি থেকে একের পর এক বই নিয়ে এসে রাত জেগে পড়া। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ ক্লাসিক পড়া শেষ হয়ে গিয়েছিল গ্র্যাজুয়েশনের আগেই। তবে গদ্যের থেকে কবিতা অনিরুদ্ধকে টেনেছিল বেশি। ইশকুলবয়সে বাংলা টেক্সট বইয়ে জীবনানন্দের আবার আসিব ফিরে কবিতা পড়ে কিশোর বয়সের মনোজগত তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল।

রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে ডিঙ্গা বায়—রাঙ্গা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে

অনীক দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা শুনল,

দেখিবে ধবল বক—আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে।

এই লাইনগুলো অনিরুদ্ধর অন্তরকে এলমেলো করে দিয়েছিল। এই কবিতা তো রবিঠাকুরের মতো নয়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর মতো নয়, কাজী নজরুল ইসলামের মতোও নয়। এ যে সম্পূর্ণ আলাদা। বাংলা মানে বইয়ে, প্রশ্নোত্তরে, টীকাতে আরও বেশ কিছু জীবনানন্দের কবিতার লাইন রেফারেন্স হিসাবে উদ্ধৃত ছিল। ক্লাস টেনে পড়া অনিরুদ্ধ সেই লাইনগুলো পড়ে বুঝতে পারলেন এই কবির কবিতা না পড়ে তিনি থাকতে পারছেন না। পাড়ার সারদাস্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগারে গিয়ে তিনি নিয়ে এলেন জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা। সারা রাত ধরে পড়লেন—

সামান্য মানুষ

একজন সামান্য মানুষকে দেখা যেত রোজ
ছিপ হাতে চেয়ে আছে; ভোরের পুকুরে
চাপেলী পায়রাচাঁদা মৌরলা আছে;
উজ্জ্বল মাছের চেয়ে খানিকটা দূরে
আমার হৃদয় থেকে সেই মানুষের ব্যবধান;
মনে হয়েছিল এক হেমন্তের সকালবেলায় ;
এমন হেমন্ত ঢের আমাদের গোল পৃথিবীতে
কেটে গেছে; তবুও আবার কেটে যায়।

ক্লাস টেনে জীবনানন্দকে ধারণ করা অসম্ভব। কিন্তু হৃদয়ে কবিতার বোধ নিয়ে যে জন্মায় তার মনে যে কোনো বয়সেই কবিতা অনুরণন তুলবেই। অনিরুদ্ধ নিজের মতো করে অনুভব করেছিলেন জীবনানন্দের কবিতাকে, কবিতার প্রতিটি শব্দকে, শব্দের অন্তর্নিহিত আত্মাকে। জীবনানন্দের কবিতা অনিরুদ্ধকে এক ধাক্কায় অনেকটা বড়ো করে দিয়েছিল, অনেকটা একা করে দিয়েছিল। সারাক্ষণ মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করত জীবনানন্দের লাইন। কখনো মনে পড়ত 'সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা একা কথা কয়'। আবার কখনো অনেক রাতে আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে খাটের পাশের জানলা গলে ঘরের ভেতরে চলে আসা চাঁদের আলো দেখে মাথার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ত—

হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে
সরু সরু কালো কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার,
শিরিষের অথবা জামের।
ঝাউয়ের, আমের;
কুড়ি বছর পরে তখন তোমারে নাই মনে।

কুড়ি বছর পর কাকে মনে নেই? কাকে মনে রাখার কথা ছিল? কিশোর মনে এক অদ্ভুত দোলাচল তৈরি হত, কষ্ট হত কারও জন্য। একদিন জীবনানন্দকে নিয়ে থাকতে থাকতেই মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার দুইদিন পরেই আচমকা একটা লাইন মনে এল। সম্পূর্ণ নিজের একটা লাইন। লাইনটা নিয়ে সারাদিন কাটল। রাতের দিকে তারপরে আবার একটা লাইন এল। দুটো লাইন খাতায় লেখামাত্র পরপর আরও কতগুলো লাইন জলোচ্ছ্বাসের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রুলটানা খাতায়। নিজের লেখা সেই প্রথম কবিতার দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল একটা আস্ত সূর্যের জন্ম দিয়েছেন তিনি। পরের কয়েকটা দিন কী অপূর্ব যে এক আনন্দে কেটেছিল। বারবার খাতা খুলে নিজের লেখা কবিতাটিকে দেখা। মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন পরে আবার একটি কবিতা এল। তারপর আবার। প্রতিটি কবিতাতেই প্রকটভাবে জীবনানন্দ উপস্থিত। ব্যস সেই শুরু। কলেজে পড়ার সময় একটা বড়ো জগত খুলে গিয়েছিল অনিরুদ্ধর। পরিচয় হয়েছিল তরুণ কবিদের সঙ্গে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কবিতা লেখা, লিটল ম্যাগাজিন করা, কবিতা নিয়ে ঝগড়া, চিৎকার, রাত্রিযাপন, হুল্লোড়। ওই সময়েই একের পর এক কবিতা লেখা। নিজের টিউশনির টাকা জমিয়ে একফর্মার কবিতার বই প্রকাশ। বয়স যখন তিরিশের দিকে এগোচ্ছে তখন টের পেলেন তাঁর কবিতাকে জীবনানন্দের অনুকরণ বলে। বয়স চল্লিশ ছোঁয়ার আগেই তরুণ কবি হিসেবে পরিচিতি পেয়ে গিয়েছিলেন। বেশ কয়েকটি বইও প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল। শুধু লিটল ম্যগাজিন নন পরে বহুলপ্রচারিত পত্রপত্রিকাতেও দুই হাতে লিখেছেন অনিরুদ্ধ। নিজের পাঠক তৈরি করতে পেরেছেন। অনিরুদ্ধ শুধু সুকবি নয়, সুবক্তা হওয়ার সুবাদে তাঁর জনপ্রিয়তা সমসাময়িক কবিদের থেকে কিছুটা এগিয়েই ছিল। রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কার তো পেয়েই ছিলেন, আটান্ন বছর বয়সে পেলেন আকাদেমি পুরস্কার। সর্বভারতীয় সম্মান। পরিষদের সঙ্গে সেই সম্পর্ক শুরু। এরপর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তিনি পরিষদের আমন্ত্রণে সাহিত্যসভায় গিয়েছেন, বক্তব্য রেখেছেন, কবিতা পাঠ করেছেন। স্ত্রী অতসী অকালে চলে যাওয়ার একাকিত্বকে তিনি ভুলতে চেয়ে কবিতাকেই আঁকড়ে ধরেছেন বেশি করে। কবিতা হয়ে উঠেছে তাঁর বন্ধু। একমাত্র পুত্র অনির্বাণ এবং পুত্রবধূ কোয়েলের কথা মনে পড়ল। নাহ্ ভাবব না। এসব কিছুই ভাবব না। নিজেকে শাসন করলেন অনিরুদ্ধ। মনকে নরম করে ফেললে হবে না। এখনও অন্তত বারো-চোদ্দো বছর সুস্থভাবে বাঁচতেই হবে অনীকের জন্য। গভীর শ্বাস নিলেন অনিরুদ্ধ। যখনই তাঁর বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে যায় তিনি এইভাবে শ্বাস নেন। সামনে পাহাড়। এখানে এসে ভুল করলেন না তো? স্মৃতি আরও বেশি উস্কে উঠবে কি?

টয়লেট থেকে বেরোল অনীক। একেবারে স্নান করেই বেরিয়েছে। বেরিয়েই বলল, নি জল কিন্তু বেশ ঠান্ডা। গরম জল মিশিয়ে নিও।

আচ্ছা। বলে আর বসে থাকলেন না অনিরুদ্ধ। উঠে পড়লেন স্নানের জন্য। গায়ে গরমজামা দিতে না হলেও রাতে ঠান্ডা ছিল। এসি চালাতে তো হয়ইনি। গায়ে চাদর ঢাকা দিতে হয়েছিল।

অনীক পোশাক বার করবে বলে নিজের সুটকেস খুলল। অনিরুদ্ধ টয়লেটে ঢুকলেন। দরজা খুলতেই মুখোমুখি মস্ত একটা আয়না। বহুদিন পর নিজেকে আচমকা দেখলেন যেন। দামি হোটেলের টয়েলেটের আয়নাগুলো প্রকাণ্ড হয় এবং আলোও থাকে অতিরিক্ত। ফলে নিজেকে খুঁটিয়ে দেখার একটা অবকাশ তৈরি হয়ে যায়। যারা নিজেকে ভালোবাসে তাদের জন্য এই আয়না যতটা আদরের, যারা নিজেকে আড়াল করে রাখতে চায়, নিজেকেও দেখতে যাদের অনীহা তাদের জন্য এই আয়না ততটাই অস্বস্তির। অনিরুদ্ধর অস্বস্তি হল। এতটা স্পষ্টভাবে তিনি নিজের দিকে তাকাতে চান না। ঝকঝকে বেসিনের সামনে টয়লেট কিট রাখা।

তাতে টুথব্রাশ, পেস্ট, শ্যাম্পু, সাবান, শেভিং-এর রেজার ইত্যাদি রাখা। টুথব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে দাঁত মাজলেন অনিরুদ্ধ। আয়নাটা ওঁর দিকে হাঁ করে দেখছে। বারবার চোখ পড়ে যাচ্ছে। অনিরুদ্ধ টের পেলেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা দুই বছরে অনেক বুড়ো হয়ে গেছে। অনেক ভেঙে গেছে। মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে থেকে সরে গেলেন তিনি। টয়লেট সেরে স্নানের জন্য কাচ দিয়ে ঘেরা শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে স্নান করতে করতে আচমকা প্রবল কান্না পেল অনিরুদ্ধর। সেই কান্নাকে আটকালেন না তিনি। ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলেন। একাত্তর বছরের শরীরটা কান্নার দমকে কাঁপতে থাকল। শাওয়ারের উষ্ণ জলকণার সঙ্গে অশ্রু মিশে ধুয়ে যেতে থাকল, পৃথিবী জানল না এক বৃদ্ধের কান্নার কথা।

* * *

ব্রেকফাস্ট করতে এসে বিতানের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অনিরুদ্ধর। বছর তিরিশের এই ছেলেটি অত্যন্ত শক্তিশালী একজন কবি। বিতান চার বছর আগে পরিষদের তরুণ আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছে ওর প্রথম কাব্যগ্রন্থের জন্য। এই পুরস্কার পরিষদ আর সেই পুরস্কারের তিনজন চূড়ান্ত নির্বাচকের একজন ছিলেন অনিরুদ্ধ। বইটি তাঁর একান্ত ভালো লেগেছিল। তিনি বিশেষভাবে এই বইটিকেই পুরস্কৃত করার জন্য জোর দিয়েছিলেন। পুরস্কার পাবার পর একদিন বিতান এসেছিল অনিরুদ্ধর বাড়িতে প্রণাম করতে। সেদিন ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে অনিরুদ্ধ বুঝেছিলেন এই ছেলের মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যরকম লেখে। তারপর বেশ কয়েকবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছে বিতানের সঙ্গে। প্রতিবারই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে। একমাথা কোঁকড়া চুল, ঘন দাড়ি-গোঁফ। রোগা, কালো। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা বিতানের। ও খাচ্ছিল। ওর সামনে বসে খুব রোগা একটি মেয়ে। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ব্রেকফাস্ট সারছিল বিতান। ডাইনিং হলটা খুবই বড়ো। অন্তত পঞ্চাশজন একসঙ্গে বসে খেতে পারবে। বুফে সিস্টেম। অনেকেই ব্রেকফাস্ট করছিলেন। অনিরুদ্ধ খেয়াল করেননি। বিতান দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডেকেছিল, স্যর এখানে বসুন।

অনিরুদ্ধ চিনতে পেরেছিলেন বিতানকে। মৃদু হেসে এগিয়ে এসেছিলেন।

আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগছে স্যর। ওর সামনে বসা মেয়েটি তাকিয়েছিল অনিরুদ্ধর দিকে। বিতান বলেছিল, ও স্যর দীপালি বোরা। গৌহাটিতে থাকে। আমাদের ব্যাচে অহমিয়া ভাষায় ও তরুণ আকাদেমি পেয়েছিল। আমরা খুব ভালো বন্ধু।

বাহ বেশ বেশ।

অনিরুদ্ধ আর অনীক দুজনেই প্লেটে খাবার নিয়ে এসে বসেছিল ওদের টেবিলে। কিছুক্ষণ গল্প হল। বিতান খুবই উচ্ছ্বসিত অনিরুদ্ধকে দেখে। ওর কথায় বারবার সেটা প্রকাশ পাচ্ছিল।

আমি ব্রোশিওরে আপনার নাম দেখেছিলাম কিন্তু ভাবতেই পারিনি যে আপনি আসবেন এবং এই হোটেলেই উঠবেন।

অনিরুদ্ধ বললেন, হ্যাঁ সেই।

বিতান সেই মেয়েটিকেও অনিরুদ্ধর কবিতা ওকে কতটা প্রভাবিত করেছে তা বলল।

আপনাকে দেখে সত্যিই খুব ভালো লাগছে স্যর। কতদিন পর আপনাকে দেখলাম।

হ্যাঁ বিতান, আমি অনেকদিন পর বেরোলাম।

খুব ভালো করেছেন স্যর। ও কি আপনার নাতি?

হ্যাঁ। ও অনীক। আমার নিক।

বিতান অনীককে জিজ্ঞাসা করল, কোন ক্লাসে পড়ো তুমি?

অনীক নীচু গলায় বলল, নাইন।

বাহ খুব ভালো। বলেই বিতান বলল আমি আসলে বছর দেড়েক আগে বিয়ে করেছিলাম স্যর, খুব ইচ্ছে ছিল আপনাকে ইনভাইট করার। কিন্তু মানে...যাইনি। আমি মানে ব্যাপারটা শোনার...

ঠিক আছে, ঠিক আছে। বলে বিতানকে থামিয়ে দিলেন অনিরুদ্ধ। ওই প্রসঙ্গ আর এগোতে দিলেন না। বললেন, একদিন দুজনে মিলে এসো।

দুজনে মিলে? বলে হাসল বিতান। তারপর বলল, বেশ।

খেতে খেতেই অনিরুদ্ধ খেয়াল রাখছিলেন অনীক ঠিকঠাক খাচ্ছে কি না। কী খাচ্ছে, কতটা পরিমাণ খাচ্ছে, আর কিছু লাগবে কি না সব নজর রাখছিলেন। তিনিও বোঝেন অনীক আর অত ছোটো নেই। জীবনে ওকে বিশেষ করে সময়ের আগেই অনেকটা ম্যাচিওর করে দিয়েছে। নিজে দায়িত্ব নিয়ে অনেককিছুই করে, কিন্তু তারপরেও অভ্যাস রয়ে গেছে অনিরুদ্ধর। আসলে সারাক্ষণ ছেলেটাকে নিয়ে একটা চোরা উদ্বেগ কাজ করে।

খেতে খেতেই বিতান বলল, আপনি কি গাড়িতে যাবেন স্যর?

হ্যাঁ। তুমি?

আমি হেঁটেই চলে যাব। একদম সামনে। দশ মিনিট হাঁটলেই পৌঁছে যাব। আমি গতকাল সন্ধেবেলায় গিয়ে জায়গাটা দেখে এসেছি। আসলে আমি কাল সকালের ফ্লাইট ধরেছিলাম। এখানে দুপুরের মধ্যে পৌঁছে গেছি। তাই বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলাম। হোটেল থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে খানিকটা এগোলেই পরপর দুটো সিঁড়ি। সিঁড়ি দুটো পার করে একটু হাঁটলেই রিজ। বরং গাড়িতে গেলে মিনিমাম আধঘণ্টা লাগবে, এখানে যা জ্যাম!

অনিরুদ্ধ বললেন, সিঁড়ি কি খুব খাড়া?

হ্যাঁ স্যর তা খানিকটা খাড়া।

দীপালি এবারে বলল, আমার মনে হয় স্যরের অসুবিধা হতে পারে। উনি গাড়িতে গেলেই ভালো করবেন। ফেরার সময় না হয় একবার নেমে দেখবেন।

অনিরুদ্ধ বললেন, হ্যাঁ সেটাই ভালো হবে। ঠিক আছে আমরা তাহলে উঠি। তোমরা এসো।

হ্যাঁ স্যর। ওখানে তো দেখা হচ্ছেই, রাতেও দেখা হবে হোটেলে। অনেক কথা রয়েছে আপনার সঙ্গে। বাই অনীক।

অনীক ঘাড় নেড়ে বিতানকে বিদায় জানাল।

দুজনে বাইরে বেরিয়ে এল। গাড়ির ব্যবস্থা যিনি দেখছেন তিনি এগিয়ে এসে বললেন, স্যর প্রোগ্রামে যাবেন তো?

হ্যাঁ।

প্লিজ এই গাড়িতে চলে যান।

একটা সিক্সসিটার গাড়িতে অনিরুদ্ধ আর অনীক উঠে বসলেন। গাড়িতে আগেই তিনজন বসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনিরুদ্ধর চেনা কেউ নেই। শুধু নমস্কার জানানো ছাড়া তাঁদের সঙ্গে আর কোনো কথা হল না। মিনিট কুড়ি লাগল ম্যাল রোডে পৌঁছতে। গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা হাঁটা। অনীক শুধু অনিরুদ্ধকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করল, সকলে জানে তাই না?

সকলে নয়, তবে অনেকে।

সবাই জিজ্ঞাসা করবে?

না, কেউ জিজ্ঞাসা করবে না।

নি...

ওরা কেন এমন করল বলো তো?

এই প্রশ্নের উত্তর অনিরুদ্ধর কাছে ছিল না। অনীকের মুখের দিকে তাকাতে গিয়েও তাকাতে পারলেন না অনিরুদ্ধ। অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, এসব ভেব না। আর ভেব না।

* * *

ছবির মতো সাজানো সিমলার রিজ। দার্জিলিং-এর ম্যাল-এর মতো সিমলার এই ম্যালও টুরিস্টদের অন্যতম আকর্ষণের জায়গা। তবে আপাতত কয়েকদিনের জন্য পুরো রিজকে সাহিত্য পরিষদ দখল করে নিয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় অনেকটা ওপেন স্পেস নিয়ে তৈরি রিজ সিমলার কালচারাল হাব। অনেক পুরোনো। এই রিজই ঢাল বেয়ে ম্যাল রোডে গিয়ে মিশেছে। ভারী সুন্দর রঙিন ফেস্টুন, হোর্ডিং ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়েছে রিজকে। দুটো ওপেন স্টেজ হয়েছে অনুষ্ঠানের জন্য। অনীক চারদিকটা দেখছিল। একটা হলুদরঙের মস্ত চার্চ, তার পাশে ওয়াচ টাওয়ার, রেলিং দেওয়া খাদের দিকে বেশ কিছু বুকস্টল হয়েছে পরিষদের নিজস্ব প্রকাশনার। আর তার উল্টোদিক ঐতিহ্যশালী গেইটি থিয়েটার। মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশে সাদা সাদা টুকরো মেঘ ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে, আর তার নীচে একদিকে সবুজ পাহাড়ের সারি। অন্যদিকে বহু প্রাচীন গথিক বিল্ডিং। পায়ের নীচে চওড়া কালো পিচের রাস্তা। একটি মঞ্চে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। বেশ কয়েকজন তরুণ-তরুণী রঙিন পোশাক পরে নেচে নেচে গান গাইছে। ভাষাটা বোঝা যাচ্ছে না। অনেকেই দর্শকাসনে বসে সেই অনুষ্ঠান শুনছেন। অনীকের মনে হল ও বহুযুগ পর একটা অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে আজ সূর্যের আলো দেখছে। মনটা হাল্কা লাগছে। গেইটি হলের সামনে পৌঁছল দুজনে। সামনে একটি টেবিলে অনেক ব্রোশিওর, পার্টিসিপেন্টদের কার্ড ইত্যাদি রাখা। পরিষদের দুজন স্টাফ সেগুলি বিলি করছেন। অনিরুদ্ধ একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রোগ্রাম কি শুরু হয়ে গেছে?

হ্যাঁ স্যর, একটু আগেই শুরু হয়েছে। সিএম এসেছেন।

আচ্ছা। আমার নাম অনিরুদ্ধ মিত্র। আমি একজন পার্টিসিপেন্ট। এখানে কি আমার কার্ডটা পেতে পারি?

নিশ্চয়ই স্যর, বলে একজন অনিরুদ্ধর কার্ডটি খুঁজে বার করে দিলেন। ওটা গলায় ঝুলিয়ে অনিরুদ্ধ অনীককে বললেন, শোনো ইন্যুগরাল প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। আমাকে ভেতরে যেতে হবে। তবে তোমার মনে হয় না খুব একটা ভালো লাগবে। তুমি যদি চাও এই চত্বরটা ঘুরে ফিরে দেখতে পারো। আর এই টাকাটা কাছে রাখো। বলে পার্স থেকে কয়েকটা একশো টাকার নোট তিনি অনীককে দিলেন।

অনীক টাকাটা পকেটে গুঁজে নিয়ে বলল, আমি বাইরেই থাকছি।

ঠিক আছে। তবে অচেনা জায়গা, খুব বেশি দূরে যেও না।

হুঁ।

অনিরুদ্ধ গেইটি থিয়েটারের ভেতরে ঢুকে গেলেন আর অনীক ভাবল পার্টিসিপেন্টদের পোস্টারদের মধ্যে দাদুর ছবিটা আগে খুঁজে বার করতে হবে।

বিক্ষিপ্তভাবে পোস্টারগুলো রিজের দুইধারে ফাইবার রডের ফ্রেম দিয়ে চৌকো পিলারের মতো করে সাজানো। এক একটি পোস্টারে ছয়-সাতজন করে কবি-সাহিত্যিকদের ছবি ও নাম লেখা। অনীক তাদের ভিড়ে নিজের দাদুকে ঘুরে ঘুরে খুঁজতে লাগল। একসময় পেল। কিন্তু নি-এর ছবিটা পাহাড়ের খাদের দিকে ঘোরানো। ফলে রাস্তায় যাঁরা চলাফেরা করছেন তাঁরা কেউ অনিরুদ্ধকে দেখতে পাচ্ছেন না। এই ব্যাপারটা মোটে ভালো লাগল না। নি-র সঙ্গে আরও একজন অচেনা রাইটারের ছবি। তার নীচে নাম লেখা ভাম্পেল্লি গঙ্গাধর। চারটে ওয়ালে দুজন করে রাইটারের ছবি। অনীক প্রথমে আলতোভাবে জিনিসটাকে নাড়িয়ে দেখল খুবই হালকা। জাস্ট ফ্রেমটা রাস্তার ওপর বসিয়ে রাখা। আর সময় নষ্ট না করে জিনিসটাকে ঘুরিয়ে অনিরুদ্ধর ছবিটাকে রাস্তার দিকে মুখ করিয়ে দিল। এবার সকলে ওর দাদুর ছবি দেখতে পাবে। যদিও চত্বরে চলতি মানুষেরা কেউই পোস্টারগুলো অত নজর করে দেখছেন না। চত্বরটায় অজস্র মানুষ হাঁটাচলা করছে। অনেক বাচ্চা এসেছে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে। সকলে খুব খুশি। ছোটোরা দৌড়চ্ছে। বড়োরা ঘুরছে। কেউ আইসক্রিম কিনে খাচ্ছে। কেউ বসে গল্প করছে। সকলে সুখী। হাসিমুখগুলো দেখতে দেখতে আচমকা বমি পাবার মতো করে কান্নার দমক এল অনীকের। দাঁত চিপে কান্নাটা আটকাল। চোখদুটো মুহূর্তে ঝাপসা হয়ে উঠল। না আমি কাঁদব না, কিছুতেই কাঁদব না। কান্নাটাকে ঢোঁক গিলে গলার থেকে নামানোর প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে গলা বুজে এল। ব্যথা করতে শুরু করল। কী করবে ভেবে না পেয়ে পকেট থেকে মোবাইল বার করে চারদিকে এলপাথাড়ি ছবি তুলতে শুরু করল অনীক। একটানা প্রায় কুড়ি-পঁচিশটা ছবি তোলার পর থামল ও। দেখল ওর থেকে কিছুটা দূরে বসে থাকা একটি মেয়ে ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। আসলে ভাবছে এ কেমন পাগল ছেলে রে বাবা, এইভাবে কেউ খচাখচ এলপাথাড়ি ছবি তোলে! অনীক ওখানে আর দাঁড়াল না। হন হন করে হাঁটতে থাকল। গেইটি থিয়েটার হলকে বাঁহাতে রেখে সোজা হাঁটতে থাকল। খানিকটা যাওয়ার পরেই রাস্তাটা ঢাল বেয়ে নীচে নেমেছে। অনীক সোজা নেমে গেল। ঢালটা যেখানে শেষ হয়েছে তার ডানহাতে পুলিশ স্টেশন এবং একটা ব্যাঙ্ক। আর বাঁদিকে অনেক দোকান। এখানে রাস্তাটা দুটো ভাগ হয়ে একটা চলে গেছে উঁচুতে আরেকটা নীচুতে। যেখানে রাস্তাটা দুইভাগ হয়েছে সেখানে একজন মহিলা ট্রাফিক পুলিশ কিয়স্কে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কী সুন্দর ইউনিফর্ম ওঁর। যদিও এই রাস্তায় কোনো গাড়ি চলাচল

করছে না। রাস্তা, দোকানপাট, অফিস সব এতই ঝকঝকে পরিষ্কার যেন মনে হয় ইউরোপের কোনো দেশ। এবার কোনদিকে যাওয়া যায়? থমকে দাঁড়িয়ে গেল অনীক। খুব বেশিদূর না যাওয়াই ভালো। কিয়স্কের পিছনে একটা কংক্রিটের পিলার সেটার গায়ে একটা মেটাল প্লেটের মধ্যে ইংরেজিতে কিছু লেখা। অনীক এগিয়ে গিয়ে দেখল বাঁদিকের রাস্তায় এবং ডানদিকের রাস্তায় কী কী দর্শনীয় স্থান রয়েছে তা উল্লেখ করা রয়েছে প্লেটে। ট্রাফিক পুলিশ ম্যাডাম অনীককে জিজ্ঞাসা করল, মে আই হেল্প ইউ?

নো নো ম্যাম। থ্যাঙ্কস।

ওক্কে।

কয়েকজন টুরিস্ট এসে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে ছবিও তুলছে। অনীক ভাবল কোনদিকে যাওয়া যায়। ডানদিকেই কিছুটা যাওয়া যাক। চড়াই বেয়ে কিছুটা উঠল। এদিকটায় কোনো দোকানপাট নেই। অনেকটা উঁচুতে একটা পুরোনো বিল্ডিং। কীসের বিল্ডিং নীচের থেকে বোঝা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে উঠতে থাকল অনীক। হাঁটতে হাঁটতে বার বার ওপরের দিকে তাকাচ্ছিল যদি বিল্ডিংটা কী তা বোঝা যায়। হঠাৎই পায়ে কী যেন একটা ঠোক্কর লাগল। মাটিতে তাকাতেই থেমে গেল অনীক। একটা মোবাইল পড়ে রয়েছে। সেটায় ঠোকা লেগেছে পায়ে। এ বাবা কার মোবাইল পড়ে গেছে! এদিক-ওদিকে তাকাল ও। কাউকেই দেখতে পেল না। কালচে নীল রঙের মোবাইল। ছোটো সাইজ। এখন এই মডেল আর বিশেষ ব্যবহার হয় না। একবার ভাবল তুলে নিয়ে দেখবে। তারপরেই মনে হল দরকার নেই তুলে। যার ফোন হারিয়েছে সে নিশ্চয়ই খুঁজবে এবং পেয়ে যাবে। নাকি ফোনটা তুলে ওই ট্রাফিক পুলিশ ম্যামের কাছে জমা দিয়ে দেবে? কী করা উচিত ভাবতে ভাবতেই অনীক দেখল রাস্তায় চিত হয়ে শুয়ে থাকা ফোনটা বেজে উঠল। ডিসপ্লেতে নাম ফুটে উঠেছে MAA.....

মা! কার মা ফোন করেছে? কতদিন পর মোবাইলে স্ক্রিনে এই নামটা দেখল অনীক। ওর মোবাইলেও MAA বলেই নাম্বারটা সেভ রয়েছে। কিন্তু দুই বছর হল আর ফোন আসে না। ফোনটা বেজেই চলেছে। অনীক হাঁ করে তাকিয়ে রইল স্ক্রিনের দিকে। কতক্ষণ এইভাবে তাকিয়ে রইল খেয়াল রইল না। কিন্তু ফোনটা রিং হওয়া থামল না। বেজেই চলল। অনীক ওখান থেকে সরে যেতে পারল না। পা দুটো যেন মাটিতে আটকে গেছে। ধীরে ধীরে নীচু হয়ে ফোনটা তুলে কল রিসিভ করে কানে ঠেকাতেই শুনতে পেল—বাবু আমাকে চিনতে পারছিস?

মুহূর্তের মধ্যে গোটা পৃথিবীটা দুলে উঠল যেন। এ কী! এ কার কণ্ঠস্বর! মায়ের! আমার মা! থরথর করে কেঁপে উঠল অনীক।

* * *

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। এরপর বেলা একটা থেকে বিভিন্ন সাহিত্যানুষ্ঠানগুলি শুরু হবে। আপাতত আধঘণ্টার টি-ব্রেক। অধিকাংশ দর্শকই হল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। হল থেকে বেরিয়েই ডানদিকে চা-কফির ব্যবস্থা। এক কাপ চা নিয়ে ইতিউতি তাকালেন অনিরুদ্ধ। চারদিকে ভিড়ে ভিড়। অনীককে দেখতে পেলেন না। কাছাকাছিই থাকবে অবশ্যই। বাধ্য ছেলে। খুব সাহসীও নয়। তাই খুব বেশিদূর যাবে না। তবু একটা ফোন করা দরকার। হলের ভেতরে ফোন সাইলেন্ট করা ছিল। যদিও তিনি বারকয়েক মোবাইল বার করে দেখেছেন অনীকের কোনো ফোন এসেছে কি না। এক হাতে চায়ের কাপ নিয়ে অনীককে ফোন করলেন তিনি। ফোনে যান্ত্রিককণ্ঠ বলল, দ্য নাম্বার ইউ আর ট্রাইং টু রিচ ইজ আউট অফ নেটওয়ার্ক কভারেজ। মুহূর্তের মধ্যে চিন্তায় পড়ে গেলেন অনিরুদ্ধ। কোথায় গেল ছেলেটা! পাহাড়ি অঞ্চলে অনেক জায়গাতেই নেটওয়ার্কের সমস্যা থাকে, অনীক একেবারে বাচ্চাও নয় যে রাস্তা গুলিয়ে ফেললে কাউকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে পারবে না, কিন্তু অনিরুদ্ধর চিন্তাটা অনীকের মানসিক অবস্থা নিয়ে। ইন্ট্রোভার্ট মানুষদের বাইরে থেকে বোঝা যায় না তাদের ভেতরে কী চলছে। চা-টা চুপচাপ শেষ করে তিনি এগিয়ে গেলেন চার্চের দিকে। ছেলেটাকে খোঁজা দরকার। চার্চের সামনে গিয়ে এদিক-ওদিক দেখলেন। নেই। চার্চের উল্টোদিকে যেখানে ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে সওয়ারি চড়াবে বলে, সেদিকে গেলেন। নাহ্ নেই। তাহলে...?

অনীককে খুঁজতে খুঁজতেই তিনি বারবার ওকে ফোন করতে থাকলেন। প্রতিবারে একই উত্তর। অনিরুদ্ধ টের পেলেন তিনি এতই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন যে ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। অকারণেই তিনি রাস্তার ধারের রেলিং থেকে ঝুঁকে বহু নীচের খাদের দিকে তাকালেন। পরক্ষণেই তাঁর মনে হল কী করছেন তিনি! এত খারাপ কথা কেন ভাবছেন! না না, এসব ভাবা একেবারেই ঠিক নয়। চশমা খুলে একবার মুছে নিয়ে এবার আরেকদিকে এগোতে যাবেন তখন অনীকের ফোনে রিং হল। বারদুয়েক রিং হতেই কলটা রিসিভ করল অনীক।

অনিরুদ্ধ ওখানে দাঁড়িয়েই একটু অতিরিক্ত গলা চড়িয়েই বলে উঠলেন—কোথায় তুমি? ফোনে পাচ্ছি না কেন?

আমি কাছেই রয়েছি নি। কী হয়েছে?

অনিরুদ্ধ টের পেলেন উত্তেজনার বশে তিনি অনীককে একটু কড়াভাবেই বলে ফেলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গলা নামিয়ে বললেন, না না কিছু হয়নি। আসলে তোমায় ফোনে না পেয়ে চিন্তা হচ্ছিল।

তোমার ইন্যুগরাল প্রোগ্রাম শেষ?

হ্যাঁ, চা খেতে বাইরে এসেছি। তুমি ইচ্ছে হলে চলে আসতে পারো।

আমি কি এখনই আসব?

তোমার ইচ্ছা। তবে প্লিজ কাছাকাছি থেকো।

অনিরুদ্ধর কণ্ঠে যে আর্তিটা ছিল সেটা টের পেল অনীক। বলল, চিন্তা কোরো না নি। আমি কোথাও যাব না।

এইটুকু কথার মধ্যে অনেককিছু বলা ছিল।

বেশ। মনে রেখো আমি ভালোবাসি তোমাকে।

আমিও নি।

রাখি। বলে ফোন রাখলেন অনিরুদ্ধ। শরীরটা হালকা লাগছে। মোবাইল পকেটে রেখে কপালে জমে ওঠা স্বেদবিন্দু মোছার জন্য

রুমালটা বার করতে যাবেন, দেখতে পেলেন পায়ের সামনে একটা খাম পড়ে রয়েছে। খামের রংটা কালচে নীল। এমন রং সচরাচর দেখা যায় না। অনিরুদ্ধ খামটাকে উপেক্ষা করে চলে আসতে গিয়ে বুঝতে পারলেন খামটা যেন তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছে। খামটার মুখ খোলা। খোলামুখ খামের কোনো মূল্য নেই। কেউ হয়তো ভেতরের বস্তুটি বার করে নিয়ে এটাকে ফেলে দিয়েছেন অবহেলায়। কিন্তু যিনি এই খামে প্রাপককে কিছু পাঠিয়েছিলেন তাঁর রুচির প্রশংসা করতে হয়। এমন কালচে নীল রং রাতের আকাশের হয়। এমন খাম তিনি কখনো দেখেননি। প্রাপকের উচিত হয়নি খামটিকে ফেলে দেওয়ার। নীচু হয়ে এমনিই ওটাকে হাতে তুলে নিলেন। হাতে তুলেই বুঝতে পারলেন খামটা খালি নয়। ভেতরে কিছু রয়েছে। খোলা মুখটা আরেকটু ফাঁকা করতেই তিনি দেখলেন ভেতরে একটা ভাঁজকরা কাগজ।

কার চিঠি পড়ে রয়েছে! কেউ কি চিঠিটা হারিয়ে ফেলেছে? নাকি কেউ চিঠিটা লিখে প্রাপককে আর দেয়নি? নাকি প্রাপক চিঠিটা পড়ে এইভাবে ফেলে দিয়ে গেছে? লেখকের কল্পনাপ্রবণ মন এবং কৌতূহল অনিরুদ্ধকে বাধ্য করল চিঠিটাকে বার করে আনতে। ডায়েরির পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ঝরনাকলমে লেখা—

প্রিয় বাবা,

তুমি কেমন আছ?...

প্রথম লাইনটা পড়েই শিউরে উঠলেন অনিরুদ্ধ...এ...এ কী করে সম্ভব! এই হাতের লেখা...! এই চিঠি...!

*　　　*　　　*

অনেক রাত। অনিরুদ্ধ আর অনীক পাশাপাশি শুয়ে। ঘুম আসছে না অনিরুদ্ধর। চোখ বুজে রয়েছেন কিন্তু দুই চোখের পাতায় ছুটোছুটি করছে অসংখ্য টুকরো টুকরো সিপিয়া রঙের দৃশ্য।

সরলা মাতৃসদনের পেশেন্টপার্টির ওয়েটিং রুমে সারারাত পাইচারি করছেন তরুণ অনিরুদ্ধ। সন্ধে সাতটার সময় অতসীর পেইন উঠেছিল। তখন অনিরুদ্ধ সবে অফিস সেরে বাড়িতে ঢুকেছেন। ডালহৌসি থেকে শ্যামবাজার অনেকটাই দূরত্ব। অফিস থেকে বেরোতে সাড়ে পাঁচটা বেজে যায়। তারপর বাসে অথবা ট্রামে শ্যামবাজার। শ্যামবাজারে অনিরুদ্ধর বসতবাড়ি নয়, শ্রীরামপুরে ওঁর তিন পুরুষের বাস। বহু পুরোনো বাড়ি। অনিরুদ্ধর ঠাকুরদা ননীগোপাল মিত্র খুবই নামজাদা উকিল ছিলেন। বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মদনগোপালের বিগ্রহ। নিত্যসেবা হত। পুরোহিতমশাই পুজো ভোগ দিতেন। অনিরুদ্ধ ঠাকুরদাকে চোখে দেখলেও সেই স্মৃতি ছিল না, ওর সাতবছর বয়সেই ঠাকুরদা দেহ রেখেছিলেন। অনিরুদ্ধর বাবা অনন্তদেবও তাঁর পিতৃদেবের পেশাতেই গিয়েছিলেন। এবং ঘোরতর আস্তিক এবং বর্ণাশ্রমের পরাকাষ্ঠা। জাতপাত-ছোঁয়াছুঁয়ি প্রবলভাবে মানতেন। কুলীন কায়স্থ বলে প্রকট গর্ব ছিল তাঁর। সমাজে জাতিভেদ থাকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, বর্ণাশ্রম যে কতটা বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি বিষয়ে মাঝেমাঝেই জ্ঞান দিতেন। নীচু জাতের হাতের জলগ্রহণ করতেন না। আরও অনেক বিধিনিষেধ মেনে চলতেন। সেই গোকুলেই সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবনা নিয়ে বেড়ে উঠছিলেন অনিরুদ্ধ। ক্লাস টেনে ওঠার সময় থেকেই বাবার অনেক শাসন, বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে আচরণে প্রতিবাদ শুরু করলেন। ফলে অচিরেই বাবার সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়ে গেল। অনিরুদ্ধর কোনো আচরণই অনন্তদেব পছন্দ করতেন না। অন্যদিকে অনিরুদ্ধও তাঁর বাবার ভাবনাচিন্তা জীবনযাত্রাকে অপছন্দ করতেন। একদিকে মাথায় জীবনানন্দ, অন্যদিকে কড়া বাস্তববাদী জাতিভেদের ধ্বজাধারী বাবা—দুইয়ের মধ্যে দিন পার করতে করতে একসময় অনিরুদ্ধ বুঝলেন তিনি এইভাবে খুব বেশিদিন পারবেন না। কবিতা অথবা এই পরিবার দুটোর একটাকে তাঁকে বেছে নিতে হবে। অনন্তদেবের নির্দেশ ছিল অনিরুদ্ধ বংশের ধারা বজায় রেখে আইন নিয়ে পড়বে। কিন্তু অনিরুদ্ধ পিতৃ-আদেশ অস্বীকার করে সাহিত্য নিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত জানালেন। সেটাই ছিল পিতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম প্রতিবাদ। অনিরুদ্ধকে সাপোর্ট করতেন ওঁর মা। মা জানতেন তার স্বামী যেমন জেদি, ছেলে আরও বেশি জেদি। তিনি তাই দুই পক্ষকেরই মধ্যস্থতা করে পারিবারিক শান্তি বজায় রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। অনন্তদেব ছেলেকে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন—সাহিত্য নিয়ে নিজের ইচ্ছেয় পড়াশোনা করছ। কিন্তু গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর একবছর আমি তোমাকে সময় দেব। তারমধ্যে নিজে উপার্জনের ব্যবস্থা করবে নয়তো আমার আর কোনো সাহায্য তুমি পাবে না। অথবা এই বাড়িতে যদি আমার আশ্রয়ে তখন থাকতে চাও তাহলে আমি যা বলব তাই শুনতে হবে।

বাবার ছুড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন অনিরুদ্ধ। ফার্স্টক্লাস নিয়ে শুধু পাশই করলেন না, একবছরের কম সময়ের মধ্যেই ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি জুটিয়ে ফেললেন। অনন্তদেবের আর কিছু বলার রইল না। কিন্তু আসল যুদ্ধ শুরু হল যেদিন অনন্তদেব অনিরুদ্ধকে বললেন, তোমার জন্য একটি পাত্রী পছন্দ করেছি। তুমি এর মধ্যে একদিন গিয়ে দেখে এসো। সামনের মাঘে তোমার বিবাহ দিতে চাই।

অনিরুদ্ধ বললেন—সেটা সম্ভব নয়।

কেন তুমি বিয়ে করতে চাও না?

চাই, তবে পাত্রী আমার পছন্দ করা রয়েছে।

হুম। কী নাম?

অতসী।

আমি পদবি সমেত নাম জানতে চেয়েছি।

অতসী দাস।

হোয়াট! দাস! তুমি নিজের পদবি জানো তো? নিজের বংশমর্যাদাবোধ বলে কি কিছুই নেই! এই শিক্ষিত হয়েছ!

শিক্ষা পেয়েছি বলেই আমি জাত-পাত মানি না।

হ্যাঁ আর আমরা সব অশিক্ষিত তাই তো? তুমিই একা শিক্ষিত। তোমার বাপ-ঠাকুরদা কেউ লেখাপড়া শেখেনি।

আমি লেখাপড়া শেখার কথা বলিনি, শিক্ষার কথা বলেছি।

শাট-আপ! গর্জে উঠেছিলেন অনন্তদেব। ছেলের মুখে এত বড়ো কথা তিনি সহ্য করতে পারেননি। তোমাকে একটা স্পষ্ট কথা বলে রাখছি, যদি তুমি ওই মেয়েকে মিত্র পরিবারের বউ হিসেবে আনার কথা ভেবে থাকো তাহলে শুনে রাখো এই বাড়িতে শুধু নয়, এই পরিবারের সঙ্গেও তোমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এবারে কী করবে সেই সিদ্ধান্ত তোমার।

অনিরুদ্ধ জানতেন বাবার কাছ থেকে এই কথাগুলো হয়তো তাঁকে একদিন শুনতে হতে পারে, তার জন্য মনে-মনে প্রস্তুতও ছিলেন। কথাটি শোনার পর আর অপেক্ষা করেননি তিনি, নিজের কিছু জামাকাপড় সহ প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিস ব্যাগে গুছিয়ে সেইদিনই শ্রীরামপুরের মিত্রবাড়ি ছেড়েছিলেন। মায়ের কষ্ট হয়েছিল খুব, কিন্তু এই পরিবারে মেয়েদের মতামতের কোনো গুরুত্ব নেই। মায়ের উপায় ছিল না অনন্তদেবের বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু বলার, নীরবে চোখের জল মুছেছিলেন তিনি। আর বলেছিলেন, আমাকে ভুলে যাস না, অন্তত মুখাগ্নিটুকু করার সময় আসিস।

মিত্রবাড়ির মস্ত গেটটা থেকে বাইরে বেরিয়ে তার পাঁচিলে একবার মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিলেন অনিরুদ্ধ। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাননি। কলকাতায় এসে প্রথমে উঠলেন তাঁরই এক অফিস কলিগের বাড়িতে। সেখানে দু-দিন থেকে মেসের ব্যবস্থা করে ফেললেন। জ্ঞান হওয়া ইস্তক মস্ত বাড়িতে বড়ো হওয়া মানুষ আচমকাই যখন ছোটো খুপরির মতো একটা ঘরে গিয়ে ঢোকে, তার প্রতিপদে জীবনকে দুর্বিষহ মনে হয়। অনিরুদ্ধরও তাই-ই হয়েছিল। কলকাতার বউবাজার এলাকায় যে মেসবাড়িটিতে তিনি প্রথমে উঠলেন

শাট-আপ! গর্জে উঠেছিলেন অনন্তদেব।

সেটা বহু পুরোনো একটা বিল্ডিং। সাতজন্মেও মেরামত হয় না, রং হয় না। লাইট-ফ্যানের অবস্থা তথৈবচ। বাইরের আলো-বাতাসও ভেতরে ঢোকে না ভালো করে। একটা ঘরে চারটে খাট। চারটে আলাদা জীবন। কেউ কারও নয়, শুধু বাথরুম-পায়খানা কমন। প্রতিমুহূর্তে অসুবিধা, বিরক্তিবোধ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছিল অনিরুদ্ধকে। যতক্ষণ অফিস করতেন ততক্ষণ রেহাই, তারপর অফিস ফেরতা কখনো দেখা হত অতসীর সঙ্গে। দুজনে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আবার ফিরে আসা মেসের গর্তে। অসহনীয় মনে হত। মিত্রবাড়ির সেই বিশাল বিশাল ঘর, দালান, বাগান, নিজের প্রাইভেসি সবকিছু এক মুহূর্তে উধাও। খুব কষ্ট হত, কিন্তু সেই মুহূর্তে একা একটা বাড়িভাড়া নেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। বিয়ের পর ঘরভাড়া নিতেই হত। তাই কিছুদিন একটু কষ্ট করে থেকে সেভিংসটা যতটুকু বাড়ানো যায় সেই চেষ্টা করছিলেন তিনি। তা ছাড়া আরও একটা গোপন অভিপ্রায় ছিল তাঁর। তা হল নিজেকে যাচাই করে নেওয়া। অতসীর জন্য তিনি কতটা স্যাক্রিফাইস করতে পারেন সেটাও নিজে একবার দেখে নিতে চেয়েছিলেন। অতসী অনিরুদ্ধর এই অবস্থার জন্য নিজেকে দায়ী ভাবত, অপরাধী মনে করত। কিন্তু অনিরুদ্ধ বলতেন, তুমি যদি এমন মনে করো তাহলে আমি হেরে যাব অতসী। আমার এই লড়াইটা শুধু তোমাকে ভালোবাসার জন্য নয়, একটা অন্যায় সিস্টেমের প্রতিবাদ করাও বটে। তুমি প্লিজ আমার পাশে থাকো অতসী, আমাকে সাহস দাও নইলে আমি হেরে যাব।

আমি তোমার পাশেই রয়েছি অনিরুদ্ধ, শুধু খারাপ লাগে আমার জন্য তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ। এটা তুমি ডিজার্ভ করো না।

ভালোবাসি যে তোমাকে, তাই পৃথিবীর সব কিছু ছাড়তে পারি। ভালোবাসা আসলে সন্ন্যাস নেওয়ার মতো, ত্যাগের মধ্যেই যে তার সুখ খুঁজে পায়।

সেদিন অতসীর চোখে যে অশ্রু চিকচিক করে উঠেছিল, তা দেখে অনিরুদ্ধর মনে হয়েছিল জগতের শ্রেষ্ঠ, উজ্জ্বলতম হিরের টুকরোটি তিনি পেয়ে গেছেন।

মাসদুয়েক মেসের জীবন অনিরুদ্ধকে এক অন্যরকম জীবন দেখিয়েছিল। ওই মেসেই পরিচয় হয়েছিল শৈলেন গুহর সঙ্গে। শৈলেন একটা সওদাগরি অফিসে কেরানি ছিল, সারাদিন অফিসে কলম পিষে সন্ধে নাগাদ ফিরে আসত। পকেটে থাকত একটা দেশি মদের বোতল, প্রতিদিন একটা করে লটারির টিকিট কাটত শৈলেন, কোনোদিন লটারি লাগত না, অথচ কেটেই যেত। সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল পুরোনো টিকিটগুলো ও ফেলত না, সব

জমিয়ে রাখত নিজের তক্তপোশের তোশকের তলায়। অফিসে কটা টাকাই বা মাইনে, তার মধ্যে লটারি আর মদেই টাকা প্রায় শেষ। মাঝে মাঝে এর-ওর কাছে ধার-দেনাও করত।

একবার অনিরুদ্ধ শৈলেনকে বললেন, এত টাকা খামোখা লটারি কিনে নষ্ট করো কেন? কোনোদিনই তো একটা টাকাও জেতো না।

মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে সেদিন শৈলেন বলেছিল, ভাই অনিরুদ্ধ তোমাকে একটা গোপন কথা বলি, আমি লটারির টিকিট জেতার জন্য কাটি না, ইনফ্যাক্ট আমি চাই না আমি কোনোদিন জিতি।

সে আবার কেমন কথা!

ইয়েস ব্রাদার। এই টিকিটটা আমি কাটি রোজ এই আশা নিয়ে আমি একদিন জিতব, আর এই জেতার আশাটাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখে, যেদিন সত্যিই জিতে যাব, আমার বেঁচে থাকার আশাটা আর রইবে না।

শুনে চমকে উঠেছিলেন অনিরুদ্ধ। এমনও হয়! সত্যি এইভাবে তো কখনো ভেবে দেখা হয়নি। আমরা সকলেই জীবনে কিছু না কিছু একটা অ্যাচিভ করার আশায় বেঁচে থাকি, দিন কাটাই। সেই অ্যাচিভমেন্টের আশাটাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। এবার যে যেমনভাবে বাঁচে, যেমনভাবে বাঁচতে চায়।

শৈলেন বলেছিল, ভায়া পুরো সংসারটাই তো আসলে একটা প্রকাণ্ড লটারির দোকান। সবাই আমরা আসছি আর অনেক হিসেব কষে, কপাল ঠুকে একটা টিকিট কাটছি। জেতে একজন, কিন্তু টিকিট কাটে একশোজন। যে হারে সেও যেমন পরের দিন জেতার আশায় টিকিট কাটছে আবার যে জেতে সেও পরের দিন আবার জেতার আশায় টিকিট কাটছে। এর থেকে মুক্তি নেই ভায়া।

ওই দিনটার পর থেকে অনেক ধোঁয়াশা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল অনিরুদ্ধর। শৈলেনকে নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলেন তিনি। নাম দিয়েছিলেন লটারি। একটি নামী পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশ পেয়েছিল, অবশ্য ততদিনে শৈলেনের সঙ্গে আর যোগাযোগ ছিল না।

আজ এতদিন পর আচমকা শৈলেনের কথা খুব মনে পড়ছে। শৈলেন ঠিক কে তা অনিরুদ্ধ কোনোদিনই বোঝেননি। আত্মীয় নয়, বন্ধু বলতে যা বোঝায় তাও নয়, অথচ অদ্ভুত একটা যোগাযোগ। সেটা ঠিক কী ছিল অনিরুদ্ধ বুঝে উঠতে পারেননি। দুজনের জীবন-যাত্রা, ভাবনা-চিন্তা, মতাদর্শে বিস্তর ফারাক অথচ অদ্ভুত একটা টান অনুভব করতেন শৈলেনের প্রতি। মনে হত অতি নিকটজন। শৈলেন মাঝেমাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়ত, তখন মেসের বাকি বোর্ডাররা অদ্ভুত নিস্পৃহ বা বিরক্ত হলেও অনিরুদ্ধ প্রতিবারই শৈলেনের দেখভাল করতেন। এবং একটু সুস্থ হওয়ার পরেই শৈলেন অদ্ভুত ভাবে বলতেন, থ্যাংকিউ ব্রাদার। মে গড ব্লেস ইউ। ঈশ্বর থেকে থাকলে উনি তোমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করুন। আরেকদিন শৈলেন বেজায় অসুস্থ হল, খুব জ্বর। অনিরুদ্ধ প্রায় সারা রাত জেগে জলপটি দিয়ে, ওষুধ খাইয়ে ওকে ঠিক করলেন। দুইদিন পর জ্বর ছাড়ল শৈলেনের। তারপর অনিরুদ্ধ অফিস থেকে একদিন ফেরার পর শৈলেন ওঁকে ডেকে হাতে একটা চিরকুট দিয়ে বলল—থ্যাংকিউ এগেইন ব্রাদার, তবে এবারে আর শুকনো ধন্যবাদ নয়, আমি আমার যাবতীয় সম্পত্তি আজ তোমার নামে উইল করে দিয়ে গেলাম। আমি ফট হয়ে গেলে আমার স্থাবর, জঙ্গম সব সম্পত্তি তোমার।

অনিরুদ্ধ সেই ভাঁজকরা কাগজটা খুলে দেখেছিলেন ওতে লেখা রয়েছে—আমি শ্রী শৈলেন দত্ত সজ্ঞানে এই মর্মে জানাইতেছি যে আমার মৃত্যুর পর আমার সঞ্চিত যাবতীয় লটারির টিকিট সহ তোরঙ্গটি যেন আমার অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রী অনিরুদ্ধ মিত্রকে অর্পণ করা হয়। এ ছাড়া আমার তক্তপোশের বিছানা-বালিশ এবং একজোড়া চাদর ও দুই সেট জামা-প্যান্ট সবকিছু যেন আমার চিতার সঙ্গেই পুড়িয়ে ফেলা হয়। আশা রাখি আমার এই অন্তিম ইচ্ছাপত্রটির যথাযথ সম্মান রাখা হবে।

অনিরুদ্ধ শৈলেনের এমন ইচ্ছাপত্র পড়ে হেসে উঠতে গিয়েও পারেননি। থমকে গিয়েছিলেন।

অতসীর সঙ্গে বিয়ের দিন সাতেক আগে ওই মেস ছেড়ে দিয়ে শ্যামবাজারে একটা ঘর ভাড়া নিলেন অনিরুদ্ধ। ছোটো একখানিই ঘর, কিন্তু সবটাই ব্যক্তিগত। রান্নাঘর, বাথরুম ইত্যাদি সবই নিজস্ব। কোনো হোমযজ্ঞ করে বিয়ে নয়, কোর্টপেপারে সই করে বিয়ে। পাড়ার বাল্যবন্ধু তপনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল অনিরুদ্ধর। ওর মাধ্যমেই বাড়ির খবরাখবর নিতেন তিনি। বিয়ে করছেন সেই খবরটা মাকে জানানোর জন্য বলেছিলেন তপনকে। বিয়ের দিন সন্ধেবেলায় তপন এসেছিল, একগাছা পুরোনো সোনার বালা আর একটা হার। অনিরুদ্ধ প্রথমে সেটা নিতে চাননি, তপনকে বলেছিলেন, এটা তুই মাকে ফেরত দিয়ে দিস। তপন বলেছিল—শোন, কাকিমা বলে দিয়েছেন এই গয়না তাঁর শ্বশুরবাড়ির থেকে পাওয়া নয়, বাবা তাঁকে বিয়েতে দিয়েছিলেন, এটা তিনি পুত্রবধূকে দেবেন বলেই রেখে দিয়েছেন, না নিলে উনি কষ্ট পাবেন। এরপর আর কিছু বলার ছিল না। বিয়েতে অনিরুদ্ধর নিমন্ত্রিত কয়েকজন অফিসকলিগ এসেছিলেন আর মেস থেকে দুজন। তার মধ্যে একজন ছিল শৈলেন। শৈলেন এসেছিল হাতে একটা তাজা গোলাপ নিয়ে, আর একটা খাম। গোলাপটা অতসীর হাতে দিয়ে বলেছিল, এটা সদ্য একজনের বাগান থেকে না বলে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছি, একেবারে তাজা। আর অনিরুদ্ধকে বলেছিল, ভায়া আমার তরফ থেকে এই উপহারটুকু রাখো। আর হ্যাঁ ইন ফিউচার যে কোনো দরকারে এই শৈলেনকে একবার হাঁক দিও। আই উইল বি দেয়ার। অনিরুদ্ধ বলেছিলেন, বেশ তাই হবে। পরে খামটা খুলে দেখেছিলেন ভেতরে ভরা রয়েছে একখানি লটারির টিকিট। সেই টিকিটের ভবিষ্যৎ কী ছিল তা নিয়ে কোনো আগ্রহ ছিল না। তবে খামসমেত টিকিটটি রেখে দিয়েছিলেন উপহার হিসেবে। খাওয়ানো হয়েছিল লুচি, আলুর দম, মাংস আর মিষ্টি। সবমিলিয়ে জনা পঁচিশেক নিমন্ত্রিত। বাড়িওলাও সপরিবার নিমন্ত্রিত ছিলেন। খুব সংক্ষেপে অনাড়ম্বরভাবে মিটেছিল বিয়ে। অতসীর বাবা, মা এবং তাঁদের দুই-চারজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এসেছিলেন সেদিন। তাঁরা সবই জানতেন। অতসীর পরিবার ছিল অসচ্ছল। বাবা একটি জুটমিলে চাকরি করতেন। কলেজে পরিচয়, সেখান থেকেই ধীরে ধীরে প্রেম। গান আর কবিতাই ওদের দুজনকে পরস্পরের কাছে নিয়ে এসেছিল। বিয়ের পর নতুন জীবন। তবে নিজের বাড়ি একবারের জন্যও ফেরা হয়নি অনিরুদ্ধর। অনন্তদেব যেমন নিজের জেদে অটল—অনিরুদ্ধও ছিলেন নিজের আদর্শে অবিচল। কেউ

এতটুকু নিজের জমি ছাড়তে রাজি ছিলেন না। ফলে মিত্রকুঠি নামের বাড়িটা দিনে দিনে ঝাপসা হয়ে এল। ভাড়া নেওয়া ওই ছোটোখানিকেই অনিরুদ্ধ আর অতসী মিলে ভালোবাসা দিয়ে মস্ত করে ফেললেন। গানে, কবিতায়, ভালোবাসায় সমস্ত অভাব যেন ধুয়ে-মুছে গেল দুজনেরই। ছুটির দিনে বিকেলে দুজনে শ্যামবাজার থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসতেন বাগবাজার ঘাটে, কখনো কুমোরটুলির অলিগলিতে। কখনো আবার বাসে চেপে হাতিবাগানে চলে যেতেন বাংলা সিনেমা দেখতে। অতসীর চোখদুটো ছিল বড়ো মায়াময়। অনিরুদ্ধ বলতেন, তোমার চোখের দিকে তাকালে অতিবড়ো কঠিন হৃদয়েরও মন নরম হয়ে যাবে। আসলে মায়ামমতার সঙ্গে খানিক ক্লান্তিও জড়ানো থাকত অতসীর দৃষ্টিতে। খানিক করুণ। আসলে অতসী একটু রুগ্‌ণ ছিলেন। রোগা, রক্তাল্পতায় ভোগা। কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর একেবারেই ছিল না ওঁর। অনিরুদ্ধ যখন অতসীকে পেয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন এমনই আনন্দে প্রচুর লেখালিখি, সভাসমিতি করা শুরু করলেন, প্রেমে টইটম্বুর হয়ে অতসীর জন্য একের পর এক প্রেমের কবিতা লিখে চলেছেন, তখন তার সঙ্গে নিজের স্ত্রী-র শরীরের দিকেও যে নজর রাখা উচিত সেটা যেন তিনি ভুলে গেলেন। ওদিকে মুখচোরা অতসী শুধু অনিরুদ্ধর খুশিতেই খুশি হয়ে নিজের সমস্যাকে আড়াল করে রইলেন। ফল হল বছর দেড়েক পর যখন অতসী কনসিভ করলেন, তখন শরীরে নানাবিধ সমস্যা, অভাব প্রকট হয়ে উঠল। এবার টনক নড়ল অনিরুদ্ধর। সাধ্যমতো চিকিৎসা শুরু করলেন অতসীর। একদিকে গর্ভস্থ সন্তানের যেন কোনো ক্ষতি না হয় তার খেয়াল রাখা, একইসঙ্গে অতসীর যত্ন। না সত্যিই কোনো ত্রুটি করেননি তিনি, কিন্তু হয়তো খানিকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল। প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন যত এগিয়ে আসছিল ততই অতসীর শরীরে নানা কমপ্লিকেশন। শেষ সপ্তাহটা খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে কেটেছিল। অতসীর বাবা-মা চেয়েছিলেন মেয়ে মাস দুয়েক আগে থেকে তাঁদের বাড়িতে গিয়েই থাকুক। কিন্তু সন্তান প্রসবের আগেই অতসীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে রাজি হননি অনিরুদ্ধ। অতসীও অনিরুদ্ধকে একা ছাড়তে চাননি। আসলে একে অপরকে একেবারে চোখে হারাতেন। এ ছাড়াও আরও একটি কারণ ছিল। অতসীর বাবার ওপর অতিরিক্ত খরচের বোঝা তিনি চাপাতে চাননি। পুষ্টিকর খাবার, ওষুধ ইত্যাদির জন্য একটা ভালো খরচ হচ্ছিল, সেটা অতসীর বাবার পক্ষে বহন করা একটু কঠিন হত, আবার এর জন্য টাকা দেওয়াটাও ভদ্রলোককে অসম্মান জানানো হয়, তাই অনিরুদ্ধ অতসীকে আগে পাঠাতে চাননি। তা ছাড়া সন্তানের জন্ম হওয়ার পর মাস কয়েক তো অতসীকে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতেই হবে। কারণ একটি সদ্যোজাত শিশু ওর। তার মাকে কীভাবে যত্ন করতে হয় তার জন্য অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। এবং দরকার মহিলার সাহায্য। অতসীর মা রয়েছেন। তিনি নিজে যথেষ্ট কর্মঠ, ফলে সবদিক থেকে সেটাই সুবিধাজনক বলে এমনটাই স্থির হয়েছিল। আর অতসীদের বাড়ি হাওড়ার শলপে। কলকাতা থেকে বেশ খানিকটা দূরেই। অনিরুদ্ধ যে বাড়িতে ভাড়া থাকেন তার থেকে খানিক দূরেই হাসপাতাল, সেটাও একটা বড়ো সুবিধা ছিল। অবশ্য বাড়িওলার স্ত্রী অতসীকে খুবই স্নেহ করতেন। শেষ দিন-পনেরো উনি নিজেই অনিরুদ্ধর অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর সারাদিন খোঁজখবর রাখতেন। সেইদিক থেকে অনিরুদ্ধ অনেকটাই নিশ্চিন্ত ছিলেন। বাড়িওলার ঘরে টেলিফোন ছিল। অনিরুদ্ধ নিজের অফিসের নাম্বারটা দিয়ে রেখেছিলেন যদি প্রয়োজন হয়। হয়নি। বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ পরেই যখন অতসীর পেইন শুরু হল তখন আর মুহূর্তকাল দেরি না করে একটা ট্যাক্সি ডেকে অতসীকে নিয়ে গেলেন সরলা মাতৃসদনে। ভর্তি করার কিছুক্ষণ পরেই হাসপাতাল থেকে অনিরুদ্ধকে জানানো হল পেশেন্টকে রক্ত দিতে লাগবে, ইমিডিয়েট। এ নেগেটিভ রক্ত। নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত রাত সাড়ে আটটার সময় কোথা থেকে জোগাড় করবেন বুঝতে পারছিলেন না অনিরুদ্ধ। দিশেহারা লাগছিল। অ্যাডমিট করানোর পরেই হাসপাতাল লাগোয়া পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করে খবর দিয়েছিলেন অতসীর বাড়ির এক প্রতিবেশীকে। তারা অতসীর বাড়িতে খবর দিয়ে দিয়েছিল। ঘণ্টা দুয়েক পর অতসীর বাবাও চলে এসেছিলেন হাসপাতালে। কিন্তু এ নেগেটিভ রক্ত কোথায় পাওয়া যায় সেটা বুঝে পাচ্ছিলেন না কেউ। এদিকে হাসপাতাল থেকে বারবার রক্তের ব্যবস্থা করার জন্য তাগাদা দিচ্ছিল। তখন আচমকাই অনিরুদ্ধর কেন জানা নেই শৈলেনের কথা মনে পড়েছিল। বিয়ের পর আর কোনো যোগাযোগ ছিল না শৈলেনের সঙ্গে। সে আদৌ কোথায় রয়েছে তাও জানা ছিল না। কিন্তু ওকেই মনে পড়েছিল। আর পড়ামাত্র বুকপকেট থেকে ফোন নাম্বার লেখার ছোটো ডায়েরিটা বার করে সেখান থেকে পুরোনো মেসের নাম্বার বার করে কল করেছিলেন। মেসের জীবন সম্ভবত বদলায় না, বছরের পর বছর সবকিছু একইভাবে চলতে থাকে। ফোনটা বেজে উঠেছিল, কেউ একজন তুলেছিলেন, শৈলেন গুহ আছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, আছেন, কোথায় আর যাবেন? ধরুন দিচ্ছি। একটু পরেই সেই পরিচিত সামান্য জড়ানো কণ্ঠস্বরে, হ্যালোওওও।

শৈলেন আমি অনিরুদ্ধ বলছি, অনিরুদ্ধ মিত্র।

ইয়েস ব্রাদার, কী খবর বলো?

অনিরুদ্ধ খুব সংক্ষেপে নিজের প্রয়োজনটুকু জানিয়েছিলেন। শৈলেন বলেছিল, কানে শুনে নিয়েছি যখন ডোন্ট ওয়ারি, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যবস্থা করে চলে আসছি।

সত্যিই আধঘণ্টার মধ্যে সঙ্গে একজন লোককে নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে এসেছিল শৈলেন। এই যে ব্রাদার, ইনি এ নেগেটিভ। ইনি তোমার স্ত্রীকে রক্ত দেবেন।

সত্যিই তাই হল। কিন্তু পুত্রসন্তান প্রসবের পরেই অতসীর শারীরিক অবস্থা খুবই ক্রিটিকাল হয়ে গেল। প্রায় ঘণ্টা চারেক চলল যমে-মানুষে টানাটানি। মধ্যরাতে অনিরুদ্ধ জানলেন বিপদ কেটে গেছে। আপাতত মা ও তার শিশু ভালো আছে। অনিরুদ্ধ তাঁর পুত্রের মুখ দেখতে পারেন। শৈলেন ততক্ষণ অপেক্ষা করছিল তার সেই পরিচিত ডোনারকে নিয়ে। বিপদ কেটে গেছে শুনে অনিরুদ্ধকে বলল, ব্যস আর চিন্তা নেই। এবার তাহলে আমরা আসি। এনি প্রয়োজন অ্যাট এনি টাইম শুধু কল করে দেবে, বাঘের লেজ থেকে হাওড়াব্রিজের নাটবোল্ট সব ব্যবস্থা করে দেব।

অনিরুদ্ধ মুখে কিছু না বলে শৈলেনকে একবার জড়িয়ে ধরলেন

শুধু। আর সেই ডোনারকে বললেন, আপনার নামটুকু পর্যন্ত আমার জানা হয়নি দাদা।

আমার নাম শেখ সুরাব। শৈলেনভাইয়ের বন্ধু।

আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। আপনি আমার স্ত্রী এবং পুত্রের প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

না না, ধন্যবাদের কী আছে? মানুষ মানুষের সাহায্যে আসবে এটাই তো স্বাভাবিক।

অনিরুদ্ধ এই সহজ কথাটার উত্তরে কী বলবেন ভেবে পেলেন না, শুধু বললেন, একদিন আমাদের বাড়িতে আসবেন।

জ্বি ভাই নিশ্চয়ই আসব। আমি আসি তাহলে।

আচ্ছা।

চলি ব্রাদার।

ওরা দুজন ভোর রাতে চলে যাওয়ার পর অতসী যে ওয়ার্ডে ভর্তি সেখানে ঢুকেছিলেন অনিরুদ্ধ। পুত্রের মুখ দেখার আগে অতসীর ঘুমিয়ে থাকা যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখটার দিকে আগে দেখেছিলেন। বড়ো করুণ, অসহায় সেই মুখ।

ও সুস্থ আছে তো সিস্টার?

হ্যাঁ, ঠিক আছে। চিন্তা করবেন না। বাকিটা ডাক্তারবাবু বলে দেবেন।

খানিক নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর পুত্রের মুখ দেখেছিলেন অনিরুদ্ধ। চাদরে জড়ানো পুঁচকে একটা শরীর, চোখ বুজে থাকা টুকটুকে লাল একটা মুখ। আমার...আমার সন্তান! এই অনুভূতি শিহরিত করেছিল। অনির্বাণ...আমাদের অনির্বাণ। ফিসফিস করে উচ্চারণ করেছিলেন তিনি।

অতসী আর তিনি আগেই স্থির করে রেখেছিলেন যদি কন্যা সন্তান হয় তাহলে নাম রাখবেন অনিতা আর যদি পুত্র জন্মায় তবে অনির্বাণ। রাত ভোর হয়ে ওঠা অবধি অনির্বাণের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন অনিরুদ্ধ। কী কোমল নিষ্পাপ একটি শিশুর মুখ...

সেই মুখটা এত বছর পর মনে পড়ামাত্র সামান্য কেঁপে উঠলেন অনিরুদ্ধ। ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। নিঃশব্দে উঠলেন বিছানা ছেড়ে। পাশে অনীক নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। ব্যাগের ভেতর থেকে সকালে কুড়িয়ে পাওয়া খামটা কি এখনও আছে? নাকি সেটা মনের ভ্রম ছিল! ব্যাগের খাপে হাত ঢোকাতেই হাত ঠেকল খামে। আছে! খামটা বার করে সেই ভাঁজকরা চিঠিটা আবারও চোখের সামনে মেলে ধরলেন তিনি। কী করে সম্ভব! কী করে! চিঠিটা হাতে নিয়ে চলে এলেন নিজের শোবার জায়গায়। বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে আবার চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন—

প্রিয় বাবা,

তুমি কেমন আছ? আশা করি তুমি এবং মা ভালো আছ। কিন্তু আমি একদম ভালো নেই। তোমার কথা খুব মনে পড়ছে বাবা। আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে। আমার জন্মদিনে কিনে দেওয়া তিনচাকা সাইকেলটা আমি এঘর-ওঘর চালাচ্ছি, মা রান্নাঘরে কড়াইতে তেজপাতা আর পাঁচফোড়ন ভাজছে, আর তুমি তোমার ঘরে বসে লিখছ। যে বাড়িটায় আমরা থাকতাম সেই বাড়িতে দুটো ঘর। একটায় আমরা ঘুমোতাম। সেই ঘরটা ছিল বড়ো। খাট ছিল, ড্রেসিং টেবিল ছিল। বাক্সে সুটকেস থাকত, জামাকাপড় রাখার আলনা ছিল। আরেকটা ঘরে থাকত তোমার বইয়ের আলমারি, সেই আলমারিতে কত্ত কত্ত বই। এ ছাড়াও একটা ছোটো সোফা আর দুটো চেয়ার এবং একটা টেবিল ছিল সেই ঘরে। রবিবার, ছুটির দিনে তুমি ওই ঘরে বসে অনেককিছু লিখতে। কী লিখতে আমি বুঝতে পারতাম না। সাইকেল চালিয়ে আমি তোমার কাছে এসে দেখতাম তুমি টেবিলের ওপর খাতার দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছ, কখনো খসখস করে লিখছ। আমি যে তোমার কাছে এসেছি তা তুমি টেরই পাওনি। আমি অ্যাটেনশন পাবার জন্য অর্থহীন চিৎকার করতাম, তখন তুমি আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতে, কখনো সাইকেল থেকে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে গালে চুমু খেতে, কখনো বা একটু বিরক্ত হয়ে বলতে, ওই ঘরে দেখো মা কী করছে। শিশুকে অ্যাভয়েড করলে তারা খুব ভালো বুঝতে পারে। খুব রেগে যায়। হাত-পা ছুড়ে, বিচিত্র শব্দ করে আরও বেশি করে অ্যাটেনশন পাবার চেষ্টা করে। আমিও তাই করতাম। তোমার কাজের ক্ষতি হত, কিন্তু তুমি মোটেও রাগতে না। হো হো করে হেসে উঠে বলতে, ওই দেখো অতসী, তোমার ছেলে কেমন আমার কাজ পণ্ড করবে বলে যুদ্ধ বাধিয়েছে। তোমার কথায় মা রান্না ফেলে প্রায় দৌড়ে আসত, আমাকে মৃদু বকা দিয়ে বলত, বাবু তুমি তো লক্ষ্মী ছেলে, লক্ষ্মী ছেলেরা কখনো দুষ্টুমি করে? চিৎকার করে? আমি তখন সবে অল্প অল্প কথা বলা শিখেছি, আমি আঙুল তুলে আধো আধো বলতাম, বাবা দুষ্টু, বাবা দুষ্টু। আমার কথা শুনে তুমি আর মা খুব হেসে উঠতে। আর তোমাদের হাসতে দেখে আমিও দুই হাতে তালি দিয়ে উঠতাম। তারপর মা আমাকে কোলে তুলে নিয়ে চলে আসত রান্নাঘরে। সেখানে আমার হাতে কিছু একটা ধরিয়ে দিয়ে এমনভাবে ভুলিয়ে দিত যে আমি তোমার কাছে আসতেই ভুলে যেতাম।

জানো বাবা আমার স্পষ্ট মনে রয়েছে, রাতে ঘুমের মধ্যে বিছানায় হিসি করে ফেললে কিংবা আচমকা মুখ দিয়ে দই তুললে অথবা স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠলে তুমি উঠে আমার ভেজা কাঁথা বদলে দিতে, মুখের কষ বেয়ে গড়িয়ে আসা দই মুছিয়ে দিতে, বুকের ওপর আলতোভাবে হাত থাবড়ে আমাকে আশ্বস্ত করতে। মা তখন অঘোরে ঘুমোত, কিংবা মায়ের ঘুম ভেঙে গেলে তুমি মাকে ফিসফিস করে বলতে, তুমি ঘুমোও অতসী, আমি দেখছি। আসলে আমার তখনো বোঝার বয়স হয়নি যে কেন মা অঘোরে ঘুমোত, অথবা ঘুম ভেঙে গেলেও তুমি মাকে ঘুমোতে বলে নিজে আমার জন্য জাগতে। আমি যেন বিছানা ভিজিয়ে তারমধ্যেই শুয়ে না থাকি তাইজন্য তুমি আমার কাঁথার তলায় নিজের একটা হাত ঢুকিয়ে রাখতে। হাতে গরম জলের স্পর্শ পেলেই উঠে পড়তে। তুমি সারাদিন অফিস করে ফিরে এসে তারপর মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে, আমাকে আদর করে, রাতের খাবার খেয়ে নিজের ঘরে লিখতে বসতে। তারপর আমি আর মা ঘুমিয়ে পড়ার পর তুমি অনেক রাতে শুতে। আমি তোমাদের দুজনের মাঝখানে শুতাম। এক একদিন তুমি কেন জানি না আমাকে দেওয়ালের দিকে সরিয়ে দিয়ে মা আর তুমি পাশাপাশি শুতে। পরের দিন আবার আমি নিজেকে তোমাদের মাঝখানেই আবিষ্কার করতাম। তখন তো আমি খুব ছোটো ছিলাম।

আমি জানতাম তোমরা দুজনে শুধু আমাকেই আদর করো। আমি আরেকটুখানি বড়ো হওয়ার পর বুঝতে পারলাম তুমি আমাকে যেমন খুব ভালোবাসো, মাকেও তেমন ভালোবাসো। দুজনেরই সমান খেয়াল নাও। আমার মাকে তুমি একটু বেশিই আগলে রাখতে পরে বুঝেছি। মা ছিল দুর্বল, রুগ্‌ণ, মাঝেমাঝেই অসুস্থ হত। তুমি তখন দিবারাত্রি নিজের সবকিছু ভুলে মাকেও দেখতে আবার আমাকেও সামলাতে। তুমি অফিসে গেলে মা আমাকে কোলে নিয়ে কত গল্প শোনাত, কিন্তু প্রতিবারই গল্প শোনাতে শোনাতে মায়ের জিভ জড়িয়ে আসত, ঘুমে ঢুলে পড়ত, আমি মাকে ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, মা তারপর কী হল? তারপর রাক্ষসটা কী করল? ও মা...মা। মায়ের ঘুমের ঘোর কেটে যেত, আবার অতি কষ্টে চোখ মেলে আমাকে গল্প শোনাতে শুরু করত। একদিন তুমি আর মা মিলে আমাকে নিয়ে গেলে মস্ত একটা বাড়িতে, সেখানে আমার মতো অনেক ছেলে-মেয়ে রয়েছে। তাদের বাবা-মায়েরাও এসেছে। আমার মায়ের বয়েসি একজন আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করল। আমাকে স্লেটে অ-আ এক-দুই লিখতে বলল, আমি তোমার কাছে ওগুলো লিখতে শিখে নিয়েছিলাম। আমি লিখলাম তারপর তুমি আর মা সেই মস্ত বাড়িটা থেকে খুব খুশি হয়ে ফিরলে। ফেরার পথে তুমি আমাকে বললে ওই বাড়িটার নাম স্কুল। এরপর থেকে আমি রোজ যাব। আমার নতুন বই এল, ব্যাগ, জুতো, ইউনিফর্ম, ওয়াটার বটল, টিফিনবক্স। তারপর তুমি আর মা মিলে আমাকে প্রথমদিন স্কুলে দিয়ে এলে। আমাকে একা ছেড়ে দিয়ে তোমরা যখন ফিরে যাচ্ছিলে আমি চিল চিৎকার করে কাঁদছিলাম। আমি ভাবছিলাম তোমরা দুজন আমাকে চিরকালের মতো ছেড়ে চলে যাচ্ছ। স্কুলের একজন মাসি আমাকে কোলে তুলে ক্লাসরুমে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল আর আমি প্রাণপণে হাত-পা ছুড়ছিলাম। শুধু আমি নয়, সেদিন প্রথমবার যে বাচ্চারা স্কুলে এসেছিল তাদের অনেকেই আমার মতো কাঁদছিল। কেউ ফুঁপিয়ে, কেউ আমার মতো চিৎকার করে। আসলে ওইটুকু বয়সে বোঝার ক্ষমতা ছিল না যে তোমরা কখনো আমাকে ছেড়ে যেতে পারো না, কিছুতেই না। বরং আমি কোনোদিন...। প্রথম দুই-তিনদিন আমি স্কুলে যাওয়ার নাম শুনলেই কাঁদতে শুরু করতাম। তারপর অভ্যাস হয়ে গেল। ওই ঘণ্টা কয়েক তোমাদের ছেড়ে থাকা স্বাভাবিক হয়ে গেল। বিচ্ছেদেরও কি একটা অভ্যাস থাকে বাবা? তুমি তো কবি, আমার থেকে তোমার জ্ঞান, অনুভূতি সবই অনেক গভীর, তুমি ভালো বলতে পারবে। অনেক বন্ধু হল আমার। তুমি রোজ সকালে আমাকে স্কুলে পৌঁছে দিতে আর ছুটির পর মা গিয়ে নিয়ে আসত। তারপর মা আর পারত না, কষ্ট হত। তখন তুমি স্কুলভ্যান করে দিলে। ভ্যানকাকু আমাকে নিয়ে যাওয়া, ফিরিয়ে দিয়ে আসা করত। পাড়াতেও আমার কয়েকজন বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। আমরা একসঙ্গে খেলতাম। বাবা...আমার জীবনটা খুব সুন্দর ছিল। তোমাদের জন্য আমার জীবনটা বড়ো সুন্দর ছিল। তখন বুঝতাম না, অনেকটা বড়ো হওয়ার পর বুঝেছি। আমি বড়ো হতে থাকলাম আর আমার মা বুড়ি হতে থাকল, মাঝেমাঝেই মা অসুস্থ হয়ে পড়ত, ফ্যাকাশে শীর্ণ চেহারা, মায়ের কোনো খাবার সহ্য হত না, অল্প কাজ করলেই হাঁফিয়ে পড়ত, সব কাজ খুব ধীরে ধীরে করত, অথচ তুমি মায়ের প্রতি ছিলে অদ্ভুত সহমর্মী। তোমার অফিসের ভাত রান্না করতেও মা এক একদিন হাঁফিয়ে পড়ত, তোমার দেরি হত, অথচ তুমি কী অদ্ভুত শান্ত। কখনো বিরক্ত হতে না, বরং মাকে বলতে তাড়াহুড়ো না করতে। এক একদিন তোমার অফিসের টিফিন বানিয়ে দিতে পারত না মা, তুমি টিফিন না নিয়েই চলে যেতে। মা অসুস্থ হলে নিজের সব কাজ ফেলে মায়ের খেয়াল রাখতে, ওষুধ-পথ্য দিতে। আমার মনে আছে তুমি বাজার থেকে শোল মাছ, মাগুর মাছ কিনে আনতে মায়ের জন্য। মা ওই মাছ কুটতে পারত না বলে তুমি বারান্দায় সেই মাছ কুটতে বসতে। মাকে বলতে এই মাছ খেলে শরীরে রক্ত হয়। কোনোদিন মায়ের ওষুধ একদিনের জন্যও বন্ধ হত না তোমার খেয়াল রাখার জন্য। তোমার চোখে মায়ের প্রতি অদ্ভুত মায়া আর ভালোবাসা দেখতাম, মায়ের চোখেও ছিল তোমার প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর এই সবকিছু ছাপিয়ে ছলছল করত কৃতজ্ঞতা যা মা কখনো মুখে প্রকাশ করত না। শুধু নিজের সবটুকু নিংড়ে তোমায় ভালো রাখার চেষ্টা করত। আমি কিছুটা বড়ো হওয়ার পর বুঝতে শিখেছিলাম তোমরা আসলে ভালোবাসায় মাখামাখি দুজন মানুষ। আচ্ছা বাবা আমার আর কোয়েলের জীবনটাও তো তোমাদের মতো হতে পারত, তোমার থেকে আমাদের দুজনের উপার্জন অনেক বেশি ছিল, আরও স্বচ্ছন্দে আমরা জীবন কাটাতে পারতাম, আরও সুখে থাকতে পারতাম। কিন্তু সে আর হল কই? ক্লাস ফোর কিংবা ফাইভে যখন উঠলাম তখন আমি অল্পস্বল্প বুঝতে পারলাম তুমি আমার বন্ধুদের বাবার থেকে একটু আলাদা। তুমি শুধু চাকরিই করো না, তুমি একজন পোয়েট। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল যেমন পোয়েট ছিলেন তেমনই। ছুটির দিনে কখনো আমাদের বাড়িতে তোমার বন্ধুরা আসত, কমবয়েসি দাদা-দিদিরাও আসত। মা তাদের জন্য চা বানাত। কখনো অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমি আধো ঘুমে শুনতে পেতাম তুমি মাকে তোমার সদ্য লেখা কবিতা পড়ে শোনাচ্ছ। জানো বাবা শৈশবের স্মৃতি বেশির ভাগটাই ভুলে গেলেও কিছু কথা, কিছু মুহূর্ত আশ্চর্যভাবে আজীবনের জন্য মনের ভেতরে গেঁথে যায়। যেমন একদিন রাতে আমি তোমার পাঠ করা একটা কবিতার লাইন শুনেছিলাম। 'আমার ইচ্ছে করে একটা আকাশ থেকে কিছুটা আকাশ নিয়ে তোমার জন্য একটা নীলরঙা ওড়না বানাই, তাতে বসিয়ে দিই কচুপাতার ওপর হিরের মতো টলটলে জলবিন্দু। সেই ওড়নাটা বানানোর জন্য আমাকে একটু সময় দাও, একটু অপেক্ষায় থাকো লক্ষ্মীটি'।

আমি সেই বয়সে এই লাইনের কীই বা মানে বুঝব বলো? অথচ লাইনটা অদ্ভুতভাবে মনে গেঁথে গিয়েছিল। আমারও ইচ্ছে হয়েছিল অমন একটা ওড়না আমিও বানাই কারও জন্য। তুমি ওড়নাটা হয়তো বানাতে পেরেছিলে, আমি পারিনি।

ভালো থেকো বাবা। তোমার অনি।

চিঠিটা ভাঁজ করামাত্র অনিরুদ্ধ বুঝতে পারলেন আবার তাঁর চোখের কোণদুটো জ্বালা করছে। আঙুলের ডগাগুলো আবারও শিরশির করছে। এই চিঠির হাতের লেখা, এই চিঠির কথা সবকিছু তাঁর জানা, সবকিছু তাঁর চেনা। এমন কী করে সম্ভব! অনিরুদ্ধ নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন এটা সম্ভব নয়, এটা চোখের ভুল। মানসিক বিকার, কিন্তু...একটা ভ্রম কতক্ষণ স্থায়ী হতে পারে? সেই

সকাল থেকে এখন মধ্যরাত সেই একই চিঠি, একই অক্ষর! ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না। এটা কি আদৌ কোনো স্বপ্ন? এতদিন পর কেন তাহলে সেই স্বপ্ন সত্যির মতো করে ফিরে আসছে! পৃথিবীতে কতকিছু ঘটে যা মানুষের অভিজ্ঞতার বাইরে, চৈতন্যের আড়ালে। এই চিঠিও কি তাই? চিঠিটা যতবার পড়ছেন অনিরুদ্ধ, অনির্বাণের ছোটোবেলার কথা মনে পড়ছে। ছেলেটা...আমার ছেলেটা...আচমকাই শিশুর মতো ঠোঁট ফুলিয়ে আবারও ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি। কোনোমতে নিজেকে সামলালেন। অনেকক্ষণ চিঠিটা হাতে ধরে বসে রইলেন। কখনো তার অক্ষরগুলোর ওপরে হাত বোলালেন। চুমু খেলেন। অনি...আমার অনি...তুই খুব ভালো ছেলে বাবা সোনা আমার...ভালো থাক।

* * *

ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গেল অনীকের। হোটেলের সেই জানলার ফাঁক দিয়ে মিহি আলো গলে ঘরের ভেতরে ঢুকছে। ঘুম ভাঙার পরে আরও কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল ও। অনীকের একবার ঘুম ভেঙে গেলে আর আসতে চায় না। এমনিতেই ঘুম ওর খুব কমে গেছে। এখন তবু একটু হয়, মাস ছয়েক আগে পর্যন্ত একেবারে ঘুম আসত না। ভেতরটা সবসময় আনচান করত, অস্থির লাগত। ঘুমের জন্য যে মানসিক স্থিরতা প্রয়োজন হয় তা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আবার ধীরে ধীরে ফিরেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে শোবার পর উঠে বসল অনীক। কাল রাতে যতক্ষণ ঘুম আসেনি, মায়ের ফোনটার কথা মনে এসেছে। এমন কী করে হল? রাস্তায় পড়ে থাকা একটা ফোনে কখনো মায়ের ফোন আসতে পারে? প্রথমে ভেবেছিল অন্য কারও মা, কিন্তু সেই কণ্ঠ, আর মা ছাড়া অনীকের জীবনের এত কথা আর কেই বা জানত? একটানা মা কাল কথা বলে গিয়েছিল। অনীক কিছুই বলতে পারেনি। শুধু শুনে গেছে। তারপর একটা সময়ে ফোনটা রেখে দিয়েছে মা। এটা হয়তো সত্যি ছিল না। পুরোটাই ওর ভাবনা। মোবাইলটা আর এখন নিশ্চয়ই নেই। থাকার কথাও নয়। একবার দেখা দরকার।

অনিরুদ্ধর দিকে তাকিয়ে দেখল, নি ঘুমোচ্ছে। ধীরে ধীরে উঠল। ঘরের ভেতরে আবছা অন্ধকার। লাইট না জ্বালিয়ে নিজের ব্যাগের ভেতরের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় হাত রাখতেই চমকে উঠল। হাতে ঠেকছে! এখনও রয়েছে! মুঠোয় ধরে বার করে নিয়ে আসল সেটাকে। হ্যাঁ সেই মোবাইলটাই। এটাতেই গতকাল মায়ের ফোন এসেছিল। কাল মা যতক্ষণ কথা বলছিল, অনীকের দুই চোখ বেয়ে শুধু জল গড়িয়ে নেমেছিল গালে, গলায়, বুকের ওপরে। আর কি ফোন আসবে? হয়তো আর আসবে না। আরও অনেক অনেক কথা মায়ের কাছ থেকে শুনতে ইচ্ছে করছে, মাকে বলতে ইচ্ছে করছে...।

মোবাইলটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল অনীক। মোবাইলের ব্যাপারে নি-কে কিচ্ছু বলেনি ও। সারাদিন ওটাকে নিয়ে ঘুরেছে। বারবার মনে হয়েছে এই বুঝি আবার মায়ের ফোন এল। আসেনি। যদি আসত, তাহলে? দাদুর কাছে অনীক কোনোকিছু লুকোয় না, লুকোলেও দাদু কীভাবে যেন ওর মুখের দিকে তাকালে সব বুঝতে পেরে যায়। এমনটা আজ নয়, বরাবর। এতটা মা-বাবাও বুঝত না ওকে। অবশ্য বোঝার সময়ও ছিল না দুজনের। দুজনেই যে যার জগতে ব্যস্ত। একমাত্র বন্ধু বলতে নি। কিন্তু তারপরেও মা, তারপরেও বাবা ডাকটার মধ্যে কী যেন একটা রয়েছে। যা কোনো ডাকের মধ্যে নেই।

ঘরের ভেতরে থাকতে ইচ্ছে করছে না। অনীক ফুলপ্যান্ট পরল, গায়ে হুড দেওয়া উলেন জ্যাকেটটা চাপাল। তারপর ওর নিজের মোবাইল আর কুড়িয়ে পাওয়া মোবাইলটা পকেটে ঢুকিয়ে দরজা খুলে রুমের বাইরে বেরিয়ে এল। লবির লাইটগুলো জ্বলছে। লবিতে বাইরের আলো বিশেষ ঢোকে না। একটু এগিয়েই সামনে লিফট। সুইচ টেপা মাত্র লিফটের দরজা খুলে গেল। ফোর্থ ফ্লোর প্রেস করল অনীক। লিফট নিঃশব্দে ওকে পৌঁছে দিল গন্তব্যে। লিফট থেকে বেরিয়ে রিসেপশন পার করতেই সামনে রাস্তা, আর একরাশ ঠান্ডা হাওয়া। রাস্তায় এসে হাঁটতে শুরু করল অনীক। সামনে একটু এগোলেই রাস্তায় ছোটো রেলিং দিয়ে ঘেরা একটুকরো বসার জায়গা। এখানটায় দাঁড়ালে সামনের অতল খাদ আর দূরের পাহাড়গুলো দেখা যায়। পাহাড়ের কোলে মেঘ জমে রয়েছে। হাওয়া দিচ্ছে। এখনও রাস্তায় বিশেষ লোকজন, গাড়ি চলাচল শুরু হয়নি। আকাশ একটু ঘোলাটে। আজ কি বৃষ্টি হবে? খাদের মধ্যে জমে থাকা মেঘকে আরেকটু দেখার ইচ্ছা হল অনীকের। রেলিং-এর একেবারে সামনে গিয়ে নীচে ঝুঁকে দেখতে যেতেই পকেটে রাখা ফোন টিঁইইক টিক টিঁইক টিক শব্দ করে বেজে উঠল। আবারও চমকে উঠল অনীক। এই রিংটোনটা অনীক জানে। সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা বার করল। স্ক্রিনের ওপর ভেসে উঠল MAA...

মুহূর্তে বুকের ভেতরে ধড়াস ধড়াস করতে শুরু করল। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড তারপর কলটা রিসিভ করে চাপা গলায় বলল, হ্যালো...

বাবু শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা?

মা!

হ্যাঁ বাবু, মা, তুই খাদের এত ধারে কেন গিয়েছিস? সরে আয়। সরে আয় এখনই।

অনীক সরে আসতে গিয়েও ওখানে দাঁড়িয়ে রইল।

সরে আয় সোনা। খাদের বেশি ধারে যেতে নেই।

তুমিও তো গিয়েছিলে মা। বাবাও গিয়েছিল। বলে উঠল অনীক।

মা বলল, আমাকে ক্ষমা কর অনীক।

না করব না, কিছুতেই ক্ষমা করব না, কেন গিয়েছিলে তোমরা, কেন গিয়েছিলে আমাকে বলো? বলতে বলতে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল অনীক। মা, মা, তুমি জানো না আমার কত কষ্ট হয়, তোমরা খুব খারাপ, খুব খুব খারাপ।

দুজন স্থানীয় লোক হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের কর্মস্থলের দিকে যাচ্ছিল। এই ভোরবেলায় এক কিশোরকে কানে ফোন ধরে এইভাবে কাঁদতে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল। নিজেরা কিছু আলোচনা করল। তারপর একজন অনীককে ইশারায় রেলিঙের ধার থেকে সরে দাঁড়াতে বলল। অনীক যখন ওদের ইশারা দেখে লোহার বেঞ্চটায় বসে পড়ল তখন ওরা আবার নিজেদের গন্তব্যের দিকে রওনা হল।

লক্ষ্মী বাবু আমার। সকালে ঘুম থেকে উঠে এইভাবে কাঁদে না।

আমি বলছি তো আমি, তোর বাবা খুব ভুল করেছি, কিন্তু আর কী করব বল? আমারও তোকে ছাড়া বড়ো কষ্ট হয় রে সোনা। তুই কাঁদিস না বাবু আমার। চোখের জল মোছ।

অনীকের বুকের ভেতরে জমিয়ে রাখা দীর্ঘ অভিমান দুইকূল ভাসানো নদীর মতো উপচে পড়ল।

কোয়েল বলল, তুই কাঁদিস না, আর কাঁদিস না। জানিস অনি, আমার বয়স যখন ষোলো, তখন আমি বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রথম দার্জিলিং গিয়েছিলাম। জীবনে সেই প্রথমবার আমার পাহাড় দেখা। টাইগার হিল থেকে যখন কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয় দেখলাম তখন আমি আচমকাই ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিলাম, ঠিক তোর মতো। সবাই যখন ছবি তুলতে, সূর্যোদয়কে দুই চোখ ভরে দেখতে ব্যস্ত, আমি তখন হাপুসনয়নে কাঁদছি। মা-বাবা দুজনেই অবাক। বার বার মা আমাকে জিজ্ঞাসা করছে আমি কেন কাঁদছি, আমি নিজেও জানতাম না কেন কাঁদছি। হয়তো ওই অপ্রত্যাশিত সুন্দরটা আমাকে এতটাই অভিভূত করে দিয়েছিল যে আমার ভেতরে জমে থাকা কষ্ট কান্না হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, অথবা এতটা সুন্দর আমার সহ্য হয়নি। জানি না রে বাবু তুই আমার কথা বুঝবি কি না, আজ তুই পাহাড়ের সামনে বসে এইভাবে কাঁদছিস দেখে আমারও নিজের কথা মনে পড়ে গেল। সেবার আমি, মা আর বাবা অনেক ঘুরেছিলাম। তোকে তো নিজের কথা কোনোদিন বলিনি। বলিনি মানে আমিই বলার সময় পাইনি। তোর প্রতি আমি অনেক অবিচার করেছি। খুব ভুল করেছি। একজন মা হয়ে আমি তোর কাছে ক্ষমা চাইছি অনি। একজন শিশুকে তার মায়ের যেটুকু সময় দেওয়া প্রয়োজন ছিল তা আমি তোকে দিইনি। তোর বাবাও না। কোয়ালিটি টাইম যেটুকু দিয়েছিল সে শুধু তোর নি একাই। সেইজন্য আমার সঙ্গে তোর বন্ডিংটা ভালো করে গড়েই উঠল না। আমিও মাদারহুডের সুখ ভালোভাবে উপভোগ করতে পারিনি। তোকে আজ একটা কথা বলি রে বাবু, মন দিয়ে পড়াশোনা করবি, অবশ্যই করবি, ভালো মার্কসও পরীক্ষায় তুলবি, কিন্তু জীবনের একমাত্র লক্ষ্য শুধু কেরিয়ার করে ফেলিস না, তাহলে এভারেস্টের চূড়ায় উঠলেও একদিন তোর মনে হবে সব কিছু ব্যর্থ, সব ভুল। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য যদি কেরিয়ার হয়ে যায় তাহলে একসময় সেই জীবনটা বইবার অযোগ্য হয়ে পড়ে। আমি জানি আমার কথাগুলো তোর শুনতে হয়তো কঠিন লাগছে। জানি না তুই বুঝতে পারছিস কি না, হয়তো পারছিস, কারণ তুই অনিরুদ্ধ মিত্র নাতি, দাদুর কাছেই বড়ো হয়েছিস। ওঁর মতো মানুষের সাহচর্য পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের। আমার এমন দুর্ভাগ্য, এত সুন্দর একজন শ্বশুরমশাই পেলাম, তোর মতো ভালো একটা ছেলে পেলাম, অথচ ভালো করে সংসারটা করতে পারলাম না রে। সব খুইয়ে বসলাম। বাবু তুই মাথায় হুডিটা আরও ভালো করে টেনে নে। হাওয়া দিচ্ছে। দেখ দেখ, কেমন সুন্দর সূর্য উঠছে দেখ। পৃথিবীতে রোজ সূর্য ওঠে, বহুযুগ ধরে উঠছে, অথচ প্রতিটা সূর্যোদয়ই নতুন, প্রথমবার।

কলটা রিসিভ করে চাপা গলায় বলল, হ্যালো...

ওহ তোকে আমার পাহাড় দেখার গল্পটা বলি শোন। আমি ছোটোবয়স থেকে খুব মেধাবী ছাত্রী ছিলাম। প্রতি ক্লাসে একেবারে ফার্স্ট হতাম। ক্লাস এইটে একবার আমাকে সেকেন্ড করে দিয়ে তৃষা ফার্স্ট হয়ে গেছিল, আমি কয়েকদিন কেঁদেকেটে এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম যে ডাক্তার দেখাতে হয়েছিল। ওইটুকু বয়সেই আমার মাথায় ঢুকে গিয়েছিল আমাকে ফার্স্ট হতে হবে, শুধু ফার্স্ট। মাধ্যমিকেও আমার ফার্স্ট হওয়ার খুব স্বপ্ন ছিল। দিন-রাত এক করে আমি পড়তাম। নাওয়া-খাওয়া সব বন্ধ করে ফেলেছিলাম। আমার

বাবা ছিলেন ব্যাংক ম্যানেজার। সরকারি ব্যাংক হলেও বাবার এক একদিন বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যেত। বাবা ছিলেন আমার প্রধান টিচার। আমি দেখতে সুন্দর ছিলাম বলে বাবা আমাকে আদর করে পরি নামে ডাকতেন। আর মা ডাকত মুনাই। মায়ের দেওয়া নামটা আমার মোটেও ভালো লাগত না। বাবা অফিস থেকে ফিরেই চায়ের কাপ নিয়ে বসে পড়তেন আমার সামনে। আমিও অপেক্ষা করতাম বাবা কখন ফিরে আমাকে পড়া ধরবেন। পড়তে পড়তে আমার শরীর ভেঙে যাচ্ছিল, বাবা সেটা খেয়াল করে আমাকে সাবধান করতেন, পরি তুই কিন্তু পরীক্ষার সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়বি, এমন অমানুষের মতো পরিশ্রম করতে যাস না। তোর রেজাল্ট এমনিতেও ভালো হবে, তুই মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করবি, মাধ্যমিকের প্রথম দশজনের মেরিট কিন্তু মোটামুটি একই হয়। কিন্তু আমি বাবার কথা মোটেও শুনলাম না, মাকে তো পাত্তাই দিতাম না, ফলে বাবার আশঙ্কাই সত্যি হল, পরীক্ষা শুরুর ঠিক দুই দিন আগে সম্ভবত অতিরিক্ত টেনশন করার কারণেই আমি বেজায় অসুস্থ হয়ে পড়লাম। একেবারে শয্যাশায়ী। অসুস্থ অবস্থাতেই পরীক্ষা দিলাম। রেজাল্ট বেরুল। আমার রেজাল্ট আশানুরূপ হল না। ফার্স্ট হওয়া তো দূর প্রথম দশের মধ্যেও থাকলাম না। সেই প্রথমবার আমি ডিপ্রেশনে পড়লাম। ঘর থেকে বেরুতাম না, খেতাম না, ঘুমোতাম না। শুধু নিজের ঘরে গুম হয়ে বসে থাকতাম। বাবা-মা আমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ল। আমি শুকিয়ে দড়ির মতো হয়ে গেলাম। তখন ডাক্তারবাবু বললেন, আমাকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যেতে। বাবা আর মা আমাকে নিয়ে দার্জিলিং গেল। আমি যেতে চাইনি। আমার বাইরে বেরোতেই ভয় করত। মনে হত বাইরে বেরোলেই সকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে—আমার রেজাল্ট কেমন হয়েছে? কেন খারাপ হল? কেন আমি পরীক্ষা ভালো দিইনি, আমার মেরিট কম, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবে। বাবা আর মা অনেক বুঝিয়ে আমাকে অবশেষে রাজি করিয়ে নিয়ে গেল দার্জিলিং। জীবনে প্রথমবার আমার পাহাড় দেখা। অবশ্য প্রথমবার বলব না, আমার যখন তিন বছর বয়স বাবা আর মা আমাকে নিয়ে কাশ্মীর গিয়েছিল। সেই স্মৃতি আমার কিছুই ছিল না। পাহাড়ের কাছে পৌঁছে আমার মনের ভেতরটা সত্যিই যেন একটু কেমন হয়ে উঠেছিল। দার্জিলিং-এর প্ল্যান্টার্স ক্লাবে আমরা ছিলাম। সে এক অসাধারণ হোটেল। মস্ত কাঠের ঘর, কাঠের সিঁড়ি। টানা লম্বা বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়ালে অনেক অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যেত। আমি প্রথম দিন শুধু হোটেলের রুমে বসে রইলাম। দ্বিতীয় দিন, বারান্দায় বসে দূরের ওই পাহাড়গুলো দেখলাম। আমার মা আর বাবা অসীম ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল আমি কখন সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে উঠি। তৃতীয়দিনও আমি বারান্দায় বসে রইলাম, তারপর হোটেলের সামনের লনে গিয়ে বসলাম, ওখানে অনেক চেয়ার-টেবিল পাতা ছিল, সেখানে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। আমি যে এই বছর মাধ্যমিক দিয়েছি, আমার যে রেজাল্ট বেরিয়েছে এখানে সেই ব্যাপারে কেউ জিজ্ঞাসা করার ছিল না, কারণ সকলেই ছিল অচেনা। আমি ধীরে ধীরে আশ্বস্ত হলাম আমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। তখন আমি নিজের বানানো শামুকের খোল থেকে ধীরে ধীরে বেরোতে শুরু করলাম। ওইদিন রাতে প্ল্যান্টার্স ক্লাবের মস্ত লনটায় লোকাল ডাক্তার এবং নার্সদের একটা কালচারাল প্রোগ্রাম ছিল। বেশ অনেক রাত পর্যন্ত সেই নাচ-গান চলল। স্টেজে স্থানীয় ভাষায় গান হচ্ছিল আর সেই গানের তালে সকলে নাচছিল। হোটেলের অনেক বোর্ডার তাদের প্রোগ্রাম দেখছিল। আমি গানের ভাষা বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু শীতের রাতে আলো-আঁধারিতে ওই প্রাণখোলা নাচ-গান আর তরুণ-তরুণীদের অনাবিল হাসি-উচ্ছ্বাস আমার ভেতরটাকে ভরিয়ে দিল। একটি মেয়ে, আমার থেকে বছর কয়েক বড়োই হবে হয়তো, সে আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে আমার হাতদুটো ধরে বলল, ডান্স ডান্স, মানে ডান্স করতে অনুরোধ করল।

আমি সংকুচিত হয়ে গেলাম। মা তখন বলল, যা না ডাকছে তোকে।

আমি যেন এই কথাটুকুর অপেক্ষাতেই ছিলাম। মেয়েটির সঙ্গে তারপর ওদের দলে ভিড়ে গিয়ে সে কী উদ্দাম নাচ আমার! আমি যত নাচছিলাম, আমার গায়ের থেকে কষ্ট, যন্ত্রণার বাকলগুলো খসে খসে পড়ছিল, আমি হাল্কা হয়ে যাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি মুক্ত হচ্ছি দীর্ঘজন্মের অন্ধকার থেকে, বন্দিত্ব থেকে। সেদিন একেবারে বেদম হয়ে মাটিতে বসে পড়া পর্যন্ত আমি নাচ করেছিলাম সেই অচেনা তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে। আর আমার বাবা-মা আনন্দে-খুশিতে কেঁদেছিল। সেদিন রাতে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি যে রুমে ঢুকেই ঘুমিয়ে কাদা। পরদিন অনেক ভোরে মা আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এই মুনাই, সানরাইজ দেখবি?

আমার দু-চোখে বহুকাল পর অগাধ ঘুম ছিল, কিন্তু ঘুমচোখেই মায়ের কথা শুনে আমার মনে হল সূর্যোদয় আমার দেখা দরকার। আমার দেখতে ইচ্ছে করছে। আমি উঠে পড়লাম। মা-বাবার সঙ্গে প্রায় অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়লাম। বেশ খানিকটা যাওয়ার পর এক জায়গায় অনেক মানুষের ভিড়। সামনে অতল খাদে জমে রয়েছে মেঘের তুলো। ধীরে ধীরে সূর্য উঠল, আহ্ সে যে কী অপূর্ব এক দৃশ্য, মনে হল আমার মনের অন্ধকার কেটে গিয়ে ভেতরটা আলো হয়ে গেল। পরের দিন আমরা টাইগার হিলে গেছিলাম সূর্যোদয় দেখব বলে। সে দৃশ্য আজীবন ভুলব না। বুঝলি বাবু, প্রত্যেক মানুষের জীবনে অন্তত একবার কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয় দেখা উচিত। লাইফটাইম এক্সপিরিয়েন্স। আজীবন মনে থেকে যায়। সেই দিনটার পর আমরা আর একদিন ছিলাম। সেদিন আমরা সারাদিন খুব ঘুরেছিলাম, খুব আনন্দ করেছিলাম। দার্জিলিং ছেড়ে চলে আসার সময় আমি আমার অতীতকে পাহাড়ের খাদে ফেলে এসেছিলাম। কিন্তু...আসলে ভেবেছিলাম পাহাড়ের খাদে ফেলে এসেছি...জানিস বাবু তুই তো বড়ো হচ্ছিস, একটা কথা মনে রাখবি, মানুষ যেটা ভুলতে চায় সেটাই সে সবথেকে বেশি করে মনে রাখে। জোর করে মনেও রাখা যায় না, ভোলাও যায় না। জীবন নিয়ে জোরাজুরি চলে না। জানি না তুই আমার কথাটা বুঝতে পারলি কি না, না পারলেও এখন শুধু শুনে রেখে দে। ওখান থেকে বাড়ি ফেরার পর আমি আবার নতুন লড়াই শুরু করলাম। মানুষ অন্যের সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে খুব বেশিদিন মাথা ঘামায় না। সবাই দ্রুত ভুলে গেল আমার কথা। যেহেতু আমি নিজের রেজাল্টে খুশি না হলেও আমার রেজাল্ট

ভালো ছিল, আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম আমি সায়েন্স নেব না, কমার্স পড়ব। সকলে খুব অবাক হয়েছিল, কিন্তু আমার সিদ্ধান্তে আমার বাবা-মা কেউ আপত্তি জানায়নি। আমি কমার্স নিলাম। দ্বিগুণ উৎসাহে, পরিশ্রমে পড়তে শুরু করলাম। যদিও একসময় স্বপ্ন ছিল ফিজিক্স নিয়ে পড়ব কিন্তু তার বদলে ডেবিট, ক্রেডিট, প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট একেবারে বিপরীত। কিন্তু আমি আমার লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছিলাম। এইচ এস-এ আমি আর ফার্স্ট বা সেকেন্ড হতে চাইনি। আমার ডেস্টিনেশন ছিল আরও দূরে। তবে খুবই ভালো রেজাল্ট হল। হায়ার সেকেন্ডারি পড়তে পড়তেই আমি চার্টার্ডের ফাউন্ডেশন কোর্সে ভর্তি হয়ে গেছিলাম। এইচ এস দিয়ে আর গ্র্যাজুয়েশনের দিকে গেলামই না। পুরো ঝাঁপ দিলাম চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পাশ করব বলে। ভাবতে পারবি না বাবু কী কঠিন কঠিন সাবজেক্ট। আমার টার্গেট ছিল আমি প্রতিটা সেমিস্টার একবারে পাশ করব। উদয়-অস্ত পরিশ্রম। অসাধ্যকে সাধন করে ফেললাম আমি। পেরে গেলাম রে। শুধু একটা বছর বেশি লাগল। ওই আর্টিকেলশিপ করার সময়েই তোর বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় হল...

অনীক চুপ করে শুনে যাচ্ছিল ওর মায়ের কথা। এরমধ্যে দিব্যি ঝলমলে একটা সকাল হয়েছে। পাহাড়ের খাদে জমে থাকা মেঘ ভেসে উঠেছে ওপরে। নতুন দিনের আয়োজন। এবার অনীকের পকেটে ওর ফোনটা বেজে উঠল। ওটা বার করতে দেখল অনিরুদ্ধ কল করছে। মায়ের কলটা ধরে রেখেই নি-এর কল রিসিভ করল অনীক।

হ্যাঁ বলো।

কোথায় তুমি?

এই সামনেই রাস্তায় একটু হাঁটছি।

দেরি হবে?

না। আসছি।

এসো তাহলে একসঙ্গে চা খাব।

বেশ।

অনিরুদ্ধর কলটা কেটে মাকে আবার 'হ্যালো' বলতেই মা বলল, যা বাবু তোর নি ডাকছে। আর দেরি করিস না। আমার সোনাবাবু, ভালো থাক, তুই আমার অনেক আদর নে।

ফোন কেটে গেল মায়ের। স্ক্রিনটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল অনীক। তারপর ধীরে-সুস্থে বেঞ্চটা থেকে উঠতে গিয়ে বুঝতে পারল ওর শরীরটা ভীষণ ভারী মনে হচ্ছে।

*　　　　*　　　　*

আজ বেলা সাড়ে দশটার সময় অনীক আর অনিরুদ্ধ পৌঁছল রিজে। তবে আজ আর গাড়িতে করে রিজে যায়নি। হোটেল থেকে বেরিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরে খানিকটা গেলেই একটা লোহার সিঁড়ি সোজা ওপরে উঠে গেছে। রিজে পৌঁছনোর শর্টকাট রাস্তা। আগের দিন ওই সিঁড়ি দিয়ে নেমে হোটেলে পৌঁছেছিলেন অনিরুদ্ধ। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলে গাড়ির থেকে সময় অনেক কম লাগে। তবে পাহাড়ি অঞ্চলে ওই জীবনের মতোই নামতে কষ্ট হয় না, উঠতে খুব কষ্ট। আজ অনিরুদ্ধ ঠিক করে নিয়েছিলেন একবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার ট্রাই করবেন। দেখাই যাক না। ধীরে-সুস্থে উঠলেই হবে।

ব্রেকফাস্ট সেরে অনীককে সঙ্গে নিয়ে অনিরুদ্ধ বেরোলেন। সামান্য রাস্তা হেঁটে গিয়েই বাঁদিকে টার্ন, তারপর পাহাড়ের গা দিয়ে খাড়া লোহার সিঁড়ি। একবার ওপরে তাকালেন অনিরুদ্ধ। সিঁড়িটা পুরো সোজা নয়। অনেকটা সোজা গিয়ে আবার বাঁদিকে ঘুরেছে। তারপর আবার সোজা। বুকে দম টেনে ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করলেন। প্রথম অংশটুকু পেরিয়ে বুঝতে পারলেন যতটা কঠিন ভেবেছিলেন তার থেকেও কঠিন। দ্বিতীয় অংশটুকু উঠতে গিয়ে মনে হল হৃৎপিণ্ড বুঝি গলা দিয়ে বেরিয়ে আসবে। দুই পা উঠে আবার থেমে সামনে ঝুঁকে উঠতে থাকলেন অনিরুদ্ধ। অনীকের বয়স অল্প, তাই ও হাঁফাচ্ছিল না। কিন্তু তাই বলে দাদুকে ছেড়ে একপা-ও এগিয়ে যাচ্ছিল না। পাশে পাশে চলতে থাকল। ওরা দুজনেই একটু অন্যমনস্ক। কুড়িয়ে পাওয়া মোবাইল আর চিঠির খাম নিয়ে। অথচ কেউ কাউকে বলতে পারছে না, মুখের সামনে এসেও কেউ কাউকে বলতে পারছে না। এ এক প্রবল দোলাচল। দুজনেই একে অপরের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারছে না।

আজ গেইটি থিয়েটার হলের ভাইসরয় অডিটরিয়ামে অনিরুদ্ধর প্রোগ্রাম। নিজের কয়েকটি কবিতা পাঠ করবেন তিনি। চারটি কবিতা পড়বেন, প্রথমে বাংলায় তারপর ইংরেজি অনুবাদে। আজ বিকেল চারটের সময় গুলজারের অনুষ্ঠান রয়েছে। সেটা অনীকের দেখার খুব ইচ্ছে। অনিরুদ্ধ নিজেও গুলজারের ভক্ত। কাজেই এই প্রোগ্রামটা শুনতেই হবে। গেইটি থিয়েটার হলের ভেতরও বাইরেটার মতোই অসাধারণ। ভেতরে প্রবেশমাত্রই একটা হেরিটেজ ফিলিং আসে। বিল্ডিং-এর ভেতরে বেশ তিনটি অডিটোরিয়াম রয়েছে। মেইন অডিটোরিয়াম, ভাইসরয় অডিটোরিয়াম, ট্যাভার্ন হল। তিনটি হলে একইসঙ্গে অনুষ্ঠান চলছে। অনিরুদ্ধ ভাইরসয় অডিটোরিয়ামে এলেন, সঙ্গে অনীক। হলের ভেতরটা সেই প্রাচীন অপেরা স্টাইলের। দুশো বছরের পুরোনো এই গেইটি থিয়েটার। ব্রিটিশের তৈরি এই বিল্ডিং গথিক স্থাপত্যের এক অসামান্য নিদর্শন। ভাইসরয় লর্ড লিটন, রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর মতো লেজেন্ড এই হলে নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। আর বলিউডের তো প্রায় সব স্টলওয়ার্টই কোনো সময়ে এখানে অভিনয় করে গেছেন। ভাইসরয় হলটার চেয়ারগুলোর সাইজ ছোটো। পিঠ সোজা করে বসতে হয়। আগেকার মতো দুই ধাপ সারাউন্ডিং ব্যালকনি রয়েছে। ব্যালকনিগুলোতে চেয়ার পাতা। ওখানে বসেও মঞ্চের অনুষ্ঠান দেখার ব্যবস্থা। হলে অল্প আলো। সবমিলিয়ে একটা অন্যরকম পরিবেশ। একটা অনুষ্ঠান চলছিল, দর্শকাসন মোটামুটি ভরা।

অনিরুদ্ধ অনীককে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বসবে?

তোমার প্রোগ্রাম তো বারোটায়?

হুঁ।

তাহলে আমি একটু হলটা ঘুরে দেখব?

বেশ তো।

অনিরুদ্ধ গিয়ে সামনের সারির সিটে বসলেন। এখন একটা

প্যানেল ডিসকাশন চলছে। অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে। পাঁচজন প্যানেলিস্ট। এর পরের সেশনটাই মাল্টিলিঙ্গুয়াল পোয়েটস মিট। সেখানেই অনিরুদ্ধ কবিতা পাঠ করবেন। মোবাইল সাইলেন্ট করেই বসেছেন। মনের ভেতরটা খুব চঞ্চল। খালি মনে পড়ছে খামটার কথা। এরপরের চিঠিটা কি আসবে? চিঠিগুলো কীভাবে আসছে, কেন আসছে, আদৌ কি সত্যি? এইসব যুক্তি নিয়ে তিনি আর ভাবছেন না, ভাবতে চাইছেনও না। শুধু ভাবছেন আরেকটা চিঠি কি পাব? ছেলেটাকে আরেকটু কাছে...

অনিরুদ্ধ কিছুই শুনতে পাচ্ছিলেন না, তাঁর মন এক অশ্রুনদীতে কাগজের নৌকোর মতো টলমল করছিল। আর অনীক তখন হলের ভেতরটায় ঘুরে ঘুরে দেখছিল আর বারবার পকেট থেকে সেই মোবাইলটা বার করে দেখছিল মায়ের কোনো ফোন এসেছিল কি না। পুরো বিল্ডিংটা যেন একটা গোলকধাঁধা। কোন অডিটোরিয়াম কোনদিকে খুঁজে পাওয়াই কঠিন। অনেক মানুষের ব্যস্ততা। অনেকে করিডরে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। একসঙ্গে ছবি তুলছেন। সকলেই খুব খুশি। অনীকের মাঝে মাঝে মনে হয় এই পৃথিবীতে সবথেকে অসুখী মানুষ হল ও আর নি। স্কুলে বন্ধুদের, রাস্তায় চেনা-অচেনা মানুষজনকে হাসতে দেখলে অনীকের কান্না পায়।

গেইটি হলের ভেতরে কিছুক্ষণ চক্কর কেটে অনীক বাইরে বেরিয়ে এল। যে মোবাইলটা ও কুড়িয়ে পেয়েছে সেটায় কোনো টাওয়ার সিগনাল তো দূরের কথা, স্ক্রিনে কিছুই নেই। পুরো ডেড। ব্যাটারি চার্জড আউট হলে যেমন থাকে আর কী। অথচ মায়ের ফোন এলে কীভাবে যে...মায়ের কথা মনে পড়তেই আবারও বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল অনীকের। ও বিল্ডিং ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। কয়েক পা এগোলেই বাঁ হাতে একটি হ্যান্ডলুমের দোকান। সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে হিমাচল হ্যান্ডলুম এম্পোরিয়াম। অনীকের ইচ্ছা হল দোকানের ভেতরটা দেখার। ভেতরে ঢুকতেই ও দেখতে পেল নি-র পরিচিত সেই বিতান আর দীপালি। ওরা দুজনে শাল, স্টোল, হিমাচলি টুপি ইত্যাদি দেখছে। ওদের দোকানের ভেতর দেখতে পেয়ে অনীক অকারণ সংকোচে দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই ও দীপালির চোখে পড়ে গেল। হাত নেড়ে অনীককে হ্যালো বলল দীপালি। বিতানও অনীককে দেখতে পেয়ে হাসল। অনীকের আর পালানোর উপায় রইল না। ওর একা একা কারও সঙ্গে দেখা হলে খুব ভয় লাগে। প্রতি মুহূর্তে টেনশন হয় এই বুঝি ওকে বাবা-মায়ের প্রসঙ্গ টেনে কিছু বলল, একটা অদ্ভুত আতঙ্ক হতে থাকে।

বিতান ওকে জিজ্ঞাসা করল, দাদু কোথায়?

অনীক বলল, প্রোগ্রাম শুনছেন।

আজ তো বারোটায় স্যারের সেশন রয়েছে তাই না?

হ্যাঁ।

তুমি শুনবে তো?

হ্যাঁ।

আমরাও শুনব। স্যারের কণ্ঠে কবিতাপাঠের সুযোগ ছাড়া যাবে না।

তুমি কী কিনবে অনীক?

কিছু না।

বিতানের মাথায় একটা হিমাচলি টুপি। এখানে অনেকেই এই টুপি পরে ঘুরছে। বাহারি রঙের রাউন্ডশেপ টুপিগুলি সুন্দর দেখতে। অনীক বিতানের টুপির দিকে একবার তাকাতেই দীপালি বলে উঠল, তুমি একটা টুপি কেনো বরং। দাঁড়াও আমি কিনে দিই।

না, না, আমার কিছু লাগবে না।

কেন লাগবে না? দেখছ না কী সুন্দর টুপি, এগুলো এখানকার মানুষ পরেন। ভারী সুন্দর। এই বলে দীপালি দোকানের র‍্যাকে সাজানো অনেক টুপির থেকে নীল রঙের একটা টুপি দোকানির কাছ থেকে চেয়ে নিল। দীপালি অহমিয়া হলেও বাংলা বলতে পারে, বলার মধ্যে অহমিয়া টান রয়েছে, কিছু শব্দ অহমিয়া ভাষাতেই উচ্চারণ করে, কিন্তু এতটাই আন্তরিক যে কিছুমাত্র বুঝতে অসুবিধা হয় না।

দীপালি টুপিটা অনীকের মাথায় বসিয়ে দেখল সাইজে একটু বড়ো হচ্ছে। ওর থেকে ছোটো সাইজটাও পাওয়া গেল। সামনে আয়নার দিকে তাকিয়ে অনীক দেখল ওকে বেশ সুন্দর লাগছে। ভালো লাগার এই অনুভূতিটুকু আসামাত্র ভয় পেল অনীক। আজকাল ভালো লাগলেই ভয় করে ওর। দীপালি বলল, খুব সুন্দর মানিয়েছে তোমায়, তাই না বিতান?

হ্যাঁ দারুণ লাগছে। বলে বিতান আচমকা বলল, ইউ আর আ ব্রেভ বয় অনীক।

অনীক এর উত্তরে কী বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল। ওর অস্বস্তি বাড়ছে। এই বুঝি সান্ত্বনা দেওয়া শুরু হল। গত দুই বছরে এই সান্ত্বনাবাক্য শুনতে শুনতে দম যেন বন্ধ হয়ে গেছে। অসহ্য লাগে।

কিন্তু বিতান আর কিছুই বলল না।

দীপালি দোকানদারকে মোট কত বিল হয়েছে জিজ্ঞাসা করল। অনীকের ইচ্ছা করছিল বলতে আমার টুপির দাম আমি দেব। কিন্তু সেটা বলতে না পেরে নিজের পার্স বার করতে গেল, দীপালি সেটা বুঝতে পেরে বলল, আমি কিন্তু এই টুপিটা তোমাকে গিফট করলাম। আমি তোমার দিদি হই। প্লিজ নাও।

দীপালির কথার মধ্যে এমনই আন্তরিকতা ছিল যে অনীক আর কিছু বলতে পারল না। অনীক ঘাড় কাত করে সায় দিল।

তুমি খুব মিষ্টি ছেলে, তোমার খুব ভালো হবে দেখো।

দীপালির কথায় সায় দিয়ে বিতান বলল, স্যারের জন্যও একটা কিনে নেওয়া যাক।

হ্যাঁ ঠিক কথা। অনিরুদ্ধর জন্যও একটা টুপি কিনল দীপালি। তারপর সবকটা জিনিসের বিল ও মেটাল। বিতান বলল, স্যারের প্রোগ্রাম শুরু হতে আর আধঘণ্টা বাকি, আমরা তাহলে এককাপ করে কফি খেয়ে ঢুকে পড়ি?

দীপালি বলল, হ্যাঁ।

অনীক বলল, গেইটি হলের পাশে কফি কাউন্টার দেখেছি।

হ্যাঁ আমরা ওখানেই এখন কফি খাব। তবে আজ বিকেলে এখানকার কফিহাউসে কফি খেতেই হবে।

দীপালি জিজ্ঞাসা করল, কোথায় সেটা?

এই তো একেবারেই সামনে। এই ঢালু রাস্তাটা শেষ হলেই বাঁদিকের রাস্তাটা ধরে চার-পাঁচটা দোকান পরেই।

হ্যাঁ খুব ভালো হবে। সবাই মিলেই যাব তাহলে।

হ্যাঁ আপাতত চলো এককাপ কফি খেয়ে প্রোগ্রাম শোনা যাক।

* * *

বিকেল চারটে থেকে গুলজার সাহেব ও বিশাল ভরদ্বাজের যুগলবন্দি হলভর্তি শ্রোতা-দর্শককে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আহা প্রতিটি মুহূর্ত যেন স্বর্গীয়। বহু মানুষ বসার জায়গা পাননি। দাঁড়িয়ে থেকেই অনুষ্ঠান শুনেছেন। গুলজারের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে অনীকের মনে হচ্ছিল ও যেন স্বপ্ন দেখছে। সাদা ধপধপে পাঞ্জাবি আর পায়জামা, কাঁধে আলগোছে রাখা একটা শাল। বাঁ হাতের কব্জিতে কালো ব্যান্ডের রিসওয়াচ। পায়ে শুঁড় তোলা নাগরাই। রিমলেস চশমা, বিরল পক্ককেশ আর সবকিছু ছাপিয়ে ওই অদ্ভুত ব্যারিটোন ভয়েস। একইসঙ্গে কোমল অথচ কী বিপুল ভরাট! গোটা হল গমগম করছিল ওঁর কথায়। হল জুড়ে দর্শক যেন নড়াচড়া করতেও ভুলে গিয়েছিল। গুলজারজি ছিলেন নিজস্ব মেজাজে। কখনো স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে চলে যাচ্ছেন সুদূর অতীতে, কখনো ফিরে আসছেন অতি সাম্প্রতিককালে। কোন গানটি কেমন পরিস্থিতিতে কীভাবে তিনি লিখেছিলেন, তাই নিয়ে ওঁর স্বভাবজাত সরসভঙ্গিতে কখনো গল্প শোনাচ্ছেন, গল্পের মাঝেই বিশাল ভরদ্বাজ গেয়ে উঠছেন গান। বিশাল সত্যিই একজন মাল্টি ট্যালেন্টেড মানুষ। উনি যে খুব ভালো একজন ফিল্ম ডিরেক্টর এবং মিউজিক কম্পোজার সেটা অনীক জানত, কিন্তু এত ভালো গায়ক সেটা আজই প্রথম বুঝতে পারল। মাচিস, মকবুল, হায়দর, ইশকিয়ার মতো ছবিতে সুর দিয়েছেন। আর ওঁর পরিচালনায় মাকড়ি ছবিটা দুর্দান্ত লেগেছিল অনীকের। গুলজার একটু করে কথা বলছেন আর সেই কথার খেই ধরে গান ধরছেন বিশাল। তাঁর হাতে শুধু একটি হারমোনিয়াম এবং আরেকজন স্প্যানিশ গিটার। বিশাল যখন ইশকিয়া ছবির 'দিল তো বচ্চা হ্যায় জি, থোড়া কচ্চা হ্যায় জি' গানটি ধরলেন, গোটা হল হাততালিতে ফেটে পড়ল, নিজের অজান্তেই অনীক নিজেও হাততালি দিতে গিয়ে দেখল নি-র চোখমুখ খুশিতে চিকচিক করছে। যেন কতযুগ পর একটু ভালো লাগার অনুভূতি দুইজনের।

অনুষ্ঠান শেষে বহু মানুষ গুলজার সাহবের সঙ্গে একটু দেখা করার জন্য, ছবি তোলার জন্য কিংবা অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য ছুটে গিয়েছিল কিন্তু অনীক বা অনিরুদ্ধ কেউই যায়নি। অনীকের যদিও একবার গুলজারজিকে খুব কাছ থেকে দেখার ইচ্ছা করছিল। কিন্তু সংকোচে সেই ইচ্ছার কথা নি-কে বলতে পারেনি। অনুষ্ঠান শেষ হল সন্ধে ছ-টার সময়। তারপরেও অন্য প্রোগ্রাম ছিল কিন্তু ওরা আর ছিল না। অনীক এবং অনিরুদ্ধ বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। দীপালি এবং বিতানও এসেছিল। অনিরুদ্ধ বিতানের কাছ থেকে টুপি উপহার পেয়ে খুবই খুশি হলেন। অনীককে হিমাচলি টুপিতে খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। অনির্বাণকে এই বয়সে যেমন দেখতে ছিল, অনীকও যে হুবহু ওর বাবার মতো দেখতে!

বিতান বাইরে বেরিয়ে প্রস্তাব দিয়েছিল, স্যার সামনেই ইন্ডিয়ান কফিহাউস রয়েছে, একবার যাবেন?

অনিরুদ্ধ আবারও বিছানা ছেড়ে উঠে সেই খামটা খুললেন

হ্যাঁ যাওয়াই যায়। এখানে তো সাড়ে সাতটার আগে সন্ধেই নামে না। সুতরাং হোটেলে যাওয়ার প্রশ্নই নেই।

চারজনে মিলে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছেছিল ইন্ডিয়ান কফিহাউসে। বাইরে সাইনবোর্ডে লেখা 'ইন্ডিয়ান কফিহাউস'। ভেতরটায় খানিক কলকাতার কফিহাউসের মেজাজ। যদিও আকারে কলকাতার কফিহাউস থেকে অনেক ছোটো, কিন্তু পুরোনো দেওয়াল। দেওয়ালে পুরোনো ফটোর সারি, উর্দিপরা বেয়ারা, ছোটো চৌকো টেবিল।

কফির গন্ধ। তবে যেহেতু এই চত্বরে ধূমপান করার অনুমতি নেই, তাই চোখ জ্বালানো সিগারেটের ধোঁয়া নেই। বেশ ভালোই ভিড় ছিল ওখানে। গলায় সাহিত্য পরিষদের কার্ড ঝোলানো কয়েকজনকে কফি খেতেও দেখা গেল। তবে তাঁরা কেউই পরিচিত নন। ওখানে কফি খেয়ে চারজনে মিলে খানিকটা এমনই হাঁটাহাঁটি করে তারপর হোটেলে ফেরার পথ ধরেছিলেন। ফেরার সময় বিতান বলল, স্যার কিছু নতুন লেখা আপনাকে শোনানোর ইচ্ছে ছিল।

বেশ তো এক কাজ করো, হটেলে ফিরে আমরা একটু ফ্রেশ হয়ে নিই, তারপর তোমরা আমার রুমে চলে এসো। শুনব তোমার লেখা।

আমার পরম সৌভাগ্য হবে স্যার! বিতানের গলায় কৃতজ্ঞতা এবং উচ্ছ্বাস ঝরে পড়েছিল। ফেরার পথে দেখা হয়েছিল অনিরুদ্ধর কয়েকজন পরিচিতের সঙ্গে। বিতান এবং দীপালিরও দুজন পরিচিতর সঙ্গে দেখা হল। সকলেই রিজের চত্বরে ইতস্তত ঘুরছেন। এখানে সারাদিন মেলার মতো ভিড়। গেইটি হল থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে ওই চত্বরে একটি গির্জা রয়েছে। ওটা এখনও ঘুরে দেখা হয়নি। ওরা যখন নীচে নামবে বলে সিঁড়ির কাছে এল, তখন সূর্যাস্তের আয়োজন চলছে। বিতান আর দীপালি সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল বার করে সূর্যাস্তের ছবি তুলতে শুরু করল। অনীক আর অনিরুদ্ধ শুধু সেই সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে রইল। গোটা আকাশে যেন কেউ বালতি বালতি রং ছড়িয়ে দিয়েছে। দূরের পাহাড়গুলো আর স্পষ্ট নয়, সূর্যটা হাফবয়েল ডিমের কুসুমের মতো দেখতে লাগছিল। বিতান অনীককে বলেছিল, তুমি ছবি তুলবে না?

অনীক ঘাড় নেড়ে 'না' বলেছিল।

বিতান বলেছিল, বেশ তাহলে তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি তোমার একটা ছবি তুলি।

অনীক 'না' বলেনি। ওর কয়েকটা ফটো তুলেছিল বিতান। দীপালি এবং বিতান দুজনে কয়েকটা সেলফি তুলেছিল। অনিরুদ্ধর ওদের দুজনের এই ঘনিষ্ঠতা খুব সামান্য হলেও একটু অবাকই করেছিল। দুজন মানুষের মধ্যে ঘোষিত সম্পর্ক যা-ই থাকুক না কেন, তারা পাশাপাশি এলে তাদের অঘোষিত সম্পর্কটি দিব্যি টের পাওয়া যায়। অনিরুদ্ধর মনে হয়েছিল এরা শুধু বন্ধু নয়, তার থেকেও হয়তো খানিকটা বেশি। বিতান বলেছিল ওর বিয়ে হয়েছে বছর কয়েক আগে। দীপালিও কি বিবাহিতা? অবশ্য এসব প্রশ্ন এই যুগে অচল পয়সা। হোটেলে পৌঁছনোর জন্য লোহার খাড়া সিঁড়িটা বেশ অন্ধকার। দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল অনিরুদ্ধর। তাই নামার সময়ে অনীকের কাঁধটা ধরলেন, ট্রেনে যেভাবে অন্ধ ভিখিরি তার অন্ধ সঙ্গীর কাঁধ ধরে এগিয়ে চলে, সেইভাবে।

* * *

নির্জন চৈত্রের লেখা

ফাধনমাসে সুস্থ আমাকে
পলাশের বনে দণ্ড দেওয়া হয়েছিল
কপালে উল্কি এঁকে। আমার প্রাণ হাতের মুঠোয় চেপে
রেখেছিলে কবিরাজ বাড়ির মেয়ে,
আমায় নিয়ে পদ্মফুলের ব্যবসা করেছিলে।
বিশ্বনাথের বেয়াইয়ের
মটরখেতে ঢুকে
বলি দিয়েছিলে দিনের আলোয়
টিনের খাঁড়ায়।
সেই থেকে আমি দেবীর সাপ।
রাতের দিকে জ্যান্ত আহার
ধরে আনি। তুমি সে সব কালীর জিভে ছুড়ে
জড়িয়েমড়িয়ে শুয়ে থাকো,
যেন আমি তোমার পোষ্য নই, সন্তান!

এতটা পড়ে নিজের ডায়েরির পাতা থেকে মুখ তুলল বিতান। ওর চোখদুটিতে কবিতার জল লেগে টলমল করছে।

অনিরুদ্ধ চোখ বুজে শুনছিলেন বিতানের লেখা কবিতা। কবিতাটি শোনার পর কোনো প্রতিক্রিয়া জানালেন না, শুধু মৃদুভাবে দুইবার মাথা নাড়লেন। ঘরে বিতান, দীপালি আর অনিরুদ্ধ।

বিতান ওর কবিতার খাতা নিয়ে এসেছে অনিরুদ্ধকে শোনানোর জন্য। অনিরুদ্ধ শুনছেন। অনীক প্রথমে কিছুক্ষণ বসেছিল, তারপর অনিরুদ্ধকে বলে রুমের বাইরে চলে এসেছে। হোটেলের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোপন মোবাইলটা পকেটে রাখা। মাঝে মাঝে বার করে দেখছে, পুরোপুরি ডেড। মনের ভেতরটা ছটফট করছে বিতানের। আরেকটা ফোন আসবে তো? মায়ের গলাটা শোনার জন্য বুকের ভেতরে সারাক্ষণ ছটফট করে।

ঘরে অনিরুদ্ধ মন দিয়ে বিতানের কবিতা শুনছেন। কিন্তু বারবার তাঁর মনোসংযোগ বিঘ্নিত হচ্ছে। হোটেলে ফেরার পর অনীক যখন ওয়াশরুমে ঢুকেছিল, তখন নিজের ব্যাগ থেকে সেই খামটা বার করে দেখেছিলেন ভেতরে কোনো চিঠি নেই। তাহলে কি আর কোনো চিঠি আসবে না? তিনি নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন আসলে এমনটা হয় না, এটা একটা ভ্রম, কিন্তু তারপরেও কী এক আশ্চর্য টানে বারংবার সেই খামটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সবার অলক্ষে কতবার যে তিনি খামটার মুখ খুলে দেখেছেন। ভেতরে ফাঁকা। পুরোনো চিঠিটাও উধাও। আর কি কোনো চিঠি আসবে? আসা কি সম্ভব? নাকি এই ভ্রমের এখানেই পরিসমাপ্তি?

অনিরুদ্ধকে চুপ করে থকতে দেখে বিতানও চুপ থাকল, কিন্তু অনিরুদ্ধর কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে ও জিজ্ঞাসা করল, আমি কি এই সিরিজের আরেকটি লেখা পড়ব?

অনিরুদ্ধ মাথা নেড়ে বিতানকে পড়তে বললেন।

বিতান আবারও পড়তে শুরু করল—

তুমি নেই,
তবু তোমার গলার আওয়াজ ভেজা
গাছের কোটর থেকে উঠে আসে।
নলকূপ খুলে গেছে বুকের, সকালে
কিশোরী ছিলাম বিকেলে জরতি
এসেছ তুমি চৈত্র-ফুলের বিষ।

গলায় নেব আজ হারিয়েছি শক্তি।
পায়রার মাংসের মতো বিকেলের মেঘ
উঠে যায় শূন্যে,
আমি পথে পড়ে থাকা ভুলে যাওয়া সতীর আঙুল।

লেখাটি পাঠ করা শেষ হওয়ামাত্র বাহ্...চমৎকার লেখা বলে উঠলেন অনিরুদ্ধ। সত্যিই অসম্ভব ভালো লিখেছ। এই কবিতাটি আগেরটিকে ছাপিয়ে গেছে।

অনিরুদ্ধর প্রশংসা শুনে গদগদ হয়ে উঠল বিতান। নিজের বুকে আলতোভাবে হাত রেখে বলল, আপনার এই প্রশংসা আমার কাছে মস্ত পাওয়া।

অনিরুদ্ধ বললেন, কবিকে আঘাত পেতে হবে, যন্ত্রণা পেতে হবে—বুঝলে বিতান! কবি এক আশ্চর্য জীব যে নিজে অভিশপ্ত হয়ে আশীর্বাদ প্রসব করেন।

একদম ঠিক বলেছেন স্যার। আমি নিজের জীবন দিয়ে সেটা অনুভব করি।

জীবন দিয়ে?...মৃদু হাসলেন অনিরুদ্ধ। জীবন অনেক বড়ো বিতান, আমরা তার থেকে অনেক ছোটো, তোমার তো জীবনের সবে শুরু বলা যায়। এখন তোমাদের হারানোর কিছু নেই, শুধু দুই হাত ভরে পাওয়ার সময়।

বিতান বলল, আমি জানি স্যার, আপনি কী বলতে চাইছেন। তবে হারানোর জন্য কোনো বয়স কি আদৌ লাগে? এই আমার কথাই ধরুন না কেন? আমি তৃষাকে পাগলের মতো ভালোবাসতাম। তৃষাও বাসত। বিয়েটা করেছিলাম, দুই বাড়ির কারও সায় ছিল না। আমরা কোনো পরোয়া করিনি। দুজনেই যে যার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম সেদিন সন্ধেবেলা। কিন্তু তারপর? বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পাঁচ বছরের প্রেমের চামড়া, মাংস সব খসে গিয়ে হাড়, কঙ্কাল বেরিয়ে এল। যেগুলো একসময়ে পরস্পরের ভালোলাগা ছিল, মুগ্ধতা ছিল, সেগুলোই কোন ম্যাজিকে পুরো উলটে গিয়ে সবথেকে ঘৃণার হয়ে উঠল। সবেতেই সন্দেহ, সবেতেই বিরক্তি, আমরা একে অপরকে চিনতে পারতাম না, নিজেকেও অচেনা মনে হত। ভাবতাম এটা আমি! এই আমিই কি তৃষাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতাম! জানেন স্যার ওইসময় বুঝতে পেরেছিলাম ভালোবাসার মতো ঘৃণারও একটা মোহ রয়েছে। যেটা উত্তরোত্তর নেশার মতোই চড়তে থাকে। অবশ করে দেয়। আমরা দুজনে একে অপরের কাছে এতটাই অসহ্য হয়ে উঠলাম যে এক ছাদের তলায় থাকা তো দূর, এক পৃথিবীতেও থাকা অসহ্য হয়ে উঠছিল।

এই কথাটা শুনে চমকে উঠলেন অনিরুদ্ধ। এক পৃথিবীতে থাকাও অসহ্য হয়ে ওঠে?

পাঁচ বছরের তুলকালাম প্রেম চুল্লির আগুনে শবদেহের মতো পুড়ে ছাই হয়ে গেল...এই কবিতাটি সেই ছাইয়েরই কিছুটা...

কথাগুলো একনাগাড়ে বলে গেল বিতান।

বাইরে থেকে কোনো মানুষকে কোনোদিন বোঝা যায়নি, আজও বোঝা যায় না। কে যে কীভাবে তার শোককে বহন করে নিয়ে চলে তা একমাত্র সে-ই জানে।

অনিরুদ্ধ বললেন, আমি জানি না তোমাদের মধ্যে কী হয়েছিল, জানতে চাইও না। কারণ, জেনে কিছুই হয় না। শুধু জানাই হয়। শুধু এইটুকু বলব, লেখো। একজন লেখকের ক্রমাগত লিখে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। এটাই তার নিয়তি।

হ্যাঁ স্যার, সেটাই চেষ্টা করছি।

দীপালি এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। ও এবার বলল, তুমি একজন ভালো কবি বিতান।

বিতান দীপালির দিকে তাকাল। এবং ওর হাতের মুঠির ওপর নিজের হাতটা একবার রেখে শুধু বলল, থ্যাংক্স দীপালি। তোমার বন্ধুত্বটা আমার কাছে অনেক বড়ো পাওয়া। জানেন স্যার, তৃষা সন্দেহ করত আমার সঙ্গে দীপালির বুঝি প্রেম রয়েছে। হ্যাঁ দীপালিকে আমার ভালো লাগত, ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অনেকের থেকে একটু বেশিই ছিল, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তৃষাকে ভালোবাসতাম না। ও ছিল আমার সবকিছু। তৃষার সঙ্গে দীপালির কোনো তুলনাই আসত না...অথচ...আচ্ছা ভালোবাসার কি কোনো লেয়ার হয় না? আপনি বলুন স্যার? সবকিছুই কি এক? আমাদের লেখা সব কবিতা কি এক? সব গান, সব ছবি কি এক? তাহলে সব ভালোবাসা একইরকম কেন হবে? বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল বিতান। আমি তো কোনো ব্যভিচার করিনি, কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। কোনো কমিটমেন্ট ভাঙিনি। তবু...

কুল বিতান। জাস্ট লিভ ইট। ইটস পাস্ট।

অনিরুদ্ধ খেয়াল করছিলেন বিতান যতটা ছেলেমানুষ, দীপালি কিন্তু অনেক সংযত। মেয়েরা চিরকালই ছেলেদের থেকে অধিক সংযমী, ধীরস্থির। দীপালিকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিও তো কবিতাই লেখো তাই না?

হ্যাঁ স্যার। কবিতা লিখি। আর জীবিকার প্রয়োজনে একটি কলেজে পড়াই।

বিয়ে করেছ?

না। বলে একটু থেমে দীপালি বলল, হয়তো করব না। বলে বিতানের দিকে তাকাল।

আমরা কি আমাদের ভবিষ্যৎ জানি? কেউ জানি না।

না স্যার, ভবিষ্যৎ সত্যিই জানি না, কিন্তু নিজেদের অতীতকে তো জানি।

দীপালির কথার মূল ইঙ্গিতটুকু ধরতে পারলেন অনিরুদ্ধ। বললেন, হ্যাঁ তা ঠিক বলেছ। অতীত হল সবচেয়ে বড়ো জ্যোতিষী। যাইহোক, আমরা বড্ড বেশি বেদনাসিক্ত হয়ে পড়ছি। পাহাড়ে দুঃখ পেতে নেই। তোমার কবিতা শোনাও।

দীপালি এই প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। বলে উঠল, আমার কবিতা!

হ্যাঁ, সঙ্গে নেই?

হ্যাঁ...মানে মোবাইলে আছে...কিন্তু স্যার...

তুমি অসমিয়া ভাষাতেই পড়ো। বাংলা আর অসমিয়া তো প্রায় পিঠোপিঠি ভাই। বুঝতে খুব সমস্যা হবে না। আর আমি নিজে জীবনে অন্তত বার ছয়েক অসমে গিয়েছি। ওখানে আমার অনেক বন্ধু রয়েছে, অনেক স্মৃতি রয়েছে। আমার অত্যন্ত প্রিয় একই জায়গা।

দীপালি ওর মোবাইল বার করে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করল। তারপর বলল, এই কবিতাটা কাল প্রোগ্রামে আমি পড়ব। আপনাকে শোনাই।

শিওর।

কবিতার নাম—বৃষ্টি।

যেন র'দে আহি
সকলকে খাই পেলাইছে
র'দত পুড়িছে মন
দেহজ জুই জ্বলে
উমি উমি...
বুকুর ভিতরত
পখির গুনগুননি
ডেউকার কান্দোন...
মোর বাবে গোপন বরকুন দিয়া
র'দত পুরি থকা
এই মানুষটর বাবে
তোমার চকুলো
বৃষ্টি হৈ নামক।

অনিরুদ্ধ চোখ বুজে দীপালির কবিতা শুনছিলেন। নিস্তব্ধ ঘরটার ভেতরে যখন কবিতার লাইন মন্ত্রের মতো ধ্বনিত হচ্ছিল, হ্যাঁ মন্ত্রের মতো। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রের নামই হল কবিতা। মহামন্ত্র। ঘরের মস্ত কাচের জানলার বাইরে রাতের অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে অনেক অনেক দূরের পাহাড়ের গায়ে জোনাকির ঝাঁকের মতো আলো মিটমিট করে জ্বলছিল। অনীক হোটেলের প্রতিটা ফ্লোরে ঘুরপাক খেতে খেতে আবারও বেরিয়ে এল রাস্তায়। নির্জন আলো-আঁধারি রাস্তা। বাইরে বেশ ঠান্ডা। গায়ে তেমন কোনো গরম জামা নেই। কাজটা কি ঠিক হল? ভাবতে ভাবতেই অনীকের পকেটের সেই ফোন বেজে উঠল। ছলাৎ করে উঠল রক্ত। যত দ্রুত সম্ভব পকেট থেকে ফোন বার করেই কল রিসিভ করল ও।

বাবু তুই গায় সোয়েটার না দিয়েই বেরিয়েছিস কেন? ঠান্ডা লেগে যাবে তো...

তুমি সব দেখতে পাও মা?

পাহাড়ি রাতে আবারও শুরু হল এক মা ও তার কিশোর পুত্রের কথোপকথন।

*   *   *

বিতান আর দীপালি রুম ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ একা চুপ করে বসেছিলেন অনিরুদ্ধ। কাচের জানলার খোলা অংশ দিয়ে ভেজা ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছিল। কোলের ওপর খুলে রাখা ছিল কবিতার খাতা। অনেককাল আগে লেখা একটি পুরোনো কবিতার পৃষ্ঠায় চোখ রেখেছিলেন তিনি—

এখানে এসো। নিশ্চিন্তে হাত রাখো আমার কাঁধে।

কেঁদো না। না, না, একদম না। এরকম করে কাঁদতে আছে নাকি! একদম বোকা কোথাকার! আমিও তো মানুষ
আমি জানি তোমার মধ্যে বহু অনাহুত মেঘ ও বৃষ্টি
অনেক-অনেকদিনের গুমরে ওঠা কৃৎস্ন নদীদের উত্তাপ
আমি সব বুঝি। আমিও তো মানুষ
বরং আমার বুকেই তুমি মাথা রাখো
চেপে ধরো দেবত্র দু-হাত আমার, এখানে এসো। এখানে
আমার দেহাতি দুই চোখের দিকে তাকাও, এখানে
খোলা মাঠ আর সবুজে ঘেরা আকাশ। বড়োই শান্তি।
আরও একটু ঘনিষ্ঠ হলে বুঝবে লহরিসমূহ, আমিও তো মানুষ
আমার ধ্বংসোন্মুখ হৃদয়ের পরতে পরতে এখনও
প্রেমের গদ্য। ভয় পেয়ো না
আমরা সবাই সমবেত জীবন-যাপন করব
আমরা সকলেই একসাথে ভালোবেসে মরে যাব।
আমিও তো মানুষ।
এখানে এসো।

নিজেরই লেখা অথচ কত অচেনা! মানুষ বেঁচে থেকেও কেন মৃত্যুর কথা বলে! সে তাকে আজীবন এড়াতে চায় অথচ প্রতিমুহূর্তে তাকেই জড়িয়ে থাকে।

অনেক রাতে অনীক ঘুমিয়ে পড়ার পর অনিরুদ্ধ আবারও বিছানা ছেড়ে উঠে সেই খামটা খুললেন, হ্যাঁ আবারও একটি চিঠি—

প্রিয় বাবা,

আমি জানি আমার আগের চিঠির কথাগুলো তোমাকে কষ্ট দিয়েছে। তুমি কেঁদেছ, কিন্তু তুমি তো জানো প্রত্যেকটা মানুষের কিছু কথা থাকে যা তাকে বলে যেতে হয়, নইলে তার মুক্তি নেই। আমি তোমার মতো অত ভালো ভাষা জানি না, কিন্তু একটা কথা বুঝি কথা আসলে নদীর জলের মতো, তাকে বয়ে যেতে দিতে হয়, জমিয়ে রেখে দিলে সে পাথর হয়ে যায়। আমি ভালোমতো বোঝাতে পারলাম না জানি, কিন্তু এইটুকু জানি তুমি ঠিক বুঝে নেবে আমি আসলে কী বলতে চেয়েছি। বাবারা তার ছেলের কথা ঠিক বুঝে নেয়। কারণ প্রতিটি বাবা তার ছেলের মধ্যে নিজেকে দেখে, নিজেকে প্রতি মুহূর্তে আবিষ্কার করে। আমার এখনও মনে পড়ে তুমি কখনো আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে, তোমার দুই চোখে আমার জন্য অপার মুগ্ধতা আর বিস্ময় খেলা করত। আমার যখন সবে গোঁফের রেখা উঠছে, আমার শরীরে বদল ঘটতে শুরু হয়েছে, মনের ভেতরে তৈরি হচ্ছে অনেক বিপন্নতা, বিস্ময়; ওই সময়টা মানুষের জীবনে খুব ক্রুশিয়াল। সে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, অসংখ্য দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাজ করে। বড্ড একা মনে হয়, নিজেকে গুটিয়ে ফেলতে চায়। ওইসময়টায় বুঝিনি বাবা তবে আজ বুঝি তুমি কী পরম বন্ধুর মতো আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলে। আমাকে বুঝতে তুমি, আমিও ভরসা পেয়ে আমার সবকিছু তোমার সঙ্গে শেয়ার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতাম না। মা যেহেতু বড়োই অসুস্থ থাকত বছরের বেশির ভাগ সময়টায়, সেইজন্য সংসারে মায়ের ভূমিকা ছিল অনেক কম। তুমি শুধু আমার বাবা নও, আমার মা-ও হয়ে উঠেছিলে। কিন্তু তোমার

প্রতি আমার এই বিশেষ অ্যাটাচমেন্ট পাছে মায়ের মনে কোনো কষ্ট তৈরি করে তাই আমাকে তুমি বলেছিলে সারাদিনে অন্তত কিছুটা সময় নিয়ম করে মায়ের সঙ্গে কাটাতে। আমি তাই করতাম। জানো বাবা অসুস্থ মানুষ, তা সে যতই প্রিয়জন হোক না কেন, তার কাছে খুব বেশিক্ষণ থাকা যায় না, একটা সময়ের পর খুব ডাল লাগে, ডিপ্রেসড লাগে। বিশেষ করে আমার তখন যা বয়স ছিল তাতে অসুস্থ শয্যাশায়ী মায়ের পাশে রুটিন করে কিছুক্ষণ সময় কাটানোটা দমবন্ধ করা লাগত; ওষুধ, পুরোনো বিছানা, কাঁথা সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা মৃত্যুর গন্ধ। আমার অসহ্য লাগত, কিন্তু আমি জোর করে মাকে এবং তোমাকে খুশি করার জন্যই মায়ের সঙ্গে প্রতিদিন রাতে কিছুক্ষণ গল্প করতাম। গল্পের তেমন কিছুই খুঁজে পেতাম না, মাঝে মাঝে এমনিই গিয়ে চুপ করে বসে থাকতাম। মা হয়তো পরের দিকে বুঝত আমি কর্তব্য সারতে এসেছি, তাই কিছুক্ষণ পরেই বলত, তুই যা, পড়তে যা, কিংবা বলত, আমার ক্লান্ত লাগছে আমি শুই। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। অথচ তুমি, জগতের এক আশ্চর্য মানুষ কী পরম আন্তরিকতায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর মায়ের যত্ন করতে। এক এক সময় মনে হত তুমিও বুঝি আমার মতোই মায়ের কেয়ার করার ভান করো, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম ভান করে এতদিন পারা যায় না। ভানের এক্সপায়ারি ডেট থাকে, মায়ার নয়। অসুস্থ মানুষের মধ্যে যতই কৃতজ্ঞতাবোধ থাকুক না কেন সে কখনো-সখনো হতাশা থেকে মেজাজ হারাবেই। মায়েরও হত। মা তখন খুব চিৎকার করত, আমার ওপর, বাবার ওপর। যা নয় তাই বলত। ভুলভাল দোষারোপ শুনে আমার মাথা গরম হয়ে যেত, আমিও পালটা কিছু বলতে যেতাম, কিন্তু তুমি আমাকে থামিয়ে দিতে। ইশারায় চুপ করে থাকতে বলতে। পরে আমাকে বুঝিয়ে বলতে কেন মা এমন করে। আর বলতে যতদিন তোর মা এমন রাগ করবে, বুঝবি তোর মায়ের প্রাণশক্তি রয়েছে। ঈশ্বরকে বলিস মায়ের রাগ যেন না চলে যায়। মা অবশ্য খুব বেশিক্ষণ চেঁচামেচি করতে পারত না, হাঁফিয়ে পড়ত, কাশত, তখন তুমি অথবা আমি গিয়ে মাকে জল খাওয়াতাম। মা হাঁফাত, তারপর ধীরে ধীরে জল খেয়ে শুয়ে পড়ত। তোমার কাছ থেকে অনেককিছু শেখার ছিল বাবা, আমি কিছুই শিখতে পারিনি। আমার এক এক সময় এটাও মনে হত মা এবার চলে যাক। বাড়ির ভেতরে সারাক্ষণ একটা অসুস্থতা, মৃত্যুর ক্ষয়াটে ছায়াকে অনুভব করতাম আমি। একদম ভালো লাগত না। অথচ তুমি মায়ের শেষদিন পর্যন্ত একই বিছানায় শুতে। কী করে শুতে? ভয় করত না? ঘেন্না লাগত না? তুমি তোমার কোনো একটা লেখায় লিখেছিলে, ভালোবাসাও এক ধরনের অ্যাডিকশন, তুমিও কি এই অ্যাডিকশনে পড়েছিলে? অথচ তুমি ছিলে আশ্চর্য নির্লিপ্ত। আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেই ভোরবেলাটার কথা। তুমি আমার ঘরে এসে মশারি সরিয়ে আমাকে ঠেলে ঘুম ভাঙিয়ে শান্তভাবে বললে, তোমার মা চলে গেছে। ওঠো।

এইভাবেও বলা যায়!

ভালোবাসার অ্যাডিকশনে আমিও তো পড়েছিলাম। ভালোবাসতে শিখেছিলাম তোমার কাছে, কিন্তু অ্যাডিকশনটাই শিখেছিলাম শুধু, কীভাবে নির্লিপ্তও থাকতে হয় সেটা শেখা হয়নি। ওটা কেন যে শিখলাম না! তুমি তো সবই বুঝতে, সবই জানতে। আমাকে চিরকাল বন্ধুর মতো সবকিছুতে গাইড করে গেলে কিন্তু কোয়েলের বেলায় কেন চুপ থাকলে তুমি? সত্যিই কি তুমি জানতে না, সংসার-ভালোবাসা-কেরিয়ার এই শব্দগুলো পাশাপাশি রাখা ভারী সহজ হলেও জীবনে এগুলোকে পাশাপাশি বসানো বড়ো কঠিন। তুমি চেয়েছিলে একজন বড়ো কবি হতে, আর ভালোবাসতে মাকে, আমাকে। আর মা শুধু চেয়েছিল তার সংসারটুকু সুন্দর হোক এবং সে সুস্থ হয়ে উঠুক। কিন্তু আমি? আমি কোয়েলকে ভালোবাসলাম, ওর কেরিয়ারকে ভালোবাসলাম, আমার কেরিয়ারকে ভালোবাসলাম আবার ভাবলাম একেবারে নিটোল একটা সংসার হবে, একেবারে খড়ে ছাওয়া মাটির ঘর যেমন শান্ত আর শীতল হয় তেমন। কিন্তু আমি একেবারে বোকা ছিলাম। শুধু আমি কেন? আমি বলব কোয়েলও খুব বোকা ছিল। দুজনেই কেরিয়ারিস্ট ছিলাম। ভেবেছিলাম এটাই বুঝি আমাদের বাঁধন। কিন্তু আমরা দুজনেই গুলিয়ে ফেলেছিলাম। কেরিয়ার তৈরি করা যেমন একটা সাধনা, আর সেই সাধনায় সফলতার জন্য জীবন অনেক মূল্যবান সময় দাবি করে, সংসারও ঠিক তেমনই একটা সাধনা, তাকেও সুন্দরভাবে সফল করে তোলার জন্য চাই কোয়ালিটি টাইম। দুটো সাধনা কখনো প্যারালালি একইভাবে চলতে পারে না। কোয়েল আমাকে ভালোবাসত, কিন্তু তার চেয়েও ভালোবাসত নিজের পেশা, আরও উন্নতি। অন্যদিকে আমিও তাই। ওকে ভালোবাসতাম কিন্তু তার থেকেও ভালোবাসতাম নিজের কেরিয়ার। তুমি তো জানোই বাবা একই ফার্মে আর্টিকেলশিপ পড়তে গিয়ে কোয়েলের সঙ্গে আমার পরিচয়, তারপর প্রেম, বিয়ে। বিয়ের আগে ওকে একদিনই মাত্র তোমার সঙ্গে দেখা করানোর জন্য আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম। তুমি শুধু আমাদের দুজনকে একটা কথাই বলেছিলে, ভালোবাসার থেকে ভালো আর কিছু হয় না। কেন জানো? ভালোবাসার কোনো শর্ত হয় না, ভালোবাসি মানে ভালোবাসি, ব্যস। কিন্তু একসঙ্গে থাকতে গেলে কিছু শর্ত চলে আসে। প্রথমেই আসে না, ধীরে ধীরে আসতে থাকে। সেই শর্তগুলোকে কিন্তু কোনোভাবেই এড়ানো যায় না, যতই এড়াতে চেষ্টা করবে ততই ঘাড়ের ওপর চেপে বসবে। সেটাকে সাবধানে সামাল দিও। বড্ড ধৈর্য লাগে।

ব্যস এইটুকুই বলেছিলে। আমরা ভেবেছিলাম এ আর এমন কী...কিন্তু তোমার কথা আমরা কেউ সেদিন বুঝতে পারিনি। আমরা ভেবেছিলাম দুজনেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পাশ করেছি। একই কোয়ালিফিকেশন, একই ফিল্ডে কাজ, ফলে একে অপরের কাজেও যেমন সাহায্য করতে পারব তেমনই একে অপরের সুখ-দুঃখও ভাগ করে নেব। কিন্তু বয়সটা কাঁচা ছিল তো, তাই বুঝিনি, আর তুমি হয়তো কিছু আন্দাজ করেও চুপ ছিলে। কিন্তু ওই যে বললাম না, কোয়েলের মতো আমিও ছিলাম তীব্র কেরিয়ারিস্ট। এমনটা আমি ছিলাম না। কিন্তু মা চলে যাওয়ার পর একসময় আমি আবিষ্কার করলাম আমাদের বাড়িটা একদম ফাঁকা হয়ে গেছে। একটা প্রাণ, তা সে যতই অপ্রয়োজনীয় হোক না কেন তার থাকা আর না থাকায়

একটা পার্থক্য রয়েছে। মা সংসারের প্রতি, আমার প্রতি কোনোদিনই বিশেষ নজর দিতে পারেনি, নিজের শরীর নিয়েই বরাবর নাজেহাল থাকত। আমার কাছে তাই মায়ের বিশেষ কোনো গুরুত্ব ছিল না। বড়ো হওয়ার পর তো নয়ই। এমনকি মা চলে যাওয়ার পর আমি যে খুব কেঁদেছিলাম, ভীষণ আঘাত পেয়েছিলাম তা নয়, বরং তুমি খুব চুপ হয়ে গেছিলে। আজ তোমাকে একটা কথা নির্লজ্জের মতো স্বীকার করি, আমি চাইতাম মা চলে যাক, আমি বুঝেছিলাম মা কোনোদিনই সুস্থ হওয়ার নয়, কিন্তু বাড়ির মধ্যে দিনের পর দিন একটা অসুস্থতার পরিবেশ আমার কেমন যেন অভিশাপের মতো মনে হত। বাড়িটায় কোনো আলো নেই মনে হত। মা চলে যাওয়ায় আমার মনে হয়েছিল মা এবং বাড়িটা দুজনেই মুক্তি পেল। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ঘরটা ফাঁকা লাগত। বিয়ের পর আমাদের সেই ছোটো বাড়িটা যেন প্রথমবার এত আলোময় হয়ে উঠেছিল। তুমিও খুশি হয়েছিলে, আমি সেটা বুঝতে পারতাম। কিন্তু তারপর ভালোলাগার চকচকে রাংতাটা দৈনন্দিন ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে ভেতরের আসল মেটেরিয়ালটা বেরিয়ে এল। আমি আর কোয়েল দুজনে একসঙ্গে লড়তে লড়তে কখন যে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করেছি নিজেরাই টের পাইনি জানো। বিয়ে যখন করেছিলাম তখন দুজনেই দুটো কোম্পানিতে জয়েন করেছি। একদিকে নতুন জীবনের আনন্দ, অন্যদিকে কেরিয়ার শুরুর উদ্দীপনা। দুজনেই বছর কয়েকের মধ্যে দু-তিনটে চাকরি বদলে ফেললাম। তারপর একটা সময়ে আমি দেখলাম কোয়েল আমার থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। অনেক বড়ো কোম্পানি, অনেক বেশি প্যাকেজ। আমিও চেষ্টা করছিলাম কিন্তু হচ্ছিল না। জানো বাবা এই সময়ে আমি প্রথমবার ফিল করি, শত্রুর উন্নতিতে হিংসা হওয়ার থেকে অনেক বেশি যন্ত্রণার নিজের বন্ধুর উন্নতিতে হিংসা হওয়া। শত্রুর প্রতি হিংসায় কোনো দায় থাকে না, কিন্তু যখন তুমি তোমার সবথেকে কাছের মানুষটার উন্নতিতে আচমকাই ঈর্ষা অনুভব করো তখন তোমাকে বিবেকের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হতে হয়। আমারও সেই অবস্থাই হল। আমি পিছিয়ে পড়ছিলাম, আর দেখছিলাম কোয়েল চড়চড় করে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাদের তো একসঙ্গেই এগোনোর কথা ছিল। আমি যে অসফল ছিলাম তা মোটেও নয়, কিন্তু অধিক সফল আর কম সফলের মধ্যে ব্যর্থতার যে একটা চোরাগলি থাকে সেটাই ছিল আমার আর কোয়েলের মধ্যে দূরত্ব। ওই সময়টায় আমি আরও একটা জিনিস বুঝেছিলাম। সাফল্য আর ব্যর্থতা একটা ধারাবাহিক প্রসেস। কেউ যখন সফল হতে থাকে তখন সে পরপর সফল হতে থাকে, আর উল্টোদিকে কেউ যখন ব্যর্থ হতে থাকে তখন সবকিছুতেই ব্যর্থ হতে থাকে। কোয়েল তখন যে প্রোমোশনের একের পর সিঁড়ি পেরোচ্ছে, স্যালারি প্যাকেজ বাড়ছে লাফিয়ে আর এদিকে আমি কোনো বড়ো কোম্পানিতে এন্ট্রি নিতে পারছি না, তার মাঝে একটা অডিটে বড়ো ভুল ধরা পড়ল, আমার সাইন ছিল। শোকজ খেয়ে গেলাম। আমার অস্থিরতা, হতাশা আরও বেড়ে গেল...জানো বাবা আজ আমার করা একটা পাপ আমি তোমার কাছে স্বীকার করছি, অনীককে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসাটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না। আমাদের দুজনের প্ল্যানও ছিল না। ওটা আমার একার প্ল্যান ছিল। কোয়েল যখন বুঝতে পারে তখন অ্যাবোর্ট করাতে চেয়েছিল কিন্তু আমি ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করে ওকে আটকেছিলাম। আসলে বাবা আমার মনে হয়েছিল একটা সন্তান এলে কোয়েল নিশ্চয়ই পিছিয়ে পড়বে। আমি আসলে ওকে আটকাতে চেয়েছিলাম, আর ওকে আটকানোর জন্য এ ছাড়া আর কোনো পথ আমার জানা ছিল না। এটা পড়ার পর তুমি নিশ্চয়ই আমাকে খুব ঘেন্না করছ, ভাবছ এতটা নীচ আমি! তোমার ছেলে হয়ে এমন কাজ আমি করতে পারলাম! তোমার আর মায়ের মধ্যে যে অপূর্ব সম্পর্ক আমি দেখেছি তার তুলনা আমাদের সঙ্গে কোরো না। আর আমি তো কোনোদিনই তোমার নখের যোগ্য নই। একটা সময়ে তোমার যোগ্যতা, তোমার পরিচিতি, সম্মান আমাকেও কখনো ঈর্ষাকাতর করে তুলত; ভাগ্যিস আমার আর তোমার পেশাগত জীবন এবং জীবনযাত্রা আলাদা ছিল, তুমি সাধারণ জীবন যাপন ভালোবাসতে, আমি ভালোবাসতাম একটু বিলাসব্যাসন। আমি আর কোয়েল ট্যাক্স সেভিংস-এর জন্য গাড়ি কিনেছিলাম, ফ্ল্যাট কিনেছিলাম। সবই তুমি জানো। অবশ্য আমরা আরও একটা জমি কিনেছিলাম শান্তিনিকেতনে। সেটা তোমাকে আর জানানো হয়নি।

জানো বাবা অনীক এই পৃথিবীতে আসার পর আমি যতটা খুশি হয়েছিলাম কোয়েল কিন্তু অত খুশি হয়নি। কোনোদিনই হয়নি। তারমানে এই নয় ও অনীককে ভালোবাসত না। নিজের সন্তানই তো। কিন্তু ও হয়তো আন্দাজ করত আমি এটা জেনেবুঝে ঘটিয়েছি। পরের দিকে তো সরাসরি বলেও ফেলত, আমি ওকে ঠকিয়েছি। আমি যেটা ভেবেছিলাম ঠিক সেটাই হল। অনীক ওর মায়ের কাছ থেকে যতটা ভালোবাসা পাবার কথা ছিল ততটা পেল না। আর আমিও অনীককে যতটা ভালোবাসা দিতে পারতাম, নিজেকে নিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকতে গিয়ে আমি পুরো ঘেঁটে গেলাম। কোয়েলকে পিছিয়ে দিয়ে আমি যে খুব বেশি এগোতে পেরেছিলাম তা নয়। ওইভাবে যে এগোনো যায় না সেটা আমি বুঝিনি, বরং অনীক আসার প্রথম বছর দুয়েক কোয়েল বাড়িতে বসে ছেলেকে দেখল। আর ঘরে বসেই টুকটাক অডিটের কাজ। তারপর বাড়িতে উষাদিকে রাখা হল অনীককে দেখাশোনা করার জন্য। আর কোয়েল আগের চেয়ে তিনগুণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিজের পুরোনো কর্মক্ষেত্রে। আমি ভেবেছিলাম ও বুঝি আর আগের মতো পেরে উঠবে না। কিন্তু আমি একটা বোকা এইটুকু বুঝিনি, স্বাভাবিক ছন্দে বয়ে চলা নদীতে বাঁধ দিলে সেই নদীর স্রোত আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে যায়। তারপর সে যখন বাঁধ ভাঙে তখন তার স্রোতের তোড়ে অনেক কিছু ভেসে বেরিয়ে যায়। কোয়েলের সঙ্গে আমার যে সম্পর্কের জোড়াটুকু ছিল সেইটুকুও ছিঁড়ে গেল। একটা ছাদের তলায় নিজস্ব জগতে থাকা দুটো মানুষ যারা অ্যাক্সিডেন্টালি একটি পুত্র সন্তানের পিতা ও মাতা।

আমার আর কোয়েলের দূরত্বটা সবচেয়ে ক্ষতি করছিল অনীককে। তুমি সবই হয়তো বুঝতে, আর তাই অনীককে নিজের কাছে টেনে নিয়ে নিজের মতো গড়ে তুলছিলে। একদিকে এটা হয়তো ভালোই হয়েছিল। ঠিক জানি না...

বাবা, আমাকে সবকিছুর জন্য ক্ষমা করো। আমি আর কোয়েল দুজনেই তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। অনীক আরেকটু বড়ো হোক,

ওকে তুমি সব বোলো, সবকিছু জানিয়ে দিও। কী ঘটেছিল, কেন ঘটেছিল তাই নিয়ে ওর মনের ভেতরে যেন কোনো দ্বিধা না থাকে। তুমি আমার ভালো বাবা, কিন্তু আমি অনীকের ভালো বাবা হতে পারলাম না।

তোমরা ভালো থেকো।

তোমার অনি।

চিঠিটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ সে চিঠির দিকে তাকিয়ে রইলেন অনিরুদ্ধ। চশমা খুলে কাচ মুছে আবার পরে নিয়ে বুঝলেন কাচ ঝাপসা নয়, তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে রয়েছে। অনি চিঠিতে যা লিখেছে তার প্রায় অনেকটাই তিনি জানতেন, বাকিটা আন্দাজ করতেন। অনি এবং কোয়েলের সংসারটা যে খুব সুখের হবে না সেটা তিনি অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। কম্পিটিশন করে সংসার হয় না। বিয়ের কিছুদিন পরেই ওদের দুজনের মধ্যে দাম্পত্যের আনন্দ থেকে কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা হত বেশি। খুনসুটির থেকে ডেবিট ক্রেডিট ব্যালেন্সশিট, ট্যাক্স অডিট হয়ে উঠেছিল রাতে খাবার টেবিলে আলোচনার বিষয়। অনিরুদ্ধ প্রথম দিকে দুইজনকেই একসঙ্গে এবং আলাদাভাবে বলেছিলেন, তোমাদের এই সময়টুকু জীবনের সবথেকে সুখের সময়। এটাকে প্রাণপণে উপভোগ করো, এমন সময় আর কিন্তু আসবে না। আর এইসময়টা সুন্দর কাটালে আগামী দিনের পথচলা সুন্দর হবে। তার উত্তরে দুজনেই বলেছিল, কিন্তু এটা আমাদের কেরিয়ায় তৈরিরও সময়। এই সময়টাও আর আসবে না।

মিউজিয়াম দেখে ইন্সটিটিউট ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজ।

এরপর আর কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করেননি অনিরুদ্ধ। এমনিতেই অতসী চলে যাওয়ার পর তিনি ভেতরে ভেতরে অনেক ভেঙে পড়েছিলেন। একটা মানুষ সশরীরে থাকা আর না থাকার মধ্যে বিশাল পার্থক্য। মৃতদেহকে যখন বাড়ি থেকে শেষবারের জন্য বার করে নিয়ে যাওয়া হয়, কিংবা শ্মশানে তাকে চুল্লিতে ঢোকানো হয় সেই মুহূর্তটায় তার প্রিয়জনের বুকটা আবারও ফেটে চুরমার হয়ে যায়, সে মানুষটি আর বেঁচে নেই তা অনেক আগে জানার পরেও আবার সে হাহাকার করে ওঠে কারণ সেই নিথর শরীরটিও চিরকালের মতো চোখের সামনে থেকে চলে যাচ্ছে, আর কখনো কোনোভাবেই তাকে দেখতে পাব না, এই অনুভব তাকে কাতর করে তোলে। অনিরুদ্ধ জানতেন, মনে মনে প্রস্তুতও ছিলেন অতসী থাকবে না, কিন্তু তার পরেও একটা মুহূর্তের জন্য তিনি হাল ছাড়েননি, অতসীকে বুঝতে দেননি তিনি হাঁফিয়ে পড়ছেন। অনেক রাতে অতসী ঘুমিয়ে পড়লে, ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে কখনো টের পেতেন অতসীর চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, অতসী কাঁদছে। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলতেন না, অনিরুদ্ধ শুধু সেই অশ্রুটুকু মুছিয়ে দিতেন। চোখের সামনে দিনের পর দিন ধুঁকতে থাকা, অসুখের গন্ধমাখা একটা মানুষের পাশে থাকা যে কতটা কঠিন, কতটা লড়াইয়ের তা একমাত্র যে এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছে সেই জানে। অনিরুদ্ধ নিজেও কি কখনো ভেতরে ভেতরে হাঁফিয়ে পড়েননি? কখনো কি তাঁর মনে হয়নি আর পারছি না, কখনো কি একটু রেহাই পেতে চাননি? হ্যাঁ চেয়েছেন, তিনিও একজন সুস্থ রক্ত-মাংসের মানুষ। কিন্তু এই ভাবনাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। বরং নিজের মনুষ্যত্ব দিয়ে, বিবেক দিয়ে এবং সর্বোপরি ভালোবাসা দিয়ে এই সব মনে হওয়াকে দূরে সরিয়ে অতসীকে আগলে

রেখেছেন। তিনি সচেতন থাকতেন অতসী যেন কখনো মনে না করে ওর এই অসুস্থতা অনিরুদ্ধর কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, খুব সহজ স্বাভাবিক আচরণ করতেন তিনি অতসীর সঙ্গে। মানে চেষ্টা করতেন আর কী...আর এই অভিনয় করতে করতে আচমকাই কখনো আবিষ্কার করতেন অতসী ওঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। তখন বুকের ভেতরে ঝনাৎ করে শব্দ হত অনিরুদ্ধর। তাঁর মনে হত অতসী বুঝি তার মনের ভেতরটা দেখে ফেলছে। চোখ সরিয়ে নিয়ে অনিরুদ্ধ জিজ্ঞাসা করতেন, কী দেখছ অমন করে?

কিছু না। বলতেন অতসী। কিংবা কখনো মৃদুস্বরে বলতেন, তুমি বড়ো ভালোমানুষ।

অনিরুদ্ধর মনে পড়ল, অতসী চলে যাওয়ার ঠিক মাস চারেক আগে, একদিন ও বলল, আমাকে একদিন একটা সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবে? কতদিন সিনেমা দেখি না।

অনিরুদ্ধ ঠিক একদিন পরেই সিনেমার টিকিট কেটেছিলেন। বাড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ছিল জগন্নাথ হল। সেই হলে রিকশায় চেপে তিনজনে মিলে গিয়েছিলেন। অনিরুদ্ধর কোলে অনির্বাণ। ছেলেকে বাঁ-হাতে জাপটে ধরে ডানহাত দিয়ে অতসীকে ধরে রেখেছিলেন যাতে রাস্তায় ঝাঁকুনিতে অতসী না পড়ে যায়। বাংলা সিনেমা ছিল, কী সিনেমা আজ আর নাম মনে নেই, শুধু একটা কথা আজও মনে আছে। অন্ধকার হলে একবার অতসী অনিরুদ্ধর হাতটা ধরে ফিসফিস করে বলেছিলেন, আমি আর বাঁচব না তাই না?

এ আবার কেমন কথা বলছ তুমি? তোমার তো কোনো মারণরোগ হয়নি।

তবু আমি জানি আমি আর বেশিদিন থাকব না। কিন্তু তোমার মতো একজন মানুষকে পেয়েছিলাম এটাই আমার সাতজন্মের ভাগ্য।

অতসী, এমন বোলো না, প্লিজ।

না গো, বলছি না। আসলে...আমি বুঝি...তবে মরলেও আমার চিন্তা নেই, তুমি ছেলেকে ঠিক মানুষ করে দেবে। সেটা আমি জানি।

আর কথা হয়নি। অনিরুদ্ধ পরে ভেবেছিলেন অতসী কি শুধু এই কথাটুকু বলবে বলেই সিনেমা দেখতে গিয়েছিল? কিছু কথা থাকে যেগুলো বলার জন্য অন্যরকম পরিবেশ লাগে। মস্ত একটা অন্ধকার ঘর, অনেক মানুষ, সকলে চুপ এবং কেউ কাউকে দেখছে না। তারই মধ্যে পাশে বসা মানুষটিকে ফিসফিস করে এমন কোনো গোপন জমানো কথা বলে ফেলা যায় যা একান্তে, আলোতে, চোখে চোখ রেখে বলা সম্ভব নয়।

চিঠিটা ভাঁজ করে সেই নীল খামের ভেতরে ভরতে গিয়ে অনীকের দিকে তাকালেন অনিরুদ্ধ। ওপাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে ছেলেটা। অনির্বাণকেও এই বয়সে একা হাতে বড়ো করেছিলেন, এখন তার ছেলেকে। ঢোঁক গিলতে গিয়ে গলার কাছটা ভারী লাগল। উঠে খামটা নিজের লেখার ডায়রির খাঁজে রাখার সময়ে জানলার দিকে চোখ পড়ল, অন্ধকারে বহুদূরে কয়েকবিন্দু আলো মিটমিট করছে। এই ঘর আর ওই আলোর মাঝে অতল খাদ। একবার খাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে হল।

*   *   *

নি।

বলো।

একটা কথা।

হ্যাঁ।

বলছি যে...

হুঁ...

পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তাকেই লৌকিক বলে?

কতকটা সেইরকমই।

তাহলে অলৌকিক কাকে বলে?

যা ঘটতে পারে না।

কিন্তু ধরো যা ঘটতে পারে না তেমন কি কখনোই ঘটে না?

সাতসকালে অনীকের এমন প্রশ্ন অনিরুদ্ধকে সামান্য বিচলিত করল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, এমন কিছু কি ঘটেছে তোমার সঙ্গে?

অনীক একটু চমকে গেল। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, না না কিছু ঘটেনি, এমনই বললাম...এমনই।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। অনিরুদ্ধর হঠাৎই মনে এল অনীকও কি কোনো চিঠি পাচ্ছে? হতেও পারে...

যদি এমন কিছু তোমার সঙ্গে হয়ে থাকে, আমাকে বলতে পারো, আবার নাও বলতে পারো।

যদি হয় তাহলে কি সেটা বিশ্বাস করবে?

হুম...বলে একটু চুপ করে থাকলেন অনিরুদ্ধ। কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করলেন। হয়তো নিকও এমন কোনো খাম পেয়েছে, হয়তো সেখানে এমনই চিঠি থাকছে। হয়তো অনিরুদ্ধর মতোই কোনো গোপন সময়ে সেই চিঠি পড়ছে অনীক। কিন্তু অনীক যেহেতু খুবই চাপা স্বভাবের তাই ওর চোখ-মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই ওর ভেতরে কী ঘটছে। অনিরুদ্ধ এতবছর ধরে অনীকের সঙ্গে রয়েছেন, তবু অনেকটাই বুঝতে পারেন না ওকে।

দেখো নিক, আমরা জগতের সবকিছুকে বুঝি বা বলতে পারো রিলেট করি আমাদের এক্সপিরিয়েন্স, আমাদের পারসেপশন দিয়ে। যাবতীয় ঘটনা, মেটেরিয়াল, ইভেন স্বপ্নকেও জাস্টিফাই করি আমাদের যে চৈতন্য রয়েছে তার দ্বারা। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের চৈতন্যের জগতের বাইরেও মস্ত একটা স্পেস রয়েছে। সেখানে কী ঘটছে তা আমাদের এই চেতনার দ্বারা তাকে বোঝা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে কী হবে জানা নেই কিন্তু এখনও মানুষ সেই জগতে পৌঁছতে পারেনি, কাজেই যে ব্যাপারটা আমার ভাবনা-চিন্তা, অভিজ্ঞতার বাইরে তাকেই আমরা অলৌকিক বলি। এবার অনেক সময় এই পৃথিবীতেই আমাদের বোধ-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার অতীত কিছু ঘটে, তখন আমাদের মনে হয়ে এমন হতে পারে না, এটা অসত্য। কিন্তু এমনটা নাও হতে পারে।

খুব ধীরে ধীরে রয়ে সয়ে কঠিন কথাগুলো বললেন অনিরুদ্ধ। তিনি জানেন অনীক এই কথা অনেকটাই বুঝতে পারবে। জ্ঞান হওয়া ইস্তক অনীক তার দাদুর কাছেই বড়ো হয়েছে, অনিরুদ্ধর ভাবনা, তাঁর কথার সঙ্গেই বেড়ে ওঠা, তাই ওর বয়সের তুলনায় অনীক অনেকটাই মানসিকভাবে পরিপক্ব।

অনীক মন দিয়ে পুরোটা শুনল। অল্প মাথা নাড়ল। অনিরুদ্ধ অপেক্ষা করলেন অনীক যদি কিছু বলে। কিন্তু অনীক কিছুই বলল না। অনিরুদ্ধ আর কিছু বললেন না। অনীক এমনই একটি ছেলে তাকে জোরাজুরি করে কিছু বার করা যায় না। বরং উল্টোটা ঘটে, আরও গুটিয়ে যায়। ছেড়ে দিলে বরং কখনো একসময়ে নিজে থেকেই প্রকাশ করে।

উঠে পড়লেন অনিরুদ্ধ। ওয়াশরুমে যাওয়ার আগে অনীককে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের আজকের প্ল্যান তাহলে কনফার্মড তো?

হ্যাঁ।

তাহলে ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়ব?

হ্যাঁ। তাইই করব।

অনিরুদ্ধ ওয়াশরুমে ঢুকলেন। আজ অনিরুদ্ধ আর অনীক দুজনে মিলে সিমলা শহর ঘুরে বেড়াবে এমনই প্ল্যান রয়েছে। জাকু টেম্পল, কালীবাড়ি, মিউজিয়াম এবং ইন্সটিটিউট ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজে ঘোরার ইচ্ছা। তবে আজ সকাল থেকেই বাইরের আবহাওয়া মেঘলা। মাঝে মাঝে ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও হচ্ছে। অনীক টিভি চালাল। কিছুক্ষণ চ্যানেল সার্ফ করল। তারপর বন্ধ করে দিয়ে ব্যাগের ভেতর থেকে সেই মোবাইলটা বার করল। নি-র কথাগুলো কানে বাজছে। অলৌকিক মানেই তা অসত্য নয়। নিজেও বিড়বিড় করে বলল কথাটা। ফোনটা আবার ব্যাগের ভেতর রেখে দিয়ে অনীক ভাবল এবার কী করা উচিত? চেস্টারের কথা মনে এল ওর। লিংকিন পার্ক ব্যান্ডের সিঙ্গার চেস্টার বেনিংটন। ওর গান শুনলে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে, নিজের সঙ্গে মেলাতে পারে। হেভি, টকিং টু মাইসেলফ গানগুলো অনীকের সর্বক্ষণের বন্ধু। গত দুই বছরে চেস্টারের গান শুনতে শুনতে গানের প্রতিটা অক্ষরকে ও আলাদাভাবে বুঝতে পারে, চেস্টারের ভেতরের যন্ত্রণাটাকে অনুভব করতে পারে।

অনিরুদ্ধ চেস্টারের এই গানদুটো পছন্দ করলেও অনীককে খুব বেশি শুনতে বারণ করেন। একটা সময় চেস্টারের গান অনীকের সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। সেই অসহ্য যন্ত্রণার সময়টায় চেস্টার যেন অনীকের কাছে বন্ধুর মতো পাশে বসত। নিজের যন্ত্রণা, নিজের কষ্টের কথা বলে অনীকের বেদনা লাঘবের চেষ্টা করত। বলত, এই পৃথিবীতে তুমি শুধু একা নও অনীক। আমিও অল্প বয়স থেকে অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে গেছি। যে যন্ত্রণার পাথরকে বহন করার ক্ষমতা ছিল না—জীবন আমাকে দিয়ে সেই ভারও বইয়েছে। অনীকের এক এক সময় মনে হত বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটা নিঃশ্বাসও যেন কষ্টকর। চেস্টার যেভাবে গাইতেন—

I don't like my mind right now
Stacking up problems that are so unnecessary
Wish that I could slow things down
I wanna let go, but there's comfort in the panic
And I drive myself crazy
Thinking everything's about me
Yeah, I drive myself crazy
'Cause I can't escape the gravity
I'm holding on
Why is everything so heavy?
Holding on
To so much more than I can carry
I keep dragging around what's bringing me down
If I just let go, I'd be set free
Holding on
Why is everything so heavy?

সেই চূড়ান্ত একা হয়ে যাওয়ার মুহূর্তগুলোতে গুলজার এবং চেস্টারকে একমাত্র বন্ধু মনে হত অনীকের। ক্লাস সেভেনের একটি ছাত্রকে সবে বয়ঃসন্ধির সন্ধিক্ষণে দাঁড়ানো কিশোর মনের ভেতরের আঘাতে এই দুটি মানুষ অনেকটা আশ্রয় দিয়েছিলেন। মা কিংবা বাবা কেউই গানের ভক্ত ছিল না, ইনফ্যাক্ট ওদের দুজনের শুধু ডেবিট আর ক্রেডিট ছাড়া অন্য কোনো শখ ছিল না। সকালে বেরিয়ে যেত দুজনে। ফিরত রাত। কোনোদিনই বাবা আর মা একসঙ্গে ফিরত না। এক এক সময় ট্যুর থাকত। কখনো বাবার কখনো মায়ের। তখন তিন-চারদিন বাড়ি থাকত না। ওদের দুজনেরই রবিবার ছুটি থাকত। কিন্তু অনীকের মনে পড়ে না কটা ছুটির দিন ওরা তিনজনে আনন্দে কাটিয়েছে। রবিবার বাড়িটাই অফিস হয়ে উঠত। দাদুর সঙ্গে সপ্তাহের ছয়দিন যেমন কাটাত, রবিবারটাও প্রায় সেইভাবেই কাটত। কিন্তু অনীকের তখনো বাবা-মায়ের সঙ্গ পাবার অভাববোধটা মরে যায়নি। ও চাইত বাবা-মা ওকে ছুটির দিনে অন্তত ভালোবাসুক। ওর কথা শুনুক, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাক। অনিরুদ্ধ বুঝেছিলেন এই ছেলেকে একাই বড়ো হতে হবে। বাবা-মায়ের বন্ধুত্ব, স্নেহ, ভালোবাসা এর কপালে নেই। তাই অনীক যেন বন্ধুহীন একাকিত্বে না ভোগে সেইজন্য মিউজিকের নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন অল্প বয়স হতেই। ইংলিশ মিডিয়মে পড়াশোনা করার সুবাদে ইংরেজি গানের প্রতি দ্রুত আকর্ষিত হয়েছিল অনীক। মেধা এবং তার সঙ্গে অতি অনুভবী একটা মন এই দুয়ের মিলনে অনীক ওর বয়সের তুলনায় বেশিই ম্যাচিওর ছিল, আর অনিরুদ্ধর গাইডেন্স ওকে আরও পরিণত করে তুলেছিল। সংগীত সত্যিই অনীককে বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

টেবিলের ওপর রাখা ইয়ারফোনটা মোবাইলে গুঁজে চেস্টারের টকিং টু মাইসেলফ গানটা চালাল অনীক। এই গানটা চেস্টার সুইসাইড করার কয়েক ঘণ্টা আগে আপলোড করেছিলেন ইউটিউবে। অন্তত সহস্রবার শোনা গানটাকে আবার শুনতে থাকল অনীক।

Tell me what I've gotta do
There's no getting through to you
The lights are on but nobody's home
(nobody's home)

You say I can't understand
But you're not giving me a chance
When you leave me, where do you go?
(Where do you go?)
All the walls that you keep building
All this time that I spent chasing
All the ways that I keep losing you
The truth is, you turn into someone else
You keep running like the sky is falling
I can whisper, I can yell
But I know, yeah I know, yeah I know
I'm just talking to myself
Talking to myself
Talking to myself
But I know, yeah I know, yeah I know
I'm just talking to myself...

এই গানটার মধ্যে অনীক নিজের না বলতে পারা কথাগুলো, না প্রকাশ করতে পারা ব্যথাগুলোকে খুঁজে পায়। একচল্লিশ বছর বয়সে খ্যাতির শিখরে থাকা চেস্টার কাউকে সামান্য কিছু বুঝতে না দিয়ে এই গান ইউটিউবে আপলোড করার পর নিজের ঘরে ঢুকে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহনন করেন। কোনো মানুষ যে কী যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছে তা একমাত্র সে-ই জানে। গানটা শুনতে শুনতে প্রতিবারের মতো অল্প মাথা দোলাচ্ছিল অনীক। সকালে এই গান না শুনলেই ভালো হত, নি হয়তো বুঝতে পারলে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে অসন্তুষ্ট হবে। গানটা শোনার পর কান থেকে ইয়ারফোন খুলে নিল অনীক। গুনগুন করতে থাকল টকিং টু মাইসেলফ। আজ কি মায়ের ফোন আসবে? একবার অন্তত আসুক। কয়েকটা কথা মাকে জিজ্ঞাসা করার আছে।

সারাদিন ধরে অনেক ঘোরা হল আজ। প্রথমে হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে কালীবাড়ি যাওয়া। সেখান থেকে মিউজিয়াম। মিউজিয়াম দেখে ইন্সটিটিউট ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজ। এদিকের রাস্তাটা যেমন নির্জন তেমনই সুন্দর। বহু পুরোনো কিন্তু ঝকঝকে ব্রিটিশ আমলের অফিস বিল্ডিং পেরোনোর পরে বিশাল লম্বা পাইন, ঝাউয়ের সারি। চওড়া, কালো পিচের রাস্তা সোজা ওপরে উঠে গেছে। ওবেরয় হোটেলটা এইদিকেই। এখানেই গুলজারজি রয়েছেন। অবশ্য আজ তিনি ছিলেন না। গতকাল প্রোগ্রাম শেষ করে রাতের ফ্লাইটেই ফিরে গিয়েছেন। মিউজিয়ামটা ছিল ভারী সুন্দর একটা জায়গায়। সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। খুব পরিপাটি, কিন্তু দর্শক প্রায় নেই বললেই চলে। ওখানে ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়ে সেখান থেকে অ্যাডভান্স স্টাডিজ-এর বিল্ডিং। সেও এক দেখবার মতো জায়গা বটে। ওখানে প্রচুর দর্শক ছিল। প্রায় দুশো বছরের পুরোনো প্রাসাদোপম বিল্ডিং। টিকিটের লম্বা লাইন ছিল, গাইড নিয়ে ঘুরতে হল। দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। কোথা থেকে যে সময় পেরিয়ে গেল টেরই পাওয়া গেল না। স্বাধীনতার সময়কার অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে এই শতাব্দীপ্রাচীন প্রাসাদে। পুরো পরিবেশটা এতই সুন্দর যে মনের ভেতরের অনেক অন্ধকার মুছে যায়। অনিরুদ্ধ এবং অনীক দুজনেই খুশি হয়ে উঠেছিলে, গল্প করছিল। বহুকাল পর প্রাণখোলা গল্প। বিল্ডিং-এর বাইরে একটা ক্যাফেটেরিয়া রয়েছে। সেখানে অপূর্ব সুস্বাদু প্যাটিস এবং কফি খাওয়া হল, তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে আবার সোজা জাকুর দিকে। তার আগে একটা রেস্তোরাঁয় বসে দুজনে লাঞ্চ সেরে নিলেন। পুরো রাস্তাটা একই ট্যাক্সিতে যাওয়া গেল না। নিয়ম নেই। জাকু যেতে গেলে সেখানে আলাদা ট্যাক্সি নিতে হয়। অথবা রোপওয়ে। কিন্তু রোপওয়ের চার্জ বড্ড বেশি। আর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তাই শেয়ারে গাড়িই ভাড়া নেওয়া হল। উফ সেও এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। পুরো খাড়াই রাস্তা দিয়ে গোঁওও শব্দ করে মোটরভ্যান উঠছে তো উঠছেই। তারপর অবশেষে পৌঁছনো জাকুতে। আকাশ-ছোঁয়া এক হনুমানজির মূর্তি পাহাড়ের চুড়োয়। মূর্তিটি ম্যাল থেকেও দেখা যায়। বহু প্রাচীন মন্দির রয়েছে এখানে। অনেক ভক্ত এসেছেন। মন্দিরে প্রবেশের জন্য অনেক ধাপ সিঁড়ি উঠতে হল। তারপর মূল মন্দির। মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করলেই বোঝা যায় কত বছরের পুরোনো। আলো আবছা মন্দিরের গায়ে পুরোনো পেইন্টিং হনুমানজির জীবনের নানা লীলার। মন্দির দেখে তারপর কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে দেখল দুজনে। খুব সুন্দর বাগান রয়েছে। বিকেল নেমে আসছিল। নীচে গোটা সিমলা শহর। সারাদিনের পরিশ্রমের একটা ক্লান্তিও ছিল। তাই সন্ধের আগেই আবার বাড়ি ফেরার পালা। ফেরার পথে আবার একটি দোকানে গিয়ে বসে আয়েশ করে চা খাওয়া। অনিরুদ্ধ আর অনীক দুজনেই বুঝতে পারছিল আজকের এই অকারণ ঘুরে বেড়ানোটা অদ্ভুত একটা আরাম দিয়েছে। বহুদিন পর ওরা দুজনে একে অপরের সঙ্গে মনের সুখে গল্প করেছে, হেসেছে। পাহাড়ি জায়গায় বেড়ানোর একটা মজা হল চড়াই-উতরাইয়ের জন্য এখানে হাঁটাহাঁটি করা খুবই শ্রমসাধ্য, মনে হয় বুকের সব দম বুঝি বেরিয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেই ফের চাঙ্গা। হোটেলে ঢোকার মুখে দেখা হল বিতানের সঙ্গে। দীপালি ছিল না। বিতান বলল, দীপালি একটু আগে বেরিয়ে গেছে। ওর আজ রাতে ফ্লাইট। অবশ্য বিতান যাবে আগামীকাল। বিতানের মুখটা শুকনো। খুব বেশি কথা বলল না।

রিসেপশন থেকে চাবি নেওয়ার সময়ে রিসেপশনিস্ট জানালেন পরিষদ থেকে একটা মেসেজ রয়েছে, আগামীকাল সকাল আটটার সময় এয়ারপোর্টের জন্য গাড়ি ছাড়বে। এবার ডায়রেক্ট ফ্লাইট নেই। বেলা দেড়টায় চণ্ডীগড় থেকে ফ্লাইট নিউ দিল্লি, সেখান থেকে কলকাতা।

সারাদিনে কয়েকবার মায়ের ফোনের কথা আলতো মনে পড়লেও রুমের চার দেওয়ালের ভেতর ঢোকামাত্র সেই ভাবনাটা যেন মাথার ওপর সিলিং থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আজ একবারও ফোন আসেনি। যদিও আগের দুইবারই ফোন এসেছিল অনীক যখন একা ছিল ঠিক তখনই। আজ অনীক একা হয়নি, সত্যি বলতে নি-কে

ছেড়ে একা হতে ইচ্ছেও করেনি। নি ওর প্রিয় বন্ধু; এখানে আসার পর সেটা আবারও যেন আবিষ্কার করেছে ও। মা আর ফোন করবে না?

রাত ন-টা নাগাদ ডিনার টেবিলে রোজের মতো অনেক কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গেই দেখা হল। অনীকের সঙ্গেও কয়েকজনের পরিচয় হয়েছে। প্রতুল বাগচী অনিরুদ্ধর অনেকদিনের বন্ধু। প্রখ্যাত সাহিত্যিক। তিনি অনিরুদ্ধকে বললেন, আজ ডিনারের পর আমরা এই হোটেলে যে পার্টিসিপেন্টরা রয়েছি একটা গেট টুগেদার করছি, তুমিও চলে এসো। বলে অনিরুদ্ধর কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বললেন, এখানে ডিনার খুব সামান্য করো, ওখানে পানাহারের ব্যবস্থা হয়েছে। লেটস ব্যাক টু লাইফ অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধ গত দুই বছরে মদ্যপান আর প্রায় করেনই না। আগেও যে প্রত্যহ পান করতেন তা নয়, কিন্তু অনীকের জন্যই গত দুই বছরে একদিনও বাড়িতে পান করেন না। কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি। ছোটোরা যা দেখে তাই-ই শেখে।

অনীকের দিকে তাকালেন তিনি। বুঝে গেলেন অনীক চায় অনিরুদ্ধ ওই আড্ডায় যাক। প্রতুলকে বললেন, বেশ তাহলে আসছি।

হ্যাঁ আমরা সিনিয়র-জুনিয়র মিলে আজ মোট নয়জন আছি এখানে। শেষদিন একটু আড্ডা হোক জমিয়ে। তোমাকে তো এই ক-দিন দেখতেই পেলাম না। অবশ্য ভালোই করেছ, পিতামহ এবং পৌত্রের এই চমৎকার জুটি থাকলে তার মজাই আলাদা। এনজয়! তাহলে চলে এসো। থার্ডফ্লোরে একটা স্পেস রয়েছে। ওখানেই সকলে মিট করছি আমরা।

অনীক এবং অনিরুদ্ধ দুজনেই এই ধরনের কথাগুলোর ভেতরে যে একটা প্রচ্ছন্ন সান্ত্বনা থাকে তা স্পষ্ট বুঝতে পারে। অবশ্য সান্ত্বনা দেওয়া কোনো অন্যায়ের মধ্যে পড়ে না। সমব্যথী মানুষ তো সান্ত্বনাই দেবে। প্রথমে এই ধরনের কথাগুলোতে অস্বস্তি হত। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।

ডিনার সেরে রুমে ফেরার পর অনিরুদ্ধ তাঁর লেখার ডায়েরিটি বার করে অনীককে বললেন, একা তোমার কোনো অসুবিধা হবে না তো?

একেবারেই হবে না নি। তুমি যাও। নাউ গো ব্যাক টু ইয়োর ওন স্কিয়ার। ইউ হ্যাভ মেড মি ম্যাচিওরড এনাফ।

অনীকের মুখে এমন কথা শুনে হাসলেন অনিরুদ্ধ। বললেন, ওক্কে স্যর। যদি বেশি রাত হয় তাহলে তোমাকে জেগে থাকতে হবে না। দরজাটা জাস্ট ভেজিয়ে রেখো, ছিটকিনি দিও না। এখানে কোনো অসুবিধা নেই।

আচ্ছা।

অনিরুদ্ধ রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ভালো লাগছে এই ভেবে যে—অনীক আজ প্রথম নিজে থেকে অনিরুদ্ধকে নিজের জগতে ফেরার কথা বলল। অর্থ্যাৎ ওর ভেতরে কনফিডেন্স ফিরে আসছে। অনিরুদ্ধও স্থির করলেন এবার তাহলে খুব অল্প অল্প করে অনীককে নিজের মতো ছাড়তে হবে।

অনিরুদ্ধ ঘর ছাড়া মাত্র অনীক প্রায় এক লাফ দিয়ে আগে দরজাটা লক করল তারপর ওর ব্যাগ থেকে সেই ফোনটা বার করল। পুরোপুরি ডেডফোন। ওটাকে মুঠোয় ধরে বিছানায় বসল। কী করা যায় এখন? আজ ও নিজের মোবাইলে বেশ কিছু ফটো তুলেছিল, সেই ছবিগুলো দেখল, তারপর একবার টিভি চালাল। টিভি দেখতে মোটে ভালো লাগে না। কিছুক্ষণ সার্ফিং করে বন্ধ করে দিল। তারপর ভাবল গান শোনা যাক। আজ গুলজার নয়, শাহ আবদুল করিমের গান শুনতে ইচ্ছে করছে। ইউটিউবে ওর একটা প্রিয় গান মোবাইলে চালাল অনীক।

দেখা দাও না কাছে নেও না
আর কত থাকি দূরে? মুর্শিদ ধন হে,
কেমনে চিনিব তোমারে?
মায়াজালে বন্দি হয়ে আর কতকাল থাকিব
মনে ভাবি সব ছাড়িয়া তোমারে খুঁজে নেব
আশা রাখি আলো পাব, ডুবে যাই অন্ধকারে
কেমনে চিনিব তোমারে?
দেখা দাও না কাছে নেও না
আর কত থাকি দূরে?
মুর্শিদ ধন হে,
কেমনে চিনিব তোমারে?

গানটা শুনলে বুকের ভেতরটা এক অজানা কারণে হু হু করে ওঠে। অনীকের এক এক সময় মনে হয় ও বড়ো হয়ে একজন বাউল দরবেশ হবে। কোনো চাকরি, বিজনেস কিচ্ছু করবে না। এসব খুব খুব খুউউব খারাপ। মানুষকে নষ্ট করে দেয়। বাউল হলে নি নিশ্চয়ই রাগ করবে না।

তন্ত্র-মন্ত্র পড়ে দেখি তার ভিতরে তুমি নাই
শাস্ত্র-গ্রন্থ পড়ি যত আরও দূরে সরে যাই
কোন সাগরে খেলতেছ লাই ভাবতেছি তাই অন্তরে
কেমনে চিনিব তোমারে?...

গান শোনার মাঝে এইসব ভাবনার পাশাপাশি বারবার সেই ফোনটাকেও হাতে নিয়ে দেখছিল অনীক। একটা চাপা অস্বস্তি, দোলাচল। একবার মনে হচ্ছে আর কল না এলেই ভালো। পরক্ষণেই মনে হচ্ছে, আর একবার অন্তত....ওর মন বলছিল কাল এই পাহাড় ছেড়ে চলে যাওয়ার পর এই মোবাইলে আর কোনো কল আসবে না। কিন্তু কিছু কথা মাকে বলার ছিল, আর...আর একবার মায়ের কথা শোনার জন্য...

গান শুনতে শুনতে, ভাবতে ভাবতে অনেকটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর একসময় ঘুম পেল অনীকের। সহসাই সেই ফোন বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের রেশ কেটে গিয়ে বুকের ভেতরটা ছলাৎ করে উঠল।

মা!

হ্যাঁ রে বাবু। মা।

মায়ের গলাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা আবারও নরম হয়ে গেল অনীকের। যে কথাগুলো বলবে বলে ভেবে রেখেছিল সব কেমন যেন গুলিয়ে গেল।

আজ তুই আর তো নি মিলে অনেক ঘুরলি বল?

হুঁ। তুমি দেখেছ!

হ্যাঁ রে আমি তো তোকে সবসময়েই দেখি।

কিন্তু আমি তোমায় দেখতে পাই না। কেন দেখতে পাই না মা?

অনীকের এই প্রশ্নের কোনো উত্তর এল না।

দুজনেই চুপ।

মা।

বল সোনা।

তুমি আমাকে ভালোবাস?

খুব বাসি রে সোনা...খুব।

আর বাবা?

তোর বাবা...হ্যাঁ বাবা তোকে অন্তত খুব ভালোবাসে। সে জগতে একমাত্র আমাকে ছাড়া আর সকলকে ভালোবাসে। তবে তোকে সবথেকে বেশি।

তাহলে তোমরা দুজনে আমাকে ছেড়ে চলে গেলে কেন মা?

তখন বুঝতে পারিনি রে বাবু, এখন আমার খুব কষ্ট হয়...খুব কষ্ট পাই তোর জন্য।

তাহলে এতদিন কেন আমার সঙ্গে কথা বলোনি তুমি?

আবার কোনো উত্তর পেল না অনীক।

মা...

বল সোনা।

তোমরা কেন এমন করলে?

আমাকে ক্ষমা করে দে বাবু।

আমার খুব কষ্ট হয় মা। নি-ও খুব কষ্ট পায়।

আর কষ্ট পাস না। বিশ্বাস কর বাবু আমি কিন্তু একসময়ে সত্যিই একজন ভালো মা হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু...আমি পারিনি রে। আমি হেরে গেছি। শুধু মা হিসেবে নয়, আমি সবকিছুতেই হেরে গেছি। আসলে আমি আর তোর বাবা বড়ো বেশি জিততে চেয়েছিলাম। তাই পুরো হেরে গেছি।

অনীক ভেতরে আজ অনেক অভিযোগ, অনেক রাগ জমিয়ে রেখেছিল, ভেবে রেখেছিল মায়ের যদি ফোন আসে তাহলে এই কথাগুলো ও আজ বলবে। কিন্তু মায়ের গলাটা...এত নরম সেই গলাটা, শোনামাত্র প্রায় হারিয়ে ফেলা মায়ের গায়ের গন্ধটা পেল আর সব যেন অবশ হয়ে গেল। ওর খুব ইচ্ছে হল সেই ছোটোবেলার মতো একবার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরতে। মায়ের হাতের আঙুলগুলো নিয়ে খেলতে।

আমি তোর খারাপ মা, খুব খারাপ মা, আমাকে ক্ষমা করিস বাবু।

মায়ের এমন বারংবার ক্ষমা চাওয়া শুনে আচমকাই দমকা হাওয়ার মতো কান্না এল অনীকের। সমস্ত বাঁধ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়ে দু-চোখ ঝেঁপে কান্না এল। অস্ফুটে মা...মা বলতে বলতে শিশুর মতো কাঁদতে থাকল।

তুই কাঁদিস না সোনাবাবা আমার। আয় আমার কাছে আয়...

আমি তোমার কাছে যাব মা। আমি বাবার কাছে যাব।

হ্যাঁ বাবু তুই আয় আমার কাছে। আমি আর বাবা তোকে ছেড়ে থাকতে পারছি না।

কথা বলতে বলতে, কাঁদতে কাঁদতেই কী এক ঘোরের মধ্যে অনীক ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকল ফোর্থফ্লোরের দিকে।

*   *   *

বহু বহু যুগ পর যেন আবার সেই ভুলে যাওয়া চেনা জগতটাকে ফিরে পেলেন অনিরুদ্ধ। সেই জমিয়ে সাহিত্যপাঠ, আড্ডা। পানভোজন। মনের ভেতরটা ভরে উঠছিল। আজ মন বড়ো খুশি। এই সংসারে তাঁর সবথেকে প্রিয়, বেঁচে থাকার ইচ্ছের একমাত্র কারণ অনীক আজ খুশি ছিল। বহু বহুদিন পরে ওকে আবার হাসতে দেখেছেন তিনি, সহজ হতে দেখেছেন, নিজে থেকে কথা বলতে দেখেছেন। যে পাহাড় একদিন অনীকের এবং অনিরুদ্ধর সবকিছু কেড়ে নিয়েছিল সেই পাহাড়ের কাছেই এসে অনীক আবার নিজের হারিয়ে ফেলা জীবনকে কিছুটা ফিরে পেয়েছে। অন্তত তার ইঙ্গিত কিছুটা পেয়েছেন অনিরুদ্ধ। আর তিনি নিজেও আজ তাঁর থেকে বয়েসে প্রায় ছাপ্পান্ন বছরের ছোটো বন্ধুর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে মনের ভেতরে জমে ওঠা অনেক পাথরকে যেন ফেলে দিতে পেরেছেন। সেই আনন্দটুকুই সেলিব্রেট করার জন্য তিনি এসেছিলেন এই শেষ রাতের গেট টুগেদারে। বাঙালি দু-তিনজন তো ছিলেনই, বিভিন্ন ভাষার কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে অনেক গল্প। এই গল্পেই তো প্রকৃত প্রাণের আরাম। আজ তিন পেগ পানও করেছেন তিনি। এতদিন অনভ্যাসের পর তিনটে পেগ একটু বেশিই হয়ে গেছে। অনিরুদ্ধকে যখন তাঁর কবিতা পড়ার জন্য অনুরোধ করলেন প্রতুল, তখন নিজের ডায়েরিটি খুলে চমকে গেলেন অনিরুদ্ধ। তাঁর লেখার ডায়েরির ফাঁকে সেই নীল খামটি গোঁজা। নিজেই রেখেছিলেন। খামের ভেতর কি আর কোনো চিঠি রয়েছে অনির? থাকবে। থাকবেই। থাকারই কথা। নিজের লেখা কবিতার কয়েকটি ট্রান্সলেশন পড়লেন অনিরুদ্ধ। তাঁর কবিতা শুনে সকলেই সাধু সাধু বলে উঠলেন। আজকের আসরে বিতানও রয়েছে।

প্রতুল বললেন, অনিরুদ্ধ আমি খুব খুশি যে এত বড়ো একটা আঘাতকে তুমি সামলে উঠছ, এবং তোমার নাতিকে যেভাবে তুমি আগলে রাখছ ভাই, হ্যাটস অফ।

অনিরুদ্ধর ভালো লাগছিল না এই কথা শুনতে। হাত তুলে প্রতুলকে থামতে বললেন। খামটা দেখার পর থেকেই তাঁর মনের ভেতরে একটা অস্থিরতা কাজ করতে শুরু করেছিল। নিজের পাঠের পর সেই খাম সামান্য ফাঁক করে দেখতে পেলেন একটা কাগজ ভাঁজ করে ভেতরে রাখা। নতুন চিঠি। অনির লেখা চিঠি। পড়ার জন্য ছটফট করছে মন। যখন পাঞ্জাবি কবি সুখবিন্দর শেখাওয়াতকে কবিতা পড়ার জন্য অনুরোধ জানানো হল তখন অনিরুদ্ধ বললেন, আমি দশ মিনিটের জন্য একটু বাইরে থেকে আসছি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই পৃথিবী টলে গেল। মাথা ভার। বিতানের হাতেও গ্লাস। সে অনিরুদ্ধকে বেসামাল হতে দেখে বলল—স্যর, আমি কি আপনার সঙ্গে যাব?

না, না, আয়্যাম অ্যাবসল্যুটলি ফাইন। নিড নট এনিবডি'জ হেল্প।

আচ্ছা স্যর। টেক কেয়ার।

অনিরুদ্ধ সাবধানে পা ফেলে হাতে ডায়েরিটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। অনেক রাত হয়েছে। লবি ফাঁকা। সোফা পাতা রয়েছে। সোফায় বসে খাম থেকে চিঠিটা বার করলেন অনিরুদ্ধ। ছোটো চিঠি।

আমার প্রিয় বাবা,

কাল তুমি আর তোমার নিক ফিরে যাবে। তোমাদের দুজনকে আজ আমি সারাদিন ধরে দেখেছি জানো। তোমরা আজ খুব আনন্দে কাটিয়েছ। জানো বাবা, আজ তোমাদের দেখে আমারও খুব ইচ্ছে করছিল আমিও তোমাদের সঙ্গে যোগ দিই। এখন আমি বুঝতে পারি নিজের বানানো স্বপ্নের কঠিন পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে গিয়ে আমি জীবনের সহজ রাস্তাতেই কখনো হাঁটিনি। সবটুকু নষ্ট করেছি। বাবা, আমি কেন যে তোমার মতো হলাম না? কবি-সাহিত্যিক হওয়ার কথা বলছি না, ওটা তোমার প্রতিভা। আমি বলতে চাইছি, তোমার মতো জীবন, অথচ তোমার এত কাছেই তো ছিলাম। তোমার কাছেই তো বড়ো হয়েছি। আমি পারলাম না, অথচ দেখো আমার ছেলে কী সুন্দর তোমার মতো হয়ে উঠছে। দাঁত-নখ বার করে আঁচড়ে, কামড়ে আদায় করতে গিয়ে নিজেকেই ক্ষতবিক্ষত করে গেলাম আজীবন। আমি শুধু তোমার কাছে আজ একটা কথা জানাতে চাই বাবা, যে কথা কেউ জানে না, আমার সঙ্গে কোয়েলের সংঘাত ছিল। প্রতি মুহূর্তে ছিল, কিন্তু এমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা কেউ কখনো ভাবিনি জানো? আমরা এক ছাদের নীচে থেকেও আলাদা জীবনে বাঁচতাম, আমাদের আলাদা পৃথিবী ছিল আর তার মাঝে ছিল আমাদের ছেলে। ও-ই সরু সুতোটা আমাদের বেঁধে রেখেছিল। কোয়েল শেষে যে কোম্পানিতে চাকরি পেল আমি সেই গ্রুপেরই আরেকটি ইউনিটে ছিলাম। আমাদের ম্যানেজমেন্ট এক হলেও আমাদের অফিস আলাদা ছিল। কোয়েল কোম্পানিতে জয়েন করে যথারীতি আবারও হু হু করে উঠছিল। আমি কাউকে বলতাম না যে কোয়েল মিত্র আমার স্ত্রী। সেবছর আমাদের গ্রুপ অনেক প্রফিট করল। আমার স্যালারি বাড়ল কিন্তু কোয়েল হয়ে গেল সেই কোম্পানির অ্যাসিস্টেন্ট ভি পি। এদিকে আমি সেই চিফ কমার্শিয়াল অফিসার। রাগ হত, ভাবতাম, কোনোভাবেই একে আটকানো গেল না। এক এক সময় অনীকের ওপরেও রাগ হত। আমি কী নীচ তাই না বাবা! ঈর্ষার কাদায় মাখামাখি একটা লোক। আমাদের গ্রুপ তার সিনিয়ার অফিসিয়ালদের ট্রিট হিসেবে তিনদিনের জন্য কালিম্পং পাঠাল প্লেজারট্রিপে। আমিও গেলাম, কোয়েলও গেল। অনীক রইল তোমার কাছে। ওখানে অবশেষে সকলে জেনেই গেল সদ্য প্রোমোটেড অ্যাসিস্ট্যান্ট ভি পি কোয়েল মিত্র আমার স্ত্রী। সকলে আমাকেও কংগ্র্যাচুলেট করতে থাকল আর প্রতিটা কংগ্র্যাচুলেশন আমার মনে হচ্ছিল আমাকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে, আমার চোখে আঙুল দিয়ে আমার অক্ষমতাকে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি কোনোভাবেই যে কোয়েলকে আটকাতে পারিনি সেই হার সকলে বুঝে যাচ্ছে। আসলে অক্ষমের ঈর্ষা এমনই হয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে এখন ভাবি, তখন যেটাকে নিজের অক্ষমতা ভাবতাম, সেটা আসলে কিছুই না, জাস্ট কিস্যু না। পাত্তা না দিলেও হত। মস্ত হোটেলে আমরা ছিলাম। কিন্তু আলাদা রুমে। সেটা নিয়েও নিশ্চয়ই কথা উঠেছিল, আমার আসলে সবকিছুতেই কেমন যেন সন্দেহ হত, কিছুই ভালো লাগত না। ফিরে আসার আগের রাতে গ্র্যান্ড পার্টি হল। ককটেল পার্টি। আমি সেদিন অনেক পান করলাম। কোয়েলও। আমার পা টলমল করছিল। একসময় আমার মনে হল কিছু কথা কোয়েলকে বলা দরকার। ওকে ডাকলাম আমি। বললাম, তোমার সঙ্গে কিছু কথা রয়েছে। ও বলল, কী কথা?

বাইরে চলো বলছি।

এখন রাতে বাইরে কেন যাব? এখানেই বলো।

না এখানে নয়, বলে আমি ওর হাত ধরে টানলাম। কোয়েল বলল, কী হচ্ছে অনি!

আমি যেন ফুঁসে উঠলাম। বললাম, কেন, অসুবিধা কী? তুমি কোম্পানির এ ভি পি হতে পারো কিন্তু তুমি এখনও আমার স্ত্রী। তোমার হাত ধরতে পারি না? নাকি সিনিয়র বলে আমার আর হাত ধরার অধিকার নেই!

আমি হয়তো আরও সিন ক্রিয়েট করতে পারি ভেবে কোয়েল আমার সঙ্গে হোটেলের ব্যাংকোয়েট ছেড়ে বেরিয়ে এল। তখন অনেক রাত হয়েছে। বাইরে যথেষ্ট ঠান্ডা। আমি কোয়েলকে নিয়ে কোথায় যেতে চাইছি, কী বলতে চাই নিজেও জানি না, শুধু একটা আলগা অধিকার বোধ দেখানোর জন্যই ওকে ব্যাংকোয়েট থেকে বার করে নিয়ে এলাম, ভাবখানা এই যে দেখো তোমরা সকলে, তোমাদের এ ভি পি আমার এক কথায় কেমন পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। হাঃ! মানুষের ইগোর থেকে ইডিয়ট জগতে আর কিছু নেই। রাস্তায় বেরিয়ে কোয়েল আমাকে ঝাঁঝিয়ে উঠল, অনেক হয়েছে অনি। তুমি বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছ।

আমিও বললাম, ইয়েস করছি বাড়াবাড়ি। সো?

কী বলতে চাইছ বলো?

বলছি...বলছি।

না এখনই বলো।

আচ্ছা বেশ, ওই রেলিংটার সামনে চলো। বলছি।

হোটেল থেকে সামান্য এগোলেই একটা রেলিং-ঘেরা ভিউ পয়েন্ট ছিল, ঠিক তোমাদের হোটেলের সামনে যেমন রয়েছে। নীচে অতল খাদ। আমরা দুজনে রেলিঙের সামনে দাঁড়ালাম। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। জানো বাবা...ওই খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আমার আচমকাই মনে হল আমার উচিত কোয়েলকে সরি বলা। কেন এমন মনে হল আমি জানি না। নেশার ঘোরে, নাকি বিবেকের কামড় আচমকা জেগে উঠেছিল...আমি কোয়েলকে বললাম, তোমাকে একটা কথা বলতে চাইছি আমি।

কোয়েল ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, দয়া করে সেটা বলে আমাকে ছাড়ো। তোমার এই ন্যাকামো, এই শয়তানি আমি সব বুঝি।

ব্যস মুহূর্তে আমার মাথা আবার গরম হয়ে গেল। আসলে আমি একেবারেই নিয়ন্ত্রণে ছিলাম না। চিৎকার করে বলে উঠলাম, শাট আপ!

কোয়েলও সেদিন পালটা গর্জে উঠল। আমাকে বলল, ইউ শাট আপ। তুমি বেসিকালি গুড ফর নাথিং। আমার কেরিয়ারটাও নষ্ট করতে চেয়েছিলে। সব বুঝি আমি। সব জানি।

বাবা জানো, স্বেচ্ছায় নিজের মুখে দোষ স্বীকার করা একরকম, কিন্তু তোমার অন্যায় যদি কেউ বুঝতে পেরে যায় তখন মানুষ আরেকরকম। আমি আগের মুহূর্তেই নিজের অন্যায়ে কোয়েলের কাছে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু যখনই ও আমাকে নেকেড করে দিল, আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। বাবা বিশ্বাস করো আমি চাইনি...আমি সত্যিই চাইনি। কোয়েলকে সপাটে চড় মেরেছিলাম। ও যখন পালটা আমার গালেও চড় মারল তখন গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি ওকে ধাক্কা দিলাম। আমার সেই মুহূর্তে সত্যি বলছি খেয়াল ছিল না, আমরা দুজন একটা খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আছি। রেলিংটা কোমরের মাপে হাইট ছিল। আমি তোমাকে বলছি বাবা, কোয়েল যদি সেদিন ড্রাঙ্ক না থাকত তাহলে ও ইজিলি রেলিং ধরে ফেলতে পারত...তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না বাবা? সেকেন্ডের মধ্যে যখন দেখলাম কোয়েল আমার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল, আমার মনে হল পৃথিবীতে আমিই শেষতম মানুষ। আমি বুঝতে পারছিলাম না আমি কী করলাম? আমি রেলিংটা ধরে একবার ঝুঁকে দেখলাম তারপরেই পিছন ফিরে দেখলাম রাস্তায় একটা লোক, সম্ভবত কোনো স্থানীয় শ্রমিক, আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে। ওর চোখদুটোতে যে আতঙ্ক, যে ভয় আর...আর আমার প্রতি ক্রোধ মেশানো ঘৃণা আমি তখন দেখতে পেলাম, আমি শুধু ওই অচেনা লোকটাকে, ওই পথচলতি অতি সামান্য মানুষটাকে যার হাতে একশোটা টাকা গুঁজে দিলেই সে চুপচাপ হয়তো চলে যেত, আমি ওই লোকটাকে স্রেফ কী বলব বুঝতে না পেরে, হ্যাঁ বাবা ওই অচেনা লোকটার চোখে যে আমার প্রতি, যে অকৃত্রিম ঘৃণা দেখতে পেয়েছিলাম তা আমার সহ্য হল না। শুধু ওইজন্যই আমি রেলিং টপকে নিজেকেও ভাসিয়ে দিলাম। জানো বাবা সেই লোকটা কিন্তু বুঝতে পেরেছিল আমিও ঝাঁপ দিতে চলেছি, কিন্তু সে আমাকে বাঁচাতে আসেনি, আমাকে বারণ করেনি। যেন অপেক্ষা করছিল আমিও কখন ঝাঁপ দিই। লোকটা কে? কেন অত রাতে একা এসে ওইভাবে দাঁড়িয়েছিল আমি জানি না।

অনিরুদ্ধর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। বুকের ভেতরে ভয়ংকরভাবে দাপাদাপি চলছিল। আহ্ অনি...কেন করলি তুই অনি...এমন কেন করলি!

আমার খুব কষ্ট হয় বাবা। আমার খুব ইচ্ছে করে সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে থাকি। আমি কী ভীষণ একা... আমি আর পারছি না বিশ্বাস করো...আমার হাতটা একটু ধরবে বাবা? তোমার অনির হাতটা?

অনি...অনি! তুই আর কষ্ট পাস না রে...বলতে বলতেই উঠে দাঁড়ালেন অনিরুদ্ধ। দুই চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। মধ্যরাতে এক নিঃসঙ্গ পুত্রহারা পিতার সান্ত্বনাহীন সকরুণ শোকের অশ্রুজল তাঁর বুক ভিজিয়ে দিতে থাকল। এতদিন ধরে বেঁধে রাখা যন্ত্রণা সহসাই বাঁধনহারা হয়ে উঠে তাঁকে আত্মহারা করে দিল। টলমল করতে করতে তিনি হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন রাস্তায় যে পথ দিয়ে ঠিক মিনিট কয়েক আগেই তাঁর পৌত্র হেঁটে গেছে। সবকিছু ভুলে গেছেন অনিরুদ্ধ। কী এক আশ্চর্য ঘোর তাঁর সমস্ত বোধ, চৈতন্যকে অসার করে দিয়েছে, এতদিন পর তাঁর মনের ভেতরে শুধু পুত্রশোক...পুত্রশোক আর কিছু নয়। প্রিয় অনি আমার...আমি আসছি তোর কাছে। নিঝুম নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনিরুদ্ধ সেই রেলিংটার কাছে পৌঁছোতেই থরথর করে কেঁপে উঠলেন। এ কী! ও কে! নিই...নিক! তুমি এখানে কেন? সংবিৎ ফিরল অনিরুদ্ধর। অনীক তখন রেলিং থেকে নীচের অতল অন্ধকারের দিকে বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে রয়েছে।

কী করছ তুমি নিক? কী করছ! কিছু একটা আন্দাজ করে আর্তনাদ করে উঠলেন অনিরুদ্ধ। সমস্ত ঘোর মুহূর্তের মধ্যে কেটে গিয়ে আবার সচেতন বোধে ফিরলেন তিনি। অসম্ভব হাঁফাচ্ছেন। পা দুটো যেন পাথরের মতো ভারী। কোনোমতে ঘষটে ঘষটে অনীকের কাছে গেলেন। অনীকের মুখে কোনো কথা নেই। রাতের ঘষা আলোতে ওর চোখ আর গাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে আসা অশ্রু চিকচিক করছে।

অনীক তাকাল তার নি-র দিকে। ওকে যেন বোবায় পেয়েছে। অনিরুদ্ধ অনীকের কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন, কেন নিক? এখানে কেন?

অনীক খুব শান্তভাবে ধীরে ধীরে বলল, আমি মায়ের কাছে যেতে চেয়েছিলাম নি।

অনিরুদ্ধ থমকে গেলেন। দুজনেই সেই খাদের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর তখন একজন মানুষ এই এত রাতে কোনো কাজ সেরে বাড়ির দিকে ফিরছিল, সে এই দুটো অসমবয়েসি মানুষকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল। ওদের দেখল, তারপর ভাঙা গলায় অনুচ্চস্বরে বলল, ঠন্ডা লগ যায় গা, ঘর যাও। বলে শিস দিতে দিতে চলে গেল।

অনীকের হাতে সেই মোবাইল আর অনিরুদ্ধর মুঠোয় ধরা সেই নীল খাম। ওরা একে অপরের হাতের দিকে তাকাল। কে যে কী দেখল জানা নেই, অনিরুদ্ধ তাঁর হাতের খামটা রেলিং থেকে অন্ধকার খাদে ভাসিয়ে দিয়ে শুধু খুব নীচুগলায় ফিসফিস করে বললেন, চলো নিক, আমরা বাঁচি।

অনীক কোনো উত্তর দিল না, শুধু হাতের মুঠোয় ধরা একটা অদৃশ্য মোবাইল ফোন শূন্যে ছুড়ে দিয়ে অনিরুদ্ধর হাতটা ধরে অস্ফুটে বলল, হ্যাঁ।

আর রাতের অন্ধকারে সেই অজানা লোকটা শিস দিতে দিতে বাড়ি ফিরছিল। ❖

(ঋণস্বীকার—এই উপন্যাসে চরিত্রদের লিখিত কবিতাগুলি কবি জগন্নাথদেব মণ্ডল, বুদ্ধদেব হালদার এবং প্রশান্ত চক্রবর্তীর থেকে নেওয়া।)

ছবি : শৈবাল দত্ত

সাবিত্রী-সত্যবান

স্বপ্নময় চক্রবর্তী
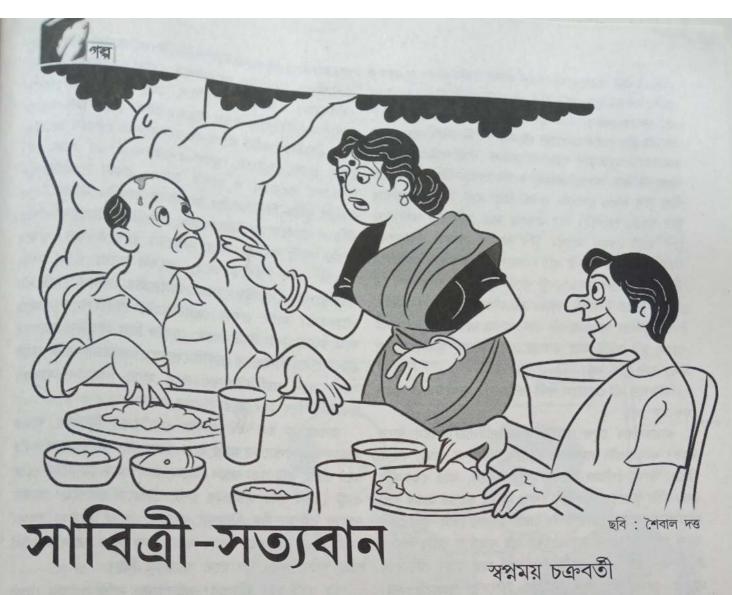
বটতলায় বউদির হোটেল। এখন একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে কালো জামা পরানো কাকতাড়ুয়া, একটা হাঁড়ি রং করে মাথা, গোল চোখ, গোঁফ। কাকেরা ভয় করে না। মুখটা পালটানো হয়েছে কয়েকবার। হাঁড়ির বদলে হনুমানের মুখোশ ছিল, প্লাস্টিকের করোটি ছিল, কাকেরা নির্ভীক।

মাছের মুড়োর ঘন্ট দিয়ে ভাত খাচ্ছিল সত্যচরণ, তখনই ওর নিজের মুড়োর উপর পুটুস করে পুরীষ পড়ল উপর থেকে। বউদি দেখল, হাততালি দিয়ে কাক তাড়ানোর চেষ্টা করল, চিল্লাল—শোরের বাচ্চা কাগগুলো সব স্যায়না শয়তান। কিচ্ছু মনে করবেন না সত্যদা, আমার তো কাগের উপর হাত নেই, কতা শোনে না। এক্কেবারে টাকের উপর দিয়েচে গো। তাও তো ভাগ্যিস মাছের মুড়োর উপর হাগেনি, অবশ্য পেলেট আমি পেল্টে দিতুম। তালি দিল, দুটো কাক পালাল। কিন্তু কাকতালীয় ব্যাপারটা সফল হল না, সত্যচরণের শিরোপরি পুনরায় উর্ধ্বপতন হল। বউদি মর মর, গুষ্টিসুদ্ধু মর করতে করতে সত্যচরণের কাছে এল, পাশে এল, এবং আঁচলের মাথা দিয়ে সত্যচরণের মসৃণ মাথা মুছিয়ে দিল। বলল আজ কাগেরা একটু বেশি বেশি করচে। তারপর হাতের গণ্ডুষে প্লাস্টিক জগ জাত সুশ্লষা বারি প্রলেপিত করে পুনরায় আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল। তারপর কাছে এসে বলল, কাগ আপনার টাগটা খুব পছন্দ করেছে। আপনি নিশ্চিন্তে খান, আমি ছাতা ধরছি। কাল থেকে মাতায় একটা টুপি পরে আসবেন।

সত্যচরণ টুপি পরেই এসেছে এবার। টুপিটার রং লাল। টুপিতে এভারেডি লেখা। কীভাবে যেন ফ্রিতে পেয়েছিল। সত্যচরণ একটা গান শুনেছিল, সিনেমার গান বোধহয়। খোকাবাবু যায় লাল জুতো পায়ে, বড়ো বড়ো মেয়েরা সব উঁকি মেরে চায়। এটা যদি এমন হত খোকাবাবু যায় লাল টুপি মাথায়...উঁকি দিয়ে ওই তো দেখছে মেয়েরা। মেয়েরা মানে রাজমিস্ত্রিদের কামিনগুলো। কামিন হলেও কামিনী তো। ক-দিন ধরে একটা বড়ো নির্মাণ কর্ম চলছে কাছেই। কুলি-কামিনরা এখানেই খায় বেশ কিছুদিন ধরে। এমনি টুপি পরা রূপ তো দেখেনি ওরা। বউদি বলল, বেশ মানিয়েছে কিন্তু আপনাকে। ফিরোজ খানের মতো লাগছে। ফিরোজ খানের মাথায় খুব সুন্দর টাগ। টুপিও পরে মাঝে মাঝে। খুলুন, একটু খুলুন তো

দেখি...কথাটা সত্যচরণের কানে কেমন যেন ঠেকল। একজন মহিলা একজন পুরুষকে বলছে খুলুন...দেখব...? সত্যচরণ খুলবে না। খুলবে কেন?

এই টুপি পরার ব্যাপারটা যে এই বউদিই প্রথম বলেছে তা নয়। বউদি ওকে টুপি পরায়নি। আকাশ থেকে পক্ষীমলের ঝক্কি এড়াতেই এটা পরতে হয়েছে। বউদি বলল—ফিরোজ খানকে কিন্তু টুপি পরাও দেখেছি 'গুসসা কিয়া যায়' 'সিনেমায় আবার টুপি ছাড়াও দেখেছি। আর একবার আর দেখি তো আপনাকে টুপি ছাড়া কেমন লাগে? টুপি পরাবে, আবার খোলাবে? সত্যচরণের ব্যক্তিত্ব নেই নাকি? খোলো বললেই খুলবে? টুপিটা রইল যেমন ছিল। আর একটু পরেই টুপুস করে পড়ল উপর থেকে। টুপির উপরেই পড়ল। সত্যচরণের রাগ হল টুপিটার উপর। টুপিটা না থাকলেই তো মাথায় পড়ত, আর মাথায় পড়লে যদি বউদি আর একবার...মসৃণ মাথায় আঁচল প্রলেপ মিস। আর টুপি নয়।

বটতলার এই হোটেলে পক্ষী-পটির ঝক্কি থাকলেও লোকজন মন্দ হয় না।

খাবারদাবার বেশ সস্তাই, এবং পরিপাটি। গরম থাকে ভাত। আলুমাখাটা দারুণ রাঁধে। শুকনো লংকা ভাজা, কালো জিরে, ভাজা পেঁয়াজ দিয়ে। মুসুরির ডাল, আর তেলকাঁটা দেয়া ডাঁটা কুমড়োর তরকারি খেয়ে মায়ের হাতের রান্নার কথা মনে পড়ে সত্যর। এই বউদির রান্নাটার মধ্যে তেল-ঝাল বেশি থাকে না, পেটরোগা সত্যচরণের এই রান্নাটায় শরীর খারাপ করে না। ডাল ভাত আলুমাখা আর মাছ ছাড়া প্রতিদিনই মাছের তেলকাঁটা দেয়া ছ্যাঁচড়া টাইপের তরকারি হয়। সয়াবিনের বড়ির তরকারিও হয়। ডিমের ঝোল। ব্রয়লার মুরগির মাংস কোনো কোনো দিন। পাঁঠার মাংস করে না। অনেক দাম পড়ে যায়, খদ্দের নেই। এই দোকানের খদ্দের বলতে রিকশাওলা, ভ্যানওলা, ফেরিওলা মজুর, আর সত্যচরণের মতো কয়েকজন, ওদের মতো অতটা কায়িক শ্রম করে না, কিন্তু রোজগারপাতি অতিপাতি। যারা হোটেলে খায়, ওদেরও বর্ণাশ্রম আছে। ঘ বর্ণরা ফুটপাথের হোটেল, গাছতলার হোটেল, যাদের সাইনবোর্ড থাকে না। গ বর্ণদের হোটেলে সাইনবোর্ড থাকে ছোটো মতো। এইসব হোটেলের নাম হয় অন্নদা হোটেল, তৃপ্তি ভোজনালয়। এসব হোটেলের একটা দেয়ালে কিছুটা কালো রং করে চক দিয়ে লেখা হয় ডিমের কারি এক পিস ১২ টাকা, কাতলা মাছের ঝোল এক পিস ২০ টাকা...বাজার অনুযায়ী দাম পালটায়। এসব দোকানে গ বর্ণর লোক খায়, যেমন অটোওলা, টোটোওলা, সিকিউরিটি গার্ড...এই বর্ণের কোনো কোনো হোটেলে বেসিন থাকে। খ বর্ণের হোটেলে বেসিন থাকে, বেসিনে সাবান থাকে, দেয়ালে মেনুকার্ড থাকে, কাউন্টারে মৌরি থাকে, তিন-চার রকম মাছ পাওয়া যায়। এসব হোটেলে পনির মশলা, ভালো ফ্রাই থাকে। কেরানিকুল, ছোটো দোকানদার, নানা ধরনের এজেন্ট, সেলসম্যান...। ক বর্ণের হোটেলে। মেনু কার্ড থাকে। বেসিনে সাবান নয়, লিকুইড সোপ থাকে। এইসব হোটেলের নামের মধ্যে হোটেল শব্দটাই থাকে না অনেক সময়। যেমন আহেলি, ব্ল্যাক রোজ, সাংহাই, মুঘল-এ-আজম...। সে যাক গে। আমাদের সত্যচরণ ঘ বর্গের লোক। একটা স্যানিটাইজার তৈরির কুটির শিল্প জাতীয় কারখানায় চাকরি। মালিক নিজে দাঁড়িয়ে অ্যালকোহল-ট্যালকোহল, গ্লিসারিন- টিসারিন মিশিয়ে ট্যাংকি রেডি করিয়ে অন্য বিজনেস দেখতে যায়। ছ'জন কর্মচারী ওসব শিশিতে ভরে, লেবেল মারে, প্যাক করে। সত্যচরণের পোস্টের নাম ম্যানেজার, কিন্তু মাইনেটা যাচ্ছেতাই। আগে একটা ছোটোখাটো ফিনাইল কারখানায় কাজ করত, সেটা উঠে গেছে, বেকার ছিল কিছুদিন, তারপর এদিকের স্যানিটাইজারে চাকরি পেয়েছে। করোনা নাকি রয়েই যাবে। ফলে স্যানিটাইজারও রয়ে যাবে। করোনা থাকলে চাকরিটা যাবে না। করোনা যেন থাকে।

মাসখানেক হল এই বউদির হোটেলের নিয়মিত খদ্দের সত্যচরণ। ফুলপ্যান্টের মধ্যে জামা গুঁজে পরা সত্যচরণকে সমীহ করে বউদি, এটা সত্য জানে। উচ্ছে ভাজা হলে অন্যদের চেয়ে একটু বেশিই দেয় সত্যচরণ সেটা টেরিয়ে দেখেছে। আবার কোনো কোনো দিন জিজ্ঞাসা করেছে, আজ ছ্যাঁচড়া কেমন হয়েচে? ভালোই তো বলবে সত্য, কিন্তু সত্য ভাবেনি বউদি সত্যি সত্যি বলবে, তা হলে আরেকটু দিই?

কত বয়স হবে মহিলার? মহিলাদের নাকি বয়সটা বোঝা যায় না। তবে মহিলা সম্পর্কে সত্যর জ্ঞান কমই। কপালে একটু সিঁদুরও আছে। ঠারে-টেরিয়ে দেখেছে সত্য—মহিলার বাঁধুনি বেশ ভালোই। একইসঙ্গে রাঁধুনি, পরিবেশনকারিণী, হিসেব করে কার কত হল বলে টাকা দেয়ানেয়া সব একা হাতে করে। টেবিল পরিষ্কার আর বাসন মাজার জন্য একটা বয়স্কা মহিলা আছে। বউদির মুখশ্রী মন্দ না। বেশ একটা পানপাতা টাইপের। নাকটা একটু বোঁচা বলেই হয়তো কথাগুলো সামান্য নাকি নাকি। তাই একটু নেকা নেকা, তাই আদুরে আদুরে। একদিন ডিমভাত খাচ্ছিল সত্য। পরিবেশনকারিণী সত্যর পাশে এসে বলল, আর একটু কারি দিই? ভাতটা শুকনো লাগছে। কারির সঙ্গে আবার একটুকরো আলুও দিল সে। দিল সে নিকলি রে...একটা গান বেজে উঠল মোবাইলে তখনই। মহিলার মোবাইলে কলার টিউন না কি যেন বলে। মোবাইলটা টেবিলের উপরই বেজে চলল। উনি তখনও সত্যসেবা করছেন। বলল, ভাত দিই আরেট্টু, আমনার আজ খিদে পেইচে খুব। গপগপ করে খেয়ে নিচ্চেন দেখছি। সত্যর দিল ধড়ক পড়ক শুরু হল। ওটা আবেগে। দিল তো পাগল হ্যায় গানটা ঝমঝমিয়ে বেরিয়ে আসছে যেন। হলুদ-

জিরে মেশানো শাড়ির গন্ধ কিছুটা বিলিয়ে দিয়ে বউদি চলে যেতে সত্য আঙুল চুষতে লাগল। কারণ কারিটা বড়ো সুস্বাদু হয়েছিল।

একদিন খেতে আসতে দেরি হল। কাজে ঝামেলা ছিল। বউদি সুর করে জিজ্ঞাসা করল—আজ দেরি হল যে?

—বড্ড ঝামেলা ছিল। ('গো' শব্দটাও ছিল, কিন্তু অনুচ্চারিত)

—খুব খিদে পেয়েছে না? (এবারও অনুচ্চারিত গো শব্দটা কানে নয়, মরমে শুনতে পেল সত্যচরণ)

কে একজন বলল—বউদি, আজ নাকি ওল চিংড়ি করেছ, দাও এক প্লেট।

বউদি মুখ ঝামটা দিয়ে বলল—আর নেই, শেষ। ঠিক টাইমে আসতে হয়। হেভি ডিমান্ড ছিল।

এবার একদম অন্য গলায়, যেন স্যানিটাইজার মাখানো গলায় বলল—আজ কী দিয়ে খাবেন। তেলাপিয়ার ঝাল আছে, ভোলা সরষে, আর ওল চিংড়ি করেছিলাম, এক পেলেট আমনার জন্য রেখে দিইচি।

ওল চিংড়িটা সত্যিই দারুণ হয়েছিল। সত্য হাসি হাসি মুখ করে বলল, দারুণ হয়েছে ওটা বউদি। কতদিন পর খেলাম। বহু বছর পর। মা মরে যাবার পর আর খাইনি।

—বে-থা করেননি কো?

—নাঃ (বিসর্গ ধ্বনির মধ্যে 'সে আর হল কই' নিহিত ছিল)

—কে আছে ঘরে?

—কেউ নেই।

—আমনি একা?

কথা নয়। ঘাড় নাড়ে সত্য।

—রাতে কী খান?

—রুটি। হোটেল থেকে কিনে নি।

---মাকালবাবুর স্যানিটাইজারে ম্যানেজারি করেন না?

—আপনি তো জানেন দেখছি।

—মাকালবাবুর স্যানিটাইজারের দুজন এখানে খেতে আসত। আপনি আসেন বলে এখানে আর আসে না। ওরা লেবার, আমনি ম্যানেজার।

সত্য বলল, আমার জন্য দুজন খদ্দের বাদ গেল আপনার। খুব খারাপ লাগছে বউদি।

—আমনার কী দোষ। ওরা না এলে আমনি কি করবেন? বাপ-মায়ের আশীর্বাদে আমার সব বিক্কির হয়ে যায় সাড়ে তিনটের মধ্যেই। বিকেলে আমি দোকান লাগাই না। ঝাকগে। একটা কতা কই। আঁচলে একটু আঙুল পেঁচাল, এবার বলল, আমনি আমায় বউদি ডাকবেননি। আমি আমনার চেয়ে অনেক ছোটো। আমার নাম ধরে ডাকবেন। আমার নাম সাবিত্রী। সাবি বলেই ডাকবেন গুনে।

স্থান সমস্যা সমাধান

কাল সন্ধ্যা!

একটা বোর্ডে লেখা—"নেশা মুক্ত করা হয়। পতি-পত্নী, প্রেমিক-প্রেমিকা, ভাড়াটে-বাড়িওয়ালা প্রভৃতি নানারকম সমস্যায় শুধু উপদেশের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা হয়।"

এটা সাবিত্রীরই আবিষ্কার। আগেও একদিন এসেছে।

বি দ্র হাতে সময় লইয়া আসিবেন।

ওদের এখানে আসার কারণ প্রচুর সময় পাওয়া যায়। নাম লিখিয়ে বসে থাকতে হয়। প্রতিটি সিটিং অন্তত বিশ মিনিট লাগে। বেশিও। আজ ওদের নম্বর ছয়। চার নম্বর যেই ঢুকবে, তখনই ওরা পালাবে। দেড়-দু-ঘণ্টা বসা যাবে বেশ। এটা সাবিত্রীরই আবিষ্কার। আগেও একদিন এসেছে।

এর আগে একটা ফিজিওথেরাপি সেন্টারে গিয়েছিল। ওখানে প্রত্যেকের অন্তত আধঘন্টা লাগে। কিন্তু সবচে ভালো ডেন্টিস্টের চেম্বার। অপেক্ষার ঘরটা এসি। এখন এই বয়সে পার্কে-টার্কে লজ্জা করে। ছেলেমেয়েরা প্যাঁক দেবে।

ডেন্টিস্টের চেম্বারে একদিন নিয়ে গিয়েছিল সাবিত্রী। বিশ মিনিটও হয়নি, ডেন্টিস্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট এসে বলল, পুরনোরা দুশো, নতুনরা তিনশো করে আগে দিয়ে দিন...তখন পালিয়ে আসে।

আসলে সাবিত্রীই একদিন 'আমাকে একটু টাইম দেবেন দাদা, পেরাইভেট কথা আছে। এই হোটেলে বলা যায় না। বাইরে কোথাও গিয়ে...।'

সত্যও বলেছিল, আমিও এই একই কথাটা বলব বলব করছিলাম।

সাবিত্রী বলেছিল, আপনি ছুটির পর আমাকে একটা ফোন করবেন, আমি ওই ওখানে চালতাতলায় আলতা মাসির চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে থাকব। ফোন নম্বর নিন। সত্যচরণ বলেছিল, আমার যে মোবাইল ফোন নেই...।

—সে কী! একুনো মোবাইল নেই? কেনেননি কেন?

সত্য বলেছিল, সামর্থ্য নেই। তা ছাড়া কাকেই বা করব।

সাবিত্রী বলেছিল, সামথ্য নেই বাজে কথা। তবে আমার সামথ্য থাকলে আমিই একটা কিনে দিতুম।

কথাটা শুনেই বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল। সেই ছোটোবেলায় ইস্কুলে মুখস্থ করা কবিতার একটা লাইন হট করে মনে পড়ে গেল, ওরে হাসিয়া উঠিছে প্রাণ ওরে উথলি উঠিছে বারি...। সত্য সত্যিই বোবা হয়ে গেল। সাবিত্রী বলল, ছটায় ছুটি হয় তো? সোয়া ছটার সময় থেকে ভাঁড়িয়ে থাকব এ্যাঁ? গেল, সত্যচরণ। সাবিত্রী বলল, এখানে বলা যাবে না কো। চলুন এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি। সেদিন ফিজিওথেরাপির ওখানে গিয়েছিল। ওখানে সাবিত্রী বলেছিল, এবার বলুন কী বলবেন,

সত্য বলল—আপনি আগে।

সাবিত্রী—না, আপনি আগে।

সত্য মাথা চুলকে, আঙুল মটকে বলল, বলছি কি, মুসুর ডালে আপনি কি রাঁদুনি ফোড়ন দেন?

সাবিত্রী বলল, কুনো দিন কালো জিরে-শুগনো নংকা, কুনো দিন রাঁদুনি, কুনো দিন পিঁয়াজ, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে..।

—হ্যাঁ, আমার মাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করত। কুমড়োফুল ভাজা দিয়ে রাঁদুনি দেয়া মুসুরিডাল কতদিন খাইনি।

—কুমড়ো ফুল? আচ্ছা একদিন খাওয়াব আমনাকে। বাজারে উঠছে তো এখন।

—আচ্ছা, আপনি শুক্তো করেন না কেন? কী সুন্দর কাঁচকলা-পেঁপে-সজনে-উচ্ছে দিয়ে।

—পলতে পাতা দিয়েও খুব ভালো হয়। কিন্তু এখানে শুক্তো চলে না। আমনি দেখি রান্নাবান্না খুব ভালো বোঝেন।

—হ্যাঁ মা যখন শয্যা নিলেন, আমিই তো রান্না কত্তাম।

—ও। তাই বুঝি? মুসুরির ডালের ফোড়ন নিয়েই কি আমনার পেরাইভেট কতা ছিল?

—না, অন্য একটা।

—বলুন না।

—না, একটু ইয়ে ব্যাপার তো। আপনি কি বলবেন সেটা বলে দিন না আগে।

—না, ভয় করে। যদি বলে দেন 'উহুঁ', আমি দুঃখু পাব।

সে দিন ফিজিওথেরাপিটা আগে আগে হয়ে গেল, পরের লোক ঢুকে গেল। ওরা বেরিয়ে এল।

পরের বার ডেন্টিস্টের ঘরেও বেশিক্ষণ বসা হল না। আজ এখানে এসেছে। সমস্যা সমাধান কেন্দ্রে।

কথপোকথন এরকম।

—দেকুন না, ওরা ভাবছে আমনি মদের নেশা করেন, আমি আপনাকে নে এইচি। হি-হি।

—মদ আমি খাই না। জীবনে একবার খেয়েছিলাম। বমি করে আর খাইনি জীবনে।

—তা ভালো করেছেন। নিন, এবার বলুন। লজ্জা কী?

—আপনি আগে বলুন।

—না, মেয়েরা আগে বলে না, ছেলেরা আগে বলে।

—আচ্ছা, সবাই বউদির হোটেল বলে, আপনার কপালে সিঁদুরও একটু থাকে, কিন্তু দাদাকে দেখিনি কখনো।

—দাদা! মানে হ্যাজবেন? সে নেই।

—তবে যে কপালে সিঁদুর দিচ্ছেন—

—সে কি মরেচে নাকি? সে শালা ফুটে গেছে। অন্য মাগি নিয়ে থাকে। সোমসার করে। আমি ফ্রি।

—ও। আচ্ছা। তা হলে আপনাকে বাধা দেবার কেউ নেই।

—না। কুনো শালার সাহস নেই। এই হোটেলে আমি কাঠে বা কয়লায় রান্না করি, কিন্তু আমার ঘরে গ্যাস। বাড়িওলা বলেছিল গ্যাস আনতে দেবে না, অ্যাকসিডেন হতে পারে। আমি বললাম কে আটকায় দেখি। সবার পরথম গ্যাস আমার ঘরে। আমার ঘরে কার্তিক নামে একটা ছেলে আসে অটো চালায়। বাড়িওলা বলেছিল ঢুকতে দেব না। আমি বললুম দেখি কত মুরোদ। আমার ঘরে যে খুশি সে ঢুকবে।

এবার কিছুটা সময় কথা নেই।

সাবিত্রী বলল—আমনি একা মানুষ তাই না?

—তাইতো। একা লোক।

—খরচাপাতি তো তেমন নেই, তাই না?

—না, আমার একার জন্য আর খরচ কী?

—তা হলে তো টাকাপয়সা জমিয়েছেন কিছু। তাই না?

—হ্যাঁ, কিছু তো জমিয়েছি, তবে...

—তবে কী?

হন্ত দন্ত হয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো তক্ষুনি চেম্বার থেকে ডাক্তার বেরিয়ে এল। বাড়িতে সর্বনাশ হয়েছে। গিন্নি গলায় দড়ি দিয়েছে। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আপনারা চলে যান...।

সেদিনও কথা হল না।

কী কথা ছিল যে মনে মনে জানা হল না সে দিনও।

এর পরদিন চাঁদসি চিকিৎসালয়।

অর্শ-ভগন্দর-নালি ঘায়ের বিনা অস্ত্রে চিকিৎসা।

পুরোনো একটা বাড়িতে ভাঙাচোরা ঘর। দুটো বেঞ্চি। সন্ধের সময় কেউ খুলে দেয়। ডাক্তার বেশ বুড়ো। বিকেলের দিকে রুগি হয় না তবুও একবার আসেন সাড়ে সাতটা নাগাদ। ওরা সাড়ে ছটায় গেছে। হাতে এক ঘণ্টা টাইম।

আজ ফাইনাল করবেই।

ওরা বসল।

আর কেউ নেই।

সাবিত্রী বলল—মুখে বলতে পারব না। মুখের উপর না করে দিলে দুঃখ পাব। তাই লিখে এনেছি। ক্লাস এইট অবদি পড়েছিলাম। বানান ভুল আছে। বুঝে নেবেন। নিন চিঠিটা পড়ে হ্যাঁ বা না বলে দিন। না বললেও কিছু মনে করব না। যেমন হোটেলে আসছেন, তেমনি আসবেন।

সত্য বলল—আমিও তো লিখেই এনেছি। ছোটো চিঠি। পড়ে নিন। পাঁচ মিনিটও লাগবে না।

ওরা পত্র দেয়ানেয়া করে।

মাননীয় সত্যবাবু। কারুর কাছে তেমন কিছু চাইনি। আজ আপনার কাছে চাহিতেছি। জীবনে কী পাব না ভুলেছি সে ভাবনা। সামনে যা দেখি তাহা হল কত্তব্য। আমার বয়স এখন ৪৩ না ৪৪ জানি না। ৪৫ও হতে পারে। আমি পেম করিয়া বিয়ে করেছিলাম কিন্তু আমার সেই স্বামী দুই বছর পরই আমাকে ছড়িয়া দেয়। আমার মেয়ে সন্তান। দেখিতে ভালো নয়। দাঁত উচা, কালো, ওই শালার রং পেইচে। মেয়েটা কলেজে পড়ে। একটাও ছেলে ফিট করতে পারেনি। আমি একটা ছেলে ফিট করাইয়া দিয়াচ্ছি। সে অটো চালায়। থাম কার্ত্তিক। আমি বলিয়াছি ঘরজামাই রহিলে আমি অটো কিনিয়া দিব। আমি কিছু জমাইয়াছি, আরও এক লক্ষ টাকা দরকার। আপনি একা লোক। নিশ্চয়ই টাকাপয়সা আছে। আমাকে দয়া করে ধার দিলে মা কালীর দিব্বি এক বছরের মধ্যে শোধ দিয়ে দেব। আশা করি না বলিবেন না।

সত্যচরণের চিঠিটা হল— মাননীয়া সাবিত্রী ম্যাডাম। আমার নিজস্ব শখ-আহ্লাদ বলিতে কিছুই নাই। শুধু দায়িত্ব আর কর্তব্য। আমার বয়স বর্তমানে তিপ্পান্ন। বানপ্রস্থের সময় হইয়াছে। আমি ঠিক করিয়াছি সন্ন্যাসী হইয়া যাব। হৃষিকেশে একটি আশ্রমও দেখিয়া আসিয়াছি। তার আগে শেষ কর্তব্যটি করিতে চাই। আমার পিতা যখন দেহ রাখেন, তখন আমরা এক ভাই দুই বোন। আমি সবার বড়ো। মা জীবিত থাকিতেই দুই ভগিনীকে পড়াইয়া গ্রাজুয়েট করাইয়া বিবাহ দিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার ছোটো ভগিনীর স্বামীর অকালমৃত্যু হয়। ভগিনী তার শ্বশুরবাড়িতে আছে, কিন্তু আমি সাহায্য করিয়া যাইতেছি। আমার ভাগনি, খুব লেখাপড়ায় ভালো। জয়েন্ট পরীক্ষা দিয়ে জলপাইগুড়ি সরকারি ইনজিনিয়ারিং কলেজে পড়িতেছে। সরকারি হইলেও খরচ আছে। আমার ভগিনী তাহার শ্বশুরবাড়ির রাস্তার উপরে দুটি ঘর ভাগে পাইয়াছে। একটি ঘরে একটি জেরক্স মেশিন বসাইয়া কিছু রোজগার করিতে চায়। একটি পুরাতন জেরক্স মেশিন উত্তম অবস্থায় বিক্রি হইবে। এই সুযোগে উহা কিনিয়া দিতে চাই। এজন্য আমাকে এক লক্ষ টাকা ধার দিন। আমি আমার বাসার দীর্ঘদিনের ভাড়াটিয়া। খুব কম ভাড়ায় বাবার আমল হইতে আছি। বাড়িওয়ালাকে দখল ছাড়িয়া দিলে সে আমাকে লক্ষাধিক টাকা দিবে বলিতেছে। আমি আশ্রমে চলিয়া গিয়া আধ্যাত্মিক জগতে রহিব। তার আগেই আপনার টাকা সুদসহ পরিশোধ করিয়া দিব ইহা ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি। আশা করি আমাকে না বলিবেন না।

গল্পটা এখানেই শেষ করা যেত। কিন্তু পাঠকের ইচ্ছাপূরণ হবে না। আমারও অন্তরের তৃপ্তি হবে না। তাই আর একটু

এক বছর পর দেখা গেল বটতলায় টেবিলগুলোর উপরে রঙিন রঙিন ছাতা। পক্ষীবিষ্ঠা ছাতার উপরই পড়ে। আর পাখিও তেমন নেই। পালিয়েছে। কারণ সত্যচরণের ভাগনির বুদ্ধিতে একটা স্পিকারে মাঝে মাঝেই টেলিভিশন টাকে শোয়ের রেকর্ডিং শোনা যায়। তিন-চারজন একসঙ্গে ঝগড়া করে। তাছাড়া দীপক ইসলামের ব্যান্ডের গান, ছিলিম ব্যান্ডের, চিড়িক বিড়িক ব্যান্ডের গানও পেন ড্রাইভে দিয়ে দিয়েছে। কাক-চিল তাতেই পালায়। একটা সাইনবোর্ডও লাগানো হয়েছে। ওখানে লেখা দাদা-বউদির হোটেল।

সাবিত্রী-সত্যবানের হোটেলও কেউ কেউ বলছে আজকাল। ❖

ম্যারেজ ডেসটিনেশন

গল্প

বিনতা রায়চৌধুরী

ছবি : স্মৃতিশ মণ্ডল

দূরত্ব শব্দটা একটা আশ্চর্য শব্দ। কে যে কখন কার কাছ থেকে দূরে চলে যায় আবার কে যে কখন দূরত্ব ভেঙে কার কাছে চলে আসে, আগে থেকে বোঝা যায় না।

খুব ছোটোবেলায় বাবা-মাকেই মনে হয় সবচেয়ে কাছের মানুষ। তারাই মন চেনায়, জন চেনায়, রং চেনায়। তারপর ছেলে-মেয়েরা বড়ো হয়ে গেলে বয়সের বছর ঢেউয়ের মতো ঠেলে ঠেলে সরিয়ে নিয়ে একটা ফাঁক তৈরি করে দেয় বুঝি! যৌবনের মাতোয়ারা ইয়ং জেনারেশন এই গ্যাপটাকে আমল দেয় না। কিন্তু বাবা-মায়ের দিক থেকে তারা কখনোই দূরে যায় না। প্রথম দিনের মতো বুকের কাছটিতেই জায়গা নিয়ে থেকে যায়।

অধীশ আর শুভ্রা ছেলে অনুভবকে নিয়ে খুব ভাবে কিন্তু বেশি কিছু বলতে পারে না।

অনুভব বাবা-মাকে অবজ্ঞা করে না। একেবারেই না। সে বাড়িতে থাকে, যায়-আসে, বন্ধুরা আসে। তাদের পড়াশোনা, গান, হইচই নিয়ে নিজের মতো করে থাকে। অনুভব নিজের মতো থাকতে ভালোবাসে।

অধীশ তো প্রয়োজনের বাইরে কথাই বলে না ছেলের সঙ্গে, আসলে সুযোগই পায় না। শুভ্রা তবু একটু কাছে ঘেঁষার সুযোগ পায়, একটু বেশি কথা বলে। একদিন শুভ্রা বলল, 'তোর পড়াশোনা তো শেষ হয়ে গেল। এবার কোনো চাকরি...।'

মাঝপথেই মায়ের কথা বন্ধ করে দিয়ে ছেলে উত্তর দিল, 'সব হবে। যথাসময়ে জেনে যাবে। তোমাদের কোনো টেনশন নেই।'

এই একটা কথা শিখেছে এরা। তোমাদের কোনো টেনশন নেই। আরে আমরা তোর মা-বাবা, আমাদের তোকে নিয়ে কোনো টেনশন থাকবে না? কোনো কোনো ব্যাপারে একটু টেনশন করতেও তো ভালো লাগে। তো সে কথা কে আর বোঝাবে!

একদিন অনুভব এসে জানাল, 'আমি চাকরি পেয়ে গেছি।'

'ওমা তাই নাকি? কী আনন্দ! শঙ্খ বাজাই? একটু মিষ্টি আনাই?' শুভ্রার গদগদ ভাবকে খণ্ডন করে অনুভব বলে উঠল, 'আরে দাঁড়াও-দাঁড়াও। শাঁখ বাজাবে? কেন? কতদিন এখানে চাকরি করি দেখো। আজ এটা নিচ্ছি কয়েকদিন পর আবার ছেড়েও দিতে পারি।'

'চাকরি নিয়ে আবার ছেড়ে দেওয়ার কথাই বা ভাবছ কেন?' অধীশ গম্ভীর গলায় বলল।

'তবে? এক জায়গাতেই পড়ে থাকব নাকি? বেটার চান্স পেলেই চলে যাব না? মা, তুমি কতবার শঙ্খ বাজাবে? আর ওই সব কী রাবিশ ভাবনা-চিন্তা, ছেলে চাকরি পেয়েছে তো মা শঙ্খ বাজাচ্ছে! ওফ্ ভাবা যায় না।'

এরপর আর সেই চাকরি সম্বন্ধে বেশি কৌতূহল দেখানো চলে? সাহস হয়? ফস্ করে কী বলে দেবে তার ঠিক নেই। আগেকার দিনে ছেলের চাকরি হলে বাবা সবচেয়ে আগে জিজ্ঞেস করতেন, মাহিনা কত তোমার? আর একটু পেছনে হাঁটলে, সেটা আবার শুদ্ধ ভাষায় আসত, বেতন কত পাবে? ছেলে লজ্জায় নুয়ে জবাব দিত। এখন অধীশের যুগে, সেটা হয়তো 'স্যালারি' কত জিজ্ঞাসা করা যেত কিন্তু অধীশ করল না। কারণ জবাবটা কীভাবে আসবে জানে না। স্যালারি সঙ্গে এখন অনেক কিছু যোগ হয়। ভেরিয়েবল্ পে, পার্কস্ নানারকম। ছেলে কী বলবে, কতটুকু বলবে, বললেও অধীশ বুঝবে কিনা কে জানে। তার চেয়ে জিজ্ঞেস না করাই ভালো। যা বলে শুধু শুনে যাও। শুনে খুশি থাকো।

শুভ্রাও পরে বলল, 'ভালো করেছ, কিছু জিজ্ঞেস করনি। শঙ্খ বাজানোর কথা বলে আমি কেমন বোকা বনে গেলাম, দেখলে না? ছেলের হাসিমুখ দেখেই আমরা সন্তুষ্ট।'

ছেলে চাকরি পেয়ে গেছে। এবার সব বাবা-মাই যা ভাবে অধীশ আর শুভ্রাও তাই ভাবতে লাগল। ছেলের বিয়ে দিতে হবে। তার আগে জানা দরকার ছেলের নিজের কোনো পছন্দ আছে কি না। সেটা কীভাবে জানা যাবে? বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? অধীশ বলে শুভ্রাকে, শুভ্রা বলে অধীশকে।

এর মধ্যে একদিন অনুভবের এক বান্ধবী এল বাড়িতে। অনুভব তাকে মা-বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, 'এই হল আমার বন্ধু রীনা। রীনা, আমার বাবা-মা।'

রীনা মেয়েটিকে বেশ নরম-সরম মনে হল। এগিয়ে এসে প্রণাম করল অধীশদের।

ছেলের সব বন্ধুরা যেমন তার ঘরে গিয়ে গল্প করে, রীনাও অনুভবের ঘরে চলে গেল। গল্প-গুজবও করল অনেকক্ষণ। শুভ্রা খুব যত্ন করে খাবারও পাঠিয়ে দিল ঘরে। এতদিনে একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছে যেন শুভ্রা-অধীশ।

ব্যস্, তারপর আর কোনো দেখা-সাক্ষাৎ নেই। কোনো উচ্চবাচ্য নেই। সাহস করে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারছে না। তারপর একদিন শুভ্রা বলেই ফেলল, 'সেই রীনা তো আর এল না একদিনও?'

'কোন রীনা?' অনুভব সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'সেই যে তুই বাড়ি নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলি।'

'ওঃ রীনা। সে তো এখন সিঙ্গাপুরে থাকে। ওর চাকরি শিফ্ট হয়ে গেল। তার আগে অবশ্য ওর বয়ফ্রেন্ড অর্কর সঙ্গে রেজিস্ট্রিটাও হয়ে গেল। ভালো আছে।'

শুভ্রার মুখ হাঁ হয়ে গেল। বলেই ফেলল বেচারি, 'অর্কর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, তাতে এত অবাক হওয়ার কী আছে?'

'আমরা তো ভেবেছিলাম...।' বাবার দিকে তাকাল অনুভব, 'কী ভেবেছিলে?'

'ভেবেছিলাম, রীনা বোধহয় তোরই গার্লফ্রেন্ড। মানে তোর সঙ্গেই বোধহয় ওর....মানে.....।'

'ওঃ মাই সুইট মাম্মি! অর্ক যেমন আমার বন্ধু, রীনাও আমার সেরকম বন্ধু। কী যে ভেবে বসে থাকো তোমরা। তোমাদের নিয়ে আর পারা যায় না।'

শুভ্রা আর অধীশ একেবারে চুপ।

তারপর রীনার মতো কবিতা, লিলি, মোনা এইরকম কতজন এল। দলবেঁধে একসঙ্গে কখনো, দলছুট হয়ে কখনো একা। শুভ্রা কিংবা অধীশ একটা কথাও বলল না। কে তার ছেলের এমনি বন্ধু, কে অমনি বন্ধু জানার দুঃসাহসও করল না।

প্রথমবার চাকরি পাওয়ার সংবাদে শঙ্খ বাজানোর কথা বলে একেবারে হ্যাটা খেয়ে গেছে শুভ্রা। তারপর কতবার চাকরি পালটেছে অনুভব, ভালো করে সেটাও জানে না তারা। চেষ্টাও করেনি। রীনাকে প্রায় ছেলের বউ ভেবে নিয়ে একবার ঠকেছে, তারপর আর কারো সম্পর্কে আশা পোষণ করেনি। অপেক্ষায় আছে ছেলে কবে তাদের আলো দেখাবে। তবুও বাবা-মা তো, অনেক ভেবে-চিন্তে অধীশ একবার নিজের দায়িত্বের দোহাই দিয়ে সোজা করে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'অনু, আমরা তোমার বাবা-মা তো। একটা দায়িত্ব থেকেই যায়। তুমি হয়তো বুঝবে না। তবু বলছি....।'

'এত কিন্তু কিন্তু করছ কেন? কেসটা কী? কিছু বলার থাকলে বলেই ফেলো।'

'তোমার বিয়ের জন্য আমরা কি পাত্রী দেখব?'

অনুভব তাকিয়ে থাকল দু-মুহূর্ত। তারপর হো-হো করে হেসে উঠল, 'ও, এই ব্যাপার? কোনো টেনশন নিও না। সময় মতো আমিই বলব তোমাদের।'

একান্তে স্বামীকে শুভ্রা বলল, 'ব্যস্, আর টেনশন নেই। ছেলেই এই ব্যাপারটা দেখবে মনে হচ্ছে।'

'হুঁ।'

২

একদিন সেইদিন এল। হয়তো বা।

অনুভব বাবা-মাকে বলল, 'মা, তোমাদের একটা কথা বলার আছে।'

বুক টিপ্ টিপ্ করে উঠল শুভ্রার। অধীশও নিজের হৃদ্স্পন্দন শুনতে পেতে শুরু করল নিজে। কী বলবে ছেলে? কী বিষয়ে বলবে তাই বা কে জানে?

'ওর নাম চেরি।'

'কার নাম চেরি?' বলে ফেলল শুভ্রা। কারণ নাম শুনে জেন্ডার তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কোনো স্থানের নামও হতে পারে। কিংবা কোনো কনসার্ন, যেখানে অনুভব টাটকা-নতুন জয়েন করেছে। কত

কোম্পানি যে সে ছেড়েছে আর ধরেছে তার হিসেব তো নেই তাদের কাছে।

'ও, কাম অন মা। চেরি ইজ মাই গার্লফ্রেন্ড।'

প্রাণে একটু জল এল শুভ্রার। যাক্ অন্তত নিজের মুখে অনু কোনো মেয়েকে গার্লফ্রেন্ড বলছে। আরও দু-একবার বলেছে বোধহয়, স্পেশাল ফ্রেন্ডও বলেছে। কিন্তু এবার সবটা একটু অন্যরকম লাগছে।

'তাহলে, একেই কি তুই বিয়ে করবি? বিয়েই করবি তো?' অধীশ ভণিতা না করে বলেই ফেলল।

'হ্যাঁ, সেরকমই তো ভাবছি। লিভ-টুগেদার-এ আমার বিশ্বাস নেই। ভালোও লাগে না। তোমাদেরই তো সন্তান শত হলেও। রক্ত তো একটু কথা বলেই। লিলিকেও ভেবেছিলাম বিয়ে করব। ওকে আমার ভালো লাগত। খুবই ভালো লাগত।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, লিলিকে আমি দেখেছিলাম একবার। ভালো লেগেছিল আমারও। তা ওকে কেন বিয়ে করলি না?'

'লিলি বিয়ের আগে কিছুদিন লিভ-ইন-এ থাকতে চেয়েছিল আমার সঙ্গে। আমি রাজি হইনি। তাই আমাকে ছেড়ে চলে গেল। গেল তো গেল। আমি নিজের চিন্তা-ভাবনা থেকে সরতে পারব না।'

একমুখ হাসি নিয়ে শুভ্রা জিজ্ঞেস করল, 'একে তোর খুব পছন্দ তো? আমাদের দেখবি না?'

'দেখবে?' হাসিমুখ অনুভবেরও। আজ সে যেন খুব মুডে আছে। মোবাইল ফোনটা বের করে একটু খুট-খাট করল, তারপর বলল, 'এই দেখো, এই হল চেরি।'

অধীশও মুখ বাড়াল, শুভ্রা তো আরও বেশি। দুজনেই খুব খুশি ছবি দেখে, 'বাঃ বাঃ বেশ মেয়ে—সুন্দর মেয়ে। কতদিনের আলাপ তোর সঙ্গে? কোথায় থাকে ওরা?' শুভ্রার অতি উৎসাহকে অধীশ চোখের ইশারায় শাসন করল। বেশি প্রশ্ন কোরো না।

অনুভব বলল, 'আলাপ তো অনেক দিনের। প্রায় ছ-মাস হয়ে গেল। আমাদের মধ্যে খুব মিল দেখে দুজনেই দুজনের প্রতি অ্যাট্রাক্ট হলাম।'

'কোথায় থাকে? নাম-ঠিকানা দে। আমাদের তো উচিত ওর বাড়ির লোকদের সঙ্গে দেখা করা। একটা সামাজিক আলোচনা তো করা উচিত দুই পক্ষের।'

অনুভব জোরে বলে উঠল, 'দেখা করবে? সামাজিক আলোচনা? আরে, আমিই মাত্র একদিন দেখা করেছি। কথাও হয়েছে সেদিন সামান্য। সময় ছিল না কারও।'

'সে কী অনু? তুই যে বললি ছয় মাসের আলাপ? তোদের মধ্যে খুব মিল?'

'সে তো ফেসবুকে আলাপ। চ্যাট করে সব জানাজানির পালা শেষ করেছি। ও তো মুম্বইতে থাকে। গত সপ্তাহে এসেছে কলকাতায়। ওর বাবা-মা গড়িয়ার দিকে থাকে। আমার জন্যই চেরি এবার কলকাতায় এল। ওকে এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করে গড়িয়ায় পৌঁছে দিয়ে এলাম।'

'ও তাই?' শুভ্রার গলা দিয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু আর বেরোল না।

'তোমাদের বলেছিলাম, বিয়ের বিষয়ে সময়মতো জানাব। তাই ডিসিশনটা যেই নিয়ে নিলাম, অমনি তোমাদের জানিয়ে দিলাম। চেরিও কাল ওর বাবা-মাকে সব বলবে।'

'তারা কোনো অমত করবে না তো?' অধীশ সংশয়ে একটু দুলে উঠল বুঝি।

'অমত? চেরিকে? এতদিন ধরে মেয়েকে খোশামোদ করে করে বিয়েতে রাজি করাতেই পারেনি। অবশেষে যখন রাজি হয়েছে, ওরা কোনোভাবেই 'না' বলবে না।'

'বাড়ির লোকদের মধ্যে কথা বলার কোনো দরকার নেই বলছিস?'

'আগে আমি কয়েকদিন ডেট করে নিই। প্ল্যান-প্রোগ্রাম সাজিয়ে নিই। তারপর না হয় গার্জিয়ানদের একদিন সামনাসামনি বসিয়ে দেব। তবে সেটা না বসালেও হয়। একেবারে বিয়ের দিনেই আলাপ-পরিচয় করে নেওয়া যেতে পারে।'

'সে বেশ তো, সে বেশ তো। তুই যেমন বলবি, সেই রকমই হবে। তবে দিনক্ষণ ফাইনাল করতে হবে তো। বিয়ের তারিখ তো সব মাসে থাকে না। তবে পাত্র-পাত্রী যখন নিজেরা রাজি তখন আমরা কোনো টেনশন করছি না।' ছেলের কাছে নতুন করে ধমক খাওয়ার আগেই শুভ্রা শেষ কথাটা বলে রাখল।

'দিন তো আমরা আমাদের সুযোগ-সুবিধা মতো ঠিক করব। পাঁজি-পুঁথিতে কোন মাসে বিয়ের দিন আছে কি নেই, তাতে আমাদের কি যায়-আসে? তবে এই বিয়েটা হচ্ছে, এই অ্যাসিওরেন্সটা জানিয়ে দিলাম।'

অধীশ মনে মনে ভাবল, না-না করেও অনেকটা জেনেছে তারা। শুভ্রাও সায় দিল তাতে। কিছুই তো বলে না ছেলে। সেক্ষেত্রে পাত্রীর নাম-ধাম, কোথায় কাজ করে, কতদিনের আলাপ, কীভাবে আলাপ হয়েছে, এতটা তো জানাই হয়ে গেল।

'যাই বল, মেয়েটা কিন্তু সুন্দরী।' শুভ্রা খুশির গলায় বলল।

'নইলে তোমার ছেলের মনে ধরে?'

'হ্যাঁ, সে তো বটেই, ছেলে তো বাবার মতোই হয়েছে কিনা।' এই কথা বলে শুভ্রা তার লম্বা বেণীটা সামনে নিয়ে এল। এখনও শুভ্রা সুন্দরী। একটুও মোটা হয়ে যায়নি। চুলও ওঠেনি। বেণী খুলে দিলে আজও পিঠের ওপর কালো জলপ্রপাত। অধীশ একদিন ওখানেই ভেসে গেছিল।

অধীশ বলল, 'শোনো, ছেলে যখন বলেই দিয়েছে বিয়ে ও এখানেই করবে, তখন আমাদেরও প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। সবচেয়ে আগে বাড়িটাতে একটু কাজ করিয়ে নিয়ে বাইরে-ভেতরে রং করে ফেলি। শত হলেও এই বাড়িতে কতদিন পরে একটা উৎসব লাগছে। তাকে মনের মতো করে সাজিয়ে তুলতে হবে না?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ—নিশ্চয়ই। নিমন্ত্রণের লিস্ট তৈরি করতে হবে। আমি কাউকে বাদ দেব না। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাইকে বলব। কারো আক্ষেপ রাখব না।'

'ওসব তো পরে শুভ্রা। একটা মেজর জিনিসই আমরা জানি না।'

'কী জিনিস জানি না!'

'মেয়েটি কোন জাতিভুক্ত। চেরি নাম শুনে তো হিন্দু না মুসলমান, ব্রাহ্ম না খ্রিস্টান কিছুই বোঝার উপায় নেই। ব্রাহ্মণ না কায়স্থ কে জানে। সবচেয়ে বড়ো কথা, সে কি বাঙালি হতে পারে শুভ্রা? চেরি কি বাঙালির নাম হয়?'

'এটা জিজ্ঞাসা করেই জানতে হবে। তবে তোমাকে বলে দিলাম, সে যে জাতেরই হোক তুমি কোনো আপত্তি করতে পারবে না। কোনোভাবেই ছেলের মন ভাঙা চলবে না।'

'আরে, তুমি কি পাগল হলে? আমি আপত্তি করব? সে বিয়ে করবে বলে একটি মিষ্টি মেয়ের ছবি দেখিয়েছে, এতেই আমি উদ্ধার হয়ে গেছি। যদি একটি ছেলেকে পছন্দ করত, আর বলত, এসবই এখন আইনসিদ্ধ। তখন কী করতাম আমরা?'

শুভ্রা স্বামীর কথায় চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল। গম্ভীরভাবে মাথাটা ওপর-নীচ করল কয়েকবার। যেন, ঠিক—ঠিক বলেছে অধীশ। এমনটা শুনতে হলে বাকরুদ্ধ হয়ে যেত না? কিন্তু জাতি-ধর্ম, এসব জিজ্ঞাসা করবে কী করে? ছেলে যদি বিগড়ে যায়?

'না-না শুভ্রা। একটু কায়দা করে জিজ্ঞাসা করতে হবে, যেন ওসব নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। নেহাত প্রয়োজনেই জিজ্ঞাসা করছি।'

'তুমি পারবে? আমি যদি ঘাবড়ে যাই? একটা অ্যালিবাই তো রাখতে হবে সামনে।'

'হ্যাঁ পারব। না পারার কী আছে? তুমি কি আমার যৌবন বেলার করিৎকর্মা রূপ দেখোনি? দেখো না, এমন হালকা করে, একটা ছুতো নিয়ে হাসি হাসি মুখে প্রশ্নটা করে ফেলব যে ছেলে সরল মনে উত্তরটা দিয়ে দেবে।'

'দেখো, যদি পার। শুধু চুলটাই তোমার একটু উঠে গেছে, চেহারাটা তো একেবারে পুরুষোচিতই আছে।'

অন্যসময় হলে চুল উঠে যাওয়ার খোঁটাটা সহ্য করত না অধীশ। কিন্তু বড়ো কাজ হাসিল করার আগে ছোটোখাটো ব্যাপার ভুলে যেতে হয়।

আজ রাতে কপাল জোর ছেলেকে সামনে পেয়ে গেল অধীশ। সুন্দর হেসে বলল, 'আজ আমাদের সঙ্গে ডিনারটা কর না। ল্যাপটপে কাজ থাকলে পরে করিস না হয়।'

সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল অনুভব, 'না বাবা, অনেক কাজ আছে। মা, তুমি আমার খাবারটা দিয়ে দাও, ঘরে নিয়ে যাই।'

অধীশ ইশারায় শুভ্রাকে বলল, এখনই জিজ্ঞেস করবে ছেলেকে। ভাতটা বাড়তে যেন শুভ্রা একটু দেরি করে। শুভ্রা ঘাড় নাড়ল বটে কিন্তু সে ভাত বাড়বে কী, কান খাড়া করে রইল।

'বলছিলাম কী অনু, মেয়েটির নাম তো চেরি। বেশ সুন্দর নাম, দেখতেও মিষ্টি। তো ওর পুরো নামটা কী? মানে পদবিটা জানতে পারলে ভালো হয়।'

'কেন, তোমরা কি ওর জাতি-গোত্র বিচার করতে বসবে নাকি?'

'না-না, ওসবে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। হিন্দু-মুসলমান- খ্রিস্টান কিছুতে কিছু আসে-যায় না আমাদের। আমরা শুধু....।'

'এসব আবার কী কথা বাবা? ওরা হিন্দুই, কারণ ওর একটা ফাইলে আমি শিব আর কালীর মূর্তির ছবি দেখেছিলাম। ওসব তো হিন্দুদেরই দেবতা, তাই না?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই হবে। ওতে আমার কিছু যায়-আসে না। হোক না ভিন্নধর্মী, তাতে কী?' মুখে এ কথা বললেও অধীশ বেজায় খুশি। চেরি হিন্দু নিশ্চিত। শুভ্রাও চোখের কোনায় মনের আনন্দটা জানিয়ে দিল।

এবার এর পরের ধাপ। এটাও কঠিন। তবু অধীশ লড়ে গেল, 'মানে, আর কিছুই না। কার্ড ছাপতে হবে তো। তাই পুরো নামটা জানা দরকার।' এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। অধীশ বেশি স্মার্ট হতে গিয়ে তার সঙ্গে জুড়ে ফেলল আর একটা কথা, 'তাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় না কায়স্থ সেটাও বোঝা যায়, এই আর কী!' শুভ্রার চক্ষু তর্জনই অধীশকে বুঝিয়ে দিল ভুলটা। এবার কী হবে?

অনুভব উঠে দাঁড়াল, 'তোমাদের দেখছি অনেক কোয়ারি। আমি বিয়ে করব, আমার জাতে-পাতে কোনো আগ্রহ নেই।'

'মানে...মানে...আসলে উনি....।' শুভ্রা নৌকাডুবিটা বাঁচাতে চেষ্টা করল। তার আগেই অনুভব উঠে দাঁড়াল, 'দাঁড়াও-দাঁড়াও। দেখছি আমি। মনে হচ্ছে ওর পুরোনো চ্যাটে পুরো নামটা দেখেছিলাম একবার।'

ছেলে ঘরে চলে গেল। শুভ্রা ছেলের জন্য বাড়া ভাতের সামনেই মাথায় হাত দিয়ে বসল। অধীশও কাঁচুমাচু মুখে থেবড়ে গেছে মনে হল। এর জন্য কি ছেলের বিয়ে ভেঙে যেতে পারে? কিংবা বিয়ে ব্যাপারটা থেকে এই অ্যান্টিক পিস বাবা-মা বাদ পড়ে যেতে পারে? কী হয়, কী হয়, কী জানি কি হয়? দুজনেরই বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে গেছে।

অনুভব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রায় গুপ্তধনের সংকেত আবিষ্কারের ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'ওর পুরো নাম সুচরিতা সান্যাল। হয়েছে? এতে কি জাত-ধর্ম বোঝা যাবে? না গেলে না যাবে। বলেছি ফালতু টেনশন করবে না। মা, ভাতের প্লেট-টা দাও।'

ছেলে প্লেট নিয়ে ঘরে চলে যেতেই শুভ্রা অধীশকে, অধীশ শুভ্রাকে জড়িয়ে ধরল। কতদিন পরে কে জানে? যদিও এ আলিঙ্গন সে আলিঙ্গন নয়। তবু....।

মনের খুশি চাপতে পারছে না শুভ্রা, 'সান্যাল বলল, মানে আমাদের পালটি ঘর!'

'হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ। তা ছাড়া সুচরিতা, কী সুন্দর নাম। তাকে শর্টে চেরি বলে ডাকে সবাই?' রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলল অধীশ।

শুভ্রা এখনই বউমার তরফদারি শুরু করে দিল, 'তা হোক, অমন টুকটুকে দেখতে বলেই তো চেরি বলে ডাকে। চেরি ফল দেখোনি? লাল-লাল, মিষ্টি দেখতে?'

অধীশ বউয়ের সমর্থনে হেসে ফেলল, 'বেশ-বেশ। চলো

আমরা এবার ময়দানে নেমে পড়ি। অনেক কাজ বাকি আছে আমাদের।'

৩

বাড়ির ভেতরে-বাইরে মিস্ত্রি লাগিয়েছে অধীশ। একদিকে রাজমিস্ত্রি, অন্যদিকে জানলা-দরজা ঠিক করার জন্য ছুতোর মিস্ত্রি। এর সঙ্গে সঙ্গে রং মিস্ত্রিকেও ডেকে নেবে ঠিক করেছে অধীশ। শুভ্রাও সায় দিয়েছে, 'দিনটা এখনো অনু আমাদের জানায়নি। তবে সেটা তো তাড়াতাড়িও হতে পারে। তাই আমাদের দিক থেকে দেরি করা চলবে না।'

ঘরের রং করার আগে ওরা দুজনেই ভাবল, অন্তত অনুর ঘরের রংটা ওকে দিয়ে পছন্দ করিয়ে নেওয়া উচিত। যারা থাকবে, তাদের পছন্দের দাম আছে একটা। প্রথম কয়েকদিন ঘষাঘষির কাজ চলুক সারা বাড়িতে। তারপর অনুর ঘরে হাত দেওয়ার সময় জিজ্ঞেস করা যাবে।

জিজ্ঞেস করতে হল না। অনুভবই একদিন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার বাবা? সারা বাড়িতে এত মিস্ত্রি থই থই করছে কেন?'

'তোর বিয়ে, বাড়িটা সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলতে হবে না?'

'বাড়িতে বিয়ে? আমি কি এই বাড়িতে বিয়ে করব নাকি?'

'হ্যাঁ, এত বড়ো বাড়ি। এতগুলো ঘর। কত বড়ো ছাদ!'

'ছাদে ম্যারাপ বেঁধে, বারান্দায় নহবত বসিয়ে, উঠোনে গায়ে হলুদ দিয়ে বিয়ে হবে আমার?'

ছেলের গলায় এটা ধমক, না ব্যঙ্গ, না চূড়ান্ত অপছন্দের সুর অধীশ ঠিক বুঝতে পারল না। তাই চট করে মুখে কথা যোগাল না। তারপর তাড়াহুড়ো করে বলতে গেল, 'তুই যদি চাস তাহলে আমরা একটা ফ্যাশনেবল ম্যারেজ হাউস ভাড়া নিতেই পারি। এখন অনেক খোলামেলা গ্রাউন্ড সমেত ভালো ভালো ম্যারেজ হাউস...।'

বাবার কথা শেষ করতে দিল না অনুভব, 'বাবা, আমি বলছি এইসব থামাও। আমরা দুজনে সব সমস্যা সাইজ করে একটা দিন ঠিক করতেই হিমশিম খাচ্ছি। তারপর স্থান নিয়ে তো আরও অনেক বড়ো আলোচনা রয়েছে। সমানেই দেখে যাচ্ছি দুজনে।' এই বলে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। কিছুটা বিমূঢ় হয়ে অধীশ দাঁড়িয়ে রইল ছেলের ঘরের সামনেই। কী যে বলে গেল অনু হৃদয়ঙ্গমই হল না। অনুভবও বোধহয় বাবাকে একটু ফিল করে থাকবে। সে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বাবাকে বলল একটু হেসে, 'কোনো টেনশন কোরো না বাবা। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের ওপর ভরসা রাখো। সময়মতো সব জানিয়ে দেব।'

ছেলের মৃদু হাসিতে অধীশের একটু সাহস বেড়ে গেল, বলেই ফেলল, 'তারিখটা একটু আগে জানতে পারলে ভালো হত। কার্ডটা ছাপতে দিতে পারতাম। কার্ড এলে নেমন্তন্ন করার ব্যাপারটা....।'

'কার্ড ছাপাবে? কেন? ফালতু টাকা নষ্ট করবে? ও আমি কমপিউটারে বানিয়ে সকলকে সফ্‌ট কপি পাঠিয়ে দেব।'

'তাতে নিমন্ত্রণ করা হবে? সফ্‌ট কপি পাঠিয়ে দেব?'

'এখন এভাবেই হয় বাবা। বাড়ি গিয়ে গিয়ে নেমন্তন্ন করা উঠে গেছে। কার এত সময় আছে বল তো? তারপর ওই সব কার্ড তো আগানে-বাগানে গড়াগড়ি খাবে। বিয়ের দিন অনেকে কার্ডখানা খুঁজেই পায় না। তার চেয়ে সফ্‌ট কপির আমন্ত্রণ পত্র মোবাইল ফোনেই থাকবে সকলের। হুশ করে পৌঁছে যেতে কোনো সমস্যাই নয়।'

'ম্যারেজ ডেসটিনেশন— মাল দ্বীভস্ বললে যাবে তো কেউ?'

'তবুও তারিখটা যদি বলে দিতিস সুবিধে হত আমাদের।' স্বামীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে শুভ্রা এগিয়ে না এসে পারল না।

'ও, ধরে নাও সামনের মাসের পরের মাসের শেষ দিকে। এই সাতাশ কি আঠাশ হবে। তার আগে চেরি একবার মুম্বই যাবে। আমিও যাব ওর সঙ্গে। আমার নিজের কিছু কাজ আছে। ফিরে এসে সবটা ডিটেলে জানাব তোমাদের।'

'ও, তাহলে সময় একটু আছে হাতে। একবার চেরির বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা হলে ভালো হত। নমস্কারি কী কিনব, তাছাড়া কনের জন্যও কেনাকাটা আছে।'

'বেশ, মুম্বই যাওয়ার আগে তোমাদের ভিডিয়ো কনফারেন্স করিয়ে দেব। একেবারে সময় নেই আমাদের হাতে। ফিরে এলে সামনাসামনি দেখা কোরো। আর মা, কেনাকাটার কথা কিছু বলছিলে? নমস্কারি-টারি কিচ্ছু না। কনের জন্যও না। বাবা, তোমার টাকাটা নষ্ট কোরো না এভাবে। বরং জমিয়ে রাখো, অন্য কাজে লাগবে।'

'কনের জন্যও কিছু কিনব না?' কঁকিয়ে উঠল শুভ্রা।

'কী কিনবে? ও গয়না একেবারেই পরে না। পরলে নিজেরটাই পরবে। কারো থেকে নেবে না। আর আমরা ঠিক করেছি শুধু দুটো হিরের আংটি কিনব নিজেদের জন্য। ম্যারেজ রিং। আর সেটা অন্য কারো টাকায় কিনব না আমরা।'

অনুভবের মতো সোনা ছেলে যাদের আছে, তার বাবা-মায়ের কোনো টেনশন থাকে? না থাকতে পারে? অধীশ আর শুভ্রা হাত কোলে করে বসে আছে। ছেলের বিয়ের জন্য কোনো কাজই নেই ওদের জন্য।

বাড়িতে মিস্ত্রির কাজ বন্ধ করে দিয়েছে অধীশ। অনু এই জন্য ডিসটার্ব বোধ করছে। সেটা সে কীভাবে হতে দিতে পারে? শুভ্রা বিজ বিজ করে মন্তব্য করেছিল একবার, 'যে কাজগুলো শুরু হয়েছিল, সেটা শেষ করে নিতে পারতে।'

'করব, কোনো তাড়া নেই। অনু শিগ্গিরিই মুম্বই যাবে। ও গেলে মিস্ত্রির কাজটা করিয়ে নেব। ওকে বাড়িতে কোনোভাবেই ডিসটার্বড্ হতে দেব না।'

মুম্বই যাওয়ার আগে অনুভব দুই বাড়ির মা-বাবাকে ভিডিয়ো কলিং করে দেখা করিয়ে দিল। দুই পক্ষই প্রচুর হাসি মুখে নিয়ে নমস্কার, কুশল বিনিময়, ছেলেমেয়ের সুখ-আনন্দই তাদের সুখ-আনন্দ, এইসব কথা বলে গেল খানিকক্ষণ ধরে! মনে হল কোনো অদৃশ্য স্ক্রিপ্ট রাইটারের স্ক্রিপ্ট পড়ে গেল চারজনই। একটাও কোনো বেফাঁস কথা নয়, এক্সট্রা কথা নয়, টেনশানের কথা নয়। ফোন ছাড়ার সময় চেরির মা বলল, 'এই তো ওরা মুম্বই থেকে ফিরে এলে চার হাত এক করে দেওয়ার পালা। তখন খুব গল্প করব আমরা।'

শুভ্রা ঘাড় নাড়ল, 'সে তো বটেই, সে তো বটেই। তখন তো দেখা হবেই। দেখা হলে খুব ভালো লাগবে।'

'হ্যাঁ, ঘুরে আসুক ওরা। তারিখ তো ওরা আমাদের জানিয়েছে, পরের পরের মাসের আঠাশ?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, অনুও আমাদের তারিখ জানিয়েছে, ওই আঠাশই।'

মুম্বই চলে গেল হবু বর-কনে। বাবা-মায়েরা অপেক্ষা করতে লাগল স্ব-স্ব ক্ষেত্রে।

শুভ্রা চেয়ারে বসে মন উদাস করে বলল, 'হ্যাঁ গো, ওরা একসঙ্গে মুম্বই চলে গেল?'

'হ্যাঁ গেল তো। তুমিও দেখলে, আমিও দেখলাম।'

'ওদের তো এখনও বিয়ে হয়নি। আমরা কি পারতাম এমন, বলো?'

'আবার শুভ্রা, আবার! আমরা আর ওরা কি এক? পুরোনো কোটর ছেড়ে বেরোও দেখি। মনটা বড়ো করে দাও। আকাশের মতো। সেখান থেকে নীচে তাকালে এইসব ছোটো ছোটো সমস্যা ক্ষুদ্র দেখাবে।'

শুভ্রা মেনে নিল যেন সবটা। তারপর চোখ ট্যারা করে বলল, 'চেরির বাবা-মা কি চালাক দেখলে? ভেনুটা বলল না। মেয়ের বাবা-মা, একটুও চিন্তা নেই!'

'হয়তো জানেই না। আমরা জানি? অনু এখনও বলেনি, চেরিও নিশ্চয়ই বলেনি। আমার মনে হয় এই প্রি-হনিমুন পিরিয়ডটায় ওরা বিয়ের ভেনু আর ফাইনাল হনিমুনের ভেনু, দুটোই স্থির করবে।'

'হনিমুনের আবার 'প্রি' আর 'ফাইনাল' হয় বুঝি?'

বউয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে অধীশ জবাব দিল, 'এখন এসব হয় সোনা, কোনো টেনশন কোরো না। তবে আমিও দু-তিনটে ভেনু দেখে রেখেছি। ম্যারেজ হাউসই বটে, অপূর্ব ব্যবস্থা। গ্রাউন্ডে খোলা আকাশের নীচে খানা-পিনা করো, নাচ-গান করো। যা খুশি। সত্যি, ছাদে ম্যারাপ বেঁধে, বারান্দায় নহবত করে এইসব আনন্দ হয় না। একটু এগিয়ে ভাবতে হয়। ঠিকই।'

কতটা এগিয়ে ভাবতে হয়, সেটা বোধহয় অধীশ দম্পতি স্বপ্নেও ভাবেনি।

৪

ওরা মুম্বই থেকে ফিরে এসেছে। খুব খুশি দুজনে। অনুভব এয়ারপোর্ট থেকে চেরিকে গড়িয়ায় ড্রপ করে বাড়ি ফিরল। ছেলের মুখের হাসি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ওদের ভবিষ্যৎ-জীবনের কত ভালো প্ল্যানিং ওরা করেছে। অনুভব বাড়ি এসে বাবা-মাকে পাশে নিয়ে বসল। বাবা-মা তো আনন্দে প্রায় গলেই যাচ্ছিল। ছেলের কথাতেই পিঠ সোজা করে বসল। কারণ অনুভব শুরু করল এইভাবে, 'আমাদের ম্যারেজ ডেসটিনেশন ফাইনাল হয়ে গেছে।'

'তাই? আমিও দু-একটা দেখে রেখেছি। এক জায়গায় তো কথাও এগিয়ে রেখেছি। তুই আগে দেখে নে। তারপরই ফাইনাল করব। তিনটে ম্যারেজ হাউসই দুর্দান্ত!'

'কী কথা এগিয়ে রেখেছ? টাকা-ফাকা অ্যাডভান্স করে ফেলোনি তো?'

'না-না, কোনো টেনশন করিস না। তুই বল। কী ভেবেছিস? নিজে ভেনু পছন্দ করেছিস?'

'ইয়েস বাবা, শোনো মা, আমি আর চেরি একটা আইল্যান্ড-এ গিয়ে বিয়ে করব।'

আইল্যান্ড মানে তো দ্বীপ! শুভ্রা কী শুনল? তার ছেলে একটি দ্বীপে চলেছে বিয়ে করতে! তার মনে হল কানের মধ্যে আরশোলা ঢুকে গেছে।

'আইল্যান্ড-এ গিয়ে বিয়ে হবে?' অধীশ দ্বিতীয়বার শুনতে চাইল।

'হ্যাঁ। প্রথমে আমি চেয়েছিলাম একটা পাহাড়ের গুহায় বিয়ে করব, চেরি চেয়েছিল কোনো জঙ্গলের মধ্যে বিয়েটা হবে। শেষ পর্যন্ত দুজনের কারোরই মতের মিল হচ্ছিল না। আমাদের এক বন্ধুই এই আইডিয়াটা দিল—তোরা একটা দ্বীপে চলে যা। সেখানে বিয়ের বাসর কর। ওঃ কী থ্রিলিং ভাবতে পার? ম্যারেজ হাউসে বিয়ে এখন সেকেলে ব্যাপার, এখন ডেসটিনেশন ওয়েডিংয়ের জমানা।'

ভাবতে পারছে না তারা। কিছুতেই পারছে না। ভাবলেই কাঁপুনি এসে যাচ্ছে। কাঁপছেও তারা। তাতে ছেলের কোনোই ভাবান্তর হল না। সে ঘোষণা করল তাদের বিয়ে হবে দ্বীপেই।

'ম্যারেজ ডেসটিনেশন—মাল দ্বীভস্।'

'মাল দ্বীভস্। সে তো অনেক দূর। প্লেন-এ করে যেতে হবে। পাসপোর্ট-ভিসা লাগবে। ভাবতেই পারছি না। এত নিমন্ত্রিত লোকদের কী করে বলব মালদ্বীপ চলো। ছেলের বিয়ে।'

'এত নিমন্ত্রিত? হবে না। সব ছেঁটে ফেলো। খুব কাছের বন্ধু ও আত্মীয়কে সিলেক্ট করে নাও। তাদের নিয়ে চলো বিয়ের আসরে। এখানকার ম্যারেজ হাউস রেন্ট, ডেকরেশন, ক্যাটারারের জন্য যা খরচ হত, সেটা তো বেঁচেই গেল তোমাদের। এমনকী, বিয়ের যাবতীয় খরচ, কিচ্ছু করবে না। চেরিও বাড়িতে একই কথা বলে দিয়েছে। বিয়ের যা কিছু খরচ সব আমরা দুজনেই বহন করব। তোমরা বরপক্ষ বরযাত্রী নিয়ে যাবে আর চেরির বাবা-মা কন্যাযাত্রী নিয়ে যাবে। কোনো পক্ষই কোনো পক্ষের ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করবে না।'

শুভ্রাকে যদি শ্রীকৃষ্ণ দিব্যদৃষ্টি প্রদান করত তাহলেও সে এই বিয়ের ছবিটা অনুমানেও আনতে পারছে না। ভাবতে গেলেই পিছলে পড়ে যাচ্ছে। প্রায় খাবি খাওয়ার মতো অবস্থা তার, 'দ্বীপের মধ্যে বিয়ে কী করে হবে? চারধারেই তো জল। সাঁকো বাঁধা হবে নাকি?'

খুব হাসতে লাগল অনুভব, যেন এতক্ষণে সে একটা আনন্দ দেওয়ার মতো কাজ খুঁজে পেয়েছে।

'মাল দ্বীভস্-এ একটা আইল্যান্ড একটা হোটেল। সমুদ্রের ওপর পর পর ঘর। চারদিকে যেমন জল, পায়ের নীচেও তেমন জল। কাচের মেঝে, সেখান দিয়ে দেখবে সামুদ্রিক মাছরা খেলা করছে। প্রত্যেকটা ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড্ সুইমিং পুল। প্রত্যেকটা ঘর থেকে সমুদ্রে নেমে যাওয়ার সিঁড়ি রয়েছে।'

এবার শুভ্রার শুধু নয়, অধীশেরও গা শির শির করছে। এতদিন অ্যাটাচড্ বাথ-এর কথা শুনেছে। অ্যাটাচড্ সুইমিং পুল শোনেনি। ঘর থেকে সমুদ্রে নামার সিঁড়ি? সে কেমন ব্যাপার? তবু তা নয় হল, বিদেশ-বিভুঁইয়ে কতরকম হয়। কিন্তু বিয়েটা কী করে হবে?

'অনু, বিয়েটা কি সমুদ্রের মধ্যে হবে? সিঁড়ি দিয়ে নেমে?'

'না-না, বিয়ে হবে সমুদ্রতটে। সাদা বালির ওপর। গোধূলি লগ্নে। ডুবে যাওয়া সূর্যর আলোই সেখানে অপূর্ব আলোকসজ্জার কাজ করবে। আমরা দুজনেই সাজব দ্বীপবাসীদের নিজস্ব বিয়ের কসটিউমে। ভাবলেই আমার থ্রিল হচ্ছে।'

এই এতটা বলে অনুভব উঠে পড়ল।

ঘরের মধ্যে কয়েকপাক ঘুরে নিল। তারপর হাসিমুখে বলল, 'কাদের নিয়ে যাবে একটা লিস্ট করে ফেলো। আমি তোমার নিমন্ত্রিতদের কার্ড পাঠিয়ে দেব। তবে বাবা, বরযাত্রীদের দায়িত্বটা কিন্তু তোমারই। আমার দুই বন্ধু অবশ্য একদিন আগেই ভেনুতে পৌঁছে যাবে। সব ব্যবস্থা করে রাখবে। কোনো টেনশন নেই।'

ছেলে তো বলে দিল, কোনো টেনশন নেই। কিন্তু ওদিকে বরযাত্রীদের দায়িত্ব তো বাবার। হোটেলের ভাড়া কতদিনের জন্য গুনতে হবে কে জানে?

অনুভব বাবার মনের কথা বুঝে বা না বুঝে বলে উঠল, 'ওখানে একদিনই থাকা হবে। বিয়ের পরদিনই আমরা দুজনে মুম্বই চলে যাব। মুম্বইতে আমি নতুন চাকরিতে জয়েন করব। তার কয়েকদিন পরই চলে যাব কেনিয়ার জঙ্গলে---হনিমুন। তুমি সব বরযাত্রীদের নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসবে।'

ফ্যাসফ্যাসে গলায় অধীশ বলল, 'ম্যারেজ ডেসটিনেশন— মাল দ্বীভস্ বললে যাবে তো কেউ?'

'যাবে না মানে? ভেবে দেখো, প্লেন থেকে নেমে ইমিগ্রেশন নিয়ে, ভিসা অন অ্যারাইভাল সেরে স্পিডবোটে চেপে বসেছে বরযাত্রী। তারপর তীব্র গতিতে সমুদ্র জল কেটে ছুটে চলেছে একটি আইল্যান্ডের দিকে বিবাহ বাসরে যোগ দিতে! দেখো না, তোমাকে মাথায় তুলে নাচবে ওরা।'

বন্ধু ও স্বজনরা মাল দ্বীভস্-এর বিবাহ আসরে যোগ দিতে পেরে অধীশদের মাথায় তুলে নাচবে, না পায়ের নীচে আছড়াবে, সেটা পিতা-মাতা ঠাহর করতে পারছে না। আপাতত ম্যারেজ ডেসটিনেশনের ধাক্কায় সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। লাইফ বেল্ট ছাড়াই। ❖

চশমা বদল

দীপান্বিতা রায়

ছবি : নচিকেতা মাহাত

ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছে। বাদল গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করে ফেলেছে। এবার না বেরোলে দেরি হয়ে যাবে। এদিকে সুদীপ এখনও দোতলা থেকে নামছে না। রোমিতা আগে নেমে এসে গাড়িতে স্যুটকেস, খাবারের ব্যাগ এসব তুলে ফেলেছে। রিন্টিও মায়ের হাতে হাতে রয়েছে। অথচ এখনও সুদীপের দেখা নেই। মহা বিরক্ত হয়ে নীচ থেকেই হাঁক পাড়াপাড়ি করল রোমিতা। কোনো সাড়াশব্দ নেই। মায়ের নির্দেশে রিন্টি এবার জুতো পায়ে দিয়েই দুমদুম করে ওপরে উঠে গেল বাবার খোঁজ করতে। আর কয়েক সেকেন্ড পরেই তার গগনবিদারী গলা শোনা গেল, মা শিগগির এস, বাবা মোবাইল খুঁজে পাচ্ছে না....

ঠিক বেরনোর মুখে এহেন দুঃসংবাদে রোমিতার মোটামুটি মাথায় বজ্রাঘাত হল। সুদীপ সাধারণভাবে গড়ে ছ-মাসে একবার করে মোবাইল হারায়। ছাতা হারানোর গড় এত বেশি ছিল যে ছাতা ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছে। কালিম্পং-এ বেড়াতে গিয়ে লনে বসে গপ্প করার সময় পকেট থেকে মোবাইল বার করে ঘাসের ওপর রেখে চলে এসেছিল। পরে এলাকার নেড়ি কুকুররা সেটি মুখে নিয়ে খেলা করছে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে বাংলোর কেয়ারটেকার। উদ্ধার করে অবশ্য বিশেষ লাভ হয়নি। খেলাধুলোর চোটে ততক্ষণে সেটির পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। এই কারণেই সুদীপের ভয়ংকর ইচ্ছে সত্ত্বেও রোমিতা তাকে কিছুতেই দামী মোবাইল কিনতে দেয় না। ফোন করা এবং মানুষ চেনা যাবে এমন ছবি তোলা, এইটুকু করা যায় যে মোবাইলে, সেরকম মুঠোফোনই সুদীপের জন্য বরাদ্দ। স্মার্টফোনের দাম এখন অনেকটাই কমে গেছে বলে শেষ পর্যন্ত সেরকম একটি ফোনের মালিক হওয়ার সুযোগ পেয়েছে সুদীপ। নাহলে বেচারাকে এই সেদিন পর্যন্ত সেই আদ্যিকালের আনস্মার্ট ঢ্যাপা মোবাইলই ব্যবহার করতে হত। সেসব তো নাহয় নিত্যদিনের জ্বালা-যন্ত্রণা। কিন্তু আজ মোবাইল হারালে তো একেবারে সাড়ে সর্বনাশ। কারণ ট্রেনের টিকিট থেকে শুরু করে হোটেল বুকিং-এর ই-মেল সবই ওই ফোনের গর্ভে। আজকাল সর্বত্রই পেপারলেস হওয়াই ফ্যাশন। তাও রোমিতা বলেছিল সব জরুরি ডকুমেন্টের একটা করে প্রিন্ট আউট নিয়ে ব্যাগে রাখবে। কিন্তু সুদীপ রাজি হয়নি। সে আবার অতিরিক্ত পরিবেশ সচেতন মানুষ। প্রিন্ট আউট মানে কাগজ আর কাগজ মানেই গাছকাটা। অতএব প্রিন্ট-আউটের ব্যাপারে একেবারে অ্যাবসোলিউটলি নো নো। তখন কন্যাও বাবার ধামা ধরেছিলেন। এখন ম্যাও সামলাতে একা রোমিতা।

মোবাইলটা রেখেছিলে কোথায়?

এই তো বুককেসের ওপর রাখা ছিল....

ঠিক করে মনে করে দ্যাখো।

বউয়ের হুঙ্কারে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সুদীপ গলায় বাড়তি জোর এনে বলল, আমার একশো শতাংশ স্পষ্ট মনে আছে, মোবাইলটা আমি বুককেসের ওপরেই রেখেছি...

সুদীপের একশো শতাংশ মনে রাখার ব্যাপারে রোমিতার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। কারণ যে কোনো এই ধরনের গণ্ডগোলেই সুদীপ এরকম একশো শতাংশ স্পষ্টভাবে সবকিছু মনে আছে বলে দাবি করে এবং কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় তার এক শতাংশও সঠিক নয়। রোমিতা তাই নিজেই সম্ভাব্য যেসব জায়গায় মোবাইল থাকতে

পারে সেখানে খোঁজ করার আগে প্রচণ্ড বিরক্তভাবে বলল, মোবাইলের তো আর ডানা নেই যে ওখানে তুমি রাখলেও উড়ে অন্য কোথাও গিয়ে লুকোচুরি খেলবে।

না, তা নেই। তবে মানে তোমার তো আবার একটু গোছানো অভ্যাস, তাই ভাবছিলাম...

কী ভাবছিলে শুনি?

ট্রেনের দেরি হয়ে যাচ্ছে। ফলে রোমিতার মেজাজ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী।

না, মানে ভাবছিলাম তুমি বেশি সাবধান হতে গিয়ে গুছিয়ে স্যুটকেসে ঢুকিয়ে ফেলোনি তো?

রাগে প্রায় বাক্যস্ফূর্তি হয় না রোমিতার। ইতিমধ্যে সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গায় একবার চোখ বুলিয়ে এসে রিন্টি বলে, মা তোমার মোবাইল থেকে একবার রিং করো না...

বললাম তো কোনো লাভ নেই। ফোন সাইলেন্ট করা আছে...

সুদীপ খুব আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই বলল কথাটা। কিন্তু তবু যদি সুদীপ ভুল বলে থাকে এরকম একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে, রিন্টির কথামতো নিজের ফোনে নম্বরটা ডায়াল করে রোমিতা। রিং-টোন অবশ্য শোনা যায় না। কিন্তু ঘরের কোণে রাখা প্লাস্টিকের ডাস্টবিনটা হঠাৎ কেমন একটা বেখাপ্পাভাবে গোঁ গোঁ করে ডেকে ওঠে। রিন্টি ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা খুলতেই দেখা যায় বেশ কিছু বাতিল কাগজপত্রের বিছানায় শুয়ে নীল রঙের যন্ত্রটি আর্তনাদ করছেন। সুদীপ ব্যাগ খালি করে ফালতু কাগজ ফেলার সময় ফোনটিকেও তার সঙ্গে মুড়ে সেখানে বিসর্জন দিয়েছে।

সেবার বেড়ানোর বাকি পর্বটি মোটামুটি নির্বিঘ্নেই কেটেছিল। শুধুমাত্র মানালির হোটেল থেকে বেরোনর সময় নতুন কেনা সোয়েটার আর মাফলার ঠাসা ব্যাগটি আর একটু হলেই ফেলে আসা হত। গাড়িতে মাল তোলার দায়িত্ব ছিল সুদীপের। রোমিতা গেছিল বিল পেমেন্ট করতে। তবে শেষ মুহূর্তে মায়ের নির্দেশে রিন্টি আর একবার ঘর পর্যবেক্ষণ করতে যাওয়ায় ব্যাগ উদ্ধার হয় এবং সুদীপকে ফের একবার শিলে বাটার সুযোগ রোমিতার হাতছাড়া হয়।

সুদীপের ভুলো স্বভাব তাদের তিনজনের সংসারে একটা বেশ উল্লেখযোগ্য গল্প। সুদীপ কিন্তু বেসরকারি ব্যাংকে রীতিমতো উঁচু পদে চাকরি করে। ব্যাঙ্ক মানেই লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে কারবার। সবটাই আবার অন্যের টাকা। সুতরাং সামান্যতম গণ্ডগোল হলেই মুশকিল। গণ্ডগোল কিন্তু হয় না। অফিসের কাজ সে একেবারে নিখুঁত-নির্ভুলভাবে করে। অথচ বাড়ির কোনো কাজের সময় তার কিছুই ঠিকঠাক মনে থাকে না। সবথেকে মজার ব্যাপার হল, শুধু মনে থাকে না তাই নয়, এই মনে না থাকার কথাটা সে কিছুতেই স্বীকারও করতে চায় না। সবসময় তার একটা নিজস্ব যুক্তি থাকে যেটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোমিতার জন্য আগুনে ঘৃতাহুতির ভূমিকা পালন করে। দু-একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

শীতকাল। রবিবারের সকালে সুদীপ গেছে সাপ্তাহিক কাঁচা বাজার করতে। গেছে বললে একটু অতিশয়োক্তি করা হবে। তাকে ঠেলে পাঠানো হয়েছে। বাজার করতে যাওয়াটা সুদীপের বিশেষ অপছন্দের। প্রতিটি ঋতুর জন্য তার এই অপছন্দের ভিন্ন ভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন গ্রীষ্মে বিকট গরম, বর্ষায় প্যাচপেচে কাদা, শীতে আলসেমি ইত্যাদি-প্রভৃতি। সুদীপের শালি একবার বসন্তের কারণটা জিজ্ঞাসা করায় সুদীপ অবলীলায় বলেছিল, বসন্তকালে চারপাশটা এমন সুন্দর থাকে যে বাজারে গেলে আমার মুড খারাপ হয়ে যায়। ঋতুরাজের সঙ্গে সবজি আর মাছের আদা-কাঁচকলা সম্পর্ক আছে বলেই আমার ধারণা।

এদিকে সে কিন্তু বেশ ভোজনরসিক। অন্যে বাজার করে দিলে গুছিয়ে খেতে পছন্দ করে। বাজার যাতে করতে না হয়, সেজন্য বিয়ের ঠিক পরপরই রোমিতাকে একটা গল্প শুনিয়েছিল সুদীপ। বিয়ের আগে চাকরির কারণেই তাকে কিছুদিন মফস্সলের একটা ব্যাচেলারস্ মেসে থাকতে হয়েছিল। মেসের নিয়ম ছিল প্রত্যেক বোর্ডারকে পালা করে বাজারে যেতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই কিছুদিন পরে একদিন সুদীপেরও পালা পড়ল। নতুন ছেলে। মেসের অন্য বোর্ডারদের তার সম্বন্ধে কোনো সম্যক ধারণা ছিল না। ফলে সুদীপ বাজার গেল এবং মাছসুদ্ধ থলেটি বাজারেই ফেলে বাড়ি চলে এল। ঘটনাটা শুনে মেসের বৃদ্ধ এবং হাড় কিপটে বোর্ডার, দাস সাহেব নাকি অসহায় ক্রোধে দাঁত কিড়মিড় করে বলেছিলেন,

তোমরা ওকে কেন বাজারে পাঠিয়েছ? আমি তো জানি এরকমটাই ঘটবে। ও তো কবিতা লেখে। আকাশের দিকে তাকিয়ে রাস্তা হাঁটে।

সুদীপ কোনোদিন একলাইনও কবিতা লেখেনি। কিন্তু এই গল্পটা সে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই রোমিতাকে শুনিয়েছিল। আশা ছিল রোমিতা নিশ্চয় দাস সাহেবের সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করবে না। কিন্তু লাভ হয়নি। রোমিতা অতি জাঁদরেল বউ। তার সাফ কথা হল, বাজার দুজনকেই করতে হবে। অতএব তার তাড়নায় শীতের সকালে বাজার যেতে হয়েছে সুদীপকে।

সুদীপ যখন বাজার থেকে ফিরছে, তখনই তাকে দেখে কিংবা আরও নির্দিষ্ট করে বললে বাজারের থলিটা দেখে একটু অবাক হয়েছিল রোমিতা। বাজার করতে নিমরাজি হলেও সুদীপের একটা শর্ত আছে। কী কী আনতে হবে তার একটা লিস্ট তাকে বানিয়ে দিতে হবে। রোমিতা তাতে আপত্তি করেনি। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছেলের মধ্যে সুদীপকেই পছন্দ করে বিয়ে করলেও, সুদীপের বাজার পছন্দের ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। তাছাড়া পুঁইডাঁটা আনলে যে তার সঙ্গে কুমড়ো আনতে হয় কিংবা কচুরশাকের সঙ্গে যে নারকেল লাগে সেসব ধারণা রোমিতার বরের একশো মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যেও ঘোরাফেরা করে না। অতএব লিস্ট বানিয়ে দেওয়াটাই যুক্তিগ্রাহ্য, নিরাপদ সিদ্ধান্ত। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বাজারে বেরোনর আগে রোমিতা নিজে তালিকাটি বরের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে।

শীতের সবজিতে ব্যাগ ভর্তি। কানা উপচে বাইরে উঁকি দিচ্ছে চিকণ সবুজ তাজা পেঁয়াজকলি। কিন্তু পেঁয়াজকলি তো আজকের তালিকায় ছিল না। মনে মনে একটু ভুরু কোঁচকায় রোমিতা। তবে মুখে কিছু বলে না। চিংড়ি মাছ কিংবা মটরশুঁটি দিয়ে পেঁয়াজকলি ভাজা তার নিজের খুব পছন্দের খাবার। সুদীপও ভালোবাসে।

সেজন্যই হয়তো তাজা কলি পেয়ে নিয়ে এসেছে। ব্যাপারটা সুদীপের পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক হলেও, সে নিয়ে আর মাথা ঘামায় না রোমিতা। হাতে সময়ও বিশেষ নেই। রান্নার লোক কমলাদি এসে গেছে। কমলাদি আবার সবসময় ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসে। তারজন্য সবজি-পাতি, মশলা সব গুছিয়ে হাতের কাছে রাখতে হয়। তিনি একেবারে চার হাতে কেটে-বেঁটে-ছ্যাঁকছোঁক করে পাঁচ পদ টেবিলে বসিয়ে দিয়ে চলে যান। কাজের সময় কথাবার্তাও বিশেষ বলেন না। হাইলি প্রফেশনাল। মুশকিল হচ্ছে রোমিতা সবসময় কমলাদির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রফেশনাল হতে পারে না। পিছিয়ে পড়ে। এই যেমন আজ হয়েছে। কমলাদির পেশাদারিত্বের কথাটা মাথায় রাখলে তার বাজারটা আগের দিন রাতে করা উচিত ছিল। কিন্তু করেনি। ভয়ানক অপেশাদারের মতো সিনেমা দেখতে চলে গেছিল। অতএব কমলাদিকে এসে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এহেন অসৈরণ কাণ্ডকারখানায় তার মুখখানা তেলো হাঁড়ির মতো হয়ে আছে। রোমিতা তাই আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি বাজারের থলি রান্নাঘরের মাটিতে উপুড় করে। হুড়মুড় করে ফুলকফি, বাঁধাকফি, বেগুন, ক্যাপসিকামের সঙ্গে বেরিয়ে আসে কুমোরের চাকের মতো কাগজে মোড়া মস্ত এক তাল পাটালি। গত সপ্তাহেই পাটালি আনা হয়েছে। তার বেশিটাই এখনও ঘরে মজুত। তাহলে আবার পাটালি আনা হল কেন? মনের মধ্যে গজগজিয়ে ওঠা প্রশ্নটাকে কোনোরকমে ভিতরে ঠেলে প্রথমে কমলাদিকে রান্না বুঝিয়ে দেয় রোমিতা। তারপর সোজা হাজির হয় বসার ঘরে।

তুমি আজ আবার পাটালি এনেছ কেন? পাটালি তো আছে।

তুমি লিস্টে লিখে দিয়েছ, তাই এনেছি।

কাগজ পড়তে পড়তে শান্ত উত্তর সুদীপের। এবার রেগে ওঠে রোমিতা।

কক্ষনো আমি লিখিনি। পাটালিও আমি লিখিনি, পেঁয়াজকলিও লিখিনি...।

রোমিতার মনে হল তার মাথার মধ্যে একটা বোমা রয়েছে।

তুমি যা লিখেছ আমি তাই এনেছি। নিজে থেকে কিছুটি আনিনি।

একদম বাজে কথা বোলো না। তুমি নির্ঘাৎ লিস্টটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছ।

ভুলে যাওয়ার কথা তুলে খোঁটা দেওয়ায় রেগে যায় সুদীপ। মোটেই আমি ভুলিনি, এই তো লিস্ট....

ট্রাউজারসের পকেট থেকে লিস্টটা বার করে এগিয়ে দেয় সুদীপ। সেটা হাতে নিয়ে কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে যায় রোমিতা। তারই হাতের লেখায় সেখানে পাটালি আর পেঁয়াজকলি দুটো শব্দই লেখা আছে। পরমুহূর্তেই করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কারের মতো আনন্দে লাফিয়ে ওঠে,

এটা তো আগের সপ্তাহের লিস্ট...তুমি সেই লিস্ট দেখে বাজার করে এনেছ!

স্ত্রীর এহেন আক্রমণে সামান্য হতভম্ব হয়ে যায় সুদীপ। কিন্তু প্রতিবাদ করতে ছাড়ে না, মোটেই না। এটাই আজকের লিস্ট। তুমি এটাই আমাকে দিয়েছ...

রোমিতা ছাড়বার পাত্রী নয়। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সে সুদীপের বুকপকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে বলে, এই তো। এটা তো আজকে দিয়েছিলাম। তুমি সব ভুলভাল কিনে এনেছ। এবার সারা সপ্তাহ রান্না করতে গিয়ে আমাকে কথা শোনাবে কমলাদি...

সুদীপ বউয়ের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে। তারপর অম্লানবদনে বলে, দোষ তোমারই রোমি। লিস্টের ওপর তারিখ দেওয়া উচিত ছিল। প্রপার ডেট ছাড়া কোনো কাজই ঠিক করে করা যায় না।

এরকম উদাহরণ অজস্র। রোমিতা অফিসে কাজে ব্যস্ত। এমন সময় উদ্বিগ্ন সুদীপের ফোন।

রোমি আমার কালো ট্রাউজারসটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

ব্যস্ততার মধ্যে এহেন ফোনে ভয়ানক বিরক্ত রোমিতার প্রথম প্রতিক্রিয়া হল, কল্পনা দিকে বলো, খুঁজে দেবে।

কল্পনাদি তাদের বাড়ির অনেকদিনের কাজের লোক। বাড়ির সব কিছুই তার নখদর্পণে। তাকে না বলে অফিস টাইমে বউকে ফোন করার কী অর্থ রোমিতার মাথায় ঢোকে না। কিন্তু সুদীপ নিজের জায়গায় অনড়, কল্পনাদিকেই তো বলেছি। বললাম যে কাল অফিস থেকে ফিরে ট্রাউজারসটা আলমারিতে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন খুঁজে পাচ্ছি না। কল্পনাদি পাত্তাই দিল না। বলল, নিশ্চয় অন্য কোথাও রেখেছেন। ভালো করে মনে করে দেখুন। কিন্তু রোমি আমি একশো শতাংশ নিশ্চিত যে ট্রাউজারসটা আলমারিতেই রেখেছিলাম। ওটা ওখান থেকেই গায়েব হয়েছে।
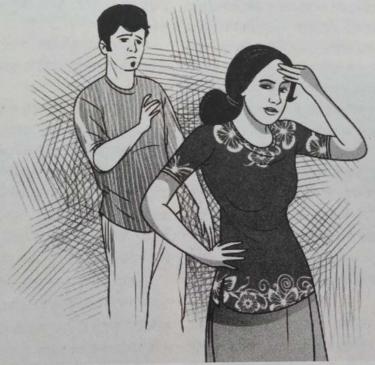
রোমিতার মনে হল তার মাথার মধ্যে একটা বোমা রয়েছে। সলতের আগুনটা টিকটিক করে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আগের

দিন সন্ধেবেলা সুদীপ যখন অফিস থেকে ফেরে, তখন বাড়িতেই ছিল রোমিতা। জামা-কাপড় বদলে সুদীপ যে সেগুলো গুছিয়ে আলমারিতে রেখেছে সে নিজেই দেখেছে। আগুনটা পলতেয় লাগতেই দুম্। ফেটে গেল বোমা। দাঁতে দাঁত চিপে রোমিতা বলল,

শোনো সুদীপ কাল সন্ধেবেলায় তুমি ট্রাউজারসটা আলমারিতে রেখেছ তো। তারপর একমাত্র যদি বাড়িতে ডাকাত পড়ে, সর্বস্ব লুঠ হয়ে যেত, তাহলে হয়তো ওটা গায়েব হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। তা যখন হয়নি তখন ওটা আলমারিতেই আছে। ভালো করে খুঁজে দ্যাখো।

ট্রাউজারস্ অবশ্য খুঁজে পায়নি সুদীপ। অন্য সেট পরে অফিস গেছিল। বিকেলে বাড়ি ফিরে রোমিতা দেখেছিল, আলমারির ভিতরে হ্যাঙ্গারে নিশ্চিন্তে ঝুলছে সুদীপের কালো ট্রাউজারস্। সুদীপ নিজেই তার ওপর একটা শার্টও গুছিয়ে রেখেছে এবং সেটা বেমালুম ভুলে গিয়ে শার্টের নীচে রাখা ট্রাউজারসটিকে গরু খোঁজা করেছে।

এরকমভাবেই সুদীপ-রোমিতার সংসার চলে এবং চলছিলও। তবে এবার যেটা ঘটল সেটা এককথায় তুলনাহীন। রোমিতা সাধারণত বেশ সকাল সকাল অফিস যায়। সুদীপ বেরোয় একটু পরে । সেদিন সাড়ে দশটা নাগাদ অফিসে রোমিতার ফোন বাজল। স্ক্রিনে সুদীপের নাম দেখে একটু অবাকই হল রোমিতা। সে যে এইসময় সাংঘাতিক ব্যস্ত থাকে সেটা সুদীপ খুব ভালোমতোই জানে। তাও ফোন করছে কেন? তার চারপাশে তখন একটা সাংঘাতিক ক্যাকোফেনি চলছে। অন্তত দশজন লোক বিভিন্ন কাজে একসঙ্গে তাকে ডাকাডাকি করছে। রোমিতাও অনেকটা দশাননের কায়দায় (যদিও দশানন ঠিক কী কায়দায় কথা বলে সেটা তার ঠিকঠাক জানা নেই) তাদের সবার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। দশভুজার মতো সবকাজ একসঙ্গে সামলানোর ব্যর্থ চেষ্টাও করছে। তবু ফোনটা যেহেতু বরের তাই ধরল। ফোনের ওপাশে সুদীপের একটু দ্বিধামিশ্রিত গলা, রোমি, তুমি কি তোমার পুরোনো চশমাটা আমার চশমার খাপের মধ্যে রেখেছিলে?

একে প্রচণ্ড কাজের চাপ, তারমধ্যে এরকম একখানা কিম্ভূত প্রশ্ন। আমার পুরোনো চশমা! তোমার চশমার খাপ ! কিছুই মাথায় ঢুকল না রোমিতার। তবে ব্যাপারটা যে শ্বশুরমশাইয়ের হার্ট অ্যাটাক কিংবা রিন্টির স্কুল থেকে আকস্মিক গার্জেন কলের মতো গুরুতর কিছু নয় সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না। তাই সে আর দেরি না করে, অনেকটা মাছি তাড়ানোর মতো সুরে, না না আমি রাখিনি....

বলে ফোনটা কেটে দিল এবং পরমুহূর্তেই ফোনের কথা ভুলে গিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারপরে বেশ ঘণ্টা তিনেক কেটে গেছে। রোজকার মতোই পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে রোমিতাও কিছুটা ধাতস্থ। হাউস কিপিং এক কাপ কফি দিয়ে গেছে। তার সঙ্গে খাবে বলে সবে কুকিজের প্যাকেটটা বার করেছে, এমন সময় আবার ফোন। এবার সুদীপের জুনিয়র শিবাশিসের। রোমিতাও তাকে ভালোমতোই চেনে। তাই খুশি খুশি মুখে ফোনটা ধরতেই শোনা গেল শিবাশিসের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ, বউদি, দাদা সিঁড়িতে পড়ে গেছেন। কোমরে, পায়ে বেশ লেগেছে। কিছুতেই আপনাকে ফোন করতে দিচ্ছিলেন না। বলছিলেন একলাই বাড়ি চলে যাবেন। কিন্তু আমাদের মনে হল একলা ছাড়াটা ঠিক হবে না। তাছাড়া একবার ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়াও বোধহয় দরকার...

পরের কয়েকঘণ্টায় রোমিতার ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেল। কোনোরকমে বাদলকে ডেকে, সুদীপের অফিসে গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে সোজা ডাক্তারের চেম্বারে। যাওয়ার পথেই ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিল। তিনি দেখে বললেন, হাড় ভাঙেনি তবে পড়ে যাওয়ায় পেশিতে টান পড়েছে। অন্তত তিন দিন বিশ্রাম নিতে হবে। আচমকা মাথা ঘুরে পড়ে গেছে কিনা বুঝতে প্রেসার চেক এবং আনুষঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করা হল।

বাড়ি ফিরে সুদীপকে খাটে আরাম করে বসিয়ে, নিজেও খানিকটা সুস্থিত হয়ে রোমিতা জিজ্ঞাসা করল, তুমি পড়লে কী করে? পা স্লিপ করে গেছিল?

সুদীপ চুপ। বউ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখেও তার মুখে কুলুপ। হঠাৎ রোমিতার মাথার মধ্যে বিদ্যুতের ঝলকের মতো সকালের ফোন কলটা ভেসে এল। তখন নেহাত ব্যস্ত ছিল। কিন্তু নিজের বরকে তো সে গত কুড়ি বছর ধরে চেনে। কোমরে হাত দিয়ে ভুরু কুঁচকে এবার সুদীপের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে রোমিতা বলল, সুদীপ, তুমি কি বাই এনি চান্স নিজের চশমার বদলে আমার পুরোন চশমাটা পরে অফিসে চলে গেছিলে?

চোরের মতো মুখ করে নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল সুদীপ,

না মানে আসলে দুটো চশমা তো একইরকম দেখতে (রোমিতার পুরোনো চশমাটা ডিপ ব্রাউন রঙের আর সুদীপের কালো ফ্রেম) তাই ঠিক বুঝতে পারিনি বুঝলে....

চশমাটা পরেও বুঝতে পারোনি এটা নিজের চশমা নয়...?

গাড়িতে কাগজ পড়তে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। ঝাপসা ঝাপসা লাগছিল। আমি ভাবলাম চশমাটা সকালে মোছা হয়নি তো তাই...কিন্তু চেম্বার থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দেখি ধাপগুলো বিশাল বড় আর ভয়ানক নীচু...আন্দাজে যেই পা ফেলতে গেছি অমনি গড়িয়ে গেলাম...

খাটের পাশে রাখা চেয়ারটায় বসে পড়ে হতভম্ব হয়ে সুদীপের দিকে তাকিয়ে থাকে রোমিতা। বরের এহেন কনফেশনের পর তার আর বাক্যস্ফূর্তির ক্ষমতা থাকে না। ❖

পুনশ্চ আমিরশাহি

নন্দিতা বাগচী

করোনাকালে প্রায় আঠেরো মাস গৃহবন্দি থাকার পর আমরা স্থির করলাম অনেক হয়েছে, এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। দ্বিতীয় প্রতিষেধক টিকাটি নেবার পর থেকেই আমাদের মন উড়ু উড়ু। তার ওপরে আমাদের বাৎসরিক পরিযানে আমেরিকা যাবার টিকিটটি কাটা আছে প্রায় বছরখানেক আগে থেকে।

কিন্তু এ এক অদ্ভুত সময়। যাব বললেই যাওয়া যায় না। আগে বিদেশে যেতে প্রয়োজন হত প্লেনের টিকিট, পাসপোর্ট আর ভিসা। কিন্তু এখন প্রয়োজন টিকাকরণের সার্টিফিকেট এবং আরটি-পিসিআর-এর রিপোর্টও। সেসব নয়তো জোগাড় করা গেল কিন্তু আমেরিকাই যে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে আমাদের জন্য।

এমিরেটস প্যালাসের অভ্যন্তরে সুদৃশ্য থাম

তবে সবকিছুরই একটা বিকল্প ব্যবস্থা করে রেখেছেন ঈশ্বর। তাই সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বাঁকানো যেতে পারে। উকিল মশাইদের মতো একটা পালাবার পথ খুঁজে পেলাম আমরা। জানা গেল, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে যদি চোদ্দো দিন নিভৃতবাসে থেকে যাই তবে শুদ্ধ হয়ে যেতে পারি আমরা।

এই গঙ্গাস্নানের ব্যাপারটি আমাদের মনে ধরলেও নিভৃতবাসের ব্যাপারটি ভয়ানক মনে হল। নির্দিষ্ট একটি ঘরে চোদ্দো দিন বন্ধ থাকতে হবে, ভুলেও দরজার বাইরে পা রাখা

গ্র্যান্ড মসজিদ

চলবে না, একজন সেবক নিজেকে প্লাস্টিকের পোশাকে মুড়ে এসে দরজার বাইরে খাবারের ট্রে রেখে বেল বাজিয়ে চলে যাবে, ইত্যাদি। সাত-পাঁচ নানা ফন্দি আঁটছি আমরা আর তখনই দুবাই আমাদের জন্য দরজা খুলে দিল। অর্থাৎ আমাদের যদি দুটো প্রতিষেধক টিকা নেওয়া থাকে এবং উড়ানের আটচল্লিশ ঘণ্টা আগেকার আরটি-পিসিআর টেস্ট নেগেটিভ হয় তবে আমরা ওই দেশে প্রবেশ করতে পারি। সেখানে চোদ্দো দিন থেকে আমেরিকায় রওনা হবার ছাড়পত্র পেতে পারি। কেননা আমেরিকার কালো থুড়ি লাল লিস্টে দুবাইয়ের নাম নেই।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদেরকে সজ্জিত করলাম। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগেকার আরটি-পিসিআর টেস্টের রেজাল্টও নেগেটিভ এল। খুশিতে ডগমগ আমরা।

পারস্য উপসাগরের তীরে কর্নিশ

দিব্যি টের পেলাম আমাদের পিঠে দুটো করে ডানা গজাচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই আরেক বিধিনিষেধ এল এয়ারলাইনের তরফ থেকে। কী, না তিন ঘণ্টা নয়, ছয় ঘণ্টা আগে রিপোর্ট করতে হবে এয়ারপোর্টে। সেখানে উড়ানে ওঠার আগে আরেক দফা র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করতে হবে দুবাই যাবার জন্য। যার জন্য মজুদ রাখতে হবে জনপ্রতি পাঁচ হাজার টাকা। ভাবি, "সমুদ্রে পেতেছি শয্যা" ইত্যাদি।

যা হোক দমদম এয়ারপোর্টে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট এবং দুবাই এয়ারপোর্টে আরেক দফা আরটি-পিসিআর টেস্ট করে ছাড়পত্র পেলাম আমরা দুবাইয়ে প্রবেশের। এযারপোর্ট থেকে বেরিয়ে মনে হল যেন বহু বছর হাজত বাসের পর ছাড়া পেয়েছি আমরা।

জুমেইরা বিচের হোটেলটি আমাদের পূর্ব পরিচিত। পরিচিত এখানকার নানা দ্রষ্টব্য। পৃথিবীর সর্বোচ্চ বাড়ি বুর্জ খালিফাও। তবে নব নব সংযোজন হয়েছে তার আশেপাশে। যেমন একটি নতুন দ্বীপ তৈরি হয়েছে দুবাই মেরিনা আর জেবেল আলির মাঝামাঝিতে। হ্যাঁ, দুবাইয়ের পারস্য উপসাগরে নতুন নতুন দ্বীপ (Reclaimation Land) তৈরি করা হয়। যেমন Palm Jumeirah Island এবং World Island। তা এই নবনির্মিত দ্বীপটির নাম Blue Waters Island, আর এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পৃথিবীর সবচাইতে উঁচু Ferris Wheel-টি। London Eye-এর আদলে যার নাম রাখা হয়েছে Ain Dubai আমাদের হোটেলের ঠিক পাশেই তৈরি হয়েছে এক আকাশছোঁয়া বাড়ি যার নাম Jumeirah Gate, অবিকল একটি তোরণের মতোই দেখতে বাড়িটি। হাজারখানেক ফুট উঁচু বাড়িটিতে আছে সম্পূর্ণ কাচ দিয়ে তৈরি দুটো টাওয়ার। এই টাওয়ার দুটির নীচের কয়েকটি তল এবং উপরের কয়েকটি তল সংযুক্ত এবং মাঝখানে এক বিশাল শূন্যতা। ফলে বাড়িটি একটা তোরণের আকার পেয়েছে। এটাই অভিনবত্ব এই অট্টালিকাটির এবং এই কারণেই পর্যটকেরা আকর্ষিত হন। এ ছাড়াও দুবাইয়ের নতুন আকর্ষণ হল Frame of Dubai এবং Museum of Future।

জুমেইরা বিচ রেসিডেন্সিয়াল ওয়াক (যাকে JBR Walk বলা হয়ে থাকে)-এর সমান্তরাল বিচটিকেও সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে চওড়া করা হয়েছে অনেকটা। আর সেখানের ঘাঁটি গেড়েছে অসংখ্য রেস্তোরাঁ, শিশাবার আর পানশালা। সন্ধে হতে না হতেই স্থানীয় মানুষ এবং পর্যটকে গমগম করে এলাকাটা। কেউ বেরিয়েছেন হাওয়া খেতে, কেউ বা ধোঁয়া ওড়াতে। রাত বাড়তে থাকে আর শিশাবারগুলোর সঙ্গে সঙ্গে পানশালাগুলোর উন্মাদনাও বাড়তে থাকে। ডিজেরাও মূর্ছনার গতি বাড়াতে থাকেন। দুবাইয়ে মানুষ আসেন ছুটি কাটাতে আর ফুর্তি করতে। তাঁরা ভুলে যেতে চান যে পৃথিবীটা রোগে ভুগছে।

আমরাও ভুলে যাই যে নিভৃতবাসে না হলেও গঙ্গাস্নান করতে এসেছি নিজেরা, নিজেদের শুদ্ধ করবার জন্য। পনেরোটা দিন ঘুরে-বেড়িয়ে, খেয়ে-দেয়ে কাটাই।

মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটা দেশ আমরা আগেই দেখেছি। তবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির রাজধানী আবুধাবিতে কখনো

এমিরেটস প্যালাসের সামনে লেখিকা

যাইনি। অথচ একটা চমৎকার মসজিদ আছে সেখানে যেটা দেখতে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন মানুষ। তাই হোটেলেই খোঁজ-খবর নিয়ে একটা ট্যুর কোম্পানির গাড়ি ভাড়া করলাম আমরা সারাদিনের জন্য। দক্ষিণা তিনশো ডলার। ঘণ্টা দুয়েকের পথ।

সকাল নটার মধ্যে বুফে ব্রেকফাস্ট খেয়ে, তৈরি হয়ে হোটেলের লবিতে এসে দাঁড়ালাম আমরা। গাড়িও পৌঁছে গেল সময় মতোই। গাড়ির ড্রাইভার আরশাদ পাকিস্তানের মানুষ। ইংরেজির সঙ্গে উর্দু মিশিয়ে কথা বলতে লাগল। মধ্যপ্রাচ্যের এই ব্যাপারটা বেশ মজার। এয়ারপোর্টের কর্মী, হোটেলের কর্মী, ট্যাক্সির চালক, সবাই ভারতবর্ষের, পাকিস্তানের নয়তো বাংলাদেশের। আফ্রিকা বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষও কিছু আছেন, তবে তুলনায় কম।

শেখ জায়েদ রোড ধরে দক্ষিণ দিশায় এগিয়ে যাই আমরা আবুধাবির দিকে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি এই সংযুক্ত আরব আমিরাত সংগঠিত হয়েছে সাতটি আমিরাত Abu Dhabi, Dubai, Shanjah, Ajman, Umm AL Quwain, Ras Al Khaimah ও Fujairah নিয়ে। যার ভেতরে সারা পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি পরিচিতি লাভ করেছে দুবাই। মস্ত মস্ত বহুতল আর নিত্য নতুন চমক দিয়ে পর্যটকদের আকর্ষণ করতে ওস্তাদ এ শহর। তবে আয়তনে আর প্রাধান্যে শীর্ষস্থানটি আবুধাবির। আর এটিই সংযুক্ত আরব আমিরশাহির রাজধানী।

ঝাড়বাতি

এমিরেটস প্যালেসের প্রবেশদ্বার
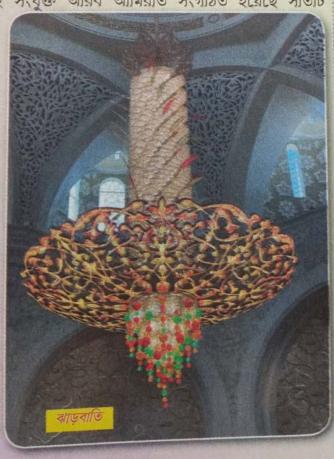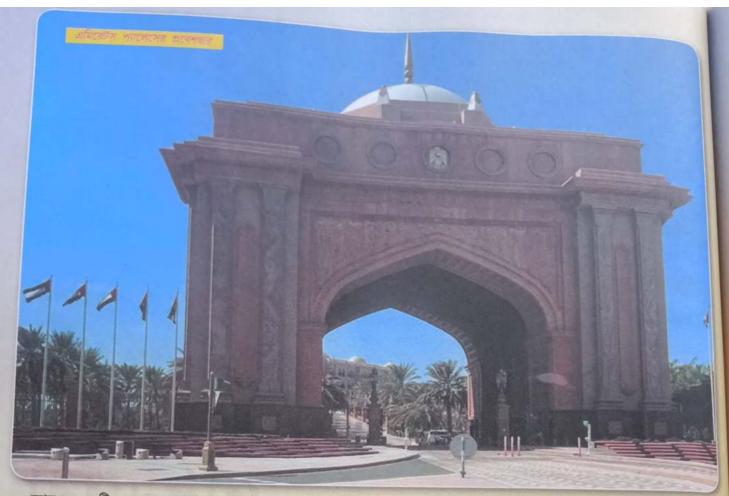
আরও একটি মজার ব্যাপার হল এই আবুধাবি শহরটা একটা দ্বীপে অবস্থান করে। শুধু তাই নয়, ছোটো-বড়ো দুশোটি দ্বীপ আছে এই আমিরাতে। আর আছে সাতশো কিলোমিটার জোড়া সৈকত। সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট Khalifa bin Zayed AL Nahyan তাঁর পরিবারসহ বসবাস করেন এই শহরেই। তবে ডেপুটি প্রেসিডেন্ট, যিনি কিনা দুবাইয়ের শাসনকর্তাও সেই Sheikh Mohammed bin Rashid AL Maktoum বসবাস করেন দুবাইয়ে।

ইবন বতুতা গেট ও জলকে হাতের বাঁয়ে ও পাম জেবেল আলিকে হাতের ডাইনে রেখে এগোতে থাকি আমরা। মরুভূমির মাঝখান দিয়ে রাস্তা। হঠাৎ হঠাৎ আসছে একেকটা লোকালয়। ছোটো ছোটো গ্রাম্য দোকানপাট, বাড়ি। তবে তারই মাঝে বাজারি মসজিদ, খেজুর গাছ। কিন্তু যতই আবুধাবি শহরের দিকে এগোতে থাকি, পরিকল্পিত নতুন নতুন লোকালয় এসে হাজির হয়।

আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপারে ড্রাইভার আরশাদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। যখন আমরা দুবাই আমিরাতের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন রাস্তার রং ছিল নীলচে কালো। আর আবুধাবি আমিরাতে গাড়ির চাকার ছোঁয়া পড়তেই সেটা হয়ে গেল বাদামি। কেমন যেন আরব্য রজনীর মতো জাদুর চমৎকারিত্বের আভাস পেলাম আমরা। রাস্তার ধারে ধারে সবুজায়নের প্রয়াসও লক্ষ করলাম।

আরেকটি চমৎকারিত্বের কথাও না বললেই নয়। সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনাবৃষ্টির জন্য ধু ধু করছে মরুভূমি। গ্রামের মানুষ জলকষ্টে ভোগেন, চাষবাস করতে পারেন না। গরমের দাপটে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। অথচ রাজকোষে উপচে পড়া ধন-দৌলত। তাই আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে cloud seeding করে বৃষ্টিপাত করানো হচ্ছে দুবাই ও আবুধাবিতে। এই ক্লাউড সিডিং-এর কথা শুনে চমকে উঠেছিলাম আমি। এ যে খোদার ওপর খোদকারি। ছোটো ছোটো প্লেন বা ড্রোন আকাশে পাঠিয়ে জমা মেঘে ইনজেক্ট করা হচ্ছে dry ice বা silver iodite, আর মেঘের জলকণাগুলো গুটি গুটি পায়ে তাদের পাশে গিয়ে ঘনীভূত হচ্ছে এবং বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে। একবার এইরকম বৃষ্টির বীজ পুঁততে নাকি খরচ হয় তিন হাজার ডলার। আর এমন চেষ্টা নাকি বছরে দুশো-আড়াইশো বার করা হয়। এমন গল্প শুনে আরব্য রজনীর জাদুর কথা মনে হতেই পারে।

Khalifa City কে হাতের ডাইনে এবং Zayed City-কে হাতের বাঁয়ে রেখে Musaffah ব্রিজ পেরিয়ে আমরা এগিয়ে যাই আবুধাবি দ্বীপের গ্র্যান্ড মস্কের দিকে।

এতিহাদ টাওয়ারস
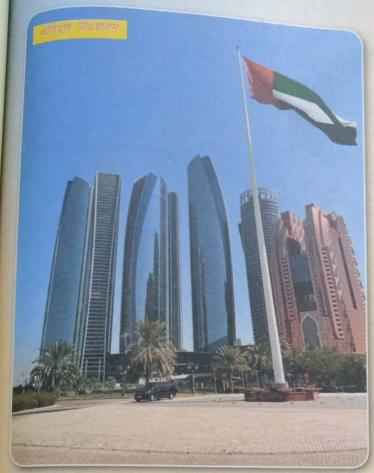
এর আগে মসজিদ দেখেছি আমি বাইরে থেকে। কলকাতার অসংখ্য মসজিদ ছাড়াও দিল্লির জামা মসজিদ দেখেছি। দুবাই ও কাতারের নানা মসজিদ দেখেছি। নাইজেরিয়ার শহুরে ও গ্রাম্য মসজিদও দেখেছি অনেক। মিশরের নানা মসজিদ দেখারও সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তবে শুধুমাত্র একটি মসজিদের শৈল্পিক সৌন্দর্য দেখার জন্য দেড়শো কিমি পথ ডিঙিয়ে ছুটে যাইনি কখনো।

তথ্য অনুযায়ী ২০০৭ সালে উদ্বোধিত এই গ্র্যান্ড মস্কটির পরিকল্পনা ছিল প্রয়াত Shikh Zayed bin Sultan AL Nahyan-এর। যাঁর নামে নামাঙ্কিত মসজিদটি তৈরি করতে খরচ হয়েছিল সাড়ে পাঁচশো মিলিয়ন ডলার। মসজিদের ভিতরে গিয়ে পদে পদে উপলব্ধি করি যে কেন এই বিপুল অর্থ খরচ হয়েছিল। মসজিদটির এগারোশোটি মার্বল দিয়ে তৈরি স্তম্ভে রয়েছে মূল্যবান রত্নের কারুকাজ। রয়েছে বিরাশিটি গম্বুজ, যেগুলির ভিতরের দিকে খোদিত আছে মরক্কোর শিল্প এবং কোরানের স্তবক। সম্পূর্ণ মসজিদটি তৈরি হয়েছে শ্বেত মর্মর দিয়ে। মহামূল্য ক্রিস্টাল দিয়ে তৈরি সাতটি মস্ত মস্ত ঝাড়বাতি টাঙানো আছে মসজিদের প্রার্থনা গৃহটি জুড়ে। প্রধান হলটির ঝাড়বাতিটি যার ওজন বারো টন তৈরি হয়েছে শুদ্ধ চব্বিশ ক্যারাট সোনা দিয়ে গিলটি করে আর অসংখ্য Swarovski ক্রিস্টাল দিয়ে। জার্মানির একজন শিল্পীই এই ঝাড়বাতিগুলোর স্রষ্টা।

গ্র্যান্ড মস্কের বারো হেক্টর জমির ওপরে ছড়িয়ে আছে নানা সম্পদ, গাছগাছালি এবং জলাশয়। কিন্তু সবচাইতে আকর্ষণীয় জিনিসটি হল ইরানে তৈরি পাঁচ হাজার সাতশো স্কোয়্যার ফুটের কার্পেটখানা যার ওজন পঁয়ত্রিশ টন। যেটি Ginness book of world record-এ পৃথিবীর সবচাইতে বড়ো হাতে বোনা কার্পেট হিসেবে নিজের নামটি কায়েম করে নিয়েছে। তবে মার্বেলের কারুকাজ করা খোলা চত্বরটিও প্রশংসার দাবি রাখে একশো ভাগ। আর দেওয়ালে দেওয়ালে খোদাই করা ঈশ্বরের প্রশস্তিগুলোও মনোমুগ্ধকর।

মসজিদটি ঘুরে দেখতে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগল আমাদের। তবে ঘোর লাগা অবস্থাটা কেটে যাবার পর মনে হল, এমন বড়ো একটা মসজিদ তৈরি করা হয়তো প্রয়োজন ছিল একটা ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের দেশে, যেখানে ঈদের দিনে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হাজার মানুষ একসঙ্গে বসে প্রার্থনা করতে পারেন। তবে ওই সোনা আর ক্রিস্টালে মোড়া ঝাড়বাতি আর সাদা মার্বল পাথরের স্তম্ভের ওপরে রত্নের কারুকাজ কিংবা চত্বর জুড়ে সাদা মার্বেলের ওপরে রঙিন মার্বেলের ফুলের আলপনার কি প্রয়োজন ছিল কিছু? আর ওই অসংখ্য লিফট, এস্কেলেটরই বা কেন একটা ধর্মীয় স্থানে? তার ওপরে একতলার স্যুভেনির, কার্পেট, হস্তশিল্পের দোকানপাট, ফাস্টফুড রেস্তোরাঁগুলোরও কি প্রয়োজন ছিল কিছু? কেমন যেন ব্যবসায়িক গন্ধ পেলাম চত্বরটায়। একটা সুন্দর মুখে একটা ছোট্ট ব্রণর মতো।

গ্র্যান্ড মস্ক-এর ভেতরে

আসলে আমিরশাহির আমিররা তাঁদের ধন-দৌলতের প্রদর্শনী পছন্দ করেন। সারা পৃথিবীর মধ্যে এক নম্বর হবার জন্য উদ্‌গ্রীব তাঁরা। এ ছাড়াও দুবাই আর আবুধাবির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতাও রয়েছে জানা গেল। এ বলে আমায় দ্যাখ তো ও বলে আমায়।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য Emirates Palace হোটেল। আমরা যে এলাকাটা ধরে এগিয়ে চলেছি সেটা ভারী পরিচ্ছন্ন। সুন্দর সুন্দর বাগানে ঘেরা একেকটা বাংলো বাড়ি। হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, আবুধাবিতে দুবাইয়ের মতো তেমন বহুতল নেই, বেশির ভাগই একতলা বা দোতলা বাড়ি আর অনেক সবুজ শহর।

আমরা পৌঁছে গিয়েছি এমিরেটস প্যালেস হোটেলের সামনে। এই সেই সেভেন স্টার হোটেল, ট্র্যাভেল চ্যানেলে যাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি। গাড়িবারান্দায় আমাদের গাড়িটা এসে দাঁড়াতেই উর্দিপরা দারোয়ান এসে দরজাটা খুলে ধরল। মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলাম যে সামান্য পর্যটক আমি, এই সাত তারা হোটেলে রাত্রিবাস করার (যার একরাতের ভাড়া চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা) সামর্থ্য আমার নেই।

১৯৯৯ সালে উদ্বোধিত দুবাইয়ের Burj AL Arab হোটেলটি তৈরি করতে খরচ হয়েছিল এক বিলিয়ন ডলারের কিছু কম। তাই আবুধাবি এই ইঁদুরদৌড়ে পিছিয়ে থাকতে রাজি হল না মোটেই। আসল তেলের পয়সা তো তাদেরই। তাই আবুধাবি তিন বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি খরচা করে দু-হাজার পাঁচ সালে খুলে ফেলল এই এমিরেটস প্যালেস হোটেল। কীসে কীসে এত পয়সা খরচ হল সে কথায় আসছি পরে।

গাড়ি থেকে নেমে উলটোদিকে তাকাতেই দেখি স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে পাঁচটি আকাশছোঁয়া টাওয়ার। হ্যাঁ, এটিই Etihad Towers, যেখানে বেশ কিছু অফিস ও বসতি আছে।

কথিত আছে, আবুধাবি কর্নিশের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত এই হোটেলটি থেকে সোনা ঝরে পড়ে। তিনশো চুরানব্বইটি ঘর বিশিষ্ট এই হোটেলটির চাবিগুলো দেখতে স্বর্ণমুদ্রার মতো। ভেন্ডিং মেশিন থেকে ঠান্ডা পানীয়ের বদলে সোনার বিস্কুট কেনা যায়। এখানকার স্পাগুলোতে সোনার প্রলেপ দেওয়া ফেসিয়াল নেওয়া যায়। কফিশপে সোনার কুচি দেওয়া ক্যাপুচিনো কফি কিনতে পাওয়া যায়। হাজারখানেক Swaravski ক্রিস্টালে তৈরি ঝাড়বাতিতেও আছে সোনার ছোঁওয়া। আর এট্রিয়ামটিতে আছে ২২ ক্যারাট সোনার পাত ও বহুবর্ণ মার্বেলের কাজ।

এক হাজার হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট এই হোটেলটি নাকি লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেসের চাইতেই বড়ো। যার চত্বরে আছে দুশোটি ফোয়ারা, আট হাজার গাছ ও একটি হেলিপ্যাড। হোটেলটির একেকটি সুইটের আয়তন সাত হাজার স্কোয়ার ফুট। আর সেই সুইটগুলো সাজানো পিওর সিল্ক, ক্রিস্টালের ঝাড়বাতি ও সোনা দিয়ে। হোটেলের ঠিক পেছনেই তাদের নিজস্ব সৈকত যার দৈর্ঘ্য দেড় কিলোমিটার। হ্যাঁ, বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁর মধ্যে একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁও আছে সেখানে। আর হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, একেবারে ওপর তলায় আছে আবুধাবির রাজ ঘরানার মানুষদের জন্য সংরক্ষিত কয়েকটি সুইট যেখানে অন্যান্য মানুষদের প্রবেশ নিষেধ।

যখন এমিরেটস প্যালেস হোটেল থেকে বেরিয়ে আসি তখন ঘড়িতে বেলা দুটো। অথচ বাকি আছে অনেক কিছুই। তাই আর কালবিলম্ব না করে আমরা পারস্য উপসাগরের কর্নিশ-এ গিয়ে হাজির হই। এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে এমিরেটস প্যালেস হোটেল ও এতিহাদ টাওয়ারস। আরও একটি বিশেষ স্থাপত্য Qasr AL Wetan, যেটা এবার আমাদের দেখা হল না কেননা আরও কিছু পছন্দের দ্রষ্টব্য বাকি আছে।

কর্নিশের পরেই আমরা গিয়ে হাজির হই খেজুরের বাজারে। আরব দেশে এলে যেটা অবশ্য কিনি আমরা। দু রকমের খেজুর কেনা হল। কিছু সৌদি আরবের, যেগুলি সাইজে বড়ো। আর অন্যটা হল জর্ডনের, যেগুলো অপেক্ষাকৃত নরম ও মাংসল এবং চিনির চাইতেও বেশি মিষ্টি। আর অবশ্যই ইরানের জাফরান।

Sheikh Khalifa bin Zayed Street ধরে Sheikh Khalifa ব্রিজ পেরিয়ে Sadiyat দ্বীপের ভেতর দিয়ে যাবার সময় হাতের বাঁয়ে দেখতে পাই Louvre মিউজিয়াম। হ্যাঁ, আবুধাবিতেও একটি লুভর মিউজিয়াম আছে। তবে আয়তনে ছোটো। আবারও দুটি ব্রিজ পেরিয়ে যে সরু স্থলভূমিটিতে পৌঁছলাম তার চারিদিকে গাঢ় নীল রঙের থই থই জল আর গরান গাছের জঙ্গল। আবারও একটা ব্রিজ পেরোবার পর আসে Yas দ্বীপ যেখানে নিত্য নতুন চমক। চারিদিকে নির্মাণ চলছে। বসতবাড়ি এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোরও রমরমা পঁচিশ স্কোয়্যার কিমি আয়তন বিশিষ্ট এই দ্বীপটিতে।

নানারকমের থিম পার্ক, গল্ফ কোর্স, অপরূপ সৈকত ছাড়াও এখানে আছে Formula One Grand Priz Race Track. তাই হোটেল ব্যবসারও বাড়বাড়ন্ত এই দ্বীপে। Ferrari World Abu Dhabi থিম পার্ক আর Warner Brothers World Indoor Ammusement পার্ক দুটিও খুবই জনপ্রিয়। তবে আমি নিজে প্রকৃতি, শিল্প আর সংস্কৃতিতে বেশি উৎসাহী। তাই এই বিনোদনে ভরপুর দ্বীপটি আমাকে তেমন আকর্ষণ করে না। ঘড়ির কাঁটাও এগিয়ে চলেছে টিকটিক করে। সন্ধে ছ-টার মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে গাড়িটা। তাই দ্বীপকে বিদায় জানিয়ে দুবাইয়ের পথ ধরি আমরা। পারস্য উপসাগর তখন হোলি খেলছে সূর্যাস্তের রং মেখে।❖

এসো অন্ধকারে

জয়ন্ত দে

ছবি : ওঙ্কার নাথ ভট্টাচার্য

এই কাহিনি আমার নয়। এই কাহিনি মুনিয়ার। ওই যে মেয়েটা প্রায় নগ্ন হয়ে আমার টেবিলের ওপর বসে আছে, যার হাতে সিগারেট, গ্লাসে মদ, মুখে হাসি, বিছানার চাদরটা কোনোক্রমে যার কোমরে জড়ানো, ওর নাম মুনিয়া। এটা ওর ডাকনাম। এই নামেই আমি ওকে ডাকি। আমি ওকে ভালোবাসি।

মুনিয়া পাখির নাম। খুব ছোট্ট পাখি। চুনিয়া মুনিয়া। আমি কোনোদিন পাখি-টাখি পুষিনি। সত্যি বলতে কি কোনোদিন পাখি-টাখির দিকে নজর করেও দেখিনি। আমার প্রিয় পাখি কাক। কী, চমকে উঠলেন! কাক কারও প্রিয় পাখি হয় না কি? কেন আমার তো হয়েছে। অথচ কাককে কেউ পাখিই বলে না। কারণ, ওই রকম একটা কেলোকুষ্টি পাখিটা তার বুদ্ধিতেই কামাল করে দেয়। কী বুদ্ধি!

বানচোতগুলো ওই রূপ নিয়ে শহরের সিরিয়ালখেকো ফ্যাশানদুরস্ত বউদিদের সঙ্গে কিতকিত খেলে, গাণ্ডুবাবুদের ঘাড়ে অ্যা করে, সুইটি বিউটি পচার মায়েদের সঙ্গে পাঙ্গা নিয়ে চুরি করে বাসা সাজায়। সব চকচকে জিনিস নাকি ওদের পছন্দ। ওদের বাসাতে সার্চ করুন, রেইড করুন, বহুত চকচকে জিনিস পাবেন। সিগারেটের প্যাকেটের রাংতা, কাঁটা-চামচ, ছুরি, গ্যালভানাইজড তার। যা চকচক করিবে তাহাই সোনা হয়ে ওদের বাসায় চামকাইবে!

আমি মাঝে মাঝে জানলার সামনে আমার চকচকে কালো গ্লক সেভেনটিন রিভলভারটা রেখে দিয়ে দেখি। হ্যাঁ, একটা না একটা এসে গরাদের ভেতর মুখ গলিয়ে মেশিনটাকে ঠোকরায়। আমি বলি, যা, পারলে নিয়ে যা, নিয়ে গিয়ে বাসায় রাখ। সবাই খুব চমকাবে।

একদিন মুনিয়াও দেখি দৌড়ে গিয়ে রিভলভারটা তুলে নিয়েছে হাতে। বলল, এটা আমাকে দাও।

'কেন, তুমি কি কাক!'

মুনিয়া হি হি করে হাসে। বলল, আমি সাদা কাক!

মুনিয়া ফর্সা। খুব ফর্সা। ওর নগ্ন শরীরে নীল নীল শিরাগুলো মানচিত্রের নদীর মতো লাগে। ওর ছোটো ছোটো গোলাপি আভার স্তনের ভেতরও নীল শিরা। দুর্দান্ত! আমি ওর শরীর দেখি, খুব বেশি ঝাঁপাঝাঁপি, হামলাহামলি করি না। দু-চোখ ভরে দেখি। দেখার জিনিস দেখি। এমন করে কাউকে সামনে থেকে দেখিনি। আমাকে কেউ দেখায়ওনি।

এমনকী আমি কোনোদিন আমার বিয়ে করা বউকে কমলাকে এমন করে দেখিনি। মুনিয়ার থেকেও কমলা সুন্দরী ছিল। আমি ওকে আদর করে বলতাম—কমলাসুন্দরী! ঈশ্বর ওকে পুরো মেপে মেপে দিয়েছিলেন। একবার এক পার্টিতে ওকে দেখে আমাদের সার্ভিসেরই এক সিনিয়র কর্তা বলেছিলেন—সামলে রাখবেন। আড়ালে বলেছিলেন, এ তো জ্যোৎস্না! সে কথাও এক কলিগের মুখ ঘুরে আমার কাছে এসেছিল। তাই শুনে আমি হেসে বলেছিলাম, শালা আজকাল পুলিশও কাব্য করছে।

সত্যি ওর মুখটা ছিল খুব শান্ত। একদম জ্যোৎস্না! ও চাঁদ সামলে রাখো জোছনাকে। কারও নজর লাগতে পারে—

আমি উলটে আমার সেই কলিগকে বলেছিলাম, 'উনি তো শুধু ফেস দেখে এই মন্তব্য করেছেন। বুক তো দেখেননি। আমি পুরো ফেসবুক দেখেছি। বলে দিবি, ধূমকেতু বলল—ওর বউয়ের যেমন মাই, তেমন পাছা।'

সত্যি আমিও যেটা বললাম—সেটাই ঠিক, কমলার যেমন মাই, তেমন পাছা! কোথাও একটু বেশি নয়, একটু কমও নয়। ওর পেট যেন পাতা দই! ওর দুই উরু দেখলেই অনেক পুরুষমানুষ হাপসে মরে যাবে।

দুধে-আলতা স্কিন, মোমের শরীর! তাই ও নিজেকে নিজেই সামলে রাখতে পারল না, মোম তো, জ্বালিয়ে দিল। নিজেও জ্বলল, আমাকেও জ্বালাল। কমলাকে আমি বিছানায় পেলেই উদোম করে দিতাম। বিশ্বাস করুন, ওকে নগ্ন করলে, আমার খারাপ কিছু করতে ইচ্ছে করত না, মনে হত কটা শিউলি ফুল নিয়ে ওর গায়ে ছড়িয়ে দিই। এই দেখুন আবার ফুলের কথা বললাম। ভাববেন না, আমি কাব্য করছি। পুলিশ কাব্য করলে পেঁদাবে কে? ওই মিনমিনে ঢ্যামনাদের জিনিস আমার আসে না। আমি দুটো ফুল জানি। জবা আর শিউলি। একশো আটটা জবার মালা আমি নিজের হাতে থানায় কালীপুজোর দিন কালী মাকে দিই। মাইনের টাকা দিয়ে মালা কিনি। তোলা বা বখরার টাকা নয়। থানায় থানায় কালীপুজো হয়, দেখবেন ডাকাতরা আগে ডাকাতি করতে বেরুনোর সময় কালীপুজো করত। এই সময়ে ডাকাত নেতা-নেত্রীর শাগরেদ আমরা, তাই থানায় থানায় কালীপুজো করি। আর শিউলি চিনি, আমাদের বাড়ির উঠোনে ছিল। আমার মা শরৎকালে কুড়িয়ে কুড়িয়ে কাঁসার রেকাবিতে রাখত। ব্যস। আমি পলাশ আর শিমুল গোলমাল করে একবার বেশ খোরাক হয়েছিলাম। ওসব ফুল-পাখি আমার সাবজেক্ট নয়। আমি আমার লাইনে আসি। আমার চোর-ডাকাত, গুলি, বোমা নিয়ে কাজ। বেশ ছিলাম জানেন। কিন্তু অভাবী বিক্রিতে একটা দামি মাল কিনে বসলাম। ব্যস! সেদিন থেকেই—বাঁশ ছিল ঝাড়ে এল আমার গাঁড়ে!

সেই বাঁশটি হচ্ছে কমলা। কমলা সুন্দরী।

শুনুন, আপনাকে ছোট্ট করে একটা কথা বলে রাখি। এই কাহিনি কমলার নয়। আমারও নয়। এই কাহিনির নায়িকা হচ্ছে মুনিয়া। যে এখন বাপের বয়েসি একটা লোক, মানে আমার সামনে আধ-ল্যাংটা হয়ে ঘুরছে। মালটা কিন্তু ডেঞ্জারাস। আমি বাপের জন্মে, হোল পুলিশি লাইফে এইরকম একটা খতরনাক মেয়ে দেখিনি। ও এখন আমার প্রেমিকা! ওর কথা পরে হবে। আমি আগে আমার কথা বলে নি, নয়তো সব গুলিয়ে ফেলবেন। প্রথম কথা আমি কে?

আমি ধূমকেতু রাহা।

সাহা নয় রাহা! সাহারা ব্যবসায়ী হয়, রাহারা কী হয় জানি না। রাহাজানি করতে পারে। কী জানি! তবে আমি ব্যবসায়ী নই, ব্যবসায়ী হলে কমলাকে বিক্রি করে বহুত কামিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু কোনোদিন ওর গায়ে সামান্য কাদাটুকু লাগতে দিইনি। কমলা খানকিগিরি করলেও আমি সেটাকেও শিল্পীর যন্ত্রণা বলে গ্লোরিফাই করেছি। যখন পারিনি, খেল খতম করে দিয়েছি।

খেল খতম টেনশন হজম।

কিন্তু টেনশন আমার কাটেনি। কমলাকে তো খতম করে দিলাম, বাদবাকি তিনজন? ওর গানের গুরুদেব যে প্রেমের নামে ওকে ঘর থেকে টেনে বের করে ভোগ করল।

আচ্ছা, করলি তো করলি। আমি তখন চোখ বন্ধ করে ভেবেছি, ওদের মিলনে নিশ্চয়ই নতুন সুরসৃষ্টি হবে। ওরা সাধনা করছে। শিল্পীদের ওটা প্রাণের আরাম। যা করেছে বেশ করেছে, তাতে অন্য লোকের কী আছে। আমার বউ শিল্পী সংগীতাচার্য অসীমানন্দের সঙ্গে প্রেম করছে, প্রেম-সাধনা, সুর-সাধনা করছে। যা মানসিক ভাবে অনেকদিন আগেই ঘটে গিয়েছিল, তা নয় শারীরিকভাবেও হচ্ছে। নো আপত্তি। আমার ভেতর ভেতর কষ্ট হলেও কমলাকে কখনো বুঝতে দিইনি। ও যদি বলত, আমি গুরুজিকে বিয়ে করব, আমি ওকে ছেড়ে দিতাম। সত্যি কমলাকে তো আমার সঙ্গে মানায় না। আমি একটা পাক্কা হারামি, হাঁড়িচাঁচা!

কিন্তু ওই গুরুজি অসীমানন্দ—একটি পাক্কা ঢ্যামনার বাচ্চা। তিনি কমলাকে ভোগ করে অনন্যা রেকর্ড কোম্পানির রত্নেশ্বর

সমাজপতিকে ভেট দিয়ে দিলেন। কমলাকে বোঝালেন, রত্নেশ্বরবাবুকে খুশি করতে পারলে—রেকর্ড হবে। রেকর্ড হলেই নাম হবে। কমলা রত্নেশ্বরবাবুকে খুশি করা শুরু করল। এটার নাম খানকিগিরি। পাক্কা খানকিগিরি। তখন সন্দেহ করেছি, কিন্তু কমলা বা অসীমানন্দ এত নীচে নেমেছে বিশ্বাস করতে পাচ্ছিলাম না। ভেবেছিলাম আমি সারা দিন বিষ্ঠা ঘাঁটি তাই আমার মনে সন্দেহ। কিন্তু একসময় বিশ্বাস পাকা হল, যখন বড়ো কাগজের হাফ পাতা জুড়ে ওর ছবি আর গানের রিপোর্টিং ছাপা হল।

মনের ভেতর কাঁটা খচখচ করছে। টোপ দিলাম রিপোর্টারকে, প্রেস ক্লাবে মাল নিয়ে বসলাম। বললাম, আমার একজন আছে, তারও ছবি দিয়ে গুণকীর্তন করতে হবে তোমাদের খবরের কাগজের শনিবারের পাতায়। তখন সে বলল, আমি পারব না দাদা। আপনি টাকা দিলেও পারব না। কেননা যেটা বেরিয়েছে এটা আমার বসের অ্যাসাইনমেন্ট। ওই কমলা সুরঙ্গমা রেকর্ড কোম্পানির উৎপলবাবুর কেপ্ট। তারপর শুনেছি, আমার বসও নাকি ওই মহিলার স্পেশাল বন্ধু। মানে প্রসাদ পেয়েছেন। তাইজন্যেই এত বড়ো লেখা। আমি আরও তিন পাত্তর মদ খেয়ে বাড়ি এলাম। কমলাকে বললাম, তোমার নামে বাজারে কী সব কথা রটছে। তুমি গিয়ে একবার গুরুজির সঙ্গে কথা বলো—এ সব কথা বন্ধ করো। পাবলিসিটির নামে এসব কী? তোমার ট্যালেন্ট আছে, আপসে হবে। আমার কথায় ও ঠোঁট ওলটাল। বলল, সব গসিপ! ঈর্ষা! তুমি বরং আমার পরিচয় কাউকে দিও না।

আমার তখন পাগলপারা অবস্থা। একজনকে ফিট করলাম। সে রত্নেশ্বরের কাছ থেকে সব খবর এনে দিল। গুরুজির সঙ্গে কমলার প্রেম-পিরিতির সম্পর্ক ছিল। কমলা গুরুজির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। কিন্তু ততদিনে ওর ওপর গুরুজির নেশা কেটে গেছে। গুরুজির কাছে কমলার মতো মেয়ের দল লাইন দিয়ে আছে। গুরুজির নিত্য নতুন চাই। গুরুজি ওকে ভেট দিয়েছিলেন রত্নেশ্বরকে। রত্নেশ্বর থেকে কমলা জোগাড় করেছে উৎপলবাবুকে। কমলাকে নিয়ে রত্নেশ্বর আর উৎপলবাবুর মধ্যে খুব ঝামেলা হয়েছিল। যে কোনো ঝামেলার উৎস অর্থ, ক্ষমতা নয়, নারী। ওদের অর্থ ছিল, ক্ষমতা ছিল, নারী এসে ঝামেলা লাগিয়ে দিল। ওরা একদিন দুজনেই গিয়েছিল গুরুজির কাছে। গুরুজি নাকি হাসতে হাসতে বলেছিলেন—কমলার স্বামী জানতে পারলে আপনাদের দুজনকে, সঙ্গে আমাকেও খুন করে রাখবে। অবশ্য কমলাকে আগে মারবে। ঘর থেকেই সাফাই অভিযান শুরু করবে। সাবধান!

গুরুজির কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনেছি। আমি ধূমকেতু রাহা, আগে মেরেছি কমলাকে। দুর্দান্ত স্কিম ছিল। পাক্কা প্ল্যান। এক মারেই কমলা টপকে গেল। ওকে বেশি কষ্ট দিইনি। জাস্ট সরিয়ে দিলাম।

কেসটা খেতাম না, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকতাম। চাল ঠিকই দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার কয়েকজন কলিগ আমাকে ধরিয়ে দিল। কাকের মাংস কাক খায় না, কিন্তু পুলিশের মাংস পুলিশের কাছে হেব্বি টেস্টি। কিন্তু অত করেও তারা আমার বাল ছিঁড়েছে। সাসপেন্ডেড ছিলাম। কেস চলল। তারপর বেকসুর খালাস। আবার জয়েন করলাম সার্ভিসে। ক-দিন ঘাপটি মেরে থাকলাম, কিন্তু দিন-রাত তিনজনের খবর রাখছি। গুরুজি, রত্নেশ্বর, উৎপল কে কোথায় যাচ্ছে? কে কোথায় যাবে? আতিপাতি সব খবর। নরম খবর, গরম খবর। কমলা খুন হয়ে যাওয়ার পর ওদের মধ্যে সব গোলমাল মিটে গিয়েছিল। হয়তো ওরা ভয় পেয়েই সব সময় একসঙ্গে থাকত। শেষে আসানসোল থেকে ট্যালেন্ট হান্টের শো করে ফিরছিল রত্নেশ্বর সমাজপতি আর উৎপলবাবু। হাইওয়েতে ওদের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করল। স্পটেই খেল খতম!

অ্যাক্সিডেন্টটা আমিই করিয়েছিলাম।

সে দিন, যখন অ্যাক্সিডেন্ট হল খবরটা নিয়েই তখন আমি গুরুজি অসীমানন্দের বাড়িতে, ওঁর সামনে। আমার সামনেই উনি খবর পেলেন—কমলার পরে দুজন মানে রত্নেশ্বর আর উৎপল গেছে। আমি বললাম, এবার আপনার পালা গুরুজি। আপনাকে মারার বড়িয়া প্ল্যান আছে আমার কাছে।

আমার কথা শুনে উনি ঢোঁক গিললেন। আমি বললাম, গুরুজি আপনার শেষ ইচ্ছে যদি কিছু থাকে আমাকে বলতে পারেন।

গুরুজি তবু তড়পালেন, আমি পুলিশকে জানাব। আমি বললাম, আমি এখন আবার পুলিশ। সার্ভিসে ফিরে এসেছি। বউ খুনের দায়ে সাসপেন্ড ছিলাম, বেকসুর খালাস হয়ে ফিরেছি। তাই আপনি আমাকে জানান। আপনি ফাঁসির আসামি—আপনার টিল টু হ্যাং ঘোষণা হয়ে গেছে। আমি আপনার শেষ ইচ্ছে পূরণ করব—কথা দিলাম।

গুরুজি কান্নায় ভেঙে পড়ে বললেন, 'ক্ষমা চাইছি।'

আমি বললাম, 'গুড। আপনি শুধু কোর্টে দাঁড়িয়ে যে কথাগুলো বলেছিলেন তা ফিরিয়ে নিন।'

উনি বললেন, 'কোন কথা?'

'ওই যে আপনি বলেছিলেন না, কমলা উচ্চাভিলাষী, গায়ে-পড়া, কিন্তু কখনো বলেননি কমলা প্রতিভাময়ী! এবার একবার বলুন—কমলা প্রতিভাময়ী। আমি আপনার বয়ান পুরো পড়েছি। আপনি বলুন গায়ে-পড়া, কিন্তু ওকে প্রতিভাময়ী বলুন। বলুন, ওর সঙ্গে আপনার প্রেমের ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। স্বীকার করুন। বলুন, কমলা তোমাকে আমি ভুলতে পাচ্ছি না। ব্যস।'

উনি বললেন, 'এসব কথা বলে কী হবে, ও তো নেই।'

'ও নেই তো কী হয়েছে, আমি তো আছি। আমি আপনার কথা রেকর্ড করে নিয়ে যাব। রোজ রাতে শুনব।'

আমার কথা শুনে উনি ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, 'আপনি আমার কথা রেকর্ড করে আমাকে ব্ল্যাকমেল করবেন।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে আপনিও আমাকে ব্ল্যাকমেল করবেন, আমি আপনাকে সে অস্ত্র দিচ্ছি। আমি কমলাকে কীভাবে মেরেছি তা সম্পূর্ণ বলে দেব। দোষ স্বীকার করে নেব।'

গুরুজি চালাক মানুষ, টোপ গিললেন। বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি আপনার কথাগুলো ভয়েস রেকর্ড করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠান। আমিও আপনাকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু তারপর আমাদের দুজনের আর কোনোদিন দেখা হবে না, আপনাকে এই কথা দিতে হবে।'

আমি রাজি। আমি বললাম, 'হোয়াটসঅ্যাপ কেন গুরুজি, আমরা সামনাসামনি বসে রেকর্ড করি।'

গুরুজি বললেন, 'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না ধূমকেতু। আপনি আমারটা রেকর্ড করে নিয়ে রুদ্রমূর্তি ধরতে পাবেন। জোর করে নিজেরটা ডিলিট করে দিতে পারেন। আপনি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠালে ওটা আমি বিদেশে থাকা আরও দুজনকে ফরোয়ার্ড করে রাখব। আমার কিছু হলে তাঁরা ওটা থানায় পাঠিয়ে দেবেন। নতুবা ভদ্রলোকের চুক্তি। আপনি আপনার মতো, আমি আমার মতো।'

আমি রাজি।

রাতে আমি রেকর্ড করে পাঠালাম। যেটা পাঠালাম, সেটা উনিশশো আশি সালের একটা বধূহত্যায় ধৃত কার্তিক সামন্ত নামে এক মৃতার স্বামীর জবানবন্দি। থানায় আরও পাঁচজন পুলিশ সহকর্মীর সামনে বসে ভিডিয়ো সহকারে রেকর্ড করলাম। গুরুজিকে পাঠালাম শুধু অডিয়ো।

পালটা গুরুজিও পাঠালেন। কিন্তু কথাগুলো আমার তেমন পছন্দ হল না। দু-দিন ছাড়া ছাড়া ওর বাড়ি যাই, যখন-তখন যাই। বলি, গুরুজি আমি সব বলে দিলাম গলগল করে, আপনি চেপে-চুপে একটুখানি ফুস করলেন। না, এমন হবে না। বেশি করে ওর প্রতিভার কথা বলুন। ওর গানের কথা বলুন। আপনাদের প্রেমের কথা বলুন। আমি তো বউ খুনের কথা বলতে কোনো কৃপণতা করিনি, কীভাবে খুন করেছি পুরোটা বলেছি। তবে আপনি কেন বলবেন না, আমাকে ঠকাবেন?

গুরুজি আমার কথা যেন ঠিক বুঝতে পারছেন না। বেশ আতান্তরে পড়ে কতটা বলবেন, কী বলবেন, রোজ মাপছেন। আমি চিৎকার-চেঁচামেচি করিনি কোনোদিন, শুধু দাবি জানিয়ে এসেছি। রোজ নতুন নতুন কথা বলছেন। আমি সেগুলো রোজ গুছিয়ে রাখছি। সব যখন গোছানো হল, তখন পাক্কা কুড়ি মিনিটের কথা। একদিন নিয়ে গিয়ে পুরোটা একসঙ্গে শোনালাম। উনি শুনে হাঁ। বার বার বলার চেষ্টা করলেন কিছু, কিন্তু আমি শুনলাম না। উনি স্বীকার করলেন—হ্যাঁ সব কথা ওঁর। উনি একবার তেড়েফুঁড়ে বলে উঠলেন—আপনার সব কথাগুলো আমার কাছে আছে। আমি তখন সত্যিটা বলে দিলাম। বললাম, ওটা গুরুজি আমার কথা নয়। আমি রিডিং পড়েছি মাত্র। ওটা আশি সালে ঘটা একটা কেস। মালা সামন্তকে খুন করেছিল তার স্বামী কার্তিক সামন্ত। ওটা গুরুজি কার্তিক সামন্তের নিজের হাতে লেখা জবানবন্দি। আমি তখন গুরুজিকে আমার ভিডিয়োটা দেখালাম। ব্যস। গুরুজি কাঁপছেন। গাঢ় গলায় বললেন, 'বিশ্বাস করুন, আমি কমলাকে খুন করিনি।'

আমি বললাম, সে তো আমি জানি। আপনি খুন করাননি, ওটা আমি করেছি। আপনি আমাকে দিয়ে করিয়েছেন। গুরুজি বললেন, 'তুমি কী চাও?' অসীমানন্দ 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি'-তে নেমে এলেন।

আমি হাসলাম, 'আপনি ফাঁসির আসামি। আমি আপনার মৃত্যু চাই। এবার বলুন কীভাবে মরবেন? এই যে ঘুমের ওষুধের পাতা টপাটপ খুলে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

উনি বললেন, 'আমি পারব না।'

আমি বললাম, 'তাহলে আপনি কাল থেকে সব গানবাজনা ছেড়ে দিন। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে নির্বাসনে থাকুন। ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলবেন না। বাইরে কোথাও যাবেন না। বাইরে গেলেই আপনার মৃত্যু। কীভাবে হবে, আপনি জানতে পারবেন না। তিন মাস আপনার শাস্তি। আমি তিন মাস জেলে ছিলাম। চার বছর সাসপেন্ড ছিলাম। আপনারও তাই। তারপর বেকসুর খালাস হয়ে বের হবেন।' উনি রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'ঠিক আছে।'

আমি বললাম, আপনার ফোন কল আমি ট্র্যাপ করব। দেখব, কারও সঙ্গে কথা বলছেন কি না? ধরা পড়লে, আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। আবার তিন মাস। বাইরের লোক এ বাড়িতে আসবে না, আপনিও কারো সঙ্গে দেখা করবেন না। উনি সব মেনে নিলেন। আমি বললাম, কবে থেকে শুরু করবেন? উনি বললেন, 'পরশু থেকে। কাল সবাইকে জানিয়ে দেব তিন মাস আমি নীল সরস্বতীর ব্রত নিয়েছি। কারও সংস্পর্শে আসব না।'

ঠিক আছে। সেই পরশু থেকে গুরুজি ঘরে ঢুকলেন। আর আমি একটু একটু করে প্রচার করে দিলাম, ওঁর এইডস হয়েছে। ক্রমশ কলকাতা শহরের সবাই জেনে গেল অসীমানন্দের এইডস হয়েছে। এর মধ্যে আমি মাঝে মাঝে যাই। গিয়ে একটু গল্পগুজব করি। একদিন সঙ্গে করে সোনাগাছির একটা মেয়ে নিয়ে গেলাম। বললাম, গুরুজি অনেকদিন নারীসঙ্গ করেননি, এই মেয়েটি আজ রাতে রইল।

গুরুজি চিৎকার করলেন, 'এটা নির্ঘাত তোমার কোনো চাল।'

আমি বললাম, একদম নয়। কাল সকালে এসে আমি ওকে নিয়ে যাব। সারা রাত আপনার। আপনি ফুর্তি করুন।

মেয়েটা সে রাতে থেকে গেল। গুরুজির 'না' আমি শুনলাম না। মেয়েটা সকালে হাসতে হাসতে বলল, 'বুড়োটা লাগাবে কী? সারা রাত আমাকে দেখে ঠকঠক করে কেঁপেছে।'

দু-দিন পরে আর একজনকে নিয়ে গেলাম। গুরুজি আগের মতো চিৎকার-চেঁচামেচি করলেন, বললেন, 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না, এটা তোমার কোনো ফাঁদ।'

সেই মেয়েটাও সকালে হেসে কুটোপাটি হল, বলল, 'আমি সব কিছু খুলে বললাম, গুরু এসো। বুড়ো বলে কি না, তুমি আমার মা! আমাকে ছেড়ে দাও। আরে আমি বুড়োকে ধরলাম কোথায়। শেষে আপনার কথামতো ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে ল্যাংটা নাচ নাচলাম। বুড়ো কিন্তু পাথর!'

চতুর্থ দিনের দিন গুরুজি মেয়েটাকে টেনে নিলেন। বললেন, 'তুমি থেকে যাও। আর এভাবে একা একা থাকতে পারছি না। সবে একমাস একুশদিন। এখনও পুরো একটা মাস পরে। এখানে এভাবে থাকলে আমি মরে যাব।'

মেয়েটা বলল, 'সে তো আপনি এমনিও মরে যাবেন। আপনার কাছে যতগুলো মেয়ে এসেছে সবার এইডস আছে। আপনি এখন গুনতিতে চলে এসেছেন।'

গুরুজি বললেন, 'আমি কাউকে ছুঁইনি।'

মেয়েটা বলল, 'ছুঁলে এইডস হয় না, শুলে হয়।'

'আমি কারও সঙ্গে শুইনি।'

'এই তো আমার সঙ্গে শুয়েছেন।'

'তোমার এইডস আছে?' গুরুজি আকাশ থেকে পড়লেন।

'হ্যাঁ মরার জন্য লাইন দিয়ে আছি। আপনিও তো এইডস রুগি, বাড়ির সবাই আপনাকে আলাদা করে রেখে দিয়েছে। ক-দিন আর, মরার আগে আনন্দ করে নিলেন।'

মেয়েটা চলে এসেছিল সকালে। তার দু-দিন পরে ঘুমের ওষুধগুলো সব খেয়ে নিয়েছিল অসীমানন্দ। একটা মেয়েরও এইডস ছিল না, বুড়ো ড্যামনাটা ভয়ে লজ্জায় মৃত্যু বেছে নিল। পাপ বিদায় হল।

আমার সব কাজ শেষ। কমলা এবং তিনজন। পর পর। বেশ ভালো ছিলাম। কিন্তু তখনই এই মেয়েটা এসে জুটল। ওর নাম মুনিয়া।

মেয়েটা একদিন সাতসকালে আমার বাড়ি চলে এল। এসে বলল, 'আমার নাম মুনিয়া।'

'আপনি কাকে চাইছেন?'

'তোমাকে।'

'আমাকে? আমি কে জানেন?'

'তুমি ধূমকেতু রাহা। চারটে মার্ডার করেছ। ঠান্ডা মাথায়। তোমার সার্ভিসের সব লোকজনই জানে। কেউ বলে—ঠিক করেছে। কেউ বলে—আইন হাতে নেবে কেন? কিন্তু আইন তোমার টিকি ছুঁতে পারেনি। পারফেক্ট প্ল্যান। তুমি সেই ধূমকেতু রাহা। এখন দরজা থেকে সরো, আমি ভেতরে যাব।'

আমি মেয়েটার দিকে তাকালাম। তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম, মেয়েটাকে কে পাঠাল? কার ছক? বুঝলাম, নতুন খেলা শুরু। দেখাই যাক। কত খেলাই তো সারা জীবনে খেললাম, আর একটা নয় শুরু হল। দেখাই যাক না—খেলা শুরু।

দুই

আমি ধূমকেতু রাহা। আমার গায়ের রং ঠিক কালো নয়, কেমন যেন পোড়া পোড়া, কেউ বলে ময়লা, কেউ বলে জং ধরা। আমার গায়ের রঙের মানুষ হঠাৎ পাবেন না। লাখে একটা। কী জানি, হয়তো আমার গায়ের রং এমন বলেই আমার নাম রাখা হয়েছিল ধূমকেতু। দেখুন, গায়ের রং নিয়ে আমার কোনো হেলদোল নেই। আমার ঠাকুমা বলত, ব্যাটাছেলে সোনার আংটি! তার আবার বাঁকা-টেরা! আমার দিকে ভালো করে তাকান। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারবেন না। আমার মুখের গড়ন লম্বা। ঘোড়ার মতো। কিন্তু সেটাই শেষ নয়। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার গালের চামড়া কেমন যেন কুঁকড়ে গিয়েছিল। একে মুখের ভেতর ঢোকা গাল, তারওপর ন্যাপকিনের মতো গুটিয়ে যাওয়া গালের চামড়া, এই সব মিলিয়ে আমি কিন্তু একটা বেশ ভয় ধরানো প্যাকেজ।

আমার চেহারা, মুখ দেখেই অনেক আসামি ভয়ে প্যান্টে পেচ্ছাপ করে ফেলত। ভাবত আমি কী না কী! তবে সত্যি আমি কী একটা যেন ছিলাম! কোনো আসামিকে মারার সময় আমার হুঁশ থাকত না। এক এক সময় মনে হত, মেরে দিই শালাকে, টিপে মেরে দিই। এত সুন্দর চেহারা নিয়ে এমন জঘন্য অপরাধ কেন করে? পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিতাম। মনে হত, একটা অসুন্দর চেহারা নিয়ে আমি কোনো মানসিক সমস্যায় ভুগছি। নিজেকে নিজেই বোঝাতাম। আরে আমি যদি আফ্রিকায় জন্মাতাম তবে আমি সুন্দর পুরুষ। সুন্দরের সংজ্ঞা কী? কেউ স্পষ্ট করে বলুক আমায়। কেউ বলেনি আমাকে, সবাই এড়িয়ে গেছে। কমলাকে নিয়ে যখন ওর বাবা গোলমালে পড়েছিল। মাতৃহীন গরিব কমলাকে পাড়ার একজন আড়কাঠি তুলে নিয়ে গিয়েছিল, ওকে আমি উদ্ধার করি। জলপাইগুড়ির মেয়ে। ওর বাবা মেয়ে নিয়ে আতান্তরে। আমি দুম করে বলে বসি, আমি বিয়ে করব। দেবেন? পুলিশে চাকরি করি, সরকারি চাকরি। ওর বাবা এক পায়ে রাজি। কমলা তখন রোগা ছিপছিপে একরত্তি মেয়ে। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল আমার দিকে। কৃতজ্ঞতায় ওর মাথা নুয়ে, ওর চোখে-মুখে অপার খুশি। ওর চোখে আমি ঠিক অসুন্দর ছিলাম না। আমার একটা হিরো হিরো ইমেজ ছিল। ও খুব খুশি হয়েছিল। বরং ও যেন বেঁচে গিয়েছিল। তখন কমলাও সুন্দরী ছিল। কিন্তু এমন ডানাকাটা নয়। পরে বিয়ের জল, মদনজল, সেই জল পড়তেই কমলা অদ্ভুতভাবে ডানা মেলল। খোলতাই হল। যত দিন গেল ওকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কী রূপ! আহা! এই কমলাকে কি আমি বিয়ে করেছিলাম? এ তো সে নয়, সেই রোগা রোগা হাঁসের মতো ফ্যাকফ্যাকে ফরসা, ভাঙা গাল, শুধু দু-চোখ ভাসা ভাসা। একমাথা এলমেলো চুল, যেখান-সেখান দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তবে আগাগোড়াই ওর টানটান চেহারা। যেমন মাই, তেমন পাছা! যেন পুরো শরীরের ভেতর বিদ্রোহ ঘোষণা করে জেগে আছে। একবার এক পার্টিতে ওকে বিউটি পার্লার থেকে সাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওকে দেখে চোখ ঠিকরে গিয়েছিল আমার সিনিয়ার সাহেবদের। তারা কাতর গলায় চিঁ চিঁ করছিল। যে কোনো সুন্দর মেয়ে দেখলেই ওরা এমন করে। যেন ওদের ভোগে লাগার কথা ছিল, ফসকে গেছে। কমলা যত সুন্দরী হল তত পালটে গেল। ওকে দেখি আর অবাক হই। সেই সঙ্গে কমলা বুঝল, সে সুন্দরী, ডানাকাটা সুন্দরী। আর আমি কুৎসিত।

কেননা তারপর থেকেই ও রাতে শুয়ে আগে আলো নিভিয়ে দিত। হয়তো তার এমন সুবর্ণ শরীরের পাশে পোড়া কাঠের মতো আমাকে দেখে তার নিজের জন্য কষ্ট হত। সেই কষ্টে আলো বন্ধ করা। আমি সব বুঝতাম, কিন্তু কোনোদিন কিছু বলিনি। বিষয়টা তো সত্যি। আর আমি জোর করে এই সত্যিকে চাপা দেব কী করে? তবে প্রশ্রয়ও দিতাম না। বিছানায় পেলেই ওকে নগ্ন করে দিতাম। যাকে বাংলা ভাষায় বলে ল্যাংটো। সেই উদোম শরীরটা নিয়ে আমি যেমন খুশি তেমন খেলতাম। নিজে সুন্দরী বুঝে ওঠার পর ও ঠিক যেন সায় দিত না। কেমন একটু আড়ষ্ট হয়ে থাকত। হয়তো ওর মনে হত, ও একটা সুন্দর শরীরের মালকিন, অথচ শুয়ে আছে একটা কালো নেকড়ে বাঘের সঙ্গে।

এই কালো নেকড়ে বাঘের সঙ্গে আমাকে তুলনা করেছে মুনিয়া। একদিন আমার নীচে শুয়ে শুয়ে বলেছিল, তোমাকে কালো নেকড়ে বাঘের মতো লাগছে।

কমলাও অন্ধকারে না দেখতে পেলেও কি তাই ভাবত? তবে শরীর তো সুখ চায়, শরীরী-সুখ, সেটা আমার মতো কে ওকে ভালো দেবে। ও বুঝল, অন্ধকারের অতলে যেটা হচ্ছে, সেটার জন্য ওর শরীর উন্মুখ হয়ে থাকে। আমি টানলেই ও পিচ্ছিল হয়ে

যেত। আমি টানলেই ও সব আলগা করে দিত। আমি শুধু মুক্ত করে দিতাম। দুর্দান্ত তালমিল। শরীর যেন শরীরের সঙ্গে বাজত। তবে ও কোনোভাবেই আলো জ্বালাতে দিত না। আমিও তাল কেটে যাওয়ার ভয়ে আলো জ্বালাতাম না। মাঝে মাঝে মনে হত, আমাদের বুঝি ভালোবাসা নেই, যা আছে সব বিছানা। নিজেকে প্রবোধ দিতাম, ভালোবাসা নাই থাক, এটুকু তো পেলাম। কমলা শরীর নিয়ে কোনো কৃপণতা করে না, সাজিয়ে দেয়। চেটেপুটে ভোগ করে, নিংড়ে নেয়। আর একটা কথা, ওকে কোনোদিনই অন্য পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হতে দেখিনি। দেখিনি বললে আবার ভুল হবে, প্রথম দেখেছিলাম গুরুজি অসীমানন্দের দিকে অদ্ভুত চোখ করে তাকাতে।

আমাদের নিঃসন্তান জীবনে আলো-বাতাস হয়ে ঢুকে পড়েছিল সুর, গান। ও সারাদিন গান নিয়ে মেতে থাকত। কিন্তু কোনোদিনই বেচাল দেখিনি। হয়তো ওর আশেপাশে যারা আসত, তারা আমার ভয়ে ওকে খুব সন্তর্পণে এড়িয়ে চলত। নাহলে আগলে রেখে আমার মন জয় করত। আমি বেশ রিল্যাক্স ছিলাম। কিন্তু গোলমাল হল যেদিন অসীমানন্দ একটা অনুষ্ঠানে ওর গান শুনে বললেন, 'আপনি পরিশ্রম করুন। আপনার কণ্ঠে সরস্বতী আছেন, তিনি চাপা পড়ে আছেন, তাঁকে উদ্ধার করে আনুন।' সেদিন থেকেই কমলা বিভ্রমে পড়ে গেল। সত্যি বলতে কি শুধু কমলা কেন আমিও। সারা রাত এক অনির্বচনীয় আনন্দে ঘুম হল না। মনে হল, উনি যখন বলছেন, তখন মিথ্যে কেন হবে। আহা! সেটাই কাল হল। গুরুজি কাউকে আপনি ছাড়া কথা বলেন না। কমলাকেও আপনি-আজ্ঞে করেন। বিভ্রম তো হবেই!

সেই বিভ্রম কাটল মৃত্যুতে। খুন করতে হল কমলাকে। কমলা বুঝেছিল, গান নয়, কণ্ঠ নয়, ওর শরীরেই আসল ম্যাজিক। সেখানেই সরস্বতী খুঁজছেন অসীমানন্দ, সেখানেই রেকর্ড কোম্পানির রত্নেশ্বরবাবু, উৎপলবাবুরা ডুবে মরছে। হয়তো আরও আরও বাবুরা আছেন। খবরের কাগজের প্রসাদ পাওয়া কর্তার নাম পেয়েছিলেন। কাদা আমি ঘুলিয়ে তুলিনি। সামান্য ইটও ছুড়িনি নোংরা কাদার দিকে। আমি জানতাম, নোংরা কমলার গায়েই বেশি লাগবে। তাই ডাকাতির কেস সাজিয়েছিলাম। ডাকাত এল লুঠ করল, লুঠ করতে গিয়ে খুন করল। প্ল্যান পাক্কা ছিল। তাই জন্যেই আজ বেকসুর খালাস। কিন্তু আমার কয়েকজন হারামি কলিগ কিছু প্রশ্ন তুলল, তাই জন্যে তিন মাস জেলে, চার বছর সাসপেন্ড। যাই হোক সব ভালোয় ভালোয় মিটে গেছে। কমলা গেল। তার পাঁচ বছর পরে রত্নেশ্বর-উৎপলবাবু। তার একবছরের মাথায় গুরুজিকেও পাঠিয়ে দিলাম। চ্যাপ্টার ক্লোজড। এখন নিয়ম করে অফিস করি। আগে ঘুষ খেতাম না। যা ভাগ পেতাম সেটুকুই নিতাম। আলাদা কোনো চাহিদা ছিল না। এখন বড্ড ঘুষ খাই। আমার টাকার খুব খাঁই। ঠিকমতো কেস পেলে গলায় আঙুল দিয়ে টাকা আদায় করি। তাই ওপর মহল আমাকে খুব পছন্দ করে। যত দামি কেস, সব আমার দিকে পাঠিয়ে দেয়। সেই হারামি কলিগরা এখন আমাকে আরও ঈর্ষা করে।

আগে ওরা আমাকে নিয়ে হাসত। সে গল্প তো বলাই হয়নি। সে গল্পটা পরে বলব। দুর্দান্ত একটা গল্প আছে। এখন হাসে না। ওরা সত্যিটা জানে। অফিস, বাড়ি। বাড়িতে দামি দামি মদ থাকে। সব ভেট পাই। নাহলে কিনি। কাউকে ডাকি না। এক পেগ মদ খাওয়াই না। সবার প্রশ্ন আমার কামানো টাকা নিয়ে আমি কী করব? জুয়া খেলি না, খানকিবাড়ি যাই না। নেশা বলতে মদ। আমার সাতকুলে কেউ নেই। ওদের খুব চিন্তা আমার টাকা নিয়ে। কেউ কেউ টাকার হদিশ পেতে আমার কাছে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিল, ভারত সেবাশ্রম সম্পর্কে জানতে চাইছিল। মানে আমি টাকাপয়সা সব ওখানে দানধ্যান করি কি না, তাহলে আমার কাছে ওখানকার খোঁজখবর থাকবেই। কেউ কেউ বলেছিল, আবার বিয়ে করুন ধূমকেতুবাবু। আমি বলেছি, করব, রিটেয়ার করে, যখন ঘরে থেকে বউ সামলাতে পারব। আমার কথা শুনে তারা চুক চুক করে। ঘাড় নেড়ে বলে—সত্যি আমরা চোর ডাকাত অপরাধীর পিছনে দৌড়ে বেড়াই। অথচ আমাদের ঘর সুরক্ষিত থাকে না। তারা এসে আমাদের ঘরে ঢুকে মেরে যায়। কী সাহস! এত সাহস ওরা কোথা থেকে পায়? ম্যাডামের কেসটার কোনো ফয়সলা হল না, এটাও কেমন? আমাদের ব্যর্থতা। আমি হাসি, ভালো কলিগ থাকলে কী করে হবে?

আমার কথায় তাদের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। তাদের মনে হয়, আমার কলিগরা যারা আমার দিকে আঙুল তুলেছিল, যাদের সব সন্দেহর তির ছিল আমার দিকে, আমি সে দিকেই ইঙ্গিত করছি। কিন্তু, আমি অন্য কথা বলছি, যেটা ওদের বোঝার ক্ষমতাই নেই।

সেটা হল, আমার পিছনে যেমন হারামি কলিগরা লেগেছিল, তেমন এতদিনের সার্ভিসে কিছু ভালো বন্ধু তৈরি করেছিলাম। তারা আড়ালে থেকে আমাকে রক্ষা করছিল। ভেতরকার খবর দিচ্ছিল, কী এভিডেন্স আছে জানাচ্ছিল। প্রয়োজনে সেটাও হয় পালটে দিচ্ছিল, নয় পাশাপাশি এমন কিছু রাখছিল যা গুলিয়ে যায়। আসলে সবাই জানত, আমিই মেরেছি। খুনি আমি। কিন্তু কেন? সেটাও জানত। তাই, মেল ইগোর সাপোর্ট পাচ্ছিলাম আমি। তাইজন্যেই আমি বেকসুর খালাস।

একা থাকি। কোনো নিঃসঙ্গতায় ভুগি না। না, গান শুনি না। জানলা খুলে আকাশ দেখি না। তবে হ্যাঁ, সারাদিনই আমার ঘরে স্পোর্টস চ্যানেল চলছে। এটাই আমার বিনোদন। কিন্তু এর মাঝেই মেয়েটা এসে ঢুকে পড়ল। ওর নাম মুনিয়া।

খুব লম্বা নয়। আবার বেঁটেও নয়। কিন্তু চেহারায় একটা চাবুক ভাব আছে। টান টান। যেন এক্ষুনি ছিলা থেকে বেরিয়ে এল। ওর চোখের দিকে তাকালেও আগুনের তেজ পাওয়া যাবে।

মুনিয়া প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে 'তুমি' বলেছে। বলুক। ওর মতো অনেক মেয়ে আমি সারা জীবনে দেখেছি।

ও ঘরে ঢুকে সোফায় এসে ঝটকা মেরে বসল। আমাকে বলল, 'কী হল আমাকে দেখতে পাচ্ছ না? আমি একটা জলজ্যান্ত মেয়ে!'

আমি বললাম, 'আমি মেয়ে দেখেছি, নারী দেখেছি, মহিলা দেখেছি—।'

মুনিয়া হাসল, 'এত্ত দেখেছ, আচ্ছা, মেয়েছেলে দেখোনি? মাগি দেখোনি? কী পুলিশ সার্ভিসে আছো? যাও, আমার বাপের কাছে যাও, কত কিছু দেখাবে—ঢলানি মাগি, চুদনি মাগি, কতরকম মাগির ক্ল্যাসিফিকেশন আছে, সব দেখিয়ে দেবে।'

আমি চুপ করে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এখন সকাল আটটা। মেয়েটার কি কাল রাতের নেশা কাটেনি? বললাম, 'কে তোমার বাপ?'

'তোমার মতোই একজন পুরুষ।'

মুখে এসে গিয়েছিল, বাপ যখন সে তো আমার মতোই একজন ডান্ডাওয়ালা পুরুষই হবে, হিজড়ে হবে না। কিন্তু সক্কাল সক্কাল এত পুলিশি কায়দায় খিস্তিখাস্তা করতে ইচ্ছে করল না।

বললাম, 'কী খাবে, চা না কফি?'

আমি আগে সবাইকে তুই-তোকারি করতাম, তুমি-আপনিও বলতাম, সেটা সামাজিক নানা জায়গা থেকে যেমন সবাই বলে। কিন্তু গুরুজিকে দেখে 'আপনি' বলা শিখেছিলাম। সেটা বেশ কাজে লাগে। কিন্তু অনেকদিন পরে উটকো কাউকে 'তুমি' বললাম।

'এখন সকালবেলা। দুপুর বা সন্ধে হলে অন্য কিছু বলতাম। তোমার ঘরে তো হেব্বি হেব্বি মালের স্টক আছে। ঠিক আছে রাতে খাব। এখন চা-ই দাও। আর কী খাবার আছে?'

'কী খাবে বলো?'

'ইশ! আজ এমনভাবে বলেছ বলে নাও, ফার্স্ট টাইম ছেড়ে দিলাম, পরের দিন বললে, বলব—চুমু খাব। তার পরের দিন বললে, বলব—পেনিস খাব। তার পরের দিন বললে, বলব—তোমাকে গোটা খাব, চিবিয়ে।'

পাগল নয়। সেয়ানা! আমি স্থির চোখে ওকে মাপলাম। খুব বেড়ে খেলছে। ঠাঁটিয়ে গালে একটা ঝাপড়া দিলে সব ঝটকা ঝরে যাবে। নইলে ফেলে চুদে দিলে চিতপাত হয়ে যাবে। বললাম, 'টোস্ট আর ওমলেট করে দিচ্ছি।'

'থ্যাংক ইউ—ইমন্ম।' মুনিয়া আমার দিয়ে ফ্লাইং কিস ছুড়ে দিল। বলল, 'তোমার বাড়িতে তো কোনো কাজের লোক নেই। তুমি পারবে? না, আমি যাব হেল্প করতে?'

আমি হাত তুললাম, 'ওক্কে!'

'ঠিক আছে প্রথম দিন তুমিই করো। পরে আমি করে খাওয়াব। যা খেতে চাইবে তাই খাওয়াব। না পারলে ইউটিউব দেখে দেখে করে দেব। খারাপ হলেও সোনামুখ করে খেয়ে নেবে। আমার বাপের মতো খাবারের থালা ছুড়ে ফেলবে না। আমার মায়ের মতো বলবে—খুব ভালো হয়েছে। কী সুন্দর, সামান্য একটু নুন চড়া, ভাতে মাখলে টের পাওয়া যাবে না। মশলাটা কাঁচা, আর একটু কষতে হত, কিন্তু কী করে করবি, আসলে তোর আভেনের আঁচটা ঠিক মতো হয় না। আঁচ ঠিকমতো না হলে কষবি কী করে? যাও, তুমি যেমন খুশি টোস্ট করে নিয়ে এসো, অমলেট যেমন হোক, কম বেশি যাই হোক, আমি সোনামুখ করে খেয়ে নেব।'

আমি মুনিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। মালটা পাগল নয়। পুরো হোমওয়ার্ক করে এসেছে। আমার বাড়িতে কাজের লোক নেই জানে। কিন্তু একটু জলদিবাজি করছে। অন্য লোক হলে এতক্ষণে বিছানায় ফেলে রগড়ে দিত। আমি বিপত্নীক একা মানুষ। নারীসঙ্গহীন। এমন টাটকা একটা মেয়ে হাতের মুঠোয়। না, আমি টোস্ট, অমলেট করতে যাই। মাথা এবং শরীর দুটোই ঠান্ডা ও সতর্ক রাখতে হবে। তবে যাওয়ার আগে বলে যাই, এই কাহিনি আমার নয়, এই কাহিনি এই মেয়েটার, মুনিয়ার। আমি নিমিত্ত মাত্র।

তিন

টোস্ট, অমলেট এবং চা করে নিয়ে এসে দেখলাম মুনিয়া সোফার ওপর কাত হয়ে ঘুমাচ্ছে। প্রথম ঝলকেই ওকে কেমন পুষি বেড়ালের মতো লাগল। তখনই দেখলাম, ও যখন এখানে ঢুকেছিল, পরনে ছিল জগার আর একটা ধূসর রঙের জ্যাকেট। তার ভেতর দিয়ে সাদা রঙের টি-শার্ট বা ইনার উঁকি মারছিল। এখন সোফার ওপর কাত হয়ে থাকা মুনিয়াকে দেখলাম, ছোট্ট প্যান্ট আর সাদা রঙের টিউব। পা দুটো সোফার ওপর তুলে, গুটিশুটি মেরে।

আমি টি-টেবিলের ওপর খাবারগুলো রাখলাম। আর সেটা বেশ শব্দ করেই। ভেবেছিলাম, এটুকু আওয়াজে উঠবে না, চা-খাবার ঠান্ডা হওয়ার আগে ডাকতে হবে। কিন্তু সামান্য আওয়াজেই দু-চোখ খুলেই সোজা হয়ে বসল। বললাম, 'হয়ে গেছে, নাও খাওয়া শুরু করো।'

আমি ওর খাবারটা এগিয়ে দিলাম। নিজের খাবারটা টেনে নিলাম, ওর দিকে না তাকিয়েই খাওয়া শুরু করলাম। মুনিয়া চায়ের কাপে প্রথমে লম্বা একটা চুমুক দিল। বুঝলাম, এটাতে গলা ভেজাল। তারপর দুটো টোস্ট ও অমলেট দ্রুত খেয়ে নিল। খিদে পেয়েছিল। রাতে কি কিছু জোটেনি নিশ্চয়ই? তাহলে কি আমার অমলেটটা এগিয়ে দেব? আমি দুটো টোস্টই চিবাচ্ছিলাম। আগে খুব হুটপাট করে খেতাম। কমলা এই তাড়াহুড়ো করে খাওয়া একদম পছন্দ করত না। বলত, উত্তমকুমারের খাওয়া দেখেছ, কী সুন্দর করে খায়। আমি হাসতাম, আমি তো উত্তমকুমার নই। কমলা মুখঝামটা দিত, তুমি উত্তমকুমার নও সেটা আমি জানি। আর তোমাকে উত্তমকুমার হতেও বলিনি। শুধু বলেছি, খাওয়াটা আস্তে আস্তে খাও, একটু গুছিয়ে ভদ্রভাবে। সেই থেকে আস্তে আস্তে খাই, ভদ্রভাবে। আমার ভাগের অমলেটটা এখনও আছে। আঙুলের টোকায় ওটা এগিয়ে দিলাম। চায়ের কাপটা টেনে নিলাম।

মুনিয়া আমার দিকে তাকাল। বলল, 'কী গো আমাকে কি তুমি রাক্ষস পেয়েছ? দুটো টোস্ট অমলেট খেলাম, আবার অমলেট?'

আমি ঘাড় নাড়লাম, 'খেয়ে নাও। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। কাল রাতে তো খাওনি।'

'কাল রাতে খাইনি! কেন? কাল রাতে তো দিব্যি খেয়েছি। চিলি চিকেন, রুটি।'

'ওহ্! আচ্ছা।'

'দাও, ভালোবেসে দিচ্ছ যখন, খেয়েই নিই।' প্লেটটা টেনে নিয়ে খেতে শুরু করল। বলল, 'আজ প্রচুর হেঁটেছি। মর্নিংওয়াক। যেটুকু ক্যালরি ঝরালাম, তা আবার—।' কথাটা শেষ করল না, হি হি করে হাসল। বলল, 'শোনো, ভালোবেসে সব দেবে, সব খেয়ে নেব।'

আমি একটা সিগারেট ধরালাম। বলতে হল না, মুনিয়া আমার

প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে নিয়ে গুছিয়ে বসল।

আমি ভাবলাম, জিজ্ঞাসা করি, আমার কাছে আসার কারণ কী? কিন্তু এটা নার্ভের খেলা, ও একটা ঘুঁটি চাললে, আমি চাল দেব। আমি জিজ্ঞাসা করলে ও উত্তর দেবে। কিন্তু আমি না জিজ্ঞাসা করলে ও কোথা থেকে শুরু করে দেখি। চাল ও আগে দিক।

মুনিয়া বলল, 'নিজে নিজে অনেক চেষ্টা করলাম, হল না। পারলাম না। তাই ভাবছি তোমার হেল্প নেব।'

আমি ওপর দিকে ধোঁয়া ছাড়লাম। আচ্ছা, হেল্প, মানে সাহায্য নিতে এসেছে। এটা একটা স্কিম। বাচ্চা মেয়ে!

মুনিয়া বলল, 'ক-দিন ধরেই আসব আসব করছি। কিন্তু তোমার কাছে এলে আমার কেসটা কেঁচে যেতে পারে। তুমি বহুত বুদ্ধিমান, তাই গোছাতে একটু সময় লাগল। তিন নম্বরটা হয়ে যেতেই এলাম। এখন আমি নিশ্চিন্ত। চার নম্বরটা হল আমার বোনাস। নাহলে ওক্কে।'

আমি ওর দিকে তাকালাম, যেন যা বলার তাড়াতাড়ি বলে ফেল। ঝেড়ে কাশ মা!

মুনিয়া বলল, 'ওরম করে তাকিয়ে থেকে লাভ হবে না, আমি খবর নিয়েছি, আজ তোমার ছুটি। তাড়াহুড়ো করে কিছু বলতেও চাই না, করতেও চাই না। আমি যেখানে যেখানে জলদিবাজি করেছি, হুটপাট করেছি, সেখানেই ঠকেছি। তাই পরের সব কাজ আমি খুব ধীরে-সুস্থে করি, তা বলে স্লো নয়। ভুল করলে সংশোধন করে নিতে পারি। এই যেমন, তোমার কাছে আসব বলে ভাবছি, প্রায় ছ-মাস। তার মধ্যে ফার্স্ট লোকটা টপকে গেল। থার্ড লোকটার খবর যে কোনো দিন এসে যাবে। সেকেন্ড হয়ে গেছে। তারপর থার্ড লোকটা হয়ে গেল, তাই এলাম। আমার এখন সব চিন্তা ফোর্থটাকে নিয়ে। বড্ড চিন্তা। আসলে, পাখি হাতের বাইরে, আকাশে। আমি আকাশের পাখির দিকে টিপ করেছি।'

আমার সিগারেট শেষ। অ্যাশট্রেতে রাখলাম। বললাম, 'শোনো, আমার ছুটি বলে কিছু নেই, যে কোনো সময় বেরিয়ে যেতে হবে।'

'সে চলে যাবে। আমি তোমাকে আটকাব না। আমার আসা-যাওয়া চলতেই থাকবে। আমি বললাম না, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। সব ধীরে-সুস্থে হবে। রোজ একটু একটু করে।' কথাটা বলে মুনিয়া ঘাড় ঘোরাল। 'তোমার ফ্ল্যাটটা বেশ ভালো। বড়োও। কিন্তু এমন সব কিছু বন্ধ কেন? তুমি কি ভূতের ভয় পাও, নাকি চোর-ডাকাতের ভয় পাও?'

অবান্তর কথার উত্তর হয় না।

মুনিয়া উঠল, বলল, 'ব্যালকনির দরজাটা খুলে দিলে পুরো ফ্ল্যাটটা আলো চমকাবে, হাওয়া খেলবে, অথচ তুমি বন্ধ করে রেখে দিয়েছে! আমি খুলে দিলাম।' মুনিয়া আমার দিকে ঘাড় ঘোরাল, 'তোমার বউ নিশ্চয়ই ভূত হয়ে তোমার ঘাড় মটকাতে আসবে না?'

আমি দাঁতে দাঁত চিপলাম। আগেই দেখেছি, মেয়েটা বড্ড বেড়ে খেলছে, কিন্তু এখন যেন একটু বেশি রকম—।

মুনিয়া বলল, 'তুমি ডাকাতের ভয় করো না, যতই ডাকাতের গল্প দাও। সবাই জানে ডাকাতিটা বাজে কথা, ডাকাতটা তুমি। খুনিও তুমি, ডাকাতও তুমি।' মুনিয়া কথাটা থান ইটের মতো চার্জ করল।

আমি আড়মোড়া ভাঙলাম, 'তোমার কথা শেষ হয়েছে? আমি এবার উঠব।'

মুনিয়া শান্ত মুখে বলল, 'আমার কথা তোমার পছন্দ হল না, রেগে গেলে তাই তো? ঠিক আছে আর বলব না। ভাবিনি এটায় তোমাকে আঘাত করতে পারে। ভেবেছিলাম তুমি স্ট্রংম্যান। নাহ, আমি তোমার থেকে স্ট্রং। ঠিক আছে, এখন আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমি আবার আসব। বেশি দূরে আমার বাড়ি নয়। তোমার পাটুলি, আমার অভিষিক্তা। আসা-যাওয়া চলতেই থাকবে।'

আমি একটা খুন করতে চাই।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটা ওর পায়ের কাছে গুটি মেরে ফেলে রাখা জগারটা তুলে আবার পরে নিল। জ্যাকেটটা চাপিয়ে নিল গায়ে।

উঠে দাঁড়াল।

আমি বললাম, 'তোমাকে কে পাঠিয়েছে? কেন এসেছ এখানে?'

মুনিয়া আবার বসে পড়ল সোফায়, 'আমি নিজের ইচ্ছেয় এসেছি। কেন এসেছি শুনতে চাও? আমি একটা খুন করতে চাই। মানে একজনকে মারতে চাই, কিন্তু কিছুতেই প্ল্যান করতে পারছি না। তোমার হেল্প চাই।'

'খুনি ধরা আমার কাজ। খুন করা নয়।'

'খুনি ধরা তোমার প্রফেশন। কিন্তু আবেগে পড়ে তুমি খুন করতে পারো, সেটা আমি জানি। আর খুন করা আমারও প্রফেশন নয়। আমি আবেগে পড়ে করেছি। একটায় এসে আটকে গেছি।'

'তুমি আগে খুন করেছ?'

মুনিয়া চুল ঝাঁকিয়ে বলল, 'পাগল! আমি স্বীকার করি, আর তুমি আমাকে ধরে লকআপ করে দাও। আমি তোমার মতো, মজা নেব, স্বীকার করব না।'

'তুমি আমার মতো হতে পারবে না।'

'তুমিও আমার মতো হতে পারবে না।'

মুনিয়া চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ফিসফিস করে, 'আমি জানি তুমি খুব ভালো মানুষ। কিন্তু যতটা ভালোমানুষ, ততটাই ডেঞ্জারাস। আর তুমি যেটা দেখছ, আমি ততটাই সুন্দর, কিন্তু যা দেখতে পাচ্ছ না, আমি ততটাই হিংস্র। আমাদের দুজনের মিল হবে ভালো।'

'মিল!' আমি হাসলাম। 'তুমি কি আমাকে তোমার বিজনেস পার্টনার বানাতে চাও?'

'একদম নয়, ভালোবাসতে চাই।'

'বাচ্চা মেয়ে, বাড়ি বয়ে এসে বকবক করছ। যাও, কেটে পড়ো।'

'চলে যাব, তাড়িয়ে দিচ্ছ, আচ্ছা চলে যাচ্ছি। আমার আত্মসম্মান বড্ড বেশি। কেউ অপমান করলে তার ত্রিসীমানায় যাই না। তার সর্বনাশ করে ছাড়ি। কিন্তু তোমার জন্য সব মাফ। তোমার কথা আমি গায়ে মাখব না। কারণ, তুমি আমার কিছু জানো না। অথচ আমি কিন্তু পুরো হোমওয়ার্ক করে এসেছি। তোমার ডে-টু-ডে আমি জানি।'

আমি হাসি, 'আমাকে নিয়ে হোমওয়ার্ক করেছ!'

'আলবাত করেছি। যতটা আমার পক্ষে করা সম্ভব। তুমি যদি এখন বলো—বলো, আমি কীভাবে আমার বউকে মেরেছি? না, আমি বলতে পারব না। ওসব কথা তুমি নিজেই একদিন আমাকে বলবে। না বললেও আমার কিছু আসে যায় না। আই লাভ মার্ডারার—।'

আমি হাসলাম, হেসে বললাম, 'তুমি আচ্ছা পাগল তো, তুমি আমাকে খুনি বানাচ্ছ, আবার তুমিই আমাকে ভালো মানুষ বলছ? দুটো একসঙ্গে কী করে হয়?'

মুনিয়া আমার দিকে স্থির চোখে তাকাল। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'তুমি তোমার বউকে খুব ভালোবাসতে। তাই তার মৃত্যুর দায়িত্বটা অন্যের হাতে দাওনি। আমি জানি, তুমি চেষ্টা করলে হাজার একটা খুনে ডাকাতকে ফিট করে কাজ শেষ করতে পারতে। তা করোনি। কারণ, দুটো। প্রথম কারণ, তারা কতটা কষ্ট দিয়ে মারবে তা তুমি জানো না। তুমি এক ঘায়েই শেষ করে দিয়েছ। এভাবে তুমি এর আগে একজন মাওবাদীকে মেরেছিলে—পুরুলিয়ার জঙ্গলে। ছেলেটার নাম রাজেন। তোমার ফাইলেই আছে। খুব গোপন কিছু নয়, তবু হুট করে তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে তুমি নাম বলতে পারবে না। আমি কিন্তু মনে রেখেছি। দ্বিতীয় কারণ, যে মারবে, সে অত সুন্দর শরীরটা হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দেবে না। ভোগ করবে। যাকে বলে রেপ। একজন-দুজন যারাই খুন করতে আসবে তারাই কমলাকে ফেলে লাগাবে। ইয়ার তোমার কমলা বহুত সেক্সি। এমন শরীর পেলে কোনো পুরুষ মাথা ঠিক রাখতে পারে? আর ওদের কাছে তো খুন করার ছাড়পত্র রয়েছে। ওরা কি একবারও ভাবত না, মারার আগে একটা রেপ হয়ে যাক।'

'স্টপ!' আমি ঠান্ডা গলায় বলি।

'ওক্কে।' মুনিয়া দু-হাত মাথার ওপর তুলল। 'আমি থেমে গেলাম। আমি ওই সময়কার সব কাগজগুলো খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি। তোমার ডিপার্টমেন্টের লোকজনের থেকেও জেনেছি। এগুলো আমার মনগড়া নয়। আমি শুধু ভেবেছি। আর একটা কথা বলব—।'

আমি ওর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকি। মনে হচ্ছিল, ওর গালে একটা চড় কষাই। মাথাটা ধরে দেওয়ালে ঠুকে দিই। কিন্তু মাথার ভেতর যতই দপ দপ করুক নিজেকে ঠান্ডা রাখি। 'তোমার প্রলাপ শোনার সময় আমার নেই। তুমি এবার কেটে পড়ো।'

'তাহলে কি পরে বলব? ছোট্ট একটা পয়েন্ট, বলেই যাই। নাইলে পেটের ভেতর গুড়গুড় করবে। তাছাড়া আবার পরে কেন এসব তেতো কথা তুলব, যা হচ্ছে হয়ে যাক। তেতো দিয়ে শুরু হলে শেষে মিঠে হবে। বলি তাহলে—তুমি আগের দুটো দিন—মোট ছ-জন বাইরের লোক ঢুকিয়েছ তোমার ফ্ল্যাটে। কাঠের মিস্ত্রি এসেছিল দু-জন। রঙের মিস্ত্রি একজন। তিনজন ব্রোকারকে ডেকে ডেকে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরিয়েছিলে। বলেছিল, ফ্ল্যাট বিক্রি করে দেবে। ওদের হাতের ছাপ তোমার ঘরের সর্বত্র পাওয়া গেছে। ওদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও চলেছে বিস্তর। তুমি কিন্তু ওদের সম্পর্কে ভালো সার্টিফিকেটই দিয়েছে। ওরা দু-চারদিন ফালতু হ্যারাসমেন্ট সহ্য করেছে তোমার জন্য। পরে তুমি ওদের কাছে ক্ষমাও চেয়েছ। কাঠের মিস্ত্রি ও রঙের মিস্ত্রিদের কিছু করে টাকাও দিয়েছ। ব্রোকারদের কী দিয়েছ খোঁজ পাইনি। ব্যস আমার কথা আপাতত শেষ, আমি চলে যাব। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না, তুমিও আমার পথে পড়বে না। শুধু আমাকে একটা প্ল্যান করে দেবে। আসলে যাকে মারতে চাইছি, আমার কেন জানি না তার প্রতি একটা সফট কর্নার আছে। তাই আমার মাথায় ঠিক প্ল্যানটা খেলছে না। তুমি পারবে। কেননা, সে তোমার কাছে একটা সাবজেক্ট ছাড়া আর কিছু নয়। তাহলে এখন আমি আসি। নাও, আমাকে একটা চুমু খাও।'

আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

'কী হল খাও। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? পরে কিন্তু এই একটা চুমু খাওয়ার জন্য সবসময় তোমার ঠোঁট সুড়সুড় করবে। নাও, চলে এসো।'

আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমি ইচ্ছে করলে ওকে দু-হাতে তুলে ছুড়ে ফেলতে পারি।

'ও হো তুমি আসবে না। লজ্জা নয়। এটা তোমার ভালোমানুষি। এই করেই তুমি মরলে। নাও, আমিই শুরু করলাম, প্রথম চুমুটা আমিই তোমাকে খাচ্ছি।'

মুনিয়া এগিয়ে এসে সত্যি সত্যি আমার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চুমু খেল। তারপর চলে যেতে যেতে বলল, 'আমি কিন্তু চোখ বন্ধ করে তোমাকে চুমু খাইনি। তোমাকে কমলা চোখ বন্ধ করে, কিংবা অন্ধকার ঘরে চুমু খেত। তুমি আগের থেকে অনেক বুড়ো হয়ে গেছ। দেখতে আরও খারাপ হয়েছ। স্বাভাবিক, তুমি যতই লুকানোর চেষ্টা

করো, তুমি কমলাকে ভালোবাসতে। নিজে হাতে তাকে মারার চাপ আছে বস। সেটা তুমি নিয়েছ। তার ওপর তোমার গাণ্ডু কলিগগুলো কেস দিল, সেটাও সামলালে, চাপ তো থাকবেই। সেই চাপের ছাপ আছে তোমার শরীরে। কিন্তু আমি চোখ খোলা রেখে তোমাকে চুমু খেলাম। মন থেকেই খেয়েছি। সে তুমি আমার প্ল্যান না করে দিলেও—লাভ ইউ বেবি।'

শালার মাগি আমাকে বেবি বলছে—মুনিয়া ঝড়ের মতো চলে গেল। খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। মুনিয়া কি সত্যি সত্যি নিজের নাম বলছে? মুনিয়া কে?

আমি ঝটফট ফেসবুকে ঢুকে ওকে খুঁজতে শুরু করলাম।

চার

এই কাহিনির শুরুতেই আপনাদের বলেছিলাম, এই কাহিনি আমার নয়, মুনিয়ার। তবু এতক্ষণ ধরে আপনারা আমার কথাই শুনে যাচ্ছেন। মুনিয়া আর কতটুকু এল। আসলে আমার কথা প্রথমে না বলে রাখলে আপনারা মুনিয়াকে ঠিক ধরতে পারবেন না। মুনিয়া খুব জটিল। এত জটিল আমি বাপের জন্মে দেখিনি। তবে বেশ ইন্টারেস্টিং।

ইন্টারেস্টিং বলতে, আপনি কী বুঝলেন জানি না। আমি কিন্তু দুটোই বলতে চাই। যেমন মগজে, তেমনই শরীরে।

প্রথম দিনের সকালেই ও আমাকে মগজের খেলায় বাজিমাত করে দিয়েছিল। বিশেষত, দুজন কাঠের মিস্ত্রি, একজন রঙের মিস্ত্রি ও তিনজন ব্রোকারকে খুনের একদিন আগে কেন ডেকেছিলাম, ও খুব সহজেই বুঝে গেছে। অথচ আমাদের ডিপার্টমেন্টের লোকজন সহজ কথাটা সহজে বুঝতে পারেনি।

আমি আসলে সব কিছু ঘেঁটে দিতে চেয়েছিলাম। নাহলে সারা ফ্ল্যাটে আমার আর কমলা, এবং ঠিকে কাজের মাসির হাতের ছাপই শুধু পাওয়া যেত। তাতে আমার দিকে খুনের তত্ত্ব বেশি স্ট্রং হত। সব কিছু গুলিয়ে দিতে আমি আরও ছ-জনকে বাড়ির ভেতর হাজির করেছিলাম। বাইরের ছ-জন।

আমি আমার দেখানো পথে পুলিশকে পাঠিয়েছি। পুলিশ ওদের নিয়ে সপ্তাহ খানিক ধরে ভেবেছে। ওদের পিছনেই চক্কর কেটেছে। ছুটেছে। আমার নাম এসেছে অনেক পরে। প্রাথমিকভাবে আমি কোনো সন্দেহের তালিকায় ছিলাম না।

কিন্তু আমার সেই চাল আমাদের ডিপার্টমেন্ট বুঝেছে অনেক পরে, কিন্তু মুনিয়া বুঝে গেল সহজে!

সহজে কি?

না কি কেউ ওকে বুঝিয়ে পাঠাল? কে ওকে এটা ধরিয়ে দিল? কে আছে ওর পিছনে? নাকি সবটাই ওর রিডিং? ইমপসিবল।

আমি সারা সকালটা ভাবলাম। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে মুনিয়া কি হিসেব কষেছে, না ওর পিছনে বড়ো মাথা? পাকা কোনো প্ল্যান! তাহলে বলতে হবে ও খুব দক্ষ অভিনেত্রী। এই কথাগুলো ও এমনভাবে বলল, যেন সবটাই ওর কথা। কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও বেশ চমকে দিল। ইন্টারেস্টিং! আর? চুমুটাও তেমন।

অনেকদিন পরে কেউ আমাকে চুমু খেল। আমি কমলাকে চুমু খেতাম। কখনো কমলা আমাকে চুমু খেয়েছে কি? না, মনে করতে পারলাম না। বরং, যখন আমি কমলাকে চুমু খেয়েছি, কমলার দু-চোখ বন্ধ দেখেছি। আমার প্রথম প্রথম মনে হত হয়তো আবেশে দু-চোখ বন্ধ করেছে। পরে বুঝলাম, কারণটা অন্য। ওর সুন্দর ঠোঁটের ওপর আমার কালো ঠোঁটগুলো বড্ড বিচ্ছিরি ব্যাপার। তাই নিভিয়ে দাও আলো। কলেজ লাইফে একটা ছড়া শুনতাম—খেঁদি পেঁচি নূরজাহান, অন্ধকারে সব সমান। স্কুলের গণ্ডি না পেরিয়েও ছড়াটা ঠিক ঠিক ব্যবহার করেছিল কমলা। অন্ধকার করে দিয়ে রাজপুত্রের সঙ্গে আমাকে সমান করে দিত। অন্ধকার করে দিলে কমলার মনে কোনো দুঃখ থাকল না। তবে কমলা আমাকে ঘেন্না করত না। ভালোবাসত। এ ব্যাপারে আমি হান্ড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত।

আবার দেখুন, আমি মুনিয়ার কাহিনি শোনাতে এসে নিজের কথা বলছি। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, মুনিয়া ইন্টারেস্টিং। সেটা যেমন মগজে, তেমনই শরীরে। মগজের কথা আগেই বলেছি। এবার শরীরের কথা আগে বলি। মুনিয়া সকালে আমাকে চুমু খেল। সত্যি বলতে কি, ও যখন চুমু খাচ্ছিল, সেটা আগে বলেছিল বটে, কিন্তু সেটা যে সত্যি সত্যি ঘটবে ভাবতে পারিনি। আচমকাই। তখন আমার সারা শরীর সিরসির করছিল। আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। হতবাক হয়ে দেখছিলাম ওর স্পর্ধা, ঠিক তেমনই নিজেকে সংযত করছিলাম। মুনিয়া চলে গেল। সারাক্ষণ একটা কথাই আমি ভাবছি—ও কেন এল? ও খুন করতে চায়, খুন করার প্ল্যান চায়, এগুলো তো কথার কথা। এসব কথা যত ভাবছি ততই আমার মাথার ভেতর একটা দৃশ্যই ঘুরে ফিরে আসছে—সেটা ওই আমার শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে ধরা। ওফ মেয়েটা যেন আমাকে পাগল করে দিল।

কমলা মারা যাওয়ার পর থেকে এ বাড়িতে কোনো নিয়মিত কাজের লোক নেই। একটা ছেলে আসে, গোবিন্দ। আমার ছুটির দিনে বলা আছে, সেটা দশটা নাগাদ এসে সিঁড়ি থেকে ঘর, বারান্দা সব পরিষ্কার করে যায়। সপ্তাহে ওই একদিন এ বাড়িতে বাইরের লোক ঢোকে। বাদবাকি দিন, দরকার মনে হলে আমি করে নিই। আজও দশটা বাজতে গোবিন্দ এল। আমি সোফায় চুপ করে বসে। গোবিন্দ এসেই দোতলা ঝাঁট দিয়ে মুছে দিল। একতলার ঘরদোর বন্ধ। তারপর ছাদে চলে গেল। ছাদ ঝাঁট দিয়ে সিঁড়ি পরিষ্কার করে, ধুয়ে-মুছে যখন এসে আমার সামনে দাঁড়াল তখন সাড়ে এগারোটা। আমি তখনো সোফায় বসে। সাধারণভাবে গোবিন্দ চলে গেলে আমি রান্না বসাই। সাড়ে বারোটায় রান্না শেষ। ছুটির দিনে আমার ভাতে-ভাত। সারা সপ্তাহ প্রচুর মাছ-মাংস খাই। তাই ছুটির দিনে সংযম। একটার মধ্যে খাওয়া হয়ে যায়। দেড়টার সময় আমি গভীর ঘুমে চলে যাই। ঘুম থেকে উঠি পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটা।

আমার ঘুম নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। শুলেই ঘুমাতে পারি। টেনশনহীন জীবন। কিন্তু আজ ঘুম এল না। আর ঠিক দুটোর সময় নীচের ডোরবেলটা বাজতে শুরু করল। একবার, দুবার, আমি না শোনার চেষ্টা করে বিছানায় চুপচাপ পড়ে থাকলাম। আবার বেল

বাজছে। আবারও। যেন নাছোড় বাজিয়েই চলেছে। বাধ্য হয়ে উঠলাম। কোন শালা, এই ভরদুপুরে!

দোতলা থেকে নীচে গেলাম। দরজা খুলেই দেখি—মুনিয়া।

—তুমি!

—কেন? আমি তো সকালে চলে গেলাম। আবার এলাম। সরো, ভেতর ঢুকতে দাও।

—ভেতরে ঢুকতে দাও মানে?

—আমি ভেতরে যাব, সরো। কথা শেষ করে মুনিয়া আমাকে পাশ কাটিয়ে সত্যি সত্যি ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারপর সিঁড়ি বয়ে দ্রুত ওপরে।

সকালে পরনে ছিল জগার, এখন ছেঁড়া-ফাটা জিনস, আর টি-শার্ট।

আমি ওপরে উঠে দেখলাম আমার বোতল উঁচিয়ে জল খাচ্ছে। বলল, 'তুমি তো ছুটির দিন সেদ্ধ ভাত খেয়ে দুপুরে ঘুমাও।'

আমি ঠান্ডা গলায় বললাম, 'বাড়াবাড়ি করো না, চুপ করে বসো।'

'তোমার এখন ঘুমানোর টাইম, আমি চুপ করে বসব কেন? আশ্চর্য! চলো ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।'

'তুমি কী চাও? কে তোমাকে পাঠিয়েছে?'

মুনিয়া ঘাড় কাত করল, 'আমি কী চাই আগেই বলেছি—একটা মার্ডার করব। তার প্ল্যান চাই। পারফেক্ট প্ল্যান। আমার আগেরগুলোর কোনো ঝামেলা হয়নি। এটাও নির্বিঘ্নে করতে চাই। তোমাকে সেই খুনের প্ল্যানটা করে দিতে হবে।'

'বাজে বকোয়াস বন্ধ করো। তোমাকে কে পাঠিয়েছে?'

'আমি নিজে তোমাকে খুঁজে বের করেছি। সব ক্রেডিট আমার।'

'আমি তোমাকে ব্যালকনি থেকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারি, জানো।'

'সে তুমি করবে না। ছুটির দিনে রান্না করার পরিশ্রমের ভয়ে তুমি সেদ্ধ ভাত খাও। আমাকে নিয়ে ছোড়াছুড়ি করতে তোমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।'

'তুমি কেন এসেছ? এক্ষুনি চলে যাও।'

'তাড়িয়ে দেবে? আমি তোমাকে বলেছি, আমার আত্মসম্মান খুব বড্ড বেশি। আঘাত করো না, সামলাতে পারবে না। তাই যা বলছি, চুপচাপ মেনে নাও। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নাও। তোমার বয়েস এক বছর পরে যাট হবে। আমার বয়েস পুরো ত্রিশ। তোমার হাফ। এই বয়েসে এসে অত কমবয়েসি মেয়ে তুমি পাবে না। আমি তোমার সবটা জানি। আমাদের জুটি কিন্তু দারুণ হবে।'

'কী?'

'জুটি!'

'কীসের জুটি?'

'খুনের জুটি। আমার তিন থেকে চার হবে। তোমার চার কমপ্লিট করা।'

'বাজে কথা বন্ধ করো।'

'কার বাজে কথা? তোমারটা? ঠিক আছে আমি মেনে নিলাম। কিন্তু আমারটা বাজে নয়।'

'ওফফ! তোমার কি মাথার গণ্ডগোল আছে?' আমি নিজের অজান্তে দু-হাত ছুড়লাম। পরক্ষণে নিজেকে বললাম, কুল, কুল!

'কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই। শুয়ে দেখে নাও। আমি একদম টাটকা। সতেজ। চলো বিছানায় চলো, আমি নিজে তোমাকে চেক করিয়ে দেব।'

'দেখো, আমার হারানোর কিছু নেই। আমার সাতকুলে কেউ ছিল না, এখনও কোনো পিছুটান নেই। আর আমি মরতে ভয় পাই না।'

'হঠাৎ এসব কথা বলছ কেন? মরতে ভয় পাও না, অথচ আনন্দ করতে ভয় পাও। চলো বিছানায় চলো।'

'তোমার কি এইডস আছে? আমার সঙ্গে শুয়ে অসুখ দান করে যাবে।'

'এইডস! না, আমার কোনো অসুখ নেই। তোমাদের গুরুজি অসীমানন্দেরও এইডস ছিল না, কিন্তু প্রচার ছিল। মালটা প্রচুর মেয়ের সর্বনাশ করেছিল। শেষে তো শুনলাম সুইসাইড করেছিল। সরি, সুইসাইড করেনি, করানো হয়েছিল। বাধ্য হয়েছিল। আর সেটা তুমি করিয়েছিলে। একা থাকত, ভয় পেত। ভয় পেয়ে মরে গেল। ভালো করেছ, একটা পাপ সরিয়ে দিয়েছ।'

'ওসব আমি জানি না।'

'তুমি সব জানো। ন্যাকামো করো না। আমি জানি আর তুমি জানবে না, তা হতে পারে? এটা তোমার স্কিম। গুড প্ল্যান। আর ওই রেকর্ড কোম্পানির দুজন কার অ্যাক্সিডেন্টে মরেছিল। এই প্ল্যানে বহুত খেলা হয়েছে। মাস্টার টাচ কিছু নেই। যাক কাজ সেরেছে, এটাই বড়ো কথা। চারটে কেসই সাকসেসফুল। একশোয় একশো! গুড বয়। গুড বয় এবার বিছানায় চলো তো দেখি, সব জেগে আছে, না, ঘুমিয়ে পড়েছে? ভয় পেও না, আমার কাছে কনডোম আছে। আমি তোমাকে দিচ্ছি। এবার প্রশ্ন করবে তো কেন কনডোম রাখি? আমার বরকে বলতাম—তোমার জন্য। তুমি তো কিনবে না, তাই আমি কিনে রাখি। আসলে, আমি দেখেছি, সেক্স হচ্ছে সবচেয়ে কম ইনভেস্টমেন্টে, যেখানে বেশি কাজ গোছানো যায়।'

আমি মেয়েটার দিকে দেখি। ও কথা শেষ করে আমার বেডরুমের দিকে চলেছে। যেতে যেতে টি-শার্ট খুলে ফেলেছে। ওর চকচকে ফরসা পিঠে ব্রায়ের কালো স্ট্রাপ আমাকে বিহ্বল করে দিল। যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমাকে টেনে নিল। কী আছে আমার? এত ভয় কীসের? আমি প্রথম প্রথম কিছুদিন কমলাকে দেখেছিলাম। কিন্তু কোনোদিন কমলার পিঠে এমন আহ্বান ছিল না। বিছানায় কোমর ঠেকিয়ে মুনিয়া জিনসের প্যান্টটা শরীর থেকে ছাড়িয়ে ফেলল।

আমি এসে দরজার সামনে দাঁড়ালাম।

মুনিয়া প্যান্টি আর ব্রায়ে আমার দিকে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দেখলাম, চুলগুলোর বন্ধনও মুক্ত করে দিয়েছে। বলল, 'আমি কমলার মতো সুন্দরী নই। কিন্তু আমি বেশ ভালো, একবার ভরসা করে দেখো।'

আমি হাসলাম, 'তিন তিনটে মানুষ মারা খুনিকে বিশ্বাস? না, পারলাম না।'

মুনিয়া শান্ত মুখে বলল, 'আসলে ওই তিনজন আমাকে আগে

মেরেছে। খুব কষ্ট দিয়ে মেরেছে। নাইলে আমি কোনোদিন একটা ইঁদুরও মারিনি। ইঁদুর কত বই কেটে দিয়েছে। কত জামাকাপড় কেটে দিয়েছে। তবু বিষ দিইনি। কল পেতে ধরে, বড়ো রাস্তায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে এসেছি। আর ওসব কথা নয়, এসো আনন্দ করি। বহুদিন পরে নিজের পছন্দে সেক্স করব।'

'কেন তোমার বর?'

'হ্যাঁ, করত। মাঝে মাঝে আমাকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে সেক্স করত। ওর কথায়—হোটেলের ঘর না হলে ফেলে লাগানো যায় না। ওর বাড়িতে আমার ঢোকা নিষেধ। ওর মা-বোন আমাকে পছন্দ করে না। আর আমার বাড়িতে আমার মা থাকে। মা 'আঃ-উঃ' শুনলে আমার বরের খারাপ লাগবে। তারপর, করতে করতে আমার বর খিস্তি দেয়, পেটেন্ট খিস্তি—খানকি মাগি, আমার পাছায় চাপড় মারে। চুলের মুঠি ধরে আমার বিছানায় মাথা ঠুকে চাপড় মেরে চিৎকার করে—বিচ! আমি কুত্তি। আমাকে হোটেলের ঘরের বিছানায় ফেলে কুত্তির মতো করে উপভোগ করে। ওর ভাষায়—লাগানো। এতে নাকি খুব সুখ! বাদ দাও, আমার বরের কথা। সেক্স করার সময় মৃত মানুষের কথা আলোচনা করতে নেই। মৃত মানুষদের শরীর থাকে না, তাই সেক্স করতে পারে না। আমি বরের কথা ভাবছি না। তুমিও কমলার কথা ভেবো না। আমরা আলাদা মানুষ। দুজন দুজনের জন্য। এই ব্রা আর প্যান্টি তোমাকেই খুলতে হবে।'

'তুমি কী করে নিশ্চিত হলে আমি তোমার কথায় রাজি হয়ে শুয়ে পড়ব?'

'আজ রাজি না হলে আপত্তি নেই। তোমাকে আমি স্মার্ট এবং ডেয়ার ডেভিল ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি হয়তো ওই কেসটা করে একটু বেশি সাবধানি হয়েছ। ঠিক আছে, আমি ওয়েট করব। আজ নাহোক কাল। কাল এসে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

মুনিয়া হাসল, 'পড়তেই হবে। তুমি তেমন মানুষ না—'

'তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ'।

'তেমন মানুষ না বলতে? আমি কি রেপিস্ট? মেয়ে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ি?'

'আমি সেকথা বলিনি। তুমি একজন মানুষের জন্য ওয়েট করে আছো, আদ্যোপান্ত তুমি একজন ভালোবাসার মানুষ, তেমন মানুষ পেলে তুমি সরিয়ে রাখবে না। আমি জানি কমলাকে তুমি কীভাবে উদ্ধার করেছ।'

'ওটা আমার কাজ ছিল।'

'কাজ তো উদ্ধার করা। কিন্তু মেয়েটাকে যে আড়কাঠি তুলে নিয়ে গিয়েছিল, সে তো দু-দিন ধরে ওর দফারফা করে দিয়েছিল। তারপর, এক রাত বেশ্যাবাড়িতে—ক-জন ঢুকেছিল ওর ঘরে?'

'তুমি ফালতু কথা রাখো। এসব কথা কেউ তোমাকে খাইয়েছে—সেই শুয়োরের বাচ্চাটা কে? কার হয়ে তুমি কাজ করতে এসেছ?'

'গড প্রমিস, আমাকে কেউ পাঠায়নি। তোমার মোবাইলটা চেক করো, আমি আমার প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছি। তুমি হোয়াটসঅ্যাপ চেক করেলে, দেখতে পেতে।'

আমি অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকালাম, কী মেয়ে রে!

মুনিয়া হাসল, 'তুমি সব দেখে নাও, আমি কে? কী আমার পরিচয়? আমার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন পাঠাব? নো প্রবলেম। সব দেখে নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে শোবে। শুতে কিন্তু তোমাকে আমার সঙ্গে হবেই। কারণ, আমার মতো কেউ তোমাকে ভালোবাসবে না। আর তুমি মনে এই অতৃপ্তি নিয়ে মরে যাবে। প্রেত হয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াবে সেটা আমার কষ্ট হবে।'

'সেক্সে আমার কোনো অতৃপ্তি নেই। আমি ইচ্ছে করলেই প্রতি রাতে নতুন মেয়ে জোটাতে পারি।'

'পারো, কিন্তু তারা কেউ তোমাকে ভালোবেসে শরীর দেবে না। বাদ দাও ভালোবাসা, এক ফোঁটা সম্মান করেও তোমাকে শরীর দেবে না। কী পাবে তুমি? তার থেকে একটা কোরিয়ান সেক্স ডল আনিয়ে নাও। তার মন নেই, তাই সেটা পাওয়ার আশাও থাকবে না।'

'আমি কী করব সেটা আমাকে ঠিক করতে দাও।'

মুনিয়া হাসে, 'সেটা তুমি ঠিক করো। কিন্তু আমার একটা কাজ করে দাও—।'

'কি, ব্রায়ের হুক খুলে দিতে হবে?'

'না, না, আমি নিজের বুদ্ধিতে তিনটেকে হাপিস করে দিয়েছি, আর ব্রায়ের হুক খুলতে পারব না? তুমি আমাকে একটা বিয়ার দাও।'

আমি ঘরের বাইরে গেলাম। ফ্রিজ খুলে একটা বিয়ার নিয়ে এলাম।

'তোমার জন্য আনলে না?'

'আমি খাব না।'

মুনিয়া বিয়ারের ক্যানটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল, আর ওর ব্রা খুলে পড়ে গেল। ব্রা খুলে ও বুকের সামনে চাপা দিয়ে রেখেছিল, এখন হাত সরাতেই সেটা খসে পড়ল। ধড়াস করে ভেঙে পড়ার ভাব করে ওর দুটি স্তন আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকল। স্তনবৃন্তে কমলা রং। উফফ্! কমলা কেন? মুনিয়া স্তনবৃন্তে গোলাপি আভায় টসটসে। কমলার কথা মনে পড়তেই আবার আমার মাথার ভেতর কেমন দপ দপ করে উঠল। আমি এক কদম এগিয়ে এলাম। আমি আমার তর্জনী স্পর্শ করলাম মুনিয়ার স্তনবৃন্তে। ছুঁয়ে থাকলাম। তিরতির করে কাঁপছে। ক্রমশ গোলাপি স্তনবৃন্ত রং পরিবর্তন করছে, গাঢ় রঙে সেজে উঠছে। কঠিন হয়ে সে যেন চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে আমার তর্জনীকে। তার কাঁপনে আমার আঙুলে বিদ্যুৎ। চূড়ান্ত তার আহ্বান—তোমার আঙুলে হবে না, জিভ দাও, দাঁত দাও। এসো।

মুনিয়া অদ্ভুত সুখে চোখ বন্ধ করছে, পরমুহূর্তে খুলছে। যেন দেখে নিতে চাইছে, ষাট ছুঁই ছুঁই একটা কুপুরুষ কেমন করে গোলাপ বনের এই কাঁটার খোঁচায় কতক্ষণ বাঁচে!

আমি মুনিয়ার স্তনে জিভের ডগা স্পর্শ করতেই সে আমার একটা হাত নিয়ে গিয়ে রাখল তার যোনির ঢেউয়ের ওপর। বলল, মুক্ত করো!

আরে পাগলি আমি কি মুক্ত করার মালিক?

পাঁচ

এতক্ষণ আমার অনেক কথা শুনেছেন। এবার মুনিয়ার কথা শুনুন। ওর বয়েস আমি আগেই বলেছি। কিন্তু সেটা আমি বলেছি। আপনি ওকে দেখলে খুব বেশি হলে চব্বিশ-পঁচিশ ভাববেন। কেন ভাববেন, ও যখন জিনস, টি-শার্ট পরে আপনার সামনে দাঁড়াবে, আপনার মনে হবে কলেজে পড়ে। আর যখন পুরো জামাকাপড় খুলে, ছুড়ে দিয়ে, লাফিয়ে উঠবে, বিছানায় তুড়ি লাফ খাবে, তখন মনে হবে ওর শরীরে এখনও কোনো পুরুষের দাঁত পড়েনি। ওর নিটোল স্তন, একটুও টাল খেয়ে নীচে ঝোঁকেনি। স্তনবৃন্ত গোলাপি। চোখ বন্ধ করে হাত দিলে প্রথমে আপনার মনে হবে কোনো পাথরের মূর্তির গায়ে আপনি হাত রেখেছেন। এত শীতল। একটা কুল কুল আমেজ।

মুনিয়া প্রচণ্ড প্রাণোচ্ছল। পাহাড়ি ঝরনার সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। খরগোশের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন।

জেলার এক ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করত। ভালো রেজাল্ট করেছিল। শান্তশিষ্ট মেয়ে ছিল—মুনিয়া আমাকে তাই বলেছে। সে খুব শান্ত ছিল। যমের মতো ভয় করত বাবাকে।

আমি বললাম, 'মুনিয়া আমাকে তোমার ভয় করে না?'

মুনিয়া হাসে, 'তোমার সঙ্গে খালি সেক্স করতে ইচ্ছে করে—।'

'ওফ আবার বাজে কথা!'

'একদম বাজে কথা নয়—আমি এখন চোখ বন্ধ করলে তোমাকে দেখতে চাই। তুমি উদোম হয়ে টানটান শুয়ে আছো আর আমি তোমার ওপর বসে ন্যাংটোপুটু! আমার ভেতর তুমি, তোমার ভেতর আমি! তুমি সম্পূর্ণ আমার ভেতর সেঁধিয়ে গেছো। কনডোম ছাড়া আমি তোমাকে ফিল করছি—। আহ্, তোমার প্রতিটা আদর আমার ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে।'

আমি চোখ স্থির রেখে আবার জানতে চাই, 'মুনিয়া আমাকে ভয় করো কি না বলো?'

'আমি প্রথম যে দিন, যার কাছ থেকে তোমার কথা শুনি, আমি তাকে ভয় করি। করতাম। তাকে যমের মতো ভয় করতাম। দেখলাম, তোমার সব চাল সে ধরতে পেরেছে, কিন্তু সে তোমাকে ভয় পায়। শত্রুর শত্রু আমার মিত্র।' কথাটা বলে মুনিয়া মাথা ঝাঁকায়। সমস্ত চুলগুলো উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

'তোমার বাবা।' আমি হাসি। কিন্তু আমার মুখে কাঠিন্য বজায় রাখি। এটা আমরা পারি। পুলিশের লোকজন খুব বড়ো অভিনেতা, যাকে পিটিয়ে ছাতু করবে, তাকেই জামাই আদর করে বিরিয়ানি খাওয়ায়। যাকে পিছন ফিরলে গুলি করবে বলে ভেবেই রেখেছে, তাকে শান্ত গলায় বলে—তোকে ছেড়ে দিলাম, যা, চলে যা।

মুনিয়া আমার দিকে তাকিয়ে। আমি ভাবার চেষ্টা করি, ও কত বড়ো অভিনেত্রী? ও কি বাবার বদলা নিতে এসেছে? কথাটা আমার মাথার ভেতর বন বন করে ঘোরে। কিন্তু মুনিয়া তো ওর বাবার কথা চেপে যায়নি। বরং রাশি রাশি ঘৃণা উগড়েছে হাসতে হাসতে। যদি সবই অভিনয় হয় তাহলে—

দীনেশ সান্যাল ছিল মুনিয়ার বাবা। অত্যন্ত খারাপ লোক এই দীনেশ সান্যাল। কতটা খারাপ তা এক কথায় বলা যাবে না। আমি এত বছরের চাকরি জীবনে এমন কুৎসিত মানুষ দেখিনি। না, না, রূপে কুৎসিত ছিল না। বরং বেশ সৌম্য দর্শন, একটু বেশি রকমই গম্ভীর। সহজে হাসত না, প্রচণ্ড ধূর্ত। ওর একটা নিক নেম ছিল—সাদা বাঘ। ওর একমাত্র টার্গেট মেয়ে। সম্ভ্রান্ত ঘর থেকে একদম শ্রমজীবী মহিলা কেউ দীনেশ সান্যালের খপ্পর থেকে নিস্তার পেত না। সবাই ওর খেলার পুতুল। এ ব্যাপারে ও কারও তোয়াক্কাও করত না। না অফিস, না পরিবার। সিস্টেমের যেখানে যেখানে দীনেশ সান্যাল আটকেছে সেখানেই ও মেয়ে সাপ্লাই করেছে। মেয়ে দিয়েই ও কাজ উসুল করেছে, টাকা করেছে।

মহিলা সংক্রান্ত ভূরি ভূরি কেস ওর নামে ডিপার্টমেন্টের ফাইলে। বছর খানেক আগে মারা গেছে দীনেশ সান্যাল। তার আগেই অবশ্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। শেষ শুনেছিলাম বেডরিডিন। মুনিয়ার কাছে জানলাম বহুত কষ্ট পেয়ে মরেছে। কথাটা বলতে বলতে মুনিয়া হাসত।—গেছে ভালো হয়েছে, আর সহ্য করা যাচ্ছিল না।

একটা কথা আমি আগে বলিনি। আমার পিছনে যারা লেগেছিল, তার মধ্যে এই দীনেশ সান্যাল একজন। এই লোকটাই আমাকে অন্য এক রূপে আবিষ্কার করে। একটা সত্যি জানতে পারে।

এই কথাটা গল্পের প্রথম দিকে আমি বলতে গিয়েও চেপে গিয়েছিলাম। আমার আর কমলার কোনো সন্তান ছিল না। সবাই জানত সন্তান না হওয়ার জন্য ত্রুটি ছিল আমার। আমার সিমেনে স্পার্ম কাউন্ট খুবই কম। এই জন্য ডিপার্টমেন্টের অনেকে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করত। বলত, খড়ের সিংহ। বেচারা ভালো করে লাগাতে পারে না, তাই জন্যে আসামি পেটায়। রেপ কেসের আসামি পেলে মেরে ছেতরে দেয়।

কিন্তু কমলা মারা যাওয়ার পর এই দীনেশ সান্যাল আমার সিমেন টেস্টের রিপোর্ট পায়। হয়তো আমার লকার কোনোভাবে ও খুলেছিল। সেখানেই ওই রিপোর্টটা পেয়ে যায়। পেয়ে অবাক হয়। রিপোর্টে দেখে আমার কোনো ত্রুটি নেই। ত্রুটি কমলার। দীনেশ সান্যাল এমনই মতামত দিয়েছিল ওপর মহলে, বলেছিল—আমি স্ত্রীকে অসম্ভব ভালোবাসি। তার প্রমাণ, আমার স্ত্রীর দোষ ত্রুটিও আমি নিজের করে নিয়েছি। স্ত্রীকে জানতে দিইনি। কিন্তু সে যখন নাম-যশের মোহে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। দীনেশ নিশ্চিত ছিল—আমিই মেরেছি। কিন্তু আইনের কাছে আবেগ ধোপে টেকে না। আদালত প্রমাণ চায়। দীনেশ সান্যাল প্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি। ওর কোনো কথাই গুরুত্ব পায়নি।

তবু দীনেশ আমার পিছন ছাড়েনি। রত্নেশ্বর-উৎপলের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হলে এই দীনেশ আমাকে এসএমএস করেছিল,—রইল বাকি এক।

আমি কোনো উত্তর দিইনি। প্রতিবাদও করিনি। কুত্তা চিৎকার করবে। তার স্বভাব। করুক ঘেউ ঘেউ।

তারপর যেদিন জানা গেল—বিখ্যাত সংগীতশিল্পী অসীমানন্দ ষাটটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালে তার বডি ঘরের দরজা ভেঙে উদ্ধার করা হয়েছে। সেদিনও দীনেশ আমায় এসএমএস করেছিল—খেল খতম পয়সা হজম!

তার আগে অবশ্য আমি দীনেশ সান্যালের দফারফা করে দিয়েছিলাম। ঘুষের অভিযোগ, অস্ত্র কেনাবেচার অভিযোগ, মেয়ে পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত তার বেশ কিছু প্রমাণ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ওপর মহলে। দীনেশের ওপর এনকোয়ারি বসেছিল। ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুলিশ ট্রেনিং আকাডেমিতে। সেখানে গিয়েও ওর শান্তি নেই। ওর মতো অসৎ লোক খুব কম আছে। ওকে কেউ নড়তে দিত না। সেখানে গিয়েও একটা মেয়েলি কেস খাওয়ালাম। আমার প্ল্যানে ও ফাঁদে পড়ল। দীনেশ যেখানে যেত তার আগে আমি রাস্তায় কাঁটা ফেলে রাখতাম।

শেষে অসুস্থ হয়ে পড়ল। কলকাতা ছেড়ে বাঁকুড়া চলে গেল। অভিষিক্তার ফ্ল্যাট, যেটা ওর লীলাক্ষেত্র ছিল, সেটা পড়ে থাকল। যেখানে এখন মুনিয়া থাকে।

আমি মুনিয়াকে বলেছিলাম, 'তুমি কি তোমার বাবার বদলা নিতে এসেছ? তাহলে আমার যেমন খোঁজখবর নিয়েছ, হোমওয়ার্ক করেছ, তোমার বাবার সম্পর্কেও করো। না, পুলিশ বা কলিগদের থেকে নয়। তারা সব মিথ্যে বলবে। তারা হয় তোমার বাবার মিত্র, নয় আমার মতো শত্রু। আমি তোমাকে কিছু খোঁজ এনে দেব, ঠিকানা এনে দেব। সেই বউ -মেয়ে বা তাদের হ্যাজবেন্ডের সঙ্গে একবার গিয়ে কথা বলো। দেখো তাদের কী অবস্থা করেছে তোমার বাবা।'

আমার কথা শুনতে শুনতে মুনিয়া আমার বুকের লোমে বিলি কাটছিল। আমার বুকে মাথা রেখে বলল, 'ওটা একটা পাক্কা শুয়োরের বাচ্চা!'

আমি হাসলাম। 'তোমার বাবা শুয়োরের বাচ্চা হলে তুমি কিন্তু তার বাচ্চা। তাহলে তুমি কী?'

মুনিয়া বলে, 'আমার মায়ের ডায়লগ—জন্ম হোক যথা তথায় কর্ম হোক ভালো। আমি আমার মায়ের সন্তান।'

আমি বুঝতে পারছিলাম না, বাবাকে শুয়োরের বাচ্চা বলার মধ্যে মুনিয়ার কোনো চাল আছে কি না? তবু ওকে আমি শোনালাম। কেমন ছিল ওর বাবা—

'তোমার বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো ছিল না। তোমার বাবার চাকরিজীবনের শেষপ্রান্তে এসে যত ঝামেলা সব আমার জন্য সয়েছিল। তুমি জানো?'

মুনিয়া হাসে, 'রিটেয়ার করার পর বাবা সকালে-বিকেলে তোমাকে খিস্তি দিত। তখনই আমি জেনেছিলাম তুমি চারটে খুন করে সাধু সেজে আছো। তুমি নিজের বউকে মেরেছ। বউয়ের প্রেমিকদের মেরেছ। আর দীনেশ সান্যালের হাতে রক্ত লেগে নেই। সে খুন করেনি। তবু তার এত বদনাম।'

'তোমার বাবা আমার থেকে বেশ কিছুটা সিনিয়ার। হ্যাঁ, তোমার বাবা কাউকে খুন করেনি, এটা একদম ঠিক কথা। কিন্তু দীনেশ সান্যাল কত মানুষের মৃত্যুর কারণ তুমি জানো না? কত সংসার ওই লোকটা দখল করে নিয়েছে। স্রেফ বাড়ির মেয়ে বা বউকে পাওয়ার আশায় দীনেশ অপরাধীকে আরও অপরাধী বানিয়েছে। মিথ্যে কেসে কত লোককে ফাঁসিয়েছে স্রেফ তার বউয়ের লোভে। স্বামীকে জেলে পুরে রাখার ভয়ে কত মেয়েকে সে নিজের কাছে টেনে এনেছে। তোমার বাবা রাক্ষস ছিল। ওকে কেউ বধ করতে পারেনি। হয়তো ওর মতো মেয়ে ভোগ করার ইচ্ছে সবারই ছিল, কিন্তু পারত না। তাই তারা এটাকে দীনেশের ম্যাজিক ভাবত। আমি ওর রকমসকম দেখে হাসতাম। ওর কাছে কেস এলেই, কোনো অপরাধী ওর হাতে পড়লেই, দীনেশ তার বাড়ি যেত। তার মেয়ে-বউকে দেখে আসত। ডেকে আসত। অদ্ভুত একটা ভাব করত, যেন সে পুলিশ নয়, সে তদন্ত করতে আসেনি। সে উদ্ধারকর্তা। এরপর সবাই দীনেশের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। আর যে ওর চাল বুঝত, ওকে আটকে দিত। দীনেশ তাদের জীবন নরক

দয়া করে মুনিয়াকে নিয়ে হাসবেন না...মুনিয়া ডেঞ্জারাস

করে দিত। ওকে কেউ সমঝায়নি। সবাই ওর কীর্তি-কাণ্ড দেখে মজা নিত। আর আমার মনে হত, দীনেশ অ্যাডিক্টেড। ও নারী মাংসলোভী একটা জানোয়ার ছাড়া আর কিছু নয়। তখনই একজন এসে আমাকে খবর দিয়েছিল, দীনেশ নিজের স্ত্রী, সন্তানদেরও ভালো করে দেখে না। তাদের বেধড়ক মারে। সারা এলাকায় ওকে কেউ সহ্য করতে পারত না। তখন থেকে আমি ওকে আরও বেশি ঘেন্না করতাম।'

মুনিয়াকে আমি ওর বাবার গুণকীর্তন করছি, আর মুনিয়া আমাকে আষ্টেপিষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। চটকাচ্ছে, আদর করছে, জিভ

দিয়ে আমাকে চাটছে। কামড়াচ্ছে। মুনিয়ার খুব ইচ্ছে কামড়ে আমার নাকে দাগ করে দেবে। আমি সেই দাগ নিয়ে আসামির পিছনে দৌড়াব। আসামি ধরার পর সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। তারপর ফিক করে হেসে ফেলবে। বলবে—ছার কে আবনার নাকে কেমড়ে দিলে?

আমি মুনিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকি। এই ছেলেমানুষি ভরা মেয়েটা তিনটি মানুষ মেরে আমার কাছে এসেছে—চতুর্থ খুনের প্ল্যান ভাঁজতে।

দয়া করে মুনিয়াকে নিয়ে হাসবেন না। ভাববেন না, ও মিথ্যে বলছে, ও মজাও করছে।

মুনিয়া ডেঞ্জারাস।

ছয়

আমি মুনিয়ার ঠিকুজি-কুষ্ঠি সব জোগাড় করে ফেলেছি। সত্যি বলতে কি, তখনো পর্যন্ত আমি মুনিয়াকে বিশ্বাস করতে পারিনি।

এখনও কি পারি? হয়তো হ্যাঁ, হয়তো না। মুনিয়া ছুটির দিন সকালে থেকেই আমাদের বাড়িতে এসে ওঠে। মুনিয়া একদিন 'আমাদের বাড়ি' কথাটায় সোচ্চারে আপত্তি করল। বলল, 'তোমাদের বাড়িতে আমি আসি না। আমি তোমার বাড়িতে আসি। তুমি কি এখনো এই বাড়িটার সঙ্গে কমলার নামটা জড়িয়ে রাখতে চাও?'

খুব তীক্ষ্ণ আর তীব্র প্রশ্ন। হ্যাঁ, কমলা যতদিন বেঁচে ছিল এই বাড়ি তারও ছিল। তখন এটা আমাদের বাড়ি ছিল। কিন্তু কমলা মারা যাওয়ার পর সত্যিই কি আমার বলা উচিত, এটা আমাদের বাড়ি।

এই বাড়ির দোতলার ঘরে আমি কমলাকে জাস্ট মেরে রেখে এসেছি। মাথায় একটা মার। কমলা লুটিয়ে পড়েছিল মেঝেতে। আমি চুপ দাঁড়িয়েছিলাম। একদম চুপ করে। কমলা স্তব্ধ হলে নিশ্চিত হলাম। তার আগে আমি পরিকল্পনামাফিক আলমারির লক ভেঙেছিলাম। টান মেরে ওর গলা থেকে হারটা ছিঁড়ে নিলাম। খুব সন্তর্পণে কানের দুল, হাতের বালাটা খুলে নিলাম। ও বার বার জিজ্ঞেস করছিল, কেন আমি এমন করছি? আমি ওকে বললাম—ইনসিওরেন্স ক্লেম করব, বলব—ডাকাতি হয়েছে। ও শান্তভাবে দাঁড়িয়েছিল। আগে লুটপাট, ভাঙাভাঙি, পরে খুন। আমি জানি কোথায় কোথায় আমার হাতের ছাপ, বা জুতোর সোলের ছাপ থাকতে পারে। আমি বুট পরি। কিন্তু এই কাজটা করার জন্য স্নিকার কিনেছিলাম। আমার পায়ের সাইজ নয়। নিয়েছিলাম দশ। খুব কায়দা করে স্নিকারের সোলের একদিক ভেঙে রেখেছিলাম। আমার সহকর্মীরা, আমার জুতোর পুরো র‍্যাক তুলে নিয়ে গিয়েছিল। আমি হাসছিলাম। সে জুতো আমি ঘণ্টা দুয়েকের জন্য পরেছিলাম। কাজ শেষ তো দু-পাটি জুতো দু-দিকে চলে গেছে। যা আমি নিজে চেষ্টা করলেও পাব না। তারপর ঘর লণ্ডভণ্ড করে চলে গিয়েছি। আমার মোবাইল ছিল অন্য জায়গায়, বহাল তবিয়তে চালু। টাওয়ার লোকেশন ওরা চেক করেছিল। দুর্গাপুরই পেয়েছে। তবে হ্যাঁ, গয়নাগুলো নিয়ে আমার খুব সমস্যা ছিল। কিন্তু তার দায়িত্ব এমন একজন নিয়েছিল, যে নিজেই পাঁচটা খুনের আসামি। এখন ডাকাতি ছেড়ে ব্যবসা করে। পরিচয় গোপন করে বাঁচে। আমি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। আমি কলকাতায় ফেরার আগেই সে গয়না গলিয়ে ফেলেছে।

তারপরও কি এই বাড়ি আমাদের হতে পারে?

কিন্তু আমি খুব সচেতনভাবেই এখনও আমার সঙ্গে কমলার নাম ও সম্পর্কটা জুড়ে রাখতে চাই। কখনো যেন ছেড়ে না যায়। বিশ্বাস নেই এই ছেড়ে যাওয়া থেকে কেসটা রি-ওপেন হতে পারে। যারা রি-ওপেন করবে তারা চায় আমার সর্বনাশ!

মুনিয়া আমাকে দিয়ে স্বীকার করাতে পারেনি কমলার মৃত্যু বিষয়ক কোনো তথ্য। আমি জানি, কান টানলে মাথা আসে। একবার ওরা আমাকে কানে হাত দিলে মাথাটা হাতের নাগালে পেয়ে যাবে। একটা নয়, শুধু কমলা নয়। রত্নেশ্বর-উৎপল-অসীমানন্দ। কমলা সহ আরও তিন-তিনটে খুন আমার নামের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে।

কমলার বাড়িতে আছে বলতে অতি বৃদ্ধ বাবা। তাঁকে আমি প্রতি মাসেই টাকা পাঠিয়ে দিই। উনি বিশ্বাস করেন না, আমি কমলাকে মেরেছি। তাঁর সাধ্য এবং ইচ্ছে নেই এই কেসটা নিয়ে আর কোনো নাড়াচাড়া করার। কিন্তু অসীমানন্দের অনেক ভক্ত। তারা এখনও তাদের সংগীতাচার্যের মৃত্যুর মধ্যে অনেক অনেক রহস্য দেখে। তারা বিশ্বাস করে না, অসীমানন্দ আত্মহত্যা করেছেন। তারা মনে করে, অসীমানন্দকে ভয় দেখিয়ে প্রথমে ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। পরে সুকৌশলে তাঁকে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। অসীমানন্দ আত্মহত্যা করতে পারেন না, ওটা হত্যা। আর তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে কমলা রাহা খুনের কোনো না কোনো যোগসূত্র আছে।

মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী, অনেক কিছু ভাবতে পারে। ভাবনা-চিন্তা তো কেউ আটকে রাখতে পারে না। ভাবুক, ভাবুক, যার যা মনে আসে ভাবুক। আদালত প্রমাণ চায়।

রত্নেশ্বর-উৎপলের বাড়ির লোকজন এখন সেই ট্রাকের সন্ধানে আছে, যার সঙ্গে গাড়ির ধাক্কা লেগেছিল। ট্রাকটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ওরাও একটা সূত্র পেলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওদের মৃত্যুর কথায় সেই কমলা রাহা খুনের কথা উল্লেখ হয়েছিল। কোনো একটা খোঁচা ছিল? সত্যিই কি অ্যাক্সিডেন্ট, না কি অ্যাক্সিডেন্টটা করানো হয়েছিল?

আমি এসব প্রশ্ন-উত্তরের খেলা থেকে শতহস্ত দূরে থাকি। পাবলিক, খবরের কাগজওয়ালারা যা মনে আসে লিখুক, দু-দিন বই তো নয়।

তবে আমি বিশ্বাস করি, ওদের মৃত্যুর সঙ্গে কমলার কথা মনে করিয়ে দিয়ে রিপোর্টাররা ভালোই করেছে। ওরা মরেও শান্তি পাবে না—একটা মেয়েলি কেসের সঙ্গে ওরা জড়িত। ওদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজনের কাছে ওরা সবাই এক একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন।

এই জিজ্ঞাসা চিহ্নকে আমি কখনো খড়্গ বানাব না। আদর করে ডেকে বলব না, এসো খড়্গ, বসো আমার মাথায়! আমি কারও মৃত্যু নিয়ে একটা কথাও বলিনি। বলবও না। বরং আমি বিশ্বাস করি, আপনারা আমার থেকে অনেক অনেক বেশি জানেন।

আপনারা কমলাকে জানেন, অসীমানন্দ, রত্নেশ্বর, উৎপলকে জানেন। আমার কথাও জানেন। যা আমি জানি না, তেমনও অনেক কিছু জানেন। এবার মুনিয়ার কথা জানুন। আমি জেনেছি। আপনিও

জানুন। আমি বার বার মুনিয়ার কথা বলতে গিয়ে নিজের কথা বলছি।

ওই দেখুন মুনিয়া আমার রান্নাঘরে মোবাইলে ইউটিউব চালিয়ে কিছু একটা রান্নার চেষ্টা করছে। আমি জানি সে রান্নাটা জঘন্য খেতে হবে, মুখে দেওয়া যাবে না, কিন্তু আমাকে সোনামুখ করে খেতে হবে। হেসে হেসে বলতে হবে—টেস্টি। নট ব্যাড। ততক্ষণে সে কিন্তু মুখে দিয়ে তিড়িংবিড়িং করে লাফাচ্ছে। আমার ওপর হম্বিতম্বি করছে, আমি কী করে এত বাজে রান্না এমন পরমানন্দে খাচ্ছি?

মুনিয়া যখন আমাকে বারণ করছে, তখন আমি ওকে শান্ত গলায় বললাম, 'এত আপত্তি করছ কেন? তুমি কি বিষ দিয়েছ? বিষ দিলেও আমি খাব।'

'আমি কেন তোমাকে বিষ দেব?'

'দিতেই পারো! আমি তোমার অপকার ছাড়া উপকার করিনি।'

'অপকার কী—আমার বাবার পিছনে কাঠি করেছ?'

'ঠিক তাই। তোমার আর কোনো ক্ষতি করার চান্স এখনও আমি পাইনি। আমার কাছে তুমি যখন এসেছ, তখন তুমি কুমারী ছিলে না, যে আমি তোমাকে ফুসলিয়ে নিয়ে এসে সতীত্ব নাশ করব।'

'সতীত্ব!' হা হা করে হেসে উঠল মুনিয়া। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল, বলল, 'একসময় আমার সতীত্ব নিয়ে খুব ভয় ছিল। আমার বন্ধু তরুর এক দাদা আমাকে খুব পছন্দ করত। খুব পছন্দ মানে, আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত। তাদের বাড়ি গেলে সে ধারে-কাছে ঘুরঘুর করত। আর তখনই তার কত কত দরকার পড়ত তরুর ঘরে। কেননা আমি তখন হয়তো ঘরে বসে। একদিন কী হল, সে সুযোগ বুঝে আমাকে একটা প্রেমপত্র দিল। ছোট্ট চিঠি—কলেজের সামনে আসবে দুটোর সময়। সে চিঠি পড়ে আমার সারা শরীর কেমন থর থর করে কাঁপছে। ভাবছি, তরু জানলে কী ভাববে? আবার ভাবছি, আমার বাবা জানলে এখুনি গিয়ে ওর পিঠে লাঠি ভাঙবে। কিন্তু দুটোর সময় আমার খুব মায়া হল, দুপুর দুটো, বাইরে শেষ এপ্রিলের ঠা ঠা রোদ্দুর। যদি বেচারার সানস্ট্রোক হয়। অগত্যা আমি ঠিক দুটো সময় কলেজ থেকে বেরিয়ে গেলাম তার কাছে। তাকে বলতে গেলাম, তুমি চলে যাও। কথাটা বলেই আমি দৌড়ে দৌড়ে চলে এলাম। কিন্তু তরুর দাদা খুব খুশি। এরমধ্যে তরুর বিয়ের ঠিক হল। বিয়ের দিন রাতে আমি থাকব। শীতকাল। বাসরঘরে আছি, কিন্তু শীতে আমি কাঁপছিলাম। তরুর দাদা একটা শাল নিয়ে যাবার জন্য আমাকে ডাকল। আমি বাসর ঘর ছেড়ে ওর সঙ্গে গেলাম। ও হঠাৎ, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আমাকে চেপে ধরল। আমাকে চুমু খেল। বুকে হাত দিল। বলল, আমি যাব তোমার মায়ের কাছে। তরুর হল, এবার আমাদের বিয়ে।

মাস ঘুরতে না ঘুরতে তরুর মা এল সম্বন্ধ নিয়ে। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। মাকে স্পষ্ট বলে দিলাম, ও ছেলে সুযোগসন্ধানী, নোংরা, আমি মরে গেলেও ওই ছেলেকে বিয়ে করব না।

তার কিছুদিন পরে আমার বিয়ে হয়ে গেল। ছেলে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। কত রাত বরের পাশে শুয়ে থাকতে থাকতে ভেবেছি, ইশ যদি তরুর দাদা এখন থাকত, আমাকে চুমু খেত, আদর করত, আমার বুকে হাত দিত। তরুর দাদা যদি থাকত—'

মুনিয়ার কথা শুনে আমি হাসি, বলি, 'বর যখন অফিস যেত তখন তরুর দাদাকে ডেকে নিলে না কেন?'

'না, তখন সাহস পাইনি। ওই যে সতীত্ব-টতীত্ব মাথায় ঘুরছে। বুঝতে পারছি না, মানুষটা কেন মুখ ঘুরিয়ে আছে। কোনো খারাপ ব্যবহার নেই। কোনো অশান্তি নেই। শুধু যেন মানুষটা নেই বাদবাকি সব আছে। কিছুদিন কাটার পর খুব সন্দেহ হচ্ছে, শুনে এসেছি, এমন পুরুষদের বউদির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। ওর বউদি খুব ফরসা আর মোটা। ভাবতে শুরু করলাম, তাহলে কি ও রোজ রাতে ময়দা মাখতে যায়! আমার লুচির মতো ফিগার ওর পছন্দ নয়?'

আমি মুনিয়ার প্রথম বিয়ের ময়দা আর লুচির গল্প শুনতে শুনতে হাসছি। মুনিয়া কিন্তু নির্বিকার। মুনিয়া বলল, 'জানো তখন আমার মনে কী দুঃখ—এই পুরুষ ময়দা মাখছে। একবার আঙুল বাড়িয়ে লুচিকে ফুটো করে দেখল না তার কী স্বাদ!'

মুনিয়া যে কোনো কষ্টের বিষয়কে নিয়ে মজা করত। নিজেকে নিয়ে মজা করত। কখনো কখনো সে মজা হত নির্মম।

একদিন হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা তুমি ওই গল্পটা জানো?'

'কোন গল্প?'

'ওই যে এক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে বলল আমি তোমার জন্য সব পারি। তখন প্রেমিকা বলল, তুমি আমার জন্য তোমার মায়ের হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়ে আসতে পারবে? প্রেমিক তখন তাই করল। মায়ের হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়ে চলেছে প্রেমিকাকে উপহার দেওয়ার জন্য। যেতে যেতে পথে প্রেমিকটি একটা পাথরে ঠোক্কর খেল। তখন হৃৎপিণ্ড থেকে মা বলে উঠল—আহা বাছা তোর লাগেনি তো?'

আমি চুপ করে মুনিয়ার গল্প শুনছি। বললাম, 'না, এ গল্প আমি শুনিনি।'

'এ কী, এই গল্প তুমি শোনোনি?'

'আমি সাহিত্য-টাহিত্য কিছু পড়িনি।'

'তাহলে আমার কাছ থেকে শুনলে। এবার বলো তো, তুমি যখন কমলাকে মেরে এই ঘরের মধ্যে রেখে চলে যাচ্ছিলে, সে যদি হঠাৎ বলে উঠত, এই যে ডার্লিং ভুল করে কোনো প্রমাণ ফেলে যাচ্ছো না তো—। এটা শুনে তুমি কী করতে?'

মুনিয়ার গল্প শুনে আমার ঝটিতি ঘরের মেঝের দিকে নজর পড়ল, ঠিক ওইখানে কমলা লুটিয়ে পড়েছিল। আমার মাথার ভেতর দপদপ করছে। কিন্তু নিমেষে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার ক্ষমতা আমার আছে। আমি লুকিয়ে ফেলে অত্যন্ত স্বাভাবিক হলাম। ওকে কাছে ডাকলাম। তারপর, আমার মধ্যমা ওর উন্মুক্ত নাভির চারপাশে ঘোরাতে ঘোরাতে, তলপেটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম—'আমি কী করে কমলার কথা শুনব, আমি তখন দুর্গাপুরে।'

'এই ঘরের মধ্যে তুমি ছিলে না?'

'না?'

'তাহলে তুমি কোনো কথা শোনোনি।'

'শোনার প্রশ্নই ওঠে না।' আমি শান্ত গলায় জবাব দিই।

'তুমি না শুনলেও কমলা কিছু বলেছিল—?' মুনিয়া তীক্ষ্ণ গলায় বলল।

'বলতেই পারে। কিন্তু আমি কী করে জানব সে কথা?'

মুনিয়া আমার থেকে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল, বলল, 'আমি জানি না কমলা কী বলেছে।'

আমি চুপ করে আছি, মুনিয়ার নিজের কথায় নিজেই উত্তর দিল। উত্তর দিতে দিতে বলল, 'যদি তুমি থাকো, তাহলে আমি জানি কমলা কী বলেছে—।'

মুনিয়া থামল, একটু শ্বাস নিল, বলল, 'আর যদি তুমি না থাকো—তাহলে কমলা কী বলেছে?'

'কী বলেছে?' আমি উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করি। এখানে তো আমি নেই। তাইজন্যে আমার শোনার আগ্রহ আছে। মুনিয়া তাহলে একটু হলেও ভাবতে শুরু করেছে—আমি খুনের সময় এই বাড়িতে, এই ঘরে ছিলাম না।

মুনিয়া বলল, 'মাটিতে শুয়ে কাতরাতে কাতরাতে কমলা বলেছে—আমার বর আসছে শয়তান। তুই যে গর্তেই ঢুকে থাকিস, ঠিক তোকে ও খুঁজে বের করবে, তারপর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোকে মারবে।'

আমি চুপ করে থাকি।

মুনিয়া হাসে। 'আমিও কমলার মতো বিশ্বাস করি, এ পৃথিবীতে সে শয়তান কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারবে না। তাকে তুমি ঠিক খুঁজে বের করবে। বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে? চমৎকার!—ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার।'

সাত

কমলা গান নিয়ে মেতে থাকত। সেদিন দেখলাম মুনিয়া কবিতা বলছে। সেদিন হঠাৎ মুনিয়া বলে উঠেছিল, বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে? চমৎকার!—ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার।

আমি বললাম, 'দুটো ইঁদুর তুমি ধরেছ। আমিই কি তোমার তিন নম্বর?'

মুনিয়া ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'বাদ দাও, ওটা জীবনানন্দ দাশ।'

'কবি! তোমার খুনোখুনির মাঝে কবি এলেন কোথা থেকে!'

'উনি এলেন না, উনি আমার হৃদয়ে থাকেন।'

মুনিয়ার হৃদয়ে একজন কবি থাকেন। ওর কথামতো তিনটে খুনের রচয়িতার হৃদয়েরও একজন কবি বাসা বাঁধতে পারেন। চমৎকার!—ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার।

আমি ইঁদুর ধরতে বসি।

শত্রুর শত্রু, আমার মিত্র। মুনিয়া এই কথাটা আমাকে বলেছিল। আমি মাথা নেড়ে বোঝার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। হয়তো ওর বাবার সঙ্গে ওর সম্পর্ক খারাপ ছিল। আকছারই এমন দেখা যায়। কিন্তু সেই বাবার শত্রুকে নিজের মিত্র বানানোর জন্য কেউ কি আকুল হয়ে ওঠে?

মুনিয়া কিছুদিনের মধ্যে আমার সব কিছু ঘেঁটে দিল। ও যখনই এ বাড়িতে ঢোকে তখনই তোলপাড় হয়। চারদিক ও নাড়িয়ে দেয়। তারপর একসময় ও চলে যায়। তখন আমি স্থির হয়ে বসে ভাবার চেষ্টা করি সত্যিই কি মুনিয়া ওর বাবার শত্রু! নাকি সবই সম্পূর্ণটাই ক্যামোফ্লেজড!

মুনিয়াকে একদিন আমি সরাসরি জিজ্ঞাসা করি।

'আমি মানলাম, আমি তোমার বাবার শত্রু। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের সার্ভিসে তোমার বাবার শত্রুর অভাব নেই। তাহলে তাদের বাদ দিয়ে আমাকে কেন বেছে নিলে?'

'ওই যে বললাম, অনেকেই আমার বাবার শত্রু, কিন্তু তারা কেউ খুনি নয়। তুমি একজন না-ধরা পড়া খুনি। পারফেক্ট মার্ডারার!'

আমি স্পষ্ট গলায় বললাম, 'তুমি ভুল করছ, আমি কোনো খুন করিনি। এগুলো আমার নামে প্রচার।'

মুনিয়া স্পষ্ট গলায় বলল, 'কিন্তু আমি যে বিশ্বাস করি।'

'তুমি বিশ্বাস করো, আমি তোমার বাবার শত্রু। হ্যাঁ, এই পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু দ্বিতীয়টি তোমার মনগড়া। আর তুমি এই কারণে যদি আমাকে পছন্দ করো, তাহলে খুব ভুল করবে। তবে মানুষ আমি মেরেছি, সেটা আত্মরক্ষার জন্য, তাকে না মারলে সে আমাদের অনেকেই মেরে দিত। আমার খুন—দেশের জন্য, চাকরির জন্য।'

মুনিয়া বলল, 'আমার বাবা আমাদের তিনজনের জিনা হারাম করে দিয়েছিল। ওই রকম খারাপ মানুষ আমি কোনো দিন দেখিনি। তারপরেও বলব—আমার বাবার তোমার সম্পর্কে বলা কথাটা ভুল নয়। কেননা, লোকটা বিছানায় পড়ে গোঙাতে গোঙাতে তোমাকে খিস্তি করত। তোমার মা-মাসি উদ্ধার করত। আর মাথা নেড়ে বলত, ও মেরেছে, ও খুনি। ওর খুনের প্রমাণ ও নিজেই। বাবার কথা থেকেই আমি বুঝেছিলাম তুমি একজন পারফেক্ট খুনি। তখনো আমি কোনো খুন করিনি। প্রস্তুতি চলছে। হঠাৎ তোমাকে গুরু দ্রোণ সাজিয়ে আমি একলব্য হলাম।'

আমি হাসি, 'যাকে যা নয় তাই সাজালে—আমি দ্রোণাচার্য নই।'

মুনিয়া হাসছে, 'কিন্তু আমি তোমাকে গুরু মেনেছি। তারপর একটা একটা করে তিনটে কেস, তিনজন—।

আমার বাবার কাছে আমি সাহসী বাচ্চা। একবার আমি বাবাকে কামড়ে দিয়েছিলাম। তারপর থেকেই আমি সাহসী আর ভাই ডরপুক! ভীতু! আমার ভাই এখনও ভীতু। একটা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে পড়ায়। সে তার ছাত্রছাত্রীদের মারা তো দূরের কথা, বকেওনি। সে ঠিক করে ক্লাস ম্যানেজ করতে পারে না। তাই জন্য হেডস্যার থেকে সহকর্মীরাও তার ওপর খুব বিরক্ত। এত ভালোমানুষি দিয়ে কিছু হয় না। আমি ভাইকে শেখাই, কিছু না পারিস চিৎকার কর। গলা ফাটিয়ে চিৎকার কর, চিৎকার করলে দেখবি, তোর চারপাশ শান্ত হয়ে যাবে। তুই সবার ওপরে থাকবি। একটু হলেও তোকে সবাই ভয় পাবে।

আমার ভাই মাথা নীচু করে, বলে, আমি পারব না। কিছু ছেলে তো মন দিয়েই আমার ক্লাস করে। আসলে ওরা কিছু ছেলেকে উসকাচ্ছে আমার ক্লাস ভন্ডুল করার জন্য।

ওরা কারা?

স্কুল সেক্রেটারি। অচিন্ত্য মহাপাত্র। উনি আমাকে তাড়াতে চাইছেন। তারপর আমার জায়গায় ট্রান্সফার করিয়ে ওঁর এক আত্মীয়কে নিয়ে আসবেন।'

মুনিয়া হাসে। 'অচিন্ত্য মহাপাত্রকে দু-দিন ফোন করলাম। আমার নাম হল দেবযানী মহাপাত্র। আমি মহাপাত্র শুনে বুড়ো উল্লসিত।

বুড়ো ফাঁদে পড়ার জন্য হাঁ করেই বসেছিল। ফোনে একটু গল্প করতেই বুড়ো গলে গেল। পর পর তিনদিন গল্প করার পর দুটো গরম ছবি পাঠালাম। তারপর আর কী, কিছু কথা রেকর্ড করলাম। মনে শান্তি হল না। শুধু কথায় হবে না, ছবি চাই। একদিন সোনালিকে বললাম, সোনালি বলল, ভিডিয়ো কল কর। বুড়োকে গরম খাইয়ে ধুতি খুলিয়ে নাচাব। বুড়ো নাচল। তারপরই ছবি দেখিয়ে হুমকি দিলাম। দেবাংশু সান্যালের পিছনে লাগবেন না। তাহলে আপনার এই ডান্স ছাত্রছাত্রীদের মোবাইলে পাঠিয়ে দেব। ব্যস শান্ত।

কিন্তু আমি জানি, আমার ভাই ক্লাস ম্যানেজ করতে পারে না। সর্বক্ষণ কীসের একটা ভয় ওকে জড়িয়ে থাকে। আমি জানি সেই ভয়টা ওর ছোটোবেলার। বাবার দেখানো ভয়। যা ও কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারেনি।

তোমার সঙ্গে আমার মিত্রতা একটু বেশি। আমরা দুজনেই মার্ডারার। কিন্তু দুজনেই মনে করি এই খুনের জন্য আমরা দোষী নই। আমরা পাপীকে শাস্তি দিয়েছি।'

'মুনিয়া আবারও বলি, তোমার সঙ্গে আমাকে জড়িও না।'

মুনিয়া হাসে, 'না, জড়াচ্ছি না। আমি এই কথাটা শুধু তোমাকেই বলছি। আর কাউকে নয়। আমি তোমার মতো আর একজনের কাছেও আমি স্বীকার করব না। তুমি যেমন শুধুমাত্র নিজের কাছে স্বীকার করো। আর কারও কাছে নয়, এমনকী আমার কাছেও নয়। আমি তেমন শুধু তোমার কাছে, আর কারও কাছে নয়।'

আমি হাসি, 'তুমি পাগল। তুমি আমার মুখে কথা বসাচ্ছ।'

মুনিয়া সারা বাড়িতে পাগলা ঝোড়ো হাওয়ার মতো নেচে বেড়ায়। প্রতিটা ছুটির দিন এখন মুনিয়া ছাড়া আমার চলে না। এমন কী অন্য অন্য দিনও নটা দশটা এগারোটা নাগাদ মুনিয়া আমাকে কাতর গলায় ফোন করে—তুমি কোথায়? তুমি কখন ফিরবে? আমি যদি ওর ঘুমিয়ে পড়ার আগে ফিরি, তার একটু পরেই আমি ওর স্কুটির আওয়াজ শুনব নীচে। আমি তৈরি, বেল বাজার আগেই দরজা খুলে দিই।

সপ্তাহ খানেক আগে এক সেট চাবি ওকে দিলাম। বললাম, এটা রেখে দাও।

ও অবলীলায় কোনো প্রশ্ন না করেই চাবির গোছাটা নিয়ে নিল। তারপর কতদিন রাতে আমি এসে দেখি ও নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে।

কিন্তু আমি জানি ও ঘুমাচ্ছে না, ও জেগে। চাদরের নীচে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে আমার অপেক্ষায়। মাঝে মাঝে আমার ওকে একজন যৌনকাতর মেয়ে মনে হত। কিন্তু এখন হয় না।

আমি ওর ছ-মাসের কললিস্ট স্টাডি করেছি। কিচ্ছু পাইনি। আমি ওর পিছনে লোক লাগিয়েছি, ওর যাওয়া-আসা, বাড়ি থাকা, আমার বাড়ি আসা, যাওয়া, এমনকী ওর মর্নিংওয়াকের সময়ও ও আমার চোখের সামনে থাকে। নাথিং, কিচ্ছু পাইনি, যাতে সামান্য সন্দেহ হয়। এই বাড়ির ভেতর ওর একা থাকার মুহূর্তগুলো জানার জন্যও আমি ক্যামেরা লাগিয়েছি, কিন্তু সেখানেও ওর পাগলামি, জোরে জোরে কবিতা আওড়ানো ছাড়া আর কিছু পাইনি।

তবু আমি জানি মেয়েটা ডেঞ্জারাস।

একসময় আমি ওকে জানতে চেয়েছি, 'তুমি ফোর্থ খুনটা কাকে করতে চাইছ?'

ও বলল, 'তাহলে তুমি স্বীকার করলে আমি তিনটে খুন করতে পারি।'

আমি বললাম, 'আমি তোমার কথার সূত্র ধরে জানতে চাইছি। এখানে আমার কোনো কথা নেই।'

মুনিয়া ঘাড় ঝাঁকাল, ক্রমশ প্রকাশ্য।

আমি বললাম, 'আমি কিন্তু সে কে বুঝতে পেরেছি।'

মুনিয়া স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কে?'

'আমি!'

মুনিয়া বলল, 'তোমার এই বুদ্ধির প্রশংসা শুনে আমি প্রেমে ফাঁসলাম! তুমি আর একটা নেংটি ইঁদুর আমার কাছে সমান। আমার কাছে এত তীব্র বিষ আছে, মুখ দিয়েই তুমি খাবার টেবিলে মরতে পারো। আবার ইঁদুরের মতো টাইম সেট করে দিলে, খাবে ঘরে মরবে বাইরে!'

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিশ্চিত হই, আমি নই। তবে হালকা গলায় ওকে বলি, 'মৃত্যু নিয়ে আমার কোনো ভয় নেই। সত্যি বলতে কি এই শরীরটা ছাড়া আমার আর কিছু নেই!'

মুনিয়া আমার দিকে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকে, 'কেন আমি নেই?'

এ প্রশ্নের কী উত্তর হবে?

আট

মুনিয়া কি আমার প্রেমিকা? আমার উত্তর, না। কিন্তু এই না বলার মধ্যে আমার তেমন জোর নেই। জোর দিয়ে কী বলব, না। অথচ মুনিয়াকে যদি এই প্রশ্ন কেউ করে, সে কিন্তু স্পষ্ট করে, জোর গলায় বলে দেবে, হ্যাঁ।

এই হ্যাঁ, একবার নয়। বেশ কয়েকবার বলতে পারে। হয়তো আরও অনেক অনেক এগিয়ে অনেক অনেক কথা বলতে পারে। আমি ওর দৌড় জানি না, আমি ওর পাগলামি জানি না, আমি ওর ওড়া কিংবা তলিয়ে যাওয়াও জানি না। আমি শুধু দু-চোখ ভরে ওকে দেখি। মুনিয়া দেখার জিনিস। কেননা ও কখন কী করতে পারে আমার ধারণা নেই। ভাবতেও চাই না। মাঝে মাঝেই ও আমার কাছে বড্ড ঝাপসা।

আমি জানতাম, ওর বিয়ে হয়েছিল। সাড়ে তিন বছরের বিবাহিত জীবন। মাস ছয়েক আগে ওর স্বামী মারা গেছে। বিয়ের এক বছর পরই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ক্রমশ পক্ষাঘাত হয়, শেষে হার্ট অ্যাটাক। মৃত্যুর কারণ টানা দু-বছরের অসুস্থতা।

মুনিয়া রহস্যময় হাসি হাসে। কুটকুট করে আমার কানের লতি কামড়ায়। ফিসফিস করে আমাকে বলে, 'ওর মৃত্যুর কারণ অসুস্থতা। কিন্তু অসুস্থতার কারণ কী? সেই কারণ কেউ জানে না। জানতেও পারবে না। সেই কারণ একমাত্র আমি জানি।'

মুনিয়া জানে। জানতেই পারে। কিন্তু কেন এত রহস্য করে বলছে? আমি ওর খোলা শরীরে হাত বোলাই। আমার মুঠোর মধ্যে ওর স্তন ঘাপটি মেরে আছে। তাহলে কি মুনিয়া...

'ও মারা যাওয়ার আমি খবর পেয়েছিলাম। জানতাম যাবে, কিন্তু কবে যাবে, জানতাম না। যেতে তো হবেই। ওর নিস্তার নেই।' মুনিয়া আবার হাসে, হালকা শব্দ আমার কানের পাশে গুমগুম করে বাজে। 'আমাকেও ওর বাড়ির কোনো লোক খবর দেয়নি। ডুকরে উঠে কেঁদে বলেনি—মুনিয়া তুমি বিধবা হলে। আমি নিজেকে নিজেই বললাম—মুনিয়া এতদিন ডিভোর্সি ছিলে, এবার বিধবা হলে। একই অঙ্গে তোমার কত রূপ। নিউ ভার্সন।

খবর দিয়েছিল ওর এক বন্ধু। আমি তো প্রত্যেক দিনই রেডি থাকতাম। সুসংবাদটা কখন আসে। শুনেই কাতর গলায় বললাম, ওই বাড়িতে তো আমি ঢুকতে পারব না। শ্মশানে রওনা দিলেই আমাকে জানাবেন।'

মুনিয়া আমার শরীরে আঙুল দিয়ে বোলায়। আঙুলে লিখেছে—কেওড়াতলা। একবার, দুবার।

ওর লেখা আমি পড়ে নিয়েছি। বললাম, 'তারপর কেওড়াতলায় গেলে?'

'হ্যাঁ গেলাম। আসলে আমি কোনোদিন শ্বশুরবাড়ি ঢুকতে পারিনি। আমাকে নিয়ে যাওয়ার সাহস ওর নেই। বিয়ের দিনই শুধু নিয়ে গিয়েছিল। ওর মা-দিদিকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। তারা মানেনি। আমাকে ওদের পছন্দ নয়। আমি মফস্‌সলের মেয়ে। আমার শিক্ষার কোনো দাম নেই। কলকাতায় আমার ফ্ল্যাট ওদের কাছে বস্তি। আমি কোনো কথা বলিনি, এক রাত কাটিয়ে মাথা নীচু করে চলে এসেছি। তারপরেও আমাকে দু-একবার হোটেলের খরচ বাঁচাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সেদিনগুলোতে ওর দিদি ছিল না, ওর মা ছিল না। সেই সুযোগে। একটা চল্লিশ বছরের লোক, বিয়ে করেছে, বিয়ে করার আগে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমাকে বলেছিল—আমার মা-দিদি অন্য মেয়ে ঠিক করেছিল, আমি রাজি হইনি বলে তারা একটু বেঁকে আছে, তোমাকে দেখলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'চল্লিশ বছর! বিয়ে করেনি কেন? আমার মতো দেখতে খারাপ? নাকি তেমন রোজগার ছিল না?'

'না, দেখতে তো খারাপ নয়। ইঞ্জিনিয়ার। আগে চাকরি করত। বিয়ের আগে আগে চাকরি ছেড়ে দিল, একটা মেশিন টুলস কোম্পানি খুলল। পারিবারিক পয়সা প্রচুর। সেই টাকা-পয়সার কন্ট্রোল নিয়ে মা আর দিদির সঙ্গে সংঘাত। আমি বলেছিলাম, যা রোজগার করো তাতেই আমাদের চলে যাবে। আমিও তো কম টাকা স্যালারি পাই না। তারপর আমার বাপের পাহাড় প্রমাণ ঘুষের টাকা জমানো, চারদিকে এত জায়গা-জমি। কলকাতা শহরে দুটো ফ্ল্যাট, বাঁকুড়ায় বাড়ি, হাওড়ায় বাড়ি। হাইওয়ের পাশে বিশাল জমি। আমাদের হয়ে যাবে। তার ওপর আমার চাকরি আছে, হয়ে যাবে। তোমার পারিবারিক টাকার লড়াই ছাড়ো। স্রেফ টাকার জন্য ওখানে পড়ে থেকো না। এসো, আমরা ভালো করি বাঁচি। ও বলল, টাকা না থাকলে প্রেম পালাবে। আরে আমাদের প্রেম কোথায়? যা ছিল তা সেক্স। আমার ফ্ল্যাটে ও এসেই জামাকাপড় খুলত, নানা ফ্লেভারের কনডোম এনে স্টোর করত। তারপর বড়োজোর দশ মিনিটেই ওর কাজ শেষ। আসলে প্রচণ্ড হাইপার হয়েই ঢুকত। আমি বলতাম, চলো এভাবে হবে না, সংসার করি। দিনরাত একসঙ্গে থাকব। ও রাজি নয়। ওর মা-দিদি ঝামেলা পাকাবে। তাহলে? ও বলল, কেন তোমার ফ্ল্যাটে আসব, যাব, এই তো বেশ আছি। আমি বললাম, তা হবে না। এই ফ্ল্যাট আর লীলাক্ষেত্র করতে দেব না। ও বলল, তবে হোটেলে চলো। হোটেলে গিয়েই ও কেমন পালটে গেল—ওর সেক্স তুমুল শব্দবাজি হয়ে গেল, খিস্তির বন্যা বইত। লাফালাফি, কামড়াকামড়ি, মারামারি। অথচ বাড়িতে দেখেছি ভিন্নরূপ—শব্দহীন, যেন ওষুধ খাচ্ছে। আমি ফ্ল্যাট আর হোটেলে দু-জায়গার বিছানায় শুয়ে শুয়ে আবারও ব্যর্থ সম্পর্ক দেখতাম।'

'বিয়ে করলে কেন? দ্বিতীয়বার বিয়ে তোমার ভালোভাবে বুঝে ডিসিশন নেওয়া উচিত ছিল।'

'ও খুব ভদ্র। শান্ত। ভালোমানুষ মনে হত। আলাপ হয়েছিল এক বন্ধুর গানের অনুষ্ঠানে। তিনদিন আলাপের পরই বলল—ভেবেছিলাম, সারাজীবন অবিবাহিত থাকব। কিন্তু আপনাকে দেখে ডিসিশন পালটাতে ইচ্ছে করছে। হেল্প করবেন? আমি বললাম, আমি ডিভোর্সি। আমার বাবা একজন ঘুষখোর, লম্পট, দুশ্চরিত্র পুলিশ অফিসার। আমার মা অপমানে নির্যাতনে ধুকপুক করে বেঁচে আছে। আমার শৈশব ভালো নয়। প্রচণ্ড জটিল। আমি ডিভোর্সের পর একটা হারামির বাচ্চার সঙ্গে জড়িয়েছিলাম। সে আমাকে ভালো জীবন দেবে বলেছিল। তারপর সে আমাকে লুকনো বউ বানাতে চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি। সে নানাভাবে এখনও আমাকে ফাঁসাতে চায়। আমি তার ভয়ে, সেই জটিলতায় কাতর। সামলাতে পারছি না। আমার কপালে মানুষ নেই। সে বলল, আপনার কপালে না থাক, আমার কপালে আছে। তাকে আমি পেয়ে গেছি, আর হারাব না। আমি আপনাকে বিয়ে করব। কোনো প্রেম নয়। আমি বললাম, এত সাহস আপনার? চলুন। আমি ভীতু নই। ফোর্থ ডে—সেই সন্ধেবেলায় বিয়ে করলাম। তার আগে আমার বন্ধুটির কাছে শুনেছি, সৈকত খুব ভালো ছেলে। ব্যাঙ্গালোরে বড়ো চাকরি করত। সব ছেড়ে চলে এসেছে। এখানে কোম্পানি খুলেছে, কিছু মানুষের কর্ম সংস্থান করবে, অনেক স্বপ্ন ওর। কিন্তু বিয়ের পর পর বুঝলাম, সব বিগ বিগ টক। সত্যি ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্গালোরের চাকরিটা টেকাতে পারেনি। এখানে কোম্পানির চেষ্টা করছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আর একটা জিনিস বুঝলাম, ও বাস্তবে থাকে না, পুরোটাই স্বপ্নে স্বপ্নে ঘোরে। পরিশ্রম করতে পারে না, তাই নানা অজুহাত খোঁজে।'

'ও অসুস্থ হয়ে পড়ল কবে?' আমি জানতে চাইলাম।

'আমরা যে হোটেলে যেতাম, সব খরচ হাফ হাফ শেয়ার হত। ঘর ভাড়া থেকে খাবার। ও হার্ড ড্রিঙ্কস নিত। আমাকে অফার করত। আমি খেতাম না। কিন্তু যেহেতু অফার করেছে, তাই ড্রিঙ্কসের দামও হাফ দিতে হত। শুধু কনডোমটা ও কিনে নিয়ে আসত। ওর পছন্দের ফ্লেভারে। তার দাম নিত না। ওর যুক্তি, দুজনে মস্তি নিচ্ছি, তাহলে একজন টাকা দেবে কেন? আমি ওর সবকিছু হ্যাঁ করে দেখতাম। এমন মানুষও হয়! কখনো কখনো আমার নিজেকে মনে হত, আমি কোনো কলগার্ল। ওর কাজ শেষ হয়েছে, এবার পার্স খুলে আমাকে পেমেন্ট করবে। আবার, কখনো মনে হত, আমি শরীরী সুখের জন্য একটা পুরুষ ভাড়া করে এনেছি। এবার তাকে

পেমেন্ট করব। একদিন বললাম, এভাবে চলতে পারে না। এটা কী খেলা হচ্ছে সৈকত? ও স্পষ্ট বলল, আমার কিন্তু খারাপ লাগছে না। এত বছর তো হোটেলেই সেক্স করেছি। বাড়িতে কোনো মেয়েকে মা-দিদি অ্যালাউ করত না। বাঙ্গালোরে যেখানে থাকতাম, সেটা মায়ের বান্ধবীর ফ্ল্যাট। কড়া নজরদারি ছিল। তাই সবই হোটেল। কিন্তু সেখানে সব খরচ আমার ছিল। এখানে দুজনের সুখ, দুজনেই ভাগ করে নিচ্ছি। ওর কথা শুনে আমার বমি উঠে এল। তারপর ওকে বললাম, আমি আর পারছি না, আমাকে মুক্তি দাও। মিউচুয়াল ডিভোর্স চাই। অদ্ভুতভাবে ও বলল, তোমার নামে হাইওয়ের ধারে যে জমি আছে, সেটা আমাকে দাও। আমি কারখানা খুলব। আমি সে অর্থে কিছু করি না। এটা মনে করো খোরপোশ! আমি তখন পাগল হয়ে যাচ্ছি। একদিকে সেই কুত্তার-ডাক্তার, আমার প্রেমিক, এদিকে দ্বিতীয় স্বামী। আমার কোনো আশ্রয় নেই। বাবার রিটেয়ার করেই স্ট্রোক হল। এখন বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। কিন্তু তার এখনো দাপ মরেনি। মাকে টানছে, কাজের মহিলাকে টানছে। আমি চারদিক থেকে জ্বলছি। হঠাৎ একদিন মনে হল, সব আগুন নেভাতে হবে।'

আমি হালকা গলায় বলি, 'তখন কি ফায়ার ব্রিগেড ডাকলে?'

'বাবা একদিন তোমার নাম করে কাউকে গালাগাল করছিল। তার আগে অনেকবার বাবার কাছে তোমার নাম শুনেছি। সেদিন তোমার কথা মনে এল। ধূমকেতু রাহা। তোমার নামটা এমন একবার শুনলে মনে থেকে যায়। হঠাৎ সেদিন ওই বাজে লোকটাকে জিজ্ঞেস করে বসলাম, এই ধূমকেতু রাহা কী করেছে। তখনই পর পর শুনলাম তোমার কথা। আগেও শুনেছিলাম। কিন্তু সেটা ছিল খবরের কাগজের খবর। কিছুটা বাবার বমি করা কথা থেকে। সেদিন যেটা শুনলাম সেটা বেশ ডিটেলসে। এমনকী তোমার পত্নীপ্রেম— কমলার ত্রুটি নিজের কাঁধে নেওয়ার গল্পও। শুনলাম কমলার শারীরিক ত্রুটির জন্য বাচ্চা হচ্ছে না, অথচ তুমি সবাইকে বলেছ, তোমার দোষ। শুনে তোমাকেই গুরু মানলাম। আমি একলব্য আর তুমি দ্রোণাচার্য!'

'তারপর কী করলে?'

'মাস ছয়েক ধরে শান্ত করলাম নিজেকে। ছ-মাসে অন্তত বার দশেক হোটেলে গেছি। হাফ হাফ টাকা নিয়ে মস্তি কিনে এনেছি। ও ড্রিংকস করেছে। আমি শুয়ে দেখেছি। খাবার খাওয়ার পর হাতে লবঙ্গ দিয়েছি। ফেরার সময় লবঙ্গ ভরা কৌটোটা ওর পকেটে দিয়ে দিয়েছি। রেখে দাও। বলেছি, মাঝে মাঝে খাবে। রোজ খেও না।'

'লবঙ্গ!' আমি সন্দিগ্ধ গলায় প্রশ্ন করি।

মুনিয়া কোনো জবাব দেয় না। আমার পিঠে আঙুল ছুঁয়ে আঁক কাটছে। বটুলিনাম টক্সিন।

আমি ফিসফিস করি, 'বটুলিনাম টক্সিন! কোথায় পেলে?'

মুনিয়া হাসল, 'খুব পড়াশোনা করেছি। মাত্রা জেনেছি। ব্যবহার জেনেছি। সহজ পন্থায় আমি জোগাড় করেছিলাম। কারও সাহায্য দরকার পড়েনি। একটা লবঙ্গ। দেখা হলেই আমার তরফ থেকে—। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্যারালিসিস। তখন আমার স্বামী আমি চোখের দেখা দেখতে বাড়ি যাব। এটাই স্বাভাবিক। যেতাম। একটু গল্প, কথা, আসার সময় একটা লবঙ্গ। কখনো কখনো দু-চারটে লবঙ্গ রেখেও আসতাম। খুব কাজ দিল। একটু সময় লাগল। কিন্তু—। আমি একদম ছটফট করিনি দ্রোণাচার্য।'

'তাহলে একটা আগুন নিভল?' আমি শান্ত গলায় বললাম।

মুনিয়া পাশে শুয়েছিল, এবার উঠে পড়ল আমার ওপর। বলল, 'টাটকা জোয়ান মদ্দ। একটু বেশি সময় নিল। প্রায় সতেরো মাস।'

'সতেরো মাস!'

'হ্যাঁ, তাড়া ছিল না, ধীরে-সুস্থে। তখন আমি নিজেই আগুন। খালি মনে হচ্ছে, না, না, জল ঢেলে নেভানো না, আমি পোড়াব!'

নয়

মুনিয়ার কথা মিলিয়ে নেওয়ার জন্য আমি অফিস থেকে দুপুরের দিকে চলে গেলাম সৈকতের বাড়ি।

সৈকতের মা আর বোন থাকেন। সঙ্গে প্রায় পাঁচজন কাজের লোক। বিশাল

আমাকে অফার করত। আমি খেতাম না।
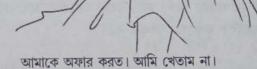
বাড়ি। এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায়, বেশ শৌখিন আর আভিজাত্যপূর্ণ! চেন দিয়ে বাঁধা বেশ বড়ো তালা ঝুলছে বাড়ির গেটে। গেটের গায়ে পর পর তিনটে নাম লেখা। সৈকত চ্যাটার্জি, স্বাতীলেখা চ্যাটার্জি, স্বাতীনক্ষত্র চ্যাটার্জি। "Beware of dog", কুকুর হইতে সাবধান।

মুনিয়ার কাছেই শুনেছি মা আর বোন। স্বাতীলেখা মা আর স্বাতীনক্ষত্র বোন। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই একজন দৌড়ে এল।

দারোয়ানই হবে। বললাম, স্বাতী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার কথা শুনে, লোকটা আধভাঙা হিন্দিতে বলল, কৌন? দুজন স্বাতী আছেন। আমি আবার বললাম, দুজনের সঙ্গেই দেখা করতে চাই। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটার কেমন যেন সন্দেহ হল। স্বাভাবিক, হওয়ারই কথা, নাহলেই বুঝতাম আমি পালটে গেছি। একটু ভয়মিশ্রিত গলায় বলল, 'আপ?' এবার সরাসরি নিজের পরিচয় দিলাম। বললাম, লালবাজার থেকে আসছি। পুলিশ! লোকটা বিড়বিড় করে কপালে হাত দিল—কুত্তা। তবু লোকটা গেট না খুলে চলে যাচ্ছিল বাড়ির ভেতর। আমি চাপা গলায় ধমকি দিলাম—আভি গেট খুলো।

লোকটা ভয় পেয়েই গেট খুলে আমাকে ঢুকিয়েই দৌড়ে চলে গেল বাড়ির ভেতর। নিশ্চিত বলে এল, পুলিশ এসেছে বাড়িতে!

আমি বারান্দার সামনে যেতেই লোকটা বেরিয়ে এসে একটা ঘর দেখাল। 'আইয়ে সাব!' সেই ঘরের দরজা খোলা ছিল না। ভেতর থেকে একজন মহিলা দরজা খুলে দিল। শুধু দরজাই খোলা হল, জানলাগুলো সব বন্ধ। ঘরের ভেতর চাপা গুমোট, মনে হল এই ঘরটা রোজ খোলা হয় না। সামনে পাতা সোফা, সেখানেই বসলাম। পরক্ষণেই আরও দুজন কাজের মহিলা ঘুরে গেল। একজন জল দিয়ে গেল। আর একজন বুদ্ধিমতী, সে তীক্ষ্ণ চোখে আমাকে মেপে নিল। আমি কে?

ভেবেছিলাম ইনসিওরেন্স কোম্পানির নাম বলে ওই বাড়িতে ঢুকব। কিন্তু হল না। ঢুকতে পারতাম না। অগত্যা লালবাজারই! একটু পরেই সৈকতের মা আর দিদি এসে হাজির। দুজনের গায়ে হাউসকোট চাপানো। দুজনের নামের যেমন মিল, দেখতেও একই রকম। দিব্যি বোন বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওঁদের বসতে বললাম। প্রথম যিনি কথা বললেন, তিনি স্বাতীনক্ষত্র। 'দেখুন আমাদের তো ওই ডগ বাইটের কেসটা মিটে গেছে। আমরা সেরকমই জানতাম। পুলিশ থেকে তাই বলা হয়েছে। এখন কী ব্যাপার বলুন তো?'

ডগ বাইট! আমি একটু থমকে গিয়ে বললাম, 'না, না, আমি কোনো কুকুর কামড়ানোর কেস নিয়ে আসিনি।'

'তবে?' পাশের জন যাঁকে বড়ো মনে হচ্ছে তিনিই বললেন।

আমি বললাম, 'আমার নাম ধূমকেতু রাহা। লালবাজার গোয়েন্দা বিভাগ। এই যে আমার কার্ড। আমি একটা এনকোয়ারিতে এসেছি।'

'এনকোয়ারি? কুকুরের ব্যাপার নয়?'

'না।'

'আপনি কী ব্যাপারে এসেছেন একটু বলবেন?'

'আমি সৈকত চ্যাটার্জির বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলতে চাই। অ্যাবাউট সৈকত চ্যাটার্জি—'

'আমি সৈকতের দিদি আর উনি আমাদের মা। আমার নাম স্বাতীনক্ষত্র চ্যাটার্জি, উনি স্বাতীলেখা চ্যাটার্জি।'

আমি হালকা গলাখাঁকারি দিলাম। বললাম, 'সৈকতবাবুর মৃত্যু নিয়ে আমাদের কিছু জানার আছে?'

'সৈকতের মৃত্যু—কেন বলুন তো?' দুজনের মুখই বিষণ্ণ সেইসঙ্গে থমথমে হয়ে গেল।

বাইরে দিন গড়িয়ে বিকেল। খোলা দরজা দিয়ে দু-একটা শুকনো পাতা উড়ে এল ঘরে। ঘরটা আধো অন্ধকার, যদিও আলো জ্বলছে। একমাত্র টিউবের আলো যথেষ্ট নয়, বিশাল উঁচু সিলিং। আগেই মনে হয়েছিল এই ঘরটা খুব একটা খোলা হয় না। আমি বন্ধ জানলাগুলো দেখছিলাম। এত বড়ো বড়ো জানলা। অথচ সব বন্ধ! একজন মহিলা ট্রেতে কাপ, টি-পট, সুগার, মিল্ক সব নিয়ে হাজির হলেন।

স্বাতীনক্ষত্র আঙুল দিয়ে টি-টেবিল দেখালেন। তিনি রেখে দাঁড়ালেন। স্বাতীলেখা বললেন, 'জানলাগুলো সব খুলে দে মালতী।'

পর পর জানলাগুলো খুলে দেওয়া হল।

স্বাতীলেখা বললেন, 'এটা সৈকতের ঘর। মানে বসার ঘর। বাইরে কেউ এলে এখানে বসেই কথা বলত। শেষের দিকে সর্বক্ষণ এই ঘরেই থাকত। আপনি চা খান।'

ততক্ষণে স্বাতীনক্ষত্র চা বানিয়ে ফেলেছেন, বললেন, 'সুগার?'

আমি মাথা নাড়ালাম, 'দরকার নেই।'

স্বাতীনক্ষত্র বললেন, 'আপনি কি লিকার খেতেন? আমি কিন্তু মিল্ক মিশিয়েছি।'

'অসুবিধে নেই, দিন।'

তিনি চায়ের কাপ, বিস্কুটের প্লেট এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'সরি, আপনি কেন এসেছেন ঠিক বুঝলাম না।'

'আমি সৈকতবাবুর মৃত্যুর বিষয়ে জানতে চাই।'

স্বাতীনক্ষত্র একটু থমকে থাকলেন। বললেন, 'সৈকত আমার ভাই। ও বছর দেড়েক অসুস্থ ছিল, মাসছয়েক আগে চলে যায়।'

'কী হয়েছিল?'

'স্ট্রোক। দীর্ঘদিন ডানদিকটা প্যারালিসিস হয়ে গিয়েছিল। ফিজিওথেরাপি চলছিল।'

'হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন? তেমন কোনো কারণ জানতে পেরেছিলেন?'

ঘরের ভেতর দুজনেই চুপ। কেউ কোনো কথা বলছে না। কাপের চা প্রায় শেষ হয়ে এল। স্বাতীলেখা বললেন, 'আপনি কেন এসেছেন জানতে পারি? কীসের এনকোয়ারি, আমরা এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না?'

'একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানি আমাদের কাছে কিছু তথ্য দিয়েছে, সৈকতবাবুর মৃত্যু হয়েছে মেডিক্যাল ত্রুটি, ভুল চিকিৎসার জন্য কী না। তাদের সন্দেহ চিকিৎসা ঠিক হয়নি। এই ঠিক না-হওয়াটা কি ইচ্ছাকৃত!'

'ইমপসিবল!' স্বাতীনক্ষত্র ছিটকে উঠলেন।

'ইনসিওরেন্স কোম্পানি বলতে চাইছে; সৈকতবাবুর মৃত্যুর মধ্যে কোনো রহস্য আছে। একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ, যাঁর বয়েস বেশ কম, তাঁর হঠাৎ স্ট্রোক হল। তারপর, মাত্র দেড় বছর বেঁচে থাকলেন? কেন? ডাক্তারদের যা রিপোর্ট তিনি বার বার সুস্থ হওয়ার মুখ থেকে আবার অসুস্থ হয়েছেন। কেন? কেউ বা কারা এটা ইচ্ছে করে—একটা প্রশ্ন রয়েছে।'

স্বাতীনক্ষত্র খুব শান্ত আর ঠান্ডা গলায় কেটে কেটে বললেন, 'দেখুন, কে কী বলে অভিযোগ করেছেন আমরা জানি না। তবে

আমাদের কাছে ওর ট্রিটমেন্টের সমস্ত পেপার আছে। আমরা একজন নয়, একাধিক ডাক্তার দেখিয়েছি। কলকাতা শহরের বড়ো বড়ো ডাক্তারবাবুরাই দেখেছেন। তাঁরা সবাই বলেছেন, মেন্টাল শক থেকে এই হয়েছে। ঠিক হয়ে যাবে। স্বাভাবিক জীবনে আবার ফিরে আসবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।'

'ইনসিওরেন্স কোম্পানি ঠিক এ কথাটাই বলতে চাইছে, কেন হল না? কীসের এত চিন্তা? উনি অবসাদে ভুগতেন, কেন? কোম্পানি খুলবেন ভেবেছিলেন, পারলেন না বলে?'

'কে বলল, ও কোম্পানি খুলতে পারল না? কোম্পানি তো খুলেছিল, আরও বড়ো করার ড্রিম ছিল। সেটাও অন প্রসেসে ছিল, তারমধ্যেই ও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। আসলে ও মানসিক চাপটা নিতে পারছিল না। সত্যি কথা বলতে, আমার ভাই একটু লেজি। শুয়ে-বসে থাকতেই ভালোবাসে। হুটপাট করে ডিসিশন নেয়। ভালো স্টুডেন্ট। চাকরিও করত ভালো। সেটাই ওর ঠিক ছিল। হঠাৎই মাথায় চাপল বিজনেস করবে। চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এল। কিন্তু বিজনেস করা দু-দশ লাখ টাকার বিষয় নয়। সে অর্থে ব্যাংক লোন পেতে গেলে যা করতে হয় সে ওই চ্যানেলে যেতে পারছিল না। মাঝে লোন সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কিছু টাকা ফ্রডও হল। আমরা ওকে পরামর্শ দিলাম, ধীরে চলো— '

'তারপরেই কি মানসিক চাপ?'

ঘরের ভেতর আবার নীরবতা।

এবার কথা শুরু করলেন স্বাতীলেখা। বললেন, 'দেখুন, সবার সন্তানই তার মায়ের কাছে ভালো। কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, আমার সন্তান সত্যি খুব ভালো। ও পাঁচবছর ব্যাঙ্গালুরুতে পড়াশোনা করেছে। তারপর চাকরি করেছে। থাকত ওর কুট্টিমাসির বাড়ি। কুট্টি আমার বান্ধবী কাম বোন। সেই কুট্টি ওকে এভরি ডে মনিটারিং করত। কিন্তু কোনোদিন সামান্যরকম কোনো খারাপ কিছু পাইনি। জল-আলো নষ্ট না করা থেকে শুরু করে স্বভাব-চরিত্র নিয়ে কোনো অভিযোগ কেউ কখনো করেনি। আগে আমি বিয়ের চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিল, বিয়ে করবে না। আমরা ওকে বিয়ে নিয়ে কখনো চাপ দিইনি। আমাদের পছন্দের একটা পাত্রী ছিল। সেটা ওরও অপছন্দের ছিল না। আমাদের আত্মীয়দের মধ্যেই। কিন্তু কী হল হঠাৎ দেখলাম সেই ছেলে হঠাৎ অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করে বসেছে।'

স্বাতীলেখার থেকে কথা কেড়ে নিলেন স্বাতীনক্ষত্র। তিনি তাঁর মাকে থামিয়ে বেশ চাপা গলায় বললেন, 'ওই বিয়েই ওর কাল হল। একটা গানের অনুষ্ঠানে গিয়েই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ। শুনেছি ফোর্থ ডে-তে বিয়ের ডিসিশন এবং তারপরের দিনই বিয়ে। ভাবা যায়! একটা স্ট্যাটাসলেস মেয়ে। মেয়েটির বাবা পুলিশ। আমি জানি না, অন্য কোনো চাপ ছিল কি না? শুনলাম বিয়ে করেছে। যখনই শুনলাম বিয়ে করেছে, আমাদের তরফের যে আপত্তি বা অপছন্দ সেটা যেমন জানিয়েছিলাম, তেমনই বলেছিলাম বউ নিয়ে এসো। তার বেশ কয়েকদিন পরে বউ নিয়ে এল। দেখতে-শুনতে খারাপ নয়। শুনেছিলাম একটা প্রাইভেট কলেজে পড়াত, পরে জানলাম একটা এমএনসিতে চাকরি করে। খুব শান্ত, ধীর স্থির ভদ্র। দু-দিন এখানে ছিল, বাবার শরীর খারাপের খবর এলে বাড়ি চলে গেল। ওদের বাড়ির কেউ কখনো আসেননি। আমাদের একবারের জন্য কেউ হাই-হ্যালো করেননি। বাবা অসুস্থ, কিন্তু মেয়েটির মা ছিলেন, ভাই ছিলেন। এঁরা কারা আমরা জানি না। আমার বিশ্বাস ভাইও ভালো করে জানত না। তবু, আমরা রিসেপশনের আয়োজন করলাম। কিন্তু অভদ্র একটা মেয়ে। মান-সম্মানের ধার ধারল না। নাহলে রিসেপশনে কেউ কোনোদিন এমন কাণ্ড করে?'

'কী করেছিল?'

'রিসেপশন পার্টিতে ককটেলের ব্যবস্থা ছিল। ডক্টর দাশগুপ্তের ছেলে নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে হার্ডড্রিংক নিয়ে এসে খাচ্ছিল। চোদ্দো-পনেরো বছরের ছেলে। ও এটা দেখে ছেলেটিকে ধমকায়, শুধু তাই নয় ডক্টর দাশগুপ্তকে ডেকে নালিশ করে। ভদ্র হওয়ার শিক্ষা দেয়। কী এম্বারাসিং বলুন। ডক্টর দাশগুপ্তের কাছে আমাদের মাথা কাটা যায়। ওর স্টান্ডার্ডটাই বড়ো লো। তারপর থাকেনি এ বাড়িতে। চাকরির সুবিধের জন্য, বাবার ফ্ল্যাটেই থাকত। এ বাড়িমুখো হত না। আমরাও ওকে মেনে নিতে পারতাম না। এই নিয়ে সৈকত চাপে ছিল। এভাবে বছর খানেক কাটল, তারপরেই ঘটল কুকুরের কাণ্ডটা—।'

'কুকুরের কাণ্ড?'

'ডগ বাইটের ব্যাপারটা জানেন না? ডগ বাইটের পর সৈকত খুব চাপে পড়ে গিয়েছিল। থানা-পুলিশ। কারণ কুকুরটা ছিল আমার।'

'কী হয়েছিল?'

স্বাতীলেখা, স্বাতীনক্ষত্র দুজনেই বোবা মেরে বসে। আমি খুব হালকা গলায় বললাম, 'আমি কী জানি সেটা বড়ো কথা নয়। আগে আপনারা পুলিশকে যা বলেছেন সেটুকুই আমাকে বলুন। আমরা জাস্ট দু-লাইনের একটা রিপোর্ট দেব। এই ক্লিয়ারেন্সটাই ইনসিওরেন্স কোম্পানি চাইছে। নইলে এই বিশাল অ্যামাউন্টের টাকা রিটার্ন হয়ে যাবে। আর একটা কথা, এই টাকাটা সৈকতের মা-ই পাবেন। স্ত্রী বা অন্য কেউ নয়। সৈকতের চাকরিকালীন পাওনার বড়ো একটা টাকা—। আমাকে রিপোর্ট দিতে হবে সৈকতবাবু মৃত্যুটা স্বাভাবিক, না অস্বাভাবিক?'

টাকার কথায় দুজনেই যেন নড়ে উঠলেন।

স্বাতীনক্ষত্র বললেন, 'হ্যাঁ, মায়ের টাকার খুব দরকার। কিন্তু আমরা না খেতে পেয়ে মরব না। আপনি হয়তো জানেন না আমার হাসবেন্ড পাইলট ছিলেন। তিনি প্লেন ক্র্যাশে মারা যান। আমার শ্বশুরবাড়ি কোনো টাকাই নেয়নি। সব আমাকে দিয়ে দিয়েছে। ভাইয়ের টাকার প্রতি আমার কোনো লোভ বা দাবি নেই। আপনাকে আমি সবটাই বলছি, যা সত্যি তা বলছি। কিন্তু এটা টাকার জন্য বলছি না। মায়ের সব দায়িত্বই আমার। আর আমার ভাইয়ের মৃত্যু অসুস্থতাজনিত কারণেই মৃত্যু, শুধু কিছু টাকা না দেওয়ার অছিলায় কালি ছেটাবেন না। প্রয়োজনে ওই টাকার দাবি আমরা করব না। আশা করি মাও করবে না।'

আমি চুপ করে বসি—শুরু করেন স্বাতীনক্ষত্র।

'আপনি এ বাড়িতে এলেন, কিন্তু কোনো কুকুর দেখলেন না, কোনো কুকুরের ডাক শুনলেন না। কিন্তু একটা সময়ে আমাদের

বাড়িতে কম করে চার-পাঁচটা কুকুর থাকত। তারাও এ বাড়ির সদস্য ছিল। এটা আমার বাবার শখ। বাবার থেকে মা। তারপর আমি বা ভাই। আমাদের সবার কুকুর অন্ত প্রাণ।

আমার বাবার পছন্দ ছিল অ্যালসেশিয়ান। অলওয়েজ অ্যালসেশিয়ান। আমার পছন্দ ছোটো, স্পিৎস, লাসা। তবু আমার বড়ো কুকুরের মধ্যে দুটো ল্যাব্রেডরও ছিল একসময়। কিন্তু ভাইয়ের পছন্দ ছিল অদ্ভুত। ও দুটো স্ট্রিট ডগ তুলে এনে পুষেছিল। তারা দিনরাত আমাদের বাগানে থাকত। মানেভঞ্জ থেকে একটা পাহাড়ি কুকুর নিয়ে এসেছিল। একটা গোল্ডেন রিট্রিভার ছিল। তারপর অফিস ছেড়েছুড়ে দিয়ে এখানে চলে আসার পর, আমিই একদিন ওকে একটা ডোবারম্যান গিফট করেছিলাম। ভাই মজা করে বলত, আমি বেকার তুই আমাকে ডোবারম্যান এনে দিলি। না, না, তোর কুকুর তোরই থাক। কুকুরটা তখন থেকে আমার। ওর সব খরচা আমিই দিতাম। কিন্তু সেই ডোবারম্যান মানে কিং এই ঘরেই দিনরাত থাকত। বড়োজোর বারান্দায় বাঁধা থাকত। ওর চেহারার মধ্যে কেমন একটা খুনে ভাব ছিল। সে সময় এই বাড়িতে আরও পাঁচটা কুকুর ছিল। তাদের পরস্পরের মধ্যে ভাব ছিল। যদিবা কখনো ভাবের ঘাটতি থাকে তবু কেউ কাউকে অন্তত আক্রমণ করত না কিন্তু ওই ডোবারম্যানটা আসার পর সব সমীকরণ যেন বদলে গেল। ভাই অনেকবার বলেছে, কিংকে রাতে খুলে দেব। আমরা রাজি হইনি। তবে হ্যাঁ, কিং খুব কথা শুনত।

আমাদের সব কুকুরেরই হেলথ আর ট্রেনিং প্রপার করা হয়। কিংয়ের জন্যও সেই ব্যবস্থা ছিল।

এই সময় মাঝে মাঝেই ভাই মুনিয়াদের ফ্ল্যাটে যেত। মুনিয়া আমার ভাইয়ের স্ত্রী। মাঝে মাঝে কেন প্রায় রোজই যেত। ওর সঙ্গে কিং থাকত। আমি যা শুনেছি, সে সময়ই কিংয়ের সঙ্গে মুনিয়ার বেশ ফ্রেন্ডশিপ হয়ে যায়। এরমধ্যে আমি আর মা লন্ডন গিয়েছিলাম। প্রায় মাসদুয়েক আমরা রোমি মাসির বাড়িতে থাকি। ফিরে আসার পরও সব কিছু স্বাভাবিক ছিল। এরমধ্যে এল সেই ভয়ংকর দিন। আমাদের বাড়িতেই কিংকে দেখতে এল মুনিয়ার এক ডাক্তার বন্ধু। তিনি একজন পাশ করা, প্রফেশনালি ভেটারেনারি ডক্টর। কিন্তু সে কাছে যেতেই সেকেন্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিং। ভয়ংকর হিংস্র হয়ে ডক্টরের গলার নলি ছিঁড়ে দিল—ভয়াবহ ঘটনা, আপনি নিশ্চয়ই জানেন। সেই মৃত্যু নিয়ে আমাদের খুব হ্যারাসমেন্ট হয়েছে। খুউব খুউব হ্যারাসমেন্ট—ভাবা যায় না। তার কিছুদিন পরেই ভাই অসুস্থ হয়ে পড়ল—। দেড় বছর ভুগেছিল। তারপর চলে গেল। ওর চিকিৎসা সংক্রান্ত সব কাগজ আমাদের কাছে আছে। আপনি বললে, আমরা ল-ইয়ারের মাধ্যমে সব কাগজ পাঠিয়ে দেব।'

'তাহলে কি ওই শকটাই সৈকতবাবু নিতে পারেননি?'

'দেখুন আপনি যদি বলেন, পারটিকুলার ওই শক—তাহলে বলব, ওটা অর্ধসত্য। ফার্স্ট, চাকরিটা হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া। কী সমস্যা হয়েছিল আমরা জানি না। সেকেন্ড, তিন বছরের চেষ্টাতেও সে অর্থে কোম্পনিটা দাঁড় করাতে পারল না। একটা হতাশা তো ছিলই। বলতে পারেন স্বপ্নভঙ্গ! থার্ড, বিয়ে। একটা বাজে মেয়ে। হঠকারী সিদ্ধান্ত, ভুল সিদ্ধান্ত—নির্ঘাত পরে বুঝেছিল। শেষে হল—ডগ বাইট। আমরা সব কুকুর বিদায় করে দিয়েছি। এই বাড়ি এখন কুকুরশূন্য। যা আমরা ভাবতে পারি না। এটা আমাদের সবাইকেই অবসাদগ্রস্ত করে দিয়েছে। এবার দেখুন আপনি কী রিপোর্ট দেবেন।'

'থ্যাংক ইউ।'

তবে কি আমি মুনিয়ার দ্বিতীয় খুনটার হদিশও পেয়ে গেলাম। কিন্তু এই ভেটেরিনারি ডাক্তার কে?

মানে তাহলে ভেটেরিনারি ডাক্তার প্রথম শিকার, দ্বিতীয় শিকার সৈকত চ্যাটার্জি। তৃতীয়...?

দশ

'ওই কুত্তার ডাক্তার লিটন সেন আমাকে ঠকিয়েছিল। আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম। সত্যিকারের ভালোবেসেছিলাম।'

আমি মুনিয়ার দিকে তাকিয়ে আছি। সারা দিনে ও আমাকে তিন-চারবার ফোন করে। সন্ধের পর, আটটা নাগাদ যে ফোনটা আসে তাতে ও জানতে চায় আমি কোথায় আছি—কখন আসব? আমি সৈকতদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে লোকাল থানায় গিয়েছিলাম। আমাকে কটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। সেখানকার কাজ সেরে আজ আমিই ওকে ফোন করলাম। বললাম, বাড়ি ফিরছি।

এসে দেখলাম, ও একগাদা খাবার অর্ডার দিয়ে আনিয়েছে। টেবিল সাজিয়ে বসে আছে। সেলার থেকে একটা রেড লেবেলের বোতলও রাখা। পাশে গ্লাস।

আমি দোতলায় উঠে দেখলাম ও সোফার পাশে, মেঝেতে বসে। আমার দিকে একবার তাকাল। ফোনে মায়ের সঙ্গে কথা বলছে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে এসে বসলাম। আমি সোফায় বসতে ও উঠে এসে আমার গায়ের মধ্যে ঢুকে বসল। আমি গ্লাসে বরফ নিয়ে তার ওপর মদ ঢাললাম। দেখলাম, ওর দু-চোখ বন্ধ। আমি বললাম, 'কী হল?'

'তোমার বুকের আওয়াজ শুনছি। শুনেছি, তোমার নারকো টেস্ট হওয়ার কথা উঠেছিল। হলে কিন্তু তুমি ধরা পড়ে যেতে।'

'কেন?' মদের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে আমি বললাম।

'কেননা তোমার বুকের ভেতর আজ কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ হচ্ছে। মনে হচ্ছে তোমার বুকে কোনো গোপন খবর চাপা আছে।'

মুনিয়া গ্লাসের দিকে হাত বাড়াল।

আমি হাসলাম, 'এটা তুমি বুকের আওয়াজ শুনে বলছ না। এটা তুমি বলছ, যেহেতু আজ তোমাকে ফোন করেছি আমি। আজ আমিই তোমাকে ডেকেছি। তুমি বুঝেছ—সামথিং ইজ রং!' কথাটা বলে আমি একটা হাত ওর টি-শার্টের ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম। নরম পায়রার মতো ওর বুক, আমার হাতের ভেতর। হাতের তালুতে নিয়ে খেলছি।

'দুটোই সত্যিই, তোমার বুকের ভেতর কেমন একটা আওয়াজ হচ্ছে। আর আজ হঠাৎ কী হল তোমার—'

মুনিয়া ভণিতাহীন ভাবে উত্তর দিল।

'বয়েস হচ্ছে তো, কলকব্জা ঢিলে হয়ে যাচ্ছে, তাই আওয়াজ

শুনেছ।' আমি ওর স্তনবৃন্তে আঙুল রেখেছি। ক্রমশ ওর স্তনবৃন্ত শক্ত হচ্ছে। ও অপাঙ্গে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'খুব মুডে আছো মনে হচ্ছে! বয়েস হচ্ছে! কই বেড়ে তো মনে হয় না। এখনও ফুরফুরে, চাবুক!'

'সত্যি বলছ?' আমি হাতের থাবায় ওর বুকটা পিষে দিচ্ছি।

'মিথ্যে বলে কী লাভ! আমি যে ক-জন পুরুষের সঙ্গে শুয়েছি, সত্যি বলছি, তুমিই বেস্ট। সেরা! সেরা!' মুনিয়া দু-হাত তুলে তালি দিল।

'তুমি আমাকে পুরোটা ঠিক বলছ না।'

'দেখো, আমি আগে সবার মন জয় করার জন্য কথা বলতাম। এখন যা আমার মন চায় তাই বলি।'

আমি প্রথম গ্লাসটা মুনিয়াকে ধরিয়ে দিলাম। ও ছোট্ট ছোট্ট পর পর বেশ কয়েকটা চুমুক দিল। আমি আমার গ্লাসে দ্বিতীয় লম্বা চুমুকটা দিয়ে বললাম—'ডাক্তার লিটন সেন কে?'

'ওটা একটা শুয়োরের বাচ্চা। প্রফেশনে কুত্তার ডাক্তার।' কথাটা বলে মুনিয়া মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'তুমি তাহলে আর একটা ঘুঁটি চিনে ফেলেছ। গুড! গুড! আমি ঠিক গুরু চয়েস করেছি। আজ ফুল মস্তি হবে। সেলিব্রেট করতে হবে। আমি বুঝেছিলাম—তাই ভালো ড্রিংকটাই সেলার থেকে নামালাম।'

আমার হঠাৎ মনে হল মুনিয়া যেন কথা ঘোরাতে চাইছে। বললাম, 'মারলে কেন?'

'এটা কোনো প্রশ্ন হল বস! জানতে চাও কীভাবে মারলাম? যাই হোক, তোমার প্রশ্নের উত্তরে বলি—ওর বেঁচে থাকার অধিকার নেই।'

'তোমার সঙ্গে কী সম্পর্ক?'

'আমার দিক থেকে গ্যাদগ্যাদে প্রেম। ওর দিক থেকে ফুর্তি করার মেয়েমানুষ। ওরা না প্রেমের চক্কর ছাড়া শুতে পারে না। সারা জীবনে যে যে মেয়ের সঙ্গে শুয়েছে, সবার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছে। সেক্স নয়, ওরা প্রেম চায়, ভালোবাসার কাঙাল। আসলে কিন্তু সব রাস্তাই বিছানায় এসে মেশে।'

'মারলে কেন?'

'ফালতু প্রশ্ন করছ—মারলে কেন? কেউ আমাকে সুপারি দেয়নি। মেরেছি, ও একটা নর্দমার কীট। আমার গায়ে উঠেছিল, তাই।'

'মারতেই হল? কেন?' আমি গ্লাসে মুখ ডুবিয়ে প্রশ্ন করলাম।

'বড্ড ঘেন্না ছিল। ওই কুত্তার ডাক্তার লিটন সেন আমাকে ঠকিয়েছিল। আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম। সত্যিকারের ভালোবেসেছিলাম।'

'আলাপ কি বিয়ের পর?'

ওর কানের লতিতে জিভ দিলাম। দাঁত দিয়ে ছুঁলাম। কানের ভেতর জিভ ঢুকিয়ে দিলাম, ও কুঁকড়ে আমার শরীরের ভেতর ঠেসে এল।

বলল, 'এমন করলে বলব কী করে? কোথা থেকে শুরু করি—আচ্ছা, আমার চাকরি পাওয়ার পর থেকে বলি। তখন একটা প্রাইভেট কলেজে চাকরি করতাম। কলেজের কাছাকাছি একটা জায়গায় ভাড়া থাকি। সেখানেই আলাপ হল লিটন সেনের সঙ্গে। আলাপটা হয়েছিল হঠাৎই। আমি যে বাড়িতে থাকতাম, সেই মাসিমার দুটো কুকুর ছিল সান্টা আর বান্টা। ওদের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। সান্টা-বান্টাকে আমার জিম্মায় রেখে বাড়িওয়ালি মাসিমা বোনপোর বিয়েতে গিয়েছিলেন চার-পাঁচ দিনের জন্য। আমার দায়িত্ব ছিল ওদেরকে দেখাশোনার। আমি যেচে দায়িত্ব নিয়েছিলাম। হঠাৎই একদিন কলেজের বেরুনোর সময় দেখলাম, বান্টার খুব শরীর খারাপ, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। আমি ডাক্তার ডাকলাম। লিটনই ওদের ডাক্তার। সেই তখন থেকে আমার সঙ্গে আলাপ হল লিটন সেনের। এরপর এ-বাড়িতে ও এলেই আমার সঙ্গে দেখা হত। একদিন হঠাৎ বলল—ম্যাডাম, কতদিন আর ভাড়া থাকবেন, আমাদের এদিকে একটা ফ্ল্যাট কিনে নিন। আমি বললাম, টাকা নেই। ও বলল, ব্যাংক থেকে লোন নিন। আমি বললাম, প্রাইভেট কলেজের চাকরি, কোন ব্যাংক লোন দেবে? ও বলল,

সেকেন্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিং।

আমি ব্যবস্থা করে দেব। আমার স্ত্রী ব্যাংকে চাকরি করে। কিন্তু যে ব্যাংক থেকে লোন করিয়ে দিল, সেখানে ওর স্ত্রী চাকরি করে না। শুনলাম, আগে এই ব্রাঞ্চে ছিল, এখন ট্রান্সফার হয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে।

তারপর লোনের সময় বেশ কয়েকদিন পর পর ব্যাংকে যাওয়া-

আসা করেছি দুজনে। এরকমই সময় একদিন জানাল, লিটন ডিভোর্স কেস ফাইল করেছে। ওর স্ত্রীই ডিভোর্স চায়। লিটন দিয়ে দেবে। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। জানতে চাইলাম—কেন? আমাকে বলল, বিয়ের পর থেকেই মেয়েটির লিটনকে ঘেন্না পায়। মেয়েটি নাকি লিটনের গায়ে কুকুর-বেড়ালের গন্ধ পায়। স্ত্রীর কথা শুনে লিটন বাড়ি ঢুকে জামাকাপড় ছেড়ে স্নান করত। গায়ে পারফিউম মাখত। তবু ওর স্ত্রী ওকে বিছানায় ওর পাশে শুতে দিত না। তারপর মেয়েটি ট্রান্সফার নিয়ে অন্য জায়গায় ওর বাপের বাড়ির কাছাকাছি ব্রাঞ্চে চলে গেছে। লিটন আর শ্বশুরবাড়িমুখো হয় না। নিজের ডাক্তারি নিয়েই ডুবে থাকে।

লিটন আমাকে প্রায় রোজ ফোন করত।

ক্রমশ দুজন দুজনের প্রেমে পড়লাম। আমি ওকে বলেছিলাম, আমি ডিভোর্সি। হাজবেন্ডের সঙ্গে বিদেশে থাকতাম। ছেড়ে চলে এসেছি। আমার হাজবেন্ড ছিল গে। কিন্তু সে বাড়ির কথায় আমাকে বিয়ে করেছিল। শুনলাম, লিটনও খুব তাড়াতাড়ি ডিভোর্স পেয়ে যাবে। আমি আবার স্বপ্ন দেখলাম, সংসার করব, ভালোভাবে বাঁচব। লিটন আমার ফ্ল্যাটে আসত, দিনরাত থাকত। বিয়ে হয়নি ঠিক কথা, আমি আমরা বিবাহিতই ছিলাম। দিন যায়, মাস যায়, লিটনের আর ডিভোর্স হয় না। আমি একদিন লোন অ্যাকাউন্টের একটা কাগজ নেওয়ার জন্য ব্যাংকে গিয়েছিলাম। গিয়ে একজনের কাছ থেকে লিটন সম্পর্কে তীর্যক কিছু মন্তব্য শুনলাম। তখন তাকে ডেকে দুটো মিষ্টি কথা বলতেই গড়গড় করে সে যা বলল, তার মোদ্দা কথা হল, লিটন ওর বউদির সঙ্গেই থাকে। দাদাটা আধ পাগলা। এটা নিয়ে ওর স্ত্রী আপত্তি জানিয়েছিল, তার ফলশ্রুতি হল, লিটন ওর স্ত্রীকে উলঙ্গ করে ছবি তোলে। এবং এতটাই ও পারভার্টেড, হাফ পাগল দাদাকে উলঙ্গ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ছবি তোলায়, বলে—এই ছবি তোমার ব্যাংকে সেঁটে দেব। স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে মধ্যরাতে পালিয়ে যায়। লিটন ওদের বাড়ির কাজের মেয়েটিকে প্রেগনেন্ট করে, লোকাল হাসপাতালে খালাস করিয়েছে। এ খবরও সবাই জানে। আমি সব শুনে একদিন লিটনের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি। সব ঘটনা শুনি। লিটন মাসে মাসে ওর থেকে টাকা নেয়। মেয়েটি ডিভোর্স চেয়েছে, লিটন ১০ লক্ষ টাকা চেয়েছে, তবে ডিভোর্স দেবে। শুনে চুপচাপ ফিরে আসি। বুঝতে পারি, খুব ভুল কাজ করেছি। লিটনকে আমার ফ্ল্যাটে ঢুকতে বারণ করে দিই। ক-দিন লিটন ফোন করে, হোয়াটসঅ্যাপে আমার কটা নগ্ন ছবি পাঠায়। আমার ঘুমন্ত অবস্থার ছবি। বলে, আমাকে ও ব্ল্যাকমেল করতে চায় না। শুধু ওর কিছু টাকার দরকার, স্ট্রিট ডগদের জন্য একটা হাসপাতাল করবে, যদি ওকে সাহায্য করি। আমি চাকরি ছাড়ি, ফ্ল্যাট বিক্রি করে চলে আসি। হ্যাঁ, ওর চাহিদা মতো পুরোটা নয়, ৫ লক্ষ টাকাও দিয়েছিলাম। আমি জানি ও মিথ্যে কথা বলছে। বলেছিলাম, আর দেব না। এটাই ফার্স্ট-অ্যান্ড-লাস্ট। আমার বাবা পুলিশ, আমি বাবাকে জানালাম না। ও আর আমাকে ডিসটার্ব করেনি। হয়তো পুলিশের ভয়ে।

কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম ওকে ছাড়ব না। সৈকত আমার কাছে ওর কুকুর নিয়ে আসত। বিশেষত কিংকে। আমি সেই কিংকে কাছে পেয়েই ওর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করি। নানা পরামর্শ নিই। ওকে বলি, আমার হাজবেন্ডের দিদির কুকুর। একদিন কিংয়ের শরীর খারাপ হয়। আমি এই সুযোগে ওকে ডেকে পাঠাই। আবার পুরনো প্রেম দিয়ে ওকে খোঁচা মারি। হ্যাঁ, সেদিন দুপুরে ওর সঙ্গে আমাকে শুতে হয়েছিল। আমি জানতাম, আজই ওর কোনো মেয়ের সঙ্গে শেষ শোয়া। ও আমার বাড়ি থেকেই সৈকতদের বাড়ি যাবে কিংকে দেখতে। আমি ওর জামার কলারে একটা স্পেশাল গন্ধ স্প্রে করে দিয়েছিলাম। জানতাম, ও যখন কিংয়ের মুখের সামনে ঝুঁকে বসবে—ওই গন্ধে কিং ওকে অ্যাটাক করবেই। ওর গলার নলি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবেই।

আসলে কিং যখনই আমার ফ্ল্যাটে আসত, আমি ওকে ওই গন্ধের ট্রেনিং দিতাম। মাঝে কিং দীর্ঘদিন আমার ফ্ল্যাটে ছিল। আমি ট্রেনিং দিয়েছিলাম, ওই বিশেষ গন্ধ—ওই গন্ধ পেলেই ও মানুষের আকারের সফট টয়েজের গলা ছিঁড়ে ফালাফালা করত।

বেচারা লিটন সেন! ওর জামার কলারে আমি স্প্রে করে দিয়েছিলাম—সেই মৃত্যুবাণ!' কথা শেষ করে মদের বোতলটা টেনে নিয়ে গ্লাসে ঢালে। বেশ কিছুটা বরফ দিয়ে বলল, 'তাহলে তুমি দুটো পেয়ে গেলে। বাকি থাকল এক।'

আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি।

গ্লাসে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে মুনিয়া বলল, 'আমার খুব জ্বালা—এসো আমার জ্বালা জুড়িয়ে দাও।'

আমি গ্লাসে মদ ঢালি, বরফ নিয়ে মৃদু নাড়াই, 'দু-দুটো খুন করেছ তুমি—সত্যি বলছ!'

'দুটো নয়, তিনটে। আর একটা তোমাকে খুঁজতে হবে।' মুনিয়া হাসে, 'তোমার চার, আমার তিন।'

আমি গ্লাসের মদ মুখের ভেতর নিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকি। আস্তে আস্তে গলায় চালান করি। বলি, 'বাজে কথা, রটনা। আমি একটাও খুন করিনি।'

মুনিয়া হাসে, 'মিথ্যে বলতে বলতে তোমার কী অবস্থা—পুরুলিয়ার জঙ্গলে যে ছেলেটাকে মেরেছিলে, ওটা খুন ছিল না?'

'আত্মরক্ষার জন্য। ওকে না মারলে ও আমাদের মারত। কতজনকে মারত জানো? কিচ্ছু জানো না তোমরা, সব খবরের কাগজ আর টিভির গল্প শোনো। আমরা প্রাণ হাতে নিয়ে লড়েছি।'

'ওই ছেলেটাকে তুমি ভুল করে মেরেছ, ও টেররিস্ট ছিল না।'

'বাজে কথা, ওই ছেলেটা যদি আমাদের মারতে পারত তবে তো টেররিস্ট হত। আগে আমরা ওকে মেরেছি, তাই ও নিরীহ। আমাদের দেশের শান্তিপ্রিয় নাগরিক!'

'এটা সবাই জানে। এটা ওপেন টু অল। এছাড়া, তোমার স্ত্রী, অসীমানন্দ, রত্নেশ্বর, উৎপল...।'

'হয়তো এর পরে কোনো দিন তোমার নামটাও জুড়ে যাবে।' আমি হাসি। 'অথবা—।'

মুনিয়া নিজের গ্লাসটা ওপর দিকে তুলে মুখের ভেতর সরু সুতো মতো ধারায় মদ ঢালে—'বলো অথবা কী?'

আমি হাসি, 'অথবা, তোমার নিজে গুনতিতে আছে তিনটে। আমি মারা গেলে হবে চারটে—আমি চতুর্থ!'

'উঁহু, তুমি কী করে চতুর্থ হবে, তুমি আমার কোনো ক্ষতিই এখনো করে উঠতে পারোনি। পারবেও না কোনোদিন। তুমি হারামি চেহারায় এতগুলো খুন করেও বড্ড মানুষ মানুষ! আদপেই তুমি ভালোমানুষ। পাশাপাশি আমি, কখনো ছেড়ে দিই না, বদলা নিতে চাই।'

'আমি কোনো খুন করিনি। আমার নামে খুনের অভিযোগ চাপিও না। আমার স্ত্রীকে আমি ভালোবাসতাম। এটাই প্রথম, এটাই শেষ। এখানে আর কিছু নেই—অসীমানন্দ সুইসাইড, রত্নেশ্বর-উৎপল অ্যাক্সিডেন্ট। এখন তোমার যদি অস্বাভাবিক কোনো মৃত্যু হয়, সবাই আমার দিকে আঙুল তুলবে। খুব সাবধানে থাকবে মুনিয়া। আমার জন্যে সাবধানে থাকবে। আমাকে আর কোনো বদনামের ভাগী করো না।'

'তুমি তিন নম্বরটার খোঁজে বেরিয়ে পড়ো। তুমি তিন নম্বরের নামটা আবিষ্কার করতে পারলে, আমি একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। তখন তোমাকে চার নম্বরের নাম-ধাম বলব। প্ল্যান কী হবে, কী হতে পারে, সাজেশন চাইব—।'

'তোমার প্রথম স্বামী বেঁচে আছে মুনিয়া?'

'হ্যাঁ, দিব্যি বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।' মুনিয়ার গলা থমকে যায়। ঢোক গেলে।

আমার তিন পেগের কোটা কমপ্লিট। বড়োজোর আর একটা। মুনিয়ার চার শেষ। ও আবার ঢালছে। খাক খাক, অনেক অনেক মদ খেয়ে এই ঘরের সোফায় লুটিয়ে পড়ে থাক। আমি ফিসফিস করি, 'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি। বিশ্বাস করছি তুমি তিনটি খুন করেছ। তিনজনের ভেতর আমি দুজনকে খুঁজে বের করেছি। দুটো খুনই নিখুঁত, কোনো প্রমাণ নেই। প্রমাণ কি সত্যিই নেই? প্রমাণ ছিল, কিন্তু তখন কেউ সন্দেহ করেনি। সন্দেহটাই আসল কথা। কেউ একটা কোনো কিছু নিয়ে সন্দেহ করলেই, তখনই খেলটা শুরু হয়। আর সন্দেহ না করলে সব প্রমাণ মুছে যায়। সেভাবেই দুটো খুনের কোনো হদিশ আর নেই। মৃতদেহও পুড়ে গেছে—তুমি যে দিনের পর দিন সৈকতকে পয়জন দিয়েছ, কেউই তা খতিয়ে দেখেনি। ডাক্তাররা ভাবতে পারেনি। তারপর কুকুরে কামড়ানোটা যে নিছক দুর্ঘটনা নয়, সেটাও কেউ খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেনি। তুমি নিশ্চয়ই কারও কাছে পরামর্শ নিয়েছিল। ইন্টারনেট দেখেছিলে। তোমাকে সন্দেহ করলে সার্চিং হত। আসলে কেউ ভাবতেই পারেনি, কুকুরটা খুনি নয়, স্রেফ খুনের অস্ত্র। তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। তুমি যা দেখিয়েছ, যা দেখাতে চেয়েছ—পুলিশ তাই দেখেছে। এটা ডিপার্টমেন্টের দুর্ভাগ্য! এর পর তৃতীয়জন। এই তৃতীয়জন কে আমি জানি না। কিন্তু চতুর্থজন কাকে খুন করার প্ল্যান করতে আমার কাছে এসেছ, সেটা আমি মনে হয় আবিষ্কার করে ফেলেছি। চতুর্থজন হল তোমার প্রথম স্বামী।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই মুনিয়া নিজের পরনের টি-শার্টটা খুলে ছুড়ে দিল। হট প্যান্টটা টেনে শরীর থেকে নামিয়ে দিয়ে আমার ওপর উঠে শুলো। আমার কান কামড়ে ফিসফিস করল, 'তৃতীয়জন কে খোঁজ পেয়েছ?'

আমি ওর দু-স্তনের মাঝে মুখ গুঁজে দিয়ে বলি, 'চতুর্থজন যাকে খুন করার স্কিম করতে আমার কাছে এসেছ, তার কথা বলতে পারি—তোমার প্রথম হাসবেন্ড। ঠিক তো?'

মুনিয়া আমার কান কামড়ায়, 'ঠিক! এবার বলো তৃতীয়জন কে? যে আমার হাতে খুন হল।'

'তৃতীয়জনের খোঁজ আমি ঠিক পেয়ে যাব। আর ওই তৃতীয়জনই শেষ। আমি তোমাকে আর খুন করতে দেব না। আর নয়। তোমার হাতে আমি আর রক্ত লাগতে দেব না। এবার তোমাকে থামাব। যিশু কতবার ক্ষমা করার কথা বলেছেন—'

মুনিয়া হাসে।

'আর নয়, এবার থামো।'

'তোমাকে যদি কেউ বলত, ধূমকেতু রাহা তোমার স্ত্রী গিয়েছে, রত্নেশ্বর-উৎপল গিয়েছে, এবার থামো। অসীমানন্দকে ছেড়ে দাও, তুমি ছাড়তে?'

'অসীমানন্দ পাপী। সবচেয়ে বড়ো পাপী। তার কাছে পুরোটাই লালসা। একবার ভাবো, তোমার প্রথম স্বামীর কথা—ভাবো, তার কি মৃত্যু পাওনা? সে কতখানি অন্যায় করেছে, যে তাকে মরতে হবে?'

মুনিয়া চুপ করে থাকে।

'তুমি খুনের নেশায় আর খুন করো না। এবার থামো।'

'থামব!'

'আগে বরং একটা কাঠগড়া প্রস্তুত করো, সেখানে একদিকে তুমি দাঁড়াও, আর একদিকে তোমার প্রথম স্বামী। বিচারক আমি—এই বিচারই শেষ বিচার।'

মুনিয়া আমার শরীরটা নিজের গায়ে মাখতে মাখতে বলে, 'বিচার পরে করবে? তৃতীয় খুনের হদিশ পেলে?'

'চিন্তা করো না। ঠিক খুঁজে বের করব। তবে তার আগে চতুর্থজনের বিচারটা করে ফেলতে চাই। আমাকে তার কথা বলো—দেখি, সত্যিই সে কতটা অন্যায় করেছে। বলো আমাকে তার কথা বলো—এখন তার বিচার হবে।'

এগারো

'আমার প্রথম হ্যাসবেন্ডে' নাম অংশুমান। খড়্গপুর আই আইটির ছেলে। স্কলার। ওদের বাড়ি নৈহাটি। চাকরি করত ক্যালিফোর্নিয়ায়। বিয়ের সম্বন্ধ আনে আমার দূরসম্পর্কের এক পিসি। অংশুমান তখন ইন্ডিয়ায় নেই। কিন্তু বাবার সঙ্গে অংশুমানের পরিবারের লোকের কথাবার্তা চলতেই থাকে। বিয়ের এই কথাবার্তার মধ্যে আমার বা মায়ের কোনো ভূমিকা নেই। আমরা নীরব দর্শক। বাবা শুধু একদিন, সেদিন ছিল শনিবার এসে বলেছিল—কাল বিকেল তোর অজন্তাপিসি কয়েকজন লোক নিয়ে আসবে। ওরা তোকে দেখতে আসবে।

দেখতে আসবে, মানে?

বাবা আমার দিকে তাকাল—তুমি অসুস্থ নও, যে তোমাকে আপেল নিয়ে কেউ দেখতে আসছে। দেখতে কেন আসছে বুঝতে পারছ না? ওরা তোমার শ্বশুরবাড়ির লোক। যদি তোমাকে পছন্দ করে তোমার কপাল ফিরে যাবে।

—মানে তুমি কি আমার বিয়ের কথা ভাবছ, আমি এখন বিয়ে করব না। আর কাল বিকেলে আমি থাকব না।

—কাল বিকেলে ওরা আসছে। তুমি না থাকলে তোমার হয়ে তোমার মা প্রক্সি দেবে। তোমার মাকেই আমি দেখাব।

পরের দিন বিকেলেই ওর দেখতে এল। দেখতে এসে ওদের পছন্দ হয়ে গেল। ছেলের বাবা পাত্রের ছবি দিয়ে গেল। সবাই ছেলের ছবি দেখল, সবারই পছন্দ হয়ে গেল। মা বলল, 'ওদের যখন পছন্দ হয়েছে, রাজি হয়ে যা। এই নরককুণ্ড থেকে মুক্তি পাবি।' ভাই বলল, 'ছেলেটা স্কলার। ভালোই হবে, তোকে শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে থাকতে হবে না, আমেরিকায় থাকবি। খুব ভালো থাকবি।' আমার বন্ধুরা, আত্মীয়স্বজনরা যারাই জানছে আমাকে ঈর্ষা করছে। যাদের মেয়ে আছে, তারা নিজেদের হতাশা চেপে রাখতে পারছে না। আমি তখন সবে এম. এসসিতে ভর্তি হয়েছি। আমার না শুনে বাবা ফুঁসছে। একদিন মাকে ধরে আচ্ছাসে পিটিয়ে দিল। আমি রাজি হয়ে গেলাম। তিন মাস পরে বিয়ে করতে ইন্ডিয়ায় ফিরল অংশুমান, একমাসের ছুটি নিয়ে। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। তার আগেই বাবা আমার পাসপোর্ট করে ফেলল। বিয়ের পরে দিন-পনেরো থেকে অংশুমান চলে গেল। ওই পনেরোদিন আমি শ্বশুরবাড়িতে ছিলাম। বলতে পারি ওই সময়টা আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি অসম্ভব ভালো মানুষ। তাঁদের কাছে আমি সত্যি সত্যি লক্ষ্মী। তাঁরা আমাকে চোখে হারাতেন, মা ছাড়া কোনোদিন কথা বলেননি। তাঁদের কাছে আমি বউ নই তাঁদের মেয়ে। ওই বাড়ির মেয়ে।

আমার বর বিয়ে করে ফিরতে ফিরতে বলল, আমার বাবা-মা তোমাকে তাদের হারানো মেয়ের জায়গা দিচ্ছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, হারানো মেয়ে মানে? তোমার কি কোনো বোন হারিয়ে গেছে?

অংশুমান বলল, না, না, তুমি খুব বুদ্ধু! তোমাকে ওরা ওদের মেয়ের জায়গায় বসাচ্ছে। এতদিন পরে যখন মেয়ে পেয়েছে, তখন নির্ঘাত সেটা হারানো মেয়ে।

ওর কথায় আমি হাসলাম। অংশুমান বলল, আমি এপ্রি। তুমি ওদের মেয়ে হয়ে যাও। আমার বোন, ভালোই হবে। সামনাসামনি বা লুকিয়ে ভাইফোঁটা দিতে হবে না। কিন্তু তুমি যা চাও আমি তাই গিফট দেব। তুমি ওদের মেয়ে হয়ে আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে থেকে যাও। ওদের দেখাশোনা করো। আমেরিকা ঘুরতে চাইলে এসো। মাস দুয়েক থেকে যাও। যা টাকা লাগে জানাবে, দেব।

আমি ভাবলাম মজা করছে। এটা যে মজা নয় তা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগে গেল। বুঝলাম আমেরিকায় গিয়ে। ফুলশয্যার রাতে এসে প্রচুর গল্প করল—ছোটোবেলা থেকে শোনা বিভিন্ন লোকের ফুলশয্যার গল্প। অনেক গল্পের পর শেষে শুয়ে পড়তে পড়তে বলল—আমাদের কোনো গল্প নেই। আজ, তিনদিনের চেনা থেকে যদি কোনো গল্প হয়, নিজেকে রেপিস্ট মনে হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আগেই ওর যাওয়ার সময় এগিয়ে এল। বিয়ের তিনদিন বাদ দিলেও পরে চোদ্দো দিন ছিল। চলে গেল। আমার যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে। এই চোদ্দো দিনে রাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিল, বেশ কয়েকবার চুমুও খেয়েছিল। একদিন মনে হয়েছিল, ও খুব চেষ্টা করছে আমার সঙ্গে ফিজিক্যাল রিলেশন করার। কিন্তু ঠিক যেন তালে বাজছে না। আমিও জোর করিনি। আমি বাবাকে দেখে এসেছি, মাকে নিয়ে যে কীর্তি করত। আমার সামনে, ভাইয়ের সামনে টেনে ঘরে নিয়ে যেত। তার থেকে মনে হত ও অনেক ভালো। ব্যস। ও চলে যাওয়ার মাসখানেক পরে আমি ভিসা পেয়ে গেলাম। দেড়মাসের মাথায় চলে গেলাম ওর কাছে। এবার ও আর আমি। অংশু আমাদের জন্য বেশ বড়ো একটা বাড়ি নিয়েছিল, আগের বাড়িটা ছেড়ে। আমি যাওয়ার পর কিছুদিন বেশ ভালোই কাটল। কিন্তু তারপরেই ওর সঙ্গে আমার অদ্ভুত একটা টানাপোড়েন শুরু হল। আমি ওকে যত জড়িয়ে ধরতে চাই, ও তত দূরে চলে যায়। আমাদের মধ্যে কোনো ফিজিকাল সম্পর্ক গড়ে উঠল না। এভাবে কোনো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক টেকে না। কিন্তু যেভাবেই হোক এ সম্পর্কটা বাঁচাতে হবে। আমার মনে হল, ও অসুস্থ, ওকে সাহায্য করা দরকার। আমি ওকে একদিন স্পষ্ট করে জানতে চাইলাম—ও কেন এমন করছে। ও জানাল, ইন্টারেস্ট পায় না। আমি বললাম, তাহলে তুমি ডাক্তারের কাছে চলো। ও বলল—ও সম্পূর্ণ সুস্থ। অংশু জানাল, এর আগে এখানকার একটি মেয়ে ওকে অ্যাপ্রোচ করে। ও তাকে না বলে। তখনই মেয়েটা ওকে বলে—তুমি ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করে নাও, কেন তোমার এমন হচ্ছে, এই অনীহার কারণ কী। অংশু তখন ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করে। সেই ডাক্তারবাবুই ওকে জানান, অংশু সম্পূর্ণভাবে সুস্থ। তাহলে ও এমন করছে কেন? কেন আমার থেকে পালিয়ে যাচ্ছে! অংশু বলল, ওর ইন্টারেস্টটা অন্য। অংশু সম্পূর্ণভাবে সেদিন আমাকে জানিয়ে দেয় দাম্পত্য সম্পর্কে ও যেতে পারবে না। জোর করলে শুধু জোর করাই হবে, ওর শরীর আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না। সেক্ষেত্রে সেটাই হবে রেপ। আমি বললাম—সব জেনেশুনে তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন? অংশু মাথা নীচু করে জানাল, আমার মা-বাবা খুব ভালো মানুষ, আমি তাদের দুঃখ দিতে চাইনি। বেশ কয়েক বছর ধরেই তারা ওর বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল, কিন্তু ও রাজি হয়নি। এবারে দেশে ফেরার আগে ও জানতই না। বাড়ি ফিরে শুনল ওর বিয়ে। সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে। নিমন্ত্রণ সম্পূর্ণ। সেক্ষেত্রে ওর কিছু করার ছিল না। ও ভেবেছিল, সব মিটে গেলে ঠান্ডা মাথায় আমাকে বলবে, আর আমি ওর সব কথা বুঝব। ক্ষতিপূরণ হিসেবে, আমি যা চাইব ও দেবে। টাকা চাইলে টাকা। অথবা, ওর সঙ্গে থেকে যেমন খুশি জীবন আমি কাটাতে পারি। ও কোনোভাবেই আমার পথে পড়বে না। বরং আমি ইচ্ছে করলে, আমেরিকা থাকার সব সুযোগ-সুবিধা নিতে পারি ওর থেকে। ওর কোনো আপত্তি নেই। অংশু আমাকে শান্তভাবে বোঝাল একটা গল্প বলে, লন্ডনে ওর এক বোন পড়তে গিয়েছিল। ওর যাওয়া-আসার রাস্তায় মাঝে মাঝেই একটা ভিখিরিকে টাকা দিত। একদিন একটু বেশিই টাকা দিল। তখন ভিখিরিটি বলল—তুমি এতগুলো ইউরো আমাকে দিলে কেন? মেয়েটি বলল—আজ আমার জন্মদিন। বাবা জন্মদিনে বন্ধুদের সঙ্গে হইচই করার জন্য বেশ কিছু বেশি

টাকা পাঠিয়েছে। বন্ধুরা জানলে সবটাই খরচ করিয়ে দেবে। তার থেকে তোমাকে আমি দিলাম, তোমার কাজে লাগবে। ভিখিরিটি তখন মেয়েটিকে বলল, তুমি খুব ভালো মেয়ে, আমি তোমাকে হেল্প করতে চাই। তুমি আমাকে বিয়ে করো। আমি তোমাকে কোনো ডিসটার্ব করব না। তুমি ইউকের সিটিজেনশিপ পেয়ে যাবে। পরে আমাকে ডিভোর্স করে দেবে।

অংশুও আমাকে সেই অফার দিল। বলল, আমি এই অফার দিলে অনেক মেয়েই কেরিয়ার গড়তে আমাকে বিয়ে করে চলে আসত। কিন্তু আমি মুখ ফুটে সেটা অ্যারেঞ্জ করতে পারিনি। বাবা-মা অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছে। আমরা দুজন আপাতত স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকি, তুমি কেরিয়ার গড়ো। টাকা নিয়ে চিন্তা করো না।

আমার তখন কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে। অংশু আমাকে বলল, আমি তোমাকে সব দেব, শুধু ফিজিকাল স্যাটিসফাই করতে পারব না। এটা আমার ত্রুটি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

আমি একসময় ঠিক করলাম, পড়াশোনা যেখানে থেমে গিয়েছিল, সেখান থেকেই আবার শুরু করব। ওর কাছে প্রায় দেড় বছর থেকে ফিরে এলাম। এম.এসসি কমপ্লিট করলাম। শ্বশুরবাড়িতেই থাকলাম। আর বাপের বাড়ির নরককুণ্ডে ফিরলাম না। ওখানেই পিএইচডি করলাম। প্রাইভেট কলেজে চাকরি পেয়ে ডিভোর্স স্যুট করলাম। অংশু কনটেস্ট করল না, ও টাকা দিতে চেয়েছিল নিইনি। ডিভোর্স পেয়ে গেলাম।

তারপর ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। ওই কুত্তার ডাক্তার আমাকে দিয়ে ফ্ল্যাট কেনাল।'

এতখানি শুনে এসে আমি বললাম—'তাহলে তুমি অংশুকে মারবে কেন?'

মুনিয়া চুপ করে থাকল।

আমি বললাম, 'অংশু কী দোষ করেছে? ওকে মারবে কেন? ও তোমার ক্ষতি করেছে। ভুল করেছে, অন্যায় করেছে। তবু কোথাও কি মনে হয় না, শেষ পর্যন্ত অংশু তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে। সব সত্যি কথা বলেছে। ও অসহায় সেটা স্বীকার করেছে। ছেড়ে দাও ওকে।'

মুনিয়া আমার গাল চেপে ধরে। 'তুমি আমাকে লোক ঠিক করে দাও; আর একটা অ্যাক্সিডেন্ট।'

'আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তোমার পক্ষেই ওটা সম্ভব। যা টাকা লাগে আমি দেব। তুমি আমাকে কানেকশন দাও।'

আমি হাসি, 'আমার ক্ষমতা নেই। আমেরিকায় আমার কোনো যোগাযোগ নেই।'

'অংশু কলকাতায় আসছে জানুয়ারিতে। অংশু যেন দমদম এয়ারপোর্ট থেকে না বাড়ি ফিরতে পারে।'

'তুমি কী করে জেনেছ?'

'ওর এক মাসতুতো ভাই আমাকে খবরটা দিয়েছে। ছেলেটা আমার প্রতি ইন্টারেস্টেড ছিল। আমি কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ও এখনও আমার পিছন ছাড়েনি। একমাত্র ওই ছেলেটিই আমাদের ডিভোর্সের সঠিক কারণটা জানে। জানে, স্রেফ ফিজিকাল স্যাটিসফায়েড না করতে পারার জন্য আমি অংশুর মতো একটা ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছি। ওর খুব ইচ্ছে আমাকে ফিজিক্যালি স্যাটিসফায়েড করবে। আমাকে সারারাত ঘুমাতে দেবে না। আমার কোমর নাড়াতে পারব না। আরও ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই আমাকে খবরটা দিয়েছে।'

'আর এই খবর পেয়েই তুমি অংশুকে মারার জন্য প্ল্যান করছ?'

'না।'

'তবে?'

'খবর পেলাম, অংশুর বাবা-মা এবার এক গবির ঘরের মেয়েকে নির্বাচন করেছে। পাত্রী অংশুর থেকে প্রায় সতেরো বছরের ছোটো। অংশু এবার জেনেশুনে বিয়ে করতে আসছে।'

রুবি ওঁর হাত-পা বেঁধে একটা ওষুধ খাইয়ে চলে গেল।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। বলি, 'অংশু জেনেশুনে বিয়ে করতে আসছে, এটা তোমাকে কে বলল?'

'আমি খবরটা জেনে অংশুকে ফোন করেছিলাম। বললাম, অংশু তুমি দেশে এসো না, তোমার বাবা-মা আবার পাত্রী ঠিক করেছে। তুমি এলেই আবার বিয়ের জন্য চাপ দেবে।' কথাটা বলে মুনিয়া চুপ করে থাকল।

'তারপর, সেটা শুনে অংশু কী বলল।'

'অংশু বলল—হ্যাঁ, আমি জানি। আসলে, বাবার পেসমেকার বসেছে। আমি চাই না বাবা-মা কষ্ট পাক। ডিভোর্সের সময় আমি মাকে ছুঁয়ে কথা দিয়ে এসেছিলাম, আমি আবার বিয়ে করব। আমি

মাকে কথা দিয়েছি। আমি বললাম, অংশু আমাকে বিয়ে করার সময় তুমি জানতে না। কিন্তু এবার আগে জেনে তুমি এত বড়ো অন্যায় করো না।' কথাটা বলে মুনিয়া চুপ করে থাকল। তারপর কেটে কেটে বলল, 'তখন অংশু আমাকে বলল—তোমার সময়ও আমি জানতাম। কিন্তু আমি চাই না বাবা-মা কষ্ট পাক।' মুনিয়া দাঁত ঘষল। ওর বাবা-মাকে কষ্ট না দেওয়ার জন্য ও আমার জীবন নষ্ট করেছে, আর একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করতে চাইছে। তাই আমি ওর বাবা-মাকে একটু বেশি কষ্ট দিতে চাই। ছেলের লাশ ধরিয়ে দেব কোলে।'

আমি চুপ করে থাকি। তারপর খুব ধীরে বলি, 'ওর বাবা-মা যে কষ্ট পেল এটা তো অংশু জানতে পারবে না, কেননা ও তখন মৃত। বরং ওকে জীবিত রেখে ওর বাবা-মাকে কষ্ট দিতে হবে।'

আমার কথায় মুনিয়া ঠিকরে উঠল, 'ঠিক তো—অংশু মরে গেলে ওর বাবা-মা কষ্ট পেল কি না ও কী করে জানবে?'

'ওকে মেরে তুমি হাত নোংরা করো না। বরং ওর বাবা-মায়ের কাছে যাও। খুব শান্ত ভাবে যাও। তোমার সঙ্গে আমিও যাব। গিয়ে ওর বাবা-মাকে সব জানাও। প্রয়োজনে ওর বাবা-মায়ের সামনে থেকে অংশুকে ফোন করো, করে কথা বলো। তোমাদের কথোপকথন অংশুর বাবা-মা শুনুক। কথা শেষ হলে তখন তুমি বলো, ফোনের সামনে তোমার বাবা ও মা আছেন। ওনাদের মুখ বন্ধ করে কথা আমি শোনাব। শেষে আমি বলে আসব—আপনার ছেলে ইন্ডিয়ায় ফিরলেই লকআপে পুরব। অংশুকে শুনিয়ে শুনিয়ে আমি ওর বাবা-মাকে হুমকি দিয়ে আসব—বলে আসব, আপনার ছেলে গে, আপনার ছেলে হোমো, আপনার ছেলে ধ্বজভঙ্গ, আপনার ছেলে... আশা করি অংশুর কাছে এর চেয়ে বড়ো শাস্তি আর কিছু নয়। আমার মনে হয়, অংশু এরপর সুইসাইড করবে। না করলে সারা জীবন জীবন্মৃত হয়ে, হতাশাগ্রস্ত একজন মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবে। এর চেয়ে বড়ো শাস্তি আর হয় না।'

মুনিয়া বলল, 'তুমি গ্রেট! দুর্দান্ত প্ল্যান দিয়েছ—কবে যাবে?'

'কালই যাব। আমি চাই পৃথিবীতে ওর শাস্তির মেয়াদ একদিন হলেও বেশি দিতে। তার আগে একটা কাজ করো। এখন তুমি অংশুকে একটা ফোন করো। এখন ওর দিন। ফোন করে বলো, তোমার কিছু কথা আছে। যা আজ বলবে না, কাল সন্ধে সাতটার সময় ফোন করে বলবে। কাল স্যাটারডে, ওর ছুটি। সন্ধে সাতটা মানে ওর সময় সকাল সাড়ে নটা। অথবা জেনে নেবে কখন ওর সুবিধে।'

মুনিয়া হাত বাড়িয়ে অংশুমানকে ফোন করল।

বারো

আমার পাশে বসে মুনিয়া কাঁদছে। মুনিয়া নিজের জন্য কাঁদছে না। কাঁদছে অংশুমানের বাবা-মা-র কষ্ট দেখে, অংশুমানের বাবা-মায়ের কান্না দেখে। আমরা যখন ওঁদের বাড়ি গেলাম, ওঁরা আমাদের দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে চেনেন না, আমি পরিচয় দিয়েছিলাম, মুনিয়ার বাবার কলিগ। এবং অবশ্যই লালবাজার। তবে তার আগেই ওঁরা মুনিয়াকে আর আমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমরা বসি, চা খাই। তারপর কথা শুরু করে মুনিয়া, আমার শেখানো মতোই ও শান্তভাবে বলে, 'আপনারা আবার অংশুমানের বিয়ের ঠিক করছেন। আমি সেই প্রসঙ্গে কটা কথা আপনাদের বলতে এসেছি। অংশুমান শারীরিকভাবে সুস্থ নয়। ও আপনাদের কথায় বিয়ে করছে। প্রথম বারও করেছে। না করলে আপনারা কষ্ট পেতেন। তাই বিয়ে করেছে। আমি বিয়ের পর আপনার ছেলের কাছে যখন যাই, তখন ও আমাকে সবটা বলেছে। আপনারা হয়তো জানেন না, জানার কথাও নয়, আপনার ছেলের মেয়েদের প্রতি টান তৈরি হয় না। তার ছেলেদের প্রতিই টান। আপনাদের কাছে বলতে খুব খারাপ লাগছে, ওর ছোটোবেলা থেকে এই প্রবৃত্তিটা আছে। এটাকে হোমোসেক্সচুয়াল বিহেভিয়ার বলে। আমি আমেরিকায় অংশুকে ডাক্তার দেখাতে চেয়েছিলাম। অংশু রাজি হয়নি। তার কারণ, ওদেশে এটা কোনো অসুখ নয়, স্বাভাবিক।

যেটা আবার এদেশে অস্বাভাবিক। এখন অবশ্য খবরের কাগজে মাঝে মাঝে দেখবেন, এইসব নিয়ে খবর করে। ছেলে-ছেলে বিয়ে হচ্ছে। ওখানে ছেলে-ছেলে বিয়ে হয়, মেয়ে-মেয়ে বিয়ে হয়, একসঙ্গে থাকে। আপনার ছেলের আমেরিকাতে এরকম একজন পুরুষ-বন্ধু আছে। সে খুব ভালো। দীর্ঘদিন ওদের মধ্যে সম্পর্ক আছে। আমি তাকে চিনি। এই কারণেই আপনার ছেলের সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়। এছাড়া আমাদের দুজনের মধ্যে কোনোদিন কোনো গোলমাল হয়নি। আমরা খুব ভালো বন্ধু ছিলাম। এখনও আমার সঙ্গে ওর মাঝে মাঝেই ফোনে কথা হয়। আমি ওকে কাল ফোন করে এই বিয়ে করতে বারণ করেছিলাম। কিন্তু ও বলল—তাতে আপনারা কষ্ট পাবেন। আমি ওকে বলেছি, মানে আমি দায়িত্ব নিয়েছি, আজ ফোনে আপনাদের সব কথা শোনাব। শুধু আপনারা কোনো কথা বলবেন না।'

মুনিয়াকে ঠিক এই জায়গায় আমি থামাই। পরিষ্কার করে অংশুমানের বাবা-মাকে বলি—'আপনার ছেলে পুলিশের চোখে একজন ক্রিমিনাল। সে তার নিজের শারীরিক অসুস্থতা জেনেশুনে একজনকে বিয়ে করেছিল। পরে ডিভোর্স হয়। সে এখন আবার সেই কাজ করতে যাচ্ছে। এই কাজ আমরা করতে দেব না। ওকে অ্যারেস্ট করে জেল খাটাব। মুনিয়া লালবাজারে অংশুমানের নামে বিয়ের নামে প্রতারণা, তাকে এবং তাদের পরিবারকে ঠকানো, বিদেশে নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেলা, দাম্পত্যে অসহযোগিতা সহ অনেক অভিযোগ এনেছে। আমি তদন্ত করতে এসেছি। এখন তদন্তের স্বার্থে আমরা অংশুমানের নিজের মুখ থেকে সব কথা শুনতে চাই। তাই, মুনিয়া যখন কথা বলবে, আমরা কেউ কথা বলব না। একমাত্র মুনিয়াই কথা বলবে। কিন্তু আমরা অসাবধানতায় কথা বলে ফেলতে পারি। তাই এই ঘরে আপনাদের দুজনের মুখে মুনিয়া লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে দেবে। যাতে অংশুমান ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে যে আমরা ফোনের এপারে আছি, সেটা জানলে ও খুব কষ্ট পাবে। এমনকী সুইসাইডও করে ফেলতে পারে। আমরা কেউ অংশুর মৃত্যু চাই না। তাই মুনিয়া আপনাদের মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে দিক। আর যদি আপনারা না লাগাতে চান, তবে লাগাবেন না। কিন্তু আপনারা সামান্য একটা কথা থেকে কী ভয়ংকর বিপদ হতে পারে সেটার দায়িত্ব নিজেদের নিতে হবে।'

অংশমানের বাবা বললেন, তিনি কোনো কথা বলবেন না। আর মুখের লিউকোপ্লাস্টও লাগাবেন না।

অংশুমানের মা বললেন, তিনি মুখে কাপড় গুঁজে নিচ্ছেন। ঘড়িতে সাতটা পাঁচ। মুনিয়া অংশুমানকে ফোন করে। বলল—

—অংশু তাহলে কী ঠিক করলে, তুমি আবার বিয়ে করবে?

—আমি কী করি বলো তো? বাবা-মাকে এতদিন আটকে রেখেছিলাম, ওনারা আবার পাগলামি করছেন।

—অংশু তুমি বলে দাও, তুমি বিয়ে করতে পারবে না। তুমি সুস্থ নও।

—মুনিয়া, এটাই তোমাদের ভুল ধারণা। আমি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ। এটা তোমাদের ট্যাবু। এখানে একটি ছেলে আর একটি ছেলের সঙ্গে স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারে। ওটা তোমাদের ওখানে অসুস্থতার লক্ষণ। এখানে নয়।

—অংশু, তুমি যে মেয়েটিকে বিয়ে করছ, তার তো কোনো দোষ নেই। সে তোমাকে স্বামী হিসেবেই চাইবে। তুমি স্বামীর পুরো দায়িত্ব পালন করতে পারবে না।

—তাকে আমি সব দেব। প্রয়োজনে সে অন্য ছেলের সঙ্গে যদি ডেট করে, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি তো তোমাকেও এই অফার দিয়েছিলাম মুনিয়া।

—এভাবে কি হয় অংশু? প্রতিটা মেয়ের স্বপ্ন থাকে স্বামী-সন্তান। ঠিক আছে, তুমি নয় স্বামী সেজে থাকলে, কিন্তু সন্তান?

—দেখো সন্তান নিয়ে এত চিন্তার কিছু নেই। কারও সঙ্গে না শুয়েও তুমি মা হতে পারতে। এখানে স্পার্ম ব্যাংক আছে। তুমি চাইলে আমি তোমাকে ব্যবস্থা করে দিতাম। এছাড়াও অন্যের থেকে বাচ্চা কনসিভ করলেও আমার আপত্তি নেই। শুধু আমি কোনো মেয়ের সঙ্গে ফিজিকালি ইন্টিমেট হতে পারব না। কোনো মেয়ের সঙ্গে ইন্টারকোর্স চ্যাপ্টারটাও আমার জীবনে নেই। এটুকু ছেড়ে দিলেই হবে। আমি নিজের আত্মাকে রেপ করতে দেব না। মুনিয়া আমি অ্যালেক্সকে নিয়েই থাকব। আমি ওকে ভালোবাসি। দীর্ঘদিন তো আছি, আমাদের দুজনের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই।

ঠিক এইসময় অংশুর মা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ডুকরে ওঠেন। যা অংশুমানের শোনার কথা নয়। কিন্তু মুনিয়া প্ল্যানমাফিক অংশুমানকে বলে—আমি তোমাদের বাড়ি এসেছি। তোমার বাবা-মায়ের সামনে বসে ফোন করছি। আমার ফোন স্পিকারে। তোমার বাবা-মা তোমার সব কথা শুনেছে। তুমি কে, কী ব্যাপার, সব জেনে গেছে। অ্যালেক্স-এর কথাও বললে। এবার তুমি ঠিক করো কী করবে?

ফোনের ভেতর থেকে আর্তনাদ করে অংশুমান।—কী বলছ তুমি?

—আমি ঠিক বলছি। প্রয়োজন পড়লে তুমি ভিডিয়ো কল করো। আমি লালবাজারে তোমার নামে কমপ্লেনও লজ করেছি। এফআইআরে পরিষ্কার করে লিখে দিয়েছি, তুমি আর একজন মেয়ের সঙ্গে, তার পরিবারের সঙ্গে প্রতারণা করছ, এর সঙ্গে তোমার বাবা-মাও জড়িত। আশা করি আমি আমার সব অভিযোগ প্রমাণ করতে পারব। তুমি নয় মিথ্যে বলবে, কিন্তু তোমার বাবা-মা লালবাজারে গিয়ে গুছিয়ে মিথ্যে বলতে পারবেন তো? ওনারা এই মুহূর্ত থেকে পুরো ব্যাপারটা জানলেন। আমি ওনাদের নামেও ডায়েরি করেছি।

—না, না, তুমি এটা করতে পার না!

—কে বলল, পারি না। নাও, তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলো। দুজনেই চুপ করে আছে।

মুনিয়া বলল, 'নিন, ছেলেকে বলে দিন, আপনাদের কাছে আমি বসে আছি, আপনারা সব শুনেছেন।'

অংশুমানের বাবা ঢোক গেলেন। আমি বলি—লালবাজারে ফ্রড সেকশান থেকে আমি ধূমকেতু রাহা এসেছিলাম কেসটা ইনভেস্টিগেট করতে। আমাদের সামনেই আপনার বাবা-মা বসে। আপনি ওনাদের সঙ্গে কথা বলুন। ওনারা কথা বলতে চাইছেন।

ফোনের ওপার থেকে অংশুমান ডুকরে কেঁদে ওঠে। অংশুমানের মাও খুব জোরে কেঁদে ওঠেন। অংশুমানের বাবা কান্না চাপতে চাপতে বলেন—আজই আমরা বিয়ে ক্যানসেল করে দিচ্ছি। তুই আর এখানে আসবি না।

মুনিয়া গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে, বলে, 'অংশু আমি লাইন কেটে দিচ্ছি। এবার তুমি আর তোমার বাবা-মা ঠিক করে নাও, কীভাবে তিনজনে জেলে গিয়ে ঘানি টানবে। আমি চলে যাচ্ছি, টা টা, বাবা-মাকে কষ্ট দিতে চাওনি, তাই আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ। আমাকে কষ্ট দিয়েছ। আমি সেই কষ্ট তোমাদের ফিরিয়ে দিলাম। আমার আর কোনো আপশোশ নেই। তুমি অ্যালেক্সকে নিয়ে এসো। তোমার বাবা-মা দেখুক, তাদের একমাত্র ছেলের বউয়ের কী সুন্দর সোনালি দাড়ি। পারলে অ্যালেক্সের সঙ্গেই ওরা ঘটা করে বিয়ে দিক।

অংশুমান ফোনের ওপার থেকে শান্ত গলায় বলল, তুমি তোমার নোংরা বাবার গল্প আমাকে বলেছিলে। বলেছিলে—তোমার সাহস থাকলে তোমার বাবাকে খুন করতে। তুমি সাহসের অভাবে তোমার বাবাকে মারতে পারনি, কিন্তু আজ আমার বাবা-মাকে খুন করে রেখে গেলে। আমি তোমায় ছাড়ব না।

—থ্যাংকু অংশু, আমার কষ্ট আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। আজ আমার আনন্দ করার দিন। চলি।

ফোন অফ করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পিছনে শুনলাম হাহাকার করে অংশুমানের মা কাঁদছে।

বাইরে বেরিয়ে গাড়িতে বসে কেঁদে উঠল মুনিয়া। অংশুর বাবা-মা বড্ড ভালো মানুষ, আমি ওঁদের কষ্ট দিতে চাইনি। কিন্তু আর কিছু আমার করার ছিল না।

গাড়ি নিয়ে বেশ কিছুটা আসার পর মুনিয়া শান্ত হল। তখনই আমি মুনিয়াকে বললাম, 'তৃতীয় খুনটার হদিশ আমি করে ফেলেছি। তোমার বাবা তো চার মাস আগে মারা গেছেন। তাঁকে কী ভাবে মারলে?'

মুনিয়ার দু-চোখে জল, কিন্তু হেসে উঠল।

আমি একটা সিগারেট বের করে একটা নিজের ঠোঁটে, আর একটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। বললাম, 'আগুন দাও। আর শুরু করো—অমন একটা জাঁদরেল, দোর্দণ্ড পুলিশ অফিসার বাবাকে কীভাবে মারলে?'

মুনিয়া চিৎকার করে কবিতা বলছে—

আমার গাড়ির স্পিড বাড়ছে, ভেতর ভেতর কেমন যেন অস্থির

অস্থির লাগছে। বললাম, 'বলো মুনিয়া, দীনেশ সান্যালকে মারলে কীভাবে?'

মুনিয়া কবিতা উড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়।

আমি আবার বললাম, 'দীনেশ সান্যাল—সাদা বাঘ! তুমি কীভাবে সাদা বাঘ শিকার করলে? আমি শিকারের গল্প শুনতে চাই।'

তেরো

হো হো করে হাসছে মুনিয়া। মাথার ওপর দু-হাতে তালি দিচ্ছে। ওর আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখে হঠাৎ আমার মনে হল, আমি কি তৃতীয়জনের নামটা ভুল বললাম? গুরুর এই পরাজয়ে কি ওর এত খুশির কারণ? গাড়ির গতি বাড়িয়ে বাড়ি ফিরলাম। বোতল তুলে মদ ঢাললাম গলায়। মুনিয়াও আজ বোতল থেকে মদ খেল।

বিড়বিড় করলাম—দীনেশ সান্যাল।

মুনিয়া চিৎকার করল—আমার বাপ! আমার জন্মদাতা বাপ! তোমাদের সাদা বাঘ!

আমি বললাম, 'আমি ভুল বলিনি। তোমার তৃতীয় শিকার তোমার বাবা, দীনেশ সান্যাল।'

হো হো করে আবার হাসিতে ফেটে পড়ল মুনিয়া। 'ভুল কেন বলবে দ্রোণাচার্য? তুমি কি ভুল বলতে পারো? একদম ঠিক। তৃতীয়জন আমার বাবা।'

'কেন মারলে?'

'ওই লোকটার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। কিন্তু ওপরওয়ালা ঘেন্নায় মালটাকে তুলে নিচ্ছে না। আমি একটা সিঁড়ি শুধু ওর কাছে এগিয়ে দিলাম, তরতর করে ওই লোকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল!'

'আমি সিঁড়ির কথা জানতে চাইছি।'

মুনিয়া শান্ত হয়ে বসল,—

'বাবাকে মারার প্ল্যান ছিল। সেই ছোটোবেলা থেকে ভাবতাম, একদিন না একদিন ওই রাক্ষসটাকে মারব। যেভাবেই হোক রাক্ষসটাকে বধ করব। তারপর রাক্ষসই একদিন তোমার কথা বলল। তোমার প্ল্যানগুলো বলল। আমি তারমধ্যে থেকে রাক্ষসের জন্য অসীমানন্দের প্ল্যানটা বেছে নিলাম।'

আমি মুনিয়ার দিকে তাকিয়ে আছি। ও সোফার ওপর পা গুটিয়ে বসে। স্থির, শান্ত! একমাথা এলমেলো চুল। চুলগুলো অশান্ত। কিছুক্ষণ আগে অশান্ত মুনিয়া আমার সঙ্গে ওই বিছানায় শুয়েছিল। তখন ও ভয়ংকর অশান্ত ছিল। বিছানায় মুনিয়ার সঙ্গে তাল মেলানো কঠিন। অনেক সময় আমি হাঁপিয়ে যাই। মুনিয়া তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা! 'আমি তোমাকে আদর করতে হেল্প করব। কিন্তু কখনো তুমি ওষুধ খাবে না। কক্ষনো না। আমি বাবাকে ওষুধ দিতাম। যৌবনউদ্দীপক। যৌনক্ষমতা বৃদ্ধি। সিলডেনাফিল।'

শান্ত মুনিয়া মাথা নীচু করে বসে।

'আমার থেকে ভাই চার বছরের ছোটো। খুব শান্ত ছিলাম আমরা দুজনেই। কখনো মাকে জ্বালাতন করতাম না। একবাটি মুড়ি দিলে ভাই চুপ করে বসে খেত। আর আমি ওর পড়ে যাওয়া, উড়ে যাওয়া মুড়ি কুড়িয়ে দিতাম। কিন্তু বাবা এলেই আমাদের শান্তির সংসারে অশান্তি শুরু হত। এই অশান্তি করত একজন—দীনেশ সান্যাল। সকাল থেকে শুরু হত বহু রকম রান্নার পাট। তিনরকম শাক, পাঁচরকম মাছ, মাংসের মেলা বসত। দুপুর থেকেই বন্ধুবান্ধব আসত, শুরু হত মোচ্ছব। তখন বাড়ির একতলা হয়ে যেত রান্নাঘর আর দোতলা হয়ে যেত শুঁড়িখানা। ওপর থেকে হাঁক আসত, জল দাও, মাছ দাও, লঙ্কা-পেঁয়াজ দাও। মা রান্না করতে করতে পড়িমরি করে দোতলায় দৌড়াত। মাঝে মাঝে কাজের মহিলা রাখত। কিন্তু তারা এই উৎপাতে থাকতে চাইত না। বাবা এবং বাবার বন্ধুরা অবলীলায় তাদের গায়ে হাত দিত, টেনে নিয়ে কোলে বসাত। তার ভয়ে-আতঙ্কে কাউকে কিছু না বলে কাজ ছেড়ে দিত। অবশ্য কাউকে কিছু বলে হবে না তারা জানত। আমার বাবা ছিল নামী-দামি পুলিশ অফিসার। নেতা-মন্ত্রীরাও বাবাকে চিনত। কত দরকারে তারা আলো লাগানো গাড়ি নিয়ে আমাদের বাড়ি আসত। বাবার নামে তখন এই এলাকায় বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। ফি সপ্তাহেই বাবা আসত।

বাবাকে দেখে ভাই খুব ভয় পেত। বাবা ওকে দেখলেই ছুড়ে দিত বিছানায়। বলত, তোমার এটা ছেলে, না মেয়ে! এমন ভয় পায় কেন! ওর ভয় কাটাতে হবে। ওকে একবার দিঘা বা পুরীতে নিয়ে যেতে হবে। সমুদ্রেব জলে চুবিয়ে, লোনা জল গিলিয়ে ওর ভয় কাটাতে হবে। আমরা ছোটোবেলা থেকে জানতাম দিঘা বা পুরী মানে একটা ভয়ানক জায়গা, সেখানে গেলে আমাদের জন্য ভয়ংকর শাস্তি অপেক্ষা করে আছে।

তার আগে দিনের পর দিন ভাই দেখেছে, আকণ্ঠ মদ খেয়ে বাবা নীচে নেমে এসেছে। একতলার একটা ঘরে আমরা দু-ভাই-বোন গুটিশুটি মেরে পড়ে আছি। বাবা নীচে নেমে মাকে টেনে নিয়ে আসত সেই ঘরে। আমাদের দুর দুর করে তাড়াত, তারমধ্যেই কামতাড়িত বাবা চিত করে ফেলেছে আমার মাকে বিছানায়। ভাই কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যেতে চাইত মায়ের কাছে। আমি তাকে জোর করে টেনে নিতে যেতে চাইতাম বাইরের উঠোনে। বাবা বলত, ওকে ছেড়ে দে মুনিয়া, ও বাচ্চা, ও কিছু বুঝবে না। মা কাতর গলায় বলত, 'যা, যা, তোরা উঠোনে যা। উঠোনে গিয়ে খেল।' বাবা হা হা করে হাসত, বলত, 'তোরা উঠোনে গিয়ে খেল। আমরা দুজনে এখানে একটু খেলে নিই।'

আমরা দু-ভাইবোন নীচে এসে উঠোনের আমগাছের তলায় ঠায় বসে থাকতাম। আমি ভাইকে লাল পিঁপড়েদের চলাচল দেখাতাম। আমার দু-চোখ বেয়ে দরদর করে জল পড়ত। অপেক্ষা করতাম মা কখন আসবে। ভাই একটু বড়ো হয়ে সব বুঝতে পেরেছিল। আমাদের এমনও দিন গেছে, বাবা বাড়িতে অন্য মহিলা নিয়ে এসেছে। তারপর মা আমাদের দু-ভাইবোনকে নিয়ে ছাদে উঠে জড়িয়ে ধরে বসে থেকেছে। নীচে-ওপরে বাবার বন্ধুবান্ধবদের উল্লাস। মাসে দু-একদিন, বাবা বাড়ি এলেই আমাদের খারাপ থাকা শুরু হত। আমি শান্ত ছিলাম, কিন্তু সাহসী ছিলাম। বাবা একবার আমাকে ছুড়ে দেবে বলে তুলেছিল, আমি শূন্যে উঠে বাবার হাত কামড়ে দিয়েছিলাম। বাবা আমাকে ছেড়েছিল, আমিও বাবার হাত থেকে এক খাবলা মাংস নিয়ে নীচে নেমেছিলাম। তবু আমি শান্ত ছিলাম। সেদিন যা করেছিলাম, সেটা হয়তো ভয় পেয়ে করেছিলাম। যেমন ভাবে ভয় পেয়ে পশু-পাখি

কামড়ায়। দেখো, আমার বাবা সারা জীবন নারী আর নেশায় ডুবেছিল। সেই নারী কখনো আমার মা। কখনো দেখেছি, বাইরের মহিলা। তাঁর যে কেউ হতে পারে। খিদের মুখেও মানুষের পছন্দ-অপছন্দ থাকে। কিন্তু আমার বাবার বাই চাগাড় দিলে, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে যেত। আমাদের সামনেই আমার মাকে কুকুর-বেড়ালের মতো ঘরের বিছানায় টেনে নিয়ে যেত। আমার বাবা একজন রেপিস্ট ছাড়া আর কিছু না। এই আমার বাবা। এই বাবার যে শত্রু সেই আমার মিত্র।'

'তোমার থেকেও তোমার বাবাকে আমি অনেক অনেক বেশি জানি। যা জানি না সেটা বলো—। খুনটা কীভাবে করলে?'

'সিম্পল। খুব সিম্পল। ওর তাসেই ওকে বাজিমাত করলাম!'

'কী করে সেটাই আমি জানতে চাই।'

'চাকরি থেকে রিটেয়ার হবার মুখে লোকটা অসুস্থ হয়ে পড়ল। এদিকে আমি স্বামী ছেড়ে ফিরে এসেছি বিদেশ থেকে। একটা চাকরির জন্যে এখানে-সেখানে ইন্টারভিউ দিচ্ছি। একটা চাকরি পেয়ে গেলাম প্রাইভেট কলেজে। বাড়িতে অসুস্থ বাবা। মা দিনরাত তার সেবা করছে। অসুস্থ হয়ে বাবা বাড়িতে ঢুকতেই ভাই চলে গেছে ওর চাকরির জায়গায়। সপ্তাহে সপ্তাহে মাকে চোখের দেখা দেখতে একবার বাড়ি যায়। আমি বাড়ি থেকে চলে এসে ভাড়াবাড়িতে আছি। আমি শনিবার যাই, একরাত থেকে ফিরে আসি। বাবাকে দেখার জন্য দু-বেলা দুজন মহিলাকে রেখেছি। নার্স নয়, আয়া, কিন্তু তারা হাসপাতালের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকার জন্য ওষুধ দিতে পারে, ইঞ্জেকশনও দিতে পারে। এমনই একদিন বাড়ি গেছি সেই আয়া মহিলাটি বলল, দিদি তোমার বাবা কাল রাতে যে মহিলাটি আসে তাকে টানাটানি করেছে। সে আজ থেকে আসবে না। সে আরও বলল, দিদি আমার সঙ্গে যদি এমন করে আমি কিন্তু ফেলে পালাব। আমি তাকে বললাম, তোমরা চলে গেলে মা বড়ো বিপদে পড়ে যাবে। দয়া করে তুমি যেও না। তেমন কিছু করলে এক ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে, পা ভাঙুক, কোমর ভাঙুক—ঠিক হবে। সে ভয়ার্ত গলায় বলল, উনি পুলিশের বড়োবাবু। শুনেছি ক-দিন আগেও নাকি ওঁর নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত। ও আমার দ্বারা হবে না। তুমি বরং রুবিকে রাখো। ওর স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়। শুনেছি, অনেক পেশেন্ট পার্টির সঙ্গেই ওর দহরম মহরম। আমি বললাম, তুমি রুবিকে বলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। রুবি এল, বলল, কোনো চিন্তা করতে হবে না, আমি আছি। রুবিই থাকল। দু-সপ্তাহ পর একদিন রুবি বলল, তোমার বাবার খুব রস দিদি। পারে না, কিন্তু ইচ্ছে ষোলোআনা! সেদিন আমাকে বলে, যা ওষুধ কিনে নিয়ে আয়। কী অসভ্য! একটা কাগজে আবার ওষুধের নামটা আমাকে দিয়ে লিখিয়েছে। আমি বললাম, সেই ওষুধ কি তুমি এনেছ? রুবি জিভ কাটল, ও দিদি ওই ওষুধ খাওয়ালে আর দেখতে হবে না, বুড়ো নির্ঘাত আমার ওপর বা তোমার মায়ের ওপর চড়বে। আমি বললাম, দেখি কী ওষুধ? দেখলাম সিলডেনাফিল গ্রুপের ওষুধ, জাস্ট লাইক ভায়াগ্রা। আমি কাগজটা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে দিলাম। বললাম, ভগ্যিস ওষুধটা কিনে খাওয়াওনি। খেলে কী যে হত। রুবি হাসল, বলল, ও দিদি এরকম কত পেশেন্ট আমি সামলেছি। তোমার বাবা তো অনেক ভালো। আমার এক বুড়ো ঢ্যামনা পেশেন্ট ছিল, যে ব্লাউজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে তবে মুখের ভাত পেটে চালান করত। মাইয়ে না হাত দিতে দিলে ভাতই খেত না। আমি ফিরে এলাম, ইন্টারনেটে দেখলাম—ওই ওষুধের সাইড এফেক্ট মারাত্মক। যে কোনো সময় রক্তচাপ বেড়ে হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত হতে পারে। পরিচিত এক ডাক্তার বন্ধুকে ফোন করে আরও ডিটেলস জানলাম। তাকে বললাম, আমার হাজবেন্ড এই ওষুধ খায়। সে বলল, ইমিডিয়েট বন্ধ করতে বলো। নইলে যে কোনোদিন বিপদ ঘটে যাবে। সব শুনে আমি সেই ওষুধ কিনলাম এক পাতা। রুবিকে বললাম, উনি যে ওষুধটা লিখে দিয়েছেন, সেটা এনেছি, সপ্তাহে একটা করে খাওয়াবে। আর খাটের সঙ্গে হাত-পা বেঁধে রাখবে। তুমি পারবে? রুবি বলল, খুব পারব। এরপর প্রতি শনিবার একটা করে ওষুধ খাইয়ে খাটের সঙ্গে হাত-পা বেঁধে রাখা হত। উনি কামতাড়িত হয়ে, বিছানায় গোঁ গোঁ আওয়াজ করে রুবিকে ডাকতেন। মাকে ডাকতেন। শুনতাম। আমার ভেতর বলির বাজনা বাজত। এই ওষুধ খেয়ে কত মেয়ের উনি সর্বনাশ করেছেন, ওই ওষুধ তখন একটু একটু করে ওঁকে মরণের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আমার খুব মজা হচ্ছিল। এক শনিবার রুবি ওঁর হাত-পা বেঁধে একটা ওষুধ খাইয়ে চলে গেল। উনি শুয়ে শুয়ে গোঁ গোঁ করছিলেন, আমি একরাশ ঘেন্না নিয়ে ওঁর কাছে গেলাম। বললাম, এমন করছ কেন? বললেন, রুবি ফি শনিবার কী একটা ওষুধ খাওয়াচ্ছে, ওই ওষুধটা খেলে আমার খুব কষ্ট হয়। ওষুধটা দিতে ওকে বারণ কর। আমি বললাম, ওষুধটা তুমি লিখে দিয়েছ রুবিকে। এটা কোনো ডাক্তারের ওষুধ নয়। শুনে বললেন, না, না, ওই ওষুধ আর আমি খাব না। তোর মাকে একবার আমাকে কাছে ডেকে দে। বল, আমি ডাকছি। আমি বললাম, মা আসবে না। আমার কথা শুনে উনি একটা নোংরা খিস্তি দিলেন। আমি বললাম, আমি তোমাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি, ঘুমিয়ে পড়ো। উনি রাজি হয়ে গেলেন। আমি তখন ঘেন্নায় গা-হাত-পা জ্বলছে। আমি আবার ওই ওষুধ আর একটা দিয়ে দিলাম। ওষুধটা দিয়ে ওঁর দু-হাতের বাঁধন খুলে দিলাম। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। দেখলাম, সারারাত ধরে ছটফট করছেন। সকালে দেখলাম মরে পড়ে আছেন। ডাক্তার আমার খুব পরিচিত। তার হয়তো একটু অস্বাভাবিক লেগেছিল, কিন্তু অসুস্থ মানুষের মরণ স্বাভাবিকই ঘটনা। ঝামেলা মিটে গেল।'

আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম।—'তুমি ঘুমাও।'

মুনিয়া বলল, 'হ্যাঁ,আমি আজ একটু শান্তিতে ঘুমাব। আমার আর কারও প্রতি শত্রুতা নেই।'

টং করে মুনিয়ার মোবাইলে একটা মেসেজ ঢুকল। মেসেজ খুলে মুনিয়া হাসল, বলল, 'অংশুমান। অংশু লিখেছে—ও খুব তাড়াতাড়ি ফিরছে। আমাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছে।'

আমি আলগোছে মুনিয়াকে বুকের ভেতর টেনে নিলাম।

মুনিয়া হাসল, 'আমি রেডি! কাম অন অংশু!' ❖

গল্প

ক্ষণজন্মা

নলিনী বেরা

ছবি : শৈবাল দত্ত

বৃষ্টি?

জানলাটা হাট করে খুলে ফেলি। বৃষ্টি কোথা? বেশ ঝকঝকে ভোর। পুকুরঘাটে রমলা আর যোগমায়া দাঁড়িয়ে।

জানলা খোলার শব্দে তারা পেছন ঘুরে দেখল বড়োজোর। ব্যস, ওই পর্যন্তই। আর বিশেষ আমল দিল না। ঠিকে-ঝি যোগমায়া খালি যা পিঠের উপর পিছলে পড়া আঁচলটা মাথার উপর টেনে দিল।

এখন প্রেক্ষাপট আর সেই দুই রমণীর দাঁড়ানোর ভঙ্গি প্রসঙ্গে জরুরি কিছু কথা বলতেই হয়।

জানলা—লোহার গরাদওয়ালা। তারপর রক। বেশ চওড়া আর চকচকে। যদিও পুরোটা এখন চোখে আসছে না।

তারপরই মাঠ একফালি। ছাড়া ছাড়া দুটি নারকেল গাছ। সুপারি গাছ দুটি। একটা পেয়ারা, পুকুরের পাড় বরাবর একটা আমগাছ। তার দুয়েকটা ডাল এখন পুকুরের জল ছুঁই-ছুঁই—

আরও কতক এতোল-বেতোল লতাগুল্ম। মোটামুটি এই।

সেখানে এখন সেই দুজন রমণী। তাদের বাঁ-দিকে পুকুরের ঘাট। ঘাটে গুচ্ছের এঁটো বাসন জড়ো করা। যোগমায়া মাজতে মাজতে উঠে গেছে। তার হাতে এখনও লেগে থাকা শুকনো সাদাটে ছাই।

আর পুকুরের জল। আঁজলায় তুলে দেখলে মনে হবে সবুজ রঙের। তার উপর বাতাস হিল হিল করে খেলে বেড়াচ্ছে।

বাতাস কি? মাছ। বড়ো বড়ো ডেকচিতে বাঁকে করে নিয়ে আসা মীন, পোনা। পুকুরটা লিজ নিয়ে মহিন্দর জেলেই ছেড়েছে। সেই সঙ্গে বালতি ভরে কিছু কচুরিপানাও ঢেলে গেছে।

নাকি কচুরিপানায় মাছ ঝাড়ে-বংশে বৃদ্ধি পায়। মাছ কতটা গায়ে-গতরে বেড়েছে—সে তো মাছমারা মহিন্দরাই জানে। তবে এর মধ্যেই কচুরিপানার দঙ্গলে নীল নীল ফুল ফুটেছে।

নীলাভ পুষ্পদলে সঙ্গোপনে কি একটা টুরি ব্যাং আচমকা ডেকে উঠল? হ্যাঁ, ওই তো ডাকছে। একবার, দুবার—

তার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে একটা কাদাখোঁচা, না ডাহুক কচুরিপানার উপর লম্বা লম্বা পা ফেলে স স করে হেঁটে, হেঁটে কি প্রায় উড়েই ঝোপঝাড়ের ভিতর ঢুকে গেল।

ঈশান-অগ্নি-নৈর্ঋত-বায়ু। চারিদিকেই তো কচুবন, উলুরি-ঝুলুরি লৈ লতি। ওদিকটা বোধকরি অগ্নিকোণই হবে। দুই রমণীর চোখ কেন যে এখন ওইদিকে!

রমলা আমার বউ, হলদে ছাপাশাড়ি। কাল রাতেও ও ওটাই পরেছিল। পিঠের উপর খোঁপা ভেঙে আছড়ে পড়ে আছে। তারমানে ঘুম থেকে উঠেই—

এখন তার হাতদুটো যেন বুকের উপর আড়াআড়ি ভাঁজ করা। নাকি এক হাত দিয়ে আরেক হাতের কনুই খুঁটছে রমলা? জানলা খোলাইস্তক তাকে দু-দুবার হাই তুলতেও দেখেছি।

আর যোগমায়া। তার ছাইমাখা একহাত কোমরে, আরেক হাত আঁচল টেনে ধরে মুখে চেপে রেখেছে। দৃশ্যত ও কার্যত তার কোমর কিঞ্চিৎ ডানদিকে হেলে আছে।

এমতই দৃশ্যপট বাঁধা।

আস্তে আস্তে আরেকটা ছবিও স্পষ্ট হচ্ছে। পুবদিকের পাড়বরাবর কচুবনের ভিতর দিয়ে গুটিকতক হাঁস চই চই করে এঁকেবেঁকে ভেসে যাচ্ছে। যেন কেউ তাদের পিছন থেকে তাড়া দিচ্ছে—

—ধত্তরে! ধত্তরে!

ঠিক তাই। পাশের বাড়ির ঠিকে-ঝি হাঁসগুলোর পিছন পিছন যাচ্ছে।

—আরেকটু, আ-রে-ক-টু যাও, অ মেনকাদি!

বলেই যোগমায়া এধার থেকে হাত-পা সমানে ঝেড়ে যাচ্ছে।

—ভয়েই ম'লো আর কি! আরেকটু যাও দিনি। অত ভয়ডরের কী আছে?

মেনকাকে সাহস জুগিয়ে এসময় যোগমায়া যেন পিছন ঘুরে এক পলক দেখেও নিল আমাকে।

ততক্ষণে উঠে বসে আছি আমি। রমলার কিন্তু নড়নচড়ন নট। চোখে যেন অপার কৌতূহল। এসময় অবধারিতভাবেই আরেকটা হাই তুলল ও।

মেনকা দু-হাতে কচুবন চিরে চিরে যাচ্ছে—

—কই বাপু, চোখে ত কিছু আসছে নি গ'?

—ওখেনে কি, ওখেনে কি! আরেকটু যাও, যেয়ে ডানহাতি ডানহাতি—

যোগমায়া ঝাঁজিয়ে উঠে আঙুল তুলে তুলে দেখাচ্ছে।

—যোগমায়া, কী হচ্ছে কী,—আস্তে বল।

বলেই রমলা ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখল একবার। আমি তো এখনও মূর্তিমান বসে আছি মশারির ভিতর।

ঠোঁটটা একটু বেঁকে গেল কি রমলার? তারমানে রমলা হাসছে?

—অ মেনকাদি, দেখতে পাচ্ছ নি? চোখে কি ন্যাবা তোমার?

বলেই যোগমায়া তার যৎকিঞ্চিৎ ভালো হাতটা দিয়ে রমলার বাহুমূলে ঠোক্কর দিয়ে বলল—

—বুড়ি কির'ম অজায়গায় টুঁড়ে মরচে দ্যাখদিনি! ডানহাতি—ডানহাতি, আ মলো, ডান-বাঁও বুঝো না! যে হাতে ভাত খাও—সেই দিকটায় খুঁজোদিনি, অ মেনকাদি?

মশারির ভিতর নিজের ডানহাতটাই তুলে বসে আছি। ভ্রম বুঝতে পেরে গুমরে গুমরে হাসছি। মেনকা ততক্ষণে জিনিসটাকে চোখের হাবড়ে নির্ঘাত এনে ফেলেছে।

ওই, ওই তো "আহা রে" "চুঃ চুঃ" করে হা-হুতোশের আওয়াজ পাচ্ছি মেনকার মুখ থেকে!

তাই তো! কী জিনিস?

উদ্বিগ্ন হয়ে রমলাও জিজ্ঞাসা করল—

—সত্যিই?

—হেঁ গো, বউদিমণি! কী মোটাসোটা, আর—

—অ্যাঁ, কচুবনে? মোটাসোটা, কী? কী জিনিস?

চোখ রগড়াতে রগড়াতে মাঠে এসেই রমলাকে জিজ্ঞাসা করলাম। শুনে যোগমায়া মুহূর্তেই ফরকে গিয়ে ঘাটে বসে বাসন মাজতে শুরু করল। রমলা চোখ বড়ো বড়ো করে আমাকে ধমকে উঠল—

—তুমি পুরুষমানুষ, মেয়েদের কথায় আসা কেন?

—যা বাব্বা!

ঘরে এসেও স্বস্তি নেই। ছটফট করছি। 'হোয়াট ইজ দেয়ার ইন দ্য কচুবন?'

—রমলা, প্লিজ!

ভুরুজোড়া ধনুকের মতো বাঁকিয়ে—

—তোমার অত ছটফটানি বাই কেন?

—জানতে চাইছি, বলবে। বেশ।

—বলব না। যাও।

একবার ভাবলাম যোগমায়াকেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করি। 'হ্যাঁ গো মেয়ে, কী দেখলে বলো তো?'

কাজটা খুব খারাপ দেখাবে। ভয়ানক রেগে যেতেও পারে রমলা।

চায়ের সময়। কাপে চা ঢেলে—

—খাও!

—যাঃ চিনিই হয়নি!

—আসলে আজ রুচিটাই বদলে গেছে তোমার।

বলেই হাসি।

—দোহাই রমলা! আর খেলিও না।

—'আমি তোমাকে খেলাচ্ছি?

সেই ভ্রূ-ভঙ্গি!

—যাও তো যাও! বলতে হবে না।

বলেই রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে কালীবাবুর বাজার। তাহলে বেশ মজাই পেয়েছে রমলা।

বাজার ফেরত তাঁর বাড়ির সামনে অনিলমেসোর সঙ্গে দেখা। নাতিকে কোলে নিয়ে ঘুরছেন উঠোনে।

—আয় একটু বসে যা!

—পরে আসব, মেসো।

—আয় না। শুচি এসেছে। চা-টাও খাবি।

শুচি মানে শুচিস্মিতা। টাটা না জাহালদা, কোথায় যেন বিয়ে হয়েছে! সিঁড়ির মুখেই দেখা।

—কী রে! কেমন আছিস?

—ভালো।

—আর তোর বর?

ছেলেকে মেসোর কোল থেকে নিতে নিতে বলল—

—হ্যাঁ, ভালো। ভালোই তো।

আমার দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে শুচি—

—বাজারের ব্যাগ হাতে! কেমন যেন কত্তা কত্তা টাইপের!

পিছন থেকে মাসিমা বলে উঠল—

—কত্তাই তো শুচি। কত্তা না? হ্যাঁ রে, এত বেলায় বাজার! আপিস যাবি না?

—আর আপিস! যা ঝামেলা সেই সকাল থেকে! পুকুরপাড়ে কচুবনে কী যে ফেলে গেছে—

কথাটা ঝট করে বলে ফেললাম। বলেই মনে হল বলাটা ঠিক হল না। ধুউস্! মেয়েদের ব্যাপার। ওতে আমার কী!

ভাবছি বটে। ভেবে ভেবেও শান্তি আসছে না। কচুবনের ভিতর সেই—, সেই ব্যাপারটা। অহরহ পিন ফোটাচ্ছে। না জানি এতক্ষণে আরও কত কী—

ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, রান্নাঘর থেকে পিসির গলা—

—আজ বেরুসনি?

—না, শরীরটা ভালো নেই। ভাবছি আজ আর যাব না। একবার আমাকে একবার রমলাকে দেখে পিসি বলল—

—তবে যাসনে। ওয়েদার বদলাচ্ছে, অসুখবিসুখ তো হতেই পারে।

বলেই যেতে যেতে ফিরে এসে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে যেন রমলাকে বলল—

—বউমা, ফের বলচি, পেটে তোমার নারাণ, এখন ও-সব পাপ তুমি দ্যাখো না!

পাপ? চমকে উঠলাম। পুকুরপাড়ে কচুবনের ভিতর যে জিনিসটা পড়ে, পিসি তাকেই কি তবে 'পাপ' বলছে?

এসময়ই পাশের বাড়ির দোতলা থেকে নমিতা বউদি ডাক দিল রমলাকে। তড়িঘড়ি যেতে যেতে রমলা আমাকে বলে গেল—

—ডাল বসিয়েছি, ডালটা একটু দ্যাখো তো!

আমি উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাল দেখছি। ডাল দেখছি বটে, কানদুটো পড় আছে দুই রমণীর কথায়।

আমার এখন সেই নিউটনের দশা—ডিম না ঘড়ি সেদ্ধ? কথা শুনব না কড়াইয়ে ফুটন্ত ডাল দেখব?

এক রমণী বলল, "ন-দশ পাউন্ডের হবে। যা মোটা না!" আরেক রমণী কহিল, "কী নিষ্ঠুর! কাপড়ের পোঁটলায় বেঁধে ছুড়ে ফেলেছে!"

দুই রমণীর কথান্তরে উপর্যুপরি উচ্চারিত হয়ে চলল 'মহাপাপ', 'পাপিষ্ঠা', 'নিষ্ঠুর', 'শখের মুয়ে আগ্গুন' ইত্যাকার কথাগুলো।

—যাঃ কাছে দাঁড়িয়ে থেকেও পুড়িয়ে ফেললে? আচ্ছাই লোক তো যাহোক!

রমলার কথায় হুঁশ ফিরলে দেখি—সত্যি সত্যিই ডালটা ধরে যাচ্ছে! রাগ হল, প্রচণ্ড রাগ নিজের উপর। কোথায় কী কচুবনে কচু না মচু—

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আজকের কাগজ দেখছি। মন কি আর বসে? সেই তো এক চিন্তা—কখন সে আসে—

সে আসে ধীরে। আঁচলে ভেজা হাতদুটো মুছতে মুছতে। ঠোঁটের একদিকটায় দাঁতে-টেপা-হাসি।

—হাসছ?

—কাগজে দিয়েছে বুঝি?

—কী?

—পুকুরপাড়ে কচুবনের ভিতর—

ঘোড়েল মেয়ে। এখনও খেলাচ্ছে। আমিও কাগজে ডুবে থাকার ভান করলাম। ও ফিস ফিস করে বলল—

—শুনবে?

—কী?

—কচুবনের ব্যাপারটা?

—না, থাক।

বলেই উঠতে যাচ্ছিলাম। রমলা ভেঙে পড়ে বলল—

—কী নির্দয়, না? ভাবতেও ঘেন্না হয়।

আরও অনেক কিছুই বলল রমলা। আশ্চর্য! আমিও তো কখন থেকে সমানে বলে চলেছি—'মহাপাপ' 'পাপিষ্ঠা' 'নিষ্ঠুর'—

অথচ আসল ব্যাপারটা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই। রমলা তো ভাঙেনি।

।। দুই।।

ফের জানলাটা খুললাম।

দু-চারটা ফড়িং কচুবনের মাথায়। দেদার উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু-চারজন লোকও রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আসছে।

চাবির গোছা হাতে একজন এইমাত্র গেল। তার পিছনে আরও দুজন—

লোক দুটো কচুবন চিরে চিরে জিনিসটা দেখল। দেখতে দেখতে একজন হো হো করে হেসে উঠল। আরেকজন নাকে
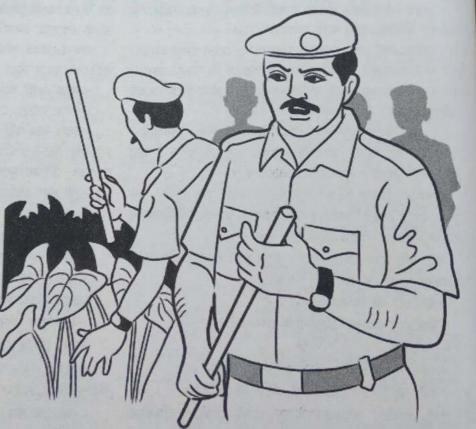
তারা একহাতের লাঠি আরেক হাতে ঠুকে যাচ্ছে।

রুমাল চাপল। যেন এরচেয়ে নারকীয় আর দুটো নেই। খবর পেয়ে তারা দেখে গেল এই যা।

দু-দশ মিনিট বাদে দেখতে এল কতিপয় চ্যাঙড়া ছেলের দল। একটা মজার খেলার জিনিস যেন তারা পেয়ে গেছে। খুউব হাসল, হইচই করল। করে পাড়ার লোকেদের দৃষ্টি কেড়ে নিল দু-দণ্ড।

তারপর লম্বা লাঠি দিয়ে পোঁটলাটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রায় জলের কিনারে ঠেলে দিল। এখন মাত্র দু-তিনটে কচুগাছের গুঁড়িতে লটকে আছে জিনিসটা!

পুকুরের এপাড় থেকে এখন সবকিছুই পষ্টাপষ্টি দেখা যাচ্ছে। যেন আমাদের চোখে আঙুল গুঁজে দেখিয়ে দিয়ে গেল তারা।

ফের জানলাটা বন্ধ করলাম। বিদায় কচুবন! আর তোমাকে দেখব না। বেলাও ঢের হল। স্নানটা এবার সেরে নিই। সেই ভেবে তেল মাখতে শুরু করলাম।

রমলা "ছি ছি, মা আবার তোকে বলছি ভুলিসনে মিথ্যে নিন্দে রটাসনে নিজের, পাপ সে পাপ"—কতকটা সেই রকমই নাচের ভঙ্গি করে কাছে এল।

আমি তেল মাখতে মাখতে বললাম—

—আজ পুকুরেই নাইব।

—ন্না।

—ও তো ডাঙায় আছে, জলে নাইতে দোষ কী?

—তা হোক, তবু তুমি যাবে না!

—তোমার যত বেশি বেশি।

তেলটেল মেখে একফালি মাঠের উপর ঘুরছি। ডগাছাঁটা ঘাস সব। খালি পায়ে হাঁটলে লাগে। আজ তেমন লাগছে না। নমিতা বউদিদের ঘাটটা কতক নারকেলগাছ কাঁঠালগাছের আড়ালে।

এখন যেখানে হাঁটছি সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় না। চওড়া চওড়া বাঁধানো অনেকগুলো সোপান। না দেখা গেলেও টের পাচ্ছি সেখানে একটা মিনি জটলা বসেছে।

আরও ক-পা দক্ষিণে হেঁটে গিয়ে আমাদের আমতলায় দাঁড়ালে ছবিটা বেশ পরিষ্কার চোখে পড়ে। শিবনাথদাদু ঘাটে বাবু হয়ে বসে। তাকে ঘিরে কতিপয় চ্যাঙড়ার দল।

দেখামাত্রই দাদু—

—এই যে ভায়া, আপিস যাওনি? আর যাবেই বা কী করে? যা সব হচ্ছে, দেখছ তো?

—তোমার দিনকালেও এসব হত। হত না?

কে যেন বলল।

—হ্যাঁ হত। তবে এত ওপেনলি না।

—কীভাবে হত, কীভাবে—সেই গুহ্য কথাটা বলো।

চ্যাঙড়ারা দাদুকে ছেঁকে ধরল।

—দু-ত্তো-র নিকুচি করেচে !

বলেই মহাফাঁপরে পড়ে দাদু উঠতে যাচ্ছিল। নিতাই তাকে ধরে বেঁধে বসিয়ে দিল।এসময়ই বুলু কাকিমা ঘাটে আমপাতা ডোবাতে এল। সব চুপ—

রমলাও ডাকল—

—কী গো, আসবে তো?

—এই যাচ্ছি।

রমলা তেড়িয়ে উঠল—

—যাচ্ছি মানে? এক্ষুনি এসো!

রকে বসে আছি। চক্ষে আমার কচুবন—কচুবন কী, শুধুই পোঁটলাটা।

যেরূপ দ্রোণাচার্য "অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! বৃক্ষকে, বৃক্ষস্থ পক্ষীকে, আমাকে বা ভ্রাতৃগণকে নিরীক্ষণ করিতেছ?" তাহা শুনিয়া অর্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, "ভগবন্! আমি বৃক্ষ বা আপনাকে নিরীক্ষণ করিতেছি না, কেবল শকুন্তকে অবলোকন করিতেছি।" অনন্তর দ্রোণ প্রীতমনে পুনর্বার জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস! শকুন্তকে সম্যকরূপে নিরীক্ষণ করিতেছ?" অর্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, "না আমি শকুন্তের অবশিষ্ট কলেবর কিছুই অবলোকন করিতেছি না, কেবল উহার মস্তকটি দেখিতেছি।"

তদ্রূপ আমিও শুধুই পোঁটলাটা, পোঁটলাটা। দেখে যাচ্ছি, দেখেই যাচ্ছি। যার ভিতর একটা নষ্টপ্রাণ পড়ে আছে। নষ্ট কি?

বেঁচে থাকতেও তো পারে, পারে না?

অদ্ভুত! কত কী হতে পারে। তাই ভাবছি। তো আচমকা "ধর! ধর!"

একটা কাগজকুড়ানি ন-দশ বছরের ছেলে বস্তা পিঠে দৌড়ুচ্ছে কচুবনের ভিতর দিয়ে। নমিতা বউদিদের ঘাট থেকেই "ধর-ধর" আওয়াজটা তাকে তাড়া করছে।

পিছন ফিরে তাকানোর ফুরসত নেই ছেলেটার। কী জন্যে ছুটছে অতকিছু বোঝবার অবকাশও নেই তার। ছুটছে, তো ছুটছে।

এসময় ঘাট থেকেই কে যেন মন্তব্য ছুড়ে দিল—

—অ রে তোর জাতভাই কচুবনে শুয়ে আছে। নিয়ে যা, নিয়ে যা!

তারপরই বেধড়ক হাসি খো খো করে। শিবনাথদাদুও খুব হাসছে।

অকস্মাৎ ঘাটটা থেমে গেল। তবে কি বুলু কাকিমা আবার ঘাটে এল?

—এ তো সমাজবিরোধীদের কাজ।

স্বরটা যেন মাটির তলা থেকে উঠে এল।

বুঝলাম ঘুনু এসে গেছে।

—হ্যাঁ, এ তো সমাজবিরোধীদেরই কাজ।

ঘুনু রিপিট করল। বলল কি, বিরোধীপার্টির কাজ?

—সমাজবিরোধিতার গন্ধ আছে বইকি ঘুনু।

এতক্ষণে শিবনাথের গলা।

—এক কাজ করো—পুলিশে খবর দিয়েছ?

বুঝতে পারছি—তার ঠোঁটে ফোর্থ ফিংগার ঠেকিয়েছে ঘুনু।

—ন্না।

—এই তো তোমাদের দোষ।

বলেই রুষ্ট হল ঘুনু ।

—কে-বা যাবে!

—কেন নেতাই? নেতাই, যা না!

—ধু-র! অতটা হেঁটে হেঁটে—

—হেঁটে কেন? যাবি তো সাইকেলে?

—সাইকেলে হাওয়া নেই।

—দিয়ে নিবি!

ঘুনু জোর দিল।

—কোথায় দোব? টিউবটাই ফুটো!

—তবে রিকশায় যা! খালি তখন থেকে ভাঙচি।

শিবনাথদাদু।

—এই দুপুরবেলা রিকশাও আছে নাকি? থাকলেও অতদূর এই রোদে যেত না।

—রিকশার নিকুচি করেচে! তোরা অবনেশের ট্যাক্সি দ্যাক! যা লাগে টাকা আমি দেব।

—সেও তো বেরিয়েছে!

—বাজে বকিস না! এই তো দেখে এলুম ট্যাক্সির তলায় ঢুকে সারাচ্চে। কথাও বলল।

বলেই শিবদাদু বোধকরি উঠতে যাচ্ছিল।

—যত্তসব অ্যান্টিসোশ্যাল!

—তবে টাকাটা আমায় দাও। আমিই যাচ্ছি।

যেন মাটির তলা থেকে সেই ঘুনুর গলা।

।। তিন ।।

সারা দুপুর রমলা পড়ে পড়ে ঘুমোল। এখনও মুখ হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। আমার ঘুম নেই, মন পড়ে আছে সেই পোঁটলায়, সেই কচুবনে। সারা দুপুরটাই যেন থম মেরে আছে সেখানে।

রমলা ঘুমোক, কচুবনে সেও শুয়ে থাক। দুটোকেই পাশাপাশি রেখে আমিও অপেক্ষায় আছি, একটা ট্যাক্সির। ঘুনু যাকে আনতে গেছে।

হঠাৎ একটা মোটর বাইক ভট—ভট-ভ-ট-র আওয়াজ তুলে কচুবনের পাশ দিয়ে ছুটে গেল সবেগে।

দৌড়ে রকে এলাম। কই, কোথায় কী ? বড়োজোর একটা কাঠঠোকরা নারকেল গুঁড়িতে তার ঠোঁট ঠুকে যাচ্ছে লাগাতার— কাঠ-ঠু-কু-র-র-র—

হতাশ হয়ে ফের ঘরে এলাম। এসময়ই রমলা ঘুমের ভিতর থেকে বলে উঠল—

—খুন্তিটা তুই মেজে দে, যোগো!

ঠিক সওয়া চারটেয় জিপগাড়িটা এল। দুজন কনস্টেবল, আর জমাদার। পোশাক-আশাক দেখে তো তাই মনে হল।

এখনও ঘুমোচ্ছে রমলা? তাকে ধাক্কা দিয়ে তুলে ঘর ছেড়ে রকে এলাম, রক থেকে একদম ঘাটে। হাঁটুজলে নেমে গেছি। এঘাট ওঘাট, ঘাটা-আঘাটা—এতক্ষণে লোকে লোকারণ্য!

পূর্বদিকের পাড় বরাবর দু-হাতে কচুবন ঘাঁটতে ঘাঁটতে ঘুনু যাচ্ছে। পিছন থেকে শিবদাদু পুনঃ পুনঃ বলছে—

—যা যা! সবকিছু ডিটেইলসে খুলে বল।

ঘুনু কি হাত-পা নেড়ে বলতে বলতে যাচ্ছে—বিচার চাই, বিচার চাই? অপরাধীর শাস্তি চাই, শাস্তি চাই?

ছিটকে বেরিয়ে এসেছে দুজন কনস্টেবল। তারা একহাতের লাঠি আরেক হাতে ঠুকে যাচ্ছে। একজন তো লাঠির ঘায়ে কচুপাতা ছপাছপ ছিঁড়ে ফেলল দু-চারটা।

ছোটো জমাদার নোটবুক হাতে এসময় জানতে চাইছে—

—হ্যাঁ, বাই দি বাই, আপনাদের ভিতর কে প্রথম ব্যাপারটা মার্ক করল? কে?
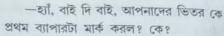
বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, পুলিশে ছুঁলে—? জনতা ক্রমশ পিছু হটছে, পিছু হটছে। কে প্রথম দেখল? 'হু হ্যাজ সিন দ্য ফার্স্ট?' সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে, করেই যাচ্ছে।

আমার মনে পড়ল—'হু হ্যাজ সিন দ্য ওইন্ড? নাইদ্যার য়্যু নর আই।' ওঘাট থেকে যথারীতি বিরক্ত হয়ে ঘুনুকেই বলল শিবদাদু—

—অ রে মেড়া, বল না—তুই-ই প্রথম দেখেছিস!

অতঃপর ঘুনু এগিয়ে গিয়ে বলল—

—বেশ, আমার নামই লিখুন। আমিই প্রথম দেখেছি।

মিথ্যে বললি ঘুনু? তুই না, তুই না—প্রথম দেখেছে আমাদের যোগো, যোগমায়া। চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করল, চেপে গেলাম। ওদিকে ভিড়ের ভিতর মেনকা ঝিকে দেখা গেল। ততক্ষণে সেও তো চেঁচাচ্ছে—

—আমিই পেথ্থম দেখনু আর নাম হল কীনা ঘুনুবাবুর? কী বিচার! কী বিচার!

দুর্বলের কণ্ঠস্বর প্রবলের ভারে চাপা পড়ে যায়, সেটাই তো স্বাভাবিক। কে যেন বলল ও—

—মেনকা ঝি, তুই চুপ মার! আর কথা বাড়াসনে।

কনস্টেবল দুটো এখন কচুবনের ভিতর। হাতের চেটোয় লাঠি ঠুকেই যাচ্ছে, ঠুকেই যাচ্ছে। তদুপরি ভারী বুটের মচমচানি আওয়াজ। দাপিয়ে ঘুরছে ফিরছে।

বড়ো অবহেলায় বাঁ-হাত দিয়ে পোঁটলাটা ফাঁকা জায়গায় টেনে আনল লোক দুটো। "দেখে যা, দেখে যা ভানুমতীর খেল্"—কতকটা ওইরকম ভঙ্গিতে ঘাড় হেলিয়ে লোক জড়ো করল তারা।

নির্দয় পুলিশ দুটোর ব্যবহারে ভিড়ের ভিতর মা-মা টাইপের যারা ছিল, তারা হেঁচকি ওঠার মতো আঁতকে উঠল—

—বাছারা, একটুক মায়া-মমতা করে নিয়ে যা!

পোঁটলাটা এখন খোলা হচ্ছে, একজন কনস্টেবল খুলছে। আরেকজন হটাচ্ছে ভিড়ভাট্টা। সবার উৎসুক চোখ তো এখন পোঁটলাতে—ছেলে না মেয়ে? তার উপর কার মতো দেখতে? কার?

কনস্টেবলটি আচমকা চেঁচিয়ে উঠল—

—শালা কুত্তার বাচ্চা!

যেন কোথাও বোমা ফাটল। বাঁ-হাত প্যান্টে ঘষতে ঘষতে, তিন থেকে সাড়ে তিনফুট হাইজাম্প মেরে লোকটা ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল পুকুরে হাত ধুতে।

বড়োজোর দু-সেকেন্ড নীরবতা, নীরবতা। তারপরই হা-হা হাসিতে চারদিকে ফেটে পড়ল জনতা।

কেউ একজন চ্যাঙড়া অতঃপর চেঁচিয়ে বলে উঠল—

—অ রে কুকুর রে! কুকুরের বাচ্চা!

কেউ কি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে? কোথাও কি খুউব 'মায়া রহিয়া গেল?' ❖

গল্প

মধুমিতা

কণা বসু মিশ্র

ছবি : শৈবাল দত্ত
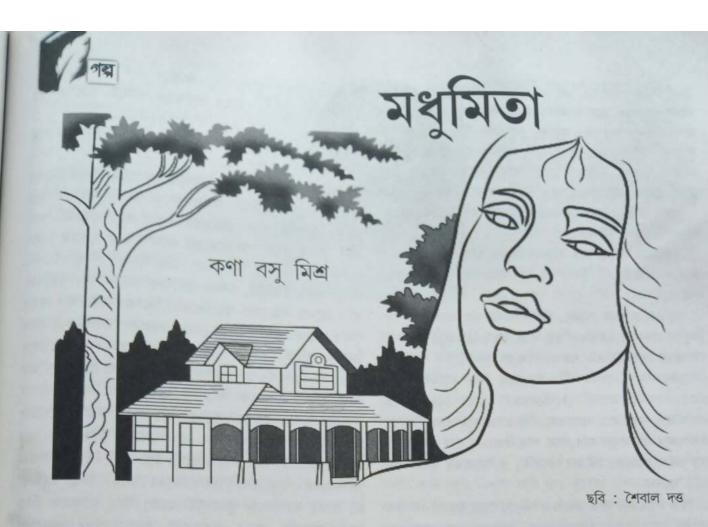
শেষ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল মধুমিতার। ওর মনে হল, ও অনেকদিন সূর্য ওঠা দেখেনি। রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোয় বলে, রোজই বেশ বেলায় ওর ঘুম ভাঙে। তখন ঝলমলে রোদ্দুর। সেই আকাশফাটা রোদ্দুরে আর প্রাতঃভ্রমণের ইচ্ছেটা থাকে না। মধুমিতা বন্ধ কাচের জানলার মধ্যে চোখ রেখে দেখল, প্রচুর তারার আলো। কুয়াশা গায়ে মেখে মধুমিতা সেই তারার আলোয় কাঠের লম্বা ব্যালকনিটায় গিয়ে দাঁড়াল। আর সামনের সবুজ জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে হরিণের পায়ের শব্দ শুনতে চেষ্টা করল।

হিলসবরো প্যাসিক অ্যাভিনিউতে যখন ও বাড়ি কিনল, তখন ওর বেশ অ্যাডভেঞ্চার মনে হয়েছিল। চারদিক নির্জন। সবুজ গাছপালার জঙ্গল। কিন্তু ওর চমৎকার বাংলো। সবুজ কার্পেটের মতো লন। কিছু মনের মতো ফুলগাছও লাগিয়েছিল মধুমিতা। সেই ফুলগাছের পাপড়ি খাবার লোভে আগে খরগোশের দলও হানা দিত। এখন সামনের কালো পিচের রাস্তায় সারা দিন-রাত গাড়ি যায়, আটলান্টিক সিটির দিকে। শনি-রবিবার হলে তো কথাই নেই। তাই খরগোশের দলকেও আর তেমন দেখা যায় না। তবে হরিণ আসে। ওরা গাড়ির রাস্তায় সোজা দাঁড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার ভয় থাকে। তবুও মধুমিতা গাড়ির চাবিটা হাতে নিয়ে গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করল। কিছুদিন হল ও ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়েছে। একটা সফ্টওয়্যার কোম্পানিতে চাকরির সূত্রেই ও আমেরিকা এসেছিল কুড়ি বছর আগে। তারপর ভারতীয় কোম্পানির চাকরি ছেড়ে এক আমেরিকান কোম্পানিতে চাকরি নিল।

মধুমিতার গ্রিনকার্ড পেতে সময় লেগেছিল বছর চারেক। বছর দুয়েকের মধ্যেই মার্কিন নাগরিক। রণেনের সঙ্গে ওর ডিভোর্সটা হয়েছিল ঠিক তার পরেই। রণেনও এদেশের নাগরিক হয়ে গেল। কিন্তু দুজনের মতে কিছুতেই মিল ছিল না।

রণেন ভিড়ে গেল একজন মার্কিন মহিলার সঙ্গে। মধুমিতা সহ্য করতে পারেনি। রণেন বলেছিল, ওর সঙ্গে যদি আমি বন্ধুত্ব রাখি, মাঝে মাঝে একসঙ্গে থাকি, তাতে তোমার আপত্তিটা কোথায়? তোমার সঙ্গে চিরদিন একসঙ্গে থাকতে হবে, এমন দাসখত তো আমি লিখে দিইনি। ওরও তো সাহেব বর আছে। কিন্তু ও থোড়াই তাকে পাত্তা দেয়! লিভ-টুগেদারের জন্য নেলি আমার একজন আইডিয়াল সঙ্গী। আমার আপত্তি নেই, তুমিও কাউকে সঙ্গী করতে পারো।

—আমি সঙ্গী করলে তোমায় একেবারে ডিভোর্স।

—আপত্তি নেই।

—কিন্তু মায়া, ভালোবাসা, আর অভ্যেস?

রণেন বলল, ওসব আবার আছে নাকি? দুনিয়া তো পাল্টাচ্ছে। মানুষ কি এক জায়গায় খুঁটি গেড়ে বসে থাকবে?

মধুমিতার রণেনের সঙ্গে যতই অশান্তি হোক, ও কিছুতেই

মেনে নিতে পারল না, ওই আমেরিকান মহিলার সঙ্গে রণেনের প্রেম। রণেনের সঙ্গে মাঝরাত্তিরে রোজই ঝগড়া। মাঝে মাঝে রণেন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত বাড়িও ফিরত না। মধুমিতা অফিস থেকে ফিরে খালি বাড়িতে বসে নিজেকে বেশ অসহায় ভাবত। নিউইয়র্ক থেকে অফিস করে এসে বার্লিংটন অবধি ড্রাইভ করা সোজা কথা নয়। একলা কদ্দিন বাঁচা যায়?

শেষ পর্যন্ত দুজনের অশান্তি সহ্যের বাইরে চলে গেল। তারপরই বিবাহ-বিচ্ছেদ।

মধুমিতাও দুর্বল হয়ে পড়ল। নির্জন রাস্তার চড়াই ভেঙে যখন ও বাড়ি ফিরত, তখন ওর মনে হত, বাঁচতে হলে একজন সঙ্গী চাই।

মধুমিতা জড়িয়ে পড়ল, ওর অফিসের এক সহকর্মীর সঙ্গে। কিছুদিন একসঙ্গে সহবাস। কিন্তু বিয়ে করল না। মধুমিতা দেখল, সেখানেও পরাধীনতার যন্ত্রণা। অতএব গুডবাই!

শেষ পর্যন্ত একলা জীবনই বেছে নিল মধুমিতা। কিন্তু রাতে চোখের জলের লোনা স্বাদ। বালিশ ভিজে যেত। কলকাতায় বাবা,মা। বলতেন, ফিরে এসো। ঢের হয়েছে। কলকাতায় কি মানুষ বাস করে না? এখানেও তো সফ্টওয়্যার কোম্পানি রয়েছে। আমরা রয়েছি। সল্টলেকের এত বড়ো খালি বাড়ি।

কিন্তু মধুমিতার আর কলকাতা ফেরার ইচ্ছে হত না। আত্মীয়-স্বজনের নানা কথা। চরিত্রহীনতার তালিকায় ওর ছাপ পড়ে গেল। আমেরিকায় যে সব আত্মীয়-স্বজন ছিল, তারাই দেশে গিয়ে রটিয়ে দিল নানা কথা। মধুমিতা নাকি প্রায়ই পুরুষ পাল্টায়। নানাজনের সঙ্গে লিভ-টুগেদার করে। কলকাতায় গেলে, ওর বাবা, মা বলতেন, তোমার জন্যে যে আমাদের মানসম্মান গেল।

মধুমিতা বলত, তোমরা আমার কাছে চলে এসো। তোমার তো রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেছে বাপি। আসতে আপত্তিটা কোথায়?

ওর বাবা বলতেন, নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেব কেন? বরং, তুমিই তোমার নিজের দেশে চলে এসো।

—অসম্ভব বাপি। মধুমিতা বলত, আমার পক্ষে আমেরিকা ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ওর মায়ের ব্যাকুল প্রশ্ন, কেন নয় মিতু? যে দেশে তোমার জন্ম, কম্ম, সে দেশে থাকতে ভালো লাগে না?

মধুমিতা দৃঢ় গলায় বলত, না, ভালো লাগে না।

বাবা অধৈর্যভাবে বলতেন, কেন? কেন?

—আমার কুড়ি বছরের অভ্যেস পালটাতে কলকাতা ফিরে আবার নতুন অভ্যেস, একদম চলবে না। ওখানে আমি স্বাধীন মতো আছি। কেউ কাউকে পাত্তা দেয় না। কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

বাবা বলেছিলেন, সবই তো বুঝলুম, কিন্তু ওদেশের ওই থাকাটাকে কি থাকা বলে? একা একা পড়ে থাকা।

মধুমিতা বলেছিল, এদেশে এলেও তো সেই একাই হব বাপি।

মা বললেন, আমরা তো রয়েছি।

মধুমিতা বলল, তোমরা ওদেশেও আমার সঙ্গে থাকতে পারো!

মা বিরক্তভাবে বলেছিলেন, সেই এক কথা। আমাদের কথা কিছুতেই তুমি শুনবে না।

তবু ওর বাবা, মা বছরে একবার আসতেন। থেকে যেতেন তিনমাস। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে ওঁদের আসা-যাওয়াও কমে গেল। মা হঠাৎ হৃদরোগে ওপরে চলে গেলেন। আর বাবা, মায়ের মৃত্যুর পর কিছুতেই এদেশে আসতে রাজি হলেন না। সল্টলেকের ওই অত বড়ো বাড়ি আগলে পড়ে রইলেন। তাঁর সংসারের স্মৃতি, ফেলে কোথাও যাবেন না। বাড়িটাও বাপি অনেক কষ্ট করে করেছিলেন। সি. এম. ডি. এ-র কাছে থেকে সস্তায় জমি, তারপর লোন। ধারদেনা শোধ করে যখন নিজের বাড়ির সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলছেন, তখনই মেয়ে চলে এল বিদেশে। তার আগে নিজের ইচ্ছেয় রণেনকে বিয়ে করে বসল। রণেনকে বিয়ে করার ব্যাপারে বাবা, মায়ের আপত্তি ছিল। কেননা ওদের পরিবারের সঙ্গে রণেনের পরিবারটা খুব মানানসই ছিল না। রণেনের জীবনযাত্রাও খুব একটা সুবিধের ছিল না, আমেরিকায় সেই খোঁজটা ওঁরা নিয়েছিলেন। ইন্টারনেট থেকে ওদের প্রেম। কিন্তু মধুমিতা মা, বাবার আপত্তিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে রণেনকে বিয়ে করল রেজেস্ট্রি করে। একেবারেই বাবা, মায়ের অজান্তে। মধুমিতার ভিসার সময় বাড়ির লোকেরা সবাই জেনে গেল। ওর বাপি বললেন, এটা তুমি ঠিক করলে না মা। বিয়েটা কিন্তু সারা জীবনের ব্যাপার। তুমি রণেনকে মানিয়ে নিতে পারবে?

মধুমিতা বলল, নিশ্চয় পারব বাপি।

ওর বাবা বললেন, কিন্তু আমার মেয়ে চুপি চুপি বিয়ে করবে আরেকজনকে এটা আমি মেনে নিতে পারব না। সমাজে আমার তো একটা পরিচয় আছে?

ওর মাও বললেন, তোমার খুশিমতো যাকে ইচ্ছে, তাকেই বিয়ে করলে, আমাদের না জানিয়ে। তোমার স্বেচ্ছাচারিতা আমরা মেনে নিলুম। কিন্তু আমাদের তো আত্মসম্মান বোধ আছে! আনুষ্ঠানিক ভাবে তোমাদের বিয়েটা আমরা দিতে চাই।

মধুমিতা বলল, আমাদের তো আর সময় নেই মা। রণেনের ছুটি ফুরিয়ে যাচ্ছে।

মা, বাবা বললেন, সে যাই হোক। এর মধ্যেই হবে।

মাত্র সাতদিনের মধ্যেই বিশাল ঘটা করে ওদের বিয়ে হয়ে গেল। মধুমিতাদের সল্টলেকের ওই বাড়িটার লোভ থেকে গেল রণেনের আর রণেনের বাবা, মায়ের মনে। বাড়িটা লিখে দিতে হবে বিয়ের যৌতুক হিসেবে, মেয়ে-জামাইয়ের নামে। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। আপত্তিটা উঠল প্রথমেই মধুমিতার। ওর বাবা, মাও রণেনকে বোঝালেন, আমাদের একটা মাত্র মেয়ে। ও ছাড়া

আর কে পাবে বল? আর ও পাওয়া মানেই তো তোমারও পাওয়া।

রণেন বলল, তার কি কোনো মানে আছে? ও যদি উল্টোপাল্টা করে বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট করে?

সে ধরনের মেয়ে ও নয়।—প্রতিবাদ করলেন মধুমিতার বাবা।

গাঁটছড়া বেঁধে রণেনের সঙ্গে বিয়ে হল। গুরুজনের আশীর্বাদ, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের হইচইয়ের মধ্যে দিয়ে। সাতদিন ফুরোতে না ফুরোতেই দমদম এয়ারপোর্ট। আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দরের ভেতরে সকলের ঢোকার অনুমতি নেই। কিন্তু এয়ারপোর্টে অনেক গাড়ি এল ওকে সি-অফ করতে। একরাশ হাসিমুখের মিছিল। চোখের জল। ওরা সিকিওরিটিতে ঢুকে গেল সবাইকে টা টা করে। কথা দিয়ে গেল, পরের শীতেই ওরা কলকাতা আসবে দুজনে। রণেনও হাসতে হাসতে প্রণাম করে গেল প্রণম্যদের।

মাস ছয়েক ভালোই কাটল ওদের আমেরিকায়। তারপর দুজনেই দুজনকে চিনতে পারল। মধুমিতা বলল, আমেরিকায় তুমি যে ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াও, একথা তো আমার জানা ছিল না রণেন!

রণেন বলল, তুমি ভাবলে কী করে? দশ বছর ইউ. এস. এ-তে কাটিয়ে আমি পবিত্র গঙ্গাজল থাকব! তোমার ওসব সেকেলে ধ্যানধারণা বদলে না ফেললে কষ্ট পেতে হবে।

মধুমিতা চোখ কপালে তুলে বলল, চমৎকার! এসব কথা তোমার তো আগেই বলা উচিত ছিল।

রণেন ভুরু কুঁচকে বলল, কী উচিত ছিল আর কী ছিল না, ওসব হিসেব করে আমি বিয়ে করিনি। আমি তো বারণ করিনি, তোমাকেও বদলাতে হবে! হয় তুমি আটপৌরে আনাড়ি মন নিয়ে পড়ে থাকো, অথবা নিজেকে পাল্টাও। মধুমিতা বলল, পাল্টানো মানে কী! তোমার মতো যার-তার সঙ্গে নোংরামি করে বেড়ানো?

রণেন বলল, নোংরামি কাকে বলছ? এখানে যত্রতত্র শারীরিক সম্পর্কের ছড়াছড়ি দেখছ না? অথচ তারা আবার বউ নিয়েও ঘর করে।

মধুমিতা বলল, মে বি, হতেই পারে। কিন্তু তুমি হবে কেন? তুমি তো বাঙালি ঘরের ছেলে, বাঙালি শিল্প-সংস্কৃতি, বাড়ির শিক্ষা-দীক্ষা, সেসব কি ভুলে যাবে? সমাজ বলে কি কিছু থাকবে না?

রণেন বলল, আরে দূর! ওই ঘুণধরা সমাজ? এই করেই তো সব গেল। বিদেশের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। জীবন কাকে বলে? বলছি, তুমিও দুটো-চারটে প্রেম করো, মেলামেশা করো। তাহলে তোমার ওপরে আমার অ্যাট্রাকশন বাড়বে। আমরা কেউ কারো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করব না।
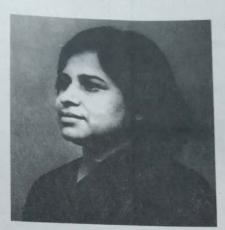
মধুমিতা বলল, উচ্ছৃঙ্খলতা? না, তোমার সঙ্গে আমার মিলবে না।

মধুমিতা অ্যাক্সিলেটারে পা চেপে স্পিডটাকে জোর করল। থার্ড গিয়ারে গাড়ি রেখে ছুটে চলল নাইনটি ফাইভ নেওয়ার্কের দিকে। বেশ কয়েক মাইল যেতেই সার্ভিস স্টেশনে গাড়ি পার্ক করে, ভেতরে ঢুকে স্টারবাক্স থেকে একটা ব্ল্যাক কফি খেল।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ওর মনে পড়ল বাবা, মাকে। মধুমিতা মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিল। পিস হেভেন থেকে ওঁর মৃতদেহ বের করে মুখাগ্নিও করেছিল নিমতলা শ্মশানঘাটে। কিন্তু বাপির হঠাৎ মৃত্যুর পর ও আর ছুটে গেল না বাপির মরা মুখ দেখতে। মামা, কাকাদের জানিয়ে দিল, তোমরা যা হোক করো। সন্তানের হাতের আগুন বাবার মুখে ওসব আমি আর বিশ্বাস করি না। মায়ের মুখে তোমরা জোর করে আগুন দেওয়ালে, আবার বাবার মুখেও?

কিন্তু সল্টলেকের বাড়িটা পড়ে রইল। ওর বাবা, মায়ের স্মৃতির হিসেব নিয়ে।

মধুমিতা ওর মামাকে বলেছিল, বাড়িটা কোনো আশ্রমকে দান করতে। মামা সেটা করতে পারেননি। ওর কাকা জাল সই করে নিজের নামে দলিল তৈরি করেছিলেন ওর বাপির মৃত্যুর পরেই। মধুমিতা জানতে পেরেও এই নিয়ে কোনো আপত্তি করতে যায়নি। বাবা, মা-ই রইল না, সম্পত্তি নিয়ে কী হবে? ওপরে তো যেতে হবে সেই শূন্য হাতে। ও ভাবে, ওর এই আমেরিকার বাংলোটাও দান করে দেবে কোনো হোমলেস্‌কে। অথবা কোনো মিশনকে।

মধুমিতা গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। আবার বৃষ্টি আসবে নাকি? আসুক না। প্রকৃতির খামখেয়ালি মেজাজকে ও পরোয়া করে না। অভিজ্ঞতার টানাপোড়েনে কবে যে পেরিয়ে গেল ওর পঞ্চাশ বছর। মধুমিতা তবু থেমে থাকবে না। প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তকে ও মনের মতো করে ভোগ করবে। কিন্তু কীসের ভোগ? কোনো পুরুষকে বিয়ে অথবা সহবাস? একেবারেই নয়। কেন একলা কি বাঁচা যায় না?

মধুমিতা দূরে দেখতে পেল, হাডসান রিভার। ও ভাবল, জীবনটা তো ওই নদীর স্রোতের মতোই। ও দেখতে পেল নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারের আলো। সেই আলোর বন্যার দিকে তাকিয়ে ও গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল। ❖

পাকা চাকরি

পার্থ দে

ছবি : নচিকেতা মাহাত

সরকারি অফিসবাড়ির মধ্যে ঢুকলে একটা ঘুম ঘুম ভাব আসে। আধো অন্ধকার করিডর। ওপরে ওঠার সিঁড়ির দেয়ালে পানের পিকের দাগ। বার্ডকেজ লিফটে প্রাগৈতিহাসিক লিফটম্যান। দপ্তরগুলোয় ঢুকলে চোখে পড়ে টেবিলের সারি। তার উপর ডাঁই করে রাখা ধুলোপড়া নোংরা ফাইল। কড়িবরগা দেওয়া উঁচু সিলিং থেকে লম্বা ডান্ডাওলা পাখা নীচের দিকে ঝুঁকে পুরোনো দিনের লং প্লেয়িং রেকর্ডের মতো শব্দ করে ঘুরে চলেছে। বেলা দেড়টার সময় যারা চেয়ারে বসে আছে তাদের মধ্যে চারজন খবরের কাগজ পড়ছে, তিনজন খড়কে কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে, বাকি দু-জন টিফিনবাক্স খুলে আয়েশ করে টিফিন খেতে খেতে ভাবছে আড়াইটে থেকে কাজ শুরু করবে।

এরকম একটা অফিসে আমার চাকরি হবে! অবশ্য সেটা ভেবে আমার লজ্জা হচ্ছে এমনটা মোটেই নয়। বরং কিছুটা আনন্দই হচ্ছে। সোনার আংটি যেমন বাঁকা হলেও কিচ্ছু যায় আসে না, তেমনই সরকারি চাকরির রূপ-জৌলুস না থাকলেও চলে। মাস গেলে ভালো মাইনে আছে—বেসিক পে, ডি এ, হাউস রেন্ট, মেডিক্যাল অ্যালাউন্স—সব গুনেগেঁথে পকেটে ভরে নিলেই হল। চাকরিটা অবশ্য জুটছে আমার বাপের দৌলতে। পিতৃদেব মরে গিয়েও আমার জন্য খাজানার দরজা খুলে দিয়ে গেছেন—ডাই-ইন-হার্নেসের চাকরি!

আমার পিতৃদেব পঃ বঃ রাঃ সঃ চাকুরে ছিলেন। খাদ্যদপ্তরে চাকরি করতেন। খাদ্যের গণবন্টন ব্যবস্থা নিয়ে ইদানীং সরকার বা সাধারণ মানুষ কেউই তেমন মাথা ঘামায় না। ওই দপ্তরের এগারোটা ডাইরেক্টরেট বন্ধ হতে হতে তিনটেতে এসে ঠেকেছে। উনি তার মধ্যেই নিজের চাকরিটা ধুক ধুক করে টিঁকিয়ে রেখেছিলেন। ওঁর চাকরির দৌলতে আমাদের সংসারও টিঁকে ছিল। তবে আট বছর আগে ক্যান্সারে মা চলে যাওয়ার পর বাবা একটু এলমেলো, একটু ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছিলেন। আমার তখন ক্লাস ইলেভেন। বাবা কখন বাড়ি আসে, কখন যায় কিছুই টের পাই না। আমিও ছাড়া গরুর মতো পাড়া চরে বেড়াই। রাতে বাড়ি ফিরি কি ফিরি না। দুজনের দূরত্ব বাড়তে লাগল, একই বাড়িতে দুজন অপরিচিতের মতো থাকি, কোনো কথা হয় না। অগোছালো ঘরদোর, থমথমে পরিবেশ। পাড়ার লোকে বলত ভূতের বাড়ি। এক পিসি এসে মাঝেমধ্যে ভূতের বাড়ির হাল ফেরানোর চেষ্টা করত, কিন্তু তার নিজের সংসার ফেলে এসে কতদিন আর দাদার সংসারে ঝি-গিরি করবে! একদিন পিসিও আমাদের ভূতের বাড়িকে টা-টা করে চলে গেল।

মায়ের ইহলোক ত্যাগের পরপরই আমার পড়াশোনাও মায়ের ভোগে চলে গেল। মিলন হলে নুন-শোয়ের 'এ' মার্কা ছবি দিয়ে শুরু হল। টিকিটের পয়সা লাগত না, লাইটম্যান ভানুদা ম্যানেজ করে হলে ঢুকিয়ে দিত। তারপর হেলাবটতলায় দিলীপদার গ্যারাজের পিছনের ঠেক-এ গাঁজার ধোঁয়ায় জীবনের দুঃখ উড়িয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার দুঃখবিলাস-টেকনিক শিখলাম। এলাকার যত লাথখোর বন্ধু জুটে গেল—তপনা, নাককাটা অসীম, পেটো পমপম, মুরগি নিতাই! দিলীপদা বুঝিয়ে দিল মনের ক্ষত জুড়োনোর আসল অ্যান্টিসেপটিক হল মদ। বুঝে গেলাম ইস্কুল-কলেজের বিদ্যের চেয়ে ঢের বিদ্যে দিলীপদার পেটে আছে।

তবে দিলীপদার আসল এলেম বুঝতে পারলাম আমার বাবার প্রথম হার্ট অ্যাটাকের পর। গাঁজার ধোঁয়া আর বোতলের বুদ্বুদের ভিতর দিয়ে একটা সূক্ষ্ম বুদ্ধি আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিল—"বান্টি, তুই গোষ্ঠদার একমাত্র ছেলে। গোষ্ঠদার সরকারি চাকরি, কিন্তু শরীরের যা হাল, কিছু একটা হয়ে গেলে...অফিস থেকে তোর চাকরির একটা ব্যবস্থা ঠিক..."

ব্যস্। কথাটা সেদিন দিলীপদাকে শেষ করতে হয়নি। আমার অ্যান্টেনা ক্যাচ করে নিয়েছিল। সেদিন থেকে 'ডাই-ইন-হার্নেস' শব্দটা মাথায় খোদাই হয়ে গিয়েছিল। বাংলাটা অবশ্য খুব বিচ্ছিরি—মৃত সরকারি কর্মীর পোষ্যের চাকরি! এই পোষ্যের তালিকায় স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সবাই পড়ে। কিন্তু দুনিয়াদারির মাস্টার ডিগ্রিধারী দিলীপদা আমার মাথায় সারকথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আমি, মানে রাহুল দত্ত, সান অফ গোষ্ঠবিহারী দত্ত, বাপের একমাত্র ছেলে, এই দত্ত খানদানের এক লওতা জিতা জাগতা ওয়ারিশ! তাই পিতৃদেবের কিছু হলে তার চাকরি-বিষয়-আশয় সব আমিই পাব।

আমি বি. কম. পাশ। এমন আইকম বাইকম ডিগ্রি নিয়ে বাংলা বাজারে নিজের দমে যে চাকরি জুটবে না তাও বহুদিন আগে বুঝে গিয়েছিলাম। তবু নিজের বাবাকে তো আর গলা টিপে খুন করে চাকরি বাগানো যায় না, তাই অপেক্ষা করতে হল। মা মারা যাওয়ার আট বছর পর তৃতীয়বার হার্ট অ্যাটাকে বাবা চলে গেলেন। বাবার মৃত্যুর তিন হপ্তা পর তাঁর পারলৌকিক কাজকর্ম সেরে-টেরে এসেছি সেই ডাই-ইন-হার্নেস গ্রাউন্ডে চাকরির দরখাস্ত জমা দিতে।

ঘুম ঘুম অফিসবাড়িটার সিঁড়ি ভেঙে বারান্দা পেরিয়ে শেষমেশ যে টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়ালাম তার পিছনে বসা বছর পঞ্চাশের ভদ্রলোক জামার বোতাম খুলে বগল চুলকোচ্ছেন। এমন নিবিষ্টচিত্তে কাজটা করছেন যে সামনে দাঁড়ানো পঁচিশ বছরের একটা ছেলের অস্তিত্ব তিনি টেরই পাচ্ছেন না। এই সময় কাশি কাজে দেয়। দু-বার খুকখুক করে কাশলাম।

ভদ্রলোক শিবনেত্র তুলে চাইলেন, "বলবেন কিছু?"

"আমি গোষ্ঠবিহারী দত্তের ছেলে, বান্টি... ভালো নাম রাহুল দত্ত।"

"অ।"

"আপনি বড়োবাবু জয়কৃষ্ণ তালুকদার, মানে জয়কৃষ্ণকাকু তো? বাবা আপনার কথা খুব বলতেন।"

"অ। বসুন।"

"কাকু, আমি দরখাস্তটা তৈরি করেই এনেছি।"

"কীসের দরখাস্ত?"

"বাবার ডাই-ইন-হার্নেসের চাকরিটার।"

হঠাৎ বগল চুলকোনো থামিয়ে জয়কৃষ্ণ চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। পাক্কা এক মিনিট চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "চাকরিটা কে করবেন? আপনি না আপনার বোন?"

কথাটার মানে বুঝলাম না। আমার গঞ্জিকাসেবিত মস্তিষ্কে অনেক কিছুই সেঁধোয় না। বোন শব্দটা বোন চায়নার বাসনের মতো আমার চেতনায় সশব্দে আছড়ে পড়ল! বললাম, "মানে?"

"মানে তো আপনি বলবেন!"

"কিন্তু জয়কৃষ্ণকাকু আমার তো কোনো বোন-টোন নেই!"

"দাঁড়ান দাঁড়ান!" বলে টেবিলে রাখা ফাইলের ডাঁই থেকে একটা ফাইল বের করে আনলেন ভদ্রলোক। ফাইল খুলে অনেক কাগজ হাতড়ে একটা আবেদনপত্র বের করে আমার সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "এই যে বান্টিবাবু, আপনার ভালো নাম কী যেন..."

"রাহুল দত্ত।"

"হ্যাঁ, রাহুল, এটা দেখুন, কালই জমা দিয়ে গেছে।"

আমি আবেদনপত্রটা ঘুরিয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করলাম—

নাম—প্রতিভা দত্ত

পিতা—গোষ্ঠবিহারী দত্ত

ঠিকানা—৬/১ডি গঙ্গাধর বিদ্যানিধি বাই লেন, হাওড়া।

বয়স—২৪ বছর

শিক্ষাগত যোগ্যতা—বি.কশ (পাস)

আবেদনপত্রের ডানদিকের ওপরে একটা মেয়ের পাসপোর্ট-সাইজের ছবি। মেয়েটার গায়ের রং ঈষৎ চাপা, কিন্তু নাক-চোখ বেশ ধারালো। ঠোঁটের ওপরে বাঁদিকে একটা তিল আছে, যেটা দেখেই মনে হচ্ছে বেশ ধড়িবাজ মেয়ে।

নাম আবার প্রতিভা দত্ত! এ মেয়ের প্রতিভার ঝলক দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। বললাম, "স্যার, এ আমার বোন-টোন নয়, আমার কোনো বোন নেই, কস্মিনকালে ছিলও না। এ মেয়েটা নির্ঘাৎ জালিয়াত!"

"সে আমি কী করে জানব, বলুন? আপনার বাবার বকেয়া প্রফিডেন্ট ফান্ড, ডেথ গ্রাচুইটি বাবদ এককালীন টাকা যেটা প্রাপ্য হয় তা সার্ভিস রুল অনুযায়ী মৃত কর্মচারীর পোষ্যদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হবে।"

"মানে?" আঁতকে উঠলাম।

"হ্যাঁ, আইন মোতাবেক সেটাই হয়। তবে চাকরি তো যে কোনো একজনের হবে, দুজনের নয়। হয় আপনি, নয় আপনার বোন।"

"উঃ স্যার, মাইরি বলছি, এ আমার বোন নয়। আমার কোনো বোন নেই।"

ইতিমধ্যে যে চারজন খবরের কাগজ পড়ছিল, তিনজন খড়কে কাঠি নিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল আর দুজন কাজ শুরু করার উদ্যোগ করছিল, তারা আসন ছেড়ে আমার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। একজন বলল, "আপনি গোষ্ঠবাবুর ছেলে! তাহলে উনি কে, কাল যিনি এসেছিলেন?"

দ্বিতীয়জন বলল, "গোষ্ঠবাবুর চরিত্র তো ভালো বলেই জানতাম। লেখালিখি করতেন। অবশ্য লেখকদের চরিত্র নিয়ে কোনো গ্যারান্টি দেওয়া যায় না।"

তৃতীয়জন বলল, "মেয়েটার মুখে কিন্তু গোষ্ঠবাবুর মুখটা একেবারে বসানো!"

মেয়েটার ছবিটার ওপর ফের ঝুঁকে পড়লাম। আমার বাবার মুখের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে বটে! মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ভাবতেই পারছি না, এত বছর ধরে বাবা মাকে ঠকিয়ে দুই

নৌকোয় পা দিয়ে দিব্যি কাটিয়ে গেছে। অথচ মা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি, বাবার জীবনে অন্য নারী আছে! আমার মাথার মধ্যে সব কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। নার্ভাস গলায় বললাম, "জয়কৃষ্ণকাকু, মেয়েটা আবার কবে আসবে?"

"কবে আসবে তা তো বলা মুশকিল। তবে শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটগুলো সামনের সপ্তাহে জমা দিতে আসবে। জিজ্ঞাসা করেছিল আগামী মঙ্গলবার আসতে পারে কিনা। আমি বললাম, আসুন। দেখুন, হয়তো মঙ্গলবার আসতে পারে।"

"আমি মঙ্গলবার আসব," বলে আমার আবেদনপত্রটা বড়োবাবুর টেবিলে রেখে চলে এলাম।

।। ২ ।।

আমি ঝড়ের গন্ধ পাই। আমি না চাইলেও ঝড় আমাকে ঠিক খুঁজে নেয়। এই পঁচিশ বছরের জীবনে যখন-তখন এসে আছড়ে পড়েছে ঝড়। মা যাওয়ার বছরে শুরু হয়েছে তার তাণ্ডব, তারপর গত আটবছরে সব তছনছ করে নিঃস্ব করে দিয়ে চলে যাওয়ার পর যখন ভাবলাম এবার সব গুছিয়ে নেব, তখনই আবার হাজির হয়েছে সে।

বাবার অফিসের লোকজন যখন তির্যক কথা বলল তখনো এতটা গায়ে লাগেনি, কিন্তু দিলীপদা যখন বিকেলে মদের ঠেক-এ বসে বলল, "বান্টি তোর বাবা তো, দেখছি, গুরুদেব লোক ছিলেন!" তখন মাথাটা পুরো ঘেঁটে গেল।

দিলীপদাই আমার ফ্রেন্ড ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড। ওর বুদ্ধিতেই ঠিক করলাম মেয়েটার সামনাসামনি হয়ে একটা হেস্তনেস্ত করব, কিন্তু দেখা হওয়ার কথা তো পরের সপ্তাহের মঙ্গলবার। তার মানে এক সপ্তাহ পর! কিন্তু ব্যাপারটা এতদিন ফেলে রাখা যাবে না। দিলীপদা বলে ক্যাজড়া-ক্যাচাল ফেলে রাখলে ঠান্ডা মেরে যায়, মামলা গরম থাকতে সাল্টে নিতে হয়।

মোবাইলের গ্যালারি খুলে প্রতিভা দত্ত নামে ডাইনিটার আবেদনপত্রের ছবিটা পেলাম। ভাগ্যিস ফোনে ছবিটা তুলে রেখেছিলাম! যোগাযোগের ফোন নম্বরটা ওখানেই লেখা আছে। ভাবলাম, ফোনটা করেই ফেলি। এখন সুলুক সুলুক নেশা রয়েছে, ফোনে যা ইচ্ছে বলে নেওয়া যাবে, পরে নেশা কাটলে হয়তো বলতে পারব না।

নম্বরটা টিপে ফোন করলাম। রিং হচ্ছে ওপাশে।

"হ্যালো।"

"হ্যালো।"

"কে বলছেন?"

"আপনি কে বলছেন?"

"আরে আপনি কে বলছেন? আপনিই তো ফোনটা করলেন। আশ্চর্য মানুষ তো!"

"আমি বান্টি, মানে...ইয়ে রাহুল," একটু থমকে বললাম।

"আমি অঞ্জলি, মানে...ইয়ে কাজল।"

"আপনি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন।"

"ইয়ার্কি করব কেন! অঞ্জলি আমার নাম, কাজলও আমার নাম।"

"আপনি প্রতিভা দত্ত নন?"

মাথাটা পুরো ঘেঁটে গেল।

"হ্যাঁ, প্রতিভা দত্তও আমার নাম। আসলে এক-একজন আমাকে এক-এক নামে ডাকে। তবে আপনি আমাকে টিয়া বলে ডাকতে পারেন।"

"আপনাকে আমার কোনো নামেই ডাকার ইচ্ছে নেই, একটা দরকারি কথা বলার জন্য ফোন করেছিলাম।"

"জানি তো দরকারি কথাটা কী। ট্রু কলারে নামটা আগেই দেখেছি, রাহুল দত্ত। তার মানে সান অফ গোষ্ঠবিহারী দত্ত, তাই তো?"

ভীষণ চমকে উঠলাম। এ তো মারাত্মক মেয়ে! মেয়ে না, মেয়েছেলে! দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "কী জানেন আপনি?"

"জানি যে আপনি আমার বাবার অযোগ্য সন্তান। বাবার ডাই-ইন-হার্নেসের চাকরিটা আপনি নয়, আমিই করব।"

"আপনার বাবা মানে! আপনি...জালিয়াত, ফ্রড কোথাকার! অন্যের বাবাকে নিজের বাবা বলে চালাচ্ছেন..."

"মুখ সামলে!"

"কীসের মুখ সামলে! ফ্রড, চিট, তোকে আমি পুলিশে দেব।"

"আমি ফ্রড! তুই কী? গেঁজেল, মাতাল, অকম্মার ঢেঁকি। আমি প্রমাণ করে দেব গোষ্ঠবিহারী দত্ত আমার বাবা।"

"তুই রাখ ফোন, তোকে আমি দেখে নেব।"

"তুই কত বড়ো হনু সেটা আমিও দেখব।"

"চোপ।"

"চোপ।"

"তবে রে..."

"তবে রে..."

ফোনটা কেটে দিলাম। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। পুরো ভেজা ফ্রাই করে ছাড়ল মেয়েটা। বলল, ও নাকি প্রমাণ করে দেবে ও গোষ্ঠবিহারী দত্তর মেয়ে!

এখুনি একজন উকিলের সঙ্গে কথা বলা দরকার। অনিমেষকাকু বাবার বন্ধু, জেলা কোর্টের উকিল, ব্যারাকপুরের দিকে কোথায় যেন থাকেন। বাবার অসুস্থতার সময় মাঝেমধ্যে বাড়িতে আসতেন। অবশ্য ইদানীং আমাকে এড়িয়ে চলতেন। ছোট্ট ঘটনা, এমন কিছু নয়। তার জন্য উকিল ভদ্রলোক বখেরা খাড়া করে দিলেন। আমার গাঁজার ঠেকের বন্ধু নাককাটা অসীম ক্ষুদিরাম কলোনি থেকে একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে দিঘা পালিয়ে গিয়েছিল। ফিরে আসার পর মেয়েটা আবার নিজের বাড়ি ফিরে যায়। ঘটনাটা নিয়ে সেদিন মালের ঠেক-এ খুব খিল্লি, আলোচনা হয়েছিল। আমি মালটাল টেনে বাড়ি ফিরে দেখি বাবার ঘরে অনিমেষকাকু বসে। ভদ্রলোককে কিছুটা রসিকতা করেই আচমকা প্রশ্ন করেছিলাম, "কাকু, বিয়ের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেয়েদের সঙ্গে সহবাস করলে কি সিআরপিসি-র ধারা লাগু হয়? নাকি ওটা পি এন পি সি-তেই মিটে যায়?"

কথাটা শুনে প্রথমে উনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরেই প্রচণ্ড রেগে উঠে চলে গিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাতে অবশ্য আমার কিস্যু যায় আসেনি। ভেবেছিলাম উকিল অনিমেষ চৌধুরীকে আমার জীবনে কখনো দরকার পড়বে না, কিন্তু নিজের চাকরির প্রয়োজনে আজ এতদিন পর ফের দরকার পড়ল।

ফোন করলাম অনিমেষকাকুকে। "কাকু, আমি বান্টি, মানে রাহুল।"

ফোনের ওপাশে কাকুর বিরক্ত গলা, "চিনেছি। বলো।"

"ডাই-ইন-হার্নেসের চাকরির একাধিক দাবিদার থাকলে সেক্ষেত্রে কী হবে কাকু?"

"চাকরি তো একজনেরই হবে। বাকিদের নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট লাগবে।"

"নো-অবজেকশন লাগবেই?"

"হ্যাঁ, ওটা লাগবেই।"

"ওটা ছাড়া হবে না?"

"না।"

"মানে, একেবারেই হবে না?"

শেষবার "না" বলে কাকু ফোনটা কাটলেন, কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম ফোন কাটার আগে উনি স্বগতোক্তি করলেন, "মামারবাড়ির আবদার নাকি!"

ওঁর শেষ কথাটা শুনে ঝট করে মনে হল, মামারা কি কোনোভাবে জানতে পারে, বাবার দ্বিতীয় বিবাহ কিংবা একাধিক বিবাহ হয়েছিল কিনা! আমার দুই মামা, তার মধ্যে বছরখানেক আগে বড়োমামা গত হয়েছেন, ছোটোমামা আবার আমার অভব্য আচরণ, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের কারণে ইদানীং আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। তবুও মরিয়া হয়ে তাঁকেই ফোন করলাম।

"মামা, আমি বান্টি বলছি।"

"এত রাত্তিরে ফোন করেছ, সব ঠিক আছে তো? অবশ্য এখন দিদি-জামাইবাবু নেই, তোমার ভালো থাকারই কথা।"

শ্লেষটা গায়ে মাখলাম না, বললাম, "মামা, আমার বাবা কি দুটো বিয়ে করেছিলেন?"

"কী যাতা বলছ? আবার ওসব ছাইপাঁশ খেয়ে রাতদুপুরে মাতলামি করছ?"

"না মামা, সত্যি বলছি, ফুল সেন্সে আছি আমি। কিন্তু আমার জানা দরকার, বাবার কোনো প্রেমিকা ছিল কিনা কিংবা কোনো অবৈধ প্রেম..."

"রাখো ফোন," ওপাশ থেকে ছোটোমামা ধমকে উঠলেন, "তোমার বাবা একজন দেবতুল্য মানুষ ছিলেন, আজীবন আমার দিদিকে প্রাণ ঢেলে ভালোবেসেছেন। তোমার মতো অকালকুষ্মাণ্ড ছিলেন না। শোনো, তুমি আর আমাকে একদম ফোন করবে না।"

ওপাশ থেকে ফোন কেটে গেল। আমি পড়লাম মহা বিপাকে। যাকে বলে দুর্বিপাক! কোত্থেকে একখানা সমবয়সি বোন তৈরি হয়ে গেল! চব্বিশ ঘণ্টা আগেও জানতাম না। এ মেয়ে এসেই ঝড়ের মতো ঝাপটা দিচ্ছে। যে সে ঝড় নয়, সুপার সাইক্লোন। যতবার অনিমেষকাকুর 'নো-অবজেকশন চাই' মনে পড়ছে, ততবার এই রাতদুপুরেও মটকা গরম হয়ে যাচ্ছে। প্রতিভা দত্তর ফোন নম্বরটা সার্চ করে দেখলাম, এটাই ওর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর। একটা মেসেজ টাইপ করলাম—'টিয়ারানি, তুই একটা ফ্রড, জোচ্চোর। তুই জালি করে আমার বাবার চাকরি নিবি? দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি।' —তারপর সেই বার্তাবাণ প্রতিভা দত্তকে পাঠিয়ে দিলাম।

এক মিনিটের মধ্যে বার্তাবাণের উত্তরে অগ্নিবাণ ছুটে এল—'আর একটা বাজে কথা লিখলে, সব মেসেজ লালবাজারের সাইবার সেলে ফরোয়ার্ড করে দেব। ওদের জানিয়ে দেব তুই আমাকে স্টকিং করছিস!'

মেসেজটা পেয়ে ঘাবড়ে গেলাম। সাংঘাতিক মেয়ে তো! বুঝলাম এবার লড়াই সেয়ানে সেয়ানে। এভাবে ভয় দেখিয়ে, গাল পেড়ে হবে না। সামনাসামনি দেখা করে একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে।

॥ ৩ ॥

পরের মঙ্গলবার দশটা নাগাদ বাবার খাদ্যদপ্তরের অফিসে হাজির হলাম। দশটা নাগাদ সরকারি দপ্তর ফাঁকা। আমি হেডক্লার্ক জয়কৃষ্ণ তালুকদারের টেবিলের উল্টোদিকে ভিজিটর্স চেয়ারে বসেছি। এরপর দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত একজন দুজন করে কর্মচারী অফিসে ঢুকছে আর আমাকে অবাক হয়ে দেখছে। জয়কৃষ্ণ তালুকদার অফিসে ঢুকলেন সোয়া এগারোটা নাগাদ। আমাকে দেখে হাসলেন, "কী ব্যাপার, আজ সাত সকালে এসে পড়েছেন, ভাই!"

"নাহ্, মানে আপনিই তো বলেছিলেন আজ প্রতিভা দত্ত আসবে। তাই ঠিক করেছি সামনাসামনিই জোচ্চোরটাকে ধরব।"

"এই মরেচে! সে তো গতকালকেই হঠাৎ ফোন করে চলে এল। এই দেখুন না, ইস্কুল-কলেজের সব সার্টিফিকেটের অরিজিনাল দেখিয়ে জেরক্স জমা দিয়ে গেল।"

আমার চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। মেয়েটা আমার সঙ্গে একটা বিশ্রী খেলায় নেমেছে! ও ভাবছে আগেভাগে কাগজপত্র জমা দিলে, দ্রুত প্রসেসিং হয়ে ওর চাকরিটা আগে হয়ে যাব। কিন্তু আমার নামও রাহুল দত্ত, গ্যারাজ-মেকানিক দিলুদার ছাত্র! কমলি ছোড়েগা নেহি!

হঠাৎ অনিমেষ কাকার কথাটা মনে পড়তে জয়কৃষ্ণবাবুকে বললাম, "কিন্তু আমিও যখন চাকরিটার ন্যায্য দাবিদার, তখন আমি নো-অবজেকশন না দিলে প্রতিভা দত্তের এই চাকরিটা তো হবে না।"

"তা অবিশ্যি ঠিক," জয়কৃষ্ণবাবু কান খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, "কিন্তু বান্টিবাবু, আপনার বাবার পি এফ, গ্রাচুইটি বাবদ যে টাকাটা প্রাপ্য হয় তার অর্ধেক তো ওকে ছাড়তে হবেই।"

এ-কথাটা তো আগে ভাবিনি! শুধু ডাই-ইন-হার্নেসের চাকরিটা নিয়ে ভাবছিলাম!

"জয়কৃষ্ণকাকু, ওই যে পি এফ আর কীসব বললেন, ওগুলো বাবদ বাবার কত টাকা প্রাপ্য হয়?"

"তাও নয় নয় করে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ লাখ টাকা তো হবেই।"

টাকার অঙ্কটা শুনে প্রায় চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম। পরক্ষণে যেই মনে হল পঁয়ত্রিশ লাখের অর্ধেক, মানে সতেরো লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা কোন এক অলপ্পেয়ে প্রতিভা দত্তের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে, তখনই মুখটা তেতো হয়ে গেল। পেটের ভিতর অ্যাসিড হয়ে বুকজ্বালা শুরু হয়ে গেল।

"অবিশ্যি আপনার মা বেঁচে থাকলে, গোষ্ঠবাবুর ফ্যামিলি পেনশনটাও পেতেন। তখন অবিশ্যি দ্বিতীয় স্ত্রীর অস্তিত্ব নিয়ে আরেকটা দ্বন্দ্ব তৈরি হত।" জয়কৃষ্ণবাবু ফের বললেন।

মাথার মধ্যে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। আরে, এর আগে আমার প্রতিভা দত্তর মায়ের কথা মনে পড়েনি কেন! আমি তো এই ভদ্রমহিলার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালেই সত্যিটা জানতে পারব। তড়িঘড়ি বললাম, "জয়কাকু, এই প্রতিভা দত্তের মা কখনো এখানে আসেননি? ওঁর নাম কী?"

"বোঝো কাণ্ড! উনি কী করে স্বর্গ থেকে এখানে নেমে আসবেন?"

"মানে!"

"মানেটা তো সোজা," জয়কৃষ্ণবাবু কষাটে হাসি মুখে টেনে বললেন, "ভদ্রমহিলা তিন বছর আগেই মারা গেছেন। এই তো ওঁর ডেথ সার্টিফিকেট জমা দিয়ে গেছে মেয়েটি।"

কথাগুলো বলে ফাইল থেকে একটা ডেথ সার্টিফিকেট বের করে এগিয়ে দিলেন জয়কৃষ্ণ তালুকদার।

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে দেখি মৃত্যুর সার্টিফিকেটে গোটা গোটা অক্ষরে ছাপা আছে—মৃতের নাম—শ্রীমতী অর্চনা দত্ত, স্বামী—গোষ্ঠবিহারী দত্ত, বয়স—আটচল্লিশ!

কোনো ভুল নেই! মৃত্যুর তারিখ তিন বছর আগের একটা দিন।

আমি বেশ ঘাবড়ে গেছি। শুধু ঘাবড়েই যাইনি, দমেও গেছি। এতদিন মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা একটা প্র্যাঙ্ক, কিন্তু এখন তো প্রমাণ আমার চোখের সামনে! তার মানে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার বাবার সত্যিই বিয়ে হয়েছিল। ইচ্ছা করছিল এই সার্টিফিকেটটা নিয়ে গিয়ে আমার ছোটোমামার নাকের সামনে ধরে বলি—'এই দেখো, তোমার জামাইবাবু কেমন দেবতুল্য ছিল! তোমার দিদিকে সারাজীবন ঠকিয়েছে। আমি না হয় মদ, গাঁজা, ভাং খাই, কিন্তু তোমার জামাইবাবু মানে আমার পিতৃদেব আমার চেয়েও এককাঠি ওপরে, বউ থাকতে অন্য মেয়েমানুষের সঙ্গে লটরপটর করত!'

সন্ধেবেলা দিলুদার গ্যারাজের ঠেকে গিয়ে মনের দুঃখে মালটাল খেয়ে কেৎরে পড়লাম। তপনা, নাককাটা অসীম, পেটো পমপম, মুরগি নিতাই সকলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছিল। পেটো পমপম বলল, "কীরে বান্টি, বাবার ডাই-ইন-হার্নেসের চাকরি বাগাচ্ছিস, পার্টি-ফার্টি দিবি না, বস্?"

আমি প্রায় বুক ছেড়ে কেঁদে উঠতে যাচ্ছিলাম। মনের ভিতর জমানো দুঃখ কান্না হয়ে বেরিয়ে এলে একটা চোখের জলের পুকুর হয়ে যেত। দিলুদা বলল, "মালটা কেস খেয়েছে। এই পঁচিশ বছর বয়সে নতুন করে বোন হয়েছে। সে বোন আবার বলছে দাদার চাকরি নিয়ে নেবে।"

ঠেকের সবচেয়ে সিরিয়াস ছেলে মুরগি নিতাই, বাজারে মুরগি কাটে, সে সব শুনেটুনে বলল, "চল টিয়াকে আস্তে করে জবাই করে দিই।"

শুনে বিস্ময়ে আমার চোয়াল ঝুলে পড়ল, বলে কী নিতাই!

"ঠিকই বলেছি। না রহেগা বাঁশ, না বাজেগি বাঁশুরি!"

সবাই একবাক্যে বলল, একবার টিয়াকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিতে পারলে চাকরি তোমার হে রাহুলচন্দ্র।

একটা খুন করা যে-সে কথা নয়। ধরা পড়লে ভারতীয় দণ্ডবিধির দশটা ধারা লাগিয়ে দেবে। তখন চাক্কি পিষিং অ্যান্ড পিষিং। তপনা বলল, "ধরা পড়বি কেন, ফুলপ্রুফ প্ল্যান বানাতে হবে, সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপাট করতে হবে, অ্যালিবাই তৈরি করতে হবে। খুন করার অনেকরকম নিরাপদ পদ্ধতি আছে, যেমন ধর উঁচু বিল্ডিংয়ের ওপরে নিয়ে গিয়ে টুক করে একটা পুশ। তোর ওই খাদ্যদপ্তরের বিল্ডিংটা কত উঁচু? ওখান থেকেও হতে পারে।"

আমি ভয়ে ঘেমে উঠলাম, তড়িঘড়ি 'দিলুদা, আজ বাড়ি যাই' বলে হাঁটা লাগালাম।

পিছন থেকে তপনা বলে উঠল, "ভাই, আমার সাজেশনটা ভেবে দেখিস, খুন করাটা কঠিন কিছু নয়, একবার অভ্যাস হয়ে গেলে তখন জলভাত মনে হবে।"

বাড়ি ফিরে রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা স্বপ্ন দেখলাম। আমি টিয়াকে খুন করে ফেলেছি। খাদ্য ভবনের তলায় পড়ে আছে টিয়ার লাশ। আমি নাচতে নাচতে অফিসে গিয়ে চাকরিতে জয়েন করতে যাব এমন সময় দেখি একটা ইয়া লম্বা লাক্সারি বাস এসে সেখানে দাঁড়াল। বাস থেকে লাইন দিয়ে একশোজন ছেলে নেমে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কোথায় যাবে? ওদের মধ্যে একজন বলল, আমরা ডাই-ইন-হার্নেসের চাকরি করব বলে এসেছি। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, তোমাদের বাবার নাম কী? ছেলেটা উত্তর দিল, আমাদের বাবার ডাকনাম ধৃতরাষ্ট্র...ভালো নাম গোষ্ঠবিহারী দত্ত।

ব্যস্। তখনই ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখি সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। সত্যিই তো, একটা প্রতিভা দত্তকে খুন করলে ফের আরও ভাইবোন গজিয়ে উঠবে না তার গ্যারান্টি কি! বাবার উপর খুব রাগ হল, মনে হল, তাঁরই তো লিখে যাওয়া উচিত ছিল—'আমার অকালমৃত্যুর পর, আমার স্থলে সরকারি চাকুরি পাইবে আমার সুপুত্র শ্রীমান রাহুল দত্ত। রাহুল ব্যতীত আমার বৈধ ও অবৈধ যত সন্তান আছে তাহারা কেহ এই চাকুরির দাবিদার হইতে পারিবে না।'

পরদিন বাজারে গেছি। পিছন থেকে একজন পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন, "আরে, রাহুল যে! তারপর, কী খবর!"

পিছন ফিরে দেখি আমার কলেজের বাংলার অধ্যাপক সুধন্য সরকার ওরফে এসএস। স্যারকে দেখলে এড়িয়ে চলতাম, আজ ধরা পড়ে গেলাম। স্যার একটু সদালাপী গোছের মানুষ, একবার কথা বলতে শুরু করলে এক ঘণ্টার আগে থামেন না। ভাবলাম, নিজের আতান্তরের কথাটা বললে তার হাত থেকে সহজে নিস্তার পাওয়া যাবে। উনি আমার করুণ কাহিনি শুনে উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন—"অভূতপূর্ব, অভাবনীয়, অনির্বচনীয়! তুমি এখুনি আমার বাড়ি চলো। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি জানো না, তুমি আমার কত বড়ো সমস্যার সমাধান করে দিলে!"

বোকার মতো সুধন্যস্যারের দিকে তাকিয়ে আছি। উনি আমাকে বগলদাবা করে ওঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখি পাঁচ-ছয়জন পাঞ্জাবি পরা দাড়িওলা ছেলে বসে আছে। এরা নাকি সবাই স্যারের বাংলা পিএইচডি-র ছাত্র। আমাকে পাশে বসিয়ে স্যার তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের পিএইচডি-র অভিনব এক বিষয় পেয়েছি—'মহাভারতের শুরবীরদের সন্তানদের উত্তরাধিকারের আতান্তর!'"

সকলে হাঁ করে শুনছে। স্যার বলছেন, "মনে করো, যুধিষ্ঠিরের দুটি পুত্র—প্রতিবিন্ধ্য আর যৌধেয়। প্রথমজনের মা দ্রৌপদী, দ্বিতীয়জনের দেবিকা। তারপর ভীমের পুত্রেরা—ঘটোৎকচ, সুতসোম, সর্বজ্ঞ। এদের সবার মা আলাদা আলাদা। তারপরে ধরো, অর্জুন। তার পুত্রেরা—অভিমন্যু, শ্রুতকর্মা, ইরাবান, বভ্রুবাহন। এবার ভাবো, এদের পিতাদের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের সময় কী আতান্তরেই না পড়তে হত! এই যে জ্যেষ্ঠপুত্রই উত্তরাধিকারী হবে, এই থিওরিটাই বা কোথা থেকে এসেছিল? পাণ্ডবদের পুত্রেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কিংবা অশ্বত্থামার হাতে মারা না গেলে এদের বাবাদের ডাই-ইন-হার্নেসের কেসে রাজমুকুট কোন কোন ছেলের মাথায় উঠত এটা ভেবে দেখেছ! এই সমস্যা থিওরি অফ রিলেটিভিটির চেয়েও জটিল। ভেবে দেখো, উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নির্বাচনে কতগুলো ফ্যাক্টর কাজ করত—জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সন্তান, পিতার প্রিয়-অপ্রিয় সন্তান, সবল-দুর্বল সন্তান, অধিকপ্রিয় মহিষী-অল্পপ্রিয় মহিষীর সন্তান—এটাই আমাদের মহাভারতের উপর সবচাইতে অভিনব গবেষণার বিষয় হবে। আর যার সৌজন্যে এই সাবজেক্ট আমি আবিষ্কার করেছি সেই রাহুলচন্দ্রও আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে।"

এই উচ্চাঙ্গের খিল্লি আর সহ্য করতে না পেরে আমি এসএস স্যারের বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম। কিন্তু বাড়ি এসেও মনের মধ্যে এতটুকু শান্তি নেই। আমার সাধের চাকরিটা এসে একজন ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। আর আমি চুপচাপ বসে দেখব!

সন্ধেবেলা টিভি চালিয়ে বসেছি। দূরদর্শনের 'ম' চ্যানেল। এটি মহিলা চ্যানেল। রিমোট দিয়ে লাফিয়ে অন্য চ্যানেলে যেতে গিয়েও থমকে গেলাম। একজন নারীবাদী কবি ইন্টারভিউ দিচ্ছেন— "পুরুষমাত্রেই পলিগ্যামি, অন্তত মনে মনে। তাদের মধ্যে বহুগামিতা জন্মগত। এক স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করার সময় অন্য নারীকেও সুযোগ পেলে ভোগ করে, আর সাহস থাকলে একাধিক নারীকে বিয়ে করে। এভাবে একাধিক নারীকে তারা ঠকায়। কিন্তু মনে রাখবেন, আমাদের সমাজে পলিগ্যামির স্থান নেই। এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ অবৈধ।"

আমার মাথা আবার আসল কথাটা ক্যাচ করে নিল—'এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ অবৈধ।'

পরদিন সকালে উঠেই আবার খাদ্যদপ্তরের অফিসে ছুটলাম। জয়কৃষ্ণ তালুকদারের সামনে বসে একটা জয়ের হাসি দিয়ে বললাম, "জয়কাকু, এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ অবৈধ। আমাদের সমাজ পলিগ্যামির প্র্যাকটিসকে বৈধতা দেয় না। তাই আমার বাবার দু-নম্বর বিয়েটা অবৈধ। বাবার প্রাপ্য টাকা আর চাকরিতে দাবি মিস প্রতিভা দত্তের থাকতে পারে না। ওকে বলে দেবেন এবারের মতো ও চান্সটা মিস করল।"

"তাই নাকি!" বলে জয়কৃষ্ণ তালুকদার ফের বগল চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "ওরে কে আছিস, এই গৌর, আমাদের পশুপতি ঘোষের লেখা 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভিস রুল'-টা নিয়ে আয় দিকি।"

গৌরহরি নামের অফিস-পিওনটি একটা থানইট সাইজের ঢাউস বই নিয়ে ধড়াম করে টেবিলের উপর রাখল। জয়কৃষ্ণবাবু বইটার পাতা ওল্টাতে শুরু করলেন। আমি তাকিয়ে আছি, উনি পাতার পর পাতা উল্টেই যাচ্ছেন। হঠাৎ একটা জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালেন, "এই তো পেয়েছি। আইনে বলছে, বিয়ে অবৈধ হলেও তাদের সন্তানাদিকে অবৈধ বলা যায় না। আইন এখানে সন্তানদের

ব্যাপারে সহানুভূতিশীল। বাপের চাকরির টাকায় তাদের অধিকার ন্যায্য।"

আমি হতাশ চোখে তাকালাম। তাহলে সেই থোড় বড়ি খাড়াই রয়ে গেল। বাপের অর্থে সব সন্তানের সমান অধিকার, সে বৈধ কি অবৈধই হোক।

॥ ৪ ॥

ভাবলাম, শেষ পর্যন্ত মুরগি নিতাইয়ের দেখানো পথ ছাড়া আর গতি নেই! আমার পথের কাঁটা সরাতে গেলে প্রতিভা দত্তকে খুনটা করতেই হবে। রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে গেলে আমার ডাই-ইন-হার্নেসের সরকারি চাকরি বাঁধা। অবশ্য তারপরেও যদি আরও দু-চারটে ভাইবোন কোথাও গজিয়ে যায় তখন অবশ্য সিরিয়াল কিলিং শুরু করতে হবে। তপনা বলেছে, একবার খুন করে ফেললে পরের খুনগুলো জলভাত হয়ে যায়।

ঠিক তখনই টিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল,

প্রথমে খুনের মোডাস অপারেন্ডি ঠিক করে নিতে হবে। বন্দুকের অনেক দাম, জোগাড় করার অনেক হ্যাপা, তাই বন্দুক বাতিল। ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করাও যাবে না, রক্ত দেখলে আমার নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়। তাই ছুরি, কাঁচিও চলবে না। বিষ খাইয়েও হবে না, বিষের কোনো গ্যারান্টি নেই, বিষে ঘরের ইঁদুর-আরশোলাই মরে না তো মানুষ! উঁচু বিল্ডিংয়ে নিয়ে যাওয়ার সমস্যা আছে, আজকাল যত বড়ো বড়ো বিল্ডিং আছে সব জায়গায় সিসিটিভি বসানো থাকে। তাছাড়া উঁচুতলায় ওঠার সময় লিফটম্যান দেখবে, উইটনেস থেকে যাবে!

অনেক ভেবেচিন্তে একটা পথ বেছে নিলাম। প্রতিভা দত্ত ওরফে টিয়ারানিকে ফোন করে বললাম, "আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। বাবার বিষয়ে কিছু কথা জানতে চাই। বাবাকে আমি একরকম ভাবে চিনি, আপনি হয়তো অন্যরকম ভাবে চেনেন।"

ফোনের ওপাশে টিয়া খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "বেশ। আমার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কোনোরকমের অফেন্সিভ কথা নয়, তাহলে কিন্তু..."

"আপনি পুলিশে ডায়েরি করবেন, তাই তো?"

"হ্যাঁ, তাই।"

"কোথায় দেখা করতে চান?" টিয়া বলল।

আমি আগেই ঠিক করে নিয়েছিলাম, টিয়ার বাড়ির কাছে অর্থাৎ হাওড়ার দিকে কোথাও দেখা করা যাবে না। ওর বাড়ির থেকে দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে। বললাম, "গঙ্গার ধারে কোথাও দেখা করা যেতে পারে।"

"গঙ্গার ধারে কোথায় বলুন?"

দক্ষিণেশ্বর যাওয়া যাবে না। দেবস্থানে ওসব খুন-টুন করা চলবে না। ঠাকুরের জায়গায় ওসব করতে গেলে বেশি গিল্টি ফিলিংস হবে। মনে পড়ল, সোদপুর, ব্যারাকপুর, ইছাপুর, শ্যামনগরের দিকে গঙ্গার ধারে অনেক নির্জন ঘাট আছে। কিন্তু হাওড়া থেকে কি মেয়েটা আসতে রাজি হবে, আমার নিজের মনেই সন্দেহ রয়েছে। তবু বললাম, "আপনি ইছাপুরের নবাবগঞ্জের ঘাটটা চেনেন? খুব সুন্দর, নিরিবিলিতে কথা বলা যাবে।"

টিয়া আপত্তি করল না, বলল, "ঠিক আছে, আমি পৌঁছে যাব, কবে, ক-টার সময় বলুন?"

"পরশু আসুন, এই ধরুন, বিকেল চারটে নাগাদ।"

ইচ্ছে করেই ওই সময়টা বললাম। পুজোর পর থেকে দিনটা ছোটো হয়ে আসছে, পাঁচটা নাগাদ যখন আধো অন্ধকার নেমে আসবে, তখনই কাজটা হাসিল করতে হবে। আমার বন্ধু তপনার কথায় 'টুক করে একটা পুশ'!

নির্দিষ্ট দিনটায় সকাল থেকেই খুব উত্তেজনা বোধ করছি। এই দিনটা প্ল্যানমাফিক ঠিকমতো কাটলেই আমার ডাই-ইন-হার্নেসের চাকরির পথে সব বাধা কেটে যাবে। ব্যস্, পাকা চাকরিটা একবার হয়ে গেলে আর চিন্তার কিছু নেই। বেসিক পে, ডি এ, হাউস রেন্ট, মেডিক্যাল অ্যালাউন্স মিলিয়ে মাসের শেষে মোটা রেস্ত পকেটে চলে আসবে।

ইছাপুর স্টেশন থেকে একটা রিকশা নিয়ে নিলাম। গঙ্গার দিক থেকে একটা ঠান্ডা হাওয়া বইছে। রিকশাওয়ালা জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবেন বাবু?"

"একটা নির্জন জায়গায় নিয়ে চলো যেখানে গিয়ে নিশ্চিন্তে..."

এই রে! প্রায় বলে ফেলেছিলাম, 'নিশ্চিন্তে খুন করা যাবে!' সংবিৎ ফিরতে বললাম, "যেখানে গিয়ে নিশ্চিন্তে

গঙ্গার হাওয়া খাওয়া যাবে, এই ধরো, নবাবগঞ্জ ঘাটের কাছাকাছি।''

নবাবগঞ্জের ঘাট পেরিয়ে গঙ্গার ধারে একটা পাকুড় গাছ জলের দিকে হেলে পড়েছে। তার পাশে দাঁত-বের-করা একটা পুরোনো ভাঙা ঘাট। ঘাট নয়, যেন খাড়া ইটের পাঁজা জলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। পাড়টাও জলের থেকে বেশ উঁচুতে। তবে জায়গাটা খুব নির্জন। আশেপাশে লোকজন নেই তেমন। রিকশা থেকে নেমে টিয়াকে ফোন করলাম, ''কোথায় আপনি?''

''এই তো রিকশায়, আসছি।''

টিয়ার হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকে কোনো প্রোফাইল ছবি নেই, তাই বললাম, ''চিনব কী করে?''

''কমলা রঙের ব্রাসো শাড়ি। আপনি?''

''নীল টি-শার্ট।''

মিনিটখানেকের মধ্যেই একটা রিকশা থেকে প্রতিভা ওরফে টিয়া নামল। পরনে কমলা রঙের শাড়ি। তবে খাদ্যদপ্তরের ফাইলে দেখা পাসপোর্ট ছবির সঙ্গে তেমন মিল পেলাম না। নাক-চোখ ধারালো ঠিকই, তবে রংটা মোটেই চাপা নয়, বেশ ফরসাই মনে হল। হয়তো ফটো তোলার সময় আলো কম-বেশির কারণে হতে পারে। তবে ওর ঠোঁটের ওপরে তিলটা চোখে পড়তেই কে যেন আমার ভিতরের চাপা রাগটা উসকে দিল। বেশ গনগনে হয়ে উঠেছে আঁচটা। তবু রাগ সংবরণ করে বললাম, ''এদিকে আসুন, কাজের কথাগুলো সেরে ফেলি।''

''বলুন।''

টিয়া কাছে আসতেই পারফ্যুমের গন্ধ পেলাম। মন বলল, শালা এটা তোর বোন! গন্ধটা উপেক্ষা করে বললাম, ''আপনি কি জানেন, এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয় বিবাহ, মানে পলিগ্যামি অবৈধ?''

''আপনাকে কে বলল বিয়েটা বৈধ ছিল না! প্রথম স্ত্রী অতীত হয়ে গেলে দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ হয়।''

''তার মানে! আপনি বলছেন, আট বছর আগে আমার মায়ের মৃত্যুর পর আমার বাবা আবার...''

টিয়া কোনো উত্তর দিল না, শুধু হাসল। ওর হাসি দেখে রাগে গা-পিত্তি জ্বলে গেল। হাত নিশপিশ করে উঠল, মনে হল গলা টিপে ধরি, তবু মন বলল, কন্ট্রোল, এখন নয়। মেয়েটা ভীষণ চালাক, আটঘাট বেঁধেই আমার সঙ্গে লড়াইতে নেমেছে। আমি বললাম, ''আপনার বাবা, মানে আপনার জন্মদাতা বাবার কথা বলছি, উনি কি...''

''উনি আমার ছোটোবেলাতেই...''

''মারা গেছেন?''

টিয়া ঘাড় নাড়ল।

''আমার বাবার সঙ্গে ওঁর... ইয়ে মানে, আপনার মায়ের কীভাবে আলাপ হয়েছিল?''

''গান। কীর্তন গান। নৌকাবিলাস, মানভঞ্জন, আরও নানা গান। ওই গানের আসরেই...''

''অর্চনা দত্ত কীর্তন শিল্পী ছিলেন?''

''হুম।''

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, কী আশ্চর্য, আমার মা-ও তো ভালো কীর্তন গাইতেন! গানের মাধ্যমেই মায়ের সঙ্গে বাবার পরিচয়। পরিণয়। মেয়েটা ইচ্ছে করে আমাকে উত্ত্যক্ত করার জন্য এসব বলছে না তো বানিয়ে বানিয়ে! হয়তো বাবার থেকেই আমার মায়ের কথা জেনে থাকবে, যেভাবে আমি এখন ওর মায়ের কথা জানতে চাইছি। হঠাৎ আমার মায়ের কথা ভীষণ মনে পড়ছে। মায়ের জন্য ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। মেয়েটার দিকে তাকালেই গা-টা রাগে জ্বলে যাচ্ছে। আর যাই হোক, এই মেয়েটা আমার বোন হতে পারে না। আমার মায়ের জীবনের কথা চুরি করে ওর মায়ের নামে চালাচ্ছে!

পাঁচটা বেজে গেছে। সন্ধে নেমে আসছে। ঘাটের গায়ের রাস্তাটা আরও নির্জন হয়ে উঠেছে। ধারেকাছে একটাও জনমনিষ্যি নেই। গাছে ফেরা পাখিদের কিচির-মিচির ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। টিয়া এখন ভাঙা ঘাটের একদম ধারে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। ঈষৎ অন্যমনস্ক। আমি একবার অনেক নীচে বয়ে যাওয়া ঘোলা জলের ঘূর্ণিটার দিকে তাকালাম। একবার ওই স্রোতের মধ্যে ফেলতে পারলে...এই সঠিক সময়। শুধু একটা ছোট্ট পুশ। জলে পড়ার সময় ওর আর্তনাদও পাখিদের কলরবে ঢেকে যাবে। আমি হাতটা বাড়ালাম ওর পিঠের দিকে।

ঠিক তখনই টিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, ওর দু-চোখে যন্ত্রণা মাখা, ''আমাকে খুন করতে চান! আমাকে খুন করলেই আপনার চাকরিটা পাকা, তাই না? আমাকে মারবেন না, প্লিজ। আমি বাঁচতে চাই।''

ছিটকে পিছিয়ে এলাম। কে যেন কবে একবার এভাবে বলে উঠেছিল! মনে পড়েছে, আমার মা তপতী দত্ত! ক্যান্সারের শেষ পর্যায়ে মৃত্যুপথযাত্রী আমার মা-ও এভাবেই বলে উঠেছিল, ''খোকা আমি মরতে চাই না। আমি বাঁচতে চাই।''

আমি পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলাম। আমি চাকরি চাই না। চাকরির জন্য মানুষ খুন করতে যাচ্ছিলাম! পিছনে পড়ে রইল গঙ্গার ঘাট। পিছনে পড়ে রইল টিয়ার ডাক, ''রাহুলবাবু চললেন কোথায়... রাহুলবাবু শুনুন...''

॥ ৫ ॥

আট-ন-মাস হয়ে গেছে খাদ্যদপ্তরের পথ মাড়াইনি। ডাই-ইন-হার্নেসের চাকরিতে আমার আর কোনো আগ্রহ নেই। কে জানে, হয়তো প্রতিভা ওরফে টিয়া ওই চাকরিটা পেয়ে গেছে। আসলে আমার জীবনটাই বদলে গেছে। বদলে দিয়েছে সেদিন গঙ্গার ধারে ফিরে আসা মায়ের স্মৃতির ঝলক। আমার মা তপতী দত্তের স্মৃতি আমাকে ফের মানুষ করে তুলেছে। বহুদিন হল দিলীপদার গ্যারাজের নেশার ঠেক-এ আর যাই না। বাড়ির তলায় একটা ছোটো দোকান করেছি—'তপতী স্টোর্স'। শুরুতে শুধু বিড়ি-সিগারেটের দোকান ছিল। এখন ব্যবসা একটু বাড়ায় বাচ্চাদের টফি, বাবলগাম, বিস্কুটের প্যাকেট, ডিম, কোল্ড ড্রিংস রাখছি। দোকানটাই এখন আমার ধ্যানজ্ঞান।

আষাঢ় মাসের বিকেলগুলো ঝেঁপে বৃষ্টি আসে। তখন দোকান আর জমে না, লোকেরা ঘরের ভিতর সেঁধিয়ে যায়। এরকম এক সন্ধেয় দোকানের ঝাঁপ ফেলব কিনা ভাবছি। এমন সময় নীল লেডিজ ছাতা মাথায় দিয়ে হিলজুতো ঠকঠকিয়ে একটি মেয়ে আমার দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে

চিনতে পেরে বললাম, "ও আপনি! একদিনই মাত্র দেখেছিলাম, তাও আট-দশ মাস আগে, একদিনের দেখায় মনে থাকে বলুন?"

"মনে নেই বলছেন? অত লড়াইয়ের পরও?"

"বাদ দিন, আপনার খাদ্যদপ্তরের চাকরি কেমন চলছে বলুন।"

"চলছে না মোটেই।"

"সেকী! কেন?"

হেসে বললাম, "চাকরির নতুন কোনো দাবিদার হাজির হয়েছে বুঝি?"

হেসে ফেলল টিয়া, "আমি তো চাকরিটা নিইনি। আপনার চাকরি, আপনাকেই ফেরত দিতে এলাম।"

"কী বলছেন আপনি!" উত্তেজনায় দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। "আপনার বাবার ডাই-ইন-হার্নেসের চাকরি নিলেন না কেন?"

"আমার বাবা," মেয়েটা একটা দুষ্টুমিভরা হাসি দিয়ে বলল, "ঠিকই বলেছেন, আমার বাবা, তবে গোষ্ঠকাকুকে আমি ধর্মপিতা মানতাম। ওঁর চাকরি নয়, উনি আমাকে একটা কাজ দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটাই করেছি।"

"কী কাজ?"

"শুদ্ধিকরণের কাজ। আপনাকে।"

ততক্ষণে দেখি মেয়েটির পিছনে এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন। চমকে উঠলাম। আরে, এ তো অনিমেষকাকু। অনিমেষ চৌধুরী, বাবার উকিল বন্ধু।

অনিমেষকাকু বললেন, "বান্টি, আজ তোমাকে আমি একটা ছোটো গল্প বলি। আমার এক বন্ধু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তখন মৃত্যুশয্যায়। আমার হাত ধরে বলেছিল, 'অনি তোর মেয়েটাকে আমায় দে। আমার পাষণ্ড ছেলেটাকে মানুষ করে দিক।' তখন তার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের প্রতিশ্রুতি প্রায় দিয়ে ফেলেছি, এমন সময় সেই পাষণ্ড ছেলে মদ্যপ অবস্থায় ঘরে ঢুকে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কাকু, বিয়ের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেয়েদের সঙ্গে সহবাস করলে কি সিআরপিসি-র ধারা লাগু হয়? নাকি ওটা পিএনপিসি-তেই মিটে যায়?' আমি তখন স্তম্ভিত হয়ে ভাবি এই পাষণ্ড ছেলের সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম! ভীষণ অপমানিত হয়ে ফিরে আসি।"

"পরের দিনই অসুস্থ শরীর নিয়ে গোষ্ঠকাকু আমাদের বাড়িতে আসেন," গল্পের পরের অংশটা টিয়া বলে, "তাঁর পাষণ্ড সন্তানের ব্যবহারের জন্য বারবার আমার বাবার কাছে ক্ষমা চান। আমার হাত ধরে ধরা গলায় বলেন, আমাকে ক্ষমা করে দে, মা। পরের জন্মে তুই যেন আমার মেয়ে হয়ে জন্মাস। আমি বলেছিলাম, পরের জন্মে কেন, কাকু, এই জন্মেই আমি তোমার মেয়ে হয়ে দেখিয়ে দেব।"

আমি বিমূঢ়ের মতো অনিমেষকাকু আর টিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকি। বলি, "তাহলে অর্চনা দত্ত কে!"

অনিমেষকাকু হাসেন, "বছরখানেক আগে কোর্টের সেরেস্তায় আমার কাছে টিয়ার বয়সি একটি মেয়ে এসেছিল। নাম প্রতিভা দত্ত। তার বাবা ও মায়ের মৃত্যুর পর ওয়ারিশান সার্টিফিকেট বের করতে। তখনই তার মায়ের ডেথ সার্টিফিকেট দেখে চমকে উঠি। মৃতের নাম—অর্চনা দত্ত, স্বামী—গোষ্ঠবিহারী দত্ত। আমার বন্ধু গোষ্ঠর সমনামী ছিল মেয়েটির বাবা। মেয়েটি কাজ করে চলে যাওয়ার পর সার্টিফিকেটের কিছু জেরক্স কপি আমার ফাইলে রয়ে যায়। সেই কাগজপত্র দেখে একদিন আমার মেয়ে টিয়ার এই দুর্বুদ্ধি চাপে। তখন বাপ-বেটিতে মিলে তোমার শুদ্ধিকরণের কাজে নেমে পড়ি। খাদ্যদপ্তরের হেড ক্লার্ক জয়কৃষ্ণ আমার শ্যালক, আমাদের এই কাজে তাই ওর সাহায্য পেতে অসুবিধা হয়নি। ও, বলা হয়নি, টিয়ার ভালো নাম নন্দিনী চৌধুরী।"

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

নন্দিনী ওরফে টিয়া হেসে বলে, "আপনার চাকরি ফিরিয়ে দিলাম। আমি বি.কম (পাস) নই। রসায়নে এম.এসসি। চাকদায় একটা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে পড়াই। ভালো থাকবেন রাহুলবাবু, সেদিন গঙ্গার ধারে আপনার ভিতরের পাষণ্ডটা মরে গিয়ে ভালো মানুষটা বেঁচে উঠেছিল দেখে খুব আনন্দ হয়েছিল।"

* * *

একমাস পর আমার বাবার ডাই-ইন-হার্নেসের চাকরিটায় জয়েন করলাম। সেই ঘুম ঘুম খাদ্যদপ্তরের সরকারি অফিস। তার পরের দিন বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে কীসের টানে সোজা ব্যারাকপুর স্টেশনে চলে গেলাম। ডাউন শান্তিপুর লোকাল সন্ধে সাড়ে ছটায় স্টেশনে ঢোকে। ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই আমি লেডিস কম্পার্টমেন্টের দিকে এগিয়ে গেলাম। দিদিমণি নন্দিনী চৌধুরী ট্রেন থেকে নেমেই অবাক চোখে তাকাল, "আরে, আপনি এখানে?"

"আপনার সঙ্গে চা খেতে এলাম। তাছাড়া অন্য আরেকটা কাজও আছে?"

"কী কাজ মশাই?"

ঘাড় চুলকে বললাম, "আপনার কাছে একটা দরখাস্ত জমা দেব।"

"আন্দাজ করতে পারছি কীসের দরখাস্ত।" নন্দিনী হাসল।

"তাই?"

"হুম।"

"মঞ্জুর হবে?"

"হবে। আমার বর্তমান প্রেমিকটা মরলে। ডাই-ইন-হার্নেসের কেস!"

ওর উত্তর শুনে আমি মুখটা কাঁচুমাচু করতেই নন্দিনী খিল খিল করে হেসে উঠল, "জাস্ট কিডিং! জাস্ট কিডিং! তবে কথাটা শুনে আপনার মুখখানা যা হয়েছিল না, দেখার মতো!" ❖

পাড়ার গন্ধ

জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ছবি : প্রণব হাজরা

ঘুম থেকে উঠে বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই চোখ দুটো কুঁচকে ছোটো হয়ে এল অম্বুজাক্ষর। ভীষণ রোদ। মেঘ-ভাঙা রোদ্দুর বড্ড কড়া। এই একটু আগেও বৃষ্টি হচ্ছিল। আজ আর মর্নিং ওয়াকে যাওয়া হয়নি। ভোর ছ-টাতে ঠিক ঘুম ভেঙে গেছিল। হাত বাড়িয়ে মোবাইল ফোনটা নিয়ে ফোন করেছিলেন বন্ধু সৌমিত্রকে।

'কীরে? বাইরাবি?'

সৌমিত্র বলেছিলেন—'কেমনে বাইরামু, বৃষ্টি তো কমে নাই। আমি তো সেই তখন বিছানা ছাইজ্যা উইঠ্যা পড়সি, বাইরাইতে পারতাসি না।'

'অন্য সবাই? বাইরাবো?'

'কেউ বাইরাইতে পারবো না। শুইয়া পড় আবার। বিকালে বাইরা।'

অগত্যা। আবার শুয়ে পড়েছিলেন অম্বুজাক্ষ।

তারপর ঘুম ভাঙল এই এখন। বেলা প্রায় ন-টা। আজ রবিবার তাই রক্ষে নাহলে কোর্ট-এ বেরোতে দেরি হয়ে যেত।

সৌমিত্রর সঙ্গে অম্বুজাক্ষর বন্ধুত্ব বহু বছরের—সেই ছোটোবেলা থেকেই। সৌমিত্র চাকরি জীবনে বড়ো কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এখন রিটায়ার্ড লাইফ কাটাচ্ছেন। একসঙ্গে মর্নিংওয়াকে যান। বিকেলেও হাঁটতে বেরোন। সেই ছোটোবেলার পাড়ার রাধুদার চা-এর দোকানে বসে আড্ডা মারেন।

রাধুদা এখন বুড়ো। তাঁর ছেলে শ্যামল-ই দোকান চালায়। দোকানটার অবশ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। একই রকম মাথায় কালো প্লাস্টিক চাপানো। উনুনের আঁচে চা, ঘুগনি, ওমলেট তৈরি হয়। বাটার টোস্টও। শ্যামল বার বার বলেছে, 'বাবা দোকানটা একটু বড়ো করো। ইট গেঁথে দেওয়াল তৈরি করো। আর মাথায় অ্যাসবেস্টস বা ফাইবার শিটের ছাত দাও। কেউ কিচ্ছু বলবে না। দ্যাখো না লেক গার্ডেন্স-লর্ডস বেকারির মোড়ের দোকানগুলো —সবাই জায়গা দখল করে পাকাপাকি দোকান করে নিয়েছে।'

রাধুদা রাজি হননি। বলেছেন, 'ফুটপাথ দখল করে দোকান কখন কর্পোরেশন-মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসে হটিয়ে দেবে। কী দরকার! বেশি টাকা ইনভেস্ট করে দোকান বানাব তারপর ভেঙে-ভুঙে হটিয়ে দিলে গায়ে লাগবে। তার চে যেমন আছি তেমন ভালো। সেই যে ওপার বাংলা থেকে তাড়িয়ে দিল তারপর এই

বিজয়গড়-অরবিন্দনগর-আজাদগড়-গান্ধী কলোনি অঞ্চলে এসে ডেরা বাঁধলাম। আমার মতোই কতো মানুষ সব খুইয়ে এই অঞ্চলে এসে আস্তানা গাড়ল। তারপর বিজয়গড়-অরবিন্দনগরের মোড়ে এসে দোকান পাতলাম। সেই থেকেই আছি। এই দোকান কইরাই বিয়া করসি, তগোরে মানুষ করসি—লেহাপড়া শিখাইসি। লোভ করি নাই কাজেই দুঃখ পাইবার ভয়ও নাই। তহন অন্য সরকারের আমল তারপর সরকার বদলাইতে দ্যাখলাম। কিন্তু আমারে কেউ কিসসু কয় নাই। আজ লোভ করুম ফুটপাথে বড়ো দোকান পাতুম, একদিন আইস্যা সব ভাইঙ্গা দিব। একবার ফকির হইসি, আবার ফকির হইতে বুকে লাগব। যন্ত্রনা সহ্য করতে পারুম না।'

আবেগে রাধুদার শেষের কথাগুলো 'দ্যাশের ভাষা'য় বেরিয়ে আসে।

শ্যামল এই প্রজন্মের ছেলে—'দ্যাশ, দ্যাশের ভাষা,' বাবার 'আবেগে থরথর কেঁপে ওঠা' তাকে তেমন ছোঁয় না। তবু সেও ইতিহাসে এম. এ. পাশ করা ছেলে। এই বিজয়গড় কলেজ থেকেই এম. এ. পাশ করেছে। চাকরি না পেয়ে টিউশন করে আর বাবাকে দোকান চালানোয় সাহায্য করে।

বাবার জলভরা চোখের নীচের মাসলগুলো তির তির করে কেঁপে উঠতে দেখে সে খানিকটা দমে গিয়ে বিড়বিড় করে বলতে থাকে—'হ্যাঁ লেক গার্ডেন্স—লর্ডস বেকারির দোকানগুলোর ক্ষেত্রে হয়তো বা ভেতরের কিছু ব্যাপার আছে তবুও চেষ্টা করলে আমরাও আমাদের দোকানটাকে একটু বড়ো করে তুলতে পারতাম—বিক্রিও বাড়ত।'

এই তো সেদিন শ্যামল আর রাধুর মধ্যে যখন এইসব কথাবার্তা আবার শুরু হয়েছে তখন অম্বুজাক্ষ আর সৌমিত্র দোকানের পাশে পাতা সিমেন্টের পাইপের উপর বসে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। সৌমিত্র দামি টি-শার্ট আর শর্টস পরা, পায়ে স্নিকার। হঠাৎই খবরের কাগজটা ভাঁজ করে পাশে রেখে বলে উঠেছিলেন—'শোন শ্যামল, লর্ডস বেকারি থেকে ডানদিকে সাউথ সিটি মল, বাঁদিকে নবীনা সিনেমা। ভেতরের দিকে এ কে ঘোষ মেমোরিয়াল স্কুল আর আমাদের এদিকে পল্লিশ্রীর মোড় পর্যন্ত মোট একশো চল্লিশটা ছোটোবড়ো ক্যাফে, মোমোর দোকান, রেঁস্তোরা, কাবাব-রোলের দোকান রয়েছে। সবগুলোতে অল্পবয়সি ছেলে-মেয়েদের ভিড়। যেমন ছেলেগুলো—গায়ে ট্যাটু কানে দুল হাতে সিগারেট। মেয়েগুলোও সেরকম—গায়ে ট্যাটু ছোট্ট গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট।'

অম্বুজাক্ষ পাশ থেকে ফুট কেটেছিলেন—'মেয়েগুলো অত ছোটো প্যান্ট কোথা থেকে পায় কে জানে। এক মাসের বাচ্চার মাও তার মেয়ের জন্য অত ছোটো হাফপ্যান্ট খুঁজেও পাবে না।'

সৌমিত্র অম্বুজাক্ষর কথায় সায় দিয়ে বললেন—'আজকাল তো শুনি ক্যাফে বা ওই নিভু নিভু আলো-জ্বলা রেস্তোরাঁগুলোর মধ্যে হুক্কা বারও থাকে। ছেলে-মেয়ে সবাই একসঙ্গে হুক্কা টানে।

যাই হোক তোর বাবার দোকানে এলে আমরা পুরোনো দিনের ফ্লেভার পাই। সে-ই সিমেন্টের পাইপ পাতা, ভোরবেলায় অন্ধকার থাকতে থাকতে উনুনে আঁচ, তালপাতার পাখা দিয়ে উনুনে হাওয়া দিয়ে দিয়ে উনুন জ্বালানো, তারপর ঘুগনি বানানোর গন্ধ ওমলেটে ঝালনুন ছড়ানোর গন্ধ, এসব আমাদের মতো বুড়োদের পাগল করে দেয় বুঝলি?

এই দ্যাখ অম্বুজ কাকা গান্ধী কলোনি স্কুলের স্টুডেন্ট ছিলেন, এখন নামকরা উকিল । আমি ভারতবিখ্যাত কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম, এখন রিটায়ার করেছি। একটু পরে রজত কাকা আর অংশুমান কাকা আসবেন। রজত কাকা পৃথিবী-বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার। তার তোলা ছবি ছাপবে বলে পৃথিবীর তাবড় তাবড় ম্যাগাজিনগুলো বসে থাকে। অংশুমান কাকা জগৎসেরা কোম্পানির চাকুরে ছিলেন, তিনিও আসবেন। অভিজিৎ কাকু আসবেন নামকরা ব্যবসায়ী। আমাদের আর এক বন্ধু হাইকোর্টের জজ, তিনি সামনের বছর রিটায়ার করে আমাদের গ্রুপে জয়েন করবেন। এই তো নেতাজিনগরের ছেলে।'

একটু থেমে জোরে দম নিয়ে সৌমিত্র আবার বলেছিলেন, 'আমরা কেন আসি জানিস? নস্টালজিয়া। রাধুদার মুখের ভাঙাচোরা চামড়ায় নিজেদের অতীতটাকে খুঁজে পাই—গান্ধী কলোনি, নেতাজিনগর, সমাজগড়, আজাদগড়, অরবিন্দনগর বিজয়গড়।

সেই ছোটোবেলায় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে ইস্কুলের ছুটি হওয়া। ছুটির সময় বাইরে আচারওয়ালার কাছ থেকে বড়োকুল, ছোটোকুল, ইলেকট্রিক কারেন্ট দেওয়া কালো নুন মিশিয়ে মুখে দেওয়া—এই দ্যাখ ভাবতে ভাবতেই আমার জিভে জল চলে এল।

তারপর আরো বড়ো হলাম। রাধুদার দোকানের পাশের এই সিমেন্টের পাইপটার ওপরে বসে আমরা আড্ডা গুলতানি মারতাম। বিশ্বাস কর এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মতো এক লাইন কথা বলতে গিয়ে চারটে খিস্তি করতাম না। আমাদের ছিল কনস্ট্রাকটিভ আলোচনা। সেই সময় বাংলার কালচারাল ওয়ার্ল্ড যেন টগবগ করে ফুটছে—

সুমন চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা, অঞ্জন দত্ত, শিলাজিৎ, কে নেই? তারপর এল বাংলা ব্যান্ড। চন্দ্রবিন্দু, ফসিলস, 'শহর'-এর অনিন্দ্য। আরে অনিন্দ্য তো আমাদেরই ব্যাচমেট ছিল। ওদিকে জয় গোস্বামীর কবিতা, ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত্র সেনগুপ্তর আবৃত্তি, জগন্নাথ বসু-উর্মিমালা বসুর শ্রুতিনাটক—উফফ আমরা তো পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। কলেজের ফেস্টগুলোয় উপচে পড়া ভিড়।' আবেগে সৌমিত্রর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

একটু থেমে সৌমিত্র আবার বলে উঠলেন, 'তারও পরে আমরা বন্ধুরা কাজের চাপে আলাদা হয়ে গেলাম। বহু বহু বছর আমাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না। আজ আমরা হয় রিটায়ার করে গেছি না হয় কাজে আর মন নেই। জীবন যা কাটানোর কাটিয়েছি।

একদিন আমি মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আবার রাধুদার দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম—একা। রাধুদা তখন সবে উনুনে আঁচ দিয়েছেন। রাস্তাটা ধোঁয়া ধোঁয়া।

সেই ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে পুরো সিনেমার মতো ফিরে গেলাম অতীতে—আমাদের পাড়া—বিজয়গড় —আজাদগড়—অরবিন্দনগর, সমাজগড়—গান্ধী কলোনি—নেতাজিনগর—সেই ছোটোবেলা।

আমি আবার পুরোনো বন্ধুদের ফোন নম্বর জোগাড় করে করে

সবার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। রাধুদার দোকানে আসতে বললাম।'

ততক্ষণে রজত, অংশুমান, অভিজিৎ-ও এসে হাজির। সবারই বয়স ষাট পেরিয়েছে। হয় মাথায় টাক না হয় পেটে হালকা ভুঁড়ি। অভিজিৎ অবশ্য এখনও ছিপছিপে আছেন। হাসতে হাসতে বললেন—'কী আশ্চর্য রাধুদার দোকানের পাশে সিমেন্টের সেই পাইপটা এখনো আছে! কত সরকার এল গেল, কর্পোরেশন বদলাল, কতবার রাস্তার ভোল বদলাল কিন্তু কেউই এই সিমেন্টের পাইপটাকে ফুটপাথ থেকে সরিয়ে দেয়নি।'

অম্বুজাক্ষ আনমনে গলফগ্রিনের দিকের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলেছিলেন—'গলফগ্রিনের রাস্তার দু-ধারের বড়ো বড়ো গাছের ডাল-লতা, পাতা দিয়ে তৈরি করা সামিয়ানা, বড়ো বড়ো কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়ার ঝরে পড়া ফুলে রঙিন হয়ে যাওয়া ফুটপাথ, সমাজগড়ের সরু গলিতে ঢোকার মুখে বড়ো বড়ো গাছগুলোতে বাসা বাঁধা অসংখ্য পাখির ডাক, আমার বাড়ির সামনের বড়ো বকুল গাছটা থেকে ঝরে পড়া ফুলে রাস্তার ঢেকে যাওয়া দেখব বলেই আমি আমার পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে বাইরে কোথাও বাড়ি কিনিনি। যতবার এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাব ভেবেছি ততবারই মনে হয়েছে যেন আমার বাবা-ঠাকুর্দা-ঠাকুমা আমাকে ডেকে বলছেন, 'আমাদের ছেড়ে চলে যাবি? একেবারে চলে যাবি? বাড়িতে শাঁখ বাজবে না, প্রদীপ জ্বলবে না?'

কথা বলতে বলতে গলা ধরে এসেছিল অম্বুজাক্ষর।

প্রত্যেকেরই পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন ওপার-বাংলা থেকে। তারপর থেকে সবাই এপার-বাংলারই বাসিন্দা। অম্বুজাক্ষ, সৌমিত্র, রজত,অংশুমান অভিজিৎ সবারই জন্ম, পড়াশুনো, চাকরি এই বাংলাতেই। তবু আজও আনন্দ হলে, দুঃখ হলে সবাই নিজেদের মধ্যে বাঙাল ভাষাতেই কথা বলেন।

রজত বললেন—'আমি ফোটোগ্রাফি করনের সুবাদে কত্ত দ্যাশ না ঘুরসি; চাইলেই আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড নিদেন সাউথ আফ্রিকায় থাইক্যা যাইতে পারতাম। আমগো রাজ্য থিক্যা বাইরে গেলে তো আর কেউ ফিইর‍্যা আসে না।'

অংশুমান বলেছিলেন—'আমেরিকার 'ফল কালার'-এর থিক্যা আমগো রেড রোডের দুই ধারের গাছগুলানের সৌন্দর্য কিস্যু কম না। বসন্তকাল আই মিন মার্চ-এপ্রিল মাসে রেড রোডের ধারের পলাশ আর শিমুল গাছগুলার সৌন্দর্য দেখসিস? দূর থিক্যা দ্যাখলে মনে হয় য্যান লাল আগুন লাগসে।'

অম্বুজাক্ষ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—'সামনের মাসেই দুর্গাপুজো। এই সময় নীল আকাশে পেঁজা পেঁজা মেঘের যা সৌন্দর্য তা কোনো অংশে ইটালি বা গ্রিসের নীল আকাশের চাইতে কম নয়। লন্ডন, জুরিখ বা প্যারিস কোনো আকাশই আমাকে টানেনি।'

'কী গো চা খাওনি? কখন তো চা রেখে গিয়েছি টেবিলে। কী যে সারাদিন ভাব—' বৈজয়ন্তীর কথায় চমক ভেঙেছিল অম্বুজাক্ষর। দোতলার বারান্দার এই কোণটা বড্ড প্রিয়। চারিদিকে টব থেকে ঝুলছে গাছ। গোটা বারান্দাটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে বিভিন্ন ধরনের রকমারি লতা। তারই মাঝে সুন্দর শ্বেতপাথরের টেবিলের দু-পাশে দুটো লোহার বাহারি চেয়ার নরম গদিপাতা। একটায় বসেন অম্বুজাক্ষ আর একটায় বৈজয়ন্তী। একমাত্র ছেলে রূপনারায়ণ সুপ্রিম কোর্টে ওকালতি করে। ছুটিছাটায় চলে আসে। তখন গোটা বাড়িতে হইহই পড়ে যায়। না হলে এত বড়ো বাড়িটা সত্যি সত্যিই বড়ো ফাঁকা লাগে।

সমাজগড়ে গুটিকতক বাড়িই এখনো আগেকার চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেশিরভাগ বাড়িতেই প্রোমোটার থাবা বসিয়েছে অনেক আগেই।

অম্বুজাক্ষর গোটা বাড়িটা প্রায় চার কাঠা জায়গার উপর দোতলা। চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বাড়ির চার পাশের জায়গা টুকুতে বিভিন্ন ধরণের গাছ। আম, কাঁঠাল নারকোল, সুপারি, কামিনী। বাড়ির সামনের দিকটায় বাহারি অমলতাস, রঙিন কাঞ্চন। বেশির ভাগ গাছই অম্বুজাক্ষর বাবার হাতে বসানো। বাবা চলে গেছেন বহুবছর। কিন্তু গাছগুলোর দিকে তাকালেই যেন বাবার গায়ের গন্ধ পান অম্বুজাক্ষ।

(হিয়ার বাবা নিশ্চয়ই হিয়ার মাকে মারছে)

আজকাল অম্বুজাক্ষর দিনের বেশির ভাগ সময় কাটে দোতলার এই বারান্দায় বসে। এটা দক্ষিণের দিক। সামনে খানিকটা খোলা জায়গা থাকায় এই দিকটায় বেশ হাওয়া খেলে। আর কত রকমের পাখিই না আসে! সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চায়ের কাপে

চুমুক দেন অম্বুজাক্ষ। ফ্লেভার্ড চা—চিনি ছাড়া লিকার। জোরে চুমুক দিয়েই মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করেন 'আঃ'।

টুইইই টুইইই করে একটা পাখি অনেকক্ষণ ধরে ডেকেই যাচ্ছে। কোথায় ডাকছে পাখিটা? অম্বুজাক্ষ মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাখিটাকে খুঁজতে লাগলেন। দেখতে না পেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে বারান্দা থেকে শরীরটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে কাঁঠাল গাছের ঘুপসি পাতার মধ্যে পাখিটাকে খুঁজতে লাগলেন। তখনই চোখে পড়ল বাচ্চাটা। একা একা আপনমনে খেলছে আর গান গাইছে—'ম্যায় হু জিয়ান বড়া তাকৎবর।'

অম্বুজাক্ষর ছেলে যখন ছোটো ছিল তখন টিভিতে একটা কার্টুন দেখত—ডোরেমন। সেখানে জিয়ান বলে একটা ক্যারেক্টার ছিল —বাচ্চা ছেলে, একটু দুষ্টু। বাচ্চাটা সেই কার্টুনের গানটাই গাইছে।

বড়ো কাঁঠাল গাছটার ঠিক কোনাকুনি নতুন একটা অ্যাপার্টমেন্ট হয়েছে। তারই একটা ফ্ল্যাটের জানালা অম্বুজাক্ষর দোতলার বারান্দার মুখোমুখি।

ফ্ল্যাটের জানালায় পর্দা লাগানো নেই। সেইজন্য বেশির ভাগ সময় ঘরের ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যায়। সেখানেই গত কয়েকমাস হল একটা ফ্যামিলি এসে উঠেছে। ভাড়াই নিয়েছে। কারণ ফ্ল্যাটের মালিককে তিনি চেনেন—ছোটোবেলা থেকেই। অম্বুজাক্ষরই কাছাকাছি বয়সি।

আগে বাড়িটা ছিল—টিনের চাল দেওয়া বেড়ার ঘর। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে গাছও ছিল প্রচুর। এদিকটায় বাড়ি করতে কেউই প্ল্যান স্যাংশান করে না। বেশির ভাগ লোকের বাড়ি বা জমির সঠিক কাগজও নেই। দখলি জমি। তবে প্রোমোটারের তাতে কোনো সমস্যা হয়নি। তারা ফ্ল্যাট তৈরি করে বিক্রিও করে দিচ্ছে।

এই বাড়িটাও সেইরকম প্রোমোটারের সঙ্গে চুক্তি করে চারটে ফ্ল্যাট পেয়েছে বাড়ির মালিক। চারটেতেই ভাড়া দিয়ে নিজে অন্য কোথায় যেন থাকে।

এই ফ্ল্যাটটা যারা ভাড়া নিয়েছে তাদের একটা ছোট্টো মেয়ে আছে—চার-পাঁচ বছর বয়স, রোগা হাড় বের করা চেহারা। বেশির ভাগ সময় সাদা হাতকাটা টেপ জামার মতো একটা জামা পরে ওই জানলাটার পাশে পাতা খাটে শুয়ে থাকে। আর ফর্সা ফর্সা ছোট্টো পা দুটো তুলে দেয় জানালার গ্রিলের উপর।

কখনো কখনো অম্বুজাক্ষ বারান্দার একেবারে কাছে চলে আসা পাখিদের বিস্কুটের টুকরো ভেঙে ভেঙে খাওয়ান। বিভিন্ন ধরনের পাখি আসে। ছটফটে টুনটুনি আর চড়ুই। ল্যাজঝোলা ফিঙে অথবা ছাতার। শালিক আর কাক তো রয়েইছে। বারান্দার কোণে বসানো থাকে কোনা উঁচু বাটিতে জল। অম্বুজাক্ষ মনে করেন পাখিই হোক বা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো বেড়াল-কুকুর। খাবারটা সবাই মোটামুটি জোগাড় করেই নেয় কিন্তু ওরা সমস্যায় পড়ে খাবার জন্য জল নিয়ে। অম্বুজাক্ষর ছোটোবেলায় রাস্তায় মুখ খোলা ড্রেন ছিল, পাড়ার মোড়ে মোড়ে টিউবওয়েল ছিল। কুকুব-বেড়ালেরা সেখান থেকে খাবার জলটা পেয়েই যেত। আজকাল তো সেই খোলামুখ ড্রেনও নেই আর মোড়ে মোড়ে টিউবওয়েলও নেই।

সেইজন্য অম্বুজাক্ষ দোতলার বারান্দায় জলের বাটি রেখেছেন। ছাদেও রেখেছেন বড়ো গামলায় জল।

যদি পাখিরা উড়তে উড়তে হাঁপিয়ে গিয়ে জল খেতে চায় যেন পায়। এছাড়া বাড়ির সামনেও মাটির গামলায় জল রাখেন পাড়ার কুকুর-বিড়ালদের জন্য।

আজকাল বারান্দায় সময়টা ভালোই কাটে অম্বুজাক্ষর। মাঝে মাঝে টবে বসানো গাছগুলোর যত্নআত্তি করেন, খবরের কাগজ কিংবা গল্পের বই পড়েন আর উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের বাচ্চাটার সঙ্গে গল্পগুজব করেন। ওর নাম হিয়া। বাচ্চাটা নিজেই বলে ও নাকি ওর মায়ের 'হিয়ার মাঝে' ছিল। তাই ওর জন্মের পর ওর নাম রাখা হয়েছে হিয়া।

সেদিন হিয়া অদ্ভুত একটা কথা বলল। যদিও অম্বুজাক্ষ খুব একটা গা করেননি তবুও শুনে চমকে গেছিলেন। জানলার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেছিল—'দাদু ও দাদু, তুমি কি উকিল?'

অম্বুজাক্ষ বলেছিলেন—'হ্যাঁ, তুই বড়ো হয়ে উকিল হবি?'

হিয়া অম্বুজাক্ষর কথায় পাত্তা না দিয়ে আনমনে বলেছিল—'মাও তাই বলছিল।'

অম্বুজাক্ষ খবরের কাগজটা পড়তে পড়তে হিয়ার কথায় উৎসাহ পেয়ে কাগজটা ভাঁজ করে পাশে রেখে বলেছিলেন—'মা আর কী বলছিল?'

হিয়া ডানহাতে তার রোগা হাড় বের করা কাঁধ থেকে প্রায় নেমে যাওয়া টেপ জামাটা ঠিক করতে করতে বলেছিল—'তোমার কাছে যাবে।'

অম্বুজাক্ষ অবাক হয়ে বলেছিলেন—'কেন? তোর মা আমার কাছে আসবেন কেন?'

হিয়া অম্বুজাক্ষর উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার বলে উঠেছিল—'জানো দাদু, পাপা না মাকে খুব মারে। দুম দুম করে মুখে ঘুঁষি মারে, বেল্ট দিয়েও মারে। মায়ের চোখে কালো দাগ হয়ে গেছে। ওই দাগকে কী বলে জানো? কালশিটে।'

মুহূর্তে অম্বুজাক্ষ যেন সপাটে চাবুকের বাড়ি খেয়েছিলেন। এইটুকু বাচ্চা বলে কী? ওর বাবা ওর মাকে বেল্ট দিয়ে মারে? ঘুঁষি মারে? চোখে কালশিটে?

এর আগে বারান্দায় বসে কয়েকবার হিয়ার বাবা-মাকে দেখেছেন অম্বুজাক্ষ। অল্পবয়সি আজকালকার স্বামী-স্ত্রী যেমন হয় আর কি। দুজনেই বাড়িতে হাফ প্যান্ট আর টি-শার্ট পরে। ছেলেটি তো বেশ সুপুরুষ। গালে বিরাট কোহলি টাইপ দাড়ি। মাঝে মাঝে খাটের উপর ল্যাপটপ নিয়ে বসে কী যেন করে—হয়তো 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম'। সেইজন্য বাইরে-টাইরে বিশেষ বেরোয় না।

মা-টিও একইরকম। সেও সারাদিন ল্যাপটপ নিয়ে বসে থাকে। আর হিয়া থাকে হিয়ার মতো। কোনো জ্বালা-যন্ত্রণা নেই মেয়েটার। বাবা-মার কাছে বায়না-টায়নাও বিশেষ করে না। খুব লক্ষ্মী বাচ্চা বলতেই হয়।

হিয়া নিজের মনে কথা বলেই যাচ্ছিল—'জানো দাদু, আজ আমাদের বাড়িতে রান্না হয়নি। পাপা কিছু না খেয়েই কোথায় যেন চলে গেল। মাও পাশের ঘরে শুয়ে আছে।'

তারপরই মুখের কাছে বাঁ হাতটা এনে মুখটা আড়াল করে ফিসফিসিয়ে কথা বলার ভঙ্গিতে বলতে লাগল—'পাপার একটা গার্লফ্রেন্ড আছে। তার সঙ্গে পাপার অনেক ছবি আছে। মা জেনে গেছে। তাই তো এত গন্ডগোল।'

হঠাৎই হিয়ার মা এসে গেছিল। বোধহয় পাশের ঘর থেকে। অম্বুজাক্ষর সঙ্গে মেয়ের কথোপকথন শুনে ফেলেছিল।

'অ্যাই কী হচ্ছে? দাদুকে ডিস্টার্ব করছ কেন? চলো, আমার সঙ্গে ওই ঘরে চলো', বলে হিয়াকে জাপটে কোলে তুলে জানালার কাছ থেকে নিয়ে সরে গেছিল।

কিন্তু হিয়ার মায়ের ডান চোখের বীভৎস ফোলা ভাব আর কালশিটে অম্বুজাক্ষর নজর এড়ায়নি। মনে মনে দুঃখ পেয়েছিলেন অম্বুজাক্ষ।

ও তাহলে এই ব্যাপার! হিয়ার বাপটা অন্য মেয়ের পাল্লায় পড়েছে, সেটা ওর মায়ের জেনে ফেলাতেই যত অশান্তি! বাবা-মায়ের অশান্তিতে বাচ্চাদের যে কী কষ্ট তা বলার কথা নয়। গত চল্লিশ বছরের ওকালতি জীবনে অম্বুজাক্ষ এই ব্যাপারটা ভালোই বুঝেছেন।

আরে বাবা বাচ্চাকে যদি ভালোবাসা না দিতে পারো তাহলে বাচ্চার জন্ম দেওয়া কেন? বাচ্চার জন্ম কি শুধুই কয়েক মুহূর্তের জৈবিক তাড়নার ফল?

আজকাল কারো কাছে 'সময়' নেই। সবাই ব্যস্ত। বাচ্চার জন্য দেবার 'সময়' নেই হয়তো কিন্তু বাবার কাছে গার্লফ্রেন্ডের জন্য আর মায়ের কাছে বয়ফ্রেন্ডের জন্য সময় রাখা আছে। আজকাল বেশির ভাগ মানুষই যেন একটা সম্পর্কে সন্তুষ্ট নয়। নিজের স্বামীকে বা নিজের স্ত্রীকে কারো যেন বেশিদিন ভালো লাগছে না।

রাধুদার চায়ের দোকানের ঠেক-এ সিমেন্টের পাইপে বসে বসে আকাশের দিকে মাথা তুলে আকাশ দেখছিলেন অম্বুজাক্ষ। একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন আকাশ আবার পরিষ্কার। বৃষ্টির পর গাছ-গাছালিগুলো যেন আরও সবুজ, আরও ঝলমলে।

এমনিতে অম্বুজাক্ষর মেঘলা আকাশই পছন্দ। বেশি রোদ একদম ভালো লাগে না। তবে শরৎকালের মজাই আলাদা। এই বুড়ো বয়সেও বন্ধুরা সবাই পুজোর জন্য দিন গুনছেন। ডাব্বু ঘোষণা করলেন পুজোর আর মাত্র কুড়ি দিন। মহালয়া তেরোদিন পর।

অভিজিৎ বলেছিলেন—'এবার আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি হয় নাই, এইবার পূজাটা না ভাসায়। তাইলেই হইসে।'

অংশুমান মন দিয়ে মোবাইল ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ খুলে কী যেন দেখছিলেন। চোখ না তুলেই বললেন—'অলুক্ষুণে কথা না কইলে আর হইতাসে না তাই না? সারা বচ্ছর অপেক্ষা কইর‍্যান রইসি এই দিনগুলির লাইগ্যা; বৃষ্টি হইলে গেসি।'

অম্বুজাক্ষ পাইপ থেকে উঠে পড়েছিলেন, নিজের পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বলেছিলেন, 'সকাল বেলায় বাথরুমটা ঠিক মতো হয় নাই, যাই ঘরে যাই, বাথরুম যাইতে হইব।'

সৌমিত্র শুনে চোখ ছোটো করে বলেছিলেন—'বাথরুম মানে 'পটি'?'

অম্বুজাক্ষ মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে বলেছিলেন—'হ।'

সৌমিত্র আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—'প্যাট গুড়গুড়ায়? আই মিন পেটের মধ্যে গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে?'

অম্বুজাক্ষ টি-শার্টের উপর দিয়ে পেটে হাত বোলাতে বোলাতেই বলেছিলেন, 'হুঁ মনে হচ্ছে পেটের ভেতর থেকে শব্দ আসছে।'

সৌমিত্র মুখে খুশির ভাব ফুটিয়ে চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন—'আরে ব্যাড গ্যাস। ব্যাড গ্যাস। অ্যাবোভ সিক্সটি ইজ ভেরির কমন।'

তারপর ফিসফিস করে মুখে মজার ভাব ফুটিয়ে বলেছিলেন—'এর লইগ্যা বাড়ি যাবি কেন? যা সাইডে যা ছাইড়্যা আয়।'

অম্বুজাক্ষ দৃশ্যতই অপ্রস্তুত। মুখে লজ্জার ভাব এনে বলেছিলেন—'ভ্যাট কী যে বলিস! তুই আর বদলাইলি না। এমন কথা কইস যেন তুই ক্লাস এইটের ছাত্র।'

সৌমিত্র চুপ করার পাত্র নন। 'আরে ক্লাস এইটে তো এই প্রবলেম ছিল না। প্রবলেম তো এখনই। তা তুই কী করবি এখন? আমারে দেখ না। মাঝে মাঝেই আমার এই প্রবলেম হয়। তখন আমি যেন একটা ইম্পর্ট্যান্ট ফোন এসেছে এমন ভাব দেখিয়ে সবার থেকে একটু দূরে চলে যাই তারপর পেটে একটু হালকা চাপ, ব্যাস ক্লিয়ার।'

সৌমিত্রর কথা বলার ভঙ্গিতে তখন রজত, অংশুমান, অভিজিৎও হাসতে শুরু করেছেন। সৌমিত্র খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে আবার বলে উঠেছিলেন—'ব্যাড গ্যাস, ব্যাড গ্যাস। তোদের সকলরে কইয়া দিলাম জমাইয়া রাখবি না, সুযোগ পাইলেই ছাইড়্যা দিবি। না হইলে এই গ্যাস বুকে উইঠ্যা ধাক্কা দিব। আর অমনি—' কথাটা শেষ না করে জিভ বের করে ঘাড় কাত করে মরে যাবার ভঙ্গি করেছিলেন। সৌমিত্রর অঙ্গভঙ্গিতে আবার সবাই হাসতে শুরু করেছিলেন।

অভিজিৎ সবাইকে থামিয়ে বলতে শুরু করলেন—'ভাইসব আমরা সবাই অ্যাবভ সিক্সটি। সেই ছোটোবেলার বাংলা রচনা থেকে একটা লাইন ধার নিয়ে বলছি—আমাদের জীবন অনিত্য, কখন কী হয় বলা যায় না।

আমাদের প্রায় সকলেরই একটি করে ছেলে বা মেয়ে। বেশির ভাগই রাজ্যের কিংবা দেশের বাইরে। আমরা সকলেই রিটায়ার করেছি। শুধু অম্বুজাক্ষ ওকালতি করে বলে ওর রিটায়ারমেন্ট নেই। রজতও পেশাদার ফোটোগ্রাফার। অম্বুজ আর ও একইরকম যতদিন সুস্থ থাকবে, ততদিন কাজ করবে।

কিন্তু এই বয়সে এসে আমরা সবাই মোটামুটি একটা বিষয়ে একমত। যে যে-কোনো সময়ে আমাদের জীবনে খারাপ কিছু ঘটতে পারে। তখন না জানি কী হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা এখন আমরা বাড়িতে থাকি শুধুমাত্র স্বামী আর স্ত্রী। কাজের লোকের ভরসায়। অথচ আজকাল আমরা সিনিয়ার সিটিজেনরাই সবচেয়ে ভালোনারেবল। সবচেয়ে আনসেফ ইনসিকিওরড।

এই তো সেদিন ভবানীপুরে এক সিনিয়র সিটিজেন গুজরাটি দম্পতি খুন হয়ে গেলেন নৃশংসভাবে। পুলিশ কাউকে ধরতে পারেনি। সেদিন কসবায় একজন নামী ইঞ্জিনিয়ার খুন হয়ে গেল। নেতাজিনগরে বৃদ্ধ দম্পতি খুন হয়ে গেলেন।'

রজত বললেন—'খুন হোন বা না হোন আজকাল তো আমরা শুধু স্বামী-স্ত্রীরাই থাকি। সারা বিজয়গড়, নেতাজিনগর, গল্ফগ্রিন

আজাদগড়, অরবিন্দনগর সমাজগড়, অশ্বিনীনগর, গান্ধী কলোনি এখন বৃদ্ধাশ্রম।

মুশকিল হল স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যে যে আগে চলে যাবে সে তো বেঁচে যাবে। যে থাকবে তারই হল কষ্ট।'

অভিজিৎ সবাইকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে নিজের মোবাইল দেখিয়ে বললেন—'তাই আমি একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলেছি। আমাদের সবারই স্মার্টফোন আছে তাই কোনো অসুবিধে নেই। আমি গ্রুপটার নাম দিয়েছি 'পাড়া'। আমি আমাদের সব বন্ধুদের ইনক্লুড করে নিচ্ছি।

আনন্দের খবর হল কাল থেকেই আমাদের ছোটোবেলার বন্ধু সমর, কুন্তল, অনিমেষ আমাদের এই রাধুদার চায়ের দোকানের 'আড্ডা'য় জয়েন করবে। ওরাও আমাদের এই 'পাড়া' হোয়াটস-অ্যাপ গ্রুপে থাকবে।

আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরির মূল উদ্দেশ্য হল পরস্পরের পাশে থাকা। কারো কোনোরকম বিপদ-আপদ হলে ছোট্টো একটা মেসেজ ব্যস। সবাই আমরা তার পাশে পৌঁছে যাব। তার মানে আর কেউ একা নই। আমরা সবাই সবার পাশে।'

অম্বুজাক্ষ, সৌমিত্র, রজত, অংশুমান বাচ্চা ছেলেদের মতো খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠলেন।

রাধুদার রেখে যাওয়া চিনি ছাড়া লিকার চায়ে চুমুক দিয়ে অংশুমান বলে উঠেছিলেন—'কাল আমাদের গান্ধী কলোনিতে কী হয়েছিল শুনেছিস? সবাই খুব সাবধান, দিনকাল ভালো না। কেউ অহেতুক কোনো ঝামেলায় জড়াবি না।'

রজত বললেন—'কখন? কাল রাত নটা নাগাদ আমিই তো গান্ধী কলোনি দিয়ে অরবিন্দনগরের ভিতর দিয়ে শর্টকাট করে পাড়ায় ঢুকলাম।'

অংশুমান রজতের কথা শেষ হতে না হতে আবার বলা শুরু করেছিলেন—'রাত আড়াইটে নাগাদ গান্ধী কলোনি ইস্কুলের উল্টোদিকে আমাদের সেই পুরোনো র‍্যালশন দোকানের সিঁড়িতে বসে দুটো মেয়ে ওপেনলি মদ খাচ্ছিল আর সিগারেট টানছিল আর নাকি নিজেদের মধ্যে চিৎকার করে ব্যাপক খিস্তাখিস্তি করছিল।'

রজত চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে বলে উঠেছিলেন—'আরেঃ এটা আবার নতুন কিছু নাকি? এ তো সব পাড়াতে হচ্ছে। এইসব ছেলে-মেয়েরা কোথা থেকে আসে কে জানে? আর কী সব পোশাক-আশাক! কারা এরা?'

অভিজিৎ বলেছিলেন—'সব ভাড়াটে। আরে আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েরা তো প্রায় কলকাতায় থাকেই না। হয় কলকাতার বাইরে না হয় দেশের বাইরে। এই সব ছেলেমেয়েদের বেশির ভাগই নর্থ ইন্ডিয়ান, ফ্রি মিক্সিং, ছেলেমেয়ে একসঙ্গে থাকে। মাঝেমাঝেই পার্টনার বদলায়। মদ ড্রাগ কিচ্ছু ওদের বাদ নেই। সব চলে। আর আমরা পাড়ার লোকেরাও বেশি টাকার লোভে আগুপিছু না ভেবে ওদের ঘর ভাড়া দিয়ে দিই।'

রজত বলেছিলেন—'শুধু নর্থ ইন্ডিয়ান নয় আমাদের বাঙালি ঘরের ছেলেমেয়েরাও আছে। এই ক-বছর আগেও পাড়ার মধ্যে বেলেল্লাপনা দেখলে পাড়ার লোকেরাই হই হই করে আপত্তি করত। আর এখন আগে যে সব মেয়েরা সোনাগাছি এলাকায় থাকত তারাই এখন আমাদের এইসব পাড়ার সস্তার ফ্ল্যাটগুলো ভাড়া নিয়ে বা কিনে নিয়ে ওই সব ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। এখন আর 'ওই'সব কাজের জন্য সোনাগাছি বা প্রস কোয়ার্টার-এ যেতে হবে না। পাড়াতে খোঁজ রাখো ঠিক জেনে যাবে কোথায় 'ওই' সব হচ্ছে।' বলে মুখ বাঁকিয়েছিলেন।

অভিজিৎ বলেছিলেন—'বেশির ভাগ মেয়েই একা থাকে। দিনের বেলা ঘুমায় আর রাত হলেই পার্টনারদের সঙ্গে ছোটো ছোটো পোশাক পরে বাইকে উঠে বেরিয়ে যায়। নিজেদের পরিচয় দেয় উঠতি মডেল। সিরিয়ালের অভিনেত্রী বলে, আসলে...' বলে থেমে গিয়েছিলেন অভিজিৎ তারপর এক চুমুকে সব চা-টা গলায় ঢেলে ঠক করে কাচের গ্লাসটা সিমেন্টের চওড়া পাইপের উপর নামিয়ে রেখে বলেছিলেন—'এই তো আমাদের বিজয়গড়ে একটা ভাড়াটে মেয়ে এসেছিল। দেখতে শুনতে ভালো। স্বাস্থ্যবতী। আমাদের পাড়ার রবীন্দ্রজয়ন্তীতে সুন্দর গানও গেয়েছিল। নাম বলেছিল শ্যামলী—সোদপুরের শ্যামলী। রোজ রাতে বেরিয়ে যেত, বলত মডেলিং-এর কাজ করে। গত মাসেই শুনলাম ফ্ল্যাটের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ বলেছিল এসকর্ট গার্লের কাজ করত। কোভিডের মধ্যে কাজ ছিল না। ফ্ল্যাটের ভাড়া, চমক-দমকের খরচা জোটাতে পারছিল না। তাই মানসিক অবসাদে আত্মহত্যা করে।'

সবাই খানিকক্ষণ চুপ করে ছিলেন, অম্বুজাক্ষই নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠেছিলেন—'অংশুমান কী বলছিলি বল। গান্ধী কলোনিতে কাল রাতে কী হয়েছিল?'

'হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম। অত রাতে নেশায় বুঁদ হয়ে মেয়েগুলোর চিৎকারে আশেপাশের লোকের ঘুম ভেঙে যায়। তারা উঠে বাইরে তো বেরিয়ে আসে কিন্তু কেউই কিছু বলতে সাহস পায় না—একে তো অল্পবয়সি দুটো মেয়ে, ছোট্টো ছোট্ট হাফপ্যান্ট আর টাইট বডি হাগিং স্লিভলেস গেঞ্জি হাতে, সিগারেট আর মালের বোতল—মুখে অবিশ্রান্ত খিস্তিখেউর; কী জানি কিছু বললে যদি উলটো রিঅ্যাকশন হয়?'

অংশুমান থামতেই সবাই হই হই করে উঠেছিলেন—'তারপর তারপর?'

সৌমিত্র বলেছিলেন—'ইস, পাড়াগুলান আর পাড়া থাকল না রে।'

অংশুমান বলে চলেছিলেন—'শেষে আমাদের পাড়ার কানুদা—ওই যে ছোটোবেলায় আমরা যাকে 'মুরগির ডিম' বলে খেপাতাম, গলার স্বরটা কেমন যেন ভাঙা ভাঙা। আমাদের থেকে কয়েক বছরের বড়ো—'

অম্বুজাক্ষ বলেছিলেন—'হ্যাঁ মনে আছে—তারপর?'

'কানুদা এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন—'এ সব হচ্ছে কী? পাড়ার মধ্যে মাতলামো হচ্ছে? চিৎকার করে খিস্তি খেউর করছেন? এখানে আমরা ফ্যামিলি নিয়ে বাস করি। এক্ষুনি এখান থেকে চলে যান। না হলে পুলিশ ডাকব।'

'ওমা যেই একথা বলেছে অমনি একটা মেয়ে নিজের গায়ের গেঞ্জিটা হাফ খুলে বলে কিনা 'পুলিশ ডাকবি? ডাক—আমরাও বলব এই বুড়োটা আমার গেঞ্জি ধরে টেনেছে। দেখি পুলিশ কার কথা বিশ্বাস করে!'

—'তারপর তারপর?'

—'কানুদা তো এই শুনে ভয়ে গুটিয়ে গ্যাছে। তখন পাড়ার মহিলারা রে রে করে বেরিয়ে আসে—বলে এত্তবড়ো সাহস! কানুদা একটা বয়স্ক লোক, পাড়ার বহুবছরের বাসিন্দা—তাকে ভয় দেখাচ্ছে যে পুলিশের কাছে শ্লীলতাহানির কেস করবে!'

—'বলিস কী, পাড়ার কী অবস্থা রে!' রজত বললেন।

—'হঠাৎ ক্লাস এইট-নাইনে পড়া একটা বাচ্চা মেয়ে হাতে মোবাইল নিয়ে এগিয়ে আসে—বলে যে 'আমার মোবাইলে প্রথম থেকেই পুরো ঘটনাটা ভিডিয়ো রেকর্ড করা আছে। আপনারা যে মিথ্যা কথা বলছেন তার প্রমাণ এর মধ্যে আছে। কানুদাদু মোটেই আপনাদের সাথে কিছু করেননি। পুলিশ আসুক—আমরা এই ভিডিয়োটা দেখাব।' পাড়ার মেয়ে-বউরাও তেড়ে আসে, বেগতিক দেখে মেয়েদুটো পালায়।'

—'বোঝো কাণ্ড।'

—'হ্যাঁ সিচুয়েশন এতটাই খারাপ। এখন মানুষের সততা মূল্যবোধ ভদ্রতা সভ্যতা কিছুই প্রায় নেই বললেই চলে।'

'ভাব তো—পাড়ার মেয়ে-বউরা এগিয়ে না এলে কানুদাকে তো আজ জেলে থাকতে হত।'

সবাই চুপ। খানিক বাদে রজত গলা তুললেন—'রাধুদা আর এক রাউন্ড চা দাও তো। অংশুমানের কথা শুনতে শুনতে মুখটা কেমন বিস্বাদ হয়ে গেল।'

তারপর বললেন—'তাহলে কী দাঁড়াল। পাড়ায় কোনো অন্যায়-অনাচার দেখলে আমরা কিচ্ছু বলব না? কোনো প্রতিবাদ করব না?' তারপর অম্বুজাক্ষকে ঠেলা দিয়ে বললেন—'কী রে তুই তো এতদিনকার উকিল, আইন কি এখন এইরকম? একদম অন্ধ?'

অম্বুজাক্ষ সিমেন্টের পাইপের উপর বসে ডান হাঁটুর উপর ডান কনুইয়ের ভর রেখে হাতের তালুতে নিজের মুখটা রেখে অরবিন্দনগরের রাস্তাটার দিকে তাকিয়েছিলেন—শরতের রোদ পড়ে রাস্তাটা ঝলমল করছে। বিদ্যাসাগর পার্কের মধ্যের বোগেনভেলিয়া গাছগুলোয় ফুল যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কতরকমের রং—লাল, গোলাপি, বেগুনি, সাদা। আর মনে মনে ভাবছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা একসময় ওপার বাংলা থেকে তাড়া খেয়ে এখানে এসে বসতি করেছিলেন। এখন কি এখান থেকেও বাস গোটাতে হবে? পাড়া বলে কি আর কিচ্ছু থাকবে না? পাড়ার একতা, একজনের অপরের পাশে এসে দাঁড়াবার মানসিকতা, অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছা, সব কি শেষ?

উঠে দাঁড়ালেন অম্বুজাক্ষ—'মোটেই না, আইন আদৌ অন্ধ নয়। আইন কখনো অন্যায়কারীকে প্রশ্রয় দেয় না।'

তারপর বললেন—'চল উঠি। কোর্ট আছে। রোদের তেজ বাড়ছে—মেঘ-ভাঙা রোদ বড্ড কড়া।'

মর্নিং ওয়াক সেরে ফিরবার পথে সমাজগড়ের মুখের ছোট্ট চায়ের দোকানে বাবুদা বসে ছিলেন। বয়সে অম্বুজাক্ষর থেকে বেশ খানিকটা বড়ো—তা-ও বছর পঁয়ষট্টি তো হবেই। কোনোদিন চাকরি-বাকরি করেননি। জমি-বাড়ি-ফ্ল্যাট এসবের দালালি করতেন, এখন বয়স হওয়ায় সে সব আর পারেন না। ছোটো ভাই, ভাইয়ের বউ-এর সংসারে থাকেন। খাওয়াদাওয়াও তাঁদের সাথেই ।

অম্বুজাক্ষ হঠাৎই পেছন থেকে করুণ স্বরে ডাক শুনলেন—'ভোম্বল ও ভোম্বল'।

হিয়ার বাবা...হাতে লকলক করছে চামড়ার বেল্ট।
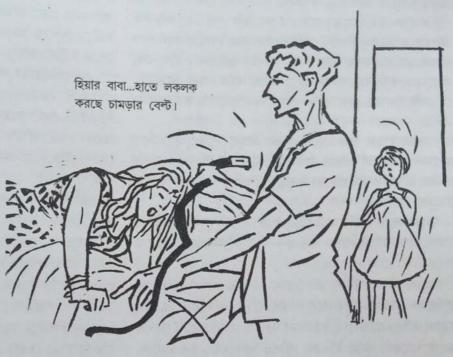
অম্বুজাক্ষর ডাক নাম ভোম্বল। ছোটোবেলায় ফরসা গোলগাল ছিলেন বলে বাবা আদর করে নাম রেখেছিলেন। পাড়ায় যাঁরা অম্বুজাক্ষর থেকেও বয়সে বড়ো তাঁরা আজও অম্বুজাক্ষকে ভোম্বল বলেই ডাকেন। অম্বুজাক্ষ সাড়াও দেন। বরং পাড়ার বড়োদের মুখে নিজের ডাক নামটা শুনে বাবার কথা মনে পড়ে যায়।

বাবুদার ক-দিন আগে স্ট্রোক হয়েছিল। বাঁ দিকটা অসাড় হয়ে গেছিল। এখন বাঁ পাটা টেনে টেনে চলেন।

অম্বুজাক্ষ পেছন থেকে ডাক শুনে থামতেই বাবুদা চায়ের দোকান থেকে উঠে এলেন। ডান হাত বাড়িয়ে অম্বুজাক্ষর ডান হাতটা নিজের হাতে নিয়ে ছলছল চোখে বললেন—'তোমারে একটা কথা কব।'

অম্বুজাক্ষ ভাবলেন বাবুদার বোধহয় টাকা-পয়সা দরকার। তাই তাঁর কাছে টাকা-পয়সা চাইতে উঠে এলেন—বোধহয় লজ্জা পাচ্ছেন।

অম্বুজাক্ষ মৃদু হেসে বললেন—'বল না বাবুদা কী হল? তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

বাবুদা করুণ মুখে বললেন—'না শরীল ঠিক নাই।'

অম্বুজাক্ষ নজর করলেন বাবুদা ঠিকমতো কথা বলতে পারছেন না—কথা যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। বলে উঠলেন—'কী হয়েছে দাদা?'

বাবুদা অম্বুজাক্ষর ডান হাতটা জোরে চেপে ধরে বললেন—'ক্যানসার। জিভে ক্যানসার—আর বাঁচুম না এই দ্যাখ' —বলেই নিজের জিভটা বড়ো করে বের করে অম্বুজাক্ষকে দেখালেন।

মুহূর্তে অম্বুজাক্ষর শরীরটা দুলে গেল, তিনি দেখলেন বাবুদার হাঁ করে বাইরে বের করে আনা জিভে একটা মাংসের দলা, তার চারপাশে অসংখ্য গুটি গুটি দানার মতো।

অম্বুজাক্ষর মনে পড়ল এই বাবুদা পাড়ার নেতাগোছের ছিলেন। কোনো দিনও অসৎ কিছু করেননি। দালালি করে যা পেতেন তাই দিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। রোজগার কম ছিল বলে বিয়ে করেননি। পাড়ার কেউ অসুস্থ হলে, কাউকে হাসপাতাল-নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার দরকার হলে সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। পাড়ার কেউ মারা গেলে নিজের দলবল নিয়ে হাজির হতেন সেই বাড়িতে। খাট জোগাড় করা ফুল আনা থেকে দাহকার্য, সব ব্যাপারে এগিয়ে আসতেন—আজ সেই লোকটার এই অবস্থা?

অম্বুজাক্ষ জল ভরা চোখে বাবুদার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন—'ও কথা কইয়ো না বাবুদা, বাঁচবা না ক্যান? আজকাল ভালো চিকিৎসা বাইরাইসে। তোমারে কালই আমি টাকা দিমু। চিকিৎসা করাও—'

অম্বুজাক্ষকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বাবুদা বলে উঠেছিলেন —'লাভ না—আ—ই লাভ—না—আ—ই, মা-বাবাও চইল্যা গেসেন। উপরে গিয়া দেখা তো হইব।'

বাবুদার দু-চোখ দিয়ে জল নেমে এসেছিল। আবার বলা শুরু করেছিলেন—'ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হসপিটালে গেসিলাম। সারাদিন অপেক্ষা কইর‍্যা ডাক্তার দেখাইলাম। ডাক্তার কইল ভালো থাকেন, আনন্দে থাকেন। আমি ইঙ্গিতটা বুইঝ্যা গ্যালাম।'

ডান হাতের তালু দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে আবার বলেছিলেন—'ডাক্তার আমি আর দেখামু না ভোম্বল। যা হবার হইবে। তোমার বাবা আমারে খুব ভালোবাসতেন। তিনিও তো অনেক বছর আগেই চইল্যা গেসেন। ওপরে গিয়া সবার সঙ্গে দেখা হইব।' বলেই ওপরের আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন বাবুদা। সঙ্গে সঙ্গে অম্বুজাক্ষও মুখ তুলে আকাশের দিকে দেখেছিলেন।

কী অদ্ভুত নীল আকাশ। সামনের বাড়িটাই নতুন মাল্টিস্টোরিড। নাম 'গণপতি এনক্লেভ'। তার গায়েই বিরাট শিরীষ গাছ। বড়ো বড়ো মাল্টিস্টোরিডগুলোর ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল শরতের রোদ এসে ঝলসাচ্ছিল নতুন রং করা 'গণপতি এনক্লেভ' আর ঘন সবুজ শিরীষ গাছটার শরীরে। কী ঝকঝকে লাগছিল!

আর মাসখানেক বাদেই পুজো। তার রং লেগে গিয়েছে প্রকৃতির গায়েও। সেটা বুঝেই বাবুদা জলভরা চোখে আবার বলেছিলেন—'মায়ের পূজাটা বোধহয় আর দেখা হইব না। যাই ওপরেই যাই। সেখান থিক্যাই মায়ের পূজা দেখুম।' বাবুদা বাঁ পাটা টেনে টেনে হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলেন। বাবুদার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে অম্বুজাক্ষর গলার কাছটাতেও কেমন যেন ভারী হয়ে গিয়েছিল।

একটা পূজাবার্ষিকী নিয়ে দোতলার বারান্দায় বসেছিলেন অম্বুজাক্ষ। কোথায় যেন একটা বাড়িভাঙা হচ্ছে। শক্তপোক্ত বাড়িই হবে হয়তো। হাতুড়ির ঘা-এর গুমগুম শব্দ বহুদূর থেকেও শোনা যাচ্ছে। আবার হয়তো আর একটা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং উঠবে। বাড়ি ভাঙার গুমগুম শব্দ শুনলেই অম্বুজাক্ষর বুকের ভেতরটা কেমন যেন মুচড়ে ওঠে। 'পরিচয় সঙ্ঘ' ক্লাবের পাশেই একটা সুন্দর বিশাল বাড়ি ছিল। বাড়িটার সামনেই ফুচকাওয়ালা বসত। বিয়ের পর বৈজয়ন্তীকে নিয়ে এমনকি ছেলে হবার পরেও তিনজন একসাথে কতবার ফুচকা খেতে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়িটাকে দেখতেন। ক-দিন আগে কী যেন একটা কাজে রানিকুঠির দিকে যাবার সময় ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন কবে যেন বাড়িটা ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে বিরাট মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং উঠেছে। কান্না পেয়ে গেছিল অম্বুজাক্ষর।

এক জেনারেশন সর্বস্ব দিয়ে বাড়ি বানায় আর পরের জেনারেশন সেই বাড়ি নির্দয়ভাবে ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। আহারে একটা বাড়ি যিনি তৈরি করেন তাঁর কত ঘাম—রক্ত সেই বাড়িতে মিশে থাকে। অথচ বাড়িটা যারা ভাঙে তারা একবার ভেবেও দ্যাখে না যে বাড়িটার মধ্যে কত আবেগ, আনন্দ অথবা বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে আছে।

সেদিন কোর্ট থেকে ফিরে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বৈজয়ন্তী বলেছিলেন—'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

অম্বুজাক্ষ চোখ তুলে তাকাতেই বৈজয়ন্তী কাছে এগিয়ে এসে কাতর স্বরে বলেছিলেন—'ওই যে দোতলার বারান্দা থেকে সামনের যে ফ্ল্যাটটা দেখা যায় না, জানো সেই ফ্ল্যাটের লোকটা না তার বউকে কী মারছিল গো—'

অম্বুজাক্ষ মনে মনে চমকে উঠেছিলেন—হিয়া মানে ওই ফ্ল্যাটের বাচ্চাটা তো একথাই বলছিল। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

বৈজয়ন্তী অম্বুজাক্ষর গায়ের একেবারে কাছে এসে অনুনয়ের সুরে বললেন—'অল্পবয়সি বউটা কী মার খাচ্ছিল কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করছিল না—আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল।' একটু থেমে আবার শুরু করেছিলেন—'আচ্ছা তুমি তো এতবড়ো উকিল, তুমি কিছু করতে পারো না?'

মুহূর্তে অম্বুজাক্ষর মনে পড়ে গিয়েছিল—কানুদার কথা—এখন পাড়া আর পাড়া নেই। আগেকার দিন হলে অম্বুজাক্ষ নিজে ছুটে যেতেন ওই বাড়িতে—চিৎকার করে বলতেন—'বউকে পেটাচ্ছেন? আপনাকেও ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে পেটাব—পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে যান। আমাদের পাড়ায় এসব হয় না।'

কিন্তু আজকাল খুব রিস্ক। কিছু বলতে গেলে ওরাই বলবে—'আমাদের প্রাইভেট ম্যাটারে আপনি কেন নাক গলাচ্ছেন?' অথবা বলতে পারে—'বেশ করেছি, আমার বউ তো প্রতিবাদ করছে না, আপনার কী?'

অম্বুজাক্ষ মনে মনে কষ্ট পেলেও মুখে বৈজয়ন্তীকে বলেছিলেন

—'থাক তুমি আর ওদিকে যেও না। কী দরকার? যদি বলে 'আপনাদের কী?' তাছাড়া মেয়েটাই বা কী? পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে কেন? সে তো কোর্টে যেতে পারে, থানা-পুলিশ করতে পারে।'

বৈজয়ন্তী বলেছিলেন—'না গো মেয়েদের অবস্থা মোটেই ভালো নয়—তুমি এতদিনের উকিল—তুমি তো সব বোঝো। হয়তো মেয়েটার মা-বাপ কেউ নেই। স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে কোর্টে গিয়ে মেয়েটা বাঁচবে? ওই তো রোগাপটকা একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে ঘরে। স্বামী যদি খোরপোশ না দেয় চলবে ওদের? আর সব মেয়েই তো ওয়ার্কিং গার্ল নয়। ও নিশ্চয়ই চাকরি-বাকরি করে না। করলে অত মার খেয়ে পড়ে থাকত না।'

নিজের মনের কথা বৈজয়ন্তীর মুখে শুনে অম্বুজাক্ষ চুপ করে গিয়েছিলেন। বৈজয়ন্তী না থেমে বলে চলেছিলেন—'ভেবে দ্যাখো ওই বাচ্চা মেয়েটা তো বউটার বোঝা। আজকে তো বউটা স্বামীটাকে ছেড়ে নতুন জীবনও শুরু করতে পারবে না। বউটা তো আজকে ডানাকাটা পাখি। উড়তেও পারবে না। কেন যে এরা বাচ্চার জন্ম দেয় কে জানে? বাচ্চাটাই বা কী কষ্ট পাচ্ছে ভেবে দ্যাখো। যে বাচ্চা দেখে যে তার বাবা তারই সামনে তার মাকে মারছে সে না জানি কী যন্ত্রণা পায়!'

ক-দিন আগেই যে বাচ্চাটার সাথে অম্বুজাক্ষর কথা হয়েছে সে কথা অম্বুজাক্ষ বৈজয়ন্তীকে জানালেন না—থাক কী হবে জানিয়ে। হিয়া মানে ওই বাচ্চাটা তো সব কথাই জানিয়েছে অম্বুজাক্ষকে।

অম্বুজাক্ষ বৈজয়ন্তীর কাঁধে হাত রেখে মমতামাখা স্বরে বললেন—'থাক তুমি আর ওসব নিয়ে অত ভেবো না। তোমার শরীরটাও তো ভালো নেই।'

পূজাবার্ষিকীটা পড়তে পড়তে হঠাৎই যেন একটা ডুকরে ডুকরে কান্নার শব্দ পেয়েছিলেন অম্বুজাক্ষ। বইটা পাশে শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর ভাঁজ করে রেখে কান খাড়া করে শুনেই বুঝতে পেরেছিলেন যে উল্টোদিকের ফ্ল্যাট থেকেই আসছে কান্নার শব্দটা।

বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে উঠেছিল অম্বুজাক্ষর। তার মানে হিয়ার বাবা নিশ্চয়ই হিয়ার মাকে মারছে। আর অপেক্ষা না করে উঠে দাঁড়িয়ে পাজামার দড়িটা টাইট করে বেঁধে বারান্দার গ্রিল থেকে শরীরটা ঝুঁকিয়ে উল্টোদিকের ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে যা দেখেছিলেন তাতে অম্বুজাক্ষর শরীরটা রাগে ঝনঝন করে উঠেছিল।

হিয়ার বাবা খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে লকলক করছে চামড়ার বেল্ট। আর হিয়ার মা একটা স্লিভলেস নাইটি পরে খাটে আধশোয়া অবস্থায় পড়ে আছে। নাইটি উঠে গিয়েছে থাই-এর উপর পর্যন্ত। ফর্সা থাইটা বেরিয়ে আছে আর তাতে লাল হয়ে বেল্ট দিয়ে মারের দাগ ফুটে উঠেছে। হিয়ার মা হেঁচকি দিয়ে দিয়ে কাঁদছে আর চাপা স্বরে বলছে—'তুমি আমাকে মারো কিন্তু ওই মেয়েটার কাছে আর যাবে না, বলো, হিয়ার কথা ভাবো। আমাদের কী হবে?'

হিয়ার বাবার চোখ টকটকে লাল। খুব ড্রিংক করে আছে বোধহয়। শপাং করে বেল্টের আর একটা বাড়ি মারল। মুখখিস্তি করে বলল—'শালি যা না তুই, তোর মেয়েকে নিয়ে আমার জীবন থেকে সরে যা। আমি বাঁচি।'

অম্বুজাক্ষ খোলা জানালা দিয়ে স্পষ্ট দেখলেন ছোট্টো হিয়া তার রোগা রোগা হাত দুটো জোড় করে তার বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে—'পাপা, মাম্মাকে আর মেরো না, মাম্মা মরে যাবে।'

হিয়ার বাবা হিয়ার ডান হাতটা ধরে এক হ্যাঁচকা টানে হিয়াকে সরিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল—'সর সর আমার সামনে থেকে।'

যে ভঙ্গিতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে হিয়াকে তার বাবা সামনে থেকে সরিয়ে দিল তাতে অম্বুজাক্ষ আঁতকে উঠলেন। বাচ্চাটার হাতটাই না বগলের কাছ থেকে ছিঁড়ে যায়!

অম্বুজাক্ষ আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর ফর্সা মুখে জমে উঠেছে ঘাম। কানের পেছন থেকেও গড়িয়ে পড়ছে ঘাম। প্রচণ্ড রাগে যন্ত্রণায় অসহায়তায় মাথার দু-পাশের রগ যেন দপদপ করছে। দূরের বাড়ি ভাঙার শব্দটা যেন উঠে এসেছে বুকের মধ্যে। কে যেন একটা হাতুড়ি দিয়ে বুকের মধ্যে বাড়ি মারছে আর তার শব্দ হচ্ছে গুম গুম।

আর পারলেন না অম্বুজাক্ষ। চিৎকার করে ফেটে পড়লেন—'অ্যাই কী হচ্ছেটা কী? বউ পেটাচ্ছিস? মেরে হাত ভেঙে দেব। এ পাড়ার নাম সমাজগড়। এখানে ওসব হয় না। ফ্যাল বেল্ট ফ্যাল, না হলে পাড়ার লোক নিয়ে এক্ষুনি তোর ঘরে ঢুকব। তোকে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে পেটাব।'

হিয়ার বাবা চমকে উঠল। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠল—'আপনি কে? আপনার কী? এটা আমাদের পারসোনাল ব্যাপার। তাছাড়া আমরা আমাদের ঘরের মধ্যে যা খুশি করি আপনার কী? আপনি আমাদের ঘরে ঝাড়ি মারছেন কেন?'

অম্বুজাক্ষ আরও জোরে চিৎকার করে উঠলেন—'আইন দেখাচ্ছ অ্যাঁ? আমাকে আইন শেখাচ্ছ? প্রথমে আমি তোমাকে মারব তারপর পুলিশে দেব। দেখি তোমাকে কে বাঁচায়।'

হঠাৎই হিয়াদের ফ্ল্যাটের ওপর থেকে আরও বেশ কিছু মহিলাকণ্ঠ শোনা গেল। 'হ্যাঁ আঙ্কল, রোজ লোকটা বউটাকে মারে। আমরা ভয়ে কিছু বলতে পারি না। কিছু বলতে গেলে লোকটা আমাদেরই ভয় দেখায়।'

পাশের দোতলা বাড়ি থেকে সদানন্দদা মুখ বাড়ালেন—'রোজ শুনি কান্নার শব্দ। কিছু কইতে সাহস পাই না। ভোম্বল আমি লাঠি নিয়া বাইরাইতাসি। লোকটার হাত ভাঙ্গুম। তুমিও বাইরাও। পাড়ার পরিবেশ এক্কেরে শেষ হইয়া গেল।'

হিয়ার মা হাত জোড় করে বিছানা থেকে উঠে জানালার কাছে এল, বলল—'কাকু ওকে এবারের মতো ছেড়ে দিন, ও আর আমাকে মারবে না—ওকে পুলিশে দেবেন না।'

অম্বুজাক্ষ গলা তুলে বললেন—'আপনি রোজ মার খান কেন? থানায় যান, কোর্টে যান, ডিভোর্স দিন। ফের যদি আপনাকে মারতে দেখি প্রথমে আমরা পাড়ার লোকেরা ওকে মারব তারপর পুলিশে দেব।'

হিয়ার মা দু-হাতে চোখ মুছে হিয়াকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলল—'কোথায় যাব কাকু? আমাদের যাবার জায়গা নেই। বাবা মারা গেছেন। বাড়িটা দাদার দখলে, মা-ও থাকে দাদার কাছে। এই ছোট্টো মেয়েটাকে নিয়ে আমার যাবার জায়গা নেই। কলেজে পড়তে

পড়তে প্রেম করে বিয়ে হয়ে গেল। লেখাপড়াও তেমন শিখিনি যে চাকরি করব।'

অম্বুজাক্ষ চুপ করে তাকিয়ে দেখলেন—হিয়ার মা-এর কাঁধ থেকে নাইটি নেমে গিয়েছে। আর ফর্সা খোলা কাঁধে বেল্টের বাড়ির আড়াআড়ি লম্বা লাল দাগ।

অম্বুজাক্ষ চোখ বন্ধ করে ফেলবার আগে দেখলেন—হিয়ার মুখে ফুটে উঠেছে খুশির ছাপ। সেও ছোট্ট ছোট্ট হাতে নমস্কার করার ভঙ্গিতে হাত জোড় করে অম্বুজাক্ষর দিকে তাকিয়ে রয়েছে—চোখ দুটো জলে ভরা।

অম্বুজাক্ষর মুখ থেকে দুটো শব্দ বেরিয়ে এল। 'আহারে—ইসস।'

আজ ষষ্ঠী। অম্বুজাক্ষ বারান্দায় চুপ করে বসেছিলেন। দূর থেকে ঢাক বাজার শব্দ ভেসে আসছিল—ড্যাং কুড়াকুড় ড্যাং কুড়াকুড়। সঙ্গে তালে তালে কাঁসর বাজছে—ঠং ঠং ঠং ঠং ।

অম্বুজাক্ষ একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন হিয়াদের ফ্ল্যাটের জানালার দিকে। সেদিনের পর থেকে হিয়াদের বাড়ির জানালা আর খোলা হয়নি। জানালার কাচের ভেতর দিয়ে ভেতরে আলো জ্বলতেও দেখেন না অম্বুজাক্ষ। হিয়ারা বোধহয় আর থাকে না। হয়তো ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গিয়েছে।

অম্বুজাক্ষর মনটা সবসময় খারাপ হয়েই থাকে। আগে বারান্দায় বসে হিয়ার নরম কচি গলার গান শুনতেন—'ম্যায় হুঁ জিয়ান বড়া তাকৎবড়ো'—ডোরেমন কার্টুনে জিয়ানের গান।

আজকাল আর শোনেন না। দোতলার বারান্দায় কখনো চা-এর কাপ হাতে নিয়ে, কখনো পূজাবার্ষিকী কোলে নিয়ে একমনে হিয়াদের ফ্ল্যাটের জানালার দিকে তাকিয়ে থাকেন অম্বুজাক্ষ কিন্তু জানালা আর খোলা হয় না বা হিয়ার গানও আর শোনেন না।

মাঝে মাঝে বৈজয়ন্তীকে বলে ওঠেন অম্বুজাক্ষ—'ধুর সেদিন আমার অত হাইপার হওয়া ঠিক হয়নি। আগে তো তবু বাচ্চাটাকে জানালা দিয়ে দেখতে পেতাম, আমার সঙ্গে কত গল্প করত! কেন যে অত চিৎকার করলাম! ওদের সমস্যা ওরাই মেটাত! হয়তো আমার থানা-পুলিশের ভয় দেখানোতেই ওরা ফ্ল্যাট ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেল।'

বৈজয়ন্তী সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলেন—'তুমি তো ঠিকই করেছ। একটা লোক রোজ রোজ তার বউকে পেটাবে, এটা কি সহ্য করা যায়?'

অম্বুজাক্ষ মাথা নেড়ে অসহিষ্ণুর ভঙ্গিতে বলে ওঠেন—'এখানে থাকলে হিয়ার মাকে মার খাওয়ার হাত থেকে তবু বাঁচাতে পারতাম—কোথায় যে গেল ওরা—সেখানে মারলে কে বাঁচাবে?'

কখনো আবার বলে ওঠেন—'হিয়ার বাবা হয়তো হিয়ার মাকে ডিভোর্সই করে দেবে—কে জানে কেমন আছে ওরা—আসলে হিয়ার উপর বড্ড মায়া পড়ে গেছিল। শেষ যেদিন দেখেছিলাম কেমন ফর্সা ফর্সা রোগা রোগা হাতদুটো জোড় করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। কী অসহায় মুখ কিন্তু চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছিল কৃতজ্ঞতা— আমি যে ওর মাকে মার খাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি।'

চেয়ার থেকে উঠে পড়েন অম্বুজাক্ষ।

দুপুরে একটা ভাতঘুম দেবার পর বারান্দায় আবার এসে বসলেন। সামনের দিকে তাকিয়েই বুকের মধ্যে খুশিতে ধক্‌ করে উঠল অম্বুজাক্ষর হিয়াদের ফ্ল্যাটের জানালাটা খোলা।

জানালার গ্রিলের উপর ছোট্টো ছোট্টো দুটো পা তুলে হিয়া মনের আনন্দে গান ধরেছে—'ম্যায় হুঁ জিয়ান বড়া তাকৎবর'। খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলেন অম্বুজাক্ষ। দৌড়ে ঘরে গেলেন। ঘুমোচ্ছিলেন বৈজয়ন্তী। তাঁকে ডেকে তুললেন—'শুনছ শুনছ? শুনতে পাচ্ছ?' বৈজয়ন্তী ঘুম ভেঙে উত্তর দিলেন—'উঁ কি, ঢাকের আওয়াজ?'

অম্বুজাক্ষর গলা আনন্দে কাঁপছে—'ভালো করে শোনো—'ম্যায় হুঁ জিয়ান বড়া তাকতবর—হিয়া ফিরে এসেছে।

বৈজয়ন্তী উঠে বসলেন। মুখে খুশির ভাব ফুটে উঠল। দু হাতে মাথার চুলে খোঁপা বেঁধে অম্বুজাক্ষর হাত ধরে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন।

সত্যিই তো—হিয়া গাইছে—'ম্যায় হুঁ জিয়ান বড়া তাকৎবর।'

বৈজয়ন্তী ডাকলেন—'হিয়া ও হিয়া, কোথায় গেছিলে মা? এতদিন ছিলে না?'

বৈজয়ন্তীর ডাক শুনে হিয়া ধড়মড় করে খাটে উঠে বসল। হিয়ার মা-ও জানালার কাছে এগিয়ে এল। অম্বুজাক্ষ দেখলেন হিয়ার পরনে নতুন জামা, হিয়ার মা-ও বেশ সেজেছে। সুন্দর একটা শাড়ি পরা। বলল—'আমরা বেড়াতে গেছিলাম কাকিমা। খুব বেড়ালাম। ও অফিসে মেইল করে ছুটি নিয়ে নিয়েছিল—পুরী গেছিলাম, সেখানে অনেকদিন থাকলাম। আমাদের মধ্যের রাগারাগি শেষ কাকু। ও ভালো হয়ে গিয়েছে। সেদিন আপনার ভয় দেখানোটা খুব কাজে এসেছে। আপনাকে তো সবাই চেনে। আপনার হুমকিতেই ও ভয় পেয়ে যায়। আপনাকে প্রণাম কাকু।'

অম্বুজাক্ষ তখন চোখ বুজে বিড়বিড় করছিলেন—'তুই আজ ষষ্ঠীর দিন ফিরে এলি হিয়া—খুব ভালো করলি। এতদিন আমি নিজেকে খুব অপরাধী মনে করছিলাম। ভাবছিলাম আমার জন্যই বোধহয় তোদের গণ্ডগোল চরমে উঠেছিল—আর তোরা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলি। বাঁচালি মা, বাঁচালি।'

অম্বুজাক্ষ ফিল করলেন—তাঁর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না—গলায় একদলা কান্না উঠে এসেছে।

দূর থেকে ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে—ড্যাং কুড়াকুড় ড্যাং কুড়াকুড়। সঙ্গে কাঁসর বাজছে ঠং ঠং ঠং ঠং।

আর ভেসে আসছে একটা অদ্ভুত গন্ধ—পাড়া পাড়া গন্ধ। ❖

দ্রোহজ

কাবেরী রায়চৌধুরী

ছবি : সৌজন্য চক্রবর্তী
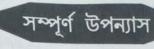
'সুখের ধানভানা আর ছেড়ো না...
ও ধান ভানতে ভানতে মইলাম আমি
বারা আমায় ছাড়ে না...'

রান্নাঘরের চালতে
দুকনা কদু ঝুলেছে
ও ছোটো দ্যাওরা
কদুয়া পাড়ে দ্যাও না।
ও ছোটো দ্যাওরা
সাইলন চাখে যাও না।
কামারপাড়ার হাটতে
ঝুকনা শাড়ি ঝুলেছে
ও ছোটো দ্যাওরা
শাড়ি কিনে দ্যাও না।
কুচি কুচি পরিব
ঘুরে ঘুরে নাচিব
ও ছোটো দ্যাওরা
নাচন দেখে যাও না।

মাথার মধ্যে আঞ্চলিক গান কথকতাগুলো ঘুরছে কয়েকদিন যাবৎ। মাটি বীজ শস্য; উৎপাদন!

সালেহা বিবি আদালতে দাঁড়িয়ে বলছিল, আমাক জমিন উর্বর লাই... তারপরে সে যা বলে গেল গলা না কাঁপিয়ে তার অর্থ হল, বিয়ে হয়েছিল তার চার বছর। গর্ভ হয়নি! সন্তান আসে না পেটে। তাই ঘরে স্বামী তার ওপর যৌন নির্যাতন করত। তার যৌনাঙ্গে কাঁচকলা এমনকি ল্যাটা মাছ পর্যন্ত ঢুকিয়ে উল্লাস করেছে! তার ঘরে ন্যাতপেতে বুড়ো শ্বশুরকেও ঢুকিয়ে দিয়েছে! বুড়ায় কাম পারে না।

জজ সাহেব নীতি সেন চোয়াল শক্ত করে বললেন, বলে যাও। যাও।

বুড়ায় চুততি পারে লাই... কী কর্কশ ভাষা উচ্চারণ করে যাচ্ছে সালেহা অবলীলায়! বুড়ো তাকে ক্রোধে উন্মাদ হয়ে যৌনাঙ্গ চাটিয়ে চাটিয়ে তার গালে প্রস্রাব করে দিত! তাকে হিংস্র জন্তুর মতো আঁচড়-কামড় দিয়ে দিয়ে রক্তাক্ত করত।

নীতি সেন জিজ্ঞেস করলেন, খুন করলে কেন?

সালেহা নির্বিকার, বলল, তোমারে হিংস্র জন্তু কামড় দিলে কী করবা?...আমার ভালোবাসা হইছিল।

সালেহার অকপট জবাব সে ভালবেসেছে ছোটো দেওরকে। ছোটো দেওরকেও তার ঘরে ঢোকানো হয়েছিল। মাত্র সতেরো বছরের কিশোর বাইশ বছরের বউদির নগ্নতার সামনে নতজানু হয়ে পড়েছিল। ডায়েরির পৃষ্ঠায় বসুমতী লিখল, সালেহার কথা অনুযায়ী পিন্টু তার সামনে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। সে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিল, নে উদোম ল্যাংটা হয়েছি...! সালেহা যে ভাষা প্রয়োগ করেছিল তা শুনে শহুরে জাজ, উকিল আর তার কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল।

কোনো পুরুষ তার সামনে এসে এই প্রথম মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল! পিন্টু ঘামছিল ভয়ে। তার ভালো লেগেছিল। পিন্টু কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল, আমি পারব না। সে তখন কাঁদছিল। আনন্দে না দুঃখে বলতে পারবে না। পিন্টু তার শরীর শাড়ি দিয়ে ঢেকে দিয়ে বলেছিল, আমি তুমার কষ্ট বুঝছি। চল পইলে ঝাই। ই ঘরে ভালোবাসা পাপ!

সালেহার জবানবন্দি নিজের মতো করে সাজিয়ে লিখেছে সে।

সালেহার জীবনে প্রথম প্রেম এল। কিশোর দেওর তাকে শরীরের বাইরে গিয়ে দেখতে শুরু করেছিল। সালেহা বলেছিল, বলেন হুজুর মাই বাপ, পিন্টু মোকে ভালোবেসেছিল। সে মোকে চুততি চায় লাই... আমার প্যাটে পিন্টুর বাচ্ছা, আমরা কেউ বলিনি ঘরে। তাহলে পিন্টুকে আর ঢুকতে দেবে না...কারণ ওদের শুদু বাচ্ছা চাই। পিন্টুও এমন ভাব লিতো যেন অত্যাচার করছে। স্বামী মরদটা একদিন আমাদের খেতের মধ্যে জড়াজড়ি করতে দেখে ফেলে। আমার মুখে অত আনন্দ দেখে সে সহ্য করতে পারেনি। সেই রাতেই আমাদের পলাইবার সময় সে আমাদের দুজনকে জঙ্গলের পথে ধরে ফেলে। সে আর বুড়া শ্বশুর ব্যাটা ছিল। জোড়া খুন...!

নীতি সেন কলম হাতে নিয়ে স্তব্ধ! বিচারকের চেয়ারটা যে কী ধারালো শানানো তরবারির মতো তা তিনি জজ হওয়ার পর থেকে বুঝেছেন! এখানে ব্যক্তিগত অনুভূতির কোনো স্থান নেই!

ছেলেটি জবানবন্দি দিতে উঠল এজলাসে। কচিপাতার মতো কিশোর এক। কপাল থেকে নামা টিকলো নাক, সরু ঠোঁটের ওপর গোঁফের হালকা রেখা তার মুখে আলাদা এক সৌন্দর্য এনে দিয়েছে। চোখে সেই সারল্য যা পশুপাখির চোখে থাকে।

নীতি সেন বললেন, খুন করেছ? স্বীকার করছ?

পিন্টু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললে নীতি সেন বললেন, মুখে বলো।

—হ্যাঁ, খুন করেছি। হাতাহাতি হতে মরে গেল। আধলা পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলাম।

যাবজ্জীবন হয়ে গেল দুই নিরপরাধ অপরাধীর।

ডায়েরিতে এইটুকু লেখার পর বসুমতী লিখেছিল, যেখানে সৃষ্টির মূলেই যৌনতা সেখানে সেই যৌনতাই সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। এবং ম্যানমেইড! ক্রাইম, এক একটা অন্যায় ম্যানমেইড!

আমার অস্তিত্ব খুঁজতে আমি যতদূর পারি যাব।

লম্বা চুলগুলো ম্যাকলয়েডগঞ্জে থাকার সময়েই কেটে ফেলেছে সে আজ কয়েকবছর! লম্বা সটান একমাথা চুলের অধিকারী ছিল সে একসময়। সেসব এখন স্মৃতি! খুব ছোটো করে কাটা চুলের কারণে চিবুকের ধার আরও বেড়েছে! চোখে সেই সন্ন্যাসীর উদাসীনতা! স্নান সেরে সাদা-কালো খোলের ধনেখালি জড়িয়ে নিল শুধু। এই গরমে ব্লাউজ বাহুল্য। এক গেলাস আখের শরবত প্রথমে, তারপর মিক্সড ফ্রুট জুস খেয়ে সুউচ্চ বাড়িটার দক্ষিণের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। শহরের অনেকটা দেখা যায় এখান থেকে। যেকোনো পর্যায়ে সে এখন ধ্যানে চলে যেতে পারে। চারপাশের যাবতীয় কোলাহলের মধ্যে থেকেও তার ইন্দ্রিয় তার নিয়ন্ত্রণে থাকে! প্রভু বুদ্ধের শরণাগত সে।

যেন ডানায় ভেসে সে চলেছে সুদূর কোনো অতীতে! তারপর আচমকাই উঠে ল্যাপটপটা নিয়ে এল।

আমি সব অভিজ্ঞতা লিখছি। লিখিত থাকা প্রয়োজন।

"পুরুষাঙ্গ যে এত ভয়াবহ হতে পারে আমি জানতাম না। কিশোরী কল্পনায় পুরুষ আমার কাছে ছিল প্রকৃতির মতো সুন্দর। পুরুষাঙ্গ আমি কখনো দেখিনি। সেটিও আমার কাছে ম্যাজিক স্টিক মনে হত। কিন্তু তার চেহারাটি প্রথম যেভাবে দেখেছি তা বীভৎস।

আমার প্রথম চাকরি একটি বিখ্যাত সংবাদপত্র অফিসে। সদ্য চলে এসেছি অভিদের বাড়ি থেকে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে। যদিও আইনত বিচ্ছেদ হয়নি। ল-পাশ করলেও বিয়ে করেছিলাম বলেই আর প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাইনি। পুরোপুরি ডিটাচড্। তাই সংবাদপত্র অফিসের বিজ্ঞাপন দেখে অ্যাপ্লাই করার পর ট্রেনি হিসাবে জয়েন করেছি। আমাকে পাঠানো হল এক বিখ্যাত সংগীতশিল্পীর কাছে তার ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য। যেহেতু তিনি আর ইহজগতে নেই তাই তাঁর নাম উল্লেখ করলাম না। কিন্তু সত্য লেখার দায়।

আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি

বললেন, "দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো। নাহলে বাইরের কোলাহল, কথা বলতে অসুবিধা। ভয় নেই। আমি বাঘ নই।"

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এসে চেয়ারে বসার পর তাঁর ইন্টারভিউ শুরু করার দশ মিনিটের মধ্যে তিনি বললেন, "খুব মাথা ধরেছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। মাথা ঘুরছে। আমাকে একটু ধরে বেডরুমে নিয়ে যাবে?" "আমি অপ্রস্তুত, বললাম, "আসুন, আমার হাত ধরুন। নিয়ে যাচ্ছি।" "উনি টাল খেয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরলেন। বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে বললেন, "একটু মালিশটা লাগিয়ে দেবে কপালে প্লিজ?" বালিশের পাশেই অমৃতাঞ্জন রাখা ছিল। ওঁর পাশে বসে অমৃতাঞ্জন কপালে ডলে দিচ্ছি। কেমন অস্বস্তি লাগছে। সারা বাড়িতে কেউ যে নেই বুঝলাম। বললাম, "স্যার, আমি আসি আজ। অন্যদিন আসব।" বলার সঙ্গে সঙ্গে উনি আমার হাত চেপে ধরে নিজের যৌনাঙ্গে চেপে ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে আমার মাথার চুল টেনে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর শক্তির সঙ্গে আমি পারিনি। বিছানায় ফেলে দিয়ে কালো শক্ত ভীষণাকারের যৌনাঙ্গ মুখে চেপে ধরলেন! বেশ খানিক্ষণ ধস্তাধস্তির পরে উনি নিজেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে বললেন, "কাউকে বললে বিপদ তোমারই। আমাকে কেউ ঘাঁটাবে না। আমি মেয়েদের মাতৃজ্ঞানে সম্মান করি সবাই জানে।"

হাজার বর্গক্ষেত্রের আমার বাড়িটির বাইরে এইরকম বিশ্বাস আর ভণ্ডামির একটা জগৎ আছে, তার মুখোমুখি হলাম। যদিও অভির সঙ্গে জীবন যাপন...!

উনি নপুংসক পরে জেনেছি। বয়সোচিত কারণ বা যেকোনো কারণেই অপারগ উনি। আর তাই ধীরে ধীরে অমন উন্মাদ হয়ে যাচ্ছিলেন। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন গায়ক—তাঁর বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর ঘোষণা করবে কার সাহস? যদিও আরও ভালো কিছু অপেক্ষা করেছিল আমার জন্য। এই সমাজের প্রতি দায়-দায়িত্ব...!

পৃথিবীতে শান্তি ছাড়া আর যেন কোনো আবেগ নেই এমনই শান্ত স্নিগ্ধতা বসুমতীর মুখাবয়ব জুড়ে!

যৌনতা যে এমন বীভৎস হতে পারে তা কল্পনাতেও ছিল না। প্রচণ্ড ভয় আর রাগ নিয়ে অফিসে না ফিরে বাড়িতে চলে এসেছিলাম। মাকে সব বললাম। মায়ের মুখ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। গুম হয়ে বসেছিলেন মা। সেইদিন সারাদিন কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলিনি। নেক্সট-ডে, সকালে মা বললেন, পুরো ব্যাপারটা একটা সাদা কাগজে লিখে ফটোকপি করে কপি রেখে অফিসে জমা দিয়ে সঙ্গে রেজিগনিশন লেটার সাবমিট করে বাড়ি ফিরে এসো। আমি আইন পাশ করেছি। ইচ্ছে করলে কেস করতে পারতাম...! প্রবৃত্তি হল না...তার ওপর ম্যারেড লাইফ থেকে সবে বেরিয়ে এসেছি তখন।

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন বড়ো করুণ আর কাতর! এইবারে গরম অন্য বছরের তুলনায় অধিক। বৃষ্টি হয়নি পুরো বৈশাখ মাস জুড়ে! ধুধু করছে আকাশ! পাখিরাও আকাশে চরতে ভয় পাচ্ছে! দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলো থেকে মৃত্যুর খবর আসছে। বেশির ভাগই বৃদ্ধ ও ফুটপাতবাসী। কথা বলতে বলতে সেইসব ঘটনাগুলোই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে বসুমতীর।

যদিও চিন্তা থেকে সরে এল সে দ্রুতই।

আমার ঘরে কোনো পুরস্কার নেই । পুরস্কারে লোভ থাকে। যে কাজগুলোর জন্য পুরস্কার পেয়েছি সেই কাজ আসলে আমাদের সকলের দায়। রেসপনসিবিলিটি! আর কী লাভ পুরস্কার দিয়ে ঘর সাজিয়ে? আমি তো দেখানোর জন্য কিছু করিনি কখনো!

বহরমপুরের প্রাচীন সংশোধনাগারে ওয়েটিং রুমে বসে ঘড়ি দেখছিল সে। জেলার সাহেব তপন সাহা এসে বললেন, ম্যাডাম! সালেহা আসছে। এইখানেই থাকুন। ও আসছে। কী কপাল! বাচ্চাটা জেলেই জন্মাল! দুর্ভাগা ছাড়া কী বলবেন বলুন!

বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল যেন মন! বলল, যে দেশে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শিশুর খাদ্য নেই, পুষ্টি দূরের কথা, মাথা গোঁজার জায়গা নেই তবু মা আছে...একটা স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশ আছে...হতে পারে তাও স্বাস্থ্যকর নয় তবু তো আছে। লোহার পাঁচিলে ঘেরা জীবন তো নয়! কিন্তু এই বাচ্চাটি...!

তপন সাহা বললেন, এরকম কত জেলে কতজন আছেন, জানেন?

—এদের ভবিষ্যৎ কী মিস্টার সাহা? আরেকটা ক্রিমিনাল তৈরি হওয়া ছাড়া আর কী বলুন তো! অথচ শিশু তো দেবশিশুই হয়!

সালেহা কপাল পর্যন্ত ঘোমটায় মুখ ঢেকে ঘরে ঢুকল তখনই, কোলে শিশু। বুড়ো আঙুল চুষছিল বাচ্চাটি। তার মুখোমুখি হয়েই সালাম ঠুকল সালেহা, বলল, বাচ্চা হওয়ার পর তুমি তো আর আসো নাই দিদি! ছেলে হইছে। ওর বাপের মতো দেখতে।

—পিন্টুর মতোই, এত ছোটোতেও মুখের আদল একরকম। পাঁচমাস হল, না? আমি খোঁজ রাখি সালেহা।

সালেহার অবসন্ন ক্লান্ত চোখেও হাসি ফুটে উঠেছে, মেঝেতে বসে পড়ে বাচ্চাকে বুকের দুধ দিতে দিতে বলল, সাহেব বলেছে ভালো করে থাকলি পরে আগেই ছুটি হতি পারে। ছেলেটা জন্ম থেকে জেলখানা দেখল!

সালেহার মাথায় হাত রাখল সে, সে কথাই ভাবছিলাম! ভালো কাজ করলেও এক-দু-বছরের মধ্যেই তো ছাড়া পাবে না। বাচ্চাটা জেলের পরিবেশে!

সালেহা ফিসফিস করে বলল, কাল অক্ত দিয়ে ভাত খেতে হয়েছিল দিদি। খাবারের লেইনে একজন আরেকজনের হাতে বেলেড চাইলে দিল তক্ক করতে করতে, ব্যস আমি বসেছিলাম ভাত নিয়ে, আমার ডাইলের বাসনে অক্ত সিটকে এসে পড়ল। সে তখন হুড়ুম মারামারি! আরো কয়জনের থালায় বাটিতে পড়েছিল! না খেতে পারলে একবেলা উপোস দিতে হত। অনেক মারামারি খিস্তাখিস্তি হয় গো! ছেলেটা বড়ো হতে হতে এইসব দেখে শিখবে দিদি! মানুষ হবে না গো দিদি! চিন্তা হয়। মাটির ঘর হলেও নিজের ঘর দিদি! জেলখানায় যে ছাওয়ালের জন্ম হয় সে কি মা-বাপকেও মান্য করবে? কোথা থেকে কী ঝেন হয়ে গেল...! আমরা তো মারতে চাইনি। পলাইতে গেসলাম! কপাল!!

কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না বসুমতী । শিশু বুকের দুধ খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন! নিষ্পাপ মুখ! কালো রং! এখনই

টিকলো নাক। বড়ো চোখ! আগামী দিন যে ওর জন্য সুখের ইঙ্গিত করছে না স্পষ্ট।

—আমরা যখন ছাড়া পাব তখন পিন্টুরেই বা কে কাজকাম দেবে, বলেন? গায়ে তো খুনের আসামির দাগ! ছেলেটাকেও শুনতে হবে খুনির ছেলে! কিসু ভালো লাগে না দিদি!

—ছেলে একটু হাঁটতে শিখলে আমাকে দেবে? দেখছি কী করা যায়!

ছেলেকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরেছে সালেহা। অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে আঁতকে উঠেছে, বলল, তাইহলে আমি কী নিয়ে থাকব দিদি! বুক খালি হয়ে যাবে যে দিদি!

—আমি জোর করছি না সালেহা। তুমি ভাবো। ভেবে দেখো। অনেক সময় আছে। পিন্টু কী বলে?

—কিসু না। ওর বুদ্ধিসুদ্ধি বেবাক শূন্য হয়ে গেসে! শুধু বলে, আল্লাহ নাই! থাকলে কি আজ এই দশা হইত! ছেলের প্রতি তার তেমন টান নাই! বয়স কম! এখন আমারে দুষ দ্যায়, বলে তোর জন্য মাগি আমারেও শাস্তি ভুগত্তি হচ্ছে! সবই নসিব দিদি!

—জীবন এইরকমই! না চাইলেও এমন এক দিকে নিয়ে যাবে! আমি আবার আসব সালেহা। তোমার বাচ্চার জন্য এই খেলনাগুলো এনেছি। নাও।

ঘন্টা বেজে গেল জেলে। সালেহা বিবি মাথায় কাপড় টেনে যেমন এসেছিল তেমনই অন্ধকারের ভেতরে ঢুকে গেল।

—জেলে জন্মানো বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনো ভেবেছেন জেলার সাহেব?

তপন সাহার মুখোমুখি বসে প্রশ্ন করল বসুমতী।

এই জাতীয় প্রশ্ন কেউ খুব একটা করে না, তাই অস্বস্তি হয়। অনুমতি নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে তপন বললেন, এই দেশে এইসব প্রশ্ন করে লাভ নেই ম্যাডাম। আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক ভালো তাই বলছি যে দেশে গভর্মেন্টি চোর টপ টু বটম সেই দেশের ভবিষ্যৎ কী আপনিই বলেন! ইদানীং কত ভুয়া আই এ পাশ, ডক্টর ধরা পড়ল বলুন তো! ভাগারের মাংস খেয়ে যে দেশের মানুষের পেটে চড়া পড়ে গেল, হজমও তো করেছি আমরা, করিনি? যে দেশে খিদে সমস্যা নয়, সমস্যা ধর্ম মন্দির মসজিদ সে দেশে জেল ও সংশোধনাগার কি? শ্রীকৃষ্ণর জন্ম লৌহ প্রাচীরের ভেতর কিন্তু সব শিশু কি কৃষ্ণ! হয়তো গোপনে অসুখ বেঁধেছে কিন্তু তা কেন আমরা তো জানি না! বলুন কী শাস্তি পেল ক্রিমিনালগুলো? ধর্মকে বর্ম করে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মূর্খ নাগরিকদের কব্জা করে ফেলেছে! সেই দেশে ফিমেল ফেটাস নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। সেই দেশে বাচ্চা জেলের ভেতর জন্মালে বড়ো হলে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে কে মাথা ঘামাবে আপনার মতো কয়েকজন ছাড়া?

এই সময় মাথার ভেতরে শুধু অন্ধকার জমাট বাঁধতে থাকে। একটা সমাজ যত আলোকিত দেখায় বাইরে ততটাই অন্ধকার ভেতরের দিকে নামলে!

—ঠিকই বলেছেন। তবুও আমাদের কি কোনো দায় নেই জেলার সাহেব?

—মানবিকভাবে আছে, কার্যত হাত-পা বাঁধা। আমি তো সরকারি চাকর। এসব তো ল-মেকাররা করবে সরকারের পরামর্শ নিয়ে। আমরা ব্যক্তিগতভাবে কিছু করতে পারি।

ঘাড় নাড়ল বসুমতী, হুম। হোমগুলোর অবস্থা সাংঘাতিক। পরশু গুড়াপের হোম থেকে দুই মেয়ে নিখোঁজ। পালাল না অন্য গল্প এখনো জানি না। যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে প্রশ্ন কেন পালাল? আর যদি অন্য কিছু হয়ে থাকে তাহলে আরো ভয়ংকর। এর আগেও লিলুয়া হাবড়া ঘুটিয়ারি শরিফ থেকে বহুবার সেম কেস! চাইল্ড অ্যাবিউজ, বাচ্চা ছেলে পর্যন্ত... ঘৃণায় নাক কুঁচকে গেছে বসুমতীর, হোমোসেক্সুয়্যালিটি! ক্যান য়ু ইমাজিন? হাউ কুড দে?

মাথা নীচু করে বসে তপন সাহা। সিগারেট কখন নিভে গেছে খেয়াল নেই।

—কিছু ভাবুন জেলার সাহেব। সালেহার কেসটা শুরু থেকে জানি বলে এতদূর ভাবছি। এটা শুধু সালেহার গল্প নয়, গোটা সমাজের গল্প। খোস-পাঁচড়া ঘা হয়ে বিষিয়ে গেছে সমাজ। আর যত দুর্গন্ধ ক্ষত ততই চাকচিক্য দিয়ে ভরিয়ে রাখার চেষ্টা!

হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন তপন সাহা, এ সমস্যার সমাধান নেই মিস দত্ত। এত বছরের জমা জঞ্জাল আমি আপনি একা কী করে সরাব? বাধা আসবে কত জানেন? মৌচাকে ঢিল ছুড়লে...! মধুর ভান্ডার তো!

ন্নাহ, আজ উঠি? আপনার মতো জেলার থাকলে কিছুটা ভরসা করা যায়। দেখবেন সালেহার বাচ্চাটাকে। আমি সময় নিয়ে আসব আবার।

ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বিদায় নিতে যাবে সে তখনই বিশাল হইচইয়ের হালকা একটা আওয়াজ কানে আসতে না আসতেই দুজন সান্ত্রী দৌড়ে এসেছে, স্যার! শিগগির চলুন... মেল ওয়ার্ডে পরশু একজন এল না, আর্টিস্ট...

তপন সাহা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? হয়েছেটা কী? বলতে বলতে বসুমতীকে ''স্যরি আসছি" বলেই লোক দুটোর সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন।

ব্যাপারটা কী জানার জন্য দাঁড়িয়ে রইল সে। এই জেল আশ্চর্য একটা জায়গা যেখানে অন্য এক পৃথিবী বাস করে!

প্রায় আধঘন্টা পরে তপন সাহা ফিরে এসে তাকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক, বললেন, আপনি এখনো আছেন?

—স্যরি! বুঝতেই পারছেন এরকম একটা ঘটনা শুনে চলে যেতে পারলাম না। যদি আপত্তি না থাকে...!

চেয়ারে বসতে বসতে বোতল থেকে জল ঢকঢক করে খানিক খেয়ে নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে কপাল ঘাড় থেকে ঘাম মুছে লম্বা শ্বাস ফেললেন তপন। তারপর কাঁধ ঝাকিয়ে বললেন, সেক্স! বুঝলেন? চিন্তিত যে তিনিও কপালের ভাঁজ দেখে বোঝা যায়।

—কী হয়েছে?

—পরশু একজন সিউড়ি থেকে ট্রান্সফার হয়ে এখানে এসেছে। ইয়াং একদম। ব্রিলিয়ান্ট। ট্রান্সজেন্ডার! আমাদের এই এক সমস্যা। ধৈবত। ও নিজেকে ছেলে বলেই মনে করে কিন্তু দেখতে মেয়েদের মতোই। কিন্তু বিহেভিয়ার ম্যানলি!

—কেসটা কী ?

—পার্টনারের মার্ডার কেস। ও বলছে ও মার্ডার করেনি। আমারও মনে হয় ওকে ফাঁসানো হয়েছে। ছেলেটা খুব শান্ত ভদ্র টাইপ।

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে বসুমতী।

—পরশুই শুনেছি অ্যাবিউজড হচ্ছিল অন্যদের হাতে। ওকে নাকি মাঝরাতে সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করা হয়েছিল! নটোরিয়াস একটা মাফিয়া এইখানে আছে। একদম শুয়োরের বাচ্চা শালা ওটা! খতরনাক! আসা অবধি একে ব্লেড মারছে, ওর খাবার কেড়ে খেয়ে নিচ্ছে! ঘরের মধ্যে পেচ্ছাপ করছে! অন্যরা ঘুমোতে পারছে না। একমাত্র আমাকে ভয় পায়। আর অ্যাডিশনল জেলারকে তো যমের মতো! আজ এখন নাকি আবার ওকে সেক্সুয়ালি হ্যারাস করছিল! ছেলেটা রুখে দাঁড়াতেই তলপেটে লাথি মেরেছে এমন যে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এক্ষুনি। শালা বাহেনচো..., স্যরি, মুখ খারাপ হয়ে যায়। কিছু মনে করবেন না প্লিজ।

চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে বসুমতীর। এক মুহূর্ত কী ভেবে নিয়ে বলল, আমি কি দেখা করতে পারি ওকে? হাসপাতালে?

—কার্ড আছে তো আপনার সাথে?

—আছে।

—তাহলে আমার সঙ্গে চলুন। ওকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে গাড়ি। আমি বেরবো এখন।

ব্লাডারে আঘাত পেয়েছে ধৈবত। আসামি নম্বর চারশো দুই!

জেলার পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বসে রইল বসুমতী। কড়া পাহারায় ওটি চলছে তার। হাসপাতালে পুলিশ পাহারা আঁটোসাঁটো এখন। তপন সাহা বসুমতীকে জিজ্ঞেস করলেন, ম্যাডাম কি ওয়েট করবেন না চলে যাবেন? আপনাকে তো ট্রেন ধরতে হবে! আমি জানিয়ে দেব আপনাকে। আর, এসব তো আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার! আপনাদের কাছে নতুন!

ছেলেটাকে এখনো দেখেনি সে। তবু কী এক অজ্ঞাত কারণে যে টান অনুভব করছে সে! দেখা করেই যেতে হবে, মন চাইছে।

—ম্যাডাম!

—হ্যাঁ, চিন্তার মধ্যে থেকে চমকে উঠেছে বসুমতী, বলুন।... না না দরকার হলে আজ থেকে যাব। কিন্তু দেখা করে যাব।

তপন সাহা একটু বুঝি অবাক হলেন। তারপরেও তা বুঝতে না দিয়ে বললেন, অ্যাজ ইউ উইশ ম্যাম।

প্রায় দু-ঘণ্টা পরে ওটি থেকে যখন ধৈবতকে স্ট্রেচারে করে বের করে রুমের দিকে নিয়ে যাওয়া হল, এক ঝলক তার মুখ দেখতে পেয়েছে বসুমতী। হালকা চাপ দাড়ি। ফর্সা। ঘুমন্ত এক মুখ! সেই মুখে অন্যায়ের কোনো চিহ্ন নেই!

ডাক্তার জানালেন, বিপদমুক্ত আসামি চারশো দুই! ধৈবত বিশ্বাস। ব্লাডারে প্রচণ্ড আঘাতে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।

তপন সাহা বসুমতীকে জানালেন, জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত কেবিনে ঢোকার পারমিশন নেই। জ্ঞান ফিরলেও ডাক্তার বুঝলে তবেই...! মনে হয় না আজ পারবেন। আপনার কি খুবই দরকার? আমিও এখন চলে যাব ম্যাম।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়েই কাঁধ ঝাকাল বসুমতী, বলল, ওকে, আমারও তো যাওয়াই উচিত। কাল আসব তাহলে। আমাকে প্লিজ যদি একটু খবর দেন।

তপন সাহা বেরিয়ে গেলেই বসুমতীও বেরিয়ে পড়ল। একটা হোটেলের ব্যবস্থা করতে হবে রাতটুকুর জন্য।

এত বড়ো প্রাপ্তি যে তার জন্য অপেক্ষা করেছিল কে জানত!

মাঝারি মানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটা হোটেল দেখে ঢুকে পড়েছে সে। অন্য কাস্টমারের ব্যস্ততা কাটিয়েই সোফায় অপেক্ষারত তাকে দেখে রিসেপশনিস্ট যুবকটি ভ্রু-তে ভাঁজ ফেলে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, ম্যাম!

ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল সে, চমকে তাকিয়েই উঠে দাঁড়িয়েছে, বলল, রুম চাই। আজকের জন্য। কাল চেক আউট।

ছেলেটির বিস্ময় কাটছে না যেন, বলল, আপনি মানে বসুমতী দত্ত, না?

ততোধিক অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ। আপনাকে তো...স্যরি!

—হাজরা ল-কলেজ? তাই তো?

—হ্যাঁ। কিন্তু...

—দেবার্চনকে ভুলে গেছ? এতটাই হেট করতে! হা হা করে হাসছে যুবক, আরে তোমার ডাইহার্ট ফ্যান গুণমুগ্ধ রূপমুগ্ধ সেই বখাটে লুচ্চা হা হা হা...তুমি ঠাঁটিয়ে থাপ্পড়..

বসুমতীর দুই ঠোঁট ফাঁক হয়ে এত বড়ো হাঁ হয়ে গেছে! চোখে সেই বিস্ময়। কিছুক্ষণ কথা বলতেই পারল না।

দেবার্চন তার পাশেই সোফায় বসে পড়েছে। হাসছে সে খুব। আর্দালিকে ডেকে অর্ডার দিয়ে দিয়েছে দু-কাপ দার্জিলিং টি!

অপ্রস্তুত ভাব কাটিয়ে উঠেছে বসুমতী। পেছনে ফিরে গেছে অনেক বছর আগে। অতীত থেকে ডুব দিয়ে ওঠার আর্দ্রতা চোখ-মুখ ভিজিয়ে দিয়েছে যেন!

—দেবার্চন মুখার্জি! থার্ড ইয়ার! ঠোঁটের রেখায় হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।

হা হা করে হাসছে দেবার্চন, যাক। চিনতে পেরে জুতো ছুড়ে মারোনি, ভাগ্যিস!

লজ্জায় আরক্ত সে। কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না।

আর্দালি চা দিয়ে গেলে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়েছে দেবার্চন, নিন ম্যাডাম। সবচেয়ে ভালো কোয়ালিটির চা দিয়ে আপ্যায়ন করতে পেরে এ লুচ্চা কৃতার্থ। কতদিন পর! ইতিহাস যাকে বলে!

দু-হাত জোড় করেছে বসুমতী, বলল, প্লিজ! এইভাবে বলো না। তখন আমরা সবাই ছোটো ছিলাম। আর আমি তো...ধ্যাৎ! কিন্তু এই হোটেলে তুমি কী করছ ল-পাশ করে? ওকালতি করো না?

—আমার হোটেল বসুমতী। তুমি কি লক্ষ করেছ হোটেলের নাম?

চায়ে চুমুক দিয়ে শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরা যেন নিমেষে উজ্জীবিত! কী আরাম! সবকিছু তবু যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। আনমনে

বলল, মাহ! খেয়াল করিনি তো! এত টায়ার্ড...প্র্যাকটিক্যালি আজ কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। একটা কাজে আটকে পড়ে...হোটেল খুঁজতে খুঁজতে রিকশাওয়ালা ছেলেটি এইখানে নিয়ে এল। ঢুকেই পছন্দ হয়ে গেল মোটামুটি, তাই।

সোফার পেছনে ঘাড় হেলিয়ে দিল দেবার্চন যেন অনেক অনেক দিনের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। সেই অবস্থানে থেকেই বলল, হোটেল বসুমতী।

চা চলকে পড়ল তার শাড়িতে। হাতের পাতাতেও। "উফফ!" করে উঠেই স্বাভাবিক আবার। এমন আশ্চর্য যে তার জীবনে কোনো বাঁকে কখনো অপেক্ষা করে থাকতে পারে এ কল্পনাতীত!

চোখে কৌতুক দেবার্চনের। খুব মজা পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে বলল, ওকালতি করতে ভালো লাগল না। তুমি আমাকে যতোই লোচ্চা লাফাঙ্গা ক্যারেকটারলেস ভাবো না কেন অতটা আমি ছিলাম না কিন্তু। কিছুদিন ক্রিমিনাল প্র্যাকটিস করেছিলাম। ভালো লাগল না! ব্যবসা করব মাথায় ছিল। এই হোটেলটা চালাতে পারছিল না বাবার বন্ধু। বিক্রি করে দেবে শুনে আমি কিনে নিলাম। আগে নাম ছিল রিজেন্ট হোটেল। হা হা হা...আমি ভেঙেচুরে নতুন কনস্ট্রাকশান করলাম। নামও চেঞ্জ।

—তা বলে বসুমতী!!!!!

—আজ্ঞে দিদিমণি। আপনার নামটা এই ক্রীতদাসের হৃদয়ে বসে গেছে যে! আপনি বুঝতে পারেননি! আর...সবাই কি হৃদয়ের গল্প শুনতে পায়?

ভরা পুকুরের জলের মতো বিস্ময় বসুধারার চোখে।

মনে পড়ে...

মায়ের অবাধ্য হয়েই আইন পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

—তুই ল' পড়বি! জানিস যাদের কোনো গতি নেই তারা ল' পড়ে!

—মানে? অগতির গতি তো সেই আইনই ভরসা মা! কী বোকাবোকা কথা বলছ মা!

—ল' কেউ ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে পড়ে না। টুকে পরীক্ষা দেয়। এই তো সেইদিনই কাগজে দেখলাম টেবিলে একদিকে বই খুলে অন্যদিকে ভোজালি রেখে পরীক্ষা দিচ্ছে হবু ল-য়াররা! তারপর মারপিট তো লেগেই আছে! না তুমি সায়েন্স পড়ো আমি চাই।

সিদ্ধান্ত তার নেওয়া হয়েই গেছে। আইন পড়বেই। পুলিশে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে ছিল গ্র্যাজুয়েশনের পর। তারপর কমপিটিটিভ একজাম! আই পি এস! কিন্তু নিজের মনেই দ্বিধা তৈরি হয়েছিল, যদি না হয়! সামাজিক দুর্নীতি অবক্ষয় তাকে অহরহ ভাবায়। অতএব সিদ্ধান্ত আইনজীবী হবে সে। অনড়ভাবে সে বলল, আমি ল' পড়ব। ব্যারিস্টারি করব। জাজ হতেও পারি মা। তুমি আটকিয়ো না।

বাবা মারা যাওয়ার পর অহেতুক রক্ষণশীল হয়ে গেছেন যেন প্রমিতা। মেয়ে যে সিদ্ধান্ত পাল্টাবে না বুঝে গেছেন। অগত্যা চুপ।

জলজ ঢেউয়ে ঢেউয়ে অতীত!

বাইরে শান্ত অথচ প্রচণ্ড ডাকাবুকো একটা মেয়ে সে। সতেরোতে আইন নিয়ে পড়া শুরু হল। প্রথম সাতদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছে মায়ের কথা খুব একটা ভুল নয়। হই-হট্টগোল, ক্লাস না হওয়া এসব নিত্যদিনের ব্যাপার। ছাত্রীর সংখ্যা তুলনায় অনেক কম। যে দু-চারটি মেয়ে পড়তে আসত তারা মাথা নীচু করে আসত, চলে যেত। ছেলেদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন ক্লাস করে। বাকিরা ক্লাসমুখো হয় না। ক্লাসে এসেও চলে যায়।

ইউনিয়ন নিয়েও মারপিট লেগে থাকে প্রায়ই। থার্ড ইয়ারের দেবার্চন মুখার্জি গুন্ডাদের লিডার বলা যায়।

ফ্রেশার্স ওয়েলকামের দিন সে ক্লাসে এসে একথা-ওকথা বলার পর সরাসরি তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, আরে ওয়াহ্! মিস ইন্ডিয়া!

চোয়াল শক্ত হয়ে গিয়েছিল তার। চোখ নামায়নি সে। স্থির অপলক দৃষ্টি!

—ঝাঁসির রানি! গুড! লাইক ইট!

—মেয়েদের এইভাবে অপমান করতে শিখেছেন?

দেবার্চনের সঙ্গে থাকা চ্যালারা হো হো করে হেসে উঠেছে কথা শুনে। পরিস্থিতি অস্বস্তিকর। অন্য মেয়েরা চুপ। ছেলেরাও চুপ।

হিন্দি সিনেমার স্টাইলে দেবার্চন আরও দু-কদম এগিয়ে এসে হাসল।

—এখানে ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে।

—হ্যাঁ। আমার বাবা স্কুল মাস্টার। আমি ল-ইয়ার হব তোমার আগেই। আমার দাদু ব্যারিস্টার ছিলেন। তাঁর বাবাও। তোমাকে দেখতে সুন্দর, সেটাই বলেছি। সেটা কি অভদ্রতা? তোমার বাবা মিউজিয়ামের কিউরেটর ছিলেন! মা স্কুলে! তুমি একমাত্র দেমাকি সন্তান! বাবা মারা গেছেন! তুমি গোখেল মেমোরিয়াল থেকে এক্সেলেন্ট রেসাল্ট করে এসেছ। তোমার হাইট ফাইভ সেভেন! থার্টিফোর-টুয়েন্টি এইট-থার্টিফোর! আন্দাজ ভুল হয় না। তুমি একটা বড়োলোকের ছেলের সাথে প্রেম করো।

কান দিয়ে আগুনের হল্কা বেরোচ্ছে তার। ঠাঁটিয়ে একটা থাপ্পড় মেরে দিল সে। পিন পড়লে শব্দ হবে রুমে। দেবার্চন প্রাথমিক হতচকিত ভাব কাটিয়ে উঠেই গালে হাত বোলাতে বোলাতে স্মিত হাসল, বলল, সুপার্ব এনকাউন্টার! আগে লাইক করতাম। আজ থেকে ভালোবাসি। বাই।

ঢেউয়ে ঢেউয়ে উঠে আসছে সময়।

প্রথম সেমেস্টার শুরু। কলেজের রাস্তায় বাস থেকে নামতেই বুঝে গেছে কিছু একটা গণ্ডগোল। দলে দলে ছেলেরা ফিরে আসছে। মুখ গম্ভীর।

কী হয়েছে? কী হয়েছে?... কথাটাই বাতাসে! শোনা গেল তৃতীয় বর্ষের ছাত্ররা পরীক্ষা দেবে না বলে আন্দোলন করছে গেটের মুখে। চেয়ার টেবিল বেঞ্চ এনে আটকে দিয়েছে!

মেইন গেটের সামনে যেতেই তীব্র বিশৃঙ্খলা। দেবার্চনকে চোখে পড়ল একটা বেঞ্চের ওপর শুয়ে আছে! ভিড় ঠেলে এগিয়ে দেবার্চনকে ডাকল সে, এই যে! এসব কী? হ্যাঁ? আপনারা পরীক্ষা না দিন যারা চায় তাদের আটকানোর কী রাইট আপনার

উড বি ল-ইয়ার? অসভ্য বখাটে! ইতরামির লিমিট থাকা উচিত।

কিছুই হয়নি এমন ভাব দেবার্চনের, সামনে এসে বলল, কী হয়েছে বেবি! আমাদের দাবি আমরা বই দেখে লিখব। কী অসুবিধা? ওকালতি যখন করব তখন বই দেখে দেখেই তো প্র্যাকটিস করব। কী?

পুলিশ এসে গেছে ইতিমধ্যে। দেবার্চন সহ বেশ কিছু ছাত্র গ্রেফতার হল। পরদিনই জামিন পেয়ে উপস্থিত আবার সদলবলে।

পরীক্ষা দিয়ে বেরোনোর সময় তার সামনে উপস্থিত দেবার্চন, এই যে দেবী!

—বলুন।

—আমি যদি ভালো ছেলে হয়ে যাই তাহলে আপনার দয়া পাব কি?

—একটা থাপ্পড়ে হয়নি?

—না। হোল লাইফ খেতে চাই।

—লাফাংগা লোচ্চার সঙ্গে আমি কথা বলি না। রাস্তা ছাড়ুন। এটা সস্তার হিন্দি মুভি নয়।

হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল দেবার্চন, বলল, দেখো আমি অতটা খারাপ নই। এক কাপ কফি কি খাওয়া যায় না?

—না।

সেই শেষ বাক্যালাপ! তারপর থেকে আর কখনো কথা বলতে আসেনি দেবার্চন। মুখোমুখি হলেও অচেনার মতো পাশ কাটিয়ে গেছে। কলেজে খুব একটা দেখাও যায়নি তাকে।

বৃষ্টিভেজা দিনের মতো নরম কিছু অতীত যে ধূসর দিনগুলোর মধ্যে শান্তভাবে ঘুমিয়ে ছিল, এ তার অজানা! বৃষ্টি পড়ছে বুকের ভেতর টুপটুপ টিপটিপ..!

—চা-টা, বসুমতী!

—ও, হ্যাঁ! চুমুক দিতে যেতেই হাত থেকে কাপটা নিয়ে চুমুক দিয়ে মাথা নাড়ল দেবার্চন, ঠান্ডা!!...অ্যাই রবি!!! বাবা, আরেক কাপ দে, না দিদিমণিকে। দ্রুতই বলে কথায় ফিরল সে, মনে আছে, কফি খাওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করেছিলাম? বাব্বা, মিস ইন্ডিয়ার কী ঘ্যাম তখন!

ঘটনার আকস্মিকতা থেকে তখনো বেরোতে পারছে না যেন বসুমতী। তুলনায় অনেক স্বাভাবিক দেবার্চন।

—কফি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম! আজ তোমার হাতে চা খেলাম! কী আয়রনি!

কান দিয়ে আগুনের হলকা বেরোচ্ছে তার। ঠাটিয়ে একটা থাপ্পড় মেরে দিল সে। পিন পড়লে শব্দ হবে রুমে।

—একেই পোয়েটিক জাস্টিস বলে বোধহয়!

—একটা কথা বলব? তোমাকে চেনা যাচ্ছে না জাস্ট।

হো হো করে হাসছে দেবার্চন, বলল, ভদ্রলোক হয়ে গেছি!

—আমাকে চিনতে পারলে! অনেক ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে এসেছি। আমারও তো পরিবর্তন এসেছে!

—তুমি যেমনই হও...থাক। আবার বলবে লাইন মারছি হে হে। তোমার নামে হোটেল আমার! তুমি কোথায় কী করো সব খোঁজ রাখি আর জানতাম একদিন এরকমভাবে দেখা হবে। তুমিই আসবে।

—এত ভালো ভালো কথা তুমি বলছ? হেসে ফেলেছে বসুমতী।

—বললাম তো ভদ্দরলোক হয়ে গেছি। আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে, তোমার রুম লাগবে তো? তোমার নামেই একটা মাত্র লাক্সারি স্যুট আছে হোটেলে। খুব অভিজাত ছাড়া কাওকেই ভাড়া দিই না। আজ স্যুট ধন্য হবে। চলো। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

হোটেল স্টাফেরা অনেকেই উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে নজর এড়ায়নি বসুমতীর, তাই বলল, তোমার স্টাফরা কী ভাবছে!

—ভাবুক এটাই তো চাই। চলো। তুমি যথেষ্ট ক্লান্ত। একটা শাওয়ার নিয়ে ফোন করো। স্ন্যাকস পাঠিয়ে দেব। ডিনার যদি আমার সঙ্গে করো খুশি হব।

অস্বস্তিটা বাড়তে শুরু করেছে বসুমতীর মধ্যে আবার। বলে ফেলল, প্লিজ এত অ্যারেঞ্জমেন্ট করো না। আমি আসলে...

—এইটুকু নাহয় আমার ভালোলাগার জন্য করলে ম্যাডাম? কাল তো চলে যাবে। আর আসবে না তাও জানি।

বিস্তীর্ণ ধূসর পথ! সেসব পেরোতে পেরোতে ক্লান্ত সে। এমন করে তো কেউ বলেনি কখনো!

বুকের ভেতর প্রায় শুকিয়ে যাওয়া শস্যভূমি হাহাকার করে উঠল যেন! কেঁদেছে সে তো অনেক কিন্তু এইভাবে কান্না এসে তো আপাদমস্তক ভিজিয়ে দেয়নি কখনো! খুব ধীরে মাথা নাড়ল সে, ডিনার, স্ন্যাকস সব একসঙ্গে...!

যে প্রশ্নটা সমীচীন কিনা ভেবে করতে পারেনি এখন সেটাই করে ফেলল সে, বিয়ে? করোনি?

হা হা হা হা, প্রায় অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল দেবার্চন, উঁহু, বসুমতী নামের কোনো মেয়ে জীবনে আর এল কই?

আরক্ত সে।

মাথা থেকে ঝরনার ধারা নামছে। আশ্চর্য অতীতে ভেসে যাচ্ছে সে। এমন তো হওয়ার কথা ছিল না! সেই কবেকার কথা! মসৃণ দিন ছিল! স্নানে আজ উচ্ছ্বাস নেই। শুধুই নিশ্চুপ নীরবতা! শুধু মনে হতে লাগল, এরকমও হয়! এইরকমও! তার জীবনটা কি তাহলে অন্যভাবে এঁকেছেন ঈশ্বর? কিন্তু এ পথ তো তার নয়!

কতদিন কত কতদিন পরে এমন আরামে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে যে কাল বসুমতী! স্নান সেরে নিতে নিতেই তপন সাহার মেসেজ এসেছে হোয়াটস্যাপে, ম্যাডাম এগারোটার মধ্যে চলে আসুন হসপিটালে।

বেরোনোর মুখেই দেবার্চন এসেছে, ব্রেকফাস্ট ঠিক ছিল তো? তোমার জন্য স্পেশাল, আমি বানিয়েছি। হোটেল চালানোর টাইমে কুকিং শিখলাম। দেখলাম নিজের নলেজ না থাকলে ভালোভাবে চালাতে পারব না।

দেবার্চনকে যত দেখছে ততই অবাক হচ্ছে সে। সেই ছেলে আর এই...!

—তুমি কি সোজা স্টেশনে না অন্য কোথাও?

—হসপিটাল। একজনকে দেখতে যাচ্ছি, জেল থেকে কাল অ্যাডমিটেড হয়েছে!

নিমেষ মাত্র; কিছু ভাবল যেন দেবার্চন, তারপর বলল, এইজন্য, এইজন্য তোমাকে ভালোবাসি। সেই বখাটে লোচ্চা ছেলেটা সেইসময়েই বুঝেছিল তুমি অন্যরকম। কিন্তু যে জীবন এখন তুমি যাপন করছ সেখানে রিস্ক এত বেশি, আমি ভয় পাই! তুমি তো কেউটের ঘরেও হাত ঢুকিয়ে দাও, আমি জানি। এনিওয়ে, যোগাযোগ রেখো। আমি সবসময় আছি, জেনো। নিজে থেকে তোমাকে বিরক্ত করব না। চলো হসপিটালে পৌঁছে দিই।

ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক এগারোটাতে হাসপাতালে পৌঁছে গেছে সে। নিজেই ড্রাইভ করেছিল দেবার্চন। গাড়ি থেকে আর নামল না। আশ্চর্য নরম একটা হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল তার মুখে। সেই অভিব্যক্তির সহস্র অর্থ হতে পারে!

পুলিশ পাহারায় কেবিনে যে যুবক চোখ বন্ধ করে সাদা চাদর বুক পর্যন্ত ঢেকে শুয়েছিল তাকে দেখে ক্রিমিনাল ভাবার কোনো অবকাশ নেই, এইটুকুই প্রাথমিক উপলব্ধি হল বসুমতীর।

নার্স, আয়া সহ তাকে রুমে ঢুকতে দেখে চোখ খুলে তাকিয়েছে ধৈবত। দৃষ্টিতে স্পষ্ট বিরক্তি।

নার্স মেয়েটি বলল, উনি আপনার সাথে একটু কথা বলবেন।

খানিকটা দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়েছিল সে। কানে এল ধৈবতের কথা, কে উনি?

—জেলার সাহেব অনুমতি দিয়েছেন। উনি সোস্যাল ওয়ার্ক করেন। হোম, জেল এসব নিয়ে..!

এই উত্তর যে তাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না বোঝা যায়। মুখের ওপরে বলে দিল, পারেও এরা! শখের সমাজ উদ্ধারকারী! তা আমার কাছে কেন?

ধৈবতের পাশে চলে এসেছে সে, মুখেচোখে প্রশ্রয়ের হাসি, বলল, আপনি রাগ করতেই পারেন। তবে শখের গোয়েন্দার মতো শখের সমাজকর্মী নই। নদীর বাঁধের বিরুদ্ধে কাজ করছি। আমি ও সাহিত্যিক মণিমা হাজারিকার চেষ্টাতেই আলফার উর্ধ্বতন নেতারা সারেন্ডার করেছিলেন। স্ট্রিট চিল্ড্রেনদের মিনিমাম এডুকেশন হেলথ শেল্টারের জন্য লড়ে যাচ্ছি। উইমেনস ট্রাফিকিং-এর এগেইনস্টে ফাইটটা সবচেয়ে টাফ! জেলে আইনের চোখে অপরাধী কিন্তু সামাজিকভাবে নিরপরাধদের মানসিক সাহায্য...এইসব আর কী!

ধৈবত প্রায় লাফিয়ে উঠে বসতে গিয়েই কঁকিয়ে উঠল। নার্স সঙ্গে সঙ্গে শুইয়ে দিয়েছে তাকে, মৃদু ধমক দিল, আপনার এইভাবে ওঠা ঠিক নয়। শুয়ে শুয়েই কথা বলুন। আর ম্যাম, দেখবেন উত্তেজিত হয় এমন কথা বলবেন না এখন।

সে প্রকৃতিগতভাবে ধীরস্থির, নম্র। আরো নমনীয় হয়ে বলল, কাম ডাউন প্লিজ। আপনার হেলথ অনেক প্রেশাস। বলুন কী বলতে চাইছিলেন।

উত্তেজনায় বুক দ্রুত ওঠানামা করছে ধৈবতের। একটু শান্ত হয়ে বলল, এই সামাজিকভাবে নিরপরাধ ব্যাপারটা কি হাস্যকর নয়? আপনার নামটা প্লিজ...!

—হাস্যকর নয়। অথচ সত্যিই হাস্যকর। সেইজন্যই বিষয়টা নিয়ে কাজ করছি। আমার নাম বসুমতী দত্ত। পেশায় আমি আইনজীবী। যদিও মূল কাজ সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে আর আইনজীবী হওয়ায় কাজটা সহজ হয়ে গেছে।

—আমার কাছে কেন?

—আপনি আমার থেকে অনেক ছোটো, নাম ধরে ডাকতে পারি?

—হুম।

—আমি জানি আপনি সামাজিকভাবে নিরপরাধ। জেলের পরিবেশ আপনার জন্য নয়। জেলকে গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে সংশোধনাগার! কী সংশোধিত হচ্ছে আমি জানি না! আমার কাছে বহু কেস রিপোর্ট আছে ছাড়া পাওয়ার পর আসামি আবার সেম অপরাধ করছে! কেউ কেউ হার্ডকোর ক্রিমিনালদের সঙ্গে মিশে ছাড়া পেয়ে আরও বড়ো অপরাধ চক্রে জড়িয়ে পড়ছে! এসব নিয়ে কেউ ভাবিত নয়। অথচ এরাই আমাদের সমাজ।

অনেক শান্ত এখন ধৈবত। উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে।

—ধৈবত, আপনাকে হেল্প করতে চাই। আমাকে সবটা বলবেন?

নৈঃশব্দ্য এক যুগ ধরে যেন বসে আছে এই ঘরে!

মাথা নাড়ল সে, হুম। লাভই বা কী! একজন খুনির তো কোনো স্পেস নেই! ওই বেঁচে থাকব আর কী!

—একটা সাজেশন! জেলে রেগুলার যে ঘটনাগুলো ঘটছে লিখতে থাকুন। আমি অনুরোধ করব আপনাকে লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ দিতে। আর অন্য সেলে পাঠাতে। এতটুকু আমি সাধ্যমতো

ট্রাই করব। আর ডিটেইলস দিন। আমি প্লিড করতে পারি। আই উইল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট।

দু-হাত জড়ো করে, নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল ধৈবত।

—আমার ফোন নম্বর দিয়ে দিতে বলব জেলার সাহেবকে।

—হুম। আমি মানাকে মারিনি। ও সুইসাইড করেছিল। অসম্ভব চাপে ছিল। ওর পেরেন্টসরা মেরেছে বা সুইসাইড। আমার কাছে আসতে দিচ্ছিল না। ফোন কেড়ে নিয়েছিল। বাড়িতে আটকে রেখেছিল। আমি কী করে মার্ডার করব বলুন? আমরা একসঙ্গে থাকতাম। ওর কিছু সার্টিফিকেট ওর বাড়িতে ছিল। সেগুলো আনতে গিয়েছিল। ওর বাবা প্রমিস করেছিলেন যে ওগুলো দিয়ে দেবেন। কিন্তু ও আর ফিরল না! থমথম করছে ধৈবতের মুখ।

—জীবনকে আঁকড়ে ধরবেন না। আজ আসি। আপনাকে আর ক্রিমিনালদের সঙ্গে থাকতে হবে না।

—মিস দত্ত থ্যাংকস। জেলের ভেতরের গল্প আমি লিখব। নরক! একটা ভয়াবহ জগৎ। মানুষ আর মানুষ থাকে না এখানে। মানুষ যে বেসিক্যালি ভীষণ ভয়ংকর আমি এখানে না এলে বুঝতাম না! কী পরিমাণে হোমোসেক্সুয়ালিটি হয় জানেন! কেউ স্বেচ্ছায় করে, আর বেশির ভাগই জোর করে...! উফফ! ঘরের মধ্যে থুতু ফেলছে, পেচ্ছাপ করছে। মারপিট তো লেগেই...নরকের কনসেপশন! আমাকেও...!

—জানি। আজ আসি। জেলার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাব কলকাতায়। আপনার ব্যবস্থা করছি। সুস্থ থাকুন।

কাচের জানালার বাইরের পৃথিবী দ্রুত সরে যাচ্ছে। সবুজের পর সবুজ চলমান দৃশ্য এখন। বেলার দিকে এই ট্রেনে ভিড় কম। এসি কামরায় অনেকেই ঘুমোচ্ছে। সালেহার বুকের দুধ খাওয়ার শিশুর মুখ বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। শিশুটি লম্বা হয়ে গেল আর ধৈবতের মুখ হয়ে গেল আচমকাই! সালেহার জীবন থেকে পিন্টু নামের ছেলেটা চলে যাবে একদিন! আঠেরো বছর বয়সের পিতৃত্ব সে অস্বীকার করছে এখনই! কিন্তু সালেহা বিবি ন-মাস যেমন করে ধারণ করেছিল তার শিশুকে তেমনই প্রতিপালন করবে হয়তো অথবা করবে না! সালেহার জীবনে নিশ্চিত পুরুষ আসবে একদিন। কিন্তু...! সালেহার শিশুটির মুখ বারবার ভেসে উঠছে!

চোখ লেগে আসছিল বসুমতীর। আচমকাই এক ঝটকায় খুলে গেল। মনে হল ওই শিশুও কি একদিন আবার জেলের অন্ধাকারে ফিরে আসবে? এভাবে চলতে থাকবে জীবন ও অপরাধ!

ধৈবত দেবার্চন সালেহা ফিরে ফিরে আসছে।

মন কথা বলছে মনের সঙ্গে একান্ত আপনমনে। সেই গুন্ডা লাফাঙ্গা ছেলেটা...! যার নাম শুনলে মাথায় রক্ত চড় সেই ছেলে...কষ্টকল্পিত সিনেমা যেন! কী অসম্ভব পরিবর্তন! ভালোবাসত তাহলে তাকে সত্যিই! না, বাসলে...! চিন্তার যোগসূত্র হারিয়ে যাচ্ছে। একঝলক কলেজের দিন বিচ্ছিন্নভাবে এসে থমকে দাঁড়িয়েই অন্তর্হিত! সে তো দূর অতীত! কবেই তাকে পেছনে ফেলে এসেছে সে! যেন পূর্বজন্ম ! দেবার্চন ফিরে এল কেন তবে? এইভাবেও ফিরে আসে কেউ পূর্বপরিকল্পনা ছাড়া! কী লাভ হল! কী লাভ! কত প্রশ্নের উত্তর তার জানা নেই!

হালকা ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল সে কখন খেয়াল নেই! সমস্ত চিন্তা জুড়ে দেবার্চন, এইটুকু হাল্কা ঘুমের মধ্যেও বুঝতে পারছে। দূর থেকে গানের সুর ভেসে এসে চেতনায় আঘাত করতেই চোখ রগড়ে সোজা হয়ে বসল সে। গান আর গায়ক এদিকেই আসছে।

...আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশীনগর
ও এক পড়শি বসত করে।
গ্রাম বেড়িয়ে অগাধ পানি

ও তার কিনারা নাই......দোতারার মিষ্টি আওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছে ট্রেনের এমাথা-ওমাথায়। বাউল পুরুষটি গাইতে গাইতে তার কামরার কাছে এসে পড়েছে। মাধুকরী চাইতে তার সামনে এসে দাঁড়াতে সে বলল, আরেকটি বার গাইবেন? কী মিঠা আওয়াজ! কথাগুলো আবার শুনতে চাই।

দু-হাত জোড় করে বিনয়ের সঙ্গে বাউল বলল, নিশ্চয় শোনাব। এ তো পরম ভাগ্য। একটা অন্য গান গাই গো দিদি! এই যে আমরা বলি সন্নেসী হব, পীর পয়গম্বর হব, সংসার আর ভালো লাগে না, তা সত্যিই কি পীর পয়গম্বর সন্নেসী হলেই মুক্তি? আসেন, সেই কথা বলি।

কোন দেশে যাবি মন চল দেখি যাই
কোথা পীর হও তুমি রে
তীর্থে যাবি সেখানে কি পাপী নাই রে।
ও কেউ নারী ছেড়ে জঙ্গলেতে যায়
স্বপ্নদোষ কি হয় না সেথায়
আপন মনের বাঘে যাহারে খায়
কে ঠেকায় রে...

কী গভীর কথা! ব্যঞ্জনা! আহা!

ব্যাগ থেকে একশোটি টাকা বাউলের হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় বাস?

খুশির বান ডেকেছে বাউলের মুখে, সে একগাল হেসে বলল, লাভপুর চেনো দিদি? ওইদিকে ঘর আমার। তা ঘরে আর থাকি কতটুক? মাধুকরী করতে বেরোতে হয়। এক হপ্তার খোরাক জুইটে গেলে একহপ্তা মনের আনন্দে গান গেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াই। যেখান-সেখান শুইয়ে কাটাই।

—খুব আনন্দের জীবন না তোমাদের?

বাউল ছেলেটি খুব খুশি, বলল, সে আনন্দের কথা কী আর বলি দিদি! এই যে আজ আপনি ডেকে এত কথা জিজ্ঞাসা করলেন তারও তো একটা অভিসন্ধি আছে! এই প্রকৃতিতে কিছুই এমনি এমনি ঘটে না গো!

—হয়তো।

—তুমি কী করো দিদি? কী সুন্দরী! দেখলেই নজর আটকে যাবে! তবে খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে আছ মনে করি।

—তোমার নামটা বলবে না?

—আমার নাম তারাপদ বাউল। তা দিদির নামটা?

—বসুমতী।

আহা আহা করে উঠল তারাপদ, বলল, ঠিক বলেছি। ঠিক বলেছি। বসুমতী না হলে কি এমন শুদ্ধ সুন্দর হয়! মা বসুমতী! এই দেহে সকলকে ধারণ করে।

—তারাপদ! কী বলছিলে, প্রকৃতিতে এমনি এমনি কিছুই ঘটে না! তাই না?

—হ্যাঁ। কার্য ও কারণ—এ তো থাকতে হবেই।

—বড়ো ভালো লাগল তারাপদ তোমাকে। তোমার খোঁজ আবার পাব কী করে?

—দিদি! লাভপুর ফুল্লরাতলা আমার আবাস। কখনো এসো।

মানুষের সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসে সে। এই সময়গুলোতে অভিকে ধন্যবাদ দেয় সে। ঘটনাগুলো পরপর না ঘটলে সে তো রাজপ্রাসাদে বন্দি জীবনযাপন করত! এত বড়ো পৃথিবীর প্রান্তিক মানুষগুলো যে অজানাই থেকে যেত!

গান গাইতে গাইতে এ কামরা থেকে ও কামরা চলে গেল তারাপদ। সুর আর কথারা ভেসে রইল। তারাপদর গাওয়া গানের কথাগুলো মস্তিষ্কের ভেতর একপ্রকার আন্দোলন করছে। কী সহজ অথচ বাস্তব! সত্যিই তো নিজের মনের ভেতরে আরেক পড়শি বাস করে! তাকে কতটুকু চিনি!

কতটুকু চিনি? কতটুকু চিনেছি নিজেকেই?

কতগুলো দিন-মাস পরে যখন ফ্ল্যাটের দরজায় চাবি ঘোরাল বসুমতী তখন খুলতেই চাইল না! তেল-জলের আদর না পেয়ে জং ধরে গেছে যেন তালাতে!

অব্যবহৃত ঘর বড়ো অসহায়! জানলা-দরজা বন্ধ থাকলেও কীভাবে যেন ধুলো ঢুকে এক হাঁটু! আলো জ্বেলে জানলা খুলতেই বয়ে গেল বাতাস। আর গুমসানো গন্ধটা বেরিয়ে গেল দুদ্দাড় করে।

একা! একার জীবন তার। কতটুকুই বা প্রয়োজন? কতটুকু প্রয়োজন তা বহুদিন আগেই বুঝে নিয়েছে সে। তাই ছাড়তে ছাড়তে একটা তক্তপোশ, একটা আয়না, আলমারি, বইয়ের আলমারি আর কয়েকটা চেয়ার এই নিয়েই গুছিয়ে নিয়েছে সে।

ঘরদোর ঝেড়ে-মুছে স্নান সেরে খাবারের অর্ডার দিয়ে দিল সে। দু-একটা দিন খোলসের মধ্যে থাকতে চায় সে।

স্নান সেরে আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়ে নিজেকে অনেকক্ষণ দেখল সে। আজকাল আর নিজেকে তেমন করে দেখতেও ইচ্ছে করে না। চুলে রুপোলি ঝিলিক এদিক-ওদিক। চুল তার বরাবর লম্বা ঘন। রঙে সোনালি গমের আভা। ঠোঁটে রঞ্জনি লাগানোর প্রয়োজন পড়ে না। আজ বেশ খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে মনে হল চোখ দুটো অনেক গভীরে বসে গেছে।

কেন দেখছি আমি নিজেকে? কেন? নিজেকে কখন দেখে মানুষ? যখন ভালোবাসে তখনই তো! নিজেকে কি সত্যিই আর তেমন করে ভালবাসি? নিজের মস্তিষ্কই আজ প্রবঞ্চনা করছে তাকে। এই মস্তিষ্ক, এই মনকে সে চেনে না। তাহলে কি? ন্নাহ্ বিচলন ভালো নয়।

সুইগির ছেলেটি দ্রুততার সঙ্গে খাবার দিয়ে গেল। খেতে খেতেও বড়ো অন্যমনস্ক সে আজ।

আগামী জীবন কঠোর তপোশ্চর্যার সে জানে। তাই সেই সাধনার শুরু হয়ে গেছে। একটা চৌকি তাতে তক্তপোশ। নরম গদি বহু বছর আগে পরিত্যাগ করেছে। শরীর বিছানার আশ্রয় চায়। তাই কোনোক্রমে খাদ্য গলাধঃকরণ করে আশ্রয় নিল বসুমতী বিছানার।

চোখ বন্ধ হয়ে আসছে আর চোখের পর্দায় ভেসে উঠছে দৃশ্যের পরে দৃশ্য!

অনেক লোক অতিথি সমাগম হয়েছে একটি স্থানে। ফুলের সাজে সেজেছে সে। ফুলের গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা দিল। বিয়ে বাড়ি! তার মন অবচেতন থেকে চেতন স্তরে এসে বলল, বিয়ে বাড়ি। সৌন্দর্যের প্রশংসায় প্রবাহিত সে। অভিকে অভিনন্দন জানাচ্ছে সকলে। কথা একটাই, খুব সুন্দর বউ হয়েছে!

হাসতে হাসতে করমর্দন করছে অভি। কিন্তু মুখের প্রতিটি সরু সূক্ষ্ম রেখায় কেমন হিংস্রতা তার নজর এড়াল না।

ব্যস্ত জনপথে দুরন্ত গতি তুলেছে সে গাড়িতে। আতঙ্কে সিঁটিয়ে আছে সে। দু-একবার বলার চেষ্টা করেছিল, এত স্পিড নিয়ো না। ভয় করছে। অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে।

ঠান্ডা শীতল দৃষ্টিপাত করে একই গতিতে স্টিয়ারিং ধরেছে অভি। ব্যস্ত রাস্তা ছেড়ে বাইপাস ধরেছে। হুহু করে উড়ছে গাড়ি। সপাটে আছড়ে পড়ল বাঁকের মুখে বড়ো গাছটার ওপর। বিকট গর্জন আর আলোর ঝলকানির মধ্যে জ্ঞান হারাল সে।

—আমি!

—হ্যাঁ অ্যাকসিডেন্ট করেছিল আপনার গাড়ি। ডাক্তার আর নার্সের মুখ ঝুঁকে দেখছে তাকে।

পেটে আর কপালে প্রদাহ। জ্ঞান ফিরলেও মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন। কোনো কিছু মনে করতে গেলে যে স্থিরতার প্রয়োজন তা নেই। তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হল। এক সকালে তার ঘুম ভাঙল যখন অনেকটাই স্বাভাবিক। সে উপলব্ধি করল হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে। চারদিকে ওষুধ-ইঞ্জেকশনের গন্ধ!

তার চোখ মেলার অপেক্ষা করছিল নার্স মেয়েটি, গুড মর্নিং বলেই বলল, আউট অব ডেঞ্জার এখন আপনি।

—অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল? আমার হাজব্যান্ড?

—উনি সেইদিনই প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট নিয়ে ফিরে গেছিলেন। ওনার তেমন কিছু হয়নি কপালে চোট ছাড়া। আপনার... বলে মুখ নীচু করল নার্স, বেবি এসেছিল, না? মিসক্যারেজ হয়ে গেছে! স্যরি!

কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল এত জল! দু-চোখ ঝাপসে উপচে গেল নিমেষে!

মাথায় হাত বোলাচ্ছে নার্স, সান্ত্বনা দিচ্ছে, কাঁদে না। অ্যাকসিডেন্টের ওপর কি কারো হাত আছে? আপনারা প্রাণে বেঁচে ফিরেছেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। কাল ডিসচার্জ করা হবে আপনাকে।

থমথমে পরিবেশ। বাচ্চাটা আলোর মুখ দেখল না তা নিয়ে

অভির কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। একই বাড়িতে দুজন অচেনা মানুষ বাস করছে।

কী কথা বলবে অভির সঙ্গে বুঝতে পারছে না। পারিবারিক ব্যবসা, আর রাতে বাড়ি ফিরে খাবার খেয়ে মদ্যপান করে শুয়ে পড়ে সে।

সন্ধেবেলা। ছুটির দিন ছিল। ঘরে বসে মদ্যপান করছে অভি। রেকর্ড প্লেয়ারে গান বাজছিল হালকা। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল সে।

—একটা কথা ছিল। বলব?

মদের গেলাসে যেটুকু ছিল দেওয়ালে ছুড়ে দিল সে, কী? কী চাই?

—বেবি নষ্ট হয়ে গেল। বাড়িতে বসে আমার কিছু ভালো লাগে না। আমি কিছু করতে চাই। এনগেজ রাখতে চাই নিজেকে। প্র্যাকটিস করি যদি? কারোর আন্ডারেই শুরু করি যদি..!

—খানকিবৃত্তি করতে চাস?

দুটো গালে সপাটে থাপ্পড় পড়ল।

—এসব হবে না এ বাড়িতে। এ বাড়িতে কোনো মাগি আজ পর্যন্ত ঘরের বাইরে গিয়ে রোজগার করেনি।

—ছিঃ! এই মুখের ভাষা! এই শিক্ষিত! তুমি জানতে না এল এল বি করেছি আমি? তোমাদের অনুরোধে প্র্যাকটিস শুরু করতে পারিনি! সংসার করব বলে...!

হিংস্র শ্বাপদের মতো ঝাপিয়ে পড়েছে ততক্ষণে অভি তার ওপরে। ওড়না দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে গলা। সেই বাঁধনের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে সে প্রাণপণে। গাড়ির ড্রাইভার ছেলেটি ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে পা দিয়েই চিৎকার করে উঠেছে, সাহেব! কী করছেন!!! ছাড়ুন! ছাড়ুন বলছি। বলতে বলতে হাত ধরে টান দিয়ে তাকে দরজার বাইরে ফেলতেই অভি বন্দুক নিয়ে তেড়ে এল। প্রাণপণে সিঁড়ির আড়ালে তাকে নিয়ে লুকিয়ে পড়েছে ততক্ষণে ড্রাইভার। মিনিট পাঁচ; রুদ্ধশ্বাস কয়েকটি মুহূর্ত। খুব সাবধানে তাকে বাড়ি থেকে বের করে ট্যাক্সি ধরিয়ে দিয়ে ছেলেটি বলেছিল, আর আসবেন না। মেরে ফেলবে আপনাকে। আজ আমাকে অ্যাসিড আনতে দিয়েছিল। আনতে পারলে বখশিস দেবে বলেছিল। আমি আন্দাজ করেছিলাম এরকম কিছু ঘটবে। বাড়িতেই ছিলাম। আপনাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বিপদ হতে পারে বুঝেই এসেছিলাম। আমিও কাজ ছেড়ে দিলাম আজ। মাইনে নিতেও যাব না। একটা পাগল শালা! স্যরি ম্যাডাম। ওর মাথার ঠিক নেই। দয়া করে আর আসবেন না।

চিল ডেকে যাচ্ছে একটানা। এইরকম দুপুরগুলোতে অতীত ঘুম থেকে উঠে আসে। দরদর করে ঘামছে সে। হিংস্র শীতল একটা মুখ বারেবারে তার ঘুমের মধ্যে ফিরে আসে। অভির মুখ!

খুব ছটপটে ডানপিটে মেয়েটা আশ্চর্যজনক শান্ত হয়ে গেছে কয়েকদিনের মধ্যে। গতকালই অভির মা এসেছিলেন, বোঝাতে চেয়েছিলেন, ছেলে তাঁর একটু বদরাগি কিন্তু মন তো ভালো। নাহলে তার তো চরিত্রদোষ থাকত। সে তো অন্য মেয়েদের প্রতি আসক্ত নয় কখনো।

প্রমিতা বলেছিলেন, এইরকম ভালো হয়ে লাভ কী বলুন তো? আমার মেয়ে যদি খুন হয়ে যেত? দিনের পর দিন টর্চার করে গেছে। মেয়ে আমার আমাদেরও জানায়নি, এত খরচ করে বিয়ে দিয়েছি, আমরা কষ্ট পাব জেনে...মুখ বুজে সহ্য করেছে। এইবার তো লিমিট ক্রস করে গেল! কোথায় ছিলেন আপনারা?

—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আমাদের মাথা না গলানোই কি ভালো নয়?

সৌজন্য আর রক্ষা করতে পারেননি প্রমিতা, বলেছিলেন, কীসের স্বামী-স্ত্রী? কোন শিক্ষিত পরিবারে স্ত্রীকে গলা টিপে মারতে যায় স্বামী? বলেন তো? আমার মেয়ে আর যাবে না। ও ভয় পাচ্ছে। এটা মান-অভিমানের ঝগড়া নয়। বিয়ে দিয়েছি বলে মেয়েকে আমরা গলগ্রহ ভাবি না। আপনি আসতে পারেন। কিন্তু ছেলে যেন না আসে এ বাড়িতে।

অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে ওঠে, দরজা বন্ধ করে দাও মা। আসছে কিন্তু। ও প্রতিশোধ নিতে আসবেই।

প্রমিতা আঁকড়ে থাকছেন মেয়েকে, কেউ আসবে না। আর এলেও তোমাকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না তুতুন।

পাগলের মতো সে চিৎকার করেছে, আসবে আসবে, তুমি ওকে চেনো না মা! ভয়ংকর! ও আমাকে মারবেই।

দরজায় বেল বাজলেই খাটের তলায় লুকিয়ে পড়া শুরু হল যে-দিন অভির মা ফিরে গেলেন সেইদিন থেকে।

প্রমিতা খুঁজে পান না মেয়েকে, তুতুন কই? কোথায় তুমি?

খাটের তলা থেকে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল যে মেয়ে তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন প্রমিতা। ভয়ে কাঁপছে মেয়ে। বলল, গেছে? চলে গেছে? বলেছিলাম?

প্রমিতা অবাক, বললেন, কে? ধূপকাঠি বিক্রি করতে এসেছিল তো মনা।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন সে, ওহ!

আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাকে তখন। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে একটু একটু করে।

আজ কেন মনে পড়ছে এইসব! মোবাইল ফোনটার দিকে কয়েকবার তাকাল সে।

—নম্বর বদলে ফেলতে হবে মা!

যখন-তখন বিভিন্ন নম্বর থেকে ফোন আসা শুরু হয়েছে। হ্যালো বলার পরেই খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ তারপরেই হাহা করে হাসে কেউ। কখনো একাধিক মানুষের অট্টহাসি। ফোনে রিং হলেই আতঙ্কিত সে।

প্রমিতা ফোন ধরলেও যেন চিনতে পারে সেই অদৃশ্য মানুষ, বলে, কোথায় লুকোবে মেয়ে?

পুলিশের কাছে গেছে দুজনে। পুলিশ সমস্ত শুনে ডায়েরি নিয়ে অভয় দিল, ভয় পাবেন না। যদি মনে করেন আপনার হাজব্যান্ড করছে তাহলে সরাসরি তার নামেই অভিযোগ করতে হবে। নাহলে আমরা তাকে অ্যারেস্ট করতে পারব না।

প্রমিতা বললেন, আমরা মা-মেয়ে থাকি। ভয় পাচ্ছি। ওরা অনেক পাওয়ারফুল।

অফিসার ভদ্রলোকটি কী বুঝলেন কে জানে, বললেন, বুঝতে

পারছি। ঠিক আছে, আমরা এই নম্বরগুলো কার বের করছি। তারপর স্টেপ নেওয়া যাবে। একটু সাবধানে থাকবেন। এইসব লোকে হাইপার হয়, বিশ্বাস করা যায় না সত্যিই। চারপাশে এরকম প্রচুর কেস হাতে আসছে, বুঝলেন?

শূন্য দৃষ্টি তার, বলেছিল, নিজেও ব্লেড দিয়ে হাত কাটে জানেন! খুব ভয়ংকর। হাত কেটে সেই রক্ত আমার মুখে মাখিয়ে দিয়েছিল একবার! সারারাত বাথরুমে লুকিয়ে ছিলাম। পরদিন ভোরে ওর মায়ের বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম।

প্রমিতা অবাক হয়ে তাকিয়ে মেয়ের মুখের দিকে। বললেন, বলিসনি তো! আর কত কী সহ্য করেছিলি রে! হ্যাঁ? শুনছেন অফিসার?

চোয়াল শক্ত হয়ে গিয়েছিল বয়স্ক অফিসারের, বলেছিলেন, স্কাউন্ড্রেল একটা। মা-বাপের প্রশ্রয়ে এইরকম বদমাইশ হয়ে ওঠে ছেলেগুলো। আমি দেখছি।

মোবাইল বেজে উঠেছে আচমকাই। কেঁপে উঠেছে বসুমতী। অচেনা নম্বর! এক মুহূর্ত; ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে একজন বলে উঠল, দিদি গো! ঘরে পৌঁছে গিয়েছ?

—তারাপদ! 'নিজেই হেসে ফেলেছে, অতীতের ভয়ের দিনগুলোতে সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছিল সে।

—আজ্ঞে গো দিদি। তারাপদ। তোমাকে বড্ড ভালো লেগেছে দিদি!

এক দমক হালকা বাতাস বয়ে গেল মনের মধ্যে। কতদিন কতবছর এই ফোনের শব্দে শিরদাঁড়া বেয়ে হিম স্রোত নামত। বলল, হ্যাঁ তারাপদ। অনেকক্ষণ। তুমি কোথায় ভাই?

—আমি ইস্টিশনে দিদি। ভাত খাচ্ছি। ভাতের গরাস মুখে তুলতে তুলতে তোমার কথা মনে পড়ল গো । তুমি কি বিরক্ত হলে?

একটা অশান্ত দুর্যোগের মধ্যে ছিল যেন সে এতক্ষণ। এখন ভালো লাগছে। বলল, না না। খুব খুশি হলাম। তুমি মনে করে ফোন করলে।

—আচ্ছা দিদি তবে আবার পরে কথা হবে এখন। খেয়ে নিই। জয় হোক দিদির।

কোথা থেকে এক শান্ত বাতাস স্নান করিয়ে দিয়ে গেল যেন তাকে। এই যে অচেনা তারাপদ, তার সঙ্গে আর কোনোদিন দেখাই হবে না হয়তো অথচ এক নিমেষে আত্মীয় হয়ে গেল!

ভালোবাসা, সম্পর্ক বলতে এইগুলোকেই বোঝে সে আজকাল।

একটানা ঘুঘু ডেকে যাচ্ছে। কেমন অলস দুপুর। হঠাৎ হুহু করে উঠল মন বসুমতীর। কেউ তো কোথাও নেই তার! অথচ সে একাও নয়। এত মানুষ! এত মানুষের জন্য সে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে! এত মানুষ তাকে ভালোবাসে। অথচ দিনশেষে একা! মা বাবা আত্মীয় বলতে যাদের বোঝায় কেউ নেই তারা! ছিল তো সবকিছু একদিন। চোখের কোল বেয়ে নিঃশব্দে জল গড়িয়ে নামছে! দেবীর কাছে কতদিন যাওয়া হয়নি! ফাদার ফোন করেছিলেন। নিজের দিকে তাকানোর পর্যন্ত সময় নেই। একটা স্বাধীন দেশে মানুষ মানুষের জন্য সমস্যা! কোথায় যাচ্ছে সে? কোথায় গিয়ে থামবে? কতটুকু পারবে সে?

প্রেম! ভালোবাসা! প্রথম প্রেম অভি। প্রেম এত নিষ্ঠুর হয়ে এসেছিল তার জীবনে! রিচি রোডের সেই প্রাসাদোপম বাড়িটা এইসব একাকী মুহূর্তে এসে দাঁড়ায়। রাজপ্রাসাদের রানি হতে পারত সে! কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গোটাকয়েক এমন প্রাসাদের মালিক অভিরা। বেশির ভাগই খালি পড়ে আছে। একটিতে মা-বাবা আরেকটিতে বিবাহিত বোন থাকত।

স্মৃতি কখন সক্রিয় হয়ে ওঠে বসুমতী জানে না। বোগেনভিলিয়ার গাছগুলো তার খুব প্রিয় ছিল। লাল হলুদ সাদা কমলার ঝাড় লতিয়ে দোতলার বারান্দা পর্যন্ত উঠেছিল। মাধবীলতার গাছটাও তার প্রিয় ছিল। মানুষ যখন খুব একা হয় তখনই কি প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শেখে! কই বিয়ের আগে তো এত ভালোবাসা জন্মায়নি মনে! অভি ব্যবসার কাজে বেরিয়ে গেলে রাজপ্রাসাদে সে একা, সঙ্গী বলতে দশজন কাজের লোক। ঠাকুর চাকর কুক দরোয়ান।

গান শুনে, বই পড়ে পড়ে একদিন ক্লান্ত হয়ে গেলে সে মাধবীলতার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। যত মনের কথা সব বলতে শুরু করল। বোগেনভিলিয়ারাও যেন উত্তর দেয় তার কথার। ক্রমশ খারাপ লাগা মন কেমন করা দুপুরগুলো খুশিতে ভরে উঠল।

—আমি গাছেদের সঙ্গে গল্প করি, জানো? আগে তো তুমি বেরিয়ে গেলে সময় কাটতেই চাইত না!

মদের গেলাসে বরফ ঢালতে ঢালতে চমকে তাকিয়েছে অভি, মানে?

আনন্দ ঝরে পড়ছে তখন তার গলায়, হ্যাঁ...আমি কথা বলি তো। রেসিপ্রোকেট করে ওরা।

—মাথায় গণ্ডগোল আছে নাকি!

—কেন?

—গাছেরা রেসিপ্রোকেট করে! হা হা হা...বুঝতে পারছ সমস্যাটা?

—সমস্যা বলছ!! কেন? য়ু মিন আয়াম ম্যাড?

—ইয়েস, অ্যাবসোল্যুটলি।

গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে আরও কিছু বলতে গিয়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে সপাটে থাপ্পড় পড়ল তার গালে। ঠান্ডা হিংস্র চোখে দেখছে অভি তাকে।

আকস্মিকতায় বিমূঢ় সে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে অভির দিকে। মদের গেলাস নিমেষে খালি করে দু-পা এগিয়ে এল অভি তার দিকে। দুটো হাত দিয়ে তার কাঁধ শক্ত করে চেপে ঝাঁকাচ্ছে, বলল, পাগলামি বের করছি। ব্যালকনিতে কীসের জন্য যাও? কোন নাগরকে দেখো? বলতে বলতে ইন্টারকমে ফোন করল, বাসুদেব! এক্ষুনি আয়।

বাসুদেব নামের আর্দালি ছেলেটি ভয়ে ভয়ে এসে উপস্থিত, আজ্ঞে সাহেব!

—মালিকে বল মাধবীলতা আর বোগেনভিলিয়াগুলোকে ছেঁটে দিতে। দোতলা অবধি যেন না থাকে।

বালিশ ভিজে যাচ্ছে বসুমতীর। সেই কোন অতীতে তার বুক ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল...আজ সেই ক্ষতস্থান আবার জেগে উঠল সমস্ত যন্ত্রণা নিয়ে! যন্ত্রণা ক্ষরণ হচ্ছে! চোখের সামনে কাটারির কোপে নুয়ে পড়ল গাছেরা! আহা! কী ব্যথা! হাসছে তখন অভি, হা হা হা হা...সমস্ত প্রাসাদের কোণে কোণে হাসি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে!

চোখ মুছছে সে যতবার ততোবারই ভিজে যাচ্ছে আজ। কেন মনে পড়ে! কেন! কেন!

সেই রাতে চরম যন্ত্রণা দিল অভি তাকে রাতের বিছানায়। মদ পেটে পড়লেই অমানুষ হয়ে যায় সে। সে সঙ্গম করতে চায় কিন্তু পারে না। ব্যর্থ হয়। আর ব্যর্থ হয় বলে হিংস্র পশুর মতো হয়ে যায়। তার যোনিদ্বারে কাচের শিশি প্রবেশ করিয়ে দিতে চাইলে সে প্রাণপণে তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে নীচের ফ্লোরে নেমে এসে একটি টয়লেটে লুকিয়ে পড়ে। ওপরে তখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে অভি আর চিৎকার করছে, কোথায় গেলি মাগি? অ্যাই রেন্ডি কোথায় গেলি?

রান্নার সহায়িকা মাসি এসে ভয়ে ভয়ে বলল, পালাও বউদিদি। তুমি মরে যাবে। কী হয়েছিল এত রাতে?

লজ্জায় ভয়ে সঙ্কুচিত সে। কী করে বলবে যৌন অত্যাচারের কথা! সে শুধু বলেছিল, আমি আর পারছি না গো। ঠিক বলেছ পালাতেই হবে। মা খুব কষ্ট পাবে তাই পালাতে পারছি না।

—তোমার গালে-মুখে অমন খামচে দিয়েছে.! ওম্মাগো মা!

ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে দৃশ্য। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর!

বৃষ্টি হয়ে গেছে বেশ ভারী। জানলা কপাট বন্ধ থাকার পর গুমসানো ভাব কাটাতে ঘরের জানলা সমস্ত খুলে দিয়েছেন প্রমিতা। মেঘের হুঙ্কার এখনো আকাশে। জ্বর থেকে উঠেছে সে সদ্য। জানলার পাশে বসে বৃষ্টিধোয়া প্রকৃতি দেখছিল। রাত তেমন হয়নি। দুর্যোগের কারণেই পথঘাট শুনশান প্রায়। অদ্ভুত নীল আলো আকাশ জুড়ে! গাছগুলো জল পেয়ে খুশি যে তা তাদের অলস দোলা দেখে অনুভব করা যায়।

বিক্ষিপ্ত মন জুড়ে অতীত শিকড় গেড়ে বসেছে। ডক্টর দ্বৈপায়ন চৌধুরী বারবার বলেছেন, নো মন খারাপ। নো, মানে নো। যখন কিছু মনে পড়বে ডায়েরিতে লিখবেন ভাবনাগুলো। পরে পড়বেন। বুঝতে পারবেন।

ধ্যানস্থ প্রায় সে শুধু মাথা নেড়েছিল।

—মিস দত্ত! বসুমতী! আমি কিন্তু আপনার বাবার বয়সি। বিশ্বাস রাখুন। জানেন মানুষ ভালো হলেই যে তার সঙ্গে সবসময় ভালো মানুষদেরই এনকাউন্টার হবে তার মানে নেই! লজিকের বাইরে। জীবনে একটা ভুল নির্বাচন হতেই পারে। আবার নতুন জীবন হবে, দেখবেন?

নতুন জীবন বলতেই যৌন নির্যাতনগুলো বীভৎসতা নিয়ে চোখের সামনে আসে। সে আঁতকে উঠে বলেছিল, না...! আর না। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠেছিল মুখ।

আজ অনেকদিন পর বৃষ্টি দেখে মন কিছুটা ভালো তার। প্রমিতা রবীন্দ্রনাথের গান চালিয়ে দিয়েছেন, মন মোর মেঘের সঙ্গীত...উড়ে চলে দিকদিগন্তের পানে...!

তার মনও পাল তুলেছে!

প্রমিতা একটা স্কার্ফ নিয়ে তার মাথা থেকে গলা ভালো করে জড়িয়ে দিয়ে রান্নাঘরে গেছেন কফি বানাতে। সেও সুরে সুর মিলিয়েছে।

প্রায়ান্ধকার গলিতে একটি ছায়ামূর্তি শুধু দেখতে পেয়েছে সে, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, জ্বলে গেল মা পুড়ে গেল......! জ্বলে গেল..!

প্রমিতা ছুটে এসে হতবাক কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখলেন মেয়ে বিছানায় পড়ে ছটফট করছে। বিছানার চাদর স্থানে স্থানে পুড়ে গেছে!

বসুমতীর হাতের পাতা জ্বলে গেছে!

অ্যাসিড আক্রমণ! ছুটে এসেছেন পাশের বাড়ির ডাক্তার। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল তাকে।

অ্যাসিড আক্রমণের কেস। প্রমিতা হতবাক। বুঝতে অসুবিধা হল না কে করেছে।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে অচেতন বসুমতী। ডাক্তারদের অভিমত, ট্রমাটাইজড। এই ট্রমা থেকে ওভারকাম করতে সময় লাগবে। জ্ঞান ফেরার পরেও কয়েকবার অজ্ঞান হয়েছে সে।

প্রমিতা শুধু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন, তুমি সহায় না থাকলে আজ মেয়েটার মুখটাই পুড়ে যেত! আপনমনেই বলে যাচ্ছেন, কী যে মনে হল স্কার্ফটা মাথা-গলায় জড়িয়ে দিলাম ঠান্ডা না লাগে যাতে। ঠাকুর রক্ষা করেছেন।

সাতদিন বাদে সে যখন বাড়িতে ফিরল অনেক স্বাভাবিক। যেন কিছুই হয়নি। শুধু গম্ভীর হয়ে গেছে আগের চেয়ে বেশি।

প্রমাণের অভাবে অভিকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। কিন্তু উকিলের পরামর্শ নিয়ে ডিভোর্স ফাইল করে এসে অনেকটা নিশ্চিন্ত।

গাঁট্টাগোঁট্টা ধরনের দুজন বেতের সোফায় বসে আছে। বিড়ি খাচ্ছে।

অদ্ভুতভাবে কাজের মধ্যে ফিরে গেল সে।

পরপর আশ্চর্যজনক ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করল।

প্রমিতা লাফাতে লাফাতে এসে ব্রাউন পেপারের খামটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ! মনে হচ্ছে এন জি ও থেকে...!

একরাশ আলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে! একটি বাদামি খামের মধ্যে এক পৃথিবী আলো!

আলোয় উজ্জ্বল মুখ তার, মা!!

—বলেছি না? সব ভালো হবে এবার থেকে! দেখে নিস। এবার থেকে তুই শুধু হাসবি।

বিদেশি এন জি ও-তে আবেদন করেছিল সে। কিছু কাগজপত্র পাঠিয়েছে তারা। সই করে পাঠাতে হবে। সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার।

—নতুন জীবন তুতুন! আর পেছনে ফিরে তাকানো নয়।

খুশি উপচে পড়ছে তার মুখে। বলল, হুম। এত আনন্দ হচ্ছে মা! আমি তো এইরকম কাজই করতে চেয়েছিলাম! পৃথিবীতে কত মানুষ কত কষ্ট আছে জানতে চাই। কতরকমভাবে মানুষ থেকে প্রকৃতি ডিপ্রাইভড আমি দেখতে চাই মা! আমি তাদের পাশে থাকতে চাই।

—ঈশ্বর পৃথিবীতে সকলের জন্য কাজ রেখেছেন। তোমাকে হয়তো এই কাজের জন্যই। এর থেকে বড়ো কাজ আর কী আছে ঈশ্বরের সংসারে! তুমি জীবন দেখেছ। জীবনকে এত কাছ থেকে দেখে সোনার মতো হয়ে উঠেছ।

আজ কতবার যে নিজেকে আয়নায় দেখল বসুমতী! কতদিন চুলের যত্ন নেয়নি! উজ্জ্বল ত্বকে বাসি দাগ লেগে রয়েছে! কিন্তু নিজের চোখের থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না। অ্যাসিডে দগ্ধ হাতের পাতায় শ্বেতীর মতো দাগটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। মৃদু হাসি খেলে গেল মুখের ওপর দিয়ে। দু-চোখের পাতায় কয়েকটি কথা ফুটে উঠল, ভালোবাসার চিহ্ন!

এই মেয়েকে বড্ড কম চেনেন প্রমিতা। আত্মজা হলেও অধরা। অভিকে যখন পছন্দ করল তখন বুঝিয়েছিলেন তিনি, এত ধনী ওরা, বিয়ে বলো আর বন্ধুত্ব, সমানে সমানে হতে হয়। আমরা মধ্যবিত্ত আর ওরা ধনী।

মেয়ের জেদের কাছে হার মেনেছিলেন। তার ওপর অভির মা-মাসিরা রীতিমতো কোমর বেঁধে লেগেছিল, এই মেয়েকেই ঘরে নিয়ে যাবেন বলে।

তারপর টানা দুটো বছর মারধর অত্যাচার নিয়ে চুপ করে সংসার করেছে! মুখ ফুটে যখন বলেছে মেয়ে তখনই জানতে পেরেছেন। অ্যাসিড আক্রমণের পরেই আচমকাই পালটে গেল!

অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা বারবার পড়ছিলেন প্রমিতা। এ বাড়িতে চলে আসা ইস্তক দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। আজ কতদিন পর বাড়িতে খুশির আবহাওয়া। অন্য জীবনে পা রাখার ডাক এই চিঠি। তবু কোথাও বিষণ্ণতার সুর বেজে চলেছে। প্রথম পোস্টিং মেদিনীপুরে। শহর-শহরতলিও নয়, গ্রামে তার অফিস। হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেতে তো শেখেনি মেয়ে!

ভারী চমৎকার পরিবেশ মা! প্রায় জঙ্গলের মধ্যেই আমার অফিস আর বাড়ি। তোমাকে তো হোয়াটসঅ্যাপ করেছিলাম প্রথমদিন কেমন কাটল। লোক বলতে তো দরোয়ানজি, রান্নাবান্নার মেয়ে সুখি আর অফিস স্টাফ গোপাদি রীনা পল্লবদা উষসী। আমার অব্যবহিত বস মীরা নায়ার আমার জয়েনিং ডে-তে এসেছিলেন হায়দরাবাদ থেকে। রাতের ফ্লাইটেই মিসেস নায়ার চলে গেছেন।

এইসব কিছুই তোমাকে লিখেছিলাম হোয়াটস্যাপে। চিঠিতে আবার লিখছি তাহলে ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

আজ সকালে ঘুম ভাঙল অজস্র পাখির গানে আর বাতাসও যে কথা বলে এই প্রথম শুনলাম মা! দিনের বাতাস ভোরের বাতাস দুপুরের বাতাস বিকেল সন্ধে রাত মধ্যরাত; প্রতিটি সময়ে বাতাস নিজের মতো কথা বলে, শুনতে পাচ্ছি।

আমার বাড়ির ছবি তোমাকে ভিডিও করে পাঠিয়েছি। কিন্তু ভিডিও করার পরেও যেন কিছু বাকি থেকে যায় মা!

আজ প্রথম সকাল এইখানে। আমার গ্রামের পাশ দিয়ে শীলাবতী নদী বয়ে যাচ্ছে। আজ নদী দেখে এলাম গ্রামগুলো ভিজিট করতে গিয়ে। আমি চাই নিজের হাতের তালুর মতো আমার পরিবেশ আর মানুষদের চিনে নিতে।

হ্যাঁ সকালের কথা বলছিলাম। জানলার পাশে ঝুঁকে আছে অজস্র গাছের ডাল। জানলা খোলাই রেখেছি। এইখানে হিংস্র মানুষ থাকে না যে আক্রমণ করবে জানলা দিয়ে! খুব নিরাপদ মা। যতদূর চোখ যায় শুধুই সবুজ। সবুজেরও কতরকম রং হতে পারে এখানে না এলে জানতেই পারতাম না!

তোমার কথাই মনে হচ্ছে, ঈশ্বর একেকজনের জন্য একেকরকমের জীবন লিখে রাখেন। প্রকৃতির মধ্যে এসে বুঝলাম প্রকৃতি ছাড়া আমাদের অন্য কোনো আশ্রয় নেই। জীবনকে যদি খুঁজতেই চাও তাহলে প্রকৃতির মধ্যে তোমাকে কখনো না কখনো এসে দাঁড়াতেই হবে।

অভিকে ধন্যবাদ দিচ্ছি মা। ও এরকম অত্যাচারী না হলে আজ আমি জীবনের প্রকৃত মানেই খুঁজে পেতাম না!

খুব বিশুদ্ধ ঠান্ডা হাওয়া আর পাখির গৃহস্থালি আমার ঘুম ভাঙাল। ভাতের ফ্যানের মতো রঙে তখন সকাল। উঠেই পায়ে স্নিকার গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সুখি আমার সঙ্গে ছিল। বলল, মেডাম তুমি নতুন তো, কয়েকটা দিন আমাদের কাওকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ো। ভালোলাগার কথা, এরা কেউ ইন্টারফেয়ার করে না। জঙ্গলে চুপ করে থাকতে হয় জানে। জঙ্গলের নিজস্ব ভাষা আছে। হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে যাওয়ার পর নদীর শব্দ পেলাম। এত বিশুদ্ধ প্রকৃতি, মা! জংলি ফল খেলাম। ডুমুরের মতো। দু-পাশে শাল, ইউকেলিপ্টাস আকাশ ছুঁয়ে! পাতা মাড়িয়ে হেঁটে আসার এই আনন্দ কোনো দামেই কেনা যায় না!

মুড়ি আর তরকারি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করেছি, জানো? এখানকার লোকজন এভাবেই খায়। মুড়ি চপ তরকারি দিয়ে মেখে..! শরীর খারাপ হয়নি কিন্তু। চিন্তা করো না। শহরের দূষণেই আমাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয় বুঝতে পারছি। এখানকার মানুষজন প্রকৃতি নির্ভর। এই বিষয়ে আরো জানতে পারব। ওদের সঙ্গে মেলামেশা শুরুই হয়নি। তবে আমি এসেছি শুনে আজ গ্রামের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ তাঁর

নাতিকে নিয়ে অফিসে এসে দেখা করে গেলেন। তাঁর বয়স হিসেব মতো একশো দুই। ওনার নাতিই তো তোমার বয়সি! ওনার নাম বটকেষ্ট মাহাতো। নাতির নাম রঘুনাথ মাহাতো। তাঁর নাকি ছেলে বউ নাতিনাতনি পুতি সব নিয়ে পঁয়তাল্লিশ জনের সংসার! এখানে ব্লক লেভেলে সবাই তাঁকে মানে। একটা ইয়া মস্ত কাঁঠাল, আম, সুপুরি, পানপাতা, মেটে আলু উপহার দিয়ে গেলেন বুড়ো। এখনো চশমা লাগে না ভাবতে পারো! একটাও দাঁত পড়েনি! শুধু কুঁজো হয়ে গেছেন। এত বছরের ভার আর মেরুদণ্ড নিতে পারেনি! মুখে একশো বছরের বলিরেখা! খুব খুশি বুড়ো। তাঁর ঘরে কালকে রাতে নিমন্ত্রণ! জীবনকে আরও কাছ থেকে দেখব ভাবতেই একসাইটেড!

যাইহোক দুপুরে লাল চালের ভাত, বিউলির ডাল, আলু বেগুন পোড়া মাখা, নদীর মাছের ঝোল দিয়ে খেলাম। সুখির রান্নার হাতকে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার দিতে হয় গো!

অফিসের পেপার ওয়ার্ক বুঝে নিয়ে ঘরে এসে দুপুরে একটু ঘুমিয়েও নিলাম! বিকেলে চা খেয়ে আবার গ্রামের ভেতরে গেলাম। কৃষিজীবন দেখছি। যদিও আজকের প্রজন্ম অনেকেই কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় চাকরি করে। তাদের চাষবাসে মন নেই নাকি! চাষ নাহলে যে শিল্প-নির্ভর জীবন টিকে থাকবে না আমি বোঝাব ঠিক করেছি যদিও এটা আমার কাছের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। এখানে এসে বুঝেছি বিস্তর কাজ আছে। এই কাজ আমাকে টানছে মা। আমি আরেকটু গুছিয়ে নিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব। তোমার ভালো লাগবে, দেখো।

আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে কী জানো? আমি এখানে নিজের মতো করে বাঁচতে পারব বুঝতে পারছি। আমাকে লিপস্টিক কাজল লাগাতে হচ্ছে না। যেমন সাধারণ থাকি ঘরে তেমনই আটপৌরে জীবন! মেকি কিচ্ছু নেই! এই দু-দিনেই বুঝতে পেরেছি নাগরিক সভ্যতা আর গ্রামীণ সভ্যতার ফারাক। হ্যাঁ গ্রামও বদলে গেছে অনেক। সেই ছোটোবেলায় বইতে ছবির গ্রাম আর নেই। তবে নেই বললেও ভুল। একদিকে ডেভেলপমেন্ট অন্যদিকে দারিদ্রের গ্রাম। আদিবাসীরা তেমনই আছে। কীভাবে মূল্যবান বাল্য-কৈশোর অপচয় হচ্ছে মা দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। সবে মাত্র দু-দিন। যতদিন যাবে আরো অনেক আবিষ্কার করব বুঝতে পারছি। শহরের হৃদয় হল গ্রাম। আর সেই হৃদয়ে এত অসুখ মা! অসুখ দিয়েছে শহরে লোভ নামে এক ভাইরাস!

কতদিন পরে কলম-কাগজে লিখছে আজ বসুমতী। ল্যাপটপ নামক যন্ত্র হাতে আসার পর থেকে কাগজ-কলমের ব্যবহার এখন সই করতেই বোধহয় শুধু! হাতের লেখা বেশ খারাপ হয়ে গেছে সে নিজেই বুঝতে পারল! তবে ছোটোবেলার চিঠি লেখার মজা আজ মনের ভেতরে চারিয়ে গেল!

কলম হাতে ধরেই জানলা দিয়ে দেখা যাওয়া জঙ্গলের পথের দিকে তাকিয়ে রইল সে আনমনে। মন ছুটে চলেছে নিজের মতো। আচ্ছা, এখনো আগের মতো ইংরেজি-বাংলাতে লেটার রাইটিং আছে? বন্ধুকে চিঠি লেখো তোমার গরমের ছুটি কেমন কাটছে বা দুর্গাপূজা নিয়ে...! কাঁধ ঝাঁকাল সে, গড নোজ!

দরজার বাইরে থেকে সুখি তখনই ডাকল, মেডাম!

—বলো।

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল সুখি, চাপা স্বরে বলল, দুজন এসেছে। ওরা বিশেষ ভালো নয়। আপনাকে কোথাও যেতে বললে যাবেন না মেডাম। ব্যস। আমি আর দরোয়ানজি আছি, আর ভয় নেই। বাকি পরে বলছি।

সবুজ সবুজ সুখে ভেসে থাকা মনটা নিমেষে সতর্ক, সে বলল, ঠিক আছে। বাইরের রুমে বসতে বলো।

পাতলা সুতির হাঁটু ঝুলের জামার ওপরে হাউজকোট চাপিয়ে বাইরের ঘরে এসে সে দেখল বেঁটে গাঁট্টাগোঁট্টা ধরনের দুজন বেতের সোফায় বসে আছে। বিড়ি খাচ্ছে। বিড়ির কটু গন্ধ বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে। এক নজরে মেপে নিল সে লোক দুটোকে। এই অঞ্চলের সবাই প্রায় কালো, এরাও ব্যতিক্রম নয়। মুখে দু-জনেরই চাপ দাড়ি। সুখ দর্শন নয় এদের উপস্থিতি। এইসব অঞ্চলে সন্ধে সাতটা মানে মধ্যরাত। এখন ঘড়িতে সাড়ে আটটা!

তাকে দেখেই লোক দুটো উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানাল। প্রতি-নমস্কার জানিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, বলুন! আপনাদের পরিচয়?

মোটা থ্যাবড়ানো নাক কুতকুতে ছোটো চোখ ভ্রুর জঙ্গলের ভেতরে থাকা হিংস্র শ্বাপদের কথা মনে করাল।

লোক দুটো একসঙ্গে হেসে বলল, আলাপ করতে এলাম। এই জায়গাটা আমরা শাসন করি কি না! মেডাম হয়তো নাও জানতে পারেন, যারা নতুন আসে তাদের জানিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে!

দাঁড়িয়েই কথা বলবে বলে ঠিক করে নিয়েছে বসুমতী। বসা মানেই গল্প করার সুয়োগ দেওয়া।

সে গম্ভীর মুখে বলল, আচ্ছা। কিন্তু সে জেনে আমি কী করব? আমার সম্পর্কে নিশ্চয় খোঁজখবর নিয়ে এসেছেন।

একজন হেসে বলল, আমার নাম অর্জুন মাহাতো আর ও পলাশ টুডু। সম্পক্কে আমরা মাসতুতো ভাই। বুঝলেন? হে হে।

তার মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, চোরে চোরে নয় তো?

হে হে করে হাসছে লোক দুটো। হাসছে তো হাসছেই। এত কুৎসিত হাসি বসুমতী জীবনে দেখেনি।

সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে বলল, হাসছেন কেন এত? কী কাজে এসেছেন সেটা আগে বলুন।

একটু ঘাবড়ে গেল দুজনেই। পলাশ বলল, চোরে চোরে বললেন...! হা হা হা হা..

চশমাটা নাগের ডগায় ঠেলে দিয়ে অসহিষ্ণু হয়ে সে বলল, আমি তাহলে বলে দিই? আপনারা এই অঞ্চল শাসন করেন আর আপনাদের হাতে অনেক ক্ষমতা এটাই বলতে এসেছেন।

অর্জুন কুতকুতে চোখ দুটোকে যথাসম্ভব বড়ো করে বলল, মেডামের অনেক বুদ্ধি বল, ভাই? মেয়েলোকের বুদ্ধি থাকলে আমরা একটু ভয় খাই কী না! আপনি কি পার্মেন্টি চাকরি লিয়ে এসেছেন?

—হ্যাঁ। এই এনজিও তো পুরোনো অনেক, জানেন তো?

পলাশ ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, হ্যাঁ। আসলে এই পথম কোনো মেয়েলোক থাকতে এল, তাই! আগে সব মরদ মদ্দা ছিল। বুঝেশুনে চলত এই আর কী!

অর্জুন বলল, বললাম না মেয়েছেলের বুদ্ধি থাকলে উরি সব্বনাশ! টেটিয়ে জিদ্দি হয়।

—আমিও তেমন।

আচমকাই অর্জুন চোখ ছোটো করে বলল, আপনার হাতে কীসের দাগ মেডাম? অ্যাসিডে পোড়া? দ্যাখ ভাই দ্যাখ, অ্যাসিডে না?

দু-চোখে এমন একটা অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলে তাকাল বসুমতী, সে ভাষা পড়ার সক্ষমতা খুব কম মানুষের আছে!

পলাশ আর অর্জুন দুজনেই একটু ঘাবড়ে গেছে বুঝতে পারছে সে। আরো একটু গম্ভীর হয়ে বলল, আপনাদের সব বলা হয়ে গেছে! আমিও সব বুঝে নিয়েছি। এবার আসুন।

পলাশ সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করল, বলল, আপনি আমাদের অতিথি। তাই কাল দুপুরে একটু খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। নেমন্তন্ন গ্রহণ করলে এই অধমরা খুশি হবে মেডাম।

খুব দ্রুততার সঙ্গেই ভেবে নিল সে, বলল, আচ্ছা আসব। ধন্যবাদ। আমি মাংস খাই না, বলে দিলাম। আয়োজন করবেন না। আপনারা যেমন খান তাই খাব। এবার আসুন। নমস্কার।

পলাশ আর অর্জুন দুজনে অতিরিক্ত বিগলিত যেন। বলল, তাহলে আসি মেডাম। গাড়ি পাঠিয়ে দিবো?.

—না। আমি সুখিকে নিয়ে চলে যাব অফিসের গাড়িতে।

লোক দুজন চলে যাওয়ার পর বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে। যতদূর যায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে আছে বনভূমি। বিভিন্ন ধরনের বন্য পোকার একটানা ডাক চলছেই! শুধু ঝিঁঝির ডাকই সে চিনতে পারে। লোক দুজন জিপ নিয়ে এসেছিল সে দেখল।

সুখি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, বলল, নেমন্তন্ন নিলে মেডাম?

—হ্যাঁ রে। বুঝেই নিয়েছি। মানুষ দুজন যে ভালো নয় সে যে কেউ বুঝতে পারবে কিন্তু কতটা খারাপ জানার জন্য যেতে হবে। খুব দরকার। তুই আর পিঙ্গল দুজনেই তো যাচ্ছিস।

—ওদের নামে অনেক কেস ঝুলছে! কেউ কিছুই কত্তে পারে না। তরাস এইখানকার।

—কী করে? স্মাগলিং? মানে চোরাচালান?

সুখি চাপা স্বরে বলল, সেসব তো আছেই। নদীর পাড়ের বালু নিয়ে কী গুন্ডামি, জানেন? লাশ পড়ে যায়! মেয়েরাও ভয় পায়।

—রেপ?

—হ্যাঁ। কিন্তু কেউ পতিবাদ করে না মেডাম! ওরা তুলে ভোগ করে ছেড়ে দেয়। জোর করতে হয় না। খপর পাঠায়, মেয়েকে পাঠিয়ে দেয় বাপ-মা। পেট খসানোর কাজ করে মুংলি বুড়ি। তার এইসব অবৈধ পেট খসানোর কাজ। গণ্ডগ্রাম...! কে খোঁজ রাখে মেডাম!

সমস্ত ইন্দ্রিয় অধিক সতর্ক হয়ে গেছে তার। সভ্যতার চাকচিক্যের তলায় কতটা অন্ধকার বাসা বেঁধে আছে অধিকাংশ মানুষই জানে না!

মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে তাকে। এই কাজ তার চ্যালেঞ্জ। একসময় পুলিশ হতে চেয়েছিল সে মনে পড়ে মাঝেমধ্যে। আজ মনে পড়ল।

খুব স্বাভাবিকভাবে সে বলল, খেতে দিয়ে দে সুখি। তুই খেয়ে নে।

কাঁকরোল ভাজা, খারকোল পাতা বাটা, মুসুরির ডাল আর চুনো মাছ ভাজা দিয়ে লাল চালের গরম ভাত খেতে খেতে মুহূর্তের জন্য মায়ের কথা মনে পড়ল। মা একলা খেতে ভালোবাসত না! সেও না। তবু জীবন তার নিয়মে যেতে বাধ্য করে। মনে হল জীবন তাকে কোথায় নিয়ে এল! অন্যমনস্ক হতেই সুখি বলল, রান্না খারাপ হয়েছে মেডাম?

সচকিত হয়েছে সে, বলল, না না, অপূর্ব সবকটা পদ। তুই জানিস এই খারকোল পাতাবাটা কোনোদিন খাইনি, নামই শুনিনি এমন দুর্দান্ত জিনিসটার! আর তোর হাত! সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতে হয় বাবু! মা-র কথা ভাবছিলাম রে।

খাওয়া শেষ করে চিঠিটা নিয়ে বসল সে। আজ গরম একটু গুমোটে ধরনের। জঙ্গলে এত গাছ থাকলেও আর্দ্রতা বেশি। ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে টেবিলল্যাম্প জ্বালিয়ে কলম তুলে নিল।

মাকে এইসব লেখা যাবে না। লিখতে গিয়েও থেমে গেল সে। তারপর লিখল, গ্রামের ভেতরের জীবনই আসল ভারতবর্ষ মা। সে অনেক দুখি আবার সব দুঃখ জয় করে সুখি হতেও শিখে নিয়েছে সে। আজ এইটুকুই। প্রতি সপ্তাহে তোমাকে চিঠি লিখব মা যতই হোয়াটস্যাপ্ করি। এই যে এত কথা কি হোয়াটস্যাপে লেখা যেত, বলো?

তুমি সাবধানে থাকবে। চিঠি খামে ভরেই ফোন করছি তোমায়।

তোমার তুতুন।

প্রমিতার সঙ্গে ফোনে কথা বলা শেষ হতে হতেই দশটা বেজে গেল। ফেসবুকে একটু উঁকিঝুঁকি দিয়ে শুয়ে পড়ল সে। কিন্তু ঘুম আসার মতো স্থির অচঞ্চল নয় আজ মন। তাদের প্রতিষ্ঠানের যে কাজ তা নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা। মাথার মধ্যে নানাবিধ পরিকল্পনা আসছে। গ্রামটাকে ভালো করে চিনতে হবে। মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে হবে। অনেক সমস্যা বেরিয়ে আসবে। একমাসের ভেতরে রিপোর্ট দেবে সে। পলাশ আর অর্জুনের মুখ দুটো বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। পোড়া দাগ তো নানান কারণে হতে পারে কিন্তু অ্যাসিডে পোড়া দাগ অন্যরকম, সেটাও এদের নজরে পড়েছে! অর্থাৎ এই বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ এরা। ক্রিমিনাল!

রাতের নিজস্ব কিছু শব্দ আছে। ভাষা আছে। আজ ঘুম আসছে না। তাই খসখস শব্দেও চমকে উঠে টর্চের আলো ফেলে দেখল বারেবারে।

সকাল আজ একটু অন্যরকম। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে। আটটা নাগাদ সুখি চা নিয়ে ডাকতেই হকচকিয়ে উঠে বসেছে সে। ঘর জুড়ে যেন অন্ধকার! জানলার দিকে তাকাতেই মেঘলা আকাশ ঘরে ঢুকে পড়ল! সঙ্গে শরীর জুড়নো বাতাস! অপার্থিব আনন্দে অন্তরীণ সে!

—ডাকিসনি কেন?

সুখি বলল, এমন ঘুমোচ্ছিলে... মা বলত ঘুমন্ত মানুষকে কখনো বিরক্ত করতে নেই।

আচ্ছা, আজ কী রান্না করব? দুপুরে তো নেমন্তন্ন?

ঘুমের মধ্যে পলাশ আর অর্জুনের কথা ভুলেই গিয়েছিল সে কিছুক্ষণের জন্য হলেও। মস্তিষ্ক সজাগ হয়ে গেল, এক লহমা; চিন্তা করেই বলল, না দরকার নেই। আমি চা খেয়ে চানে যাচ্ছি, তুই জলখাবারটা দে। আজ একটু স্যুপ আর পাউরুটি খাব। যদি বৃষ্টি হয় রাতে খিচুড়ি করিস।

সুখি রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে শুকনো মুখ করে বলল, লোকগুলো ভালো না মেডাম। খতরনাক!

খতরনাক লোকেদের ডেরায় কাজ করতে গেলে তাদের সবকিছু জানা দরকার সুখি। নাহলে বিপদ ঠেকানো যাবে না। ওরা যেমন আমাকে মাপবে, আমাকেও ওদের মাপ জেনে নিতে হবে। তুই খাবার বানা, বাবা।

চা খেতে খেতেই মেল চেক করে নিল সে। মিসেস নায়ারের মেল এসেছে। বম্বের অফিস থেকে একটা আর অস্ট্রেলিয়ার হেড অফিস থেকে একটা মেল!

স্নান করে বেরিয়েই দুটো মিসড কল দেখল বসুমতী। অচেনা নম্বর। কল ব্যাক করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতেই ফোন ঢুকল আবার। ট্রুকলারে নাম ভেসে উঠল গুড্ডু!

ফোন রিসিভ করতেই হ্যাল্লো! গুড মর্নিং মেডাম! আমি পলাশ বলছি। আজ আসছেন তো? আমরা কিন্তু অপেক্ষা করছি ধৈর্য ধরে। আপনার মতো মেয়েলোকের পায়ের ধুলো পড়বে আমাদের গরিবখানায়...!

প্রয়োজনের অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে সে বলল, হ্যাঁ। নমস্কার।

প্রমিতার ফোন ঢুকল সাথে সাথেই। পলাশের ফোন কেটে দিয়ে প্রমিতার ফোন নিয়েই বলল, সব ঠিক আছে মা। চিন্তা করবে না। রাতে কল করব।

প্রমিতা উত্তেজিত, বললেন, খবরটা এখনই পেলাম, শোন একমিনিট। অভিকে নাকি কাল অ্যাসাইলামে দেওয়া হয়েছে!

সমস্ত পৃথিবী যেন এক মুহূর্তে থমকে গেল। স্তব্ধ সে। একটা দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল, উলঙ্গ হয়ে হাতে কাচের ভাঙা বোতল নিয়ে তাড়া করছে তাকে অভি!

—তুতুন! শুনছিস!

অতীত থেকে ফিরে এল সে, হ্যাঁ হ্যাঁ শুনছি।

—তোকে যে ড্রাইভার ছেলেটা বাড়িতে দিয়ে গিয়েছিল, বাপি, হ্যাঁ বাপি, ও ফোন করেছিল। তোর নতুন নম্বর তো জানে না ও। আমি আর দিলাম না। তোর খোঁজ করছিল। বললাম, চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গেছে। ও বলল, বাড়িতে নাকি অসম্ভব পাগলামি করছিল। ওর মাকে কাল গলা টিপে মারতে গিয়েছিল...! অফিস কাজকর্ম সব বন্ধ করে বাড়িতেই থাকছিল লাস্ট একমাস। চান-খাওয়া করত না। ঘরে পেচ্ছাপ করত।...ঈশ্বর শাস্তি দিলেন, বুঝলি? কী অত্যাচারটাই না করেছিল তোর ওপর। যদি অ্যাসিডটা মুখে পড়ত...! কী হত ভাব!

আনন্দ দুঃখ স্বস্তি কোনো অনুভূতিই যেন তার মধ্যে নেই। মেঘলা সুন্দর সকালের সমস্ত সৌন্দর্য নিমেষে উবে গেছে!

প্রমিতা আবার বললেন, একদম উপযুক্ত শাস্তি।

—আমি চান করতে যাচ্ছি মা। রাতে কথা বলছি।

কীভাবে যে সে স্নান সারল! ছবির পর ছবি! ঘটনার পর ঘটনা! অভির সঙ্গে প্রথম দেখা ইস্কুলের গেটের বাইরে। মঞ্জুষার দাদা আর ওদের আত্মীয় অভি এসেছিল মঞ্জুষাকে নিতে। তখন বারো ক্লাস। সেই আলাপ। সেই দিনগুলো নির্ভার হাওয়ায় ভেসে যাওয়া দিন ছিল। খুব দ্রুততার সঙ্গে একেকটি দৃশ্য সরে সরে যাচ্ছে! প্রেম! প্রথম প্রেম! চার বছরের প্রেম! সে আইন পড়বে—অভি উচ্ছ্বসিত। কখনো নিজের পছন্দ-অপছন্দ চাপিয়ে দেয়নি তার ওপরে। ফাইনাল পরীক্ষার পরেই বিয়ে হয়ে গেল। শুধুমাত্র অভিরা অনেক ধনী এই কারণেই মা রাজি হচ্ছিল না।

আজ সব এলমেলো হয়ে যাচ্ছে! হানিমুনে গিয়েই প্রথম অভির মানসিক অসুস্থতার মুখোমুখি হল সে। মলদ্বীপের সেই অপার্থিব সৌন্দর্য দেখে যখন পাগল তখন অভির চোখ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। এত শান্ত তীব্র শাণিত দৃষ্টি! অভি তার গলায় দু-হাতের আঙুল চেপে ধরে ঠান্ডা গলায় বলেছিল, খুব সুন্দর কিছু আমি সহ্য করতে পারি না! ছিঁড়েখুঁড়ে ভেঙে তছনছ করে দিতে ইচ্ছে করে। এই যে মলদ্বীপের বিউটি, এই যে সেরেনিটি আমার ইচ্ছে করছে হয় আমি সুইসাইড করি নাহলে তোমাকে মেরে ওই জলে ভাসিয়ে দিই! হে হে...হেভেনলি ডেথ হবে! নীল জলে ভাসতে ভাসতে তুমি স্বর্গে চলে যাবে! ইজ নট ইজ দ্য হেভেনলি কনসেপ্ট?

চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল তার। গলার ভেতর মরুভূমি! ঠোঁট শুকিয়ে গেছে, কোনোমতে বলেছিল, ইয়ার্কি করা বন্ধ করো প্লিজ। আমার ভয় লাগছে। হানিমুনে এসে এরকম ইয়ার্কি করে কেউ!

—ইয়ার্কি!! ইয়ার্কি করছি মনে হচ্ছে হা হা হা হা...আমার সত্যিই সহ্য হয় না এত রূপ এতে সৌন্দর্য! হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল, এক গ্লাস জল দাও।

সব—সব মনে পড়ছে।

ভালো করে জলখাবার খেতে পারল না আজ বসুমতী। সুখি লক্ষ করে বলল, মেডাম! কী হয়েছে? মুখটা ওরকম লাগছে কেন?

—কিছু না। কিছু না।

অফিসের মেলগুলো আবার চেক করে উত্তর দিয়ে আজকের মতো কাজ শেষ করল। উষসী আর রীনা শহর থেকে যাতায়াত করে। প্রতিদিন ডিউটি থাকে না। অলটারনেট ডিউটি। আবার অফিসের প্রয়োজনে রোজও আসতে হয়। আজ দুজনেই এসেছে। লাঞ্চে ওদেরও নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা বসুমতীর।

গ্রামের মধ্যে ওইরকম প্রাসাদ যে কী বেমানান তা এক ঝলক দেখেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল বসুমতীর।

রুচির পরিচয়ও বর্তমান। চারতলা বিশাল বাড়িটাতে ম্যাজেন্টা নীল সাদা তুঁতে রঙের বর্ণময় কুৎসিত প্রদর্শন! তবে দেখার মতো বাগান! বড়ো বড়ো দুটো পুকুর। বাড়ির ভেতরে তিনটে গাড়ি। তারমধ্যে একটা সেই জিপ।

বসুমতীর অফিসের গাড়ি ঢুকতেই পলাশ আর অর্জুন একসঙ্গে

অভ্যর্থনা করল, আসুন আসুন মেডাম। খুব খুশি হয়েছি একেবারে সপারিষদ এসেছেন! আপনাদের দেখলে জানে খুশির হাওয়া বয়! মেয়েলোকেরা পাওয়ারফুল হলেই তো দেশের উন্নতি! আপনাদের অফিসে তো সক্কলে মেয়েছেলে!

—না পুরুষও আছে। আর মেয়েলোক, মেয়েছেলে বলতে নেই পলাশবাবু। আপনাদের হাতে এত টাকা-পয়সা, আর এগুলো শেখেননি! ভদ্রমহিলা বলতে হয় আর নাহলে মেয়ে, মহিলা।

অর্জুন খুব দ্রুত সামলে নিল, বলল, হে হে মেডাম, লেকাপড়াটা তো ঠিক হল না, বুঝলেন! মাথা—মাথা ভালো ছিল আমার মাস্টাররা বলত। কিন্তু পেটে খিদে নিয়ে কি আর বিদ্যে হয়? পলাশেরও তাই। আসেন আসেন...গল্প করব।

দুধসাদা পাথরের মেঝে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘর। যে ঘরটাতে তাদের জন্য আয়োজন করেছে সেই ঘরটাতে টেনিস কোর্ট হতে পারে। বিশাল লম্বা একটা টেবিলে খাবার সাজানো বুফে স্টাইলে।

একটু অস্বস্তি লাগছে তার। উষসী রীনা আর সুখি চুপচাপ। সে বলল, এত আয়োজন কেন? আর কেউ আসবে?

দুজনেই হাত কচলে বলল, না না আপনাদের জন্য। প্রসাদ করে দিলে আমরা খুউউউব খুশি।

—আপনাদের স্ত্রীরা? ছেলেমেয়ে? ওদের ডাকুন।

পলাশ বলল, ওরা এই বাড়িতে থাকে না। এটা গেস্টদিগের জন্য। নেতা-মনতিরিরা আসেন যখন এই বাড়িতে রাখি। তারা তো আর যেমন-তেমন থাকতে পারে না।

বসুমতী ডাবের জলে চুমুক দিয়ে হেসে বলল, কেন? গ্রামের যে অবস্থা, যেরকমভাবে গ্রামের মানুষ থাকে সেরকমভাবে থাকতে অসুবিধা কী এক-দু-দিন? একটু বুঝতে তো পারবেন।

অর্জুন আর পলাশ দৃষ্টিবিনিময় করল এক ঝলক। তারপর অর্জুন বলল, আপনার মধ্যে অনেক জিদ আছে দেখেই বুঝেছি। শক্ত পোড়া লোহা। বাঁকবে না সহজে।

—ঠিক বুঝেছেন। সহজে না, বাঁকবেই না এত শক্ত। তা এত বড়ো সম্পত্তি করলেন কী করে? দু-নম্বরি ধান্দা?

প্রচণ্ড বিষম খেলো অর্জুন। ডাবের জল মুখ-নাক দিয়ে বেরিয়ে এল। পলাশ হতবাক।

—ভুল বললাম? এই তো বললেন পড়াশোনা করতে পারেননি। তাহলে রোজগারের উপায়?

চোয়াল কঠিন হয়ে গেছে দুজনেরই। অর্জুন বলল, মেডাম! সব জানতে নেই। তাই না? আমরা ছোটো মানুষ!

—তা বটে। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল সে।

পনেরো পদের আয়োজন। মাংস মাছ সবজি ছানার তরকারি ভাজা হরেকরকম ডাল ভাত পোলাও মিষ্টি দই।

খেতে খেতে সে বলল, বাদবাকি খাবার কী করবেন? ফেলে দেবেন?

—না না। গরিবদেরকে বিলিয়ে দিই। খাক ছোটোলোকেরা।

বিস্মিত বসুমতী, ছোটোলোক!!!

বক্তব্যে সন্তুষ্ট নয় বুঝতে পেরেই পলাশ বলল, ওই...আমরা তো জানেনই কথাবাত্তা এইরকমই বলি, হে হে, কিছু মাইন করবেন না মেডাম।

—যাদের ছোটোলোক বলছেন...আপনারাও একদিন..

মাথা নীচু হয়ে গেছে দুজনেরই। পলাশ বলল, আজ্ঞে।

—তাহলে অমন বলেন কেন? বলবেন না।

দুজনেই চুপ। অর্জুন তার প্লেটে মিষ্টি তুলে দিতে দিতে বলল, ঘরে বানানো। আমাদের বউ-মেয়েরা বানিয়েছে। খান মেডাম। কী জানেন? একদিন বড়োলোকদের বাড়িতে অনুষ্ঠান হলে খবর পেয়ে আমরা বাচ্চারা পাতা কুড়িয়ে খেতাম! কত লষ্ট খাবার। কুকুরও খায় আমরাও খাই। একবার তো কুকুরের কামড় খেল ছোটো ভাই। হে হে..তো তখন থেকে জিদ আমিও বড়োলোক হব একদিন।

লোক দুটোকে গভীর নিরীক্ষণ করছে বসুমতী। সমাজের ক্ষতস্থানগুলো দেখা যাচ্ছে। মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিল, এখানে আসার সিদ্ধান্ত সঠিক।

কোনো কিছু না ভাবেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, সহজে বড়োলোক হওয়ার পথটা তো সুবিধার নয়, তাই না?

চমকে তাকাল দুজনেই। সপাটে এইভাবে থাপ্পড় পড়বে তা কল্পনার অতীত ছিল। থমথম করছে দুজনের মুখ।

সে লক্ষ করেছে অর্জুন পলাশের তুলনায় শান্ত স্থির স্বভাবের। নিমেষে সামলে নিয়েছে অর্জুন, পলাশ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে শান্তভাবে বলল, মেডাম, দই? দই খাবেন তো? মহিষের দুধের ঘন দই। এ দই আপনি কোথাও পাবেন না। দিই একটু? মনে থাকবে আমাদের এখান থেকে চলে গেলেও।

হেসে ফেলল বসুমতী, প্রসঙ্গ হালকা হোক সেও চাইছিল। বলল, চলে যাই তাই চাইছেন? অবশ্যই দেবেন।

রীনা, উষসী চুপচাপ খাচ্ছিল। সে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরাও নাও। কবে উনি আমাদের হাতে লেটার ধরিয়ে দিয়ে বলবেন, মেডাম চলে যান, হে হে...!

অর্জুন দই পরিবেশন করতে করতে বলল, তেমন ইচ্ছে নেই মেডাম। তবে এইখানে আমরাই হলাম সরকার! গরমেন্ট বুঝলেন কী না।

শীলাবতী নদী বয়ে চলেছে । ওপারেও গ্রাম, তার সীমারেখা দেখা যায়। অলস গতিতে একটা নৌকো ভেসে চলেছে তো চলেছে! অনন্ত যাত্রা! এখানে কোনো তাড়াহুড়ো নেই! কৃষিকাজ মূল জীবিকা সঙ্গে মাছের চাষ। তারপরও দারিদ্র চেপে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে। ফেরার পথে খানিকটা পথ পেরিয়ে এসেই নদীর অভিমুখে যেতে নির্দেশ দিল বসুমতী। সুখি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, সে বলল, ওদের জানতে দিতে চাও না বলেই ঘুরপথে এলে না?

রীনা আর উষসী খুব খুশি। রীনা বলল, এইসময় নদীর ধার অসাধারণ ম্যাডাম! আমি আগে এসেছি। একটু পরে সানসেট হবে, দেখবেন!

বড়ো বড়ো দুটো লরি ভর্তি হচ্ছে পাথর আর বালিতে। কীভাবে ক্রেন দিয়ে বালি তুলে নেওয়া হচ্ছে দেখে হতবাক বসুমতী।

পল্লবকে বলল, আপনি জানেন কারা এই বালি তোলার কাজ করছে?

পল্লব চাপা স্বরে বলল, সবাই সবকিছু জানে। ওপর মহল পর্যন্ত। ভাগ নীচুতলা থেকে উঁচুতলার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেলে কে বাধা দেবে ম্যাডাম?

—আশ্চর্য! এইভাবে নদীগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে! এই ভাবে নাব্যতা কমে যাচ্ছে অথচ শুধুমাত্র টাকার লোভে...! ভগবান!

পল্লব বলল, কত গাছ ছিল জানেন? এখন যা দেখছেন তা ওয়ান থার্ড। এই যে সামান্য বৃষ্টি হলেই ফ্লাডেড তার কারণ তো সেই...! গাছগুলো মাটি শক্ত করে ধরে রাখত। কাটার ফলে মাটি আলগা। ধস নামছে জলের ধাক্কায়। কীভাবে কত গ্রাম নদীগর্ভে চলে গেছে জানেন! চলুন ওইদিকটা, একটা জিনিস দেখাব।

মেঘ বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেটে গেছে। এখন সূর্য অস্ত যাওয়ার পথ ধরেছেন। নদীর জলে স্নান করে আসা বাতাস শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। পল্লবকে অনুসরণ করে দক্ষিণদিক ধরে হাঁটছে সবাই।

মিনিট দশ হাঁটার পরেই দেখা গেল আর এগোনোর পথ নেই। নদী এখানে চওড়া হয়ে বেঁকে গেছে! নদীর পাড়ে নদীর বুক থেকে উঠে আসা কিছু গাছ মাথা তুলে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে।

পল্লব বলল, আস্ত একটা গ্রাম নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে জানেন! আমার মামার বাড়ি ছিল এইখানে। ছোটোবেলা তো এখানেই কেটেছে! স্কুলের ছুটি মানেই মামার বাড়ি। নদী। ঠিক এই জায়গাতে ছিল...কত জমিজমা, মাছের ভেরি! একটু একটু করে তলিয়ে গেল ম্যাডাম। মানুষ কপর্দকশূন্য হয়ে আত্মহত্যা করল!

উদাস বিষণ্ণ হয়ে গেল বসুমতী। নদীর দিকে চেয়ে আছে। চোখের সামনেই একটা জনপদ গমগম করে উঠল। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে হারিয়ে গেল সেই জনপদের জনজীবনে!

—ম্যাডাম!!

—হ্যাঁ বলুন পল্লব।

—আপনি খুব সফট! মন খারাপ হচ্ছিল না?

—হ্যাঁ। প্রকৃতির তো দোষ নেই পল্লব। মানুষ যেভাবে অত্যাচার করবে সেইভাবেই ফিরিয়ে দেবে সে। তার একশোগুণ বেশি ফিরিয়ে দেবে। ভালো-মন্দ দুইই। এইভাবে বালি চুরি করতে করতে নদীর নাব্যতার যে অবস্থা...! গাছ কেটে কেটে...কেন প্রতি বছর সুন্দরবন পাথরপ্রতিমা ক্যানিং ভেসে যায় একটা সাইক্লোন এলেই? সুন্দরবনের জঙ্গল কমতে কমতে...শিট! ঘৃণায়, তীব্র বিদ্বেষে তার মুখের নরম রেখাগুলো প্রকট হয়ে উঠল।

পল্লব কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, সব জেনেও অসহায়ের মতো দেখে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কী করার আছে! যে লঙ্কায় আসে সেই রাবণ!

—এই পলাশ-অর্জুনের মতো দুর্বৃত্তগুলোর জন্য একটা জনপদ তলিয়ে যায়! বুক ফুলিয়ে বলে, আমরাই গভর্মেন্ট! এত সাহস তো সত্যিই হতে পারে না ওপর মহলের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদত না থাকলে! এরা কী?? মানুষ!

নদীতে সূর্য তাঁর শরীরের যাবতীয় রং দু-হাতে উপুড় করে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। সে এক মহাবিস্ময়কর দৃশ্য!

গাছেদের পাতা থেকে চুঁইয়ে নামছে রং! পাখির ডানায় রং! আর নদী সেই রং মেখে প্রগলভা বয়ে যাচ্ছে! আকাশের দিকে তাকানো যাচ্ছে না যেন! সকলেই সম্মোহিত।

রীনা বলল, বলেছিলাম না ম্যাডাম?

বিড়ির গন্ধ তখনই হাওয়ায় ঝাপটা মেরে গেল। বসুমতীর ঘ্রাণ-শক্তি কুকুরের মতো সে নিজেই রসিকতা করে বলে। গন্ধ অনুসরণ করতেই দেখল গামছা মাথায় বাঁধা লুঙ্গি পরা খালি গায়ে একটা লোক অদূরেই বিড়ি টানছে আর মোবাইলে কথা বলছে।

বসুমতী পল্লবকে বলল, এগোনো যাক। লোকটাকে লক্ষ রাখবেন।

আজ পল্লবই গাড়ি চালানোর দায়িত্ব নিয়েছিল। বসুমতীর কথায় সতর্ক হয়ে গেছে সে। বলল, স্পাইং করছে। চলুন ম্যাডাম।

জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে আলো-আঁধারির মায়া। পশ্চিমে চাঁদ উঠেছে। একটু ঘুরপথেই যখন তারা বাড়িতে ফিরল তখন জঙ্গলের পোকামাকড় জেগে উঠে কনসার্ট বাজানো শুরু করেছে!

রীনা আর উষসী আজ এইখানেই থেকে যাবে স্থির হল। পল্লব তার বাইক নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রীনা আর উষসী বুদ্ধিমতী হলেও সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ে

পায়ে শিকল বাঁধা এক গুহামানব!

তেমন ওয়াকিবহাল নয় বসুমতী বুঝে ফেলেছে। সামাজিক কাজে যুক্ত হয়েছে ভালোবাসার চেয়েও অর্থনৈতিক কারণে। তাই বালি চুরি ইত্যাদি নিয়ে তাদের সঙ্গে আর আলোচনায় গেল না সে। চা খেয়ে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতেই ঘুম জড়িয়ে নিল তাকে।

মধ্যরাতে যখন ঘুম ভাঙল বসুমতীর তখন অনুভব করল খিদে পেয়েছে। রাতের খাবার না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। অভির কথা মনে পড়ল আবার। জীবন যে কত জটিল হতে পারে! দীর্ঘশ্বাস পড়ল ভাবতে ভাবতে।

সুখিকে না জাগিয়েই কফি বানিয়ে ফেলল বসুমতী। খানকয়েক বিস্কুট নিয়ে অফিসের কাজ নিয়ে বসে পড়ল। সন্ধে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ঘুমিয়ে এখন আর ঘুম আসবে না। সময়কে সবসময় কাজে লাগানোর শিক্ষা দিয়েছেন প্রমিতা। শিকড়ে বসে গেছে সেই অভ্যাস।

এই এনজিও-টির পুরোনো কাজগুলোতে মনোনিবেশ করল সে। এই অঞ্চলে এদের কাজ খুব পুরোনো নয়। দু-বছর আগে শুরু করেছে। রাঁচি ঝাড়খণ্ড এলাকাতেও পাঁচ বছর ধরে কাজ করছে। বম্বের ধারাবি ও সংলগ্ন অঞ্চলে প্রায় দশ বছর ধরে কাজ এদের।

মূল প্রজেক্ট নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা।

—মেডাম! দরজার বাইরে থেকে সুখির ডাক শুনে অবাক সে, কে? সুখি?

—হ্যাঁ। আপনি জেগে আছেন?

দরজা খুলে ভেতরে ডেকে নিল সে সুখিকে, আয়। তুই ঘুমোচ্ছিলি তাই ডাকিনি। খিদে পাচ্ছিল। তাই কফি বানালাম। তুই ঘুমোসনি?

হাই তুলতে তুলতে সুখি বলল, হ্যাঁ ভেঙে গেল। মনে হল আপনি উঠেছেন। এত ঘুমোচ্ছিলেন তাই রাতে ডাকিনি মেডাম। কিছু মনে করলেন?

কফিতে চুমুক দিতেই এনার্জি। সময় দেখল সাড়ে তিনটে। সুখির কথায় হেসে ভরসা দিল সে, না রে।

—মেডাম কথা ছিল। আমার স্বামী খুন হয়েছিল ওদের হাতে! লাশ পাওয়া যায়নি!

আচমকা বজ্রপাত হল যেন! ধনুকের ছিলার মতো ছিটকে উঠেছে বসুমতী, ক্কী! কী বললি! চোখ বিস্ফারিত তার। সুখি! কী বললি?

চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে সুখির, হ্যাঁ। আমার বর ওদের সঙ্গে কাজ করা শুরু করেছিল। ও মারা যাওয়ার ক'দিন আগে থেকে ঘর ছেড়ে বেরোতে চাইত না মেডাম। ঘরে গুম হয়ে বসে থাকত। আমি বলতাম, কাজে যাবে না? কিছু বলত না। একদিন সন্ধেবেলা ...ওকে দেখলাম দাওয়ায় বসে আছে। আমি জাউ জ্বাল দিতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি নেই। ডাকাডাকি করলাম। আশপাশের সবাই খুঁজতে বেরোল। কিন্তু মানুষটা ব্যাবাক হাওয়া! গ্রামের একটা বাচ্চা পরে বলল মংলাই আর ভটকার সঙ্গে পবনকে সে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখেছে।

—মংলাইরা কারা?

—অর্জুনদের লোক। আমার স্বামীর বন্ধু ছিল।

—পুলিশে জানাসনি?

—হ্যাঁ। কেস নিচ্ছিল না। কেস নিলই না। অসহায়ের মতো মাথা নাড়ছে সুখি। এইখানে থানা-পুলিশ সব ওদের কেনা মেডাম। ওদের চাকর। পুলিশকে চাকরের মতো দেখে ওরা। আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না মেডাম পাগলের মতো বারবার থানায় গিয়েছি। একদিন গিয়ে দেখি পুলিশের চেয়ারে টেবিলে পা তুলে বসে আছে অর্জুন। আমি যেতেই একটা পুলিশ বলল, অর্জুনবাবু এই মেয়েটার মরদ হারিয়ে গিয়েছে। আপনি একটু ডায়েরি লিখে লেবেন? অর্জুন আমার বুকের দিকে তাকিয়ে জিভ চাটতে চাটতে বলল, আরে ধুর, এক মরদ গ্যাছে তো আমি আছি। আয় আয় বুকে করে রাখব। রানি করে রাখব। আমি একদলা থুতু ছুড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম ওকে ওরা সরিয়ে দিয়েছে। মেরে দিয়েছে! আমি আর ওকে পাব না। আমার মামা পঞ্চায়েতের নেতা। মামাকে সব বললাম। মামা বলল, চুপ করে যা। খবর লিয়েছি ওকে নদীর ওপারে লিয়ে গে মেরে...! গলা বুজে এল সুখির।

—তার মানে পঞ্চায়েতও ভয় পায়?

—পায়। ওরাই তো ভোটে পার্থি দাঁড় করায়। পয়সা খচ্চা করে মেডাম। ওদের গুন্ডামির জন্যই তো ভোটে জেতে এরা! ভোটে বাইক লিয়ে র‍্যালি করে! তাই সবাই ওদের কেনা কুকুর!...আমার ওপর ওদের লজর আছে কিন্তু কিছু করতে পারছে না মামার জন্য। এই কাজটা মামাই তো দিয়েছে। কোম্পানি চাইছিল অফিসে থাকার জন্য একটা মেয়ে, আমার মামা আমাকে সুপারিশ করে দিল।

পাথরের মতো হয়ে গেছে বসুমতী। পাখিদের ঘুম ভেঙেছে। আলো ফোটেনি তখনো। দুজনে নির্বাক। নিস্পন্দ!

আজ অফিসে গিয়েও মন ঠিক নেই বসুমতীর। একটা দেশ, তারমধ্যে একটা রাজ্য, তারমধ্যে গ্রাম ব্লক আর তারমধ্যে ভয়াবহ গল্পগুলো চলে আসছে বছরের পর বছর!

প্রয়োজনীয় চিঠিগুলো মেল করে মাকে লিখতে বসল সে। প্রমিতাকে শেয়ার করা প্রয়োজন। মেল নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিন্তু চিঠি প্রমিতার সিন্দুকে থাকবে।

মা,

ভারতবর্ষকে চিনতে গেলে তার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে আসতে হবে। ক্যানসার আক্রান্ত সেলগুলো ওইখানেই! আমার যে রান্না আর ঘরের কাজের সহায়িকা সুখি, তার স্বামী খুন ও লোপাট হয়ে গেছে এখানকার বালি স্মাগলারদের হাতে। সবাই সব জেনেও চুপ। কারণ এইখানে সরকার চালায় মাফিয়ারা। বালি তারপর পাহাড় থেকে নেমে আসা পাথর কীভাবে স্মাগলড হয়ে যাচ্ছে কল্পনা করতে পারবে না! এই গ্রামে পঞ্চায়েত চালায় মাফিয়ারা। নামকাওয়াস্তে পঞ্চায়েত! এই মাফিয়ারা পারে না হেন কাজ নেই। তুমি ভয় পেয়ো না, এরা আমার বাড়িতে এসেছিল। ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছিল। কাল দুপুরে লাঞ্চ করেছি ওদের বাড়িতে। শত্রুকে জানতে গেলে ভালো করে জানতে হয়। একটা বিষয় খারাপ লাগে মা, এই মাফিয়ারাও একদিন খেতে পেত না! কুকুরের সঙ্গে ডাস্টবিন থেকে বড়োলোকের বাড়ির ফেলে দেওয়া খাবার কুড়িয়ে খেতে গিয়ে কুকুরের কামড়ও খেয়েছে, মা! ভারতবর্ষের দারিদ্র বড়ো নির্লজ্জ

নগ্ন! তাকে ভদ্র পোশাক পরাবে কে জানি না! আদৌ কি সম্ভব তাও জানি না! সুখি জানে কারা ওর স্বামীকে চিরদিনের মতো লোপাট করে দিল তবুও চুপ করে থাকতে হয়। এই মেয়ে যদি আজ হত্যাকারী হয়ে ওঠে? তার দায় কে নেবে? রাষ্ট্র তাকে প্রাণদণ্ড দেবে বা যাবজ্জীবন! কিন্তু সিস্টেমকে শাস্তি কে দেবে মা? স্বাধীনতার এত বছর পরেও এই আমার ভারত! সমস্ত ভারতের শরীরে গ্যাংগরিন মা গো! দুর্গন্ধ! অভির সঙ্গে অসফল বিয়েটা না হলে আমি কি এই জীবন দেখতে পেতাম, মা? ঈশ্বরের কী ইচ্ছে আমি জানি না। আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে জীবন আমি জানি না! শুধু বুঝতে পারছি কিছু কাজ আমাকে করতে হবে। কাল গ্রাম ভিজিট করতে বেরিয়ে নদী সংলগ্ন একটা ছোট্ট কয়েক ঘরের বসতির দিকে চলে গিয়েছিলাম দুপুরে। দেখি প্রাচীন বুড়ো বটগাছের তলায় কয়েকজন ভাত খাচ্ছে। পিঁপড়ের ডিম দিয়ে ভাত! সবচেয়ে বয়স্ক লোকটির নাম মনোরঞ্জন হাঁসদা। বলল, আমাদের খাওয়া দেখতে এসেছ দিদিমণি? খুব লজ্জা পেলাম। এরকম খাবার লুকিয়ে খেতে হয় হয়তো! অথচ ওরা বুক ফুলিয়ে খায়। লজ্জা আমাদের। পিঁপড়ের ডিম কী করে খায় শুনলাম। আঠালো ডিমগুলো সংগ্রহ করে ভালো করে বেটে বা চটকে তারমধ্যে লঙ্কা পেঁয়াজ রসুন কুচি দিয়ে মেখে কলাপাতায় মুড়ে আগুনে পুড়িয়ে নেয় ঠিক আমাদের পাতুরি রান্নার মতো!

তুমি ভয় পেয়ো না। আমি আর আগের মতো নরম দুর্বল নই। আইন জানি, এইটা আমার জন্য অ্যাডভান্টেজ। সামনের মাসে আসছি দু-দিনের জন্য।

চিঠি লেখা শেষ হলে উষসী আর গোপাদিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। গোপাদি পুরোনো কর্মী। গ্রামের প্রতিটি রাস্তা, ঘর তার চেনা। বয়সে বড়ো বলে অভিজ্ঞতা ও পরিণত মন।

পল্লব আগে থেকেই মাইকিং করিয়ে এসেছে আজ স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলা হবে।

দু-পাশে জঙ্গল, মাঝখান থেকে সরু সিঁথির মতো মেঠো পথ। ওপর দিকে তাকালে নীল আকাশ! সবুজের সঙ্গে থেকে থেকে বাতাসের গন্ধও সবজেটে। এত সৌন্দর্যও আজ মনকে স্থির রাখতে পারছে না। অর্জুনরা কতটা ভয়ংকর অনুমান করে অস্থির মন বসুমতীর।

গোপার বয়স চল্লিশোর্ধ্ব। মোটের ওপর সুশ্রী সে। হাঁটতে হাঁটতে গোপা বলল, মেডামের কি বাড়ির জন্য মন খারাপ? রোজকার মতো হাসিখুশি দেখছি না!

স্মিত হাসি বসুমতীর মুখে, বলল, না গো গোপাদি। আচ্ছা গোপাদি, আপনি তো পুরোনো স্টাফ! এখানে কাজ করতে কোনো অসুবিধা হয়েছে? এই যে উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেনদের ওয়েলফেয়ার নিয়ে কাজ তাতে স্থানীয় কোনো বাধা...?

গোপার মুখ নিমেষে থমথমে, বলল, অফিসে ফিরে বলব। আপনার জায়গায় আগে যে ছিল সেই ম্যাডাম বাধ্য হয়েই ছেড়ে দিল তো...! এখানে অনেক সমস্যা!

গ্রামের প্রাইমারি ইস্কুলের মাঠে কিছু মহিলা জড়ো হয়েছে সেখানে পৌঁছে দেখতে পেল বসুমতীরা। গ্রামের সবাই এখনো তাকে চেনে না। আজই প্রথম আলাপ-পরিচয়ের পর্ব। বাঁধানো একটা ভাঙা মঞ্চের ওপর কয়েকটি চেয়ারের ব্যবস্থা করে রেখেছিল পল্লব আর ড্রাইভার বিশু।

মাইকিং করতেই মেয়ে-বউদের আসতে দেখে কিছুটা হলেও খুশি বসুমতী। মাঠ মোটামুটি ভরে গেছে। বসুমতী নিজের পরিচয় দিয়ে তার বক্তব্য শুরু করল, আমি আপনাদের কাছে সপ্তাহে একদিন করে আসব। মেয়েদের আর শিশুদের স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে পরিবার ভেঙে যায়। জানেন তো? একটি ছোটো বাচ্চার পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজন। পুষ্টিকর খাবার মানেই দামি মাছ-মাংস নয় আপনারা জানেন। আপনার পুকুরের মাছ, খেতের সবজিপাতির মধ্যেই সেই পুষ্টি আছে। মেয়েদের স্বাস্থ্য বিষয়ে বেশি সচেতন হতে হবে। আপনাদের মাসিক হয় তো?

মেয়েরা মুখ নীচু করে ফেলেছে।

—লজ্জা পাবেন না মা-দিদি-বোনেরা। মাসিক হওয়া লজ্জার নয়। আমরা যেমন বাথরুম করি, শরীরের বর্জ্য পদার্থ বের করে দিই, তেমনই মাসিক বা ঋতুস্রাব।

প্রাচীন কোনো মরচে পড়া স্তম্ভের গায়ে আঘাত পড়ল যেন। শব্দ হল। সেই শব্দ নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ল।

—তোমরা শরীর খারাপ হলে কী ব্যবহার করো? ছেঁড়া কাপড়, তাই তো? ওইগুলোই ধুয়ে আবার ব্যবহার করো, তাই তো?

একটি কিশোরী ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এসে বলল, মেডাম! আমরা স্যানিটারি ন্যাপকিন চাই। আগের মেডাম ব্যবস্থা করেছিল। ফিরিতে দিত। কিন্তু উনি চলে গেল। তাই আমরা আবার...!

—এই তো, এই তো চাই। তোমরা মুখ ফুটে বলবে তোমাদের সমস্যা। তোমরা সুস্থ থাকলে পরিবার সুস্থ থাকবে। মেয়েদের সবার আগে ভালো থাকতে হবে। তাই তো?

সম্মিলিত কণ্ঠস্বরেও যে আওয়াজ বেরোল তা অতি ক্ষীণ, হ্যাঁ।

আজ আমি তোমাদের আরও কিছু কথা বলব। কিছু প্রশ্ন থাকলে করবে। আমি যা বলব তাতে ভয় পাবে না।

সে লক্ষ করল উপস্থিত সকলে খানিকটা স্বাভাবিক এখন। নিজেদের মধ্যেও কিছু কথাবার্তা বলছে। হাসছে।

—শোনো নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে কেউ বিয়ে করবে না। বিয়ের পর সন্তানের জন্ম কখন দেবে সেটা তোমরা ঠিক করবে। এখানে যারা শাশুড়ি আছ তাদেরও বলি, বউমার সঙ্গে থাকবে। তুমিও মেয়ে বউও মেয়ে। মেয়েরা সকলে এককাট্টা হলে কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। পুরুষরা অত্যাচার করতে পারে কারণ মেয়েরা মেয়েদের পাশে থাকো না। কেন থাকো না? একটা মেয়ের কষ্ট আরেকজন মেয়েই তো বোঝে গো মায়েরা! তাই না?

গুনগুন করে কিছু গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল।

সে আবার বলল, কারুর কিছু বলার আছে?

কেউ কোনো উত্তর দিল না। সেই কিশোরী আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার এইসব কথা এই গেরামে চলবেনি মেডাম। এইখানকার লিয়ম-কানুন অন্যরকম। আমাদের কোনো মত লাই গো।

—কারণ তোমরা এককাট্টা নও, তাই। মেয়েদের শক্তি জানো?

শক্তির আরাধনা করা হয় দুর্গা মাকে পুজো করে, কালী মাকে পুজো করে। কোনো পুরুষ দেবতার কেউ পুজো করে শক্তি সাধনার জন্য? তোমাদের শক্তি তোমরাই জানো না।

মেয়েটি বলল, তুমি তো বলে চলে গেলে মেডাম। ঘরে আমাদের বাপ-ভাইরা এইসব মানে না। মানবেনি। নুটি ধরে মেরে ঘর থিকে বের করে দেবে।

মাথা নাড়ছে সে, বুঝতে অসুবিধা হয় না যুগ যুগ ধরে জমে থাকা আবর্জনা একদিনে সরানোর চেষ্টা করা বৃথা। পুরুষদেরও এই আন্দোলনে শামিল না করলে হবে না। আগে রোগের মুখে ওষুধ দিতে হবে।

—তোমার নাম কী? মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল সে।

—বন্দনা।

—বন্দনা তুমি ইস্কুলে পড়ো?

—না। পড়তাম। মাঝেমধ্যে ইস্কুলে যাই। নাম লিখা আছে ইস্কুলে। লোকের ঘরে ধান কুটি।

বন্দনার চোখে অস্বাভাবিক এক আগুন, মনে হল তার। কিছু বলতে চায়। কয়েকজন মেয়ে তার হাত টেনে ধরে বলল, অ্যাই চুপ কর না।

সে অভয় দিয়ে হেসে বলল, তোমরাও বলো। সবাই বলো।

একটি বউ মুখ গলা পর্যন্ত ঢেকে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, এই গেরামে আমাদের কথার কোনো দাম নেই মেডাম। মেয়েদের ইজ্জতের দাম নেই। তোমরা শহর থেকে এসে আমাদিগকে স্বপ্ন দেখাও...আমাদেরও ভালো লাগে। কিন্তু উপায় নাই। ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকা দায় মেডাম। তাই অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেই আমরা মেয়েদের।

অর্জুন আর পলাশের দল যে ত্রাস এখানে—মুখে নাম না নিয়েও বুঝিয়ে দিচ্ছে মেয়েরা। অসহায়!

গোপা, রীনারা ততক্ষণে ন্যাপকিন বিলিয়ে দিতে শুরু করেছে। দুপুরের রোদও পশ্চিম ঢালে! এইবার বিদায় নেওয়া উচিত। লড়াইটা বুদ্ধি করে অন্যভাবে শুরু করতে হবে বুঝতে পারছে সে।

নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছে বসুমতী। শীলাবতী নদী। শান্ত! এই গ্রীষ্মে তার জল তলানিতে এসে ঠেকেছে! শীর্ণস্রোতা! বালুময় চারদিক। সেই বালু আজও লরিতে তোলার কাজ চলছে। নদীর জলের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেছিল সে। মনে হচ্ছিল, কোথায়? কোথায় চলেছে, কোনদিকে তার জীবন?

নদীতে গামছা দিয়ে মাছ ধরছিল কিছু ছোটো ছেলে। তাদের দিকে চোখ পড়তেই সে এগিয়ে গেল, হাত নেড়ে হাসল। তখনই কানের কাছে, মেডামজি! গুড মর্নিং!

এতটাই চমকে গেছে সে কেঁপে উঠেছে।

—ভয় পেলেন? পলাশ হাসছে। সঙ্গে দুটো লোক।

—ভয় না। অন্যমনস্ক ছিলাম। চমকে গেছি।

—তাই তো ভাবি মেডামজি তো খুব সাহসী! আজ খুব ভালো কথা বলেছেন গেরামের মেয়েদের।

—আপনি শুনেছেন?

প্রশ্নের উত্তর সরাসরি না দিয়ে পলাশ হেসে বলল, একটা কথা বলি? দ্যাখেন গেরামের মেয়েছেলেদের তাদের মতোই থাকতে দিন। এই শহরের মেয়েছেলেদের মতো হয়ে গেলে সংসারধম্ম সব ভেঙে যাবে। কেউ স্বামী-শ্বশুরের কথা মান্য করবে না। ওসব আপনাদের মধ্যে হয়।

—নিজেদের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা অন্যায় বুঝি? লেখাপড়া শেখা অন্যায়? নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বিয়ে করা অন্যায় বলতে চান?

আলগোছে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বিড়ি ধারাল পলাশ, বলল, কী এ হবে অত পড়ালেখা করে? জজ-ব্যারিস্টার তো আর হবে না! রান্নাবান্না করবে, বাচ্চাকাচ্চা হবে এছাড়া আর কী আছে? মেয়েলোকের জন্মই তো ওই জন্য। নাহলে মদ্দা ব্যাটাদের পেটেই তো বাচ্চা আসত, কী বলেন? মেয়েছেলের কাজ কি মরদরা করবে না মরদের কাজ মেয়েরা? খ্যাকখ্যাক করে হাসছে সে।

—আপনারা চান না তাহলে মেয়েরা লেখাপড়া করুক?

—ছেলে-ছাওয়ালরাই করে না তো মেয়ে! হাসালেন গো মেডাম হাহাহাহা..খাবার নাই পেটে..গেঁড়ি-গুগলি খেয়ে বেঁচে ছিল। আমরা তো তবু ছেলেদের কাজ দিছি। হাতে পয়সা আসছে দুটো।

—কী কাজ?

চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে পলাশের। তার যে ধৈর্য কম বসুমতী আগেও লক্ষ করেছে। নদীর বুকে আলোছায়ার খেলা এক। সে এখন অজাগতিক দৃশ্য। শীর্ণ নদী বুকে পাখি জল ছুঁয়ে নিচ্ছে! কয়েকটি গরু-মোষ গলা পর্যন্ত কাদা গোলা জলে শরীর ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে অলস সময় যাপন করছে । নদীর পাড় ধরে চরতে দেওয়া ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রামের বউ-মেয়ে। সারি বেঁধে পাখির দল আকাশ পথ অতিক্রম করছে। তাদের কলকাকলিতে ভরে উঠেছে নদীপাড়। অন্যদিকে ধু ধু এক শূন্যতা! ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এলেই ডুবে যাবে অন্য এক রহস্যের জগতে।

গোপা হাতে চিমটি কাটল বসুমতীর। এর অর্থ বুঝে নিয়েছে সে। বলল, চলো ফেরা যাক পল্লব।

পলাশ যে একদমই খুশি নয় তার চোখের ভাষা বলে দিচ্ছে।

—আমরা আসি পলাশবাবু। ভালো থাকবেন।

গম্ভীর মুখে সেও বলল, হ্যাঁ রাতবিরেতে সাহস করবেন না। জায়গাটা ভালো নয়। মেয়েছেলে মানুষ, অত সাহস দেখিয়ে লাভ কী বলেন? ভালো-মন্দ কিছু হয়ে গেলে আমাদের ঘাড়ে দোষ পড়বে! এমনিই আমাদের বদনাম! পুলিশের খাতায় নাম আছে। মন্ত্রীমশাই আদর করেন তাই আর কী...!

এখনো সন্ধের শেষ আলো জঙ্গলের রাস্তায়। ঘরে ফেরার পথটি খুব সুন্দর হলেও মন অশান্ত বসুমতীর।

দেবার্চনের মেসেজ ঢুকল পরপর দুটো। কখন যেন সন্ধেরাতের অন্ধকার ঘরকে দখল করে নিয়েছে খেয়াল নেই বসুমতীর! রাস্তার হ্যালোজেন লাইটের কিছুটা ঘরে ঢুকে পড়েছে শুধু।

হোয়াটস্যাপে মেসেজ দেখল সে। দেবার্চন লিখেছে, খুব বোকা বোকা শোনাবে কথাগুলো। তবু রিকোয়েস্ট, হেসো না। কাল তোমাকে দেখার পর থেকে কোনো কাজে মন বসাতে পারছি না। তোমার ধারণাকে মনে রেখে এই হোটেলের নামকরণ বা অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। কাওকে ভালোবাসতে গেলেই তোমার ভীষণ রাগি

অহঙ্কারি মুখটা মনে পড়ত। তাই আর ভালোবাসা বা বিয়ে কোনোটাই হল না। তুমি যে জীবন বেছে নিয়েছ তা তো মহান! কিন্তু ফিরে আসতে পারো না কি ইচ্ছে করলে? আমিও তো অনাথ। আমি আর খারাপ ছেলে নই। একদম পালটে গেছি বসুমতী।

দ্বিতীয় মেসেজে লিখেছে, ব্লক করে দিয়ো না প্লিজ। অন্তত তুমি আছ এইটুকু জানি।

ফোন হাতেই ধরা রইল, বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল সে। এত আর সে সহ্য করতে পারে না যে! ভালোবাসা, ছোট্ট ঘর, বর, অনেক আনন্দ এই তো চাওয়া ছিল একদিন। পুরো কৈশোর-তারুণ্যে এই স্বপ্নেই তো বিভোর ছিল সে।

অভির শেষদিনগুলো খুব কষ্টের ছিল। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল সে। অভির মা খবর দিয়েছিল, অনুরোধ করেছিল, একবারটি দেখে এসো মা অভিকে। কাগজে তোমার নাম লেখে আর ডেলা পাকিয়ে পাকিয়ে ঘর নোংরা করছে রাতদিন। পাগলের আর রাতদিন!

প্রমিতা বলেছিলেন, সব জেনে বিয়ে দিয়ে আমার মেয়ের লাইফটা তো শেষ করে দিলেন! সে তো বেঁচে মরে আছে। আর কোনোদিন কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে না! অবিশ্বাস নিয়ে একটা গোটা জীবন কাটানো...!

—ভেবেছিলাম নিজে পছন্দ করেছে, তাহলে বোধহয় সুস্থ হয়ে গেল ছেলে! কপাল! তাহলে কি ও যাবে না একবার?

প্রমিতাকে অবাক করে দিয়ে বলেছিল সে, যাব।

ছোটো একটা ঘর। জেলখানা বললে ভুল হবে না। লোহার গরাদ। ভায়োলেন্ট হয়ে যায় যেসব পেশেন্ট তাদের এইভাবে রাখা হয়।

সেই ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। পায়ে শিকল বাঁধা এক গুহামানব! লম্বা লম্বা চুল-দাড়িতে অপূর্ব সুন্দর মুখটা প্রাগৈতিহাসিক হয়ে গেছে! ঢিলে একটা হাফ প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা এক মানুষ কাগজে খসখস করে কিছু লিখছে আর দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলছে! ডক্টর বললেন, বসুমতী লেখে দেখেছি। আপনার নাম জানলাম!

—কিওর হবে? এনি চান্স?

—মিথ্যে ভরসা দেব না। জেনেটিক হলে কিওর করা নেক্সট টু ইমপসিবল। পারিবারিক ইতিহাস আছে।

—তাহলে?

—ওনলি ডেথ ক্যান সেভ হিম, ম্যাম।

—ওহ!

উদ্দাম গতিতে বাইক চালানো অসম্ভব সুদর্শন সেই ছেলেটা এই গুহামানব জীবন রক্তে বহন করে চলেছিল নিঃশব্দে যে সে নিজেও ততটা ওয়াকিবহাল ছিল না!

—ম্যাম ! মন খারাপ করবেন না।

ডক্টরের কথাতে দীর্ঘশ্বাস পড়ল শুধু, একটা ঘন গভীর মেঘলা দিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে তখন। চার চারটে বছর প্রেম! একটুও আভাস ছিল না তো! ভয়ংকর আক্রমণ একের পর এক বিয়ের পরের সেইসব দিন...অ্যাসিড ছুড়ে মারা...!

তার শুধু মনে হচ্ছিল, এত শাস্তি দিলেন ঈশ্বর অভিকে!

ডক্টর বললেন, উনি সবকিছু ভুলে গেছেন শুধু বসুমতী নামটা স্মৃতিতে রয়ে গেছে! উনি কে, কী কিচ্ছু জানেন না!

কেমন আচ্ছন্ন হয়ে বাড়ি ফিরে এসে টানা দু-দিন ঘরবন্দি করে রেখেছিল নিজেকে সে। অভিরা বিবাহবিচ্ছেদের মামলা তুলে নিয়েছিল। যে বাড়িতে সে থাকত তার নামে লিখে দিতে চেয়েছিল।

ফেলে আসা জামাকাপড়, ব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলো শুধু নিয়ে চলে এল সে। ধপধপে সাদা প্রাসাদটার দিকে একবার মাত্র ফিরে চেয়েছিল সে অনেকক্ষণ ধরে! শেষ দেখা। হু হু শূন্য বাড়ি!

দেবার্চনের মেসেজ দুটো আবার পড়ল আলগোছে। চোখ ভিজে যাচ্ছে!

অভিশাপ! অভিশাপ! স্বগতোক্তি করল সে। ভালোবাসা অভিশাপ!

সে প্রেম থেকে অনেক দূরে এখন।

গেঁড়ি-গুগলি খাওয়া মানুষগুলোর সঙ্গে একমাসে তার অনেক সখ্য হয়ে গেছে।

গভীর ঘুমের মধ্যেই কিছু আওয়াজ মস্তিস্কে ধাক্কা দিয়ে গেল যেন! ঘরের দরজায় জোরে জোরে ধাক্কার শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে, কে? কে?

—মেডাম আমি সুখি। খোলেন দরজা!

সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে কোথায় দরজা কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না যেন! হোঁচট খেতে খেতে দরজা খুলতেই সুখির উত্তেজিত ভঙ্গি, আগুন! আগুন মেডাম!

—কোথায়? কোথায় আগুন সুখি?

—আমার মামা ফোন করেছিল, বন্দনাদের ঘর সাথে আরো কটা ঘরে আগুন ধরে দিয়েছে!

মাথা কাজ করছে না তখনো তার, বন্দনা!! কে সে? কে?

সুখি ঠকঠক করে কাঁপছে। বলল, বন্দনাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি আজ ঘুমিয়ে পড়লেন তাড়াতাড়ি। আমার কাছে ফোন এল মামার, সাবধানে থাকতে। বন্দনাকে নাকি তুলে নিয়ে গিয়েছিল... কান্নায় ভেঙে পড়েছে সুখি, বন্দনাকে ওরা... ওরা বন্দনাকে আগেও খবর দিয়েছিল ওদের ঘরে যেতে... ওর মা গিয়েছিল ভয় পেয়ে। ওর মাকেও ছাড়েনি ওরা। ওর মা সুসাইট করেছিল ফাঁসি লাগিয়ে! বন্দনা সেই থেকে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল মেডাম..কাউর কথা শুনত না। বলত, কী করবে আমার?

মেঝেতে বসে পড়ল সে সমস্ত শরীরের ভার সামলাতে না পেরে, এত অত্যাচার! জঙ্গলের রাজত্ব চলছে!

সামলে নিয়েছে সে কয়েক মুহূর্তে, বলল, আমি যাব।

তার হাত চেপে ধরেছে সুখি, ন্নাহ! না.....পাগল হলেন? ওরা যে হিংস্র! সকাল হোক। আলো আসুক। গেরামের সবাই ভয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে বলল মামা।

—তোর মামা তো মন্ত্রী না নেতা? সে মুখ বন্ধ করে থাকে! এইসব চলে দিনের পর দিন... উহহ মা গো! আর পুলিশ...! ওহ! সে তো বিক্রি হয়ে গেছে! ভগবান! সুখি তোর মামাকে একটা ফোন কর।

ফোন বেজে বেজে বন্ধ হয়ে গেল।

—মামা ধরছে না ফোন!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফোন এল।

—মামা! কথা বলো একটু মেডামের সাথে, বলেই তার হাতে ফোন ধরিয়ে দিল সুখি।

—শুনুন, কী অবস্থা?

—মেডাম আপনারা এইখানে এন জি ও-র কাজ করতে এসেছেন, আমার সুবুদ্ধি যদি শোনেন তাহলে চোখ কান মুখ বন্ধ রেখে কাজ করে যান। এইসব আপনাদের শহর নয় মেডাম। এইখানে অনেক কিছু হয় কিছু খবর হয় কিছু হয় না। আজকাল চ্যানেলের লোকেরা আসে বলে আপনারা জানতে পারেন।

স্তম্ভিত সে। তার মানে এইসব অন্যায় অনাচারগুলো হয়েই চলবে! মানুষ আর পশুর জীবনে কোনো পার্থক্য থাকবে না? লোভ আর অর্থ...বিড়বিড় করল সে। ফোনের সংযোগ ছিন্ন করল। সুখি ভয়ার্ত মুখে চেয়ে আছে। বলল, মামা কী বলল?

মাথা নাড়ছে বসুমতী, বলল, কিচ্ছু না। কিচ্ছু না।

সমস্ত সভ্যতা আসলে এখন একটা নড়বড়ে সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে মা। সভ্যতা বলতে আমরা যা বুঝি তা ভেতর ভেতরে শেষ হয়ে মরে হেজে গেছে মা। গতকাল রাত থেকে আজ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো প্রমাণ করল মানুষের জন্ম অভিশাপ। কৃমিকেন্নোর মতো জন্ম! পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলা যায় যখন-তখন। একদল মানুষ আরেকদল মানুষকে মারছে পোড়াচ্ছে ধর্ষণ করছে মুখের খাদ্য ছিনিয়ে নিচ্ছে। একদল ধনী থেকে উচ্চতর ধনী হচ্ছে, আরেকদল বসুধরার মাটি খুঁড়ে পোকামাকড় খাচ্ছে! অভিকে ধন্যবাদ দিই মা, আমার অসুস্থ বিয়েটা না হলে আমি তো বৃহত্তর এই গভীর জীবন দেখতে পেতাম না, মা! সারারাত ভয়ে উত্তেজনায় রাগে কাঁপতে কাঁপতে ভোর হতেই ছুটে গেছি গ্রামের ভেতরে। অঙ্গার হয়ে গেছে মা দেহগুলো! আগুন খেয়ে ফেলেছে ঘরবাড়ি! একদিন এইখানে সংসার ছিল বুঝতে দগ্ধ আসবাবগুলোই যথেষ্ট। আশেপাশের গাছপালাগুলো পর্যন্ত সেই আগুনের হাত থেকে বাঁচেনি এতটাই নিষ্ঠুর ছিল সেই অমানুষিক আক্রমণ! কেন আক্রমণ, কারা করল এইসবের উত্তর পেতে পেতে এক জীবন শেষ!

নির্মম এক ঘটনা আমার জীবনে অপেক্ষা করছিল।

বন্দনা গর্ভবতী ছিল। বন্দনা কে ভাবছ তো? সব বলব। শুধু জেনে রাখো এক দেবশিশু এখন আমার হাতে। বন্দনার মেয়ে। তার নির্মম জন্ম হল। তার জন্ম হল আর তার মার মৃত্যু হল। তার বাবা কে কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না!

সুখির ডাকে ধ্যান ভাঙল বসুমতীর। 'মেডাম দেবীকে কি দুধ দেব এখন?' ভেতরের ঘর থেকেই জোরে জিজ্ঞেস করল সুখি।

—কাঁদছে?

—হ্যাঁ। চমকে উঠছে বারবার।

কলম হাতেই ছুটে গেল সে, বাচ্চাকে কোলে তুলতেই সে চুপ। মোচড় দিয়ে উঠল বুকের ভেতরটা। এক দগ্ধ ঘা দগদগে পৃথিবীতে তুই এলি! মনে মনে বলল সে। কোলে তুলে উষ্ণতা দিতেই বাচ্চা শান্ত হয়ে তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে! খুঁজছে কিছু। ফিসফিস করে সে বলল, এই জগৎটা তুই চিনিস না তো! কী দেখছিস? মা? মাকে খুঁজছিস? এই যে মা! এই যে! দেবী!

'দেবী কী বুঝল, কে জানে? দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এত ছোটো শিশু দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা? দেখেছ? আমি প্রতিদিন শিখছি। অভিজ্ঞতা করছি। কী ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মা দেবী?

আমি ওর নাম দেবী দিয়েছি। ভালো নাম ঈশ্বরী। ও ঈশ্বরের সন্তান নাহলে নব্বই শতাংশ দগ্ধ দেহ থেকে সুস্থ শিশুর জন্ম হয় কেন মা? সম্ভব?

বন্দনা পোড়া শরীর নিয়ে ছুটছিল। পালাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে জানে না। জঙ্গল পেরিয়ে রাস্তায় উঠে দৌড়াচ্ছে। তার শরীর থেকে খসে খসে পড়ছে পোড়া পোশাক। তার পেছনে তাড়া করছে একদল হিংস্র মানুষ! হাতে জ্বলন্ত মশাল, লাঠি আর আগ্নেয়াস্ত্র। গুলি ছুটল। গাছ তাকে বাঁচিয়ে দিল। মেইন রোডে এসেও ছুটছে। সমস্ত শক্তি শেষ তখন।

জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে এইটুকু পর্যন্ত চেতনা ছিল তার।

খবর পেলাম বন্দনা হাসপাতালে। স্থানীয় চার্চের ফাদার তাকে রেসকিউ করেছিলেন। রেডক্রসের গাড়িতে করে তিনি ওই পথেই যাচ্ছিলেন। তিনি তুলে নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসেন, মা।

আমি যখন খবর পেয়ে ছুটে গেছি তখন বন্দনার জ্ঞান এল কয়েক মিনিটের জন্য। ডাক্তাররা অবাক। ডাক্তার বললেন, ওর জ্ঞান ফেরার অপেক্ষা করছিলাম। কী আশ্চর্য আপনি এলেন আর...! শুনলাম, অপারেশন করে ওর পেটের শিশুকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় পৃথিবীর আলো দেখাতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা। আমিও বুঝিনি সেইদিন ও অন্তঃসত্ত্বা! একটু ভারীর দিকে চেহারা ছিল তো! যদিও প্রিম্যাচিওর বেবি। আটমাসের...! ওইভাবে নাইন্টি পার্সেন্ট বার্ন নিয়ে...

বন্দনা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, কী করুণ সেই হাসি গো মা! এক মৃত্যুপথযাত্রী যে জেনেছে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, সেই মুখে যে হাসির জন্ম হল তা কোনোদিন ব্যাখ্যা করতে পারব না! ইনএক্সপ্লিসিবল! তিন-চারজনের নাম বলে গেছে মেয়েটা। ইশারা করে বলল ওর বাচ্চাকে যেন আমি নিই। তারপর সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে চলে গেল, মা! ঈশ্বরের সন্তান ছাড়া ও কে? আমার মনের অবস্থা বুঝিয়ে বলতে পারছি না। দেবী আমার কাছে আছে। এখনো বিস্তর আইনি পদ্ধতি চলবে। বন্দনার পরিবারে কেউ বেঁচে নেই। সেই রাতে সকলে ঘুমের মধ্যে মারা গেছে, পুড়ে! বন্দনা পালাতে গিয়েছিল...! জীবন থেকেই পালিয়ে গেল।

দেবার্চনের মেসেজ ঢুকল আবার, তুমি কি কিছুই বলবে না? বন্ধুত্বটা থাক।

উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। সে লিখল, বন্ধুত্ব হল শ্রেষ্ঠ শব্দ, শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক। বন্ধুহীন পৃথিবী খুব যন্ত্রণার। বন্ধুত্বে কিছু চাইতে নেই। আমি একজন বন্ধু পেয়েছি তোমার মধ্যে। আমি সব কাজ শেষ হলে ম্যাকলয়েডগঞ্জে চলে যাব বুদ্ধের কাছে। তোমাকে অনেক দায়িত্ব দিয়ে যাব হয়তো।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, থ্যাঙ্কিউ বসুমতী। এটাই আমার জন্য

যথেষ্ট। অনুরোধ করব, যেকোনো দরকারে আমাকে বলবে। যেকোনো বিপদে এই বন্ধু পাশে আছে।

ঘরের আলো জ্বালল সে। দেবীর হস্টেলে ফোন করল মেট্রনকে। এক সপ্তাহ হল খোঁজ নেওয়াই হয়নি কাজের ব্যস্ততায়।

—হ্যাল্লো! হ্যাললো!? মাই ডিয়ার, হাউ আর য়ু? ফাদারের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর।

—স্যরি ফাদার! রাত হয়ে গেল একটু বেশি।

—আরে না না, মাই চাইল্ড আর অলওয়েজ ওয়েলকাম। তুমি সমাজের জন্য যেভাবে কাজ করছ সেল্ফলেস...! সো নাইস অব য়ু!

—দেবী কেমন আছে? ইজ শি ডুইং ওয়েল?

—ইয়াহ! ও তো এক্সট্রাওর্ডিনারি চাইল্ড! কালকেই জিজ্ঞেস করছিল তোমার কথা। তুমি ফোন করেছিলে কি না! আমি না বলতে মনটা খারাপ হয়ে গেছিল। তোমার জন্য দুশ্চিন্তা করে বেবি। আমি বুঝিয়ে বলেছি, তোমার মা তো অনেক কাজ করে, তাই হয়তো খুব বিজি, ঠিক ফোন করবে। বেবি শান্ত হয়েছিল।

—হ্যাঁ লাস্ট ওয়ান উইক হেকটিক ট্রাভেল করতে হয়েছিল। প্রিজনারদের নিয়ে কাজ করছি তো। আমি খুব টায়ার্ড।

—গড ব্লেস মাই চাইল্ড। কতটুকু তোমার বয়স! এই বয়সে তুমি সোসাইটির ওয়েল বিইং-এর জন্য যা করছ! আমি বেবিকে ডেকে দিচ্ছি। কথা বলবে তো?

ইন্টারকমে একরাশ সংগীতের মূর্ছনা যেন!

—মা!!!!! মা তুমি কেমন আছ মা? উৎকণ্ঠা আর ভালোবাসা ঝাঁপিয়ে পড়ল।

চোখের জল বাধা মানছে না তার, সামলে নিতে গিয়েও পারছে না সে, বলল, ভালো আছি বেবি। তুমি কি রাগ করেছ সোনা? আমি খুব কাজের চাপে ছিলাম। তুমি তো জানো বেবি আমাকে হোল ইন্ডিয়া ঘুরতে হয়।

—আই নো মা। ফাদার বলেছেন। আমার খুব চিন্তা হয় মা।

—লক্ষ্মী সোনা মা আমার, তুমি অনেক বেশি বোঝো, ফাদার তোমার খুব প্রশংসা করলেন আজ।

—আমি কবে বাড়িতে আসব মা? তুমি কবে আসবে?

এক মুহূর্ত ভাবতে সময় নিল না সে, বলল, কালই আসছি বেবি। কাল মর্নিং-এর ট্রেনেই আসছি। তুমি কী খাবে বলো, নিয়ে আসব।

দেবী ছোট্ট থেকে কখনো বায়না করেনি লক্ষ করে এসেছে সে। যে সময়ে বাচ্চারা চঞ্চল হয় সেই সময়ে সে আশ্চর্যজনক শান্ত।

—আমার কিছু লাগবে না মা। তুমি এসো, প্রত্যাশিত উত্তর। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে তুমি আসবে। থাকবে মা একটা দিন?

স্নেহ—পৃথিবীর সুন্দরতম বিষয় হল স্নেহ। সে, বলল শিওর বেবি। এখন তুমি শুয়ে পড়ো। তোমাদের তো বেড টাইম এখন।

—আমি শুয়ে শুয়েই জেসাসের কাছে প্রে করছিলাম মা, যেন তুমি তাড়াতাড়ি আসো। আর অমনি তুমি ফোন করলে। কী মজা না?

—হ্যাঁ বেবি। গুড নাইট। সুইট ড্রিম।

ফোন সুইচ অফ করে নিজের জগতে ফিরে এল সে।

দুপুরের অতিরিক্ত খাবার গরম করে খেয়ে নিল সে। অনলাইনে ট্রেনের টিকিট বুকিং করে আবার শুয়ে পড়ল সে। ভোরে ট্রেন ধরতে হবে।

সেই সকাল এখনো এই আট বছর পরেও দুঃস্বপ্ন হয়ে আসে তার কাছে। বন্দনার বীভৎস দগ্ধ চেহারা, চোখের কোল বেয়ে জল বেরিয়ে আসা, অত যন্ত্রণার মধ্যেও পরিতৃপ্ত মুখ কারণ তার সন্তান সে মেডামের হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারছে। কতটা ভরসা! কম কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল বেবির কাস্টডি পেতে তাকে! পুলিশের কাছে কোর্টের কাছে বন্দনার ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন ফাদার ডাক্তার নার্সরা। ওদিকে এতগুলো ঘর কেন পুড়ে গেল, এত মানুষ কেন পুড়ে গেল সেই নিয়ে সরব জনসমাজ। পলাশ, অর্জুন পলাতক। উঠে আসছে একের পর এক তথ্য। পলাশ, অর্জুনরাও তো ভিক্টিম!

এ তার জীবনের এক অধ্যায়।

ডক্টর পরেশ কৃষ্ণমূর্তি বললেন, বেবি প্রিম্যাচিওর। হসপিটালে থাকতে হবে।

মনে মনে সে ভাবল সেটাই উভয়ের জন্য ভালো। এই অবস্থায় তার অনেক কাজ। কিছু কর্তব্য তো আছেই এই মানুষগুলোর প্রতি।

আজ অনেক কিছু মনে পড়ছে আবার। হয়তোলাগাতার কাজের পর এতদিন বাদে নিজের ঘর, শয্যা তাকে অবসরে সব ফিরিয়ে দিতে চাইছে। প্রতিটি ঘটনা তার জীবনকে আরেক গতিপথে নিয়ে গেছে!

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে দেখল সে অফিসের সবাই এসে তার ঘরেই অপেক্ষা করছে। প্রত্যেকের মুখে আতঙ্ক। গোপাদি তাকে দেখেই বলল, এখানে কী করে কাজ করব জানি না। আমাদের জীবনের তো দাম আছে! রীনা, উষসী ঘাড় নাড়ছে, বলল, রিজাইন করতে চাই।

—আমি ঘটনাস্থলে যাচ্ছি, কে কে সঙ্গে যাবে?

গোপা আতঙ্কিত, বলল, বসুমতী প্লিজ না যাওয়াই ভালো। টার্গেট হয়ে যাবে।

—টার্গেট হয়েই আছি। তাহলে আমি একাই যাচ্ছি।

পল্লব বলল, আমি যাব, চলুন।

সুখি বলল, আমিও যাব।

—সুখি তোর মামার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই।

—চলেন।

সাংবাদিক পুলিশে ছয়লাপ আজ গ্রাম। অসম্ভব থমথম করছে পরিবেশ। গ্রামের অর্ধেক পুরুষ পলাতক। মহিলারা যারা আছে তারা মুখে কুলুপ। পোড়া বাড়িগুলোর গৃহপালিত পশুরা অবাক ভয়ার্ত চোখে চুপ করে আছে। আজ তাদের জাবনা দেওয়ার কেউ নেই বুঝে গেছে! হাঁস-মুরগিগুলো শুধু এলোমেলো ঘুরছে।

আক্রান্ত জায়গাটি দেখে সুখিকে সে বলল, মামাকে ফোন কর। বল, আসছি।

ফোনে দু-চারটে কথাবার্তা বলে সুখি সাবধানে বলল, মামা একটু পর আমাদের বাড়িতে আসবে বলল।

কলকাতা থেকে পুলিশের বাঘা বাঘা অফিসাররা এসেছেন। ভিড়ের মধ্যে তাকে একটু অন্যরকম দেখে একজন এগিয়ে এসে তার পরিচয় জানতে চাইলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল সে।

অফিসারকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, কিছু বলতে চাই। থানায় গিয়ে বলব।

ঘামে বিজবিজ করছে বসুমতীর শরীর। পরিবেশ রক্ষার জন্য এয়ারকন্ডিশন মেশিন সে লাগায়নি। মাথার ওপর ফ্যান ফুল স্পিডে ঘুরলেও বাইরে গুমোট বলেই গরম আজ অসহনীয়। তার ওপর অতীতের এই অধ্যায় যখনই মনে পড়ে রক্তচাপ বেড়ে যায়।

অফিসারটি ধূর্ত সন্দেহ নেই। বয়স ও কাজের অভিজ্ঞতার স্ট্যাম্প তার চোখের কোণে!

মনেমনে প্রস্তুত বসুমতী।

—একটা গ্রামে আইনের শাসন নেই তা কি আপনারা জানেন না? নাকি জেনেও চুপ থাকাই নিয়ম? মাফ করবেন ভুল বললে।

পিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে এমনই নৈঃশব্দ্য!

—সেটা আমরা বুঝব ম্যাডাম। আপনি কী জানেন সেটাই বলবেন শুধু।

—বালির অবৈধ চুরি পাচার দিনের পর দিন চলে আসছে... একটা চক্র প্রকাশ্যে বলছে আমরাই এইখানে সরকার, আমাদের কথাতে গ্রাম চলে, তারাই আইন বানায় ভাঙে। এই যদি হয় তাহলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন কী বলে? দেখুন আমি কয়েকমাস এইখানে, জয়েন করেছি এই এনজিও-তে। ডে ওয়ান থেকে মিষ্টি হুমকির মধ্যে আছি। এসে থেকে শুনলাম এই চক্র পছন্দ হলেই ঘর থেকে মেয়েদের ডেকে পাঠায়। না গেলে তুলে নিয়ে যায়। কিশোরী মেয়েদের অ্যাবরশন করায় এক বুড়ি!...এগুলো কী? এসব কী অফিসার? এ আমরা কোথায় আছি?

—আপনি কি পলিটিক্স করেন? ধূর্ত চোখ এইবার স্পষ্ট তাকাল তার চোখের ওপর

অকম্পিত দৃষ্টি তার, বলল, বুঝলাম না।

—কোন পার্টি করেন?

—সেটা ব্যক্তিগত। প্রত্যেকের নিজস্ব আইডিওলজি থাকতে পারে কিন্তু রাজনীতি করার ইচ্ছে আমার নেই। সামান্য সমাজকর্মী। সোশ্যাল ওয়ার্ক করি। যে মেয়েটি পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল সে কতবার রেপড হয়েছে জানেন? তার যে বাচ্চাটি মৃত্যুর আগে জন্মাল সেও ধর্ষণের ফল! না, আমি কোনো রাজনীতি করি না। আমি একজন সিটিজেন হিসাবে, সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসাবে, মহিলা হিসাবে এর প্রতিবাদ বারবার করব। পাশে বসা সুখিকে দেখিয়ে বলল, আমার সহকর্মী। ওর নাম সুখি। ওর স্বামী নিখোঁজ আজ কত বছর, জানেন? লোপাট! জানেন কেন? থানায় ওর কথা কেউ শোনেনি। বিচার পায়নি।

থানার বড়োবাবু বললেন, কী হয়েছিল তোমার স্বামীর? আমি ছিলাম তখন?

—না। বিকাশ সরদার ছিল বড়োবাবু। আমার স্বামীকে একদিন অর্জুন-পলাশের লোকেরা ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, সেই থেকে নিখোঁজ! আমার মামা পঞ্চায়েতের নেতা মহাদেব বারিক। মামা বলল, খবর আছে মরে গেছে আমার স্বামী!

আজ আর সুখির চোখ দিয়ে জল পড়ল না লক্ষ করল সে। নিস্পৃহ উদাস সুখি।

—বালি চুরির এই অবৈধ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে একটা চক্র আজ এত পাওয়ারফুল যে পুরো আঞ্চলিক প্রশাসনকে ডিক্টেট করছে! কতদূর বখরার ভাগ যায় সে তো একটা বাচ্চাও বলে দেবে!

—আপনি ম্যারেড? অরিজিনাল ফ্রম?

—আমার স্বামী অ্যাসাইলামে মারা গেছেন অনেকদিন। কলকাতা।

অফিসার বয়ান রেকর্ড করে বললেন, ঠিক আছে। আসতে পারেন আপনি। একটু সাবধানেই থাকবেন। আমরা তো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সিকিয়োরিটি প্রোভাইড করতে পারব না। থ্যাংক য়ু।

পুরো গ্রামটা একদিনেই নিঝুম হয়ে গেল। গাছের পাতা খসার শব্দও পাওয়া যায়। পুরুষহীন একটা গ্রাম। কয়েকজন কিশোর আছে মাত্র।

সন্ধের দিকে সুখির মামা মহাদেব এল।

লোকটার চেহারায় একটা পরিচ্ছন্ন ভাব আছে। চোখের দৃষ্টি সরল। হাতজোড় করে নমস্কার করল মহাদেব।

সুখি চা বানিয়ে এনেছে। চায়ে চুমুক দিয়ে তারিফ করল মহাদেব, উত্তরবঙ্গের চা, না মেডাম? খাঁটি!

—আমি খাঁটিই খাই।

—তা বটে। খাঁটি মানুষ খাঁটিই তো খাবেন।

—এই ঘটনা ঘটবে জানতেন?

চায়ের কাপ টেবিলে ঠকাস করে রেখে মহাদেব উত্তেজিত হয়ে বলল, আমি জানলে হতে দিতাম! কী যে বলেন? শহর থেকে আসছেন, এসব গেরামের রাজনীতি আপনারা আর কী বোঝবেন? মেডাম একটা কথা বলি, আপনি শুধু এই গেরামটা দেখছেন— সব্বদিকে এক গল্প। আমরা ছোটো মানুষ দু-দিকেই কাটে! এই যে সব কিমিনালদের জন্ম, এ কি একদিনেই হয়েছে? বাবুরা বলবে চ্যালাদের, চুরি কর। তাহইলেই তোদের এই দেব, ওই সুযোগ দেব। চুরির পয়সা ওপর পর্যন্ত যাবে। আমি চুরি করব না? তো আরেকজন করবে...সে ক্ষমতা পাবে, আমি কেন্নোর মতো বুক ঘষটে চলব। একদিন কেউ পিষে মেরে দেবে! হেঃ! দ্যাখেন যে দেশে এত দারিদ্র সেই দেশে অন্যায় অপরাধ বেশি হবেই। যে ছেলেটা আজ পেটে লাথি খাচ্ছে কাল সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে কি না বলেন তো দিদিমণি? এই যে পলাশ, অর্জুন এদের তো আমি বাচ্চা বয়স থেকে দেখছি। আমার সামনে জন্মাল। ওদের বাপের বিয়ে দেখেছি। আজ থেকে পয়ঁত্রিশ-ছত্রিশ বছর আগে সে দিন আমরা দেখেছি...! খুদকুঁড়ো জ্বাল দিয়ে পুকুর থেকে শাক তুলে গেঁড়িগুগলি সিদ্ধ করে খেত এখানকার মানুষ। আমার বাপের জমিজিরাত কিছু ছিল তাই দু-বেলা ভাত খেতে পেতাম। সেসব কষ্ট আপনারা শহরের মানুষ চিন্তাও করতে পারবেন না। তো, দু-বেলা ভাতের জন্য যদি কেউ অপরাধের পথে পা বাড়ায় তাহলে দোষ কাদের দেবেন গো দিদিমণি?

—আমি দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু এই যে জোর করে মেয়েদের তুলে নেওয়া, ধর্ষণ—এগুলো? এগুলোকে কীভাবে যুক্তিতে সাপোর্ট করব বলুন?

মহাদেব চায়ের কাপ এক নিঃশ্বাসে শেষ করে বলল, একটা বিড়ি ধরাতে পারি দিদিমণি?

—না, মাথা নাড়ল সে, বলল, আমার সিগারেট-বিড়ির গন্ধে অসুবিধা হয়।

মহাদেব কানের ভাঁজে নিখুঁত কায়দায় বিড়িটি গুঁজে হেসে বলল, ঠিক আছে। হ্যাঁ যেকথা বলছিলাম। মানুষের ধম্ম কী জানেন, খেতে পেলে শুইতে চায়! ধরেন যে ছেলেটা কাল পুকুরের জল খেয়ে পেটে কিল দিয়ে শুয়ে পড়ল, পরদিন অন্যায়ের মধ্য দিয়ে যখন পয়সা হাতে পেলো, তখন সে প্রথমে খুব ভালো করে ভালো ভালো খাবার খাবে যেটা কিনা এতদিন তার স্বপ্ন ছিল! পেটের খিদে মিটে গেলে তার মন তখন চাইবে ফুটো চালটা মেরামত করে ভালো ঘর বাঁধতে। ভালো করে দুদিন শোয়ার পরে তার তখন দেহের অন্য খিদেগুলো চাগাড় দেবে। রিপু! হাতে পয়সা, সঙ্গে পাওয়ার এলে সে তখন এতদিন অসভ্য মানুষের যে যে রিপু থাকে সেই রিপুর খিদে মেটাইতে এইসব অনাচার করে। প্যাটে তো বিদ্যা লাই! কী বলেন? ভুল বললে ধরিয়ে দিয়ে বলেন মহাদেবদা, আপনি ভুল কথা কয়ছেন! প্যাটে বিদ্যা লাই আর অসৎ উপায়ে হাতে পয়সা হল্যো অপরাধ বাড়তেই থাকে। আর রাজনীতি তো জানেন দিদিমণি! এদের গুন্ডা-বদমাইশ বানিয়ে নিজেদের গদি পাকাপোক্ত করে ততক্ষণ এদের বাঁচিয়ে রাখে যতক্ষণ দরকার। তারপর কুত্তার মৌত মারে!

চুপচাপ শুনছে বসুমতী। কী সহজ করে বলল মহাদেব এত জটিল সামাজিক সমস্যাগুলো!

—বুঝতে পারছি মহাদেববাবু।

—আজ অর্জুন-পলাশের দল করছে, কাল এরা মরলে আরেকজনের জন্ম হবে। বুঝছেন? নোংরা রাজনীতি দেশটাকে শেষ করে দিল। আমাকেও তো এদের সাহায্য নিতে হয়, পবলেমটা হল এই।

—বালি চুরি নিয়ে কিছু বলেন না? আপনারা তো ভূমিপুত্র! জানেন না কতবড়ো সর্বনাশ ডেকে আনছেন?

হতাশ মহাদেব। তার কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ, বলল, সবাই সব জানে! এ তো আর পকেটমারি হচ্ছে না, হচ্ছে নদীর বালু চুরি, ভাবছেন কি উপরতলার বাবুরা জানেন না?

—তাহলে এরকম চলবে?

উত্তেজিত মহাদেব, বলল, সুখুর স্বামীটাকে লোপাট করে দিলে আমি কিছুই কত্তে পারলাম না! খপর এল পরে না হইলে সাবধান করে দিতে পারতাম। এরকমই চলবে। স্বাধীনতার পর থেকে এরকমই চলে আসছে! সারা ভারতবর্ষেই তো চলছে!

ঝিঁঝির ডাক স্পষ্ট হচ্ছে এখন। মাঝেমধ্যে বাতাসের সঙ্গে গাছের পাতাদের সখ্যের শনশন শব্দ! বসুমতী কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। তর্ক করার মতো কোনো কথাই মহাদেব বলেনি।

মহাদেব বলল, এইবার হয়তো অপরাধী ধরা পড়বে। দু-দিন বাদে বেল পাবে। নাও বা যদি পায়, আরেক দল উঠবে। সেই দল যাবে তো আরেক দল আসবে! আপনাকে বলি, ভালো লাগে না দিদিমণি। আগে মেয়ে পাচার হত। উপর মহলের পশ্রয়েই...এই আমি মহাদেব আর আমার লোকজন বলেছি, গেরামের একটি মেয়েও যদি পাচার হয় তবে দেখে নেব। তাইতে আমার উপর আক্রমণ হইছিল। তবু সে আমরা বন্ধ করতে পেরেছি। মানুষ পশুদিগের অধম গো দিদিমণি!

গত পাঁচদিন ঘুরে ঘুরে দেখেছে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা। বিধবা গ্রাম।

—এদের ঘরগুলোতে আগুন দিল কেন?

—এখনো খপর পাইনি। তবে বালুর ভাগ, ক্ষমতা এইসবই কারণ! তার উপর বন্দনার উপর রাগ আর ওর দাদা জ্ঞাতিরা ওদের বিরুদ্ধ লোক, তাই সম্ভবত। ঘড়ি দেখল মহাদেব, তারপর বলল, এইবার উঠি দিদিমণি। রাতবিরাতে বেরোবেন না। গেরামের এইসব ঝুটঝামেলাতেও থাকবেন না। এদের হাত বড়ো। কিছু হয়ে গেলে...! কী দরকার? আপনি তো একা পাল্টাতে পারবেন না! আপনি কিন্তু টার্গেট! পুলিশও চাকরবাকর এখন। মেরুদণ্ড আর সিধা লাই। আমি আসি।

ঠিক দু-দিনের মধ্যেই হেড অফিস থেকে ফোন এল, অফিস আপাতত তাদের কর্মীদের নিরাপত্তার জন্যই বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে। সমস্ত কর্মীকে অফিস ছেড়ে নিজেদের জায়গায় ফিরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হল। পরবর্তীতে কোথায় বদলি করা হবে অফিস জানিয়ে দেবে।

দেবীর জন্যই সে শুধু সদরে হোটেল ভাড়া করে থেকে গেল আরো পনেরো দিন। দ্রুততার সঙ্গে কোর্টের নির্দেশে দেবীর যাবতীয় কাস্টডি নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসতে লেগে গিয়েছিল বেশ কয়েকটা দিন!

প্রমিতা একেবারে হতবাক প্রথমদিন দেবীকে দেখে। সেই দিনগুলো মনে পড়ে এইরকম একলা সব রাতে! একটু একটু করে বেড়ে উঠল দেবী। প্রমিতা মারা গেলেন যখন দেবীর ছ-বছর বয়স। দেবীর জন্যই আর চাকরি করা হল না! নিজেই এনজিও খুলে ফেলল! দেবীকে বাঁকুড়াতে মিশনারি হস্টেলে দিতেই হল! গল্পের পর গল্প সুতোয় গাঁথা! একটি অসমাপ্ত উপন্যাস!

দু-চোখের পাতা জুড়ে গেছে কখন যেন! ঘুমের মধ্যেও আজ নদী, বালুর চর, অগ্নিদগ্ধ বন্দনা...! পলাশ, অর্জুন... সদ্যোজাত দেবী!

গন্ধেশ্বরী নদীর পাড়ে আজ বিকেলে দেবীকে নিয়ে যখন মন্থর গতিতে হাঁটছে, পূর্ণ সুখে ভরে উঠেছে মন বসুমতীর তখন ফোন এল ধৈবতের।

মা-মেয়ের একান্ত সময়টুকুর ভাগ দিতে চায় না সে আজ কারোকেই। দেবী তার জীবনে ঈশ্বরের উপহার। একদম নিজস্ব। এই সময় কারোর অনুপ্রবেশ সে চায় না। তাই ফোন বেজে বেজে কেটে গেল। শান্ত সমাহিত মনে তাও বিক্ষিপ্ত ভাব রচনা করল। কেন ধৈবত ফোন করল এই চিন্তা প্রায় জোর করেই মনে গেঁথে বসেছে।

দেবী বলল, মা আমি আর তুমি যদি একসাথে থাকতে পারতাম, মা!

বুকের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে উঠেছে বসুমতীর। এরকম কথা তো কখনো বলেনি দেবী! সে বড্ড মুখচোরা! বন্দনা যেমন স্বভাব প্রগলভ ছিল, দেবী তার বিপরীত! দেবীর ছোট্ট হাতের মুঠো শক্ত করে ধরেছে সে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, থাকব। আর কিছুদিন। আমার কাজগুলো আরেকটু গুছিয়ে নিয়েই তুমি-আমি একসাথে থাকব, মা সোনা।

দেবী লম্বা করে ঘাড় নাড়ল, খুব খুশি সে, বলল, আচ্ছা মা।

ধৈবতের ফোন আবার।

—বলুন।

—ম্যাম আমাকে তুমি বলুন, আমি ধৈবত।

—হ্যাঁ ভাই বলো।

—ম্যাম কলকাতায় ট্রান্সফার করে দিচ্ছে আমাকে। সামনের উইকে। থ্যাংকস ম্যাম, আপনার জন্যই অন্য সেলে ভালো আছি। যাঁদের সঙ্গে আছি তাঁরা নকশাল করতেন একসময়। পড়াশোনা করা লোকজন। লাইব্রেরি ইউজ করছি। জেলের বন্দি জীবনের কথাও লিখছি ম্যাম।

খুশিতে মন ভরে গেল নিমেষেই তার। বলল, বাহ! খুব খুউউব ভালো লাগল ধৈবত। তোমার পানিশমেন্টের সময়সীমা যাতে কম হয় আমি আবেদন করব। আমার এনজিও-তে পরে তুমি জয়েন করতে পারো। পাচার হয়ে যাওয়া যেসব মেয়েদের আর ঘরে ফিরিয়ে নিতে অনিচ্ছুক বাবা-মা—তাদের নিয়ে কাজ করছি এখন।

—একসেলেন্ট ম্যাম। আপনার সাথে দেখা হওয়া ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমার কাছে। স্যারও আপনার কথা বলছিলেন খুব। আচ্ছা ম্যাম এখন রাখি।

এই বছর বর্ষা আসবে বোধহয় আগেই। একটু গরম পড়তে না পড়তেই বৃষ্টি হচ্ছে। আজও নদীর ওপারে মেঘ ঘনিয়েছে! গাছের পাতায় তার আন্দোলন। হেসেই এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে যেন গাছেরা! মেঘ দেখেই গরু-ছাগল-হাঁসেদের নিয়ে ঘরে ফিরছে মেয়ে-বউরা। সে বড়ো স্নিগ্ধ শীতল এক চিত্র!

ধৈবতের সঙ্গে কথা বলেও মন আনন্দপূর্ণ তার। দেবীকে বলল, এইবার ফিরি তবে? বৃষ্টি পড়লে তোমার ঠান্ডা লেগে জ্বর হলে আমার যে খুব চিন্তা হবে!

—কাল চলে যাবে, না?

—হুম। আবার শিগগির আসব। তুমি চিন্তা করবে না, কেমন?

নদীর পাড় ধরে হাঁটছে বসুমতী আর দেবী! পৃথিবীর যাবতীয় রহস্যময় গল্প যেন তাদের নিয়েই লেখা! নদীর মতোই কত মোড়! কত বাঁক! কত বাধা! কত স্রোত!

তাকে চমকে দিয়ে দেবী আচমকাই প্রশ্ন করল, আমার বাবাকে দেখিনি কেন মা? কোনোদিন দেখিনি তো, মা!

এরকম প্রশ্ন আসবে একদিন জানা থাকলেও এইরকম অপ্রত্যাশিতভাবে আসবে বুঝতে পারেনি সে।

—মা! আমার বাবা কি মরে গেছে, মা?

দেবীই সহজ করে দিল সমস্ত পরিবেশ।

সে বলল, হুঁ। বলব। আরেকটু বড়ো হলে সব বলব। মরে গেছে।

আঙুলে আঙুল জড়িয়ে সহজভাবে দেবী বলল, আচ্ছা মা। ফটো দেখিয়ো। দেখতে ইচ্ছে করে।

পা চলছে না তার। জড়িয়ে যাচ্ছে। সত্য যে সবসময় শিব ও সুন্দর হয় না! ভয়ংকর এক সত্যের মধ্যে তোর জন্ম বলবে কী করে সে! আজ না হোক কাল, বলতে হবে। বন্দনার দগ্ধ মুখটা যেন বেঁচে উঠল আবার। কাতরাচ্ছে! আহ! অসহনীয়! দেবীকে বলতে হবে এক অন্যায় অপরাধ শোষণ অত্যাচারের মধ্যে তুমি পৃথিবীতে এসেছ। নিশ্চয় ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল!

সুন্দরবন থেকে নর্মদা এই এক মাস চষে ফেলেছে বসুমতী। ঋদ্ধি পাটেকর একসময় তার অনুপ্রেরণা ছিল। নর্মদার বাঁধ নিয়ে তাঁর যে কাজ তাকে বারবার উৎসাহিত করেছে নদী ও তার চরিত্র নিয়ে ভাবতে। ঋদ্ধির সঙ্গে দেখা করে সুন্দরবনে এসে দেখে গেছে নদীগুলোর প্রবাহ, জঙ্গলের অবস্থা! বাঁধ ভেঙে যায় বারবার প্রতিবছর। কেন? কেন?

সুন্দর লস্করের মাটির ঘরই এখন তার অস্থায়ী আস্তানা। গত পাঁচদিন ঘুরে ঘুরে দেখেছে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা। বিধবা গ্রাম থেকে ঘুরে আসার পর মুখে ভাত ওঠেনি তার। শহর, তার চাকচিক্য,

তারই বুকের ভেতরে আলো না জ্বলা, মশা-মাছি উপদ্রুত, বাঘ-কুমিরের আতঙ্কে, ঝড় জল বন্যায় বারবার সব হারানোর ভয় নিয়ে বেঁচে আছে এক জনপদ!

সুন্দরের ঘরে সে আছে জেনে স্থানীয় প্রশাসনের কিছু ব্যক্তি গতকাল তার সঙ্গে দেখা করে গেছেন। সরকারি অতিথিশালাতে থাকার জন্য প্রস্তাব দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁদের ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে সে পত্রপাঠ।

—সম্ভব না। নমস্কার।

—ম্যাডাম কেন? মন্ত্রীর অনুরোধ।

জল ঢালা ভাত কাঁচা পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে খেতে খেতে সে অনড়ভাবে বলেছে, সরকারি আতিথ্য গ্রহণ করলে সরকারের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে কথা বলার অধিকার কি আমার থাকবে আর?

দুই ব্যক্তি চুপ। হাত কচলাতে কচলাতে বলেছিল, আপনি কি সরকারের বিরোধিতা করবেন বলে এসেছেন?

শূন্য দৃষ্টিতে বেশ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়েছিল সে লোক দুটোর মুখের দিকে। সেই দৃষ্টি সহ্য করা সহজ নয়। মাথা নীচু করে একজন বলেছিল, না মানে...!

—না মানে নয় বিদ্যুৎবাবু, আপনিও তো এইখানে থাকেন, অবশ্যি পাকা বাড়ি। বন্যায় সাইক্লোনে আপনারা নিরাপদেই থাকেন। এই যে সুন্দরী গাছ এইভাবে অ্যালার্মিংলি কেটে ফেলা হচ্ছে তার ফল বুঝতে পারছেন তো? গরান, গেঁওয়া সবই তো কেটেকুটে কবরস্থান বানিয়ে ফেলেছেন! আপনাদের চোখের আড়ালে কিছু করা সম্ভব, বলেন দেখি? আপনারা তো এখানকার ভূমিপুত্র, জানেন না এর ফলে মাটি আলগা হয়ে যাচ্ছে। ডি-ফরেস্টেশন! মাটি আলগা মানেই ঝড়জলে সব ধূলিসাৎ!

—আমরা আসতেছি ম্যাডাম । স্যরকে বলি আপনি আতিথেয়তা গ্রহণ করবেন না।

—হ্যাঁ আসুন।

লোক দুটো চলে যেতেই সুন্দর চাপাস্বরে বলল, আপনি কিছুই করতে পারবেন না দিদিমণি।

—জানি। তবু চেষ্টা। তবু রিপোর্ট করব। তবু সাধারণ মানুষকে জানাব। একদিন না একদিন পাল্টাবে তবে তখন বোধহয় সব শেষ। মানুষের জীবনও শেষ! সুন্দরবন কি এইটুকু ছিল? দক্ষিণে কতদূর বিস্তৃত... এই যে কালীঘাট ভবানীপুর...সব সুন্দরবন ছিল। দুশো বছর আগের যে আয়তন ছিল তার এক তৃতীয়াংশে এসে আজ দাঁড়িয়েছে! কী ভয়াবহ দিন আসছে মানুষের সামনে, প্রকৃতির সামনে! উফফ! তোমরা তো অনেক বেশি জানো।

সুন্দরের বউ বাসন্তী শুকনো মুখে বলল, আমাদের আর জেবন! পদ্মপাতায় জল জানেন তো দিদি, সেইরম। এই যে মধু সনগরহ কত্তে ঝায়, নদীতে মাছ ধরতি ঝায়, আমরা মিন মারি, কে কখন ঘরে ফিরে আসতি পারব কিনা জানি না! এককেটা বড়ো ঝড় আসে আমরা পতি বচ্ছর সব্বস্বান্ত হই। ভোটের সময় ন্যাতাদের দেখা মেলে। তখন কী আর বলব দিদি তেনারা পায়ে গড় দ্যান একটা ভোটের জন্যি।

—সব জানি। এর কোথায় শেষ শুধু জানি না! চুরি-চামারি করতে করতে করতে করতে একেবারে ধ্বংসের দিনে এসে দাঁড়িয়েছে! একদিন প্লাবনে ভেসে যাবে সব।

বাসন্তী বসুমতীর দুটো হাত চেপে ধরেছে, তার মুখে মায়া, বলল, আপনি আর এত চিন্তা করবেন না গো দিদি। আমরা এমনিই জন্ম লিবো এমনই মরবো! আপনার বড়ো মায়া! কীভাবে নদী বুইজে দিয়ে ভেরি করতেছে...! গাছ কেটে বিক্কিরি হয়ে যেতেছে!.. কারা বড়োলোক হতেছে আমরা জানিনে? একটা বড়ো ঘূর্ণিঝড় এলে আমরা পরাণ হাতে নিয়ে মরবো বলে বসে থাকি গো। চক্ষের সামনে দেওঘরের চাল উইড়ে ঝায়..! পশুপাখি সব ভেসে ঝায়...সারা বচ্ছর ধরে ঝেটুকু গুইছে তুলি সব জলে ভেসে ঝায়!

—আমি রিপোর্ট করব। এইভাবে মাটির বাঁধ দিলে তো ভাঙবেই যেখানে গাছ কেটে কেটে মাটিই দুর্বল করে দিয়েছে! কংক্রিটের বাঁধ হোক।

হতাশায় আলোহীন চোখ বাসন্তীর, বলল, কিছুই হবেনি তবে তুমি চেষ্টা করো। চুপিচুপি বলি কত মেয়ে পাচার হতেছে খপর পাও? চাগরি দেবার নাম করে, ভাব-ভালোবাসা করে পাচার হয়ে যেতেছে! অনেক বড়ো বড়ো লোক আছে পিছনে।

সকাল দুপুর গড়িয়ে সূর্য ডুবলেই যতদূর দেখা যায় অন্ধকার! মাঝে টিমটিম করে দূরে কোথাও আলো জ্বলে! লোকজন সন্ধে হতেই ঘরে ঢুকে পড়ে।

কাল সকাল হলেই চলে যেতে হবে। সন্ধের মুখেই সকালে আসা লোক দুটো এল।

—আপনি এখানে কদ্দিন থাকবেন?

—কেন?

—মাধোবাবু জানতে চেয়েছেন।

—মন্ত্রী?

—হ্যাঁ আজ্ঞে।

—কাল সকালে। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে ভালো হত, বলবেন। তিনি তো ব্যস্ত মানুষ; দেখা করলেন না।

—আপনার এইখানে আসার উদ্দেশ্যটা কী?

—কেন মন্ত্রীর অনুমতি ছাড়া আসা যায় না?

—তা কেন? এইখানে আসবেন ঘুরবেন আনন্দ করবেন ঝেমন আর সকল ঝায়। কিন্তু আপনি তো উস্কাতে এসছেন!

হেসে ফেলল ক্ষোভে বসুমতী, বাবুকে গিয়ে বলেন একা মহিলা আমি আর কী করতে পারব যে এত ভয় পাচ্ছেন? আপনারা আসুন এখন।

লোক দুটো চলে গেল অনিচ্ছুক। বাসন্তী ফিসফিস করে বলল, কতজনা এল দিদি! সবাই আমাদের ঝন্যি কিছু করতে চায় কিন্তু হয় না গো! হলে তো এদ্দিনে হয়ে ঝেত। তুমি চলে ঝাও দিদি। তোমার না বিপদ-আপদ হয়ে ঝায়। এরা সব পারে।

মাথার ভেতর দপদপ করছে। রাগে হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গেছে তার, যখন রাগের প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয় সে তখন দ্রুত পায়চারি করে। বাসন্তীর কথার উত্তর দিল না সে।

বাসন্তী দাওয়াতে পিঁড়ি পেতেছে তার জন্য। নিজেরা মেঝেতেই বসে খায়। বাসন্তীর এই একুশ বছর বয়সেই তিনটে বাচ্চা। ছোটোটা

সঙ্গে থেকে ঘ্যানঘ্যান করছে। তাকে বিরক্ত হয়ে কয়েক ঘা পিঠে বসিয়েই ভাতের থালা বাড়ল সে। ছোটো মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়েছে বসুমতী। কপালে হাত দিয়েই বলল, বিনা কারণে মারলে। ওর গা গরম। জ্বর তো। ছোট্টো বাচ্চা বলতে পারে না।

—আপনি বসেন খেতে দিদি। বিরক্ত বাসন্তী, বলল, মরুক মরুক। বেঁচেই বা কোন স্বগগে থাকছে! কাল হাসপাতালে নিয়ে ঝেতে হবে।

ভাতের পাতেই কলাইয়ের ডাল আর ভাঙর মাছের রসা আর আলু সেদ্ধ দিল বাসন্তী। বলল, খেয়ে নেন। আমাদের কথা লিখেন দিদি, কত কষ্টে আছি, লিখেন। কিছু না হোক, লোকে ঝানতে পারে ঝেন!

—তোমার বড়োটাকে আমার কাছে দেবে? বাসন্তী!

বাসন্তীর হাত থেকে ডাল চলকে পড়ে গেল, থতমত খেয়ে গেছে সে, বলল, মানে ময়নাকে? তুমি লেবে দিদি? তোমার কাছে থাকবে?

মাথা নাড়ল সে, হুম। আমার কাছে মানে আমার হোমে। পড়াশোনা শিখবে, হাতের কাজ শিখবে। নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

বাসন্তী যে বিড়ম্বনায় পড়েছে বেশ বোঝা যায়, বলল, কিন্তু ওর বাবা কি দেবে?

—কথা বলো।

সুন্দর কিছু মধুর শিশি হাতে নিয়ে তখনই দাওয়ায় পা রাখতে রাখতে চিৎকার করল, কইইইইইই? কুপিটা আন দেখি।

বাসন্তী কুপি নিয়ে যেতেই সহাস্য সুন্দর বলল, দিদিমণির ঝন্যি মধু আনলাম। নেতাইকে অডার দেছিলাম। বাসন্তী ফিসফিসিয়ে কিছু বলতেই সুন্দর এক মুহূর্ত না ভেবে বলল, হেই তো ভালো কথা! দিদির কাছে থাকবে, ফাইফরমাশ খাটবে, লেখাপড়া শিখবে...ময়নার জেবন বত্তে ঝাবে!

ভাত চিবোতে চিবোতে সে বলল, ফাইফরমাশ খাটবে না। হোমে থাকবে। হোমে সবাই যেভাবে থাকে সেভাবেই থাকবে, হস্টেলের মতো। ছেলেটা একটু বড়ো হলে নিমপীঠে ভর্তি করে দেব।

বাসন্তী খুশি, বলল, কী রে ময়না ঝাবি তো দিদিমণির সনগে?

ময়না নামের চির অপুষ্ট সাত বছরের মেয়েটি খুশি খুশি হেসে বলল, হ্যাঁ...। মানসো খেতে দেবে তো? আর বড়ো মিষ্টি?

মাধোবাবুর হিংস্র মুখটা মনে আছে। সকালে তার বেরোতে যাওয়ার মুখে সপারিষদ এসে উপস্থিত, হে হে ম্যাডাম, তাহলে চললেন?

—হ্যাঁ। আবার আসব।

কুৎসিত মুখ করে হাসছে মাধো, হে হে আসেন আসেন। সরকারি বাংলো বুক করে রেখে দেব। বন্ধুবান্ধব লিয়ে আসেন। ফুত্তিফাত্তা করবেন, ঝা লাগে বলবেন হাজির হয়ে ঝাবে ঘরে। অল্প বয়স আপনার, সুন্দরী, এই তো বয়েস ফুত্তিফাত্তা করার। আসেন আসেন যক্ষুন ইচ্ছে আসেন। নমস্কার।

শরীর জ্বলছে বসুমতীর। এদের মতো লোকজন সে দেখে এসেছে এর আগে। এরকমই ভয়ংকর। শ্বাপদেরা সর্বত্র একই রকম হয়! হেরে যাচ্ছে সে!

পৃথিবীতে সৎ লোকেরা একা এবং বিচ্ছিন্ন হয়, তার মনে হল। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে একদিন সুন্দরবন নামের এই জায়গাটা প্রকৃতির রোষে হয় সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে অথবা ধু ধু রুক্ষ বৃক্ষহীন এক প্রান্তর! আর এই দ্বিপদী প্রাণীগুলো তার জন্য দায়ী থাকবে।

ময়নাকে সাজিয়ে দিল বাসন্তী। চোখের জল বাঁধ মানে না তার। মেয়ের একটা হাত আঁকড়ে ধরে রেখে কান্নায় গোঙাতে গোঙাতে বলে যাচ্ছে সে একই কথা, ও ময়নারে তোকে আর দেখতে পাবনি তো রে...ওরে আমার ময়না পাখি...মা তোকে ভাত দিতে পারে না, রক্ষা করতে পারে না...অভাগী আমি...আমি অভাগী গো দিদিমণি দেখো মেয়েটাকে...!

সুন্দর বাসন্তীকে সামলাতে সামলাতে বলছে, চুপ করো। মেয়ে আমাদের নিরাপদে থাকবেনে। আমরাও ঝেয়ে দেখে আসব।

হ্যাঁ হ্যাঁ বাসন্তী, যখন খুশি দেখে আসবে মেয়েকে, বলতে বলতে গাড়িতে উঠল যখন তখন ময়না তাকে আঁকড়ে ধরেছে।

জীবনের গল্পগুলো রৈখিক রেখায় আঁকা যায় না। আর যাদের জীবন অন্যের তরে তাদের চলার পথে বাঁকের পরে বাঁক! বিপদের পরে বিপদ!

সুন্দরবন নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রকে দিয়ে সবেমাত্র অফিসে ঢুকেছে সে, মোবাইলে ভাইব্রেশন হল। হ্যালো বলতেই, পুরুষ কণ্ঠ, ম্যাডাম বসুমতী দত্ত তো?

আপনি এক্ষুনি রিপোর্ট জমা দিয়ে এলেন, না?

—হ্যাঁ।

—আমি পার্থ, আমার হাতেই দিয়েছিলেন। স্যার এসেছেন। আপনাকে এখনই ডাকছেন। চলে আসুন প্লিজ।

গাড়ি ঘুরিয়ে রওনা দিতে দিতেই সম্ভাব্য প্রশ্ন যেগুলো মন্ত্রী করতে পারেন তা ছকে নিয়ে উত্তর প্রস্তুত রাখল সে।

গণেশ হাতি চেয়ারে বসে দুলছেন। কালো চর্বিযুক্ত মুখের ভেতরে চোখ দুটো কুতকুতে ধরনের ছোটো। বসুমতী চেম্বারে ঢোকার পরেও নিরুত্তাপ তিনি। বসুমতী নিজেই চেয়ারে বসতে বসতে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, আপনি ডেকেছিলেন!

—হ্যাঁ। আপনি সুন্দরবন গিয়েছিলেন, কী কী কাজ করছেন সব রিপোর্ট আছে। আপনার রিপোর্ট পড়লাম। বলুন কী বক্তব্য।

—একজন নাগরিক হিসাবে দেশের সামাজিক ভৌগোলিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সব বিষয়েই প্রশ্ন করার অধিকার আমাকে সংবিধান দিয়েছে।

গণেশ হাতি বিরক্ত। এইসব ডায়লগ তাঁর অপছন্দ। ভ্রূ কুঁচকে বললেন, তা দিয়েছে। তারপর।

—প্রতি বছর একটা-দুটো সাইক্লোন সুন্দরবনের ওপর দিয়ে যায় আর তছনছ করে চলে যায়। বারবার বাঁধ নির্মাণ হয় আর ভেঙে যায়! এইভাবে তো পার্মানেন্ট সল্যুশন হয় না। সরকারের টাকাও নষ্ট। কীভাবে কী করলে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আর নদীবাঁধ ঠিক থাকবে তারজন্য এই রিপোর্ট।

—আপনি পলিটিক্স করেন?

সম্ভাব্য প্রশ্ন তাকে বিচলিত করল না, বলল, ভোট দিই।

রাজনীতি রাজার কাজ। আমার সোসাইটি, জলবায়ু কীভাবে ভালো থাকবে সেগুলো দেখা উচিত আমাদের।

—আপনি মেদিনীপুরে একটা এনজিও-তে ছিলেন না?

—হুম।

—সেখানেও উস্কে এসেছেন! আজকাল আর মেয়ে-বউরা কথা শোনে না এই আপনাদের মতো মহিলাদের জন্য।

—শুনে খুশি হলাম। ধন্যবাদ।

—এনজিও চলে কী করে আপনার? খুব অনেস্ট শুনেছি।

—চলে যায়। হিসেবপত্রের কাগজ আপডেটেট আছে।

—আরেকটু অনুদান পেলে ভালো হয় না? ধরুন আমি আমার তহবিল থেকে যদি ইয়ার্লি দিই?

—কেন দেবেন?

—ধরুন আমার ইচ্ছা আপনি নিজের এনজিও নিয়ে ব্যস্ত থাকুন, অন্যদিকে মন দেওয়ার দরকার নেই!

—ঘুষ?

খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠলেন গণেশ, বললেন, ধুর! কী যে বলেন! আপনি সৎ মানুষ জানি। আপনি সিঙ্গিল তো?

দু-চোখে প্রশ্ন তুলে তাকাল বসমতী। সে জানে এই দৃষ্টি অব্যর্থ ওষুধ। এরপর আর কেউ চোখ তুলে তাকাতে পারে না।

গণেশ হাতি বললেন, একা সিঙ্গিল মহিলা। আপনার সাহস আর কাজের পুরস্কার। আমরা আপনাকে পুরস্কার দিতে চাই।

মাথা নাড়ল সে, আমি সম্মত নই। ধন্যবাদ। রাজনৈতিক পুরস্কার মানে আমি কথা বলার ক্ষমতা বেচে দিলাম। স্যরি। আপনাদের ওপর অনেক আশা। দেখুন কিছু করা যায় নাকি। নমস্কার।

গণেশের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসার পর সে বুঝতে পারল মাথা দপদপ করছে। রাস্তায় এসে এক কাপ চা খেয়ে যখন গাড়ির স্টিয়ারিংএ হাত দিল তখন সূর্যের বিদায়বেলা!

গণেশ হাতি তার কী কী ক্ষতি করতে পারে ভাবতে ভাবতে অফিসের পথে এগোতেই ফোন, ধৈবত!

—দিদি! বেকসুর খালাস!! দেবার্চনদা কথা বলবে।

এত খুশির বোধ অনেকদিন তার হয়নি যে! গাড়ি রাস্তার এক পাশে পার্ক করে ফেলেছে সে। কী আশ্চর্য! সে ভুলে গেল কী করে! আজ তো ফাইনাল জাজমেন্ট ছিল। এই কেস সে নিজে আর দেবার্চন মিলে..!

দেবার্চনের গমগমে গলা, কনগ্রাচুলেশনস ম্যাডাম।

ভারী লজ্জা আর অপরাধবোধে আক্রান্ত সে। সুন্দরবন নিয়ে এমন বিরক্ত বিভ্রান্ত ছিল কয়েকটা মাস!

—স্যরি স্যরি কনগ্রাটস টু বোথ অব য়ু। আয়াম সো স্যরি। আমি জাস্ট মন্ত্রণালয় থেকে বেরিয়ে অফিসে যাচ্ছিলাম। দেবার্চন আয়াম প্রাউড অব য়ু।

—একটা ভিডিও কল করি? প্লিজ।

উচ্ছ্বসিত দেবার্চনের মুখ। পাশেই ধৈবত। তার পাশে কয়েকজন পুলিশ। বিহ্বল হয়ে পড়েছে বসুমতী।

দেবার্চন আর ধৈবত হাত নাড়ছে। শিশুর সারল্য ভরা মুখ আজ দুজনেরই।

—এত বছর বাদে তোমার কথাতে প্র্যাকটিসে ফিরেই প্রথম সাফল্য এই টুকলিবাজের...হাহাহাহা। প্রাণ খুলে হাসছে দেবার্চন। বলল, নয়া মোড়ে দাঁড় করিয়ে দিলে ম্যাডাম। আমি খুব খুশি যে ধৈবতের মতো নিরপরাধ একজনকে জাস্টিস দিতে পেরেছি। অ্যান্ড প্রাউড অব য়ু। তোমার জন্য দু-দুটো লোক নতুন জীবন শুরু করতে পারল।

সে বিহ্বল। কী বলবে ভেবে না পেয়ে শুধুই হেসে যাচ্ছে—আনন্দে।

—কাল সব পেপার্স ক্লিয়ার করে ওকে নিয়ে আসব। আমি কি একবার আসব? মানে এক কাপ কোল্ড কফি কি আমার ফিজ হতে পারে না?

অঙ্ক, হিসেবনিকেশ সব উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে বসুমতীর, দম দেওয়া পুতুলের মতো বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়। হ্যাঁ...

—ফ্লুরিজে? আপত্তি নেই তো? নাকি বারিস্তা?

একই সঙ্গে দুশ্চিন্তা আর আনন্দ যখন মিলেমিশে যায় তখন হতচকিত হয়ে যায় বোধহয় মানুষ!

দেবার্চন আবার জিজ্ঞেস করল, ফ্লুরিজ?

কতদিন পরে এইরকম একটা আনন্দ সন্ধ্যা যে এল!

বসুমতী ফ্লুরিজে পৌঁছে দেখল দেবার্চন অপেক্ষা করছে। সহাস্য আলিঙ্গন করল দেবার্চন। খানিকটা হতচকিত ও বিড়ম্বনায় পড়ল যেন সে। লজ্জা ও আনন্দ একই সঙ্গে তার অভিব্যক্তিতে।

ভালো লাগছে! আশ্চর্য এক ভালো লাগা আচমকাই জড়িয়ে ধরেছে তাকে। চলমান পার্কস্ট্রিটের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আবিল হয়ে বলল, কতদিন বাদে, জানো!

শ্লেষ মিশিয়ে হাসল দেবার্চন, সে তো বুঝতেই পারছি! নিজের দিকে তাকানোর সময় কি আর মেলে? দেশোদ্ধার করছ! করো। অতি উত্তম। কিন্তু নিজেকে অবহেলা করে নয়। একটা মেয়ে...! কী পেলে বলো তো! চেহারা দেখেছ নিজের? এখনো তোমার দিকে মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে থাকে মানুষ, আজ দেখলাম। তুমি দরজা খুলে ঢুকলে আর একটা বিদ্যুতের চমক ঢুকল মনে হল, ম্যাডাম! সবাই ফিরে তাকাল।

ব্রীড়াবনত সে, বলল, ধ্যাত। তবে সত্যি কত বছর বাদে এমন একটা সন্ধ্যা পেলাম! মন খুলে উপভোগ করছি। আনন্দ আরও বেশি কারণ ধৈবত। নিরপরাধ একজনকে বাঁচানোর আনন্দই সেইরকম!

—আরো একজনকে বাঁচিয়ে তুললে সেটা বললে না!

ভ্রু-তে প্রশ্ন বসুমতীর, বুঝলাম না।

—একটু বোঝার চেষ্টা করো প্লিজ। আরে বাবা, আমি আমি। আমাকে। সেই লোচ্চা লাফাঙ্গা ছেলেটাকে আবার পুরোনো দিনে ফিরিয়ে দিয়ে বাঁচালে না? এতদিন বাদে প্রথম কেসেই জয়! তোমার জন্য দু-দুটো মানুষ আজ নতুন জীবন ফিরে পেল গো ম্যাডাম!

চুপচাপ কফি পান করছে বসুমতী, ভেতরে ভেতরে গুটিয়ে যাচ্ছে আবার সেই অদ্ভুত অপূর্ব আনন্দ অনুভব করছে! বলল, কাল ধৈবতকে নিয়ে বেরিয়ে আসার পর কিন্তু আরও কাজ!

স্যান্ডুয়িচে কামড় দিয়ে ভ্রু নাচাল দেবার্চন।

—ধৈবতের একটা কাজ।

—আমার হোটেল হয়ে যাবে। কয়েকটা হোম-স্টে করার প্ল্যান আছে। সে দায়িত্ব ওকে দিতে পারি আর তোমার এনজিও-তে ওকে অ্যাবসর্ব করতে পারো।

মাথা নাড়ল বসুমতী, আমিও ভেবেছি। ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়ে কাজ শুরু করব। ওকে সেই দায়িত্ব দিলে বরং আমাদের চেয়ে বেটার করবে ও। বাইরে থেকে সমস্যা বোঝা আর সমস্যার মধ্যে থেকে সমস্যা বোঝার ক্ষেত্রে কোয়ালিটিটিভ ডিফারেন্স আছে।

—রাইট।

—সুন্দরবন নিয়ে যে কাজটা করতে চলেছি তাতে প্রবলভাবে প্রবলেম স্থানীয় নেতারা। কাজ সম্ভব নয়! মন্ত্রীমশাই পুরস্কার দিতে চেয়েছেন আজ, হা হা হা...! কিছু কাজ ইনকম্পলিটই থেকে যাবে এই জীবনে!

অস্ফুট স্বগতোক্তি করল দেবার্চন, করাপশন!!!! বাই দ্য ওয়ে, ডিনার করে যাই একসাথে? না করো না প্লিজ। আমি আর অত খারাপ ছেলে নই বসুমতী! অন্তত এই ভিক্টিটা সেলিব্রেটি করি?

—ঠিক আছে।

—তোমারও তো আনন্দ করার অধিকার আছে, আছে না?

—দেবীর কথা তো জানোই...! দেবী এই ফার্স্টটাইম জিজ্ঞেস করল, ওর বাবাকে ও কোনোদিন দেখেনি কেন! আমি কিছু বলার আগেই নিজেই সলভ করে দিল, বলল, মারা গেছে, না, মা? বুঝেছি। আমি স্বস্তি পেলাম। কিন্তু সত্যিটা তো জানাতেই হবে। এত তিক্ত সত্যি কীভাবে বলব আর ও কীভাবে নেবে বুঝতে পারছি না। সেই দিনটা আমার স্বপ্নে আসে এখনও। আমি ঘুমোতে পারি না! বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে গেছে সে। রাতের পরে রাত ঘুমোতে পারিনি বন্দনার ওই পোড়া চেহারা...প্রসব করেছে, তার মধ্যেই কথা বলছে! বলতে বলতেই চলে গেল! বীভৎস! বীভৎস! ওই লোক দুটোর একজন পলাতক! আরেকটা অ্যারেস্টেড হলেও বেল পেয়ে ঘুরছে! সুখি ফোন করে তো, বলে সব। সুখি ওদের টার্গেট। জানে উইটনেস হয়ে যেতে পারে। ওর স্বামীকে তো ওরাই মার্ডার করেছিল! বডিই লোপাট! সুখিকে নিয়ে আসব ভেবেছি।

—রাইট ডিসিশন। আমি আছি। লড়াইতে সঙ্গে রাখলে খুশি হব।

—আছই তো। ভাবছি এর মধ্যেই হুট করে একদিন নিয়ে আসব। সবচেয়ে বড়ো সমস্যা দেবীকে ফেস করা।

—আরেকটু বড়ো হোক। এমনিতেই ও স্মার্ট। আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব ওকে।

চমকে তাকিয়েছে বসুমতী, তুমি ম্যানেজ, মানে?

—আমাকে যদি তোমার সঙ্গে থাকতে দাও...! শিশুর মতো আব্দার করল দেবার্চন।

ততক্ষণে ধাতস্থ সে, মাথা নাড়ল, উঁহু, আমি তো দেবী অ্যাডাল্ট হলেই ম্যাকলয়েডগঞ্জে চলে যাব। বুদ্ধের আশ্রয়ে। আমার একটু শান্তির প্রয়োজন আছে গো। সব কোলাহল, সম্পর্ক সব ছেড়ে বুদ্ধের কাছে আশ্রয় নিতে চাই। ম্যাকলয়েডগঞ্জ থেকে ঘুরে এসেছি তো! আমি যে-দিন ফিরে আসব, মন খারাপ দলাই লামার সঙ্গে দেখা হল না ভেবে সেদিনই উনি ফিরলেন আনএক্সপেক্টেডলি! দেখা হল। কথা হল।

গম্ভীর হয়ে গেছে দেবার্চনের মুখ, বলল, অনেক দেরি আছে। এতজনের ভার নিয়েছ সেসব আগে হোক। আমি আটকানোর কে?

দেবার্চনের অস্তিত্ব সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে আজ। তাকে যেন গ্রাস করে ফেলেছে দেবার্চন! দুশ্চিন্তা নয়—এ এক অন্যরকম উত্তেজনা! ঘুম আসছে না বসুমতীর। কতবার যে বাথরুমে গেল! কতবার জল খেল! দেবী সুখি ধৈবত, সালেহা অর্জুন পলাশ গণেশ সব মুখগুলো অস্থির করে তুললো আজ! দেবী বড়ো না হওয়া পর্যন্ত সে কোথাও যেতে পারবে না!

মন আজ অনেক নির্ভার বসুমতীর। সমস্ত উত্তর জানা হয়ে গেলে যেমন হয়! নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রক নিজে হওয়া গেলে যেমন হয়!

অফিসে ঢুকতেই সহকারী মেয়েটি গতকালের বিকেলের ডাকে আসা চিঠিগুলো দিয়ে বলল, এই চিঠিটা এখন এল।

সরকারি চিঠি!

তার এনজিও-র বিরুদ্ধে অভিযোগ সংক্রান্ত চিঠি। এনজিও সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে।

ফোন এল তখনই। গণেশ হাতি ফোনে কথা বলতে চেয়েছেন।

—নমস্কার! ম্যাডাম ভালো আছেন তো?

—হুম। ধন্যবাদ।

—পুরস্কারটা নিচ্ছেন তো?

—স্যরি আমি অপারগ। ধন্যবাদ আমাকে বিবেচনা করার জন্য।

—নিলে ভালো করতেন। আপনার ইচ্ছে। আপনার বিরুদ্ধে তো সাঙ্ঘাতিক অভিযোগ এনেছে সুন্দর আর বাসন্তী সুন্দরবনে যাদের ঘরে থেকে এলেন! জোর করে নাকি ওদের মেয়েকে নিয়ে এসেছেন! কান্নাকাটি করছে। মেয়ে চুরির দায়ে তো জেল হয়ে যাবে! আমি বিষয়টা আটকে রেখেছি নাহলে এতক্ষণে ওরা থানায় যেত। আপনি অ্যারেস্ট হয়ে যেতেন! আমি অবশ্য বিশ্বাস করিনি কারণ আপনি সৎ মহিলা। এইসব ছোটোলোকদের জন্য কিছু করতে নেই, বুঝলেন? ভীষণ বেইমান হয়। চাঁড়ালের জাত ব্যাটারা!

মাথা দপদপ করছে। শান্তভাবে তবুও বলল, আচ্ছা। থ্যাংকস। মিস্টার হাতি ওদের বলে দিন ওদের সঙ্গে আমার কথোপকথনের যাবতীয় রেকর্ড করা আছে। ওরা থানাতে আমার নামে রিপোর্ট করতে পারে আর আমি যে একজন আইনজীবী সেটাও বলে দেবেন। ওরা জানে হয়তো ভুলে গেছে!

কয়েক সেকেন্ড নিস্তব্ধ। ফোনের সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেল।

তার এনজি ও-র পেছনে পড়ে গেল যে ক্রিমিনালদের দল বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। অফিসে প্রথম চা খেতে খেতে গুছিয়ে নিয়েছে সে পরবর্তী কাজ। প্রথমেই প্রয়োজনীয় তথ্য কাগজপত্র বেশ কিছু ফটো কপি করে বিশ্বস্ত কয়েকজনের হাতে তুলে দিতে হবে। তারপর দেবার্চনকে নিয়েই সংশ্লিষ্ট দফতরে দেখা করতে যাবে সে।

সুন্দর আর বাসন্তীকে ফোন করতে হবে ভাবতে ভাবতেই, ফোন করল সে।

—তোমাদের মেয়েকে আমি জোর করে নিয়ে এসেছি? সত্যি বলবে। শোনো সব কথা কিন্তু রেকর্ড করা আছে।

সুন্দর খানিক থতমত খেয়ে বলল, মাপ করেন দিদিমণি...আমরা জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘ আর তারচে বড়ো দুশমন নিয়ে ঘর করি। এর বেশি আর কিছু বলতে পারবনি। আমাদের মাফ করেন ঝেন।

লড়াই পাকে পাকে জটিল হয়ে উঠছে অনুমান করতে পারছে সে। সন্তর্পণে পা ফেলতে হবে।

—তোমরা এসে মেয়েকে নিয়ে যাও।

সুন্দরের নিশ্বাস পতনের শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু ফোনের ভেতর দিয়ে।

আজ দুপুরের দিকে ভবানী ভবনে পৌঁছাল সে দেবার্চন আর ধৈবতকে সঙ্গে নিয়ে। ধৈবত আজ মুক্ত। দেখা হতেই বলল, দিদি একটা প্রণাম করি আগে। শুধু আপনার জন্য...আপনি আমার জীবনে মা দুর্গার মতো! আর দেবার্চনদা...! আবেগ বিহ্বল সে।

—নতুন জীবন শুরু হোক ধৈবত। তুমি চাইলে দাদার হোটেল ব্যবসায়ে চাকরি করতে পারো অথবা আমার এনজিও-তে। আমার পেছনে পড়ে আছে দেখছ তো অ্যান্টিসোশ্যালের দল। তবে লাভ নেই। কোনোদিন অসৎ পথে কিছু করিনি তাই আমার পেছনে পড়ে লাভ নেই। তবে কষ্ট হয় যখন দেখি পারছি না। অন্যায়গুলো দেখেও পারছি না।

দেবার্চন পিঠে হাত রেখেছে বসুমতীর, বলল, তুমি একা যা করছ তা দেশের সম্মিলিত ক-জন করছে? নিজের লাইফটাই পুরো স্যাক্রিফাইস করলে!

ভবানী ভবনে দুঁদে গোয়েন্দাদের সামনে থেকে যখন করমর্দন করে বেরিয়ে আসছে বসুমতী, তখন শুধুমাত্র একজন ছাড়া অন্য সকলের দৃষ্টিতে সম্ভ্রম লক্ষ করল সে। কানে বাজছে অফিসার সামন্তর কথা, স্ট্রেঞ্জ! আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে মাত্র থার্টিটু থাউজ্যান্ড!

হেসেছিল সে, বলেছিল, দ্যাট'স মোর দ্যান ইনাফ! প্রপার্টি বলতে বাবার বাড়ি।

প্রৌঢ় অফিসারের চোখে সম্ভ্রম, বললেন, গো অ্যাহেড উইথ ইয়োর নোবল মিশন।

আরেকটা ভালো দিন আজ। আরেকটা জয়ের দিন। দেবার্চন বলল, এইবার তোমার হাতি কাদায় পড়বে। হে হে...!

—আমার আনন্দ হচ্ছে কিন্তু কষ্ট আরও গভীরে দেবার্চন। এই অসৎ মানুষগুলোর জন্য বছরের পর বছর, দশকের পর দশক স্বাধীন ভূমিতে ক্রীতদাসের মতো সর্বহারা জীবন কাটাচ্ছে বন জঙ্গল নদীর মানুষগুলো! একেকটা ক্যালামিটিস আসে আর যেটুকু সঞ্চয় করে সব হারায় এরা! কেন? কেন হবে? পোকামাকড়ের জীবন যেন! কোনো মূল্য নেই! একটা মানুষের মতো মিনিমাম ভদ্রস্থ জীবন যাপনের যেটুকু শর্ত সেটুকুও নেই!

—তুমি তো চেষ্টা করছো বসুমতী।

ধৈবত বলল, দিদি! আপনি অনেক করছেন। এতগুলো ছেলেমেয়ের দায়িত্ব..এ কি কম? অসহায়দের ফ্রিতে আইনি সাহায্য..! ঈশ্বর আপনাকে আরও শক্তি দিন।

আজ ফ্লুরিজের কাচের দেওয়ালের ওপারে চলমান একটা পৃথিবী দেখতে দেখতে কফি পান করতে করতে সন্ধ্যা যাপন করল তিনজনে।

হতাশ! স্পষ্টত ভেঙে পড়েছে সে। মাথা নেড়ে যাচ্ছে, না না না না...!

বসুমতী বলল, আরেকটা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হই। দেবী! দেবীর রি-অ্যাকশন! সুখিকে নিয়ে আসতে হবে। পলাশ-অর্জুনের মতো লোকগুলো আবার বেরিয়ে এসে পুরোনো পেশাতে ফিরবে। নদী মরে যাবে। মেয়েরা ধর্ষিত হবে! পুলিশের চেয়ারে ক্রিমিনাল পা তুলে নাচাবে!

দেবার্চন তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, আর তুমি দেবী চৌধুরাণী হয়ে লড়ে যাবে। আমরা দুজন আছি সঙ্গে দেবী।

—তোমরাই বল-ভরসা। দেবীকে তোমাদের হাতে দিয়ে, এনজিও-র ভার দিয়ে আমি ছুটি নেব।

দেবার্চন যে গভীর চোখে তাকাল একবার তা চোখ এড়াল না বসুমতীর। সে শুধু বলল, তুমি তত কঠিন আর স্বার্থপর নও বলেই মনে হয়।

একটা বছর ঝড়ের বেগে চলেছে বসুমতীর।

মাথার চুলগুলো রোজ দেখে সে, কতটা সাদা হল। দেবী হাসে। বয়সের তুলনায় অনেক পরিণত সে। তার আব্দার, চুলে কালার করো না মা! য়ু লুক সো প্রিটি মা। তুমি সাজো না, পরার মধ্যে একটা বড়ো টিপ, ব্যস। ওটাকে সাজা বলে? দেবার্চন আঙ্কলও বলছিল। একটু ওবিডিয়েন্ট হও না মা!

দেবীর কথা শুনে হেসে ফেলে বসুমতী। দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কখনো কেঁপে ওঠে বুক। বলতে হবে দেবীকে সব। এত কঠিন রুক্ষতা সে গ্রহণ করার পর সমাজ, সম্পর্ক সম্বন্ধে তার অনুভূতি কী হবে!

অনেকবার বলবে ভেবেও কথা গলার কাছে এসে কণ্ঠরোধ হয়েছে।

আজ অফিসে যাওয়ার তাড়া নেই। চুপচাপ শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। দেবী উত্তেজিত তখনই ঘরে এসেছে, মা! আমি বড়ো হয়ে গেলাম আজ। চোখেমুখে উত্তেজনা।

—মানে? তুমি তো বড়োই সোনা।

—না না, সে বড়ো না গো। সত্যিকারের বড়ো। আমার পিরিয়ড হয়েছে। হ্যাঁ গো।

বিস্ময়ের সীমাছাড়া সে। এতটা হতচকিত যে দেবী তাকে কখনো করতে পারে তা দূর কল্পনায় ছিল। পুরো ব্যাপারটাই এত দ্রুত ঘটে গেল যে ধাতস্থ হতে যেটুকু সময় লাগল তার মধ্যেই দেবী বলল, ও মা! কী হল? শোনো তোমার ন্যাপকিন নিয়েছি কিন্তু।

—কে বলল তোকে এসব? তুই জানতিস!

দেবী হাত-পা নেড়ে উত্তেজিত হয়েই বলল, হ্যাঁ। ক্লাসের সবাই জানে তো। আমাদের ক্লাসের সবারই প্রায় হয়ে গেছে তো।

নিজের ছোটোবেলা মনে পড়ছে বসুমতীর। কী বোকা ছিল! প্রথম ঋতুস্রাবে ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করেই সারা। ভয়ংকর একটা অসুখ হয়েছিল ভেবেছিল! মনে পড়তেই হেসে ফেলল সে, বলল, তোরা কত স্মার্ট রে। আমি একেবারে ল্যাদাড়ে ছিলাম। হি হি..! আমার প্রবলেম সলভ করে দিলি তুই।

—একটা কথা ছিল মা। তুমি কিন্তু মন খারাপ করতে পারবে না। বাবার ছবি নেই কেন মা? মরে গেলে তো থাকে!

মিথ্যে না সত্যি কী বলবে দ্বিধায় ভেঙেচুরে যাচ্ছে সে। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, এখনই শুনবি?

হ্যাঁ।

—তুমিও তাহলে কথা দাও মন খারাপ করতে পারবে না। তুমি শুধু আমার মেয়ে। ঠাকুর একেকজনকে একেকরকম ভাবে পাঠান। এই যে আমাদের আশ্রমে কত বাচ্চা সবার কি বাবা-মা আছে? কত কারণেই তারা হারিয়ে গেছে বাচ্চাদের জীবন থেকে।

—আমিও কি তেমন?

—তোমার মাকে আমি চিনতাম।

অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে দেবী। কয়েক মুহূর্ত চুপ।

—দেবী! তুমি মন খারাপ করবে না কথা দিয়েছিলে।

—তুমি আমার মা নও!!

—তাই মনে হচ্ছে?

প্রবলভাবে মাথা নাড়ছে দেবী, না। বলো তুমি। বলো।

সব সত্য সবসময় সুন্দর হয় না। সব সত্য ফুল ফোটায় না মনে হল বসুমতীর। নিমেষে সামলে নিয়েছে সে, বলল, মজা করলাম। তোমার মাকে চিনতাম মানে আমি আমাকে চিনতাম, সেই আমি অন্যরকম ছিলাম, বুঝলে?

—তাহলে বাবা?

এই প্রশ্নের কাছে দিশেহারা বসুমতী। ভেবে নিয়ে বলল, তোমার বাবার ছবি হারিয়ে গেছে! একটাই ছিল। আমি মেদিনীপুরে যেখানে চাকরি করতাম সেখানে একবার আগুন লাগে...খুব আগুন... সেইদিনের সেই দৃশ্য জ্বলন্ত আবার আজ বসুমতীর চোখের সামনে।

দেবীর চোখে অসহায় বিষণ্ণভাব একটা ফুটে উঠল মনে হল বসুমতীর। যুদ্ধ তো তারও মনে। একদিন সত্যিটা তাকেই বলতে হবে।

—মন খারাপ করলে?

ঘাড় নাড়ল দেবী, না না। তুমি কী করবে? ইচ্ছে করে তো আর করোনি!

দরজায় বেল বাজতেই ভ্রুতে ভাঁজ পড়েছে বসুমতীর, কে! আজ সুখির আসার কথা। কিন্তু এখনো সময় হয়নি তো..! তাহলে?

সই করে কুরিয়ারের চিঠিটা হাতে নিয়ে অবাক সে। জেলের ঠিকানা থেকে পাঠানো হয়েছে। নিশ্বাস দ্রুত হয়েছে তার। দ্রুত ছিঁড়ে ফেলেছে সে খাম। পেন দিয়ে দুর্বোধ্য হাতের লেখায় একটা চিঠি!

প্রথমেই চোখ পড়ল "ইতি অপরাধী অর্জুন" শব্দটাতে। গলার ভেতরে একমাঠ মরুভূমি অনুভব করল সে।

মেডাম,

আপনার পতি অনেক অন্যেয় অবিচার করেচি বটেক, পথমে ক্ষমা চাইছি সেজন্য। পাল্লে মাপ করে দিবেন।

আমার মুক্তি আপনার হাতে। অনুরোধ করচি আপনি আমাকে বাঁচান। আমি অনেক অন্যেয় করেচি কিন্তু আমাদেরও হাতপা সব বাধা ছিল মেডাম। সব বলতে চাই। তারপর আমার ফাঁসি হয় হোক। একদিন আপনার সাথে দেখা করতে চাই। জেলার সাহেবকে বলে এই চিঠি লিখচি। আপনি চাইলে দেখা করার অনুমতি মিলবে, মেডাম। ফাঁসি হওয়ার আগে সব আপনাকে বলে ঝেতে চাই।

ইতি, অপরাধী অর্জুন।

বন্দনার শরীর জ্বলছে। আগুন নিভে গেলেও সর্বাঙ্গ খেয়ে নিয়েছে সে। সেই অবস্থাতে অর্ধেক জীবিত মেয়েটা বলছিল, ওদের শাস্তি দিবেন দিদি। কেউ ঝেন ছাড়া না পায়।

—বাচ্চার বাবা কে জানো? বন্দনা? বলো! বন্দনা...

চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে তখন শেষ নিশ্বাসের প্রবল চাপে, জড়িয়ে যাচ্ছে কথা, বলল, এপ...ধষ্যণ...অজ্জুনরা অনেকে মিলে... বাচ্চাকে দেখো দিদি। তুমি নাও।

অর্ধমৃত শরীর থেকে শেষ নিশ্বাস বেরিয়ে যেন মুক্তি পেল!

—মা! কার চিঠি মা? তুমি গম্ভীর হয়ে গেলে কেন মা? দেবী উদ্বিগ্ন।

ঘাড় নাড়ল বসুমতী, না। কিছু না। একটা দুষ্টু লোকের।

দেবার্চনকে ফোন করল সে তখনই। আজকাল অনেক নির্ভার লাগে তার। কোনো সমস্যা এলেই মনে হয় সে একা নয়, দেবার্চন আছে। নিজের থেকেও বেশি বিশ্বাস করা যায় দেবার্চনকে।

ফোনে চিঠিটা পুরোই পড়ে শোনাল সে। বলল, কী মত? যাওয়া উচিত?

—অবশ্যই। ধৈবতকে নিয়ে যেও সঙ্গে। আমি কাল কার্শিয়াং যাচ্ছি নতুন একটা হোম-স্টে দেখতে। পছন্দ হলে নিজে নিয়ে নেব। কী বলতে চায় দেখো। জানিয়ো আমাকে। সুখি কি এসে গেছে? শোনো আমার মনে হয় সুখির এইভাবে আসা-যাওয়া না করাই ভালো। ওর তো গ্রামে কেউ নেই, তাহলে যাচ্ছে কেন?

একটু অবাক হল বইকি সে, বলল, মনে আছে সুখি আজ আসবে?

হাসল দেবার্চন, বলল, ম্যাডাম তুমি আমাকে বুঝলে না গো! মরার পরেও দুঃখ রয়ে যাবে গো।

—ওর বাড়িটা দখল হয়ে যাবে নাহলে। ওর মামা আছে বলে তবু রয়েছে। বিক্রিও করতে পারছে না। তাহলে লোকের সন্দেহ হবে।

—তাহলেও। ওর মামাকে দিয়ে দিক।

—জমিজমা খুব দুর্বল জায়গা দেবার্চন, বিশেষত গ্রামের লোকেদের কাছে। এবার এলে বলব। এখন রাখি। কালই যাচ্ছি তাহলে।

বিশেষ অনুমতি নিয়ে জেলার সাহেবের ঘরে বসে বসুমতী। বুকের মধ্যে এক একটা ঢেউ ভেঙে পড়ছে তুমুলভাবে! সেই অর্জুন! ত্রাস! কী বক্তব্য তার!

শরীর অনেকটাই ভেঙে পড়েছে, ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই জরিপ করে নিয়েছে বসুমতী। দু-হাত মাথার ওপরে রেখে জড়ো করে নমস্কার করল অর্জুন, মেডাম নমস্কার। আপনি যে আসবেন ভাবিনি আবার ভেবেওছিলাম। বলতে বলতে মেঝেতে বসে পড়ল সে। শুধু শরীরের স্বাস্থ্যই নয়, মানসিকভাবেও নড়বড়ে দেখাচ্ছে অর্জুনকে।

—বলুন কী বলবেন। আধঘণ্টা সময় দিয়েছেন জেলার সাহেব।

কোনোরকম গৌরচন্দ্রিকা না করে সে বলল, আমি বাঁচতে চাই। বাঁচান। কেউ যদি পারে আপনি পারবেন।

—কী করে বুঝলেন? আর আপনি যে জঘন্য অপরাধ করেছেন তারপর আমি আপনাকে বাঁচাতে চেষ্টা করব কেন? বন্দনাকে মনে পড়ে? পড়ে?

মুখ নীচু অর্জুনের। শক্তি সঞ্চয় করে আপ্রাণ বাঁচার তাগিদে বলল, যে অপরাধ আমি একা করিনি তার শাস্তি আমি একা পাব কেন? আমাকে এই পথে কে এনেছিল? শালা মায়ের পেট থেকে পড়েই তো কিমিনাল হইনি! আমাকে যারা এ পথ দেখিয়েছিল তারা তো সব ছোটোখাটো নেতা! তাদের জন্য কাজ করেছি। এই কাজ কি আমি একাই করেছি? খেতে পেতাম না মেডাম আগে বলেছি। ডাসবিন থেকে কুকুরের সাথে মারামারি করে খাবার খেয়েছি। এমন এমন সব নাম বলব যারা আমাদের এই পথ দেখিয়েছে আপনি শালা চেয়ার থেকে মাটিতে ধপ্পাস করে পড়ে যাবেন! আমার মাকে মহাজন...! ধুসসস শালা বাইন..., স্যরি স্যরি মুখ খারাপ... আমি সব নাম বলে দিতে চাই মেডাম। তারপর হোক ফাঁসি।

—পলাশ তো ফেরার এখনো!

—মুখ খারাপ করলে কিছু মনে করেন না, শালা মাদারচোখ...... শালা, ওকে ঝেড়ে দিয়েছে। বলে দিচ্ছি বিষ্টু সরখেলের দলকে তৈরি করছে আপনাদের ওই সাদা জামা, কণ্ঠি পরা সাধু লোকটা! ওটা বিষ জেনে রাখুন। মঞ্চে বক্তিতা দেয় যেন মাইরি বিবেক ঠাকুর বলছে! তবে শুনুন, লিখে নিন নাহলে রেকড করে নিন নামগুলো। আমি রাজসাক্ষী হয়ে সব বলব, তবে আমি বাঁচব না বেশিদিন। কুত্তার দল মেরে ফেলবে আমাকে। আমাদের দিয়ে নোংরা কাজগুলো করিয়ে নিয়ে আজ চেনে না মেডাম!

—মানলাম তোমরা ভিক্টিম। তোমাদের ব্যবহার করেছে রাজনৈতিক নেতারা, কিন্তু তারা কি রেপ করতে বলেছিল? তোমাদের ভয়ে গ্রামের মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দিত। তাতেও সেফ ছিল না। বন্দনাকে পুড়িয়ে তোমরাই তো মেরেছ? রেপ তো তোমরা করেছ! গণধর্ষণ! থানাপুলিশ সব কব্জা! কী ভাবো তোমরা এসব চলতেই থাকবে? অন্যায়ের শাস্তি হয়ই হয় মনে রেখো। আমাকেও বলেছিলে, তোমরাই এখানে সব। এখানে তোমাদের কথাতেই সব চলে! আমাকেও ভয় দেখাতে চেয়েছিলে।

গলার কণ্ঠা ওঠানামা করছে অর্জুনের। শরীর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে প্রচণ্ড রাগ। শুকনো ঠোঁট চেটে নিয়ে বলল, ক্ষমতা খুব খারাপ জিনিস মেডাম! খুউব খারাপ। বন্দনার পেটে নাকি বাচ্চা ছিল...!

—ছিল।

—নয় বচ্ছর ধরে কেস ঝুলছে। সুইসাইড কত্তে ইচ্ছে করে। কেউ কারো নয়! কাজের বেলায় কাজি কাজ ফুরুলেই পাজি। আজ তেনারা আমাকে চিনতি অস্বীকার করে। অথচ বখরা সব্বাই হাত পেতে নিয়েছে। ঘরে ঘরে গেছে টাকা!

—তোমাকে কেউই বাঁচাতে পারবে না। আমি জানি কতগুলো ধারায় কেস চলছে তোমার। যদি মনে করো সবার নাম বলে দিতে পারো। তাতে তোমার মন হাল্কা হবে। তাতে অন্যরাও ফেঁসে যাবে। শাস্তি পাবে কিনা জানি না তবে মৌচাকে ঢিল তো পড়বে। তুমি অনেকের অনেক ক্ষতি করেছ অর্জুন। পাপ! তার শাস্তি তো হবেই।

হতাশ অর্জুন, বলল, পাপ বাপকেও ছাড়ে না জানি। জেলে বসে সব মনে পড়ে। কীভাবে সেই অর্জুন এই অর্জুন হয়ে গেল সব মনে পড়ে!....পথমে ছিল দু-বেলা খেতে পাওয়ার লোভ তারপর সেই লোভ বাড়তে বাড়তে... দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে পড়ল ঘরে!

—বন্দনার বাচ্ছাটা মরে গেছে?

সে কথার উত্তর দিল না বসুমতী, বলল, আমি যাব এখন। তুমি সব বলে দিও। একা কেন শাস্তি পাবে?

হাত মাথার ওপরে তুলে আগের ভঙ্গিতে নমস্কার করল অর্জুন,

বলল, আপনার মতো মানুষ...! কথা দিচ্ছি ঋদি বেঁচে ফিরি তবে এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে এইবার কাজ করব। অন্য অর্জুনকে দেখতে পাবেন মেডাম।

দেবার্চন বারকয়েক ফোন করেছে ইতিমধ্যেই। জেলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেবার্চনকেই প্রথম ফোনটা করল সে, বলল, বাড়ি ফিরে ডিটেইলস-এ বলছি। কেস সিরিয়াস। অনেক বড়ো রাঘব বোয়াল এইবার ফাঁসবে। আমাকে নামের তালিকা বলেছে। রেকর্ডেড।

উত্তেজিত দেবার্চন, বলল, তুমি একটু সাবধান। লোক কিন্তু সবই নজর রাখছে। তোমার পেছনে তো এমনিই ফেউ আছেই। ট্রেনে উঠে ফোন করো। দুশ্চিন্তা বাড়ল আমার।

দাবদাহের মধ্যে স্নিগ্ধ শীতল বাতাস যখন শরীরের ওপর ঝাপটা মেরে যায় তখন যে অনুভূতি হয়, আজ দেবার্চনের কথায় তেমন অনুভূতি হল বসুমতীর। তাকে নিয়ে কেউ দুশ্চিন্তা করছে!! এ এক অপূর্ব অনুভূতি।

বাড়িতে ফিরতেই সুখি দরজা খুলে দিল আজ। বলল, গেরামের অবস্থা একদম ভালো নয়। নজরে নজরে রাখছে সবাই। বারুদ জানেন তো? বারুদের ইস্তূপের উপর গেরামটা দাঁড়িয়ে আছে। গলার স্বর নামিয়ে আনল সুখি, বলল, পলাশ খুন হয়ে গেছে শুনে রাখুন। বডি গুম হয়ে গেছে!

আতঙ্কে স্তব্ধ সে। বলল, কী বলছিস!!!!!

—হ্যাঁ দিদি। সে ফেরার ছিল। আমরাও জানতাম না। একটা কঙ্কাল মিলেছে নদীর ধারে। খবর হবে। দেখুন। অনেক হাড়...! লোকে বলছে পলাশের। খবর নাও হতে পারে।

—কবে মিলেছে?

—গতকাল বিকেলে! তবে পুলিশ চেপে দিতে পারে। খবর বাইরে যায়নি মনে হয়।

পাকস্থলী মোচড় দিয়ে উঠছে, বমি পাচ্ছে বসুমতীর। চারপাশটা কী ভয়ংকর!

গীতা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে তখনই ঢুকল, দিদি চা। তোমার টেরেন লেট ছিল?

—হ্যাঁ, দেবী কী করছে?

—তাকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। মা মা করছিল।

চায়ের কাপ হাতে নিয়েই বেডরুমে ঢুকে দেবীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বসুমতী। নিদ্রিত দেবীকে দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। মনে মনে বলল, মে গড ব্লেস ইউ বেবি! জগতের সব ভালো তোর হোক।

রাতের আহার সেরে দেবার্চনকে ফোন করে বিস্তারিত জানাল বসুমতী। এমনকি পলাশের হত্যা ও বডি লোপাট, কঙ্কালের হাড় পাওয়া যাওয়ার কথাও। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য হল, এই বিষয়ে কোনো সংবাদ হল না দেখে! অর্থাৎ সুখির কথাই সত্যি প্রমাণিত হল।

—অর্জুন সব বলে দিলে রি-অ্যাকশন কী হবে বুঝতে পারছ? তোমার কাছেও নামের লিস্ট আছে। তুমি সেরকম বুঝলে কয়েকটা দিন বাড়িতে থেকেই কাজ করো। ফিল্ড ওয়ার্ক আছে কিছু? থাকলেও ক্যানসেল করো বাবু।

যথেষ্ট চিন্তিত বসুমতী, আনমনেই বলল, হুঁ।

—তোমার জন্য আমরা কতজন নতুন করে বেঁচে উঠেছি, জানো তো? তুমি স্বীকার না করলেও আমরা জানি। আমি পরশু আসছি। তোমার কাছে থাকব কয়েকদিন। থাকতে হবে আমাকে।

নিশ্চিন্ত! বুকের ভেতরে আদিগন্ত বিস্তৃত এক খোলা হাওয়ার মাঠ! ফোন হাতে ধরে আনমনেই হাসল বসুমতী। সে হাসি শুধু হাসি নয়...তার অন্য নাম আছে!

সকালে ঘুম ভাঙাল তাকে দেবার্চন, মিনি! মিনি! ওঠো। সাংঘাতিক খবর।

গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত সালেহার বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে হইচই করে বাড়ি ফিরেও কাজ করে দেরিতেই ঘুমিয়েছিল বসুমতী।

মন খুশি যথেষ্ট। সালেহা আবার বিয়ে করল। তার এলাকার এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার তাকে শাদির প্রস্তাব দিয়েছিল, জানিয়েছিল তাকে। একা বাচ্চা নিয়ে থাকা তার পক্ষে সমস্যার জীবন। ছেলে সেয়ানা হয়ে উঠছে। সেও বেপরোয়া ধরনের। বস্তির পরিবেশ! তাই এই বিয়ের প্রস্তাব পেয়ে তাকেই আগে জানিয়েছিল, দিদি গো কী করা উচিত! এত বয়সে বিয়ে-শাদি...! ছেলে মানতে চায়ছে না দিদি।

একবাক্যে রাজি হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল সে, খুব খুব ভালো হবে সালেহা। তোমারও বয়স হচ্ছে। একা একজন মেয়ের এই সমাজে বাস করা কত কঠিন জানি তো! একজন ডাক্তারবাবু বিয়ে করলে তারচেয়ে ভালো আর কী হবে? ওনার বউ নেই তো?

—মরে গেছে দিদি ক্যানছারে আজ পাঁচ বচ্ছর। একটা মেয়ে। বিয়ে হয়ে গেছে। একদম একলা।

খুব খুশি হয়েছিল সে।

—ছেলের দায়িত্ব আমার। আমি বুঝিয়ে বলব। বুঝবে।

ফারহাদ আর সে মুখোমুখি বসে। ফারহাদ তাকে পছন্দ করত। সালেহার কাছ থেকে নিয়ে এসে নিজের হোমে রেখেছিল। জেলখানার পরিবেশ শিশুর বড়ো হওয়ার পরিবেশ নয়। ছোটোবেলায় তাকে বলা হয়েছিল মা তার কাজে গেছে। অনেক টাকা রোজগার করে তার কাছে ফিরে আসবে।

—ফারহাদ, মা বিয়ে করবে তোমার পছন্দ নয়?

ঘাড় গোঁজ করে বসে তেরোর কিশোর।

—ফারহাদ! মা যদি বিয়ে না করে তাহলে মায়ের অনেক অসুবিধা। তুমি তো বড়ো হয়েছো, জানো বোঝো সব। আর ডাক্তার চাচা বিয়ে করলে তোমরা অনেক ভালোভাবে থাকতে পারবে।

—আমি আব্বা বলে ডাকতে পারব না।

মাথায় হাত বুলিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল সে। বাচ্চাটার কোথায় ব্যথা অনুমান করতে পারছে সে।

—বলতে হবে না। চাচা বলবে। তবে আব্বু বললে হয়তো উনি খুশি হবেন।

—আমার আব্বাকে শালা খুঁজে বেড়াচ্ছি। পেলে, মা কসম...! দাঁতে দাঁত ঘষছে ফারহাদ।

তবে কি জিন! সেই জিন কথা বলছে আবারও! বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠেছিল তার, ফারহাদ! তুমি গুড বয়। কখনো কাউকে

শাস্তি দেওয়ার কথা ভাববে না। আল্লাহ-র ওপর ভরসা রাখো। কথা দাও। তুমি ভালো স্কুলে পড়ো। কেমন সুন্দর ইংরেজিতে কথা বলতে পারো। আর কিছুদিন বাদে পড়া শেষ হলেই ভালো চাকরি পাবে। তাই তো?

ঘাড় শক্ত ছেলে বলল, হুম।

—মা কিন্তু তোমার পছন্দকে আগে গুরুত্ব দেয়। তুমি না বললে মা বিয়ে করবে না।

একটু যেন আলো আলো হয়ে উঠল মুখ ফারহাদের, বলল, মা খুশিতে থাকলে আমি রাজি। আমার যদি মন চায় আব্বা বলব।

—দ্যাট'স লাইক আ গুড বয়।

সালেহার বিয়েটা সুন্দরভাবে হয়েই গেল। ফারহাদ যে অত আনন্দ করবে সেটা ভাবতে পারেনি সে। তাই বড্ড খুশি তার মন।

—মিনি!! মিনিইইই! উত্তেজিত দেবার্চন।

ধড়মড় করে উঠেছে সে, হ্যাঁ কী? কী হয়েছে? ঘুম তখনো জড়িয়ে।

—কাগজ দেখো। জেলের মধ্যে অর্জুন খুন হয়ে গেছে!

ঘুম উড়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট এই সংবাদ! ছিটকে উঠেছে সে, কী! কী বললে?

খবরের কাগজগুলো তার হাতে দিয়ে সে বলল, অর্জুন মার্ডার হয়ে গেছে। পড়ো।

বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমেছে বসুমতী। টেলিভিশনের সুইচ অন করেছে।

ব্রেকিং নিউজে খবরটা বারবার আসছে! হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে বসুমতীর। অসহায়ের মতো দেবার্চনের দিকে তাকাল, জানতাম। মনে হয়েছিল! সম্ভাবনা ছিল! অর্জুনও জানত।

—চা খাও। সুখিকে চা দিতে বলি। মাথা ঠান্ডা রাখো। তুমি এরচেয়েও কঠিন পরিস্থিতি একাই সামলেছ।

দেবার্চন বলার আগেই সুখি চা নিয়ে এসেছে। শুকনো মুখে বলল, খবরটা দেখলাম। আপনি ঘুমোচ্ছিলেন বলে আমি আর দাদা ডাকিনি অনেকক্ষণ।

দেবার্চন বলল, তোমার রেকর্ডার থেকে ডিলিট করে দাও নামগুলো। পারবে না লড়তে। কোথাও থামতে হবে মিনি। এরা ভয়ংকর। তুমি এমনিতেই টার্গেট। এখন অনলাইন কাজ করো। আমি আমার কাজগুলোও অনলাইনে করব এখানে থেকে। তোমার লাইফ আমাদের কাছে ইমপর্ট্যান্ট।

হতাশ! স্পষ্টত ভেঙে পড়েছে সে। মাথা নেড়ে যাচ্ছে, না না না না...!

—ক্রিমিনালদের মৃত্যু এইভাবেই হয় মিনি। বড়ো বড়ো গ্যাংস্টারগুলোকে দেখো, কীভাবে মরে! এদের এটাই শেষ পরিণতি।

—ঠিকই। একদল মরে আরেক দল জায়গা নেয়। আরেক দল মরে আরেক দলের জন্ম হয় আমাদের সাউথ-ইস্ট এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোতে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতেও তো...! ক্রিমিনাল মেকাররা কিন্তু অপরিবর্তিত! তাদের শুধু চেয়ার বদল হয়! মুখ সব এক! ইকনোমি! দারিদ্র জিইয়ে রাখবে এরা। নাহলে ক্রিমিনাল তৈরি করা যাবে না। ক্রিমিনাল না থাকলে এরা টিকে থাকবে না! এদের অস্তিত্ব বিপন্ন। একজন-দুজন খুব ভালো হয়েও লাভ নেই। কারণ অন্যরা ক্রিমিনালদের হাত ধরে পাওয়ারফুল হবে! একটা চক্রব্যূহ! চুপচাপ বসে রইল বসুমতী।

—ছাড়ো। অনেক বাচ্চার দায়িত্ব তোমার। ওইখানে কাজ করতে না গেলে তো তুমি এসবের মধ্যে জড়াতে না। দেবীকে মানুষ করতে হবে।

—ঠিক বলেছ। আসলে সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে তবে সিস্টেম বদল করা যেতে পারে কিছুটা। বাইরে থেকে আমার মতো একা কেউ কী আর করতে পারে! সুখির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, দেবী কি স্কুলে চলে গেছে?

—হ্যাঁ।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে বসুমতী, স্কুলে একটা ফোন করতে হবে, যেন অপরিচিত কেউ তাকে আনতে গেলে তার হাতে ছেড়ে না দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ।

দেবার্চনকে বলল, দেবীকে আমরা দুজনে আনতে যাব আজ থেকে কয়েকটা দিন। বাসে আসা-যাওয়া করবে না।

—রাইট। আমিও তাই ভাবছিলাম।

দ্বিতীয় কাপ চা খাওয়ার পর কিছুটা স্থিতিতে ফিরেছে যেন নিজেরই মনে হল বসুমতীর।

রিওয়াইন্ড করছে সমস্ত ঘটে যাওয়া ঘটনা যাকে পেছনে ফিরে যাওয়া বলে। দেবীর সেই আগ্রহ ভরা মুখ, মা আমার বাবার ছবি নেই কেন? বলতে হত অনেক কিছুই কঠিন তিক্ত সত্য। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, যে অতীত মৃত তাকে মৃতই থাকতে দেওয়া উচিত। কিছু সত্য না প্রকাশিত হওয়াই বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ভালো।

দেবার্চনকে বলল, অর্জুনের মৃত্যু একটা বড়ো সমস্যার সমাধান করে দিল! ভেবেচিন্তে পরে দেবীকে ওর ইতিহাস সব বলব ভেবেছিলাম, ভয় ছিল ও কীভাবে নেবে! সেই ভয়টা আর নেই। ওর একটাই পরিচয় আমার মেয়ে। তবে একটা মিথ্যের আশ্রয় আমি নেব। তুমি হেল্প করবে?

—বলো।

স্মৃতি দপ করে জ্বলে উঠল আচমকাই, লাফিয়ে উঠেছে বসুমতী, বলল, ইয়েস। গড ইজ দেয়ার দেবার্চন। জীবনে অন্যায় খারাপ তো কিছু করিনি তাই হয়তো ঈশ্বর সাথ দেন। অভির ছবি আছে অ্যালবামে। সেও তো মৃত। আমার স্বামীও বটে! অভির একখানা ছবি দেখিয়ে দেব, বলব, খুঁজে পেয়েছি দেবী তোমার বাবার ছবি। জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকাল সে, ভুল করব কি?

—না। ভালো কিছু হওয়ার জন্য এই মিথ্যে আসলে অনেক সত্যির বেশি। আর তুমি ভুল করতে পারো না। সেই থাপ্পড় খেয়েছিলাম বলেই না আজ এই দেবার্চন।

ধৈবতের ফোন বাজছে।

—হ্যাঁ বলো।

—দিদি তোমার কাছে আসছি। ট্রেনে এখন। একজনকে সঙ্গে আনছি। বাড়ি থেকে বিতাড়িত। আমার মতো জেন্ডার! দুটো দিন

তোমার ওখানে যদি রাখো, তারমধ্যে আমরা একটা ঘর খুঁজে নেব।

—নিশ্চয়। এসো।

দেবার্চন সপ্রশ্ন তাকাতেই বসুমতী হাসি মুখে বলল, ধৈবত সম্ভবত ওর পার্টনার পেয়েছে। গড ব্লেস। দীর্ঘশ্বাস পড়ল, বলল, কতো তুচ্ছ সামান্য সব ঘটনা নিয়ে মানুষে মানুষে শত্রুতা! এলজিবিটিদের নিয়ে সাধারণ মানুষের এত সমস্যা কোথায় কিছুতেই বুঝি না! ওরা তো ক্রিমিনাল নয়? কোনো ক্রাইম করে না? অথচ ট্রিটেড হয় ক্রিমিনালদের মতো! আর সত্যিকারের ক্রিমিনালগুলো বুক ফুলিয়ে রাজত্ব করে বেড়ায়!

—স্নান করে এসো। ঘুম থেকে উঠেই যে সমস্ত শুনলে তাতে মাথা স্থির রাখা মুশকিল। আমি এই ফাঁকে একটা কনটিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছি। তোমার জন্য। হ্যাপি?
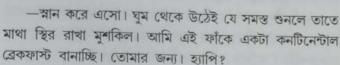
এই সময়গুলোতে নিজের কাছেই পরাজিত হয়ে পড়ে সে। এই দেবার্চনকে তো ফিরিয়ে দেওয়া যায় না! অন্যায় হবে।

ইস্কুল থেকে সে আর দেবার্চন তাকে আনতে গেছে দেখে দেবী হতবাক, মা! তোমরা!

—খুব ইচ্ছে হল যে বেবিটাকে আজ নিজে নিয়ে আসি। তোমার মা তো কাজেই ব্যস্ত থাকে। তোমাকে আর কতটুকু সময় দিতে পারে, বলো? এখন ক-দিন কাজ কম, তাই ভাবলাম...!

ঝলমল করে উঠেছে দেবীর মুখ, বলল, খুব খুশি আমি। সো হ্যাপি। দেবাকাকু তুমিও এসেছ দেখে আরও হ্যাপি।

—তুমি আরো হ্যাপি হবে আজ। তোমার বাবার ফটো একখানা খুঁজে পেয়েছি সোনামা!

দেবীকে ততটা উচ্ছ্বসিত দেখাল না যতটা হবে ভেবেছিল সে। বলল, আচ্ছা দেখব।

দেবার্চন বলল, আরেকটা খুশির খবর আছে বেবি। বলব?

ঝলমলে চোখ দেবীর, বলল, প্লিইইজ বলো।

—আমরা পাহাড়ে বেড়াতে যাচ্ছি।

বসুমতী হাঁ! হতচকিত। এমনই চমকে গেছে!

—মানে!!!!!! কবে? কোথায়? দেবা!!!!!

—তোমার ফেভারিট প্লেস!

—ম্যাকলয়েডগঞ্জ!!!! ও! গড!

দেবী উচ্ছ্বসিত, বলল, ইয়া! লভ য়ু দেবাকাকু। কতদিন বেড়াতে যাইনি! ইজ ইট আ বিউটিফুল প্লেস?

শরীরের মধ্যে দিয়ে ধারাস্নানের পবিত্র অনুভূতি হচ্ছে বসুমতীর। বুদ্ধর কাছে যাবে সে।

—মিনি! খুশি?

কেমন উদাস হয়ে গেল বসুমতী, বলল, দেবীর আঠেরো হয়ে গেলে ওর দায়িত্ব তোমার হাতে দিয়ে আমি তো বুদ্ধের পায়েই আশ্রয় নেব। এত কষ্ট মানুষের আমি আর নিতে পারছি না। বুদ্ধও তো সংসার ত্যাগ করেছিলেন!

দেবী হঠাৎই বলল, মা তুমি বুদ্ধ নও। আর আমি বইতে পড়েছি উনি সংসার ছাড়লেন কিন্তু তাতে কত কষ্ট হয়েছিল ওঁর ফ্যামিলির? তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে আমাদের কষ্ট হবে না? তুমি আমাদের কষ্ট দেবে? পারবে? বুদ্ধদেব সবাইকে কষ্ট দিয়ে কী মোক্ষলাভ করেছিলেন, মা?

চমকে উঠেছে বসুমতী। দেবী ভেতরে ভেতরে এত বড়ো হয়ে গেছে! এত ভাবতে শিখেছে! সে তো তাকে শিশু ভাবে এখনও!

দেবীর দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে বসুমতী। বলল, তুই এত কিছু ভাবতে শিখেছিস! এত বড়ো হয়ে গেলি কবে, সোনা!

—তুমি বুদ্ধের মতো গৃহত্যাগ করবে না, বলো?

—বুদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা বা শক্তি কোনোটাই আমার নেই বাবু। আমি শুধু তাঁর পথ...! বুদ্ধ যে পথ দেখিয়ে গেছেন সেই ধর্মই বৌদ্ধদর্শন, বৌদ্ধধর্ম! সেসব জানতে গেলে অনেক তপস্যা করতে হয়। আমি জানি না সত্যিই আমি পারব কি না সব ছেড়ে দিয়ে...!

দেবার্চন প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য বলল, আইসক্রিম? চলবে? তাহলে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে গঙ্গার দিকে..? কী?

কত দিন কত দিন বাদে যে এমন একটা বিকেল এল বসুমতীর জীবনে! গঙ্গার জলে তখন অস্তরাগ ফেলে নতুন দিনের দিকে পশ্চিমে চলেছেন সূর্যদেব! এ পাড়ে সন্ধ্যা শয্যা পাতছে তখন। রাত্রি আসবে।

সুখির ফোন! হৃদপিণ্ড কেঁপে উঠেছে বসুমতীর। আবার কোন অঘটন!

—হ্যাঁ বল।

—দিদি, চাঁপাগাছের তলায় কে যেন একটা বাচ্চা ফেলে গেছে! মেয়ে! একদম একদিন দু-দিনের...! কাপড় জড়ানো! কান্নার শব্দ পেয়ে গিয়ে দেখি...! ঘরে এনে রেখেছি। তুমি এসো ঝটপট।

দেবার্চন হাসল, বলল, ম্যাডাম! বুদ্ধ আপনাকে এই কাজের জন্য পৃথিবীতে এনেছেন। এটাই তোমার দায়িত্ব বসুমতী।

আইসক্রিম হাতে ধরা। গলে পড়ল খানিকটা। উত্তেজিত বসুমতী, বলল, শিগগিরি বাড়ি চলো। কিন্তু আমি তো অনেক জায়গাতেই হেরে যাচ্ছি দেবার্চন!

স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে অন্য হাতে বসুমতীর হাতে হাল্কা চাপ দিল সে, মনে রেখো তুমি একা লড়ছ একটা পচনশীল সিস্টেমের সঙ্গে! তাতে কখনো হারবে। কখনো জিতবে। নতুন কোন দেবশিশু এল ঘরে, দেখো!

দেবী খুবই উত্তেজিত, বলল, মা, ও আমার বোন হবে কিন্তু। আমি ওকে দেখব। হোমে রেখো না প্লিইইজ।

কখনো কখনো এমন ভালো লাগার দিন উপহার পেলে বসুমতীর চোখ দিয়ে অশ্রু নিঃশব্দে গড়িয়ে নামে! ❖

কালীঘাটের কুকুর

মন্দাক্রান্তা সেন

দীর্ঘ রোগভোগে শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে মানসিক নিরাপত্তার অভাববোধেও আক্রান্ত। বারবার নানান সমস্যা নিয়ে বাড়ি-নার্সিংহোম-বাড়ি। বাড়িতে আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না। আমার আর কোথাও বেরোনোও হয় না। সুজাতা আসার পর ও-ই মায়ের দায়িত্ব নিয়েছে। আমি এখন অনেকটাই নিশ্চিন্ত। লেখায় ফিরেছি, মিটিং-মিছিলে যোগ দিতে পারছি। মোট কথা, এলোমেলো সংসার এখন অনেকটাই গোছালো।

সুজাতা প্রথম এসে খুব স্বাভাবিক ভাবেই মাকে মাসিমা ডাকতে শুরু করল। কিন্তু গোল বাধল আমাকে সম্বোধনের বিষয়ে। সুজাতা এই ছাপ্পান্ন-সাতান্ন, বয়সে আমার চেয়ে বড়ো, আমাকে বলে বসল,—মিষ্টু, বেলা হয়েছে, ওঠো, চান করে খেয়ে আবার লিখতে বসবে। কথাটা ও বলল মায়ের সামনেই। আমারও কথাটা কানে খট করে লাগল। কেন লাগল কীভাবে লাগল, ঠিক ভাবার সময় পেলাম না, তার আগে মা-ই বিস্মিত ও বিরক্ত গলায় বলল—এ কী! তুমি ওকে নাম ধরে ডাকলে!

সুজাতা সুংকচিত হয়ে গেল। ক-সেকেন্ড পরে আস্তে আস্তে বলল—ভুল হয়ে গেল? কী বলে ডাকব তবে?

মা বিরক্তি বজায় রেখেই বলল—কী বলে ডাকব মানে কী? দিদি বলে ডাকবে।

—না বুঝে একটা ভুল করে ফেলেছি মাসিমা। সরি। আর ভুল হবে না। দিদি স্নান করতে যাবে? গিজার চালিয়ে রেখেছি।

কেন জানি না আমার মনটাও সংকুচিত হয়ে গেল। ও আমাকে দিদি বলবে, তাতে যেন আমারও কেমন কেমন লাগছে। অথচ কোনো কাজের লোক বা আয়ার কাছ থেকে এটাই যাকে বলে উচিত, প্রত্যাশিত।

প্রথম ক-দিন গেল ধাতস্থ হতে। ওর নতুন কাজের জায়গা, আমাদের সংসারেও নতুন মানুষ। কর্মঠ, যাকে বলে কাজেকর্মে পটু। চলনে-বলনে রুচির ছাপ। আমাদের মনে ধরে গেল।

মা বলে, কাউকে দেওয়া জিনিস ফেরত নিতে নেই। স্কুলের বন্ধুরা এক কাঠি ওপরে গিয়ে বলত, দেওয়া জিনিস ফেরত নিলে পরের জন্মে কালীঘাটের কুকুর হতে হয়। অতসব জানি না। আমি যা বুঝি, দেওয়া জিনিস ফেরত নেওয়াটা ভদ্রতার অভাব, মনুষ্যত্বের পক্ষে হানিকর।

মা যখন অসুস্থ, আমি মায়ের সেবা করে কূল পাচ্ছি না, লেখালিখি ডকে উঠেছে, তখন ঈশ্বরপ্রেরিতের মতো সংসারের হাল ধরতে সুজাতার প্রবেশ। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একজন মানুষ। সুন্দর চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ। কাজের দিদি বা কাজের মাসি বা আয়া বলার চেয়ে তথাকথিত ভদ্রমহিলা বলাই ঠিক। বনেদি বাড়ির বউ। স্বামী মারা যাবার পর শরিকি বিবাদে সংসারে অত্যন্ত টানাটানি। সেই জন্যেই অপরের সংসার সামলে কিছু অর্থ উপার্জনের উপায়ের জন্য এই পথে নামা। এইটাই সুজাতার প্রথম কাজের বাড়ি। সেখানে কী করতে হয়, কেমনভাবে থাকতে চলতে হয়, সে বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। প্রথম প্রথম দু-পক্ষেরই একটু অসুবিধে হচ্ছিল। তারপর খাপ খেয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল সুজাতাই বাস্তবিক সংসার চালাচ্ছে। তার প্রথম ও প্রধান কাজ মাকে দেখভাল করা। মা বয়স হয়ে যাওয়ার পর

সুজাতাদি আমাকে বলল—আমার এ জন্মে তো এত দুর্দশা। তবে পূর্বজন্মে নির্ঘাত আমার কিছু সুকৃতি আছে।

—কেন?

—এই তোমাদের বাড়িতে কাজ করতে এসেছি। আমি এখানে খুব ভালো আছি দিদি। তার ওপর তোমার কাছে আসতে পারা। বিখ্যাত মানুষ তুমি। কত টিভি প্রোগ্রামে যাও। কালকের প্রোগ্রামটা আমার বড়ো মেয়ে দেখেছে। বলছিল, মরীচিকা সেন কী ভালো কথা বলেন। আমায় আগে বললে না কেন দিদি? আমিও দেখতুম।

—আরে ধ্যুস। ওসব আর বলার মতো কথা নাকি? তুমি আমার লেখা পড়েছ?

সুজাতাদি মাথা নীচু করে বলল—না, দিদি। এখন পড়তে ইচ্ছে করে। আমাকে দেবে? দুপুরে মাসিমা যখন ঘুমায় তখন তো আমি বসেই থাকি, পড়ব।

—কবিতা, গল্প না উপন্যাস?

—কবিতা কি আমি ঠিক বুঝব? তোমার গল্পই পড়তে চাই।

—বেশ। দেওয়া যাবে।

—তাই আমি মেয়েকে বলছিলাম, এত বড়ো এত বিখ্যাত একজন মানুষ, কিন্তু কী ভালো ব্যবহার! একটুও অহংকার নেই। আমার সঙ্গে কী সুন্দর ভাবে মেশে। সত্যি, তোমাকে এত ভালো লাগে! তুমি আরো অনেক বড়ো হও মামণি।

অন্য কথাগুলো ভুলে গিয়ে বললাম—বাঃ, তুমি আমাকে মামণি বললে, কী ভালো লাগল!

সুজাতা আশঙ্কিত স্বরে বলল—ওহ্ সরি দিদি। ভুল হয়ে গেছে।

—ভুল কিছু হয়নি। এবার থেকে আমায় ওই নামেই ডেকো। শুনতে ভালো লাগল।

সুজাতাদি তখনো আড়ষ্ট গলায় বলল—আমায় মাপ করে দাও দিদি। আর ভুল হবে না। আসলে তোমাকে এই ক-দিনেই এত আপন মনে হয়েছে...

—না না, সত্যিই তোমার মুখে মামণি ডাকটা এত ভালো লাগল! আমাকে মামণি বলেই ডেকো। আরেকটা মজা করবে?

—কী?

—তুমি আমাকে মামণি বলে ডাকবে, আমিও তোমায় মামণি বলে ডাকব। ভালো হবে না?

সুজাতাদি ঝরঝর করে হাসল, বলল—হবে, এই না হলে কবি? কেমন সুন্দর ডাক বানিয়ে ফেললে। কিন্তু মাসিমা রেগে যাবেন যে?

—না, রাগবে কেন? আমার মনে হয় তুমিও মাকে মা বলেই ডেকো। মায়েরও ভালো লাগবে।

—আচ্ছা, মামণি।

—এবার একটু চা চলবে না কি মামণি?

সুজাতাদি হাসতে হাসতে বলল—নিশ্চয়ই, একবার কেন, মামণির জন্য একশোবার চা চলবে।

সুজাতাদির শোওয়ার ব্যবস্থা মায়ের ঘরে মায়ের খাটের পাশে মেঝেতে। ওখানে একটা কার্পেট পাতাই আছে। আছে বাড়িতে পড়ে থাকা মোটা গদি। বালিশ, চাদর। অসুবিধে কিছু নেই। প্রথমে একটু অসুবিধে হত ওর ঘুমনোর সময় যে নাইটিটা পরে, সেইটা নিয়ে। কাঁধের ওপর সরু দড়ির ফুল। পিঠটা প্রায় পুরোপুরোই অনাবৃত। স্তনের পাশগুলো চোখে পড়ে। বেশ দৃষ্টিকটু। তবু কিছু বললাম না। রাতেই তো পরে। সকালে উঠেই বদলে নেয়। ঠিকই আছে।

সেবারের শীতে মামণির ঠান্ডা লেগে গেল। প্রথমে খুশখুশে কাশি। কাশিটা বাড়ছে। তারপর জ্বরও এল। আমি মাকে বললাম—মা, মামণিকে আর নীচে শোওয়াব না।

—মানে? কেন? মা অবাক স্বরে বলল—কোথায় শোবে তবে?

আমাদের বিরাট বাড়িটায় চারটে বড়ো বড়ো ঘর। সাজানো-গোছানো পড়ে থাকে। নিয়মিত ঝাড়পোঁছ করা হয়। মাকে বললাম—আমি তো এখন তোমার পাশে শুই। আমার ঘরটা পড়েই আছে। ওখানেই ও খাটে শুক। ঠান্ডাটা ভালোই লেগেছে।

মা ক্ষুব্ধ হয়ে বলল—বললেই হল একটা কথা! আমার ঘরে থাকবে না তো কোথায় থাকবে? আমাকে রাতবিরেতে দেখবে কে?

—সে তো আমি আছিই তোমার পাশে, মা! তুমি তো রাত্তিরে ওঠোই না। দরকার পড়লে ওকে ডেকে নেওয়া যাবে। শোনো, আমার ঘরটা ওকে ছেড়ে দি।

—তোর এই সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি আমার ভালো লাগে না মিষ্টু! কাজের আয়া শেষে আলাদা ঘরে খাটে শোবে!

—কেন, অসুবিধেটা কোথায়?

—যা পারিস কর। যা করবি পড়ে থেকে দেখতে হবে। লাই দিয়ে মাথায় তুললে তখন কী হবে ভেবে দেখো। মা অন্যদিকে ফিরে শুলো।

আমি মামণিকে ব্যবস্থা করে দিলাম। মামণি কৃতজ্ঞ মুখে হাসল। আমার অদ্ভুত লাগছিল। মামণি মায়ের শরীরের দিকে খেয়াল রাখে, সেই সঙ্গে আমারও। আমারও কি ওর খেয়াল রাখার কথা নয়? দায়িত্ব নয়?

মামণির নতুন গৃহপ্রবেশ ঘটল। আমি নিজের হাতেই বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় বদলে দিলাম। ভালো লাগছিল। এবার মামণির শরীরটা ঠিক হলে নিশ্চিন্ত হই। মনে হল এর সঙ্গে আমার দয়াদাক্ষিণ্য নয়, বেশ খানিকটা স্বার্থপরতাও জড়িত। মামণি সেরে না উঠলে মুখের সামনে ঠিকঠাক খাবারটা ধরে কে, একশোবার চা-ই বা করে দেয় কে!

মামণি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু ও এখনও ওই ঘরেই শোয়। আমার আপত্তি নেই তাতে। সেখানেই ব্যাপারটা শেষ হল না। ঘরটা আমার ঘর থেকে মামণির ঘর হয়ে উঠল। প্রথম প্রথম আমিই বলতাম মামণির ঘর। মামণি তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে দিয়ে বলত—আমার ঘর আবার কী? বলো মামণি যে ঘরে শোয় সেই ঘর।

আমি বলতাম—ওরে বাবা, অতগুলো শব্দ খরচ করতে হবে? তার থেকে আমি যা বলি সেটাই সহজ।

ক্রমে ব্যাপারটা মামণিরও অভ্যাস হয়ে এল। আমি কোনো কারণে ওই ঘরে ঢোকার আগে মামণি ঘরে থাকলে বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করতাম—মামণি আসব?

মামণিও বলত—আরে এসো এসো! জিজ্ঞেস করো কেন! তোমার ঘরে ঢুকতে হবে আমার পারমিশন নিয়ে! এ মেয়ে সত্যি পাগল আছে।

—না না, তুমি হয়তো কোনো কাজটাজ করছ, হয়তো কাউকে ফোন করছ।

—ফোন আবার করব কাকে? আমার কোনো লাভার-টাভার নেই যার সঙ্গে প্রেমালাপ করব।

—হা হা হা। না, আমি তা বলিনি। আসলে এটা ছোটোবেলার অভ্যাস। মায়ের শিক্ষা। যখনই কারও ঘরে ঢুকবে, অনুমতি নেবে। আমার ছোটোবেলাতেও মা আমার ঘরে ঢুকতে গেলে পারমিশন নিত।

—আহ্! মায়ের সত্যি কোনো তুলনা নেই। আমি কাছে কাছে থাকি তো। বসে বসে দেখি। যেটুকু দেখি, বুঝি মানুষটার এখনো কী ব্যক্তিত্ব, কী বুদ্ধি! বিবেচনা-তোমাকেও তেমন গড়েপিটে তৈরি করেছেন মা। মা এমন যার, তার মেয়ে মরীচিকা সেন তো হবেই।

—যাঃ!

—কী হল?

—আমি যেন কেন এঘরে এসেছিলাম সেটাই ভুলে গেছি।

—হা হা হা, কেন আবার, তোমার বইয়ের তাক থেকে বই পাড়তে নিশ্চয়ই।

—হুমমমম, বই, ঠিক, কিন্তু কোন বই!

—সে আর আমি কী বলব মামণি!

—মনে পড়ছে না। ধ্যাৎ, মামণি চা দাও। মাথাটা জ্যাম হয়ে গেছে।

—একটু রেস্ট নাও। সকাল থেকে লিখেছ। এক্ষুনি চা আনছি।

—তুমিও নিও কিন্তু। একা একা চা খেতে একটুও ভাল্লাগে না।

—আচ্ছা। বেশ মামণি বেশ। চায়ের সঙ্গে কী দেবো?

—কিছু না, শুধু চা।

—পনেরো মিনিট সময় দেবে?

—কেন গো?

—ফ্রিজে ফুলকপি আছে। চট করে পকোড়া করে আনি?

—ওমা! পকোড়া! কী দারুণ! পারবে?

—ফিফটিন মিনিটস।

পনেরো মিনিটের সামান্য পরেই মামণি ঘরে ঢুকল ট্রে-তে ধূমায়িত চায়ের কাপ আর ফুলকপির পকোড়া নিয়ে। আমি অবাক হয়ে বললাম— আরে এসো এসো, কী দুর্দান্ত ব্যাপার! তুমি এসবও জানো নাকি!

—আগে খেয়ে দ্যাখো কেমন হয়েছে। তবে একটু ওয়েট করো। খুব গরম।

চমৎকার পকোড়া। আমার বিস্ময়বোধ কাটতে সময় লাগছে। মামণি বলল—তুমি কী কী খেতে ভালোবাসো আমায় বোলো মামণি। আমি করে দেব।

সেই থেকে কত কিছু যে শুরু হল বাড়িতে। গাজরের হালুয়া, রাঙাআলু পোড়ার চাট, দইবড়া, মোহনভোগ, রাবড়ি, রসমালাই, রসবড়া। সেই রূপকথার হাঁড়ির মতো। যা ইচ্ছে হয় হাঁড়িকে বললেই হত, হাঁড়িতে তৎক্ষণাৎ সেটা তৈরি হয়ে যাবে। আমি মামণিকে বললাম—গুপী গাইন বাঘা বাইন দেখেছ? সেই ভূতের রাজার কাছে যা খেতে ইচ্ছে হয় চেয়ে দুজনে হাতে হাতে তালি বাজালেই খাবার হাজির?

—হ্যাঁঅ্যাঅ্যা...সত্যজিৎ রায়ের বই। স্বামীর সঙ্গে ছেলেমেয়েকে নিয়ে দেখতে গেছিলাম।

—হ্যাঁ, তবে সিনেমাটা সত্যজিৎ রায়ের হলেও বইটা ওনার দাদু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর। যাঁর ছেলে, মানে সত্যজিতের বাবা হলেন সুকুমার রায়। সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল পড়েছ?

—পড়িনি আর! তবে ওই একটাই বই পড়েছি। উনি তো আরও বই লিখেছেন...আরে! ও হ্যাঁ তো, হযবরলও পড়েছি।

মামণির সঙ্গে আমার কথাবার্তার স্তর দেখে আমি বিস্মিত হয়ে থাকি। তথাকথিত 'কাজের লোক'-এর সঙ্গে সিনেমা ও সাহিত্যের আলোচনা! এও সম্ভব! কথাটা বলেই ফেললাম—মামণি?

মা যখন ফিরল, মামণি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। মুখে কোনো আনন্দের ছাপ নেই।

—উঁ?

—তুমি এত জেনে শুনে এমন জীবন কাটিয়ে শেষে এখানে...এভাবে...

—আয়ার কাজ করছি কেন?

—হ্যাঁ...মানে...

—মানে আর কী মামণি, মানে আমার কপাল। তবে কপাল খারাপ তাই বা বলি কীসে? প্রথম কাজে নেমেই তোমাদের বাড়িতে আসা।

মরীচিকা সেনের বাড়ি। কত বড়ো লেখক। আমার কি কম সুকৃতি! আমি তো এখানেই থেকে যাব। মরার আগে অবধি।

—ওসব বড়ো লেখক-টেখক বাজে কথা ছাড়ো। তোমাকে পাওয়াটা আমাদেরও কপাল। তোমার যত্নে মা-ও তো ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে।

—সবই ভগবানের ইচ্ছা মামণি। জানো তো, বাড়িতে আমার গোপাল ছিল। এখনও আছে। মেয়ে সেবা করে। গোপাল যা করে মেনে নিতে হয়, তবে না ভক্তি!

এবার আমি প্রমাদ গুনলাম। এই রে, সাহিত্য-সিনেমা থেকে এবার কি অধ্যাত্মবাদ! সেরেছে! আর যে বইটা নিতে এসেছিলাম, সেটাও মনে পড়েছে। জীবনানন্দের গল্পসমগ্র। অনেক আড্ডা হয়েছে। বললাম—যাই মামণি, লেখা পড়ে আছে।

আমারও মনে হয়, মামণিকে আরো আগে পেলে ভালো হত। মায়ের সি ও পি ডি অনেক দিনের। মাঝেমাঝেই মাথাচাড়া দেয়। এবারও সেই আক্রমণ। শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, নার্সিংহোম। অক্সিজেন, নেবুলাইজার। অন্যান্যবার আমিই সামলে দিই। এবার আর পারলাম না। মামণিকে রাখতে হল। মা এখন অনেকটা ভালো। কিন্তু পরের ব্যাপারটা অভাবিত।

জ্বর এসেছিল। না, করোনা নয়। লকডাউন শিথিল হয়েছে। টুকটাক সভা-টভা শুরু হয়েছে। সামান্য জ্বর ভেবে মিটিং-এ গেছিলাম। ফিরলাম যখন, ধুম জ্বর। সেই সঙ্গে মাথা ঘোরা। রাত্রিবেলা বাথরুম পেয়েছে। পটি। আমাদের দুটো বাথরুম, একটাতে কমোড অন্যটাতে ইন্ডিয়ান স্টাইল। আমি কমোড ব্যবহার করি। উঠে দেখি কমোডের টয়লেটটা বন্ধ। মা গেছে। মামণিকে কাছেপিঠে দেখা গেল না। কিন্তু তখন আর অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর অবস্থা নেই। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না, ভীষণ বেগ এসেছে, মাথাও ঘুরছে। আমি অন্য টয়লেটটায় ঢুকলাম। জ্বরের ঘোরে ছিটকিনিটাও দিইনি। ভাগ্যিস দিইনি। প্যানে বসেই অজ্ঞান। মা বাথরুম থেকে বেরিয়েছে, শুতেও চলে গেছে। নিশ্চয়ই খেয়াল করেছে পাশে আমি নেই। মায়ের মন। অনেকক্ষণ হয়ে গেল আসছি না দেখে একাই উঠেছে, একাই ডেকেছে। সাড়া না পেয়ে দরজা ঠেলে দেখে আমি প্যানের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছি। মা নিশ্চয়ই মামণিকে চিৎকার করে ডেকেছে। মামণির সম্ভবত আসতে একটু দেরিই হয়েছিল। তার মধ্যে, মা তো, নিজেই অশক্ত শরীরে আমাকে তুলতে গেছে। ব্যস, কোমরে চোট। শিরদাঁড়াটি গেল ভেঙে। তার সঙ্গে আবার প্রবল শ্বাসকষ্ট।

আমাকে নার্সিংহোমে ভর্তি হতে যেতে হয়নি, মাকে ভর্তি করাতে নিয়ে যেতে হল। ক্রিটিকাল পজিশন। রোজ যাওয়া-আসা। মা-কে নিয়ে গভীর উদ্বেগেরও তলে কী একটা যেন আমার মনে হত। চেনা নার্সিংহোম। আমি সারাদিন মায়ের কাছে থাকতে পারি। সকালে বেরিয়ে যাই, সন্ধে পেরিয়ে ফিরি। যাওয়ার সময় মামণি দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলে—দুগ্গা দুগ্গা জয় শ্রীধর। কিন্তু ফিরে এলে একবারও জিজ্ঞেস করে না মা কেমন আছে। বাড়ি এসে জামাকাপড় কেচে স্নানটান সেরে বাথরুম থেকে বেরোলে হাসিমুখে বলে—আজ কী বানিয়েছি বলো তো মামণি?

আমি ক্লান্ত বিষণ্ণ গলায় বলি—বলো।

—গাজরের হালুয়া। তুমি এত ভালোবাসো। আজই সকালে গাজর কিনলাম। ভাবছি কতক্ষণে তোমায় খেতে দেবো।

—আমার খাওয়ার ইচ্ছে নেই। শুয়ে পড়লাম। আমাকে ডেকো না।

আমি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। একটু পরেই শুনতে পেলাম, মামণি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করল। নিজেও কিছু খেলো না বোধ হয়। হ্যাঁ, মামণি এখন নিজের ঘরের দরজা লাগিয়ে শোয়। আজকের আওয়াজটা কি একটু জোরে হল?

মা এতদিন নার্সিংহোমে আছে, একই রান্না মুখে আর রোচে না। অর্ধেকেরও কম মুখে তোলে। আমি বললাম—বাড়ি থেকে কিছু নিয়ে আসব? কী খেতে ইচ্ছে হয় বলো?

—সেদ্ধভাত খেতে ইচ্ছে করে। আলুসেদ্ধ ডিমসেদ্ধ আর ঘি কাঁচালংকা। সুজাতাকে বলিস করে দিতে।

আমি বাড়ি এসে মামণিকে বললাম। পরদিন সকালে মামণি মায়ের খাবার টিফিন ক্যারিয়ারে গুছিয়ে দিল। নার্সিংহোমে গিয়ে মাকে দিতে গিয়ে দেখি ভাত ডিমসেদ্ধ ঘি লংকা সব ঠিক আছে, কিন্তু আলুসেদ্ধর বদলে আলুর ভর্তা। মা নাক কুঁচকে বলল—উফ রসুনের গন্ধ! ভাল্লাগে না। আমি সিম্পল আলুসেদ্ধ চেয়েছিলাম।

বললাম—তাই তো বলেছিলাম মামণিকে। টিফিন ক্যারিয়ার খুলে আর দেখা হয়নি।

মা ক্ষুব্ধ স্বরে বলল—ও বেশ বাড়ির গিন্নি হয়ে বসেছে, না? আমি বাড়ি যাই, ও বুঝবে ও গিন্নি নয়, গিন্নি আমি। আমি যা বলব তাই হবে। ওর ইচ্ছেমতো সংসার চলবে না।

সেদিন একটা আরো অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। বাড়ি ফিরতেই মামণি বলল—মাসিমা কেমন খেলো?

—ভালো।

—তোমার জন্য আজ কী করেছি বলো তো?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। মামণি নিজেই বলল—পাটিসাপটা। কটা দেবো?

—খাবো না। শুয়ে পড়ছি।

অতঃপর সশব্দে ফ্রিজ বন্ধ। এবং তারপর আরো সশব্দে দরজা বন্ধ।

আমার অবাক লাগে। যার জন্য মামণিকে রাখা, সেই মায়ের জন্য কোনো উদ্বেগ নেই। চিন্তা নেই। মানুষটা কবে বাড়ি আসবে ভাবা নেই। আর আমার জন্য ভালোমন্দ খাবার বানিয়ে যাওয়া। ও কি একা একা বাড়িতে আমি কী ভালোবাসি ভেবে ভেবে খাবার বানিয়ে যাওয়াটা খুব উপভোগ করছে? এমনকি চাইছে এই সময় যেন দীর্ঘায়িত হয়! আচ্ছা, ও কি আসলে চায় না মা আর বাড়ি ফিরুক!

আমার মনে পড়ে, এর মধ্যে, মা এবার নার্সিংহোম যাওয়ার আগে, মামণির আরেকবার জ্বর হয়েছিল। আমি কপালে ওডিকোলনের জলপটি দিতাম। দু-বেলা খাইয়ে দিতাম। মামণি বলেছিল—তুমি আমার মা?

আমি হেসেছিলাম। মামণি বলেছিল—আমি মরে গেলেও তোমাকে ছেড়ে যাব না।

—আচ্ছা। এখন কথা নয়। চুপ করে শুয়ে থাকো।

—মামণি? এই যে আমি শুয়ে আছি, কোনো কাজ করতে পারছি

না, বাড়ি যাব যে, সে তো লকডাউন, বলো সেজন্যে আমাকে তাড়িয়ে দেবে না তো?

মনে হল মামণি একটু একটু ভুল বকছে। বললাম—না। আর কথা নয়। এবার চুপ। চোখ বন্ধ করো।

—আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি মামণি, আমার পেটের মেয়ের চাইতে বেশি।

—আমিও তোমাকে খুব ভালোবাসি।

—সত্যি?

—সত্যি। ঘুমনোর চেষ্টা করো।

মামণি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুলো। ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আমিও পাশ থেকে উঠে এলাম।

সেইসব কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে ভালো লাগে না। আমার প্রতি এত টান, যাকে যত্ন করা ওর দায়িত্ব, ক্রমশ সেই কাজেই যেন দিন দিন কেমন উদাসীন হয়ে পড়ছে।

মা বাড়ি ফিরল। এখনও খুব দুর্বল। এবং নড়াচড়া একেবারে রেসট্রিকটেড। জানলা খুলে শুয়ে শুয়ে প্রকৃতির শোভা উপভোগ করুন, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিন। ভাগ্যিস এখন বয়স্ক মানুষদের জন্য ডায়াপার বেরিয়েছে। সেটা নষ্ট হলে খুলে ফেলে নতুন একটা পরিয়ে দেওয়াই শুধু। বেডপ্যানের দরকার নেই। এতদিন মা নিজেই বাথরুমে যেত। এখন নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়েছে বলেই ডায়াপারের ব্যবস্থা। নোংরা ঘাঁটতে হবে না। শুধু হাত দিয়ে ডিসপোসেব্‌ল প্যাকেটে পুরে মেথরকে, যে রোজ বাথরুম পরিষ্কার করতে আসে, তাকে দিয়ে দেওয়া।

মা যখন ফিরল, মামণি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। মুখে কোনো আনন্দের ছাপ নেই। একটা মানুষ এতদিন পর নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরেছে, তাকে স্বাগত জানানোর খুশি নেই। মা-ই বলল—কী সুজাতা? কেমন আছ?

—আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?

—একটু ভালো না হলে কি আর বাড়ি ফিরি। আয়ু আছে আর কি। আবার তোমাকে জ্বালাতে এলাম।

এবার আমি কড়া গলায় বললাম—জ্বালানো আবার কী? মামণিকে তো রাখাই হয়েছে তোমার দেখভাল করতে। এতদিন তেমন দরকার পড়েনি তাই। এবার ক-দিন দরকার পড়বে। করতে তো হবেই।

দরজার সামনে থেকে মামণি চলে যাচ্ছিল। আমি বললাম—কী হল মামণি, ধরো? মাকে ঘর অবধি নিয়ে যেতে হবে তো। বিছানায় শুইয়ে দাও। জামাকাপড় ছাড়িয়ে গা-হাত-পা মুছিয়ে দাও। এসবগুলো করতে হবে তো, না কী?

সেই রাতে মা ঘুমোনোর আগে ডাকল—সুজাতা!

মামণি নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। ঘর থেকেই গলা তুলে বলল—কী, বলো।

—একটু কাছে এসো, চেঁচাতে পারছি না।

মামণি এসে দাঁড়াল। মা বলল—আজ থেকে আর দরজা দিও না। কখন কী দরকার পড়ে বলা তো যায় না।

মামণি মায়ের মুখের ওপর বলল—মানে? সারাদিন কাজ করে রাত্তিরেও একটু শুতে পাব না?

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মা বলল—সে কী, তোমার কাজই তো তাই! এছাড়া কোনো কাজের জন্য তো তোমায় রাখা হয়নি?

—না, আমি দরজা বন্ধ করেই শোবো। আমারও তো শরীর ভালো না। আমার ঘুম প্রয়োজন। বলেই ও চলে গেল।

আমি আর মা পরস্পরের দিকে হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। মা ক্রুদ্ধস্বরে আমাকে বলল—দ্যাখ লাই দিয়ে কোথায় তুলেছিস। আলাদা ঘর! দরজা বন্ধ করে ঘুমাব। রাত্তিরে উঠব না!

আমি ঠান্ডা মাথায় দু-মিনিট ভাবলাম। এটা চলতে পারে না। ডাকলাম—মামণি শোনো!

এবার কাছ থেকেই উত্তর এল—বলো!

—এসো শোনো।

মামণি এল। আমি আস্তে আস্তে কেটে কেটে বললাম—শোনো, কাল থেকে তোমার ছুটি। জামাকাপড় গুছিয়ে নিও। তোমাকে আমরা আর কাজে রাখছি না। এ মাস যদিও শেষ হয়নি, তবু পুরো মাসের মাইনেটাই দিয়ে দেব।

বলে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। খেয়াল করলাম মামণি বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে চলে গেল। ও কি ভাবেইনি আমি ওকে চলে যেতে বলতে পারি! কী আশ্চর্য! এই লোককে নিয়ে আমরাই বা কী করব? ওকে কি আমার পছন্দ জেনে গোকুল পিঠে শিঙাড়া বানাতে রাখা হয়েছে, না মায়ের সেবার জন্যে!

সকালেই ও চলে গেল। ওর ব্যাগ দেখলাম বেশ হালকা। ওঃ, তার মানে ও জামাকাপড় যেটুকু নিজের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল শুধু সেই ক-টাই নিয়ে গেল। এখানে থাকতে ওকে শাড়ি সালোয়ার-কামিজ নাইটি শাল সোয়েটার হুডি ডক্টর্স শু (ওর পায়ে ব্যথা হত বলে), জুতো থেকে আরও অনেক কিছু আমারই দেওয়া। এমনকী আমি ওকে সাজাতাম। জিন্সে, থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্টে, টপে, স্কার্ফে, স্টোলে। সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বময়ী বলে সবেতেই সুন্দর লাগত। গাদাগুচ্ছের ব্যাগ দিয়েছিলাম। সেগুলোও নির্ঘাৎ নেয়নি। শুধু নিজের আনা ব্যাগটাই নিয়ে গেছে।

কেমন একটু মনখারাপ নিয়েই ওর ঘরে, যা আর ওর ঘর নেই, আমার ঘর হয়ে গেছে, সেখানে এসে ঢুকলাম। সত্যিই ও কিছু নিয়ে যায়নি। সব ফেলে রেখে গেছে। আমি কি পরের জন্মে কালীঘাটের কুকুর হব? কেন, আমি তো কিছু ফেরত নিইনি?

আর আমি ওকে ভালোবাসাও দিয়েছিলাম, সেটা ফেরত নিলে কী হবে? ❖

গুপ্তচর

শুভমানস ঘোষ

ভালো মানুষ বলতে যা বোঝায় সজ্জনবাবু ঠিক তাই। তার গায়ের রং ভালো। হাইট ভালো। মুখ-চোখের গড়ন ভালো। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার। আয়পয়ও ভালো। কাজেই শুধু ভালো নয়, অলরাউন্ডার ভালো মানুষ সজ্জনবাবু।

ভালো মানুষ বিধাতার বন্ধু হলেও প্রকৃতির শত্রু। কারণ যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর, তার উপর জাতক্রোধ প্রকৃতির। ভালো মানুষের ভালোত্বকে শিকার করাই তার সবচেয়ে প্রিয় বিনোদন। তার জন্য তাদের দুঃখ-দুর্দশা-অভাব দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। বিপদে ফেলার জন্য, তার সর্বনাশের ছিদ্র বের করতে সব সময় সামনে-পিছনে গুপ্তচর মোতায়েন করে রাখে।

তবে ভালো মানুষের পক্ষে ভরসার কথা এই যে, প্রকৃতি যদি চলে ডালে ডালে, বিধাতা চলে পাতায় পাতায়। গুপ্তচরদের হাত থেকে ভালোকে বাঁচাতে সময় ভালো দেখে, জবরদস্ত দেখে পাহারাদার পাঠিয়ে দেয়।

সজ্জনবাবুর ক্ষেত্রে উপস্থিত সেই রোল পালন করছে তারই স্ত্রী শ্রীময়ী। বিধাতাপ্রেরিত পাহারাদার বলে কথা, ভালো করেই জানে ভালোকে শুধু খারাপ করাই নয়, প্রকৃতির মধ্যে একটা ন্যালাখ্যাপা ভাবও থাকে। যা কিছু গোছানো-সাজানো তাকে অগোছালো করতে না-পারলে তার যেন ঠিক সুখ হয় না।

তাই কষ্ট করে মানুষ ঘরদোর গুছিয়ে রাখলেও কী করে যেন ক-দিন পরেই দেখা যায় ঘরের জিনিসপত্র সব এলোমেলো-বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছে। দু-দিন আগেও যে-ঘরে ঢুকলে শান্তি হত, ঢুকতেই ইচ্ছে করে না। যত গুছোনো লোকই হোক, সকলের ক্ষেত্রে একই গল্প। তাই শুধু গুছোনো ঘর নয়, চরিত্রকেও যারা শৃঙ্খলায় বেঁধে ভালো হয়ে থাকতে চায়, তাদেরও নিষ্কৃতি মেলে না।

সজ্জনবাবুরও মিলল না। রাত করে স্ত্রীর জন্য দোকান থেকে ওষুধ আনতে সবে দরজা খুলে পথে বেরিয়েছে, প্রকৃতির লণ্ডভণ্ডকর চক্রান্তের পার্ট হয়ে বেছে বেছে ঠিক তখনই ভোঁ করে এসে পড়ল একটা বাইক। টুপিতে আর মাস্কে মুখ ঢেকে পিছনের সিটে বসে আছে মুখপোড়া হনুমান। সজ্জনবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চট করে ঘুরিয়ে নিল মুখ। বাইক চলে গেল স্টেশনের দিকে।

মুখপোড়া হনুমানের আসল নাম লোকে ভুলে গেলেও নামের কারণটা ভোলেনি। বোমা বাঁধতে গিয়ে তার মুখটা ঝলসে অবিকল হনুমানের মুখের মতো কালো হয়ে গিয়েছিল। তাতেই শাপে বর হয়েছিল তার। আগে এই অঞ্চলে টুকটাক চুরি-চামারি করত। পালা করে তিনমাস তিনমাস করে ছ-মাস হাসপাতালে আর জেলে কাটিয়ে সাহস বাড়ে তার। নেমে পড়ে তোলাবাজিতে। এই লাইনে যত বদখত চেহারা তত অব্যর্থ আমদানি।

সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার হয়েও সজ্জনবাবু তার হাত থেকে রেহাই পায়নি। তখন রীতিমতো সুদিন মুখপোড়া হনুমানের। লাইনের ওপারে থেকেও এপারটাও কব্জা করে বিশাল রাজ্যপাট গড়ে তুলেছে।

পুলিশকে কলা দেখিয়ে দলবল জুটিয়ে মনের সুখে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সজ্জনবাবু দোতলার উপরে তিনতলা তুলছে দেখে বাড়ি বয়ে এসে জানায়, একলাখ টাকা না-ছাড়লে তিনতলার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের মায়াও ছাড়তে হবে তাকে। একরকম বাধ্য হয়েই টাকাটা বের করে দিয়েছিল সজ্জনবাবু।

সে সময় মুখপোড়া হনুমানের ডানহাত ছিল কানকাটা কার্তিক। বাইশ বছরের তরতাজা যুবক। পেটে সামান্য হলেও বিদ্যা ছিল। মুখপোড়া হনুমানের সঙ্গে থেকে হাত পাকিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল। এপারের দল ভাঙিয়ে নিজেই মাথা হয়ে মুখপোড়া হনুমানকে লাইনের ওপারে ঠেলে দিয়েছিল। তারই পালটা ঠেলায় এক রাতে রেলস্টেশনকে মাঝে রেখে দু-পক্ষে রাতভর ধুন্ধুমার লড়াই লেগে যায়। বোমা পড়তে থাকে মুহুর্মুহু।

কার্তিক বীরদর্পে লড়ে মুখপোড়া হনুমানকে হঠিয়ে ভোর হওয়ার মুখে মুখে এসে হাজির হয় সজ্জনবাবুর বাড়িতে। তার ডান হাতে গুলি লেগেছিল। হাসপাতালে ও নার্সিংহোমে গেলে পুলিশ ধরবে। গুলিভরা পিস্তলটা কোমরে গুঁজে রক্তাক্ত হাতটা দেখিয়ে বলেছিল, "ডাক্তারবাবু গুলিটা বের করে ওষুধ দিয়ে দিন।"

সজ্জনবাবু ভালো মানুষ। ভয় পাচ্ছে দেখে শ্রীময়ী এগিয়ে এসেছিল। অলরেডি অনেক রক্ত বেরিয়ে গিয়েছে। দেরি করলে ছেলেটা মরে যাবে বলে তাকে সাহস জুগিয়েছিল। দ্বিধা ঝেড়ে সজ্জনবাবু লেগে পড়েছিল কাজে। বিনা অ্যানাস্থেশিয়ায় অপারেশন মুখের কথা নয়। দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল কার্তিকের মুখ থেকে একটা "আহ্!" শব্দ পর্যন্ত বেরোয়নি।

গুলি বের করে ভালো করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে উঠে পড়েছিল কার্তিক। সজ্জনবাবুকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজের সিক্রেট মোবাইল নাম্বার দিয়ে বলেছিল, কোনো সমস্যা হলেই যেন খবর দেয় তাকে। মুখপোড়া হনুমানের আমলে যা হয়েছে, কেউ জুলুম করা দূরে থাক, তাকে টাচ পর্যন্ত করতে পারবে না। হনুমানকে ভালো করে টের পাইয়ে দিয়েছে লাইন টপকাতে গেলেই নিজেই টপকে যাবে।

এবার কি সুদে-আসলে তারই ঝাল মেটানোর পালা? ভালো মানুষের মাথা সাধারণত অসম্ভব ঠান্ডা হয়। কিন্তু মুখপোড়া হনুমানকে দেখে কী যে হল সজ্জনবাবুর, হয়ে গেল গৃহিণীর জন্য ওষুধ আনা, পড়ে গেল প্রকৃতির ছেড়ে-রাখা গুপ্তচরের খপ্পরে। চড়াৎ করে মাথায় রক্ত উঠে গেল তার।

একলাখ টাকার জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে পকেট থেকে মোবাইল বের করে কার্তিককে ধরে হনুমানের খবর দিয়ে উত্তেজিত ভাবে জানাল, স্পিডে রান করছে বাইক। মিনিট দশেকের মধ্যেই স্টেশনে পৌঁছে যাবে। হারি আপ। স্টেশন পেরোতে পারলে ওর আর টিকি ছোঁয়া যাবে না।

মস্তান-গুন্ডাদের টিকি ছোঁয়া কঠিন। কিন্তু সজ্জনবাবু তো তা নয়। নিপাট ভালো মানুষ। প্রকৃতির ছলনায় পড়ে তলিয়েও দেখল না খারাপ মানুষ খারাপ কাজ করলে খারাপ ফল হয়। কিন্তু ভালো মানুষ করলে তার চেয়েও খারাপ, তার চেয়েও বিষাক্ত ফল হয়। কিন্তু ততক্ষণে তির বেরিয়ে গিয়েছে হাত থেকে। চৈতন্য ফিরেছে সজ্জনবাবুর। ওষুধ আনতে যাবে সাহসে কুলোল না আর। ঘরে এসে বিড়বিড় করল, "কাজটা ঠিক হল না! কাজটা ঠিক হল না! কেন যে ফোনটা করতে গেলাম কার্তিককে!"

সজ্জনবাবুর সাড়া পেয়ে এসে দাঁড়াল শ্রীময়ী। শুধোল, "কী বলছ আপন মনে? গেলে না ওষুধ আনতে?"

সজ্জনবাবু মাথা নাড়াল, "না। শরীরটা ভালো লাগছে না।"

শ্রীময়ী ব্যস্ত হল, "কী হল আবার?"

কী হল, কেন হল তার উত্তর তখন হাতের বাইরে। সজ্জনবাবু স্পষ্ট ফিল করছিল প্রাণান্ত সংযমের ও কষ্টের মূল্য দিয়ে যে-গুড সোলটাকে এতদিন জাগিয়ে-বাঁচিয়ে রেখেছিল তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। নিট অ্যান্ড ক্লিন করে সাজানো-গোছানো মনের ড্রয়িংটাও ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাচ্ছে। তার জীবনে বিস্ফোরণ আসন্ন।

হুঁ, সেটাই হল। গুপ্তচরের মুখে মুখপোড়া হনুমানের মার্ডারের কারণ জেনেই "এতদিনে বাগে পেয়েছি!" বলে প্রকৃতি ক্ষুধার্ত-মত্ত হস্তিনীর মতো হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল সজ্জনবাবুর সাজানো বাগানে।

দুই

মুখপোড়া হনুমানের পড়াশোনার দৌড় ক্লাস থ্রি ফেল। রেললাইনের একদিকটা কানকাটা কার্তিক দখল করে নিলেও আসল মধু তো সে যে-পারে থাকে সেখানে। বড়ো বড়ো দোকানপাট, শপিং মল, উঁচু উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি, রানিং কারখানার সঙ্গে পরিত্যক্ত কারখানার গোডাউনের ছড়াছড়ি। মাস গেলে হেসেখেলে পঞ্চাশ লাখ টাকা কামাই। সেসব সামলাতে তাকে অনেক কসরত করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়েছে। টিপসই দিতে মানে লাগে বলে তিনদিন ধরে মকশো করে কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং গোছের একটা সিগনেচারও রপ্ত করেছে।

হাইরোডের ধারে নরেশের এলাকায় ব্যাংক। নরেশের আমদানির সোর্স হাইরোডের লরি, আশপাশের মোটর গ্যারাজ, ধাবা, ড্যান্সবার ও গাড়ির ঝাঁ-চকচকে শো-রুমগুলো। তাই তার সঙ্গে মুখপোড়া হনুমানের শত্রুতা নেই। বরং বন্ধু দুজন দুজনের। ব্যাংকে গেলেই একবার করে তার সঙ্গে মোলাকাত করে আসে।

তিনদিন আগে বড়ো কাজ করে লাখ দশ হাতিয়েছিল মুখপোড়া হনুমান। কাজের টোটাল প্ল্যানটা ছিল তারই। কিন্তু তাকে কিছুই করতে হয়নি। যা করার ছেলেদের নিয়ে করেছিল তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী বুলডোজার। খুন-জখমের প্রয়োজনই ছিল না। তা-ও একজনকে পাঁচতলার উপর থেকে বেমক্কা ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে মানুষ খুনের ফিতে কেটেছিল।

সেই টাকা জমা করতেই তাকে নিয়েই কার্তিকের এলাকা এড়িয়ে অনেকটা ঘুরেই ব্যাংকে যেতে দেরিই হয়েছিল হনুমানের। ব্যাংকের কাজ মিটিয়ে নরেশের আড্ডায় ঢুঁ মারতে গিয়েই পড়ে গেল তার চক্করে। তিনজনে মিলে চুটিয়ে মদ-গাঁজার শ্রাদ্ধ করে উঠতে উঠতে দেরি হয়ে গেল। শরীরটাও বেগড়বাঁই করছিল। বুলডোজারের বয়েস কম। সে অবশ্য স্টেডিই ছিল। ওস্তাদ টসকে গিয়েছে দেখে তাকে পিছনে বসিয়ে বাইক উড়িয়ে দিয়েছিল।

রাত হয়ে গিয়েছে। তার উপর শীতটাও ঠেলে পড়েছিল। এই অবস্থায় অনেকটা রাস্তা ঘুরে ফিরতে পাছে আরও দেরি হয়ে যায়, হনুমান বলেছিল, "ঘুরতে হবে না বুল্লু। সোজা চল। ছেলেরা আসবে। যেতে যেতে ধুনকি কেটে যাবে। আড্ডায় গিয়ে আর এক খেপ মস্তি চড়াতে হবে। ফাটাফাটি

কাজ করেছিস। তোকে কোনো শালা আর আটকাতে পারবে না। হারামজাদা কার্তিকটাকে কে বাঁচায় এবার দেখব।"

"সে নয় দেখবে," বুলডোজার গাঁইগুঁই করছিল, "ব্যাটার এলাকা দিয়ে যাবে ওস্তাদ? যদি ধরে?"

"কিচ্ছু হবে না!" বুলডোজারের কৃতিত্বে তখন আলাদা জোশ এসে গিয়েছে মুখপোড়া হনুমানের। বলেছিল, "কেউ চিনতেই পারবে না আমাদের। ভালো করে মুখটা ঢেকে নে! জোয়ান ছেলেটাকে যেভাবে ছাদ থেকে ছুড়ে ফেললি, নীচে পড়ে ফটাস করে মাথাটা ফেটে হাঁ হয়ে গেল, এখনও সিনটা চোখে ভাসছে রে বুল্লু। তোর হবে।"

তা হয়েছিল। তবে বুল্লুর নয়, মুখপোড়া হনুমানের। ভেবেছিল কেউ তাদের চিনতে-দেখতে পারবে না। আরামসে বেরিয়ে যাবে। খুব যে ভুল আইডিয়া করেছিল তা নয়। কিন্তু মুশকিল করল ডাক্তার। তার চোখে পড়ে গেল। বোধহয় তার কাছে খবর পেয়েই স্টেশনের মুখে গাড়ি আটকাল কার্তিকের দল।

রাত গড়ানোয় স্টেশন এলাকাতে লোকজন তেমন ছিল না। থাকলেও মস্তান-গুন্ডাদের তাতে থোড়াই কেয়ার। বুলডোজারকে তোল্লাই দিচ্ছিল। বিপদ দেখে উপযুক্ত শিষ্যর মতো গাড়ি ও তারই তলায় গুরুকেও ফেলে দিল দৌড়। কার্তিকের ফায়ারিং কাটিয়ে টিকিটঘরের পাশ দিয়ে ওভারব্রিজ দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।

শিকার ফসকে গিয়েছে দেখে দাঁতে দাঁত চেপে গালাগালি দিয়ে কার্তিক ঝাঁপাল হনুমানের উপর। একে নেশার ঘোর, তার উপর আস্ত বাইকের নীচে পড়ে চিঁ-চিঁ করছে, তাকে টেনে তুলে কলার চেপে ধরল। হিড়হিড় করে টানতে টানতে রেললাইনের দিকে যেতে যেতে বলল, "চলো বস্! গুরুদক্ষিণা নেবে চলো!"

গুরুদক্ষিণা ভালো করেই দিল কানকাটা কার্তিক। কালেভদ্রে ওয়াগন যাতায়াতের ফোর্থ লাইনে গুরু মহারাজকে ফেলে ধীরেসুস্থে, রয়েবসে কচুকাটা করে শিস দিয়ে দলবল নিয়ে বাইক উড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

মরার পরে দেহ থেকে বেরিয়ে লাশের অবস্থা দেখে মন্দ লাগল না মুখপোড়া হনুমানের। গর্দান পুরো নামাতে না-পারলেও নিখুঁত ভাবে বডি চিরে দিয়েছে আধাআধি। বোম ব্লাস্টে মুখখানা পুড়ে- জ্বলে গিয়েছিল বলে লোকে তার নাম দিয়েছিল মুখপোড়া হনুমান। কিন্তু দলের ছেলেরা তাকে আদর করে বলত জিন্দালাশ। জিন্দা থেকেও লাশ বদনাম কুড়োতে হচ্ছিল। এতদিনে তার পাট চুকেছে। সে এখন মুর্দালাশ।

ততক্ষণে পুলিশ এসে গিয়েছে স্পটে। চিরকালই পুলিশের সঙ্গে মস্তান-গুন্ডাদের লুকোচুরি খেলতে হয়। অভ্যাসবশত আর দাঁড়াল না মুখপোড়া হনুমান। লাশের মায়া কাটিয়ে মুখচোখ না-থাকলেও সাঁ করে মুখ ঘুরিয়ে উড়তে উড়তে চলে এল তার আড্ডাখানায়।

গঙ্গার ধারে কবরখানার জঙ্গলের পোড়োবাড়িতেই বছরখানেক হল ঘাঁটি গেড়েছিল মুখপোড়া হনুমান। সকলকে সে বলে দিয়েছিল রাত দশটার মধ্যে যেন পৌঁছে যায়। কিন্তু গিয়ে দেখল সব ভোঁ-ভাঁ। খবর রটে গিয়েছে। সে নেই হয়ে গিয়েছে শুনে বুলডোজার সকলকে নিয়ে ভেগেছে। দেহটাই যা ভেগেছে, মনটা তো টনটনে হয়ে জেগে আছে। বুক নেই, তা-ও যেন ফেটে গেল হনুমানের।

কত কষ্ট করে ছেলেপুলে জুটিয়েছিল। হাতে ধরিয়ে কাজ শিখিয়েছিল। কার্তিক তাদের কয়েকজনকে ভাগিয়ে নিয়ে গেলেও হাল ছাড়েনি। বুলডোজারকে মনের মতো গড়ে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছিল। ক-দিন পরে তো তোরই রাজত্ব হত। তর সইল না? গুরুকে ফেলে পালালি? লাখ দশেকের সব ব্যাংকে ফেলেনি। দু-লাখ ইনট্যাক্ট সঙ্গে করে এনেছিল। প্ল্যান করেছিল বুলডোজারের ফার্স্ট মার্ডারকে সেলিব্রেট করতে সারারাত পার্টি দেবে। পার্টিই হাওয়া!

যত নষ্টের গোড়া ব্যাটা ডাক্তার। এত কামাই, তা-ও সামান্য একলাখ টাকার শোকে বুক ফেটে মরে যাচ্ছিল! ডাক্তার হয়ে তোলাবাজের খোচর বনে গেলি! দেখাচ্ছি মজা! হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিচ্ছি মরার পরেও মস্তান-গুন্ডারা কতটা খতরনাক!

হুঁ, হাড়ে হাড়ে না-হলেও ঘাড়ে পড়েই মুখপোড়া হনুমান মজা বুঝিয়েই ছাড়ল সজ্জনবাবুকে।

ঠিক তখনই ভোঁ করে এসে পড়ল একটা বাইক।

তিন

দিনদশ পরের কথা। রাত এগারোটা বেজে গিয়েছে। বাড়ি ফেরার নাম নেই সজ্জনবাবুর। শ্রীময়ী উদ্বেগে ছটফট করছে। ঘরে পায়চারি করছে আর থেকে থেকে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। ভাবছে এই বুঝি দরজার ডোরবেলটা বেজে উঠল, সজ্জনবাবু ফিরল। কিন্তু অপেক্ষা আর ছটফটানিই সার হচ্ছিল। টেনশনে শীতেও গলায় ঘাম জমছিল তার।

শ্রীময়ীর টেনশনের কারণ ফিরতে রাত করা শুধু নয়, কিছুকাল ধরে লক্ষ করছে রকমসকম একদম বদলে গিয়েছে সজ্জনবাবুর। চেম্বার করা, রুগি দেখা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছে। সকাল হলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। দুপুরে কখনও ফেরে, কখনও নয়। ফিরলেও খেয়ে-দেয়ে আবার বেরিয়ে যায়।

বাড়িতে থাকলেও সব সময় কেমন একটা অস্থির ভাব। থেকে থেকে পিছন ফিরে কী যে দেখে কে জানে! আগে মুখের মধ্যে একটা

ভদ্র-সৌম্য ভাব ছিল। কয়েকদিনের মধ্যে পালটে গিয়ে চোখদুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ও কোটরাগত হয়ে মুখখানাই চোয়াড়ে মেরে গিয়েছে। গালের দু-পাশে জেগে গিয়েছে পোড়া পোড়া দাগ।

শ্রীময়ী স্কিন ডিজিজ ভেবে ডাক্তার দেখানোর কথা বলতে সজ্জনবাবু উড়িয়ে দিয়েছিল, "একে বলে পোড়খাওয়ার দাগ। বয়েস হচ্ছে না?"

মন মানেনি শ্রীময়ীর। বলেছিল, "কী এমন বয়েস তোমার? সবে পঞ্চাশ। ভালো লাগে না বলে চেম্বার করাও ছেড়ে দিলে। তোমার কী হয়েছে ঠিক করে বলো তো?"

"কী আবার হবে?" উত্তরে চমকে পিছনে চেয়ে সজ্জনবাবু বলেছিল, "অনেক পেশেন্ট দেখেছি। ছেলে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তার উপর কোভিড নাইনটিন পিরিয়ড। পেশেন্ট দেখতে গিয়ে ফুটে গেলে কি ভালো লাগবে তোমার?"

ফুটে গেলে! এ কী কথার ছিরি! খটকা লাগলেও "ঠিক আছে! ঠিক আছে!" বলে শ্রীময়ী মেনে নিয়ে প্রশ্ন করেছিল, "ডাক্তারি নয় না-ই করলে, বাড়ি কী দোষ করল? সারাদিন ধরে কোথায় ঘোরো কে জানে। দিনকাল ভালো নয়। শুনেছ তো স্টেশনে মুখপোড়া হনুমানকে কুপিয়ে মেরেছে?"

"অ্যাঁ! তুমি জানলে কী করে?"

"জানব না?" শ্রীময়ী বলেছিল, "সকলেই জানে। টিভিতে শোনোনি, অপোনেন্ট পার্টির কার্তিকই মেরেছে।"

আচমকা সজ্জনবাবুর চোখ ধকধকিয়ে উঠেছিল, "সবাই জেনে গিয়েছে? আর জানবে না। এককোপে ধড়-মুন্ডু আলাদা হয়ে যাবে। কেউ জানতেই পারবে না। যাবে কোথায় বেটাচ্ছেলে?"

সজ্জনবাবু বিশ্রী গাল পাড়তে শুরু করেছিল কার্তিককে। হাবভাব শুধু নয়, সজ্জনবাবুর মুখের ভাষার শোচনীয় হাল দেখে ভয়ে বুক গুড়গুড় করে উঠেছিল শ্রীময়ীর। আর ঘাঁটায়নি সজ্জনবাবুকে। চুপ মেরে গিয়েছিল।

কিন্তু আজ আর চুপ করে থাকতে পারল না। আরও আধঘণ্টা তাকে টেনশনে ভুগিয়ে দরজার বেল বাজতেই ছুটল। রাত হয়েছে। তাই নিশ্চিন্ত হতে দরজার কাছে গিয়ে হাঁকল, "কে?"

উত্তরে বাইরে থেকে জড়ানো গলায় সাড়া এল, "দরজাটা খোল না বে!"

শ্রীময়ী ধাক্কা খেল, "তুমি?"

"তবে কি তোর নয়া ভাতার? গলা শুনে বুঝতে পারছিস না? নখরা হচ্ছে, অ্যাঁ?"

সজ্জনবাবুই সন্দেহ নেই। গলা আর ভাষা শুনেই বোঝা যাচ্ছে মদ খেয়ে এসেছে। ডাক্তারি করার সময় মদের উপর রীতিমতো জাতক্রোধ ছিল তার। কোনো রুগি চিকিৎসা করতে এলে মুখের উপর শুনিয়ে দিত তার যদি মদ্যপানের অভ্যাস থাকে, তা হলে হয় মদ ছাড়তে হবে, নয় অন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

অনেক সহ্য করেছে শ্রীময়ী। আর পারল না। ঘটাং করে দরজা খুলে রাগে ফেটে পড়ল, "কী ভেবেছ তুমি? শেষে মদও গিলতে শুরু করেছ!"

সজ্জনবাবু টলছিল। গা দিয়ে উৎকট গন্ধ ছাড়ছিল। এই শীতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম মুখে। তাড়াতাড়ি দরজাটা ধরে পালটা গলা তুলল, "বেশ করেছি। কবে থেকে হারামিটার জন্য স্টেশনে ডিউটি মারছি। শালাকে আজ পেয়েছিলাম। একাই ঘুরঘুর করতে করতে কালভার্টের তলা দিয়ে সটান ওপারে চলে গিয়েছিল। ভাবছি যাই, মালটা এলাকায় ঢুকেছে, দিয়ে আসি খবরটা বুল্লুকে, হঠাৎ বাইকের মুখ ঘুরিয়ে ধাঁ!"

"কে? কার কথা বলছ?"

"কে আবার? বজ্জাত কানকাটা কার্তিক।"

শ্রীময়ীর মাথা ভোঁ-ভোঁ করে উঠল, "এসব কী বলছ তুমি! রোজ সকালে উঠে তোলাবাজদের চর হয়ে তাদের বেগার খাটতে যাও? তুমি না ডাক্তার!"

"ডাক্তার!" সজ্জনবাবু মারমুখী মেজাজে বলল, "কেন ডাক্তার গুন্ডাদের টিকটিকি হতে পারে না? এত এত টাকা কামাই, মাত্র একলাখ টাকার দুঃখও সইল না চামারটার! মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দিল। নে শালা তুইও ভোগ! তোর ভালোমানুষির সব রস টিপে বের করে তবে ছাড়ব! খোচরগিরির শখ জন্মের মতো ছুটিয়ে দেব।"

মাথা আরও ঘুলিয়ে গেল শ্রীময়ীর। হঠাৎ করেই তার মনে পড়ল সেদিন রাতের কথা। ওষুধ আনতে গিয়ে সজ্জনবাবুর ফিরে আসা, অস্বাভাবিক আচরণ, আর তারপর থেকেই তার বদলে যাওয়া।

"কার কথা বলছ?" শ্রীময়ী ভেঙে পড়ল, "কার এতবড় সর্বনাশ করেছ?"

আচমকা বিকট হাসিতে ফেটে পড়ল সজ্জনবাবু। এত কুৎসিত ভাবে কোনো ডাক্তার হাসে না। এ তার হাজব্যান্ড নয়। হতেই পারে না। তবে কি মুখপোড়া হনুমান? তার পাহারার ক্লান্তির ফাঁক গলে চড়াও হয়ে মুড়িয়ে খেয়েছে তার সাধের সাজানো বাগান? প্রকৃতির দুষ্ট গুপ্তচরের পাল্লায় পড়ে নিজেও অসহায় ভাবে গুপ্তচর বনে গিয়েছে?

প্রবল কষ্টে বুক এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল শ্রীময়ীর। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড। তার পরেই দেখতে-দেখতে তারও চেহারা আমূল বদলে গেল। সর্বনাশা ক্লান্তি ঝেড়ে জেগে উঠল নতুন করে। সজ্জনবাবুর চোখে চোখ মিলিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। বুক উঠছে-পড়ছে তার। চোখে লকলকিয়ে উঠেছে প্রলয়ের আগুন। গর্জে উঠল, "তুমি যে-ই হও, যাও! আমি আদেশ দিচ্ছি বিদায় হও! গেট আউট!"

বিধাতার খাস সিক্রেট। ফুললি অ্যালার্ট। নিশ্ছিদ্র সিনসিয়ার। সইতে পারল না হনুমান। "যাচ্ছি! যাচ্ছি!" করে বিকট আর্তনাদ করে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। জ্ঞান হারিয়ে পড়ল মেঝেয়। শ্রীময়ী স্বাভাবিক হয়ে গেল। ছুটল জল আনতে। মুখে কয়েকবার জলের ছিটে দিতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সজ্জনবাবু। মুখ একদম পরিষ্কার তার। গালের কালো দাগও মিলিয়ে গিয়েছে। শ্রীময়ীর মুখের দিকে চেয়ে শুধোল, "আমি কোথায়?"

বুকের ক্ষত মিলিয়ে এল শ্রীময়ীর। স্বস্তির শ্বাস ফেলে সজ্জনবাবুকে বিছানায় এনে শুইয়ে বলল, "স্টেশনে নয়, চিন্তা নেই, বাড়িতে। সেদিন আমার ওষুধ কিনতে গিয়ে ফিরে এলে। সব খুলে বলো তো কী হয়েছিল সেদিন।" ❖

গল্প

পরি ও এক ধর্মযোদ্ধার আখ্যান

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

"চমৎকার জায়গা তো! ওখানে যাওয়া..." নিজের মনেই বলে উঠল সে। তার পায়ের নীচে অনেক গভীরে দুলন্ত আকাশের ছবি। এখান থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে হালকা খাঁজের মতো একটা ফাটল এঁকেবেঁকে নেমে গেছে সেই জলের দিকে।

পাশে দাঁড়ানো ছেলেটা মাথা নাড়ল। তার মুখে হালকা ভয়ের আভাস, "পরিওঁ কে চো হ্যায় ভাইয়া..."

পরিদের পুকুর! অদ্ভুত নাম। জায়গাটা থেকে চোখ সরিয়ে চারপাশে ফের একবার তাকিয়ে দেখল সে।

এখানে রাক্ষুসে পিরামিডের মতো পাহাড়গুলো মেঘকুয়াশার আস্তর পেরিয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। ইনফিলট্রেট করে ঢুকে আসবার পর এই রুটে এটাই এদেশের প্রথম গ্রাম। কাছাকাছি গাড়ির রাস্তা প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে। কুড়ি-পঁচিশটা ঘরের এই গ্রামটা থেকে বেরিয়ে সেদিকে নেমে যাওয়া খাড়াই পথটাকে এই মুহূর্তে আলাদা করে চেনা যায় না। বরফের পুরু আস্তর তাকে আশপাশের বরফঢাকা পাহাড়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে গেছে।

ছবি : ইন্দ্রনীল ঘোষ

এখন শীত। জায়গাটার সঙ্গে এদেশের মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ বন্ধ। সভ্যতার মূলস্রোত থেকে অনেক দূরে এ-জায়গাটার ওপরে বছরের এই সময়টা এদের অথরিটির কোনো নজর থাকে না। সেটাই স্বাভাবিক। খুদে পশুপালকদের গ্রাম। শীতের মুখমুখ তার বাসিন্দারা নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। নিরাপদে থাকার জন্য এদের পাথরের বাড়িগুলোর যেকোনো একটাকে বেছে নিলেই হল। সপ্তাহে একবার সাপ্লাই আসে। নিয়ে আসে এখানকারই এক এজেন্ট। খানিক নীচে কাছাকাছি অন্য কোথাও তার বাড়ি। কোথায়, তা সে জানে না। যেমন সাপ্লাই নিয়ে আসা ছেলেটাও জানে না, সে কে, কী তার মিশন। জানানোটা নিয়মবিরুদ্ধ। তাতে একজন ধরা পড়লেও বাকি দলটার কোনো ক্ষতি হবার ভয় থাকে না।

সাপ্লাই! কথাটা মনে হতে মুখে একটা বাঁকা হাসি উঠে এল তার। প্যাকেটের শুকনো খাবার, ওষুধ, প্লাস্টিক পাউচে খানিক মদ আর বসন্ত এলে এদের সমতলভূমিতে নেমে গিয়ে যে এলাকাটায় অপারেশন তার খুঁটিনাটি লেখা কাগজপত্র। এই

ভরা জওয়ানিতে যে-সাপ্লাই আসলে দরকার তার...সে-জিনিস...

এই গ্রামে প্রাথমিক শেল্টার নিতে পাঠাবার আগে তাকে বলা হয়েছিল, এখানে তার আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। শুধু, একটা কথাই কেবল তাকে খোলাখুলি জানানো হয়নি—শীতে এ-গ্রামটা জনশূন্য হয়ে যায়। জানানো হয়নি, আগামী প্রায় দু-মাস এখানে তাকে নির্জন অপেক্ষায় একলা কাটাতে হবে ওই পাহাড় আর বরফকে সঙ্গী করে।

বাকিরা তাদের যার যার শেল্টারে কেমন আছে এই মুহূর্তে কে জানে! হয়তো তাদের জায়গাগুলো এমন নয়! হয়তো এই মুহূর্তে তারা...

তাদের দশজনের দলটাকে এই পর্বতমালার বুকে, দূরে দূরে এমন দশটা এলাকায় পাঠানো হয়েছে। প্রত্যেকের জন্য একটা করে মিশন। বিশেষ এই প্রশিক্ষণে একক আক্রমণের জন্য তৈরি করা হয়েছে তাদের প্রত্যেককে। তারপর ঘোর শীতের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে টার্গেট এলাকার কাছাকাছি একেকটা পাহাড়ি গ্রামে। সেখানে এদিককার এজেন্টদের সাহায্যে কিছুদিন আত্মগোপন করে থেকে তারপর বসন্তে বরফ গললে...

কর্নেলসাব বলতেন, "লোন উলফ্ টেকনিক। একলা একজন মানুষ। অদৃশ্য হয়ে থাকা সহজ। ওদের মধ্যে মিশে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট টার্গেটকে ধরে একটাই অপারেশন। ব্যস। তারপর ছুটি।"

'ছুটি!' কথাটার অর্থ আগে তার কাছে অন্য ছিল। কিন্তু এখন...

এই নির্জন অঞ্চলটায় মাথা গুঁজে অপেক্ষায় থাকতে থাকতে মাঝেমাঝেই বড়ো অস্থির ঠেকে তার। ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দেবার সময় আদর্শের জন্য, ধর্মের জন্য প্রাণ দেওয়াটাকে তুচ্ছ লাগত। প্রশিক্ষণ নিয়ে সশস্ত্র হয়ে এই জায়গাটায় পেনিট্রেশনের সময় যখন প্রতি মুহূর্তে এদেশের সীমান্তরক্ষীদের গুলির আশঙ্কা হচ্ছিল, তখনও সে নিয়ে কোনো ভয় তার মনে আসেনি। কিন্তু এখন...

প্রত্যেকটা দিন যখন তাকে ধীরে ধীরে নিশ্চিত আত্মঘাতের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে পা পা করে, তখন, এই চূড়ান্ত ঠান্ডা, নির্জন অঞ্চলটার পাথুরে একটা ঘরের মধ্যে বসে তার মাথায় একটাই স্বপ্ন, একটাই আকুতি বারংবার ঘুরে-ফিরে ঘা মেরে যায়। একটি নারীদেহ। কবোষ্ণ, সামান্য পৃথুলা...আদর্শের যূপকাষ্ঠে নিজের অস্তিত্বকে স্বেচ্ছায় মুছে দেবার আগে নিজের জীবনকে আরো একটা প্রজন্মে ছড়িয়ে দিয়ে যাবার তীব্র জান্তব আকাঙ্ক্ষায় উন্মাদ হয়ে ওঠে তার শরীর একেকবার।

এখান থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে সামসিপুরা। এই অঞ্চলে এদেশের একমাত্র কলেজ। সদ্য চালু হয়েছে কিছুদিন হল। এই কলেজটাকেই টার্গেট হিসেবে দেওয়া হয়েছে তাকে। কর্নেলের সেই উদ্দীপিত বক্তৃতা তার কানে আসে, "শেষ করে দেবে তুমি ওদের এই শয়তানি শিক্ষার অপবিত্র আখড়াকে। এইজন্য ঈশ্বর তোমাকে নির্বাচন করেছেন। এর জন্য জীবন উৎসর্গ করলে তারপর অনন্ত স্বর্গ, অনন্ত জীবন-যৌবন, অনন্ত উপভোগ।"

"ফিরে চলুন ভাইয়া," পেছনে অপেক্ষায় থাকা ছেলেটা এইবার নীচুগলায় বলে উঠল, "বিকেল হয়ে আসছে। আমায় অনেকটা পথ ফিরতে হবে।"

ফের একবার পায়ের অনেক নীচে ছড়িয়ে থাকা ওই টুকটুকে নীল জলের আয়নাটার দিকে ঘুরে দেখল সে। সে-জলে পাহাড়দের বরফঢাকা চূড়াদের ছায়া পড়েছে। পরপর দুটো দিন মেঘলা, ঠান্ডা আর বরফের পর আজ আকাশ একটু পরিষ্কার হতে ছেলেটা তার সাপ্তাহিক সরবরাহ নিয়ে বরফ ভেঙে এসে পৌঁছেছিল। আকাশ পরিষ্কার দেখে তাকে নিয়ে চারধারটা একটু ঘুরে বেড়াবার জন্য বেরিয়ে এসেছিল সে। কিন্তু এবারে আর দেরি করা যায় না। একটা শ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে সে বলল, "চল।"

"পরিদের পুকুর মানে ব্যাপারটা কী রে?" হাঁটতে হাঁটতেই ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করল সে।

"ওখানে পরিরা আসে সাব। পৌষের দুসরা পৌর্ণমাসীর রাতে।"

"পরি?" একটু হাসি উঠে এল তার মুখে। "মানে সাচমুচ ডানাওয়ালা? হা হা। তুই দেখেছিস?"

ছেলেটা ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে ঘুরে দেখল একবার, "না সাব। দেখব কেমন করে? পরিওঁ কে চো-তে মানুষের যাওয়া মানা।"

"তাহলে জানলি কেমন করে?"

ছেলেটা ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে রইল একটুক্ষণ। বাইরে পাহাড়চুড়োগুলোয় এইবার লাল রং ধরেছে। পুবের দিকে থালার মতো চাঁদটার গায়ে একটু একটু করে রং ধরা শুরু হয়েছে তখন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নিজের লম্বা ডান্ডাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। তারপর দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতে যেতে বলে গেল, "আমরা জানি। চার বছর আগে দুটো পূর্ণিমা পড়েছিল এই পৌষমাসে। সেই দুসরা পূর্ণিমার রাতে আমার বাবা দেখেছিল। সে শিকারি ছিল। দোনলা বন্দুক নিয়ে ঘুরত। দুনিয়ার কোনোকিছুকে ভয় করত না।"

"তো?"

"সে-রাতে এই পাহাড়ের মাথায় বসে ওখানে পরি নামতে দেখেছিল সে সাব। তাদের রূপ দেখে দিমাগ বিগড়ে গিয়েছিল তার। পাহাড়ের খাঁজ ধরে নেমে গিয়েছিল ঝিলের কাছে। সারারাত সেখানে থেকে, তারপর পরদিন সকালে ফিরে এসে পরিদের সঙ্গে আশনাইয়ের গল্প করল। সে অওরতদের মতো সুখ নাকি কোনো মানুষের অওরত দিতে পারে না।"

"তারপর?"

চুপ করে থেকে একটা লম্বা শ্বাস নিল ছেলেটা। তারপর বলল, "ওর দু-মাস বাদে আরেক পাহাড়ে শিকারে গিয়ে বাবা নিখোঁজ হয়ে যায়। খুঁজতে গিয়ে লোকে দেখেছিল, তার কঙ্কালটা বরফের ওপরে পড়ে আছে। আর তিতলির ঝাড় তার গা চুষে চুষে খাচ্ছে..."

একটা অট্টহাসি উঠে এল এবার তার গলা থেকে, "শাব্বাস! বহোত দিলচস্প কাহানি হ্যায় বচ্চে। লে আব চল।"

ছেলেটা উতরাইয়ের বরফের গায়ে লাঠিটা গেঁথে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্তের জন্য। তারপর হঠাৎ ভিতু চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "যানা মত সাব উধর আজ রাত কো। চার বছর বাদে আজ ফের পৌষের দুসরা পৌর্ণমাসী। আজ রাতে মানুষের ওখানে যাওয়া মানা। আজ রাতে ওরা জওয়ান মর্দ পেলে

দিওয়ানা হয়ে যায় সাব। শয়তানি অওরতগুলো...আজ রাতে ওরা মর্দ চায় সাব।"

*　　*　　*　　*

রাত বাড়ছিল। আশ্চর্য মায়াবী রাত। পাথরের ঘরটার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল সে একবার। আকাশে মেঘ নেই আর এক ফোঁটাও। তুষারকণার মতোই দানাদার চাঁদের আলোর ঢল নেমে আসছে সফেদ বরফের বুকে। ঘরে জ্বলতে থাকা খুদে ব্যাটারি ল্যাম্পটার আলো থেকে চোখ ঘুরিয়ে সেদিকে দেখল সে একবার। তারপর ফের তার হাতের ধর্মগ্রন্থটার দিকে মন দিল। মূল পবিত্র ধর্মগ্রন্থটি সে কখনো পড়েনি। এ-বই নাকি সে ধর্মগ্রন্থেরই সরল ব্যাখ্যা। কে জানে! এ-বইটা তাদের সঙ্গে রাখতে হয়। ওর প্রতিটি পাতায় দেওয়া ব্যাখ্যা তাদের বিধর্মীও নাশ করে পৃথিবীতে ঈশ্বরের পবিত্র সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখায়। তাদের শেখায়, সেই মিশনের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারীরা ঈশ্বরের প্রিয় হন। জনহীন পাহাড়ের বিষাক্ত একাকিত্বের মধ্যে এক ওই বইটাই তাকে যা একটু আশা জুগিয়ে চলে। চরম দারিদ্রে বেঁচে থাকা শেষ কথা নয়। দুটো খাবারের লোভে ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দিয়ে মানুষ মারার শিক্ষা, সেই মিশন নিয়ে এই পাহাড়ের মাথায় নির্জনবাস কিংবা তার অন্তে ঈশ্বরের কাজে অজস্র বিধর্মীর জীবন শেষ করে দিয়ে আত্মাহুতিও শেষ কথা নয়। তার পরে ঈশ্বরের সেপাইয়ের জন্য অপেক্ষায় আছে অনন্ত স্বর্গ, অনন্ত ভোগ। সে ভোগের কথা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে বইতে—অনন্ত যৌবন, সুরা, দেবগণিকা...

দেবগণিকা...

শব্দটা একটুকরো আগুনের মতোই তার শিরায় শিরায় তীব্র একটা আবেগ ছড়িয়ে দেয়। কেমন হয় তারা! কে জানে! আচ্ছা, আত্মাহুতির পর, যখন তার আত্মা স্বর্গে গিয়ে পৌঁছাবে...

ক্ষীণ একটা শব্দ হঠাৎ চিন্তার জালটাকে ছিঁড়ে দিল তার। হাসির শব্দ যেন! চমকে উঠে ফের বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল সে। কেউ কোথাও নেই। চাঁদের আলোয় উঁচু-নীচু বরফের স্তূপ হা হা করছে। চারপাশের পাহাড়গুলোর গায়ে, তাদের গায়ে দাঁড়ানো নিষ্প্রাণ স্তম্ভের মতো অন্ধকার গাছগুলোর মাথায়...

ফের একবার শব্দটা উঠল। এইবার আরো খানিক স্পষ্ট। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। তার প্রশিক্ষিত কান শীতের রাতের তনুভূত বাতাসে ওই শব্দটার চরিত্রকে চিনে নিতে ভুল করেনি। মিষ্টি, ধাতব টুংটাং-এর মতো এ-শব্দ কোনো মেয়ের গলার হাসির। কিন্তু...

তাড়াতাড়ি ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল সে। সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

আওয়াজটা ফের জেগে উঠল একবার। না...একটা নয়। অনেকগুলো গলা...

ঘরের মেঝেতে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। আলোটা থেকে সরে গিয়ে তার অন্ধকার কোণে শিকারি শ্বাপদের মতোই গুঁড়ি মেরে বসে সতর্কভাবে কান পেতে সে শোনে। নির্জন পাহাড়ের বুকে হাসির শব্দ উঠেছে। তার চারপাশ থেকে...পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই শব্দেরা ভেসে যায়...ভেসে যেতে যেতে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে, কিন্তু থামে না। এইবার তারা যেন কোনো অজানা গানের সুর হয়ে উঠেছে... কোনো একটানা সুরেলা মন্ত্রের মতোই, নাকি ভ্রমরের ডাক...বেড়ে-কমে, উঠে-নেমে সেই সুরের ডাক চলতেই থাকে তাকে ঘিরে... চলতেই থাকে...

মাদক শব্দগুলো আস্তে

...অবশেষে একসময় শেষ হল সেই আনন্দের ভোজ।

আস্তে তার মনের ওপরে একটা ছায়া ফেলছিল। হাতের ধর্মগ্রন্থ খসে পড়ে গেছে তার। শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অজানা ঝঙ্কার তুলে সেই শব্দেরা তার চেতনায় এক বজ্র টান দিচ্ছিল।

আর অবশেষে, একসময় তার সমস্ত শিক্ষা, তার ধর্মগ্রন্থ, তার ঘরে জমা করে রাখা হিংস্র মারণাস্ত্র, তার মিশন, সেই সবকিছু ভুলে গিয়ে এক শব্দমুগ্ধ পুরুষজীব তার নিয়তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। এ-সুর কোনো পরিচিত ভাষায় পরিচিত ডাক দেয়নি, কিন্তু উপোসি পুরুষের যুক্তিবুদ্ধির বাঁধ দিয়ে সে-আহ্বানের অমোঘ টানকে আটকানো যায় না।

আর তাই একসময় ধীরে ধীরে পাথরের মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সেই অনভিজ্ঞ তরুণ ধর্মযোদ্ধা। সন্তানেচ্ছায় যুবতীজীবের বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া সেই শব্দ-ফেরোমনকে উপেক্ষা করবার মতো শক্তি তার নেই।

শক্ত হয়ে ওঠা বরফ পিছল ছিল। তার গায়ে বারে বারে আছাড় খেয়ে পড়ে সে। আবার পরমুহূর্তেই বহু নীচ থেকে উঠে আসা অনেক কণ্ঠের মিলিত আহ্বান তাকে শক্তি জোগায়। ফের একবার উঠে দাঁড়ায় সে। অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে ফের এগিয়ে চলে বিকেলবেলা দেখা সেই উঁচু এলাকাটার দিকে।

চাঁদের আলোয় আশ্চর্য মায়াবী রূপ ধরেছে মৌন পাহাড়চূড়ার দল। যেন একদল দর্শক, সুদীর্ঘ জীবনে তাদের অজস্রবার দেখা কোনো নাটকের পুনরাভিনয় দেখবার জন্য নিঃশব্দে চেয়ে আছে তাদের মাঝখানে, খাদের গভীরে জেগে থাকা জলরাশির মঞ্চটির দিকে। সেখানে, ওপর থেকে ধেয়ে যাওয়া চন্দ্রশলায় বিদ্ধ নগ্নিকাদের শরীরের ধাক্কায় শান্ত জল তোলপাড় হয়ে উঠেছে তখন। বাতাসে তাদের উচ্ছল হাসির শব্দ ডাক দিয়ে যায় তাকে...

মৌন পর্বতরাজদের নিঃশব্দ দৃষ্টিকে সাক্ষী রেখে, খাদের গায়ের সরু ফাটলটা বেয়ে ধীরে ধীরে সেই ঝিলের দিকে নেমে চলে রূপমুগ্ধ সেই তরুণ। মাউন্টেন ওয়ারফেয়ারে উঁচুমানের প্রশিক্ষণ পাওয়া তার শরীর, এই মুহূর্তে তার মনের সাহায্য ছাড়াই নিছক প্রতিবর্তক্রিয়ায় খুঁজে নিচ্ছে পাথরের গায়ে হাত-পায়ের আঙুল রাখবার প্রায় অদৃশ্য খাঁজদের। তাই বেয়ে পায়ে পায়ে নীচের দিকে নেমে চলে সে। সেখান থেকে উঠে আসা হাসি আর সুরের শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল তার কানে...

...তারা দেখতে পেয়েছে তাকে। নীচে নামতে নামতেই তার খেয়াল হয়, জলের মধ্যে থেমে গিয়ে মাথা উঁচু করে তার দিকে দেখছে তারা। একে একে জল ছেড়ে উঠে এসে ওপর দিকে তাকিয়ে তার উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে ধরেছে সকলে মিলে...তাদের নির্বস্ত্র, নিলাজ টানটান শরীরে লেগে থাকা বিন্দু বিন্দু জলে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে যেন স্বচ্ছ মুক্তোর রাজপোশাক সাজিয়ে দিয়েছে শরীরগুলো ঘিরে...

রাত বয়ে যায়। এবং পাহাড়-ঘেরা সেই নির্জন পরির ঝিলের পাড়ে অস্থায়ী স্বর্গ নেমে আসে যুবকটির শরীর জুড়ে। তার একুশ বছরের অনাহত যৌবন যে নারীশরীরের স্বপ্ন দেখে এসেছে কেবল এতকাল, তার নিবিড় ছোঁয়ায় যে এত সুখ, এত আগুন...সে জানত না।

ঝিলটির পাশে বন্য লতাপাতায় তার বাসকশয্যা পাতা হয়েছে। সেইখানে একে একে তারা আসে...তারপর সুবিশাল ফিনফিনে ডানাদুটি দু-পাশে ছড়িয়ে দিয়ে শান্তভাবে অপেক্ষায় থাকে যুবকটির আদরের। তার সঙ্গিনীরা, যারা তৃপ্ত হয়েছে তার আগে, এবং যারা সে আনন্দের অপেক্ষায় আছে, তারা সকলেই তাদের ঘিরে মোহময় সুর তোলে গলায়। দ্রুত কাঁপিয়ে তোলা ফিনফিনে ডানাদের মিঠে গুঞ্জন সেই সুরের সঙ্গে সঙ্গত করে। সেই জাদুকরি সুর বারে বারে যুবকটির শ্রান্তি মিটিয়ে দেয়, তাকে ফের লোভী, কঠিন ও শক্তিমান করে তোলে অপেক্ষমান পরবর্তী যুবতীর জন্য...

...অবশেষে একসময় শেষ হল সেই আনন্দের ভোজ। শেষরাত্রির অন্ধকারে, ঝিলের ধারে মাটিতে শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়া পুরুষজীবটির দিকে চোখ রেখে বড়ো খুশির হাসি ছড়িয়ে গেল তাদের মুখে। রাত শেষ হয়ে আসছিল। এইবার ফিরে যেতে হবে তাদের। ওই ঘুমন্ত পুরুষজীবটি এই মুহূর্তে তাদের কাছে বড়ো আদরের ধন। অবশ্য শারীরিক প্রক্রিয়াটি তাদের কাছে কদর্য। কিন্তু ওই পথেই পুরুষটির দেহের অযুত-নিযুত কোষের প্রতিটিতে বীজ বপন করেছে তারা, কাল সারারাত ধরে। এইবার, এদের হিসাবে দুটি মাসের অপেক্ষা কেবল...

সন্তর্পণে শরীরটিকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে উঠে দাঁড়াল তারা এইবার। তাদের পিঠের অতিকায় ফিনফিনে ডানার দল স্বর্গীয় কোনো গানের সুরমাখা ঝড় তুলল বাতাসে। অস্তগামী চাঁদের আলোয় রাত্রির মূল্যবান অতিথিকে নিয়ে তারা ভেসে গেল পাহাড়চূড়ায়, পুরুষজীবটির কদর্য ঘিনঘিনে পার্থিব আবাস সেই পাথরের ঘরে। সেখানে তাকে সযত্নে শুইয়ে দিয়ে, তার ঘুমন্ত শরীরকে তারা ঢেকে দিল দুর্গন্ধি পশমের আবরণে। কুৎসিত জীব এরা। কিন্তু...প্রকৃতির নির্বন্ধ। তারা নিরুপায়।

বাইরে সূর্য মুখ বাড়াচ্ছিল পাহাড়ের ফাঁক থেকে। সেইদিকে মুখ করে এইবার সার বেঁধে দাঁড়াল তারা। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল তাদের পিঠের ফিনফিনে মসলিনের মতো ডানারা। তারপর, একসময় নতুন সূর্যের আলো গায়ে মেখে নিয়ে, হাঁটতে হাঁটতে উতরাইয়ের বিভিন্ন বসতির দিকে নেমে গেল তারা। সেইখানে মানুষের ঘরে তাদের আশ্রয়, তাদের নির্বাসন। বরফের বুকে তাদের পায়ের ছাপ পড়ল না।

২

রাতে বরফ ফাটবার শব্দ উঠেছিল। বসন্তের প্রথম পদধ্বনি। আস্তে আস্তে চোখ মেলল সে। বাইরে সকালের আলোয় একটা বদল এসেছে। একটু বেশি উজ্জ্বল যেন। একটু বেশি রঙিন। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বের হয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল সে। জায়গাটার পাশ দিয়ে একটা বরফজমাট নালা বয়ে গেছে নীচের দিকে। সেখানটার ছবিটা একরাত্রেই বদলে গেছে হঠাৎ। বরফজমা সাদাটে ধারাটা হঠাৎ করেই তরল, উচ্ছল। টুংটাং শব্দ তুলে সে ধেয়ে চলেছে নীচের দিকে। চারপাশে ফাটা বরফের ফাঁকে ফাঁকে অজস্র ঘোলাটে জলের ধারা গিয়ে মিশছে সেটার সঙ্গে। ইতিউতি মরা ঘাসে ঢাকা জমি চোখে পড়ে একটু একটু।

সেখানে সবুজ শিষেরা লাজুক মুখে উঁকি মারছে। বসন্ত আসছে!

শরীর জুড়ে পুরোনো তিরতিরে কাঁপুনিটা ফিরে এল ফের তার। সেটা যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা নয়। সকালে উঠে এই বদলে যাওয়া চারপাশটা দেখে খানিকক্ষণের জন্য কাঁপুনিটাকে ভুলে ছিল সে এই যা। প্রায় মাসদুয়েক আগে, পূর্ণিমার রাতে সেই স্বপ্নটা দেখবার পর থেকে ধীরে ধীরে এই কাঁপুনিটাকে টের পেতে শুরু করেছে সে। প্রথমে প্রায় টের পাওয়া যেত না। ভাবত মনের ভুল। কিন্তু তারপর, আস্তে আস্তে সে-ধারণাটা বদলাতে হয়েছে তাকে। যেন তার দেহের প্রত্যেকটা কোষ কোনো অজানা সুরের তালে তালে কাঁপুনি দিয়ে চলে...পতঙ্গের ডানা ঝাপটানোর মতো...

ডানা ঝাপটানো...

চাঁদের আলোয় রামধনুর ঝলক দিয়ে দুলে ওঠা ফিনফিনে মসলিন ডানার দল...

স্বপ্নটা ফের একবার ঝাঁপিয়ে এল তার স্মৃতিতে। তার যুক্তি-বুদ্ধি, তার চেতনা তাকে বারে বারে বুঝিয়েছে সেই পূর্ণিমার রাতে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছিল সে। সে-স্বপ্ন বাস্তব হতে পারে না। কিন্তু তার রক্তমাংস, তার দেহের প্রতিটি কোষে ধরে রাখা সুতীব্র আনন্দের স্মৃতিরা বারংবার তার সেই যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্বাসের পথে বাধা হয়ে এসে দাঁড়ায়। সেদিন সারাটা রাত জুড়ে যারা তাকে স্বর্গসুখ দিয়েছিল, তাদের প্রত্যেকের ধারালো মুখ, তাদের অনিন্দ্যসুন্দর শরীরের প্রতিটি স্মৃতি, উপভোগের প্রতিটি মুহূর্তই তার মনে বজ্রাক্ষরে লেখা হয়ে রয়েছে।

"সাব..."

স্থানীয় এজেন্ট ছেলেটা কখন যেন এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে। এবারে আর তার শরীরের পরিচিত ভারী পোশাকগুলো নেই। বসন্ত এসেছে।

তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে একনজর দেখে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। যাবার সময় হয়েছে। দু-সপ্তাহ আগে শেষবার যখন এসেছিল ছেলেটা তখনই সে সেই খবর দিয়ে গিয়েছিল তাকে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল সে। খানিক বাদে বের হয়ে এল যখন, তখন তার লম্বা শরীর মুসাফিরের আলখাল্লায় মোড়া। হাতে একটা লম্বা লাঠি। বাইরে থেকে দেখলে তাকে এ-অঞ্চলের কোনো সাধারণ মেষপালক ছাড়া আর কিছু মনে হবে না কারো। সামান্যতম সন্দেহও হবে না, ওই নিরীহ আলখাল্লার নীচে সে লুকিয়ে রেখেছে তার ধর্মযুদ্ধের উপকরণ, গণহত্যার ভয়ংকরতম বিস্ফোরক অস্ত্র!

জিনিসগুলো ভারী। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল তার। একটু অবাক লাগছিল বটে। মাত্রই দু-আড়াই মাস আগে, এই ভার বয়ে কত দুর্গম পাহাড় উজিয়ে সে এইখানে এসে পৌঁছেছিল। তখন তো এ-বোঝা তার শরীরে জানান দেয়নি একটুও!

বাইরে বের হয়ে এসে চোখদুটো এক মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হয়ে এসেছিল তার। লাঠিটায় ভর দিয়ে ঘরের সামনে বরফগলা জলে কাদা হয়ে ওঠা পাথরের ওপর বসে পড়ল সে।

এজেন্ট ছেলেটা একটু অবাক হয়েই ঘুরে তাকাল তার দিকে।

"শরীর খারাপ কি সাব?"

বলতে বলতেই তার দিকে চোখ ফেলে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে ছেলেটার চোখদুটো। তার চোখের সামনে থরথর করে কাঁপছিল অতবড়ো শরীরটা।

"কী হল সাব? তুমি..."

কাঁপুনিটা হঠাৎ করেই বেড়ে উঠেছে তার। শরীরের প্রতিটি কোষ যেন একসঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে কোনো পতঙ্গের ডানা ঝাপটানোর মতো। তার শব্দ বাইরের বাতাসে ছড়ায় না, কিন্তু নিঃশব্দ সেই ঝঙ্কারের তুমুল শব্দ একটা ঢেউয়ের মতো আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল তাকে। যেন কোনো অজানা সুরে গান গেয়ে উঠেছে তার শরীর। যেন জন্মোন্মুখ অজস্র শাবক ক্রমাগত ডানা ঝাপটে চলেছে তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে...তাদের মিলিত সুর তার প্রতিটি স্নায়ু, পেশি, রক্তবহা নালিকে কাঁপিয়ে তুলছিল কোনো অজানা সুরে।

অজানা?

স্থবিরের মতো বসে সেই সুরটায় ডুবে যেতে যেতেই তার কেন যেন মনে হয় এ সুর সে চেনে...সেই আশ্চর্য বাস্তব স্বপ্নের নগ্নিকা সুন্দরীরা...মিলনের সুতীব্র মুহূর্তে তাদের ফিনফিনে মসলিন ডানার ঝাপটে বাতাসে ভেসে ওঠা সেই সুর...সে-সুর এবারে তার দেহের কোষে কোষে তাদের অবশ করা নিঃশব্দ আওয়াজ ছড়িয়ে চলেছে।

ছেলেটা এইবার তার কাছে ঘন হয়ে এসেছে। এ-পাহাড়ের অনেক রহস্যকে সে জানে। সে নিরক্ষর। কিন্তু এই নির্জন প্রস্তরভূমিতে বেঁচে থাকবার জন্য জীবনই তাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়েছে। সে-শিক্ষা এসেছে তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, এসেছে বয়স্কদের মুখে শোনা এই পর্বতমালাদের গহিনের অসংখ্য লোককাহিনি, বিশ্বাস আর বুদ্ধির সীমানার বাইরের নানান আতঙ্কের কাহিনি থেকে। মানুষটার শরীরে হঠাৎ গড়ে ওঠা এই কাঁপুনির একটা অন্য অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে আসছিল। একা একা এই পাহাড়ে, পৌষের দ্বিতীয় পূর্ণিমায়, সা-জোয়ান একটা ছেলে...

ওর শরীরের এই কাঁপুনির উৎস সে আন্দাজ করতে পারে। তবে, এ নিয়ে কিছু করবার নেই তার। এ-কাঁপুনি শুধুই একটা পূর্বাভাস। খানিক বাদেই থেমে যাবে তা। অন্তিম মুহূর্তের আরো কিছু দেরি আছে এর...

আবার তারই মধ্যে একটা স্বার্থপর সুখ কাজ করছিল ছেলেটার মনে। এ ভিনদেশি লোক। এ-বছরটা অন্তত, নিজেদের বেরাদরির কাউকে আর প্রিয়জন হারাবার শোকে চোখের জল ফেলতে হবে না।

যুবকের আলখাল্লার পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিল ছেলেটা একবার। তারপর তার মুখের কাছে জলের একটা বোতল ধরে বলল, "খেয়ে নিন সাব। ও কিছু নয়। পাহাড়ের উঁচাইতে মাঝে মাঝে এমনটা হয়। আমাদের সবারই হয়। আসুন...আস্তে আস্তে রওনা দিই, খানিক নীচে নেমে গেলে তবিয়ত আপনি ঠিক হয়ে যাবে।"

আস্তে আস্তে তার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল যুবক ধর্মযোদ্ধা। ছেলেটা ভুল বলেনি সম্ভবত। কয়েক মুহূর্তের তীব্র অস্বস্তির পর এইবারে সত্যিসত্যিই শরীরটা সুস্থির হয়ে উঠছে ফের তার...

তীব্র ঢালে গড়িয়ে যাওয়া বিপজ্জনক পথ আস্তে আস্তে চওড়া হয়ে ওঠে। তার মাঝে মাঝে এবারে মানুষের হাতের ছোঁয়া টের পাওয়া যায়। বিপজ্জনক কোণগুলোতে পাথরের বাঁধুনি। বাতাস এখানে তুলনায় অনেক ঘন। প্রতিটি নিঃশ্বাসে অনেক বেশি স্বস্তি। অনেক আরাম।

আর তারপর...ছোটো একটা টিলা পেরিয়ে এসে, নীচে পাকদণ্ডির মতো পাক খেয়ে নেমে যাওয়া পাথর বাঁধানো পথটার মুখে থেমে দাঁড়াল স্থানীয় এজেন্ট ছেলেটা। খানিক নীচে পথের এক কোণে অপেক্ষায় থাকা একটা ভাঙাচোরা ট্রেকারকে দেখিয়ে বলল, "আমার এলাকা শেষ। সোজা নেমে ওই গাড়িটার কাছে চলে যান সাব। ড্রাইভারকে বলবেন, কেশবগঞ্জে মূর্তি সিং-এর বাড়ি..."

"আমার তো সামসিপুরা যাবার কথা! কেশবগঞ্জে..."

ছেলেটা হাসল, "কোড ওয়ার্ড সাব। বললে আপনাকে ঠিকঠাক জায়গায় পৌঁছে দেবে। সেখানে আপনার আজ রাতের শেল্টারের ব্যাপারে ব্রিফিং-ও করে দেবে। যান সাব..."

বলতে বলতেই পেছন ঘুরে ফের তার পাহাড়ের দিকে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল ছেলেটা। শেষ মুহূর্তে কী মনে করে ফের সে ঘুরে এল যুবকের কাছে। তারপর হাত বাড়িয়ে তার হাতটায় একটু চাপ দিয়ে ফের বলল, "কালকের কাজের জন্য শুভেচ্ছা। আপনার শরীর ভালো নেই। আজকের রাতটা ভালো করে খানাপিনা করে রেস্ট করে নেবেন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

* * * *

কলেজটা খুব একটা বড়ো নয়। ঘনবসতি শহর এই সামসিপুরা। পাহাড় থেকে নেমে এসে সমতলভূমির প্রথম বড়ো বসতি। এদেশ থেকে প্রতিবেশী দেশগুলোর দিকে চলে যাওয়া বাণিজ্যপথের শেষ শহর। দীর্ঘ শীতের পর বসন্তের শুরুতে সে-শহর হাজারো কিসিমের মানুষজনের ভিড়ে গমগম করছে। পাহাড়ি মানুষজনের সংগ্রহ করে আনা পাহাড়ি ফলফুলুরি, মশলা, জীবজন্তুর চামড়ার পসরা বসেছে তার পথের ধারে ধারে। হস্তশিল্প, খাবার দোকান, গণিকালয়, জুয়ার ঠেক এবং অজস্র মানুষের ভিড় সেখানে। জনাকীর্ণ পথের ভিড় কাটিয়ে শম্বুকগতিতে সেই শহর চিরে সীমান্তের দিকে এগিয়ে যায় পণ্যবাহী ট্রাকের সারি।

এই ভিড়ের মধ্যে দিয়েই আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছিল সে। অত ভিড়ের মধ্যে কেউ তাকে দ্বিতীয়বার ফিরে দেখেনি। দেখলে, তার চোখ-মুখ দেখে কারো কারো কৌতূহল হত বইকি। আলখাল্লার আড়ালে ভারী বোঝা সারা শরীরে বেঁধে নিয়ে চলতে-চলতেই তীব্র যন্ত্রণায় শরীরটা বারংবার অস্বাভাবিকভাবে মুচড়ে উঠছিল তার।

আগের রাতে, একটা তীব্র শারীরিক অস্বস্তিতে ঘুম আসেনি তার। আর তারপর ভোরের মুখমুখ যন্ত্রণাটা শুরু হয়েছিল। আশ্চর্য, ব্যাখ্যাহীন একটা যন্ত্রণা। শরীরের প্রতিটি কোষ যেন ফেটে পড়ছে তার আগুনে আক্রমণে। অসহনীয় কাঁপুনিতে তার শরীরটাকে দুলিয়ে তুলতে তুলতেই ভলকে ভলকে বেড়ে উঠছিল সে- যন্ত্রণার তীব্রতা...

কিন্তু তবু, নিজের কর্তব্যপালনের জন্য অবিচল পায়ে তার রাতের আশ্রয় ছেড়ে এবারে পথে নেমেছে সেই ধর্মযোদ্ধা যুবক। তার দাঁতচাপা মুখের ভেতর কাঁপতে থাকা জিভ প্রাণপণে নিজের ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে চলে। আর একটু সাহস, আর একটু সহনক্ষমতার প্রার্থনা জানায় সে তার ঈশ্বরকে। আর তো বেশিক্ষণ নয়!

সামনে, খানিক দূরে, পথের একপাশে দেখা দিয়েছে তার লক্ষ্যবস্তু। একটা তেতলা বাড়ি। এখনো তার রং করা দেয়ালগুলো থেকে নতুনত্বের গন্ধ যায়নি। তার খোলা দরজা দিয়ে হাজারো তরুণ-তরুণীর উজ্জ্বল যাতায়াত। এই মহাবিদ্যালয়ে তারা জ্ঞানের পাঠ নিতে এসেছে।

সেদিকে তাকিয়ে ঘৃণায় ঠোঁটদুটো কুঁচকে ওঠে সেই যুবকের। নিঃসীম দারিদ্রের মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠবার দিনগুলোতে অপ্রাপনীয় আধুনিক শিক্ষা আর সে শিক্ষা পাবার প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে বড়ো লোভের চোখে তাকিয়ে দেখত সে। আর তারপর, পেটের দায়ে সে গিয়ে যোগ দিল সীমান্ত এলাকার ধর্মযোদ্ধাদের গোপন ট্রেনিং ক্যাম্পে। সেখানে তাকে শেখানো হয়েছে, এই আধুনিক শিক্ষা ঈশ্বরদ্রোহী; ঘৃণার বস্তু। সে-ব্যাখ্যাকে তার অপরিণত মন আঁকড়ে ধরতে কসুর করেনি। তাকে ঘৃণা করে নিজের অতৃপ্ত ইচ্ছেটাকে দাবিয়ে রাখবার শক্তি পেয়েছে সে।

আর তাই, এই মুহূর্তে সারা শরীর জুড়ে জেগে ওঠা যন্ত্রণাটাকে তুচ্ছ করে সে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যায় ওই 'শয়তানি শিক্ষা'র প্রতিষ্ঠানকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞাকে সম্বল করে।

* * * *

এখন নতুন বর্ষের ভর্তির মরসুম চলছে এখানে। অজস্র মানুষের ভিড়ে কেউ তাকে সন্দেহ করেনি কোনো। অতি সহজেই ভেতরে ঢুকে এল সে। এর ভেতরের ম্যাপ তার মাথায় গাঁথা। ইউ আকৃতির বাড়িটার দুটো বাহুর সংযোগস্থলে এদের কলেজের অনুষ্ঠানগৃহ। সেইখানে বিস্ফোরণটা ঘটালে তার তীব্র ধাক্কা এর দুটো বাহুকে সহজেই মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারে।

"এদিকে নয়। এদিকে অডিটোরিয়াম। অ্যাডমিশান অফিস লেফট্ উইং-এর..."

বয়স্ক চেহারার কোনো কেরানি এগিয়ে এসে তার পিঠে হাত রাখল হঠাৎ। আস্তে আস্তে তার দিকে ঘুরে তাকাল সেই ধর্মযোদ্ধা যুবক। তারপর কাঁধের হালকা ঝাঁকুনিতে খসিয়ে ফেলে দিল তার গায়ের আলখাল্লা। তার হাতে তখন উঠে এসেছে গুলিভরা একটা অ্যাসল্ট রাইফেল।

বয়স্ক মানুষটার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে হঠাৎ। দু-হাতে মুখ ঢেকে মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়েছে সে...

"মহান ঈশ্বরের নামে...পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নামে..." নিজের কাঁপা কাঁপা গলায় চিৎকারটাকে ডুবিয়ে দিয়ে এইবার গান গেয়ে উঠল তার হাতের অস্ত্র। আর তারপর গুলির ফোয়ারা ছোটাতে ছোটাতেই তার আড়াল নিয়ে সে ঢুকে এল অডিটোরিয়ামটার ভেতরে...

পরমুহূর্তেই সতর্ক হয়ে উঠেছিল রাষ্ট্রযন্ত্র। সেখানে জড়ো হওয়া

মানুষজনের ফোন ভয়াবহ খবরটা ছড়িয়ে দিতে দেরি করেনি। আর সে-খবর পেয়ে তখন, কলেজটাকে ঘিরে কাছাকাছি সেনাঘাঁটি থেকে ছুটে আসছিল সাঁজোয়া গাড়ির দল। তাদের বেতার যন্ত্র ক্রমাগত বলে চলে, "আক্রমণকারী অডিটোরিয়ামে আশ্রয় নিয়েছে। আত্মঘাতী আক্রমণ। এর শরীরে শক্তিশালী বিস্ফোরক..."

কলেজের উঠোনে জড়ো হওয়া আতঙ্কিত যুবক-যুবতীদের ভিড় থেকে তখন নিঃশব্দে সকলের চোখ এড়িয়ে বের হয়ে আসছিল কয়েকটি যুবতী। এইখানে, মানুষের কদর্য বাসস্থলে, তাদের মধ্যে মিশে থেকেই তাদের দীর্ঘ নির্বাসন। এইখানেই, নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা, সকলের চোখের আড়ালে নিজেদের সংখ্যাকে ক্রমশ বাড়িয়ে তোলার ব্রত নিয়েই তাদের এই ভূমিতে আসা। এইবার, আরো একবার সেই পবিত্র মুহূর্ত এগিয়ে আসছে। ভ্রূণসঞ্চারের পর, তাদের সন্ততির এই আধারটিকে তারা গত দু-মাস সতর্ক, অদৃশ্য প্রহরায় ঘিরে রেখেছে। তার প্রতিটি মুহূর্তের চলাফেরার হিসেব রেখেছে নিপুণ দক্ষতায়। আজ, এই পবিত্র মুহূর্তটিতে এইখানে তার এসে পৌঁছোবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিল তারা।

আতঙ্কিত মানুষজনের বিপুল ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে যাচ্ছিল অডিটোরিয়ামের বন্ধ দরজার দিকে। আর বেশি সময় নেই হাতে। বাইরে থেকে সাঁজোয়া গাড়িদের ইঞ্জিনের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছিল। সেখান থেকে লাউডস্পিকারের শব্দ ভেসে আসছিল ক্রমাগত। সেনারা তৈরি হচ্ছে। কলেজের উঠোনে ভিড় করে থাকা সাধারণ মানুষকে ক্লাসরুমগুলোর নিরাপত্তায় সরিয়ে নেবার অনুরোধ জানাচ্ছে লাউডস্পিকারেরা। জায়গাটা খানিক ফাঁকা হলে তারা আক্রমণ শানাবে...

অডিটোরিয়ামের মঞ্চটার ওপরে উঠে বসেছে ধর্মযোদ্ধা। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া যন্ত্রণা আর তীব্র কাঁপুনিকে উপেক্ষা করে কাঁপা কাঁপা হাতে শরীর জুড়ে আটকে রাখা বিস্ফোরকের খণ্ডগুলোকে সে একে একে জুড়ে চলেছিল একটা ব্যাটারির সঙ্গে। "আর সামান্যক্ষণ..." প্রাণপণে চোখদুটি বুজিয়ে রেখেই প্রার্থনা করে চলে সে... "হে ঈশ্বর, আরেকটু শক্তি দাও এই দাসকে...এ-যন্ত্রণার পরীক্ষা থেকে কয়েকটা মুহূর্তের জন্য মুক্তি দাও আমায়...আমি তো তোমারই পবিত্র কাজে..."

আর তারপর, যেন তার প্রার্থনার জবাবেই হঠাৎ তার শরীরে একটা শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে গেল কেউ। কয়েকটি সস্নেহ হাত হঠাৎ করেই চারপাশ থেকে ঘিরে এসেছে তাকে। বাতাসে ফের সেই কিছুকাল আগে শোনা সুরধ্বনি। চোখ মেলে চাইল যুবক। তাকে ঘিরে গান গেয়ে উঠেছে সুবিশাল মখমলি ডানার দল। বড়ো আদরে তার যন্ত্রণাকাতর শরীর থেকে মারণাস্ত্রদের খুলে নিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে ধীরে ধীরে তাকে সেই মঞ্চের ওপর শুইয়ে দিচ্ছিল যেই যুবতীরা। তাদের সুর তোলা পাখার বাতাস তার সব যন্ত্রণাকে মুছে দিয়ে শান্তির প্রলেপ দিয়েছে তার চোখে।

ঘুম...বড়ো তৃপ্তির...বড়ো শান্তির ঘুম ছেয়ে আসে তার চোখে... তীব্র আকুতিতে বেঁকেচুরে গিয়ে কেঁপে উঠতে থাকা নিজের শরীরটাকে সে টের পায় কিন্তু তার যন্ত্রণা আর এই মুহূর্তে ছুঁতে পারছে না তাকে। বড়ো আরামে নরম কোলগুলিকে আশ্রয় করে ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে সে অনুভব করে...তারা আসছে...তার সমস্ত শরীরকে ছিঁড়েখুঁড়ে, তার প্রতিটি কোষ থেকে উঠে আসছে তারা...

অবশ মানুষটার হাত-পাগুলো মেঝের সঙ্গে চেপে ধরে রেখেছিল সেই যুবতীরা। তাদের মখমলি ডানাগুলোর স্পন্দন থেমে গেছে। একটা সুদৃশ্য রামধনু রং তাঁবুর মতো ঘেরাটোপ গড়েছে তারা বেঁকেচুরে উঠতে থাকা শরীরটাকে ঘিরে। আর, তাদের সস্নেহ দৃষ্টির নীচে, শুয়ে থাকা মানুষটার শরীর জুড়ে ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছিল অজস্র ফাটলের রক্তমুখী দাগ। ভেতর থেকে গড়ে ওঠা তীব্র কোনো চাপে ফেটে যাওয়া চামড়ার রক্তাক্ত দাগগুলো ক্রমশ একে অন্যের সঙ্গে জুড়ে যায়...

...আর তারপর হঠাৎ ভেতর থেকে আসা একটা সম্মিলিত ধাক্কায় গোটা শরীরটা বিস্ফোরিত হয়ে, চারপাশে ছিটকে পড়া রক্তমাংসের ফোয়ারার মধ্যে দিয়ে বাতাসে ভেসে উঠল একরাশ প্রজাপতি। তাদের আশ্চর্য স্বর্গীয় সুগন্ধ ঢেকে দিয়েছে ছিটিয়ে যাওয়া রক্তমাংসের আঁশটে দুর্গন্ধকে।

শরীরের অবশিষ্টাংশটাকে ঘিরে থাকা যুবতীরা পরম স্নেহে সেই প্রজাপতিদের এক-একটিকে হাতে তুলে নেয়, তাদের রামধনু- বর্ণ ডানার মাঝখানে ছটফট করতে থাকা সূক্ষ্ম, কীটসদৃশ মানবশরীরগুলোকে ভালোবাসার স্পর্শ দিয়ে ফের বসিয়ে দেয় ধ্বংস হওয়া শরীরটার রক্তমাংসের গায়ে...

দূরে শৃঙ্খলাবদ্ধ বুটের শব্দ উঠছিল। যুবতীরা সেই শব্দ শুনে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল। মিলিয়ে গেছে তাদের পিঠের মখমলি ডানারা। ভীত, আতঙ্কিত একদল যুবতী যেন এইবার সেইখানে বসে থাকে মাথা নীচু করে, যেন তারা সেই উগ্রপন্থীর হাতে পণবন্দি কিছু নিরীহ মানুষ। আর, তাদের মাঝখানে, ছড়িয়ে থাকা রক্তমাংসের সেই স্তূপটির ওপরে একরাশ ফুলের মতো ছেয়ে থাকে তাদের সদ্যোজাত সন্তানের দল। নিঃশেষে শুষে খায় তাদের আশ্রয় ও জন্মদাতা শরীরটার সমস্ত রক্তমাংসকে।

* * * *

একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় অডিটোরিয়ামের দরজা ভেঙে ঢুকে আসা কমান্ডোর দল সেই দৃশ্যটাই দেখেছিল অবশেষে। তখন, সেখানে বসে থাকা কিংকর্তব্যবিমূঢ় কয়েকটি নিরীহ যুবতী ও একটা ভাঙাচোরা কঙ্কালকে ফেলে রেখে অডিটোরিয়ামের চারদিকে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে ভেসে চলেছে সুবিশাল প্রজাপতির একটা দল। তাদের রঙিন ডানা সে-দৃশ্যের ওপরে একটা রামধনু-রঙা, চলমান চন্দ্রাতপ বুনে দিয়েছিল যেন তখন... ❖

নিবন্ধ

চেনা-অচেনা নেতাজির পিতৃভূমি কোদালিয়া

সুব্রত ছাটুই

"কদম কদম বাড়ায়ে যা/খুশিকে গীত গায়ে যা/ইয়ে জিন্দেগি হ্যায় কামকি/তু কামপে লুটায়ে যা",— বাঁশিধর শুক্লা রচিত নেতাজির প্রিয় গানটি যখন ২৩ জানুয়ারির প্রভাতে সারা দেশের আকাশ- বাতাস মুখরিত করে তখন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কোদালিয়া, নেতাজির পৈতৃক বাসভবন যেখানে নেতাজির জন্মদিন শুধু উদ্‌যাপিত হয় কেননা ১৮ অগস্ট ১৯৪৫ তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনা এবং অন্তর্ধান এবং তারপর বাকিটা ইতিহাস।

নিরুদ্দেশের পথিক হবার পূর্বে জননী প্রভাবতী দেবীকে শেষ প্রণামটুকু যেমন তাঁর করা হয়ে ওঠেনি, তেমনি কোদালিয়ায় তাঁর একান্ত প্রাণের স্মৃতি বিজড়িত স্বপ্নের পৈতৃক বাড়িটিতে তাঁর আর আসা হয়ে ওঠেনি। বড়ো অভিমান ছিল এইখানে দেশনায়কের। সেদিনের কোদালিয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস সেদিন রচিত হয়েছিল সকলের অলক্ষে এমনকী ব্রিটিশ গোয়েন্দারাও বুঝতে পারেনি তাদের বিরুদ্ধে আগামীতে সুভাষ কী করতে চলেছে।

কোদালিয়ার প্রসঙ্গে আসি। বসু পরিবারের পুরুষানুক্রমে বাস ছিল কলকাতার অনতিদূরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ছোট্ট এক বর্ধিষ্ণু কোদালিয়া গ্রামে। গ্রামের দক্ষিণ দিক দিয়ে বয়ে গেছে আদিগঙ্গা। নয়নাভিরাম সবুজ আর নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যে ডেকে চলেছে অহরহ নানা প্রজাতির পাখি। আর পাতার আড়ালে তাদের কলকাকলি মেঘে ঢাকা আশ্বিনের দুপুরের আকাশ। শহরের সব কাজ ফেলে সপরিবারে এখানে এক অমোঘ টানে জননী প্রভাবতীর সাথে কিশোর সুভাষের চলে আসা।

পুজোর সময় কোদালিয়ার পৈতৃক বাড়ির দুর্গাদালানে খুব বড়ো করে মা দুর্গার পুজো হত। ১৯২৪, ১৯৩৭, ১৯৩৯ এই সময়গুলিতে তিনি এসেছিলেন এবং পুজোর দিনে বিপ্লবী কাজও সারেন। পারিবারিক পুজো তাই পারিবারিক সম্মেলন হত। পুরোহিত নগেন ঠাকুরের ব্যবস্থাপনায় পুজোর কাজ এবং চণ্ডীপাঠ চলত। নানা কারণে যেবার যাওয়া হয়ে উঠত না, তিনি চিঠি লিখতেন তাঁর পরম পূজনীয়া মাতাকে।

জানকীনাথ বসুর স্বর্গগমনের প্রায় পাঁচ বছরের মাথায় কোদালিয়াতে ইংরেজি ১৯৩৯ সাল। দিনটি হয়তো বা কোনো পূর্ণিমা বা বিশেষ কোনো তিথি। দুর্গাদালান সংলগ্ন বিষ্ণুমন্দির সংস্কার করে নারায়ণের বাঁধানো আসন প্রতিষ্ঠা করেন ভক্ত সুভাষ ও সুভাষ জননী।

দুর্গাপুজোতে যখন কোদালিয়ায় আসতেন তখন রাতের দিকে গ্রামের বাইরে ফাঁকা বাগানবাড়িতে রাতের পর রাত চলত গোপনে ব্রিটিশ বিতাড়নের প্রেরণাদায়ক গুপ্ত মিটিং। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোদালিয়া গ্রামটি ছিল স্বদেশীদের কাছে আদর্শ। ব্রিটিশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নিরাপদ স্থানে চলত সভা, সমিতি এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম। নেতাজি যখন কলকাতার মেয়র (১৯৩০), এমনকী তিনি যখন কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৩৮) তখনো চলেছে এখানে ব্রিটিশ বিরোধী সভা-সমিতি। মাতৃ সাধনায় বাংলার বিপ্লবীদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা একমাত্র তাঁরই পক্ষে সম্ভব। প্রখ্যাত বিপ্লবী (এম. এন. রায়) যিনি পরিচিত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নামে, এছাড়া— প্রখ্যাত বিপ্লবী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী, জগদানন্দ মুখার্জি, ভূপেন দত্ত (সম্ভবত গোপনে এক-আধবার এসেছিলেন) এছাড়া বিজয় দত্ত প্রমুখরা, অনুশীলন

সমিতি এবং যুগান্তরের বিপ্লবীরাও আসতেন এবং স্বাধীন ভারত গড়ার শপথ নিতেন (তথ্য সুশীল কুমার বসু, নেতাজি সম্পর্কে তাঁর পিতামহ হন এবং ডাঃ পল্লব কুমার দাস, নেতাজি ভবন কোদালিয়ার চেয়ারম্যান) কোদালিয়ার দুর্জয় মাটিতে এই পুণ্য তীর্থে বসে তিনি দিনের পর দিন স্বাধীন ভারত গড়ার যে স্বপ্ন দেখতেন, পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আজাদ হিন্দের ঐতিহাসিক যুদ্ধাভিযান, তার দাপটে ইংরেজ এই দেশ ছেড়েছিল একথা আমাদের ভুললে চলবে না। ১৯৩৯ সাল। এই বছর অষ্টমীর দিনে তাঁকে শেষ দেখা গেছে পৈতৃক দুর্গা দালানে বসে অঞ্জলি দিতে।

নেতাজির বংশে ২৭টা জেনারেশানের মধ্যে দশরথ বসুর বংশে একাদশতম পুরুষ হলেন মহিপতি বোস, এই মহিপতি বোস ছিলেন সেই সময়কার সুবে বাংলার সুলতানের অত্যন্ত প্রিয় ও কাছের মানুষ। তিনি সুলতানের কৃপাধন্য হয়েছিলেন এবং সুবুদ্ধি খাঁ উপাধি লাভ করেন। তাঁর জায়গির ছিল কোদালিয়ার কাছে মহীনগরে। এই মহীনগরের প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ থেকে জানকীনাথ বসু খুঁজে পান তাঁদের পরিবারের প্রাচীন অতীত এবং এক ভগ্নপ্রায় পুরোনো অট্টালিকা।

পরবর্তী সময়ে বন্যা, নদী ভাঙন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি নানাবিধ কারণে এবং প্রতিকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গোপীনাথ বসু (পুরন্দর বসু খাঁ) চলে এলেন কোদালিয়ায়। পুরন্দর খাঁ-এর ১২ তম বংশধর ছিলেন নেতাজির পিতামহ হরনাথ বসু। এই প্রবন্ধে হরনাথ লজের তোরণের যে ছবিটা আছে, সেটি তিনি নির্মাণ করেন ১৭৬০ সালে ১০ কাঠা জমির উপর। অপরদিকে নেতাজির পৈতৃক বাসভবনটি নির্মাণ করেন স্বয়ং জানকীনাথ বসু। নেতাজির পূর্বপুরুষদের বংশধারায় দেখা যায় তাঁদের মধ্যে একদিকে যেমন ছিলেন দেশ পরিচালনার সুদক্ষ মন্ত্রী, পরামর্শদাতা, তেমন দেখা যায় বিখ্যাত সব যোদ্ধা। তাই বোধ হয় সর্বাধিনায়ক তিনি হয়ে উঠেছিলেন পূর্বপুরুষদের অতুলনীয় প্রভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের।

২৫০ বছর অতিক্রান্ত কোদালিয়ার দুর্গাপুজো আজও সমানে সম্মানের সঙ্গে এবং স্বমহিমায় উদ্‌যাপিত হয়। ❖
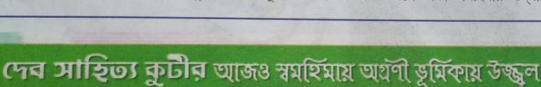
নীল চোখের মায়াকাজল
সম্পূর্ণ উপন্যাস
সাগরিকা রায়
ছবি ঃ ইন্দ্রনীল ঘোষ

১
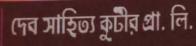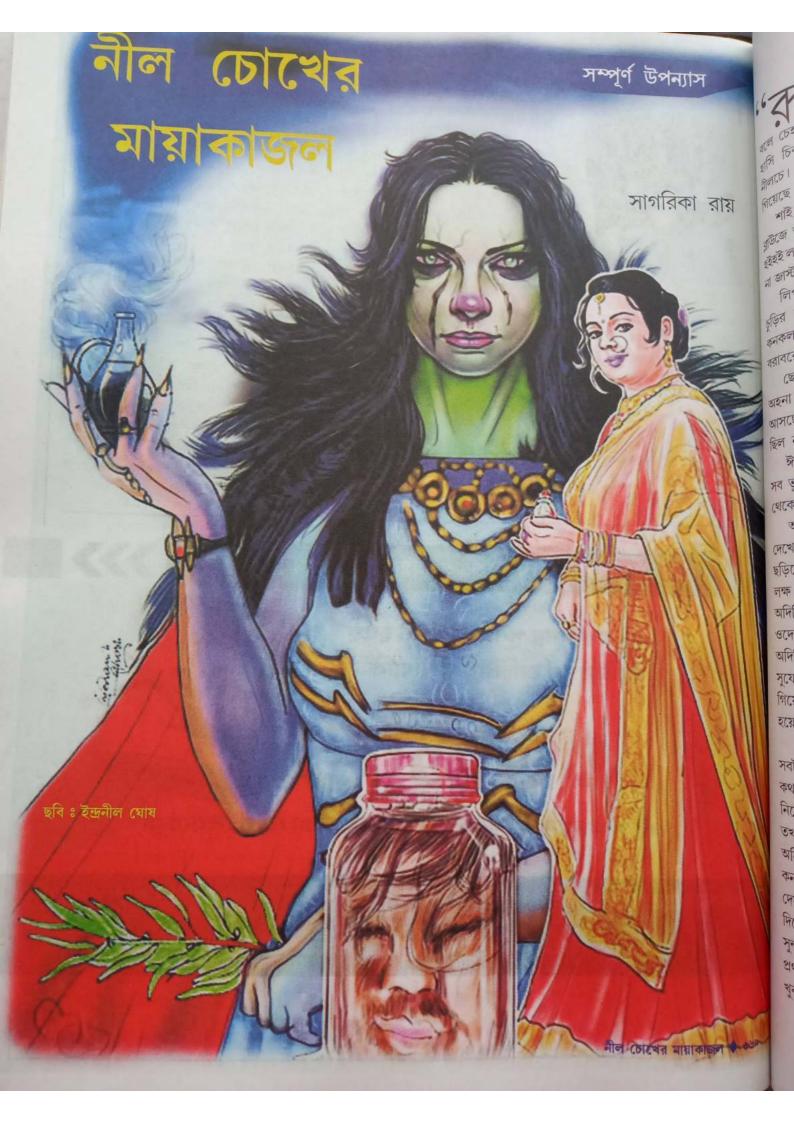
"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে"

অহনার বিয়ের দিনই কনকলতা এল। ফ্লাইটে এসেছে বলে চেহারায় জার্নির ক্লান্তির ছাপ ছিল না। নীল চোখের মণিতে হাসি চিকচিক করছিল। কন্ট্যাক্ট লেন্স নয়। চোখ জন্ম থেকেই নীলচে। অহনার মা সুব্রতা বলল, "সত্যি, একই রকম সুন্দর রয়ে গিয়েছে কনকলতা।"

শাই পিঙ্ক কালারের ঢাকাই শাড়ির সঙ্গে ব্রোঞ্জ কালারের ডিজাইনার ব্লাউজে অসাধারণ লাগছে কনকলতাকে। এসেই অহনাকে জড়িয়ে ধরে হুইহুই লাগিয়ে দিল, "এই সেদিনের লিটল প্রিন্সেসের বিয়ে! ভাবতে পারছি না জাস্ট। কী সুইট হয়েছিস! লাভ ম্যারেজ?"

লিপস্টিকে রাঙানো ঠোঁটে হাসির ঝিলিক তুলে একরাশ সোনার চুড়ির ঝনঝনে শব্দ দিয়ে বিয়েবাড়িতে রোশনাই জ্বেলে দিল কনকলতা। কনকলতা মানেই ঝলমলে রোদের সোনার আলো। বরাবরের মতোই ঝকঝকে সুন্দরী কনকলতা।

ছোটো থেকেই পিসির রূপের প্রশংসা শুনে আসছে অহনা। কিন্তু অহনা মনে মনে ভাবে, সেই ছেলেবেলা থেকে যে পিসিকে দেখে আসছে, সে সুন্দরী ছিল তো বটেই, কিন্তু এমন অত্যাশ্চর্য সুন্দরী ছিল না। দিনকে দিন কনকলতা সৌন্দর্যের সংজ্ঞা হয়ে উঠছে।

ঈর্ষা নয়, এক অসীম মুগ্ধতা আচ্ছন্ন করে রাখে অহনাকে। সব ভুলে হাঁ করে পিসিকে দেখে ও। খেয়াল করে পর্দার আড়াল থেকে অনিমেষকাকু স্থির চোখে কনকলতাকে দেখছে।

অহনাকে দুজনের কেউ খেয়াল করেনি। কনকলতা অনিমেষকে দেখেনি। সে অহনার মায়ের সঙ্গে হা হা হি হি করে যাচ্ছে মুক্তোপাটি ছড়িয়ে। অহনা আস্তে আস্তে সামান্য সরে গিয়ে অনিমেষকাকুকে লক্ষ করছিল। এই কাকু অহনার বাবার দূর সম্পর্কের পিসি অদিতিপিসির ছেলে। এই বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেছে। গ্রামে ওদের বড়ো অবস্থা। জমি-জিরেত, ফার্মহাউস সব সামলায় বাবার অদিতিপিসি আর পিসেমশাই। গ্রামে পড়াশোনার অসুবিধে ছিল। সুযোগ ছিল না সে অর্থে। স্কুলিং চলেছে নদী পেরিয়ে অন্য গ্রামে গিয়ে। আর যখনই যেমন চলুক না কেন, বর্ষায় স্কুল যাওয়া বন্ধই হয়ে যেত। তখন কতটুকুই বা বয়স ছেলের! অথচ ছেলেটা মেধাবী।

সেবারে চৈত্র সংক্রান্তিতে অদিতিপিসির বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে সবটা পিসির কাছে শুনেছেন প্রবাহ। পড়াশোনা নিয়ে দুঃখের কথাটাও। এসব শুনে প্রবাহ দেরি করেননি। সোজা নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন পিসির ছেলেকে। সে অনেকদিন আগের কথা। অহনা তখন জন্মায়নি। কনকলতা মাত্র ষোলো। অনিমেষ সতেরো। অনিমেষ সেই সময় থেকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল কনকলতার প্রতি। কনকলতা অনিমেষকে নিয়ে মজা পেয়েছিল। খানিকটা প্রশ্রয় কি দেয়নি? দিয়েছে। দিয়ে দিয়ে আকর্ষণকে প্রেমে পরিণত করিয়ে দিয়েছে। স্তুতি কে পছন্দ করে না? বিশেষ করে কনকলতার মতো সুন্দরী! সে চেয়েছিল তার চারপাশে স্তাবক ঘুরে বেড়াবে। জীবনের প্রথম স্তুতিকার অনিমেষকে স্তাবক হিসেবে গ্রহণ করলেও কনকলতা খুব দ্রুত পালটে যাচ্ছিল।

ধীরে ধীরে অনিমেষ কনকলতার জীবন থেকে ম্লান হতে শুরু করেছিল। কলেজ লাইফে নিত্য নতুন বয়ফ্রেন্ড নিয়ে মেতে উঠেছিল কনকলতা। এর সঙ্গে ছিল ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এয়ারহোস্টেস হতে চেয়েছিল কনকলতা। পরে ফ্যাশন ডিজাইনার হল। প্রথম সুযোগেই সব ফেলে চলে গেল মুম্বই। নিজেকে পালটে ফেলতে ফেলতে এখন এক জ্বলন্ত হিরের টুকরোর মতো বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে চলেছে।

এখানে এলই তো কতকাল পরে। কনকলতা কি সব ভুলে গিয়েছে? অনিমেষকাকুকেও? ওদের মধ্যে প্রেম ছিল বাড়ির সকলে জানত। কিন্তু কনকলতার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পাশে অনিমেষ টিকতে পারল না। কেউ বুঝতে না পারলেও অহনা জানে সারারাত অনিমেষকাকুর ঘর থেকে সেতারের আওয়াজ পাওয়া যায়। কাকু ঘুমোয় না। একদিন দেখতে গিয়েছিল অহনা। কেন রোজ রোজ জেগে থাকে কাকু, জানতে ইচ্ছে হয়েছিল ওর।

পা টিপে টিপে কাকুর ঘরের সামনে গিয়েছে। দরজা খোলাই ছিল। ভিতরে পা মুড়ে বসে সেতারের মূর্ছনায় আবিষ্ট অনিমেষকাকু। বন্ধ চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছে! ইমন রাগের কড়ি মা আর্তনাদের মতো নেমে আসছে জলের ধারা হয়ে।

নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখে ফেলার মতো কাজ করেছে যেন অহনা। ভয় পেয়েছিল। চোরের মতো লুকিয়ে পালিয়ে নিজের ঘরে এসে অনেকটা সময় জেগে ছিল অহনা সেদিন। কেন কাঁদছিল কাকু? বাইরে অন্ধকারে সেতারের সুর কেঁদে ফিরছে তখনো। অহনা শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে। দরজা বন্ধ করার কথাও মনে ছিল না। অথচ বরাবরের অভ্যেস দরজা বন্ধ করে ঘুমোনো। সেদিন মন বড়ো বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল অহনার। গুছিয়ে নিতে পারেনি নিজেকে। এক্সময় ক্লান্তি এসে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। সকালে সুপর্ণাদি এসে দরজা খোলা দেখে ঘরে ঢুকে ঘুম ভাঙিয়েছে, "এ কী দিদি? তোমার শরীর ঠিক আছে? দরজা খুলে রেখে ঘুমিয়েছ না কিনা, তাই বলছি।"

অহনা উঠে বসে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে হাহাকারটাকে মনে করছিল। সুপর্ণা চলে যাচ্ছে দেখে বলেছিল, "দরজাটা টেনে দিয়ে যাস সুপর্ণা। আমি ওয়াশরুমে যাব। আমাকে চা দিস।"

সুপর্ণা দরজা টেনে দিতে দিতে একবার ওকে দেখেছে। চলে যেতে যেতে ভেঙে পড়া খোঁপা দু-হাতে জড়িয়ে নিচ্ছিল। অহনা দেখল, দরজাটা ভালো করে বন্ধ করেনি সুপর্ণা। ও উঠে দরজা এঁটে দিয়ে ওয়াশরুমে গিয়েছে। আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে একটা ত্রাস অনুভব করছিল। অনিমেষকাকুর মধ্যে এমন কী দুঃখ আছে,যা রাতের অন্ধকারেই শুধু বের হয়ে আসে? কেন কাঁদে সেতারের তার?

প্রশ্নটা অবিরত টোকা দিয়ে দিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল অহনাকে। দুটো দিন পরে কাকুর অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢুকেছিল অহনা। পরিচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে হালকা রজনীগন্ধার সুবাস ভেসে বেড়াচ্ছে। লম্বা গলা ফুলদানিতে বরাবরের মতোই একগোছা রজনীগন্ধা রয়েছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সেই অর্থে কিছুই দেখতে

পায়নি অহনা। টেবিলের ওপরে কিছু বই, ডায়েরি, পেনদানিতে পেন, স্টেপলার, আঠা, সেলোটেপ—।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখল, কাকুর আলমারির গায়ে চাবি ঝুলছে। পুরনো দিনের স্টিলের আলমারি। অহনা কৌতূহলের ঘোড়ায় চেপে আলমারির পাল্লা খুলেছে। সেখানেও কিছু পেল কি? না। কী খুঁজছিল, সেটা মনের কোণে লুকিয়ে রেখেছিল ও। একটা কিছু, যা কাকুর চোখের জলের কারণ বুঝিয়ে দেবে অহনাকে।

অবশেষে দিন চারেক বাদেই ঘটল একটা ঘটনা। একদিন আচমকাই কাকুর হাত থেকে ওয়ালেট পড়ে গেল অফিস যাওয়ার মুহূর্তে। আর অহনা কুড়িয়ে দিতে গিয়ে খুলে যাওয়া ওয়ালেটের ভিতরে কাকুর চোখের জলের কারণ দেখেছিল। কনকলতার ছবি ছিল ওয়ালেটে। কেন কাকু বিয়ে করেনি, সে কথা আর যে না বুঝুক, অহনা জানতে পেরেছিল, অনেক আগে। যখনই কেউ অনিমেষকে চাপ দিয়েছে, "এবারে বিয়ে করে ফেল বাপু, আর কতদিন আইবুড়ো থাকবে?" তখনই অহনা কাকুর মুখের ম্লান হাসিটা দেখে লজ্জা পেয়েছে। কনকলতার প্রতি বিরক্তির মাত্রা বেড়েছে ওর। বিরক্তি ছিল কাকুর ওপরেও। এত প্রেম? কেন? যে অপমান করে,তাকে কেন মনে রেখে দিতে হবে? ছুড়ে ফেলে দাও বিন-এ। পড়ে থাকুক ভ্যাটের মধ্যে পচেধচে। তা নয়, রাত দুপুরে কান্নাকাটি! ছ্যাঃ। সত্যিকথা বলতে অহনা একেবারেই ছিঁচকাঁদুনে নয়। এমন দেবদাসমার্কা প্রেমিক ও পছন্দও করে না। কাকুর প্রতি সমবেদনা পালটে যাচ্ছিল কনকলতাকে এবারে দেখার পর থেকেই। পর্দার আড়াল থেকে প্রেমিকাকে দেখছে! সামনে এসে হাত ধরে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে যেতে পারছে না? কেমন কাপুরুষ?

এখন অনিমেষকাকুকে পর্দার আড়ালে দেখে অহনা কী করবে বুঝতে পারছিল না। কনকলতাকে দেখে কাকু কিছু বলে বসবে না তো? কেমন আকুল হয়ে তাকিয়ে আছে। কোনোরকম হুঁশ নেই যেন। চোখের মণি স্থির। যেন সম্মোহনের অতলে ডুবে আছে। আচ্ছা, ওদের মধ্যে রাগারাগি হবে কি? কে জানে। তবে বিয়েবাড়িতে কত কিছুই হয় সকলের অজ্ঞাতে। হয়তো দুজনের সম্পর্কের জটিলতা কেটে যেতে পারে। যেমন হয়েছিল হোসেনাবাদের মাসির মেয়ে কাজরীদির বিয়েতে। প্রণববাবুর সঙ্গে মিতালিদির সেপারেশন চলছিল। বিয়েবাড়িতে দুজনেই আলাদা এসেছে। বাসরে গান গেয়েছিল মিতালিদি। প্রণবদাকে লোকাভাবে তবলার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। ব্যস, দুজনের মিলমিশ হয়ে গেল আচমকাই। এখন তো দুই ছেলে নিয়ে সুখে আছে। তেমন হতে পারে তো?

যদিও এই মুহূর্তে কনকলতাকে দেখে সেই সম্ভাবনার মাথায় জল ঢেলে দিতে হচ্ছে অহনাকে। এই মুখচোরা ভালোমানুষ মেধাবী সায়েন্টিস্টকে পাত্তা দেবে কনকলতা? আরব সাগরের জল-বাতাসে অনেক সতেজ কনকলতা জীবনের কিছুটা সময় সুইজারল্যান্ডে কাটায়। বাকি সময় দিল্লি-মুম্বই করে বেড়ায়। নিজের বিজনেস নিয়ে মত্ত সে। ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে নাম আছে কনকলতার। মাঝে মাঝে র‍্যাম্প শো করে দিল্লি, মুম্বইতে। এই মেয়ের দায় পড়েছে কাকুর সিঁদুর পরা বউ হয়ে জীবন কাটাতে বেহালার পর্ণশ্রীর একটি ঘরের মধ্যে। কনকলতাকে কি মানায় এভাবে? না। এই কনকলতাকে দেখে মুগ্ধই হতে হয়। আর কিছু নয়। কনকলতা অনেক দূর গ্রহের তারা। স্টার। তাকে স্পর্শের সাহসই পাবে না অনিমেষ নামের বিরহী প্রেমিক! বয়স থাবা বসিয়েছে মানুষটির শরীরে। মন তো অনেক আগেই মরে গিয়েছে। কেমন নিশ্চুপ থাকে সারাক্ষণ। কোনো বিষয়েই আগ্রহী নয়। অবসরে বই নয় সেতার নিয়ে কাটায়। প্রাণহীন পদার্থ একটি।

অহনা মুগ্ধ হয়ে দেখছিল কনকলতাকে। কনকলতা আসলে ওর পিসি। অহনার চাইতে কুড়ি বছরের বড়ো। কিন্তু ওকে দেখে অহনার বান্ধবী ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। চকচকে স্কিনে লালচে আভা কেমিক্যালের নয়, স্বভাবজাত বলে মনে হচ্ছে।

এক পলক পর্দার আড়ালে যে আছে সেদিকে তাকাল অহনা। এখন কেউ নেই পর্দার আড়ালে। চলে গিয়েছে কাকু। আজ আর কোনো কাজে মন বসাতে পারবে কাকু? এই কনকলতাকে দেখে কি সে চিনতে পারছে? এই আলোকবর্তিকার সামনে দাঁড়াতে পারবে এসে অনিমেষ নামের গ্রামের ছেলেটি? পারবে না। সেই সাহস আছে কাকুর?

অহনা হাত ধরে কনককে পাশে বসাল, "কন, এখনও একরকম আছ। কী করে? শুধুই ফল খাও শুনেছি। মা বলছিল। সত্যি? কোনোরকম অয়েলি ফুড নাকি মুখে তোল না। তাই?"

কনকলতা ব্যাগ থেকে লাল ভেলভেটের বাক্স বের করে একজোড়া হিরের দুল উপহার দিল অহনাকে। মিষ্টি হেসে জানতে চাইল, "পছন্দ?"

"খুব।" হেসে গিফট হাতে তুলে নিয়ে দেখে অহনা। কিন্তু কনকলতার সৌন্দর্যের কথাটাও ভুলল না।

কনকলতা অল্প হেসে বলল, "অহনা, আজ তোর বিয়ে। আজ নিজের কথাটা ভাব। তবে, হ্যাঁ, একটা টিপস দিচ্ছি। ভুলিস না। কিছু এসেনশিয়াল অয়েল আছে। নামগুলো বলে দেব। সেগুলো ইউজ করিস নিয়মিত। স্কিন ভালো থাকবে। এসব তেলের নাম আছে। তবে আমি বলি সুবাসিত তেল"। মুক্তো দাঁতে হাসে কনকলতা। হাসির দোলায় ওর কানের হিরের ফুল আগুন ছড়াল ধক ধক করে।

অহনা কনকলতাকে প্রায় দশ বছর পরে দেখল। দশ বছর আগের মতোই রয়েছে পিসি। বরং বলা যায়, দশ বছর নয়, প্রায় পনেরো বছর বয়স কমে গিয়েছে। কী করে? শুধুই এসেনশিয়াল অয়েল ইউজ করে?

কনকলতা একটা কাগজে সুন্দর করে লিখে দিল কিছু অয়েলের নাম। বলে দিল গুপ্ত কিছু ফুল, পাতার নাম। বিশেষ কিছু গাছের পাতা, কিছু ফুল থেকে তেলকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় শুদ্ধ করে কনকলতা এসেনশিয়াল অয়েল বানিয়ে নেয় । পাতা আর ফুলের নির্যাস থাকার কারণে এই তেল সুগন্ধি, উপকারী। কালো কাচের শিশিতে রাখতে হবে এই তেল। নইলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে হ্যাঁ,এই অয়েল তৈরি করা খুব সহজ নয়। কিছু ফুল, পাতা দুর্লভও। খরচ বেশি। তাই এর বিকল্প হিসেবে ইনফিউজড অয়েল ইউজ করা ভালো।

"সেটা কী?" অহনা অদ্ভুত জগতে বিচরণ করতে শুরু করেছে।

"এই তেল এসেনশিয়াল অয়েলের মতোই উপকারী। শুধু ইউজ করার সময় বেশি পরিমাণে নিতে হবে। এগুলো বেশ হালকা হয়। এই অয়েলে ফুল, পাতা, গুল্ম মিশিয়ে রাখা হয়। যে কোনো শিশিতে এই তেল রাখা যায়।" "বলে কনকলতা শিখিয়ে দিল স্কিনের দাগ ছোপ দূর করা, অ্যাংজাইটি দূর করা, স্ট্রেস কমানো, ইত্যাদি নানা কারণের জন্য নানারকমের তেল ইউজ করা যায়। কথা বলতে বলতে হাতের আঙুল নাড়ে কনকলতা। পেলব আঙুলের আংটি, নখের রং অবিরত দ্যুতি ছড়িয়ে যায়। অহনা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে। যেন সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছে।

কনকলতার সঙ্গে খানিকটা সময় কাটাতে পেরে বিয়ে সম্পর্কিত টেনশন কেটে গিয়েছিল অহনার। সত্যিকথা বলতে কনকলতাকে পেয়ে অহনা খুশি হল। জীবনের এমন এক পর্যায় শুরু হতে যাচ্ছে, এখন নিজের দিকে আরও একটু নজর দেওয়া উচিত। পিসির টিপস খুব কাজে লাগবে। জীবন নতুন হয়ে ওঠার সময়। নিজের দিকে নজরদারি করাই উচিত।

বিয়ে শেষ হতে হতে রাত হল। সাজসজ্জা চেঞ্জ করে রেস্ট নেওয়ার জন্য বাসর ঘরের দিকে যাচ্ছিল অহনা। বান্ধবীরা হাসিতে উচ্ছল হয়ে ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে কনকলতাকে দোতলার বারান্দার দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে অহনা। বিয়েবাড়ির সব আলো ম্লান হয়ে গিয়েছিল কনকলতার সৌন্দর্যের কাছে। একটা সাদা বেনারসি পরেছে কনকলতা। সাদা বেনারসিতে সোনালি জরির সূক্ষ্ম কাজ। সাজেনি বিশেষ। কিন্তু সেই সাজেই সকলের সাজকে ম্লান করে দিয়েছিল ও।

এক মুহূর্তের জন্য বান্ধবীরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। শিরিন বিহ্বল গলায় বলে উঠেছে, "অসাধারণ সুন্দরী রে! সিনেমায় গেলেন না কেন! আগে দেখিনি। কিন্তু আমাদের বাড়িতে তোর পিসির রূপের প্রশংসা হয়। কিন্তু, সামনাসামনি না দেখলে জানাই যেত না উনি কতটা সুন্দর। যা শুনেছিলাম, তার থেকে হাজার গুণ সুন্দরী।"

অহনা সেসব ভাবেনি। ও ভাবছিল অন্য কথা । আজ রাতে কি কাকুর সঙ্গে দেখা হবে না কনকলতার? একবার? মন বলছিল, হতেই হবে। এমন আকুতি নিয়ে যে অপেক্ষা করে আছে বছরের পর বছর, সে কি আজকের রাতে দেখা করবে না?

বাসরে গান-বাজনা, ঠাট্টা-ইয়ার্কির মধ্যে কনকলতা বা অনিমেষকাকু দূরে সরে গিয়েছিল অহনার মন থেকে।

কনকলতা পরের দিনই চলে গেল। অহনা শ্বশুরবাড়ির দিকে চলে গেল আর কনকলতাও বেরিয়ে গেল এয়ারপোর্টের উদ্দেশে। জানা হল না দুজনের দেখা, কথা হয়েছিল কিনা।

ফুলশয্যার রাতে রীতেশ গল্প করছিল। অহনাদের বাড়ির আত্মীয়স্বজনদের এক রাতে চিনে উঠতে পারেনি ও। কথায় কথায় কনকলতার প্রসঙ্গ এল। কনকলতার পরিচয় জেনে রীতেশ অবাক হল, "তোমার চাইতে কুড়ি বছরের বড়ো? আমি ভেবেছিলাম, তোমার বান্ধবী। ম্যাজিক জানেন নাকি? শুনেছি, একজন অভিনেত্রী আছেন বলিউডে, তিনি নাকি ডাকিনী বিদ্যা জানেন। রূপকে অম্লান রেখেছেন। তেমন কিছু জানেন নাকি তোমার পিসি?" বলে হেসে ফেলেছে রীতেশ।

সেদিন একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা বুকের ভিতরে জন্ম নিয়েছে। পুরুষ কেবল রূপই দেখে? অহনার রূপ নেই নাকি? একবার এই রূপের সমুদ্রে ডুব দিতে ইচ্ছে করছে না রীতেশের? নাকি সুলভ পদার্থে আগ্রহ কমে যায়?

অহনার আর গল্প করতে ভালো লাগছিল না। ফুলশয্যার জন্য খুব আগ্রহ নিয়ে পরে থাকা ব্রোঞ্জ কালারের বেনারসির দিকে তাকিয়ে ক্ষোভ জন্মাচ্ছিল অহনার। "ঘুম পেয়েছে" বলে শুয়ে পড়েছে ও। রীতেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। ফুলে সাজানো খাটের ওপরে দুটো মানুষ অযথাই জেগে থাকে। টিম টিম করে নাইট ল্যাম্প নীলচে মোহময় আলো ভাসিয়ে দিতে থাকে শুধু।

পরে অবশ্য লজ্জা পেয়েছে অহনা। বিয়ের পরের প্রথম রাতটা নষ্ট করে দিয়েছে ও। এটা ঠিক করেনি। হঠাৎ করে এমন হিংসুটে হয়ে পড়েছিল কেন ও? এরকম আগে হয়নি তো! এটা কি রীতেশ কনকলতার সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছে বলে? দেখেছ কাণ্ড! এরই মধ্যে রীতেশকে নিজের সম্পত্তি বলে ভাবতে শুরু করেছে কেমন। যেন রীতেশ কেবল অহনার কথাই বলবে। ভাববে। এরকম হয় নাকি? রীতেশের কি স্বতন্ত্র মতামত থাকতে পারে না? নিজে নিজে হেসে ফেলে অহনা। ভাগ্যিস ওয়াশরুমে আছে এখন ও। কাজেই কেউ ওর হাসি দেখতে পেল না। তাছাড়া স্বীকার করতে বাধা নেই যে কনকলতার রূপের প্রশংসা যে কেউ করবে। সেটাকে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করাই উচিত।

ইচ্ছে করেই রীতেশের গায়ে ওর নরম হাত রাখল অহনা। মুহূর্তে চোখ খুলে অহনাকে কাছে টেনে নিল রীতেশ। সব গ্লানি ধুয়ে যাচ্ছিল সুরময় হয়ে। ব্রোঞ্জ কালারের বেনারসির ঝকঝকে আঁচলের ময়ূরেরা জেগে উঠে আশ্লেষে অস্ফুট শব্দ করছিল। বুনো গোলাপের গন্ধে ভরে উঠল ঘর।

অহনা স্নানের আগে চারপাশে তাকিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করল। রীতেশ এই মুহূর্তে বউভাতের তদারকিতে ব্যস্ত। আত্মীয়স্বজনের কথাবার্তায় বাড়ি সরগরম হয়ে আছে। এই ভোরেই সবাই প্রায় উঠে পড়েছে ঘুম থেকে। অহনা স্নান না করে চা খায় না। আজ থেকেই কনকলতার পরামর্শ অনুযায়ী চলার ডিসিশন নিয়েছে।

কনকলতার দেওয়া কালো কাচের শিশি থেকে অল্প তেল নিল হাতের তালুতে। কনকলতা চার রকমের তেল দিয়ে গিয়েছে ওকে। হেসে হেসে ওকে নিয়ে দোতলার ছাদে গিয়ে চিলেকোঠায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর নিজের ব্যাগ থেকে ছোটো বটুয়া বের করেছে। বটুয়াটি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল অহনা। কুচকুচে কালো ভেলভেটের কাপড়ের ওপরে মুক্তো সেট করা।

ওর মুগ্ধতা দেখে কনকলতা অল্প অল্প হাসছিল, "এর ভিতরের জিনিসটা দেখে আরও মুগ্ধ হবি। আমার নিজের ইউজের জন্য চারটে শিশি সবসময় কাছে রাখি। তোকে সেই শিশি চারটে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু, কথা দিতে হবে, এই তেলের কথাটা তুই কাউকে বলতে পারবি না। বললে তেলের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে।"

"তুমি কী ইউজ করবে? আমাকে যে দিয়ে যাচ্ছ?" অহনা অবাক হয়েছিল।

"ঠিক প্রশ্ন। আমি নিজের কথা কি ভাবিনি? শোন, আমি কালই চলে যাচ্ছি। একটা রাতের জন্য সমস্যা হবে না। আমার কাছে সবসময় এসেনশিয়াল অয়েল থাকে। আমি নিজেই বানাই কিনা। এসব ছাড়। আমার কথাটা মন দিয়ে শোন। এই তেল কাউকে দেখাবি না। যত বেশি চোখের সামনে আসবে, ততই গুণ হারাবে এটা। আর, স্নানের আগে এক নাম্বার তেলটা ইউজ করতে হবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দুই নাম্বার তেল, রাতে শোয়ার আগে তিন নাম্বার তেল। আর চার নাম্বার তেলটা? যেদিন পিরিয়ড শুরু হবে, সেদিন নাভিকুণ্ডলীতে মাখাতে হবে। মাসে একদিন। একবার। চৌষট্টিবার নাভি ঘিরে তেল মালিশ চলবে ডানহাতের তর্জনী দিয়ে। চৌষট্টিবার একটি শব্দ বলতে হবে। কী সেই শব্দ? কানে কানে বলছি। আয়।"

"বলে কানে কানে শব্দটা উচারণ করেছে কনকলতা, "গত্রদেবী"। তারপর মনে করিয়ে দিয়েছে—"একটি কথাও ভুললে সব গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। মনে রাখিস।" বলে ফিসফিস করে কয়েকটা কথা বলেছে, গত্রদেবীর কথা। "প্রাচীন যুগে নারীরাই ছিল সমাজের নেতা বা নেত্রী। নবপলিয় যুগে থেকে একটা নিয়ম পালন করা হত। বছরের শেষ ফসল কাটার পরে নেত্রী রাক্ষসী গত্রদেবী তার পুরুষ সঙ্গীকে বলি দিয়ে জমিতে রক্ত ছড়িয়ে দিত। বাকি খানিকটা রক্ত নিজে পান করত। এভাবে সে নিজের আয়ু বৃদ্ধি করে চলছিল। কিন্তু শুধু আয়ু বৃদ্ধি করলেই হবে না। তাকে যৌবন অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। নইলে পুরুষ সঙ্গী পাবে না। এরকম এক অবস্থায় রাক্ষসী গত্রদেবী একবার এক বিশেষ পুজোর আয়োজন করে, যে পুজোতে চারজন পুরুষকে তার প্রয়োজন হয়। এদিকে কোনো পুরুষ গত্রদেবীর যৌনসঙ্গী হতে রাজি হচ্ছিল না। নিয়ম অনুযায়ী পুরুষের সঙ্গে জুলুম করা যাবে না। তাদের অনুমতি নিয়েই গত্রদেবীর সঙ্গী হতে হবে।

অগত্যা নিজের পরিবারের চারজনকে বিশেষ মাত্রায় সম্মোহন রস খাইয়ে তাদের মুখ থেকে অনুমতি আদায় করে রাক্ষসী গত্রদেবী। পুরুষেরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রাক্ষসীর যৌনসঙ্গী হতে রাজি হয়।

এক প্রাচীন গুহার মধ্যে রাক্ষসী তাদের নিয়ে যায়। কী পুজো হয়েছিল, সে গত্রদেবীই জানে। কিন্তু গত্রদেবীর হাতের সবটুকু জুড়ে অদ্ভুত মূর্তির ছবি আঁকা ছিল। সে কে কেউ জানে না। সে কি গত্রদেবীর পূজ্যদেবী? কোনো দেবী? নাকি অপদেবী? গত্রদেবী দীর্ঘদিন পরে গুহা থেকে বের হয়ে আসে। তার সারা শরীর ভেজা। কাদা শুকিয়ে আছে জায়গায় জায়গায়।

কিন্তু গুহা থেকে চারদিন পরে সে যখন বেরিয়ে এল, সেই পুরুষদের আর দেখা পাওয়াই গেল না তার সঙ্গে। তারা কোথায় গেল? গুহার মধ্যে আটকে গেল? কেন? বেঁচে আছে কি তারা? এসব প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারল না। একমাত্র জবাব দিতে পারত গত্রদেবী। কিন্তু সে নিজেই নিশ্চুপ। একাই সেই গুহার মুখ বিরাট পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিল গত্রদেবী।

কিন্তু একটা রহস্য গত্রদেবীকে নিয়ে হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে লাগল। এক যুবক একদিন গভীর রাতে একটা দৃশ্য দেখে ফেলল।

সেদিন ভরা পূর্ণিমা। ভেসে যাচ্ছে বনভূমি। ডুবে আছে চরাচর। স্নান করছে জ্যোৎস্না মেখে উডুমব্র পাহাড়ের চুড়ো। সেই সময় জ্যোৎস্না রাতে একা গুহামুখের পাথর সরিয়ে গুহায় ঢুকছে গত্রদেবী। যুবকটি ফলো করেছে তাকে। গত্রদেবী নিঃশব্দে গুহায় ঢুকে গেল। গুহামুখের পাথর সরাল না সে। গুহামুখের একধার থেকে সরু ধারায় অজানা কোন গহ্বর থেকে জল নেমে আসছে। গত্রদেবী সেই জলে নেমে পড়েছে সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে। তার হাতের ওপরের আঁকা মূর্তির গায়ে জল ছিটিয়ে স্নান করাল। তারপর নিজে ডুব দিল জলে। বারবার চৌষট্টিবার। যুবকটি প্রত্যেক পূর্ণিমায় গত্রদেবীকে ফলো করে করে গুহায় এসে গত্রদেবীর স্নান দেখত।"

"যুবকটিকে গত্রদেবী দেখতে পায়নি?" অহনার বুক ধুকপুক করছিল যুবকটির পরিণতির কথা ভেবে।

"শোন শোন। গত্রদেবী একবার ঘোর অমাবস্যার রাতে সেই গুহায় গেল। যুবকটির গত্রদেবীকে ফলো করাটা একটা নেশায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সেই অমাবস্যার রাতেও সে গত্রদেবীকে অনুসরণ করল। আগে আগে গত্রদেবী হেঁটে যাচ্ছে। পিছনে অন্ধকারে গা ঢেকে যুবকটি যাচ্ছে। জঙ্গলের অলিগলি, আনাচ কানাচ সবই হাতের তালুর মতো চেনা এদের। কোনোরকম অসুবিধেই হচ্ছিল না যুবকের। তাছাড়া গত্রদেবীর পায়ের অলংকার অন্ধকারেও বেজে যাচ্ছে খন খন শব্দে। সেই শব্দ শুনে শুনে তাকে অনুসরণ করা সহজ হয়ে গিয়েছে যুবকের।

জঙ্গলের লতাপাতা পথ ছেড়ে দিচ্ছে ওদের। মাঝে মাঝে কিছু শক্ত লতায় পা আটকে যাচ্ছিল যুবকের। কিন্তু নিজে থেকেই খুলে যাচ্ছিল।

একটা মোহময় শরীরকে নিয়ে আবিষ্ট যুবকটি আন্দাজই করতে পারেনি যে জঙ্গল একটু অন্যরকম আজ। লতায় পা আটকে গেলেও কার ইঙ্গিতে খুলে যাচ্ছে, সেটা যুবকের মাথায় আসেনি। সে এগিয়ে যাচ্ছে চুম্বকের টানে। গত্রদেবী একবারের জন্য পিছন ফিরে তাকায়নি। একবারও নয়। সে দীর্ঘ চুল দুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে গুহামুখের দিকে।

গুহায় ঢুকে যেখানে জল এসে পড়ছে, সেখানে আধো অন্ধকারে সে স্নান করল। গুহার ভিতরে কোথা থেকে জলের ধারা আসে, কেউ জানতেই পারেনি। সেই জলের ধারার রং ছিল লালচে। সেখানে স্নান করত সে। বের হয়ে আসত যখন, সে এক অপরূপা সুন্দরী হয়ে উঠত। যৌবনের আগুনে জ্বলত সে। পুরুষের দল পতঙ্গের মতো ঘিরে থাকত তার চারপাশে। পুরুষসঙ্গীর অভাব আর হয়নি গত্রদেবীর। কিন্তু, একজন পুরুষ সেই নারীর আধিপত্য সহ্য করতে পারেনি। যুবা পুরুষটি গত্রদেবীকে জুলুম করে পেতে চেয়েছিল। বলেছিল, "তোমার গুপ্তকথা আমি জেনে ফেলেছি। সবাইকে জানিয়ে দেব। কিছুই আর গুপ্ত নেই তোমার।"

গত্রদেবী তাকে আঘাত করে হাতের হাড়ের অলংকার দিয়ে। যুবক হিংস্র হয়ে ওঠে কামনা নিবৃত্তিতে বাধা পেয়ে। সে গত্রদেবীকে হত্যা করতে যায়। কিন্তু, পারেনি। গত্রদেবী হঠাৎ করে হাসতে শুরু করে। তারপর হঠাৎ করেই তাকে কাছে ডাকে। স্নান করে আসতে বলে সেই জলের ধারায়, "পবিত্র হয়ে এসো। তারপর আমাদের মিলন সম্ভব। তার আগে নয়।"

যুবক জলের ধারায় গা ভাসিয়ে স্নান করে উঠল। গত্রদেবী নিয়ম

শিখিয়ে দিল। "কামনা করতে জানতে হয়। যৌবনকে নতজানু হয়ে কামনা করো।" আবেগে উত্তাল যুবক দেবীর কাছে নতজানু হয়ে তাকে কামনা করল। আর সেই মুহূর্তেই গত্রদেবীর হাতের তীক্ষ্ণ ধান কাটা অস্ত্রে যুবকের গলা নেমে গেল জলের ধারায়। গত্রদেবীকে পরাজিত করা নয়, বরং দেবীর যৌবনের আগুনে আরও একটি বলি পড়ল। এই কাহিনি মনে রাখিস। গত্রদেবীকে ভুলিস না। নাভির চারপাশে আঙুল বুলোতে বুলোতে গত্রদেবীর নাম নিবি চৌষট্টিবার। একটি কথা ভুললে চলবে না। কিন্তু কাউকে বলাও চলবে না, জীবনের একটা সময় এসে এই বিদ্যা কাউকে দান করতে হবে। তখন তাকে বলবি, যেমন আজ তোকে বলছি। মনে থাকবে?" কথা বলতে বলতে নীল কন্ট্যাক্ট মণির চোখ অহনাকে দেখছিল। অহনার সেই দৃষ্টি দেখে বুক শিরশির করে উঠেছে। একবারের জন্য কনকলতাকে পাষাণপ্রতিমা বলে মনে হয়েছে। যেন প্রাণহীন একটি মূর্তি। কেমন স্থির ঠান্ডা গলায় অহনার দিকে তাকিয়ে বলছিল, "মনে রাখিস। মনে থাকবে?"

মনে রেখেছে অহনা। এক নাম্বার তেলটা নিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকেছে। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল খানিক। এখন ও নতুন বউ। সিঁথি জুড়ে সিঁদুর। নিজেকে দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকে একসময় সংবিৎ ফিরল। তারপর কালো শিশি থেকে তেল ঢেলে নিল হাতে। কয়েক ফোঁটা তেল, কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে কয়েক ফোঁটা তেলই সারা শরীরকে অয়েলি করে তুলল। অসম্ভব সুবাস তেলের মধ্যে। তেল মাখতে মাখতে একটা রিনরিনে ঝিমঝিমে সুর খেলা করছিল শরীরের মধ্যে। এক অচেনা জগতের দরজা যেন খুলে যাচ্ছিল অহনার মধ্যে। শরীরের প্রতি কোষে রিনরিন বাজনা বাজছিল। মাথা ঘুরছে।

ওয়াশরুমের মধ্যেই অহনার ঘুম পাচ্ছিল। ও কোনোরকমে তেলের শিশিটা বটুয়ার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল। তারপর কনকলতার ইন্সট্রাকশন মতো গায়ে হালকা গরম জল ঢেলে নিল। গরম জলের স্রোত শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে। অহনা জেগে উঠছিল। যেন ঘুম ভাঙছে ওর শরীরের। যেন পাষাণের শরীর প্রাণ পাচ্ছে। অহল্যার মতো। নতুন রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে কোষে কোষে। শিরা-ধমনীতে। গরম রক্ত। পুরোনো হয়ে যাওয়া সাতাশ বছরের শরীর দশ বছর আগের শরীরে ফিরে যাচ্ছিল। সাতাশের অহনা হয়ে উঠছে সতেরোর সদ্য পাপড়ি মেলা পদ্মকুঁড়িটি।

স্নানের পরে জামাকাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে নিয়েছে বটুয়া। দ্রুত ঘরে ঢুকে দেখে রীতেশ আলমারির কাছে দাঁড়িয়ে কী করছে। অহনা একবার ড্রেসিং ইউনিটের দিকে তাকিয়ে দেখল। তিন নাম্বার ড্রয়ারের ভিতরের লুকোনো ড্রয়ারে শিশিগুলো রাখে ও। এখন কী করে গুপ্ত ড্রয়ার বের করবে! রীতেশ কী করছে এখানে? তোয়ালের আড়ালেই বা কতক্ষণ লুকিয়ে রাখা যাবে তেলের শিশি! রীতেশ দেখে ফেললে কী বলবে অহনা?

মাথা ঝিম ঝিম করছে এমনিতেই। এর মধ্যে আবার রীতেশের দৃষ্টি থেকে তেলের শিশি লুকনোর চেষ্টা করতে হচ্ছে। বিরক্ত লাগতে শুরু করেছে।

রীতেশ আলমারির সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে সদ্য স্নানসিক্ত স্ত্রীকে দেখল, "আজ তোমাকে আরও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে।" বলতে বলতে লাজরক্তিম অহনার দিকে এগিয়ে আসছে রীতেশ, অহনা আতংকে পিছিয়ে গেল, "তোমাকে বাইরে ডাকছে যে! যাও। আমি তৈরি হয়েই আসছি। প্লিজ।"

রীতেশ যেতে যেতে ফের তাকাল, "তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। এমন সতেজ সুন্দরী খুব কমই দেখা যায়। আজ অনেক গল্প হবে কিন্তু। ঘুমিয়ে পড়বে না রাতে।" হাসতে হাসতে দরজা খুলে চলে গেল রীতেশ। অহনার মনে হল, ওয়াশরুমে ঢোকার আগে ও দরজা বন্ধ করেছিল। তাহলে রীতেশ খুলল কী করে? বাইরে থেকে লক খুলেছে! এটা মনে রাখতে হবে। যখন-তখন তেলের শিশি বের করার আগে সাবধান হতে হবে। কনকলতা বলেছে, এই তেল সর্বসমক্ষে এলে গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। সেকথা ভুললে চলবে? রীতেশের এই মুগ্ধতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে না? আজীবন? মুচকি হাসি ঠোঁটের কোণে খেলা করে চু কিত কিত খেলার মতো। একটা রহস্যের অংশীদার হয়ে পড়েছে অহনা। একটা রাক্ষসীতন্ত্রের মধ্যে ও আটকে গিয়েছে। একটা চক্রের মধ্যে।

"রাতের গুহার বুকে ভালোবেসে লুকায়েছি মুখ"

অহনার বুকের ভিতরে ছল ছল করে উঠল ভালো লাগার আবেশে। একটা কৃতজ্ঞতা নত হয়ে রইল কনকলতার প্রতি। আজ থেকে শুরু হয়েছে তেলের ব্যবহার। একদিনেই নজর কেড়েছে রীতেশের। দেখা যাক, একমাস ব্যবহারের পরে কেমন উন্নতি হয় চেহারার। এমনিতেই অহনা যথেষ্ট সুন্দরী। কিন্তু, এভাবে গতকালও মুগ্ধতা দেখায়নি রীতেশ।

অহনা সাবধানে যথাস্থানে তেলের শিশিটা রাখতে যাচ্ছে, পিছনে খুট শব্দ হতেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে রীতেশ এসে দাঁড়িয়েছে। নতুন বিয়ের পর এরকম ছুঁকছুঁকে হয় পুরুষ। ফের এসেছে রীতেশ।

অহনা হেসে বলল, "একটু বাইরে যাও। আমি চেঞ্জ করব।"

রীতেশ হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বটে, যাওয়ার আগে হাসি চওড়া হল, "এখন আমরা স্বামী-স্ত্রী কিন্তু। এরপর থেকে ড্রেস চেঞ্জের সময় বাইরে যাব না।"

অহনা বলল, "না। প্রত্যেকেরই প্রিভেসি রয়েছে কিন্তু। আমি সেটা মেইনটেইন করব। আশাকরি তুমিও করবে।"

রীতেশ হেসে চলে গেল। অহনা দ্রুত দরজা বন্ধ করে ড্রেসিং ইউনিটের কাছে গিয়ে চাবি দিয়ে লক খুলে ফেলল তিন নাম্বার ড্রয়ারের। ড্রয়ার টেনে সামনে এনে হাত ঢুকিয়ে গুপ্ত ড্রয়ার টেনে আনল। সাবধানে কালো শিশিটা ঢুকিয়ে রাখল। ফের সব আগের অবস্থায় এনে আয়নার সামনে দাঁড়াল।

আয়নার প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল অহনা। এক আশ্চর্য দ্যুতি ছড়িয়ে আছে মুখে। এরকম কি ছিল অহনা? স্নানের আগের মুহূর্তেও ছিল? না। এই গ্ল্যামার কি ছিল অহনার চেহারায়?

একটা সুবাস ঘিরে রয়েছে অহনাকে ঘিরে। অহনা নিজেকে

অদ্ভুত সুবাসের মধ্যে ডুবিয়ে ফেলেছে। মাটিতে পা পড়ছে না। হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে অহনা। আলমারি খুলে লাল জামদানিতে জরির ফুলওলা শাড়িটা বের করেছে। শরীর মুড়ে ফেলেছে গয়নায়। সিঁথি ভরে সিঁদুর পরে নিল। প্রসাধন সেরে ঘর থেকে বেরিয়েই রীতেশের মায়ের সামনে পড়ে গেল। রীতেশের মা কিছু বলতে গিয়ে রুদ্ধবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একসময় অস্ফুটে বললেন, "আশ্চর্য সুন্দরী তুমি। এতটা আগে বোঝাই যায়নি কিন্তু। এসো, তোমাকে আমার সঙ্গে লিভিং রুমে নিয়ে যাই। ওখানে আমাদের

সাতাশের অহনা হয়ে উঠছে সতেরোর সদ্য পাপড়ি মেলা পদ্মপুড়িটি।

আত্মীয়স্বজন সকলেই আছে। চল।"

অহনা বুঝতে পারছিল, ওকে দেখিয়ে আত্মীয়স্বজনের মুখ বন্ধ করে দিতে চাইছেন শাশুড়ি মা। হেঁটে যাচ্ছিল শাশুড়ি মায়ের সঙ্গে, কিন্তু নিজেও অবাক হয়ে যাচ্ছিল। কী হয়ে গেল এইটুকু সময়ের মধ্যে ! কনকপিসি ওকে নতুন জীবন দিয়েছে। যে সুবাসটা ওকে ঘিরে রেখেছিল, তার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অপূর্ব সুবাসের সঙ্গে আগে কখনো পরিচয় ছিল না অহনার। যেন এক সুগন্ধের শিশিতে ঢুকে আছে অহনা। নাক, চোখ, মাথা সব, শরীরের পুরোটা অংশ কনকলতার দেওয়া "সুবাসিত তেলে" ডুবে আছে।

লিভিং রুমে যাঁরা আড্ডা দিচ্ছেন, তাঁরা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। একজন বলেই ফেললেন, "ফিল্মে নামলে না কেন গো? বলিউড আদর করে নেবে তোমাকে। দুর্দান্ত সুন্দরী বটে।"

এক আত্মীয়া বলে উঠেছেন, "মেক-আপ খুব ভালো হয়েছে। ব্রাশারটা চমৎকার ইউজ করেছে। পাক্কা বিউটিশিয়ান বটে।"

অহনা হাসল, "আমি এইমাত্র স্নান করে বেরিয়েছি। মেক-আপের সময় পাইনি নয়, মেক-আপ করিও না। পছন্দ করি না।"

ওর কথাতেই কে মুখ কালো করে অন্যদিকে তাকিয়ে বসে রইল, সেসব দেখার প্রয়োজন অনুভব করল না অহনা। কালো শিশি আছে, কাউকে ভয় নেই। অহংকার দেখাতেই পারে ও।

অহনা এভাবেই কাটিয়ে দিচ্ছে । সাতটা দিন ভালোই কেটে গেল। রীতেশের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হয়ে উঠছে। একদিন তীব্র ভালোবাসাবাসির পরে রীতেশ ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন মাঝরাত পেরিয়ে গিয়েছে। অহনা ঘুমোনোর আগে ওয়াশরুমে গিয়েছে। ফ্রেশ হয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চমকে উঠেছে। কেউ একজন ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কে?

পাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পায়নি অহনা। কিন্তু ভয় পেয়েছে। তাড়াতাড়ি করে রীতেশের পাশে এসে শুয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু কাঁপুনি থামাতে পারেনি। কী হল ব্যাপারটা? সত্যিই কি কিছু দেখেছে ও? নাকি পুরোটাই কল্পনা? এই ওয়াশরুম বরাবরই ইউজ করছে এই বাড়িতে আসার পর থেকে। কিছুই দেখেনি। আজ কেন— ?

রাতে অনেকক্ষণ ঘুম আসেনি। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছে। স্বপ্নের ভিতরে কারা এসে ওর বিছানার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মাঝে একজন ঝুঁকে পড়ে ওকে দেখছিল।

অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙেছে। তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করেছে স্বপ্নটাকে। কিন্তু অস্বস্তিটুকু ছাড়া আর কিচ্ছু মনে নেই ওর।

শুয়ে থাকতে ভালো লাগছিল না। উঠে বেডরুমের লাগোয়া ব্যালকনিতে দাঁড়াতেই এক ঝলক ঠান্ডা বাতাসে চোখমুখ জুড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মন ঠান্ডাও হয়ে গেল। তবু মনে হল, একবার কনকলতাকে ফোন করবে। এরকম অনুভূতি কি কনকলতারও হয়েছিল বা হয়?

রীতেশ পাশ ফিরে ওকে না পেয়ে উঠে বসেছে, "হাই ডার্লিং, কোথায় গেলে?"

অহনা একটু বিরক্ত হল। এখনই চোখে হারাচ্ছে লোকটা! স্বাধীন ভাবে খানিকটা সময় পাওয়ার উপায় নেই নাকি? কিন্তু মুখে হাসি টেনে এনে রীতেশের কাছে এল অহনা, "ঘুম ভেঙে গেল।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ভোর দেখছিলাম। তুমি উঠে পড়লে এখন? চা বানিয়ে আনি? নাকি কফি?"

রীতেশ ওকে টেনে বিছানায় নিয়ে এল, "তুমি এসো। চা-কফি চাই না। এই ভোরে অন্যদিন উঠি নাকি? এসো।"

রীতেশের বক্ষলগ্না হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে অহনা দেখল, ব্যালকনি থেকে কেউ ঘরে ঢুকছে। হালকা পায়ে কে ঘরে ঢুকে পড়ল।

অহনা চমকে উঠেছে। ওহ, ব্যালকনির দরজা বন্ধ করে আসেনি অহনা। কে ঢুকে পড়েছে ওদের বেডরুমে?

উৎকণ্ঠিত চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে আর শুয়ে থাকতে পারল না। ধড়মড় করে উঠে বসেছে। রীতেশ সামান্য বিরক্ত হল, "কী হল বেগম সাহেবা?"

অহনা রীতেশের দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত গলায় বলল, "দেখ, কেউ ঘরে ঢুকেছে। আমি স্পষ্ট দেখেছি, ব্যালকনির দিক থেকে ঘরে ঢুকে পড়েছে। দেখ, ঘরটা ভালো করে। চোর এদিক দিয়ে কি আসতে পারে? পাইপ বেয়ে এসেছে!"

রীতেশ প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না। ঘরে চোর ঢোকার প্রসঙ্গ কখনো এই বাড়িতে আসেনি। হঠাৎ করে ভোরবেলায় চোর কেন আসবে, সেকথা ওর মগজেই ঢুকছিল না।

অহনার ভয় ক্রমে বিরক্তিতে পর্যবসিত হচ্ছিল। ও রীতেশের দিকে এগিয়ে এল, "যাও, দেখ। আমি আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও।" বেডসাইড টেবিলের ওপরের আলোটা জ্বালিয়ে দিতে ঘরের ভিতরের আবছায়া ভাবটা কেটে গেল। কিন্তু বিছানায় বসে থেকে চারপাশে নজর দিয়ে কিছু দেখতে পেল না দুজনে। অহনা খাট থেকে নেমে পড়ল। ও স্পষ্ট দেখেছে কাউকে ঢুকে পড়তে ঘরে। কিন্তু সে গেল কোথায়?

রীতেশ বউ-এর সাহস দেখে আর বিছানা আঁকড়ে থাকতে পারল না। দুজনে পালা করে খাটের নীচে, ক্যাবিনেটের পিছনে, ওয়াল আলমারি খুলেও দেখে অবশেষে বসে পড়েছে বিছানায়। রীতেশ বলল, "আমি আর একটু ঘুমোব অহনা। আধঘণ্টা ঘুমোই। যা খাটুনি গিয়েছে রাতে ! তুমি এত উসকে দাও আমাকে!" ফিচেল হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে রীতেশ শুয়ে পড়ল।

অহনা খানিকক্ষণ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ধাতস্থ হচ্ছিল। এত সকালে এই বাড়ির কেউ ওঠেনি ঘুম থেকে। একা একা ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় ভয় করছিল ওর। ব্যালকনির দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বাড়ির ভিতরের দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

এত বড়ো বাড়ি এই মুহূর্তে নিঝুম হয়ে আছে। যে যার ঘরে শুয়ে ঘুমের আবেশে আচ্ছন্ন। অহনা ব্যাক করে নিজের ঘরে ঢুকে আলমারি খুলে জামাকাপড় বেছে নিচ্ছিল। এখন স্নান করে নেবে? না। এখন নয়। এত সকালে স্নানের অভ্যেস নেই বলে ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। একটা হলুদ জরিপাড় তাঁতের শাড়ি বেছে নিল। ম্যাচিং ব্লাউজ, পেটিকোট নিল। আর নিল দুই নাম্বার কালো শিশির "সুবাসিত তেল"। কনকলতা বলে দিয়েছে, "সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে দুই নাম্বার তেলটা ইউজ করতে হবে।"

ড্রেসিং ইউনিটের তিন নাম্বার ড্রয়ার খুলে গোপন লকার থেকে দুই নাম্বার শিশিটা নিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকে পড়ল অহনা। গতকাল রাতে তিন নাম্বার তেলটা ইউজ করেছে। একটা স্বপ্নিল আবেশ ছিল ভোর পর্যন্ত। কিন্তু ওয়াশরুমের আয়নার ঘটনার পরে সেই আবেশ কেটে গিয়েছিল যেন। যেটুকু ছিল অবশিষ্ট, সেটুকু কেটে গিয়েছে চোরের ছায়া দেখে।

ওয়াশরুমের কাচের জানলা দিয়ে বাইরের নরম আলো এসে মোহময় পরিবেশ তৈরি করেছে। অহনা আয়নার দিকে তাকাল। এই আয়নার সামনে দাঁড়াতে আজ ভয় করছে না। শিশিটা নিয়ে সাবধানে রাখল ও। উন্মুক্ত করল আবরণ। এক নাম্বার শিশির তেল অল্প অল্প নিয়ে সারা শরীরে পেলব হাতে মেখে নিচ্ছে এখন। নিয়ম অনুযায়ী তেলহাত মুখে বুলিয়ে নিল। চব্বিশবার। চুলে চব্বিশবার। সারা শরীরে চব্বিশবার।

তেল শুষে নিচ্ছে শরীরের চামড়া। টানটান হয়ে উঠছে চামড়া। একেই ত্বক বলা উচিত। এমন চকচকে, গোলাপি, সুবাসে ভরপুর ত্বক কল্পনাতেও আসেনি আগে। একদিনের মধ্যে শারীরিক ক্ষয় পূর্ণ হয়ে উঠছে। চব্বিশঘণ্টা আগে ফিরে যাচ্ছে শরীর। তাজা হয়ে উঠছে কোষ। এনার্জিতে ভরপুর হয়ে উঠছে অহনা। যেদিন থেকে ব্যবহার করছে তেল, সেদিন থেকে বয়স এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। এটাই বিশেষত্ব এই তেলের। তেলটা সারা শরীরে পৌঁছে গিয়েছে। কোষে কোষে ঢুকে পড়েছে। ভারী চনমনে লাগছে ওর।

অহনা তৈরি হয়ে নিচ্ছে। স্পষ্ট অনুভব করল ওর পিছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। এই মুহূর্তে অহনার ভয় করছে না। কেন ভয় করছে না, নিজেও জানে না। কিন্তু এত এনার্জিতে ভরে আছে যে, কোনোরকম নেগেটিভ ধারণা মাথাতেই আসছে না। অহনা আলগা চোখে ওর ডানপাশে তাকাল।

কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। কুচকুচে কালো শরীর, অজস্র সাপের মতো নেমে আসা কোঁকড়ানো চুল, নিরাবরণ, ধকধকে চোখের একজন উত্তুঙ্গবক্ষা ধারালো তলোয়ারের মতো নারী ওর দিকে তার একটি হাত তুলল। সেই হাতের প্রতিটি আঙুলের অগ্রভাগ থেকে টপ টপ শব্দে রক্ত পড়ছে। মহিলা হাসল। চিরনদাঁতি। হাতের আঙুলগুলো অদ্ভুত কায়দায় নাড়াচ্ছে সে। অহনা সব ভুলে যাচ্ছিল। ওয়াশরুমের কিছুই ওর নজরে নেই এখন। একটা ফসল তুলে ফেলা ক্ষেতের ওপরে মুণ্ডহীন পুরুষের ধড় দেখতে পাচ্ছে। বলি হয়েছে সদ্য। ধড়ফড় করছে দেহটা। ধড়ের রক্ত থেকে খানিকটা নিয়ে অহনার কপালে টিপ পরিয়ে দিল কৃষ্ণ রমণী।

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে উঠল অহনা। ও কি ঘুমিয়ে পড়েছিল? ওয়াশরুমের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে? নাকি ভ্রম? আয়নার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল অহনা। ওর কপাল বেয়ে তাজা রক্তের সরু ধারা নেমে আসছে নাকের দিকে। রক্তের টিপ!

কিন্তু, ওয়াশরুমে এখন কেউ নেই তো!

হানিমুনে বেশি দূরে নয়, অজন্তা-ইলোরা টার্গেট ছিল অহনার। রীতেশ পছন্দ জানতে চাইলে নামদুটো বলেছে। রীতেশেরও আপত্তি হয়নি। ঠিক হল, গোয়া হয়ে ফিরবে।

৩

"পদ্মপাতা একটি শুধু জলের বিন্দু নয়"

এয়ারপোর্টের ঠিক মাইল খানেক আগে বার কাম রেস্তঁরায় গাড়ি দাঁড়াল কনকলতার। ক্যাব বুক করেই নিয়েছিল বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে। এই নাইন্টিনাইন লোটাস রেস্তোঁরায় আগে এসেছে কয়েকবার। বাড়িতে লুকিয়ে এখানে আসা হয়ে উঠত না সব সময়। তবে ফ্যাশন ডিজাইনার হওয়ার ইচ্ছেটা এই রেস্তঁরার মালিকের ছেলে রুরু মাথায় ঢুকিয়েছিল। মুম্বই যাওয়ার প্ল্যানটাও রুরুর। অনেক সাহায্য করেছে রুরু। ওদের মুম্বই-এর হোটেলে প্রথম কনকলতার র‍্যাম্প শো হয়েছিল। রুরু এখন কানাডায়।

তাহলে এখানে কেন এল কনকলতা? একটু হেসে ব্যাগ থেকে সাবধানে বের করে নিল আয়না। আয়নায় নিজের মুখ দেখে নিল। রেস্তঁরায় ঢুকে পছন্দমতো টেবিলে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। মনে মনে হাসছিল কনকলতা। যে আসবে, সে এই জায়গায় ঢোকার আগে সাতবার ভাববে। তবুও সে আসবে। অহনার বিয়ের দিন বাসরে গান-বাজনা হচ্ছিল, তখন নিঃশব্দে অনিমেষের ঘরে গিয়েছিল কনকলতা। অনিমেষ দরজা ভেজিয়ে সামনের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল। কনকলতার হিরের আংটি পরা আঙুল আস্তে দরজায় চাপ দিতেই দরজা খুলে গিয়েছিল। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার।

চুপ করে দাঁড়িয়ে অনিমেষের অবস্থানটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করল কনকলতা। ব্যালকনির দিকের দরজাটা খোলা। বিয়েবাড়ির আলোর ঝলক লুকিয়ে-চুরিয়ে ঢুকে পড়ছিল ব্যালকনিতে। সেখানেই গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অনিমেষকে দেখল কনকলতা।

শব্দ করেনি। নিঃশব্দে লক্ষ করে গেছে অনিমেষকে। এই লোকটি একসময়ে কনকলতার প্রেমে আকুল হয়ে গিয়েছিল। পাগল হয়ে গিয়েছিল যাকে বলে। সেই পাগলামো কি এখনও অবশিষ্ট আছে এর মধ্যে?

আছে, আছে। অনিমেষের চোখ দেখেছে কনকলতা। একটুও পালটায়নি চোখের দৃষ্টি। এখনও চোখে সেই সতেরোর ছেলেটি রয়ে গিয়েছে। অহনার বিয়েতে আসার লক্ষ্য অনিমেষ, একথা কেউ জানতেই পারবে না। অহনাও নয়। ভালোবাসা, স্তাবকতাকে কে মরে দিতে চায়? ইদানীং অনিমেষকে খুব মনে পড়ছিল কনকলতার। দেখতে ইচ্ছে করছিল। তাই আর দেরি করেনি। অহনার বিয়ে একটা উপলক্ষমাত্র। ওকে আসতেই হত। অনিমেষের কাছে আসতেই হত। জীবনের প্রথম প্রেমিককে না দেখে থাকতে পারছিল না কনকলতা। না, কনকলতা নয়। অনিমেষ ওকে ডাকত স্বর্ণলতা বলে। বেশ নাম। সেই নাম কি মনে আছে অনিমেষের? আজ জিজ্ঞাসা করবে কনকলতা। মাইকেল মধুসূদন দত্তের রসাল ও স্বর্ণলতিকা কবিতার লাইন বলত অনিমেষ, "উর্ধ্বশির যদি তুমি কুল মান ধনে/করিওনা ঘৃণা তবু নীচশির জনে।" বরাবরই নিজেকে হীনম্মন্যতায় ভরিয়ে রেখেছে অনিমেষ।

হঠাৎ করেই নাক ভরে শ্বাস নিচ্ছে অনিমেষ। কনকলতার উপস্থিতি টের পেয়েছে অনিমেষ। বিদেশি পারফিউমের সুবাস লুকিয়ে থাকতে দেয়নি কনকলতাকে। "গুচ্চি"—কনকলতার এই মুহূর্তের ফেভারিট পারফিউমের প্রথম দিকে আছে। মনে মনে একটু হাসল কনকলতা। এখন পিছন ফিরবে অনিমেষ। চমকে যাবে কি?

ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখে চমকে গেল ছেলেবেলার প্রেমিকটি। আধো অন্ধকার, আর বিয়েবাড়ির লাইটিংয়ে এক নিথর ধাতব মূর্তির মতো দেখাচ্ছিল অনিমেষকে। এই লোকটি গুহায় আছে। গুহাতেই বসবাস করেছে এতকাল। এবারে একে টেনে বের করবে কনকলতা। অন্ধকার থেকে আলোয়।

অস্ফুটে উচ্চারণ করেছে অনিমেষ, "তুমি! স্বর্ণলতা!"

অনিমেষের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে কনকলতা, "মনে আছে নামটা? আমি ভেবেছিলাম, তুমি ভুলে গিয়েছ। মনে আছে তাহলে?"

কেটে কেটে শব্দ উচ্চারণ করে অনিমেষ, "সব মনে আছে। আমি তো কোনোকিছু ভুলে উড়ে যেতে শিখিনি। তোমার মতো করে বাঁচতে শিখিনি যে! তুমি অনেক কিছুই শিখিয়েছ। কীভাবে সব ভুলে যেতে হয়, তোমাকে দেখে শেখা উচিত ছিল। অথচ দেখ, শিখতেই পারছি না। মেধা নেই তো! কী আর করা যাবে।" বলে ঘাড় ঝুঁকিয়ে বলে, "কেন ফিরে এলে তুমি? কেন ফিরে এলে? একটা মৃতদেহকে জলে ভাসতে দেখতে এসেছ?"

কনকলতা এগিয়ে গিয়ে অনিমেষের হাত ধরেছে। কেঁপে উঠেছে অনিমেষ। ওর বিবশ চোখ দেখে কনকলতা বুঝতে পারছে, অনিমেষ সবটা বিশ্বাস করতে পারছে না! ভাবছে স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করে চলেছে ও।

কনকলতা অনিমেষের হাত দুটো নিজের হাতের নরম মুঠোয় নিয়ে নিজের গালে চেপে ধরল। এভাবে সেই ষোলো বছরের মেয়েটি সতেরোর তরুণের হাত নিজের নরম গালে চেপে ধরত, না? মনে করিয়ে দিতে হবে অনিমেষকে। আগের সেই দুনিয়ায় ঢুকিয়ে নেবে প্রেমিককে। কনকলতা আর বোকামি করবে না। এক নিষিদ্ধ জগতের বাসিন্দা হলেও ওর কি প্রেমকে মনে পড়ে না? প্রথম প্রেমকে কেউ কি ভুলে যেতে পারে ? সেদিনের লেবু ফুলের গন্ধ, সেইসব বিকেলের রং এক ঝলকে দৌড়ে আসবে অনিমেষের কাছে। ওর বুকেও তুফান জাগবে, যেমন জেগেছে কনকলতার বুকে।

অনিমেষের হাত কাঁপছে কনকের নরম গালের ওপর। নতুন করে ভালবাসায় ডুবতে যাচ্ছে প্রেমিক। নতুনের পালিশই আলাদা।

কনকলতা অনুভব করে অনিমেষ বহুদিন আগের এক জ্যোৎস্না রাতের ছাদে পৌঁছে গিয়েছে এই মুহূর্তে। হয়তো জ্ঞানে নয়, অনুভবে চলে গিয়েছে। সেদিনের অসমাপ্ত মিলনের আকাঙ্ক্ষা আজও আকর্ষিত করে অনিমেষকে। জানে কনকলতা। সবটুকুই যদি দিয়ে দেয়, ভালোবাসার টান কমে যেতে পারে, ভেবেছিল সেদিন সেই মেয়েটি। কিন্তু, ভুল ভাবেনি। অনিমেষের চোখে প্রেমের প্রগাঢ় ছায়া ক্রমেই অবয়ব নিয়ে নেবে।

মনে পড়ে রাতে টুকটুক শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল কনকলতার। সে তখন সতেরোর তারুণ্যে ঝলমলে। আলাপ ক্রমে ক্রমে ঘন হয়ে উঠছে। শব্দটা শুনে ও এক মুহূর্ত দেরি না করে দরজা খুলে দিয়েছিল। বাইরে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ থকতে বলল অনি। ফিসফিস করে বলল, "ছাদে যাবে? জ্যোৎস্নায় পূর্ণ হয়ে আছে চরাচর। দেখবে?"

চুপিচুপি অনির হাত ধরে ঘুমন্ত বাড়িকে পিছনে ফেলে ছাদে উঠে গেল ও। অসম্ভব সৌন্দর্যে মুগ্ধ করে দিয়েছে তখন দুজনকে। ছাদ জুড়ে জ্যোৎস্নার আলো মাখামাখি করেছে ওরা সেই রাতে। একসময় একে অন্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার মধ্যে পূর্ণ আনন্দের স্বাদ নিতে চেয়েই হয়তো কাছাকাছি হয়েছে। অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে দুজনে। আকাঙ্ক্ষার চরম মুহূর্তে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল কনকলতা। নিতেই হয়েছিল। নিজেকে এমন করে বিলিয়ে দিতে পারেনি সে। ওইটুকু বয়সেও অনুভব করেছে, জীবন এখানে, এই জ্যোৎস্নাময় ছাদের মধ্যে আটকে থাকার নয়। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণকে দেখে একটি লোভী পুরুষ বলে মনে হয়েছিল। চরম মুহূর্তে যে লোভ ভালোবাসার ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছিল, তাকে ঘৃণা করেছে কনক। সেই ছুড়ে ফেলা দেখে হতাশ চোখে তাকিয়েছিল অনিমেষ।

হতাশ মানুষটিকে দেখে বিরক্তি জন্মেছিল কনকলতার। প্রেম মানেই কি এভাবে নিজেকে উন্মুক্ত করা? না। জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে অভিশাপ দিতে ইচ্ছে হয়েছে। এই সৌন্দর্যের কাছে নত হতে যাচ্ছিল ওর কুমারীত্ব! মনে হচ্ছিল, এমন সৌন্দর্যের অধিকারিণী হতে হবে, যার অধিকারে ও পুরুষকে নত করতে পারবে। ইচ্ছেমতো খেলাতে পারবে। অনিমেষকে দেখে কেন যেন ঘৃণা হয়েছে সেদিন, সেই জ্যোৎস্নাময় ছাদে দাঁড়িয়ে। এতই কি সহজ কনকলতাকে পাওয়া?

একটিও কথা না বলে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসেছিল। দ্রুত পায়েই নিজের ছোটো সাজানো ঘরে ঢুকে দরজায় সাবধানে খিল দিয়েছে। তারপর থেকে একটু দূরত্ব রেখেই চলেছিল কনকলতা। অনিমেষ ওর সামনে এলে কথা বলতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু, একা নির্জনে অনিমেষের সঙ্গ উপভোগ করা থেকে বিরতই থেকেছে ও।

মনে পড়ে ছোটোকাকার বিয়ের দিন কাকাকে মুখে ক্রিম মাখতে দেখে ফাজিল কোনো বউদি টাইপ মহিলা ছদ্ম ভয়ে বাকি মহিলাদের ডেকেছে, "ওরে, রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মতো লাগছে রে ওকে! সাবধান!" মহিলা মহলের হাসিতে আদিরসাত্মক ইঙ্গিত ছিল। খানিকটা বুঝতে পেরেছিল কনকলতা। এরপর থেকে ছোটোকাকাকে দেখলে পেটপুরে ভোজন করা বাঘটিকে মনে পড়ত, যার মুখ ক্রিম মেখে তেলতেলে। তৃপ্ত। কেন যেন অনিমেষ সম্পর্কে ওর মধ্যে "রক্তের স্বাদ পাওয়া" বাঘটিকে দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হত। অথচ, সাহস ছিল কি অনিমেষের? ছিল না। সেই কাপুরষত্বকে কি আরও বেশি ঘৃণা হয়নি কনকলতার?

আজ এই মুহূর্তে একটা টান অনুভব করছে কনকলতা। সে টান ওকে দিল্লি থেকে কলকাতায় নিয়ে এসেছে, এটাও যে মিথ্যে নয়। কে জানত এই চোরা টানের কথাটা? কনকলতা নিজেও কি জানত? হয়তো জানত। খেয়াল করেনি। আজ অনিমেষের সামনে দাঁড়িয়ে খুব ভালো লাগছে ওর। অনিমেষেরও ভালো লাগছে নিশ্চয়?

কনকলতা কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। অনিমেষ বিড়বিড় করে কিছু বলছে। কনকলতা অনিমেষের বুকের কাছে এসে দাঁড়ায়। অনিমেষ ওর গালে নিজের হাত রেখে, মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে প্রাচীন এক নদী-তরঙ্গ থেকে উঠে আসা শব্দের হিল্লোলে ভাসছিল, "তোমায় আমি দেখেছিলাম বলে/তুমি আমার পদ্মপাতা হলে/শিশির কণার মতন শূন্যে ঘুরে/শুনেছিলাম পদ্মপত্র আছে অনেক দূরে/খুঁজে খুঁজে পেলাম তাকে শেষে...।" কনকলতা আধো অন্ধকারেও বুঝতে পারছে অনিমেষ ভেসে যাচ্ছে লুকিয়ে রাখা কান্নায়। নোনা জলের স্রোত কেটে উঠে আসতে চাইছিল অনিমেষ। পদ্মপাতা খুঁজে পেতে হাহাকার করে চলেছিল একদিন, আজ ফিরে পেয়েছে।

নরম সুবাসের ভিতরে দুজনে আটকে রইল। একসময় কনকলতা ফিসফিস করে, "এই কবিতা তোমার মনে আছে? তখন বলতে। আমাকে কাছে পেলেই কবিতা বলতে। মনে আছে অনিমেষ?"

"আমার সব মনে আছে স্বর্ণলতা। তুমি ভুলেছ অনেক কিছু। জীবন তোমাকে অনেক বাঁক দেখিয়েছে বলে তুমি ফেলে আসা বাঁকের স্মৃতি ভুলে গিয়েছ। আমাকে তুমি অনি বলে ডাকতে। অনিমেষ বলে নয়।"

হাসল কনকলতা। এ সেই হাসি, যা ভুবন ভুলিয়ে দেয়। অনিমেষ কনকলতার মুখ নিজের দু-হাতের মধ্যে তুলে ধরে নির্নিমেষে দেখে। দেখতেই থাকে।

কেউ ডাকছিল অনিমেষকে। দুজনে সামলে নিল নিজেদের। অনিমেষ কথা দিল, কাল দেখা হবে। যেখানে বলবে স্বর্ণলতা, সেখানেই যাবে ও।

অপেক্ষা করতে করতে নিজের আঙুলের আংটি একবার খুলছিল, একবার পরে নিচ্ছে কনকলতা। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিল চোখ তুলে। ভাগলপুরি সিল্ক শাড়ির নীলাভ ছাই আঁচল সামলে নিল বুকের ওপর। অনিমেষ আসবে এখনই ওর স্বর্ণলতার সামনে। নতুন করে প্রেমে পড়বে। নিজেকে আলগোছে গুছিয়ে নিল কনকলতা। লিপস্টিকের কোরাল শেড একবার বুলিয়ে নিল।

একসময় তাকিয়ে সোজা হয়ে বসল। ওই যে! সে এসেছে! কনকলতা নতুন করে মুগ্ধ হয়ে পড়ছিল। চশমা পরা লম্বাটে শার্প মুখের পূর্ণ যুবককে দেখে মনে হয় না বয়স চল্লিশের ওপরে ছুটছে। তবুও একটু যেন ক্লান্ত লাগছে অনিমেষকে। একটু ম্লান?

রেস্তোঁরায় ঢুকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কনকলতাকে খুঁজছে। ইচ্ছে করেই কনকলতা অনিমেষকে অবজার্ভ করছিল। এখনও স্মার্ট, পৌরুষদীপ্ত চেহারা। ভালো লাগছে অনেকদিন পরে অনিমেষকে দেখে। সেই কৈশোর অতিক্রম করা তরুণটি আজও এই লোকটির মধ্যে লুকোচুরি খেলে চলেছে। বেজ কালারের প্যান্ট, কালো টি-শার্টের অনিমেষকে নতুন করে ভালোবাসতে ইচ্ছে করছিল কনকলতার।

দেখতে পেয়েছে অনিমেষ। কনকলতা একগোছা চুড়ি পরা হাত সামান্য উঁচু করল। শব্দ হল খন খন। এগুলো হাড়ের তৈরি। কত কত স্মৃতিতে ভরপুর এই অলংকার। সব মনে থাকে না। তবু,হাড়ের চুড়িগুলো মালহোত্রার পাঁজর দিয়ে তৈরি, এটা মনে আছে। মালহোত্রার গায়ের পারফিউমের গন্ধ লেগে আছে এই চুড়িগুলোর গায়ে। একবার নাকের কাছে হাতটা এনে গাঢ় শ্বাস নিল কনকলতা। নেশা ধরিয়ে দেয় গন্ধটা। মাদকের বিজনেস করত লোকটা। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মাদক লেপে রেখেছে যেন। নাক সিঁটকেও হেসে ফেলে কনকলতা।

এদিকেই আসছে অনিমেষ। সোজা, মেরুদণ্ড টান করে হাঁটার

শিশিটা নিয়ে সাবধানে রাখল ও। উন্মুক্ত করল আবরণ।

অপেক্ষা করে থাকব। দেখেছ, তোমার ফোন নাম্বারটা নেওয়া হয়নি। দাও, দাও।"

ফোন নাম্বার সেভ করতে করতে নরম করে হাসে কনকলতা, "এখন উঠতে হবে। কিন্তু মনে রেখো, আমার কাছে খুব তাড়াতাড়িই যাচ্ছ তুমি। যে ভুলগুলো আমাদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল, সেই ভুলের গায়ে পদ্মের পাপড়ি বুলিয়ে দেওয়া আমাদেরই কাজ হবে। সেটাই উচিত। আমি দিল্লিতে পৌঁছেই ফোন করব। নেক্সট প্ল্যান তখন করে নেব। তবে হ্যাঁ, এখনই বাড়িতে কিছু বলো না। লোকের দৃষ্টি আমার সয় না। আসি অনি? অনুমতি দাও।"

কেমন একরকম করে তাকিয়েছে অনিমেষ। কনকলতার অদ্ভুত লাগছিল সেই চোখ দেখে। অনিমেষ কি মাদকাসক্ত? এক অস্বাভাবিক অতৃপ্তি চোখের মধ্যে আটকে আছে যেন। যেন নেশাগ্রস্ত একটি মানুষ তাকিয়ে আছে কনকলতার দিকে।

এই দৃষ্টি দেখেছিল পারেখের মধ্যে। ইউনিভার্সিটির জুয়েল ঋতম পারেখ।

অভ্যেস ওর। এসে টেবিলের অপোজিটে বসল। সোজাসুজি তাকাল কনকলতার দিকে, "কেমন আছ?"

"কেমন আছি, জানো না বুঝি ?" আইল্যাশের ওঠানামা মাদকতা ছড়ায়, "বুঝতে পার না ?"

"জানি না। কাল জিজ্ঞাসা করা হয়নি, তাই আজ জানতে চেয়েছি। ভালো আছ। দেখে মন বলছে আমার স্বর্ণলতা ভালো আছে। সে জীবনের সব সুখকে এক জায়গায় জড়ো করে তার ওপরে তার পদ্ম পায়ের পাতা রেখে দাঁড়িয়ে আছে।" অনিমেষের চোখের দৃষ্টি চশমার ভিতরে গাঢ়।

কনকলতা চোখ নামিয়ে নেয়, "এমন সুন্দর করে বললে! এমন করে আমিও বলতে চাই অনি। পারি না। কেন পারি না বল তো? কবি নই বলে? তুমি এখনও কবিতা লেখ? আমাকে দেখাবে না?"

অনিমেষ অল্প হাসে, "তুমি মনে রেখেছ আমি কবিতা লিখতাম? দেখতে চাওনি। শুনতেও চাওনি। আজ এই নীলচে শাড়ির গুঁড়ো গুঁড়ো অভ্রকুচির মধ্যে তোমাকে নতুন করে দেখতে পাচ্ছি। তুমি আমার কাছে একেবারেই নতুন।"

"এখন একটা কবিতা বলবে? চলে যাব একটু পরেই। শুনতে ইচ্ছে করছে। একটুখানি বল অন্তত। মনে রেখে দেব।"

অনিমেষ নিজের হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে কী দেখছে কে জানে, "কবে আসবে আবার ? আসবে তো ? নাকি চলেই যাচ্ছ?"

কনকলতা গাঢ় গলায় বলে, "আসব অনি। আসব। আসতে যে আমাকে হবেই। এই দিনগুলোকে ভুলে যেতে পারি?"

দুজনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিভৃত মগ্নতায় ডুবে থাকে কিছুক্ষণ। একসময় কনকলতা বলে, "তুমি যাবে আমার কাছে? কিছুদিনের জন্য হলেও? এসো। আমি আমার সব নিয়ে

কনকলতার প্রেমে মশগুল ছিল। এই রকম নেশাগ্রস্ত চোখ ছিল পারেখের। মাদকাসক্ত ছিল পারেখ—? নাকি কনকলতাই ছিল ওর নেশার দ্রব্য? মানসিক, শারীরিকভাবে নির্ভর করে ফেলেছিল কনকলতার ওপরে! এই নেশার খপ্পরে একবার পড়ে গেলে সেই ঘোর কমে না। বাড়তেই থাকে। এক অস্বাভাবিক আকৃতি লেগে থাকে চেহারায়। এই আকৃতি অনিমেষের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছে কনকলতা।

"তোমার নীল চোখের মায়াকাজলে আটকে যাচ্ছি। মাকড়সার মতো।" বলল অনিমেষ, "কী করব বলতে পার?"

হেসেছে কনকলতা। বলার আর আছেই বা কী?

অনিমেষ এয়ারপোর্টে গিয়েছে কনকলতার সঙ্গে। অহনার ফোন এসেছে। কনকলতা ফোন রিসিভ করল না। অনির সঙ্গে যে সুন্দর মুহূর্তগুলো উপভোগ করছে ও, সেখানে অন্য কাউকে ঢুকতে দিল না। অনিমেষের নেশা কেটে যেতে দেবে না ও। নেশাতেই প্রেম জমে উঠবে।

ফ্লাইট ধরতে যাওয়ার আগেই অনিমেষকে বাই জানাতে হল। লাউঞ্জে বসে থেকে একটা গুজগুজ শুনছিল কনকলতা। ফ্লাইট নাকি লেট হবে কোনো কারণে। কনকলতা খবরটা শুনেও কান দেয়নি। তেমন হলে যাত্রীদের জানিয়েই দেওয়া হবে।

তখনই দেখল লোকটিকে। মাদক নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিতে যাচ্ছিল লোকটা। ধরা পড়েছে চেকিং-এর সময়ে। কুচো কুচো চুলওলা মাথায় একটা মোটা কালো ব্যান্ড। নির্বিকার চোখে চারপাশে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে। এই দৃষ্টিতে একটা পাগলাটে ব্যাপার আছে। কেমন যেন! যাকে ঠিকঠাক ভাষায় বোঝাতে পারে না কনকলতা। এই লোকটিকে প্লেন থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে?

আশ্চর্য! আগেই ধরা পড়েনি কেন? ফ্যাশন জগতের ডন মালহোত্রার একটা বিজনেস ছিল, সে খবর একমাত্র কনকলতাই জানত সম্ভবত। মাদকের চোরাচালানকারি ছিল মালহোত্রা। দুবাই যাতায়াত করত যেন এ ঘর থেকে ও ঘরে যাচ্ছে। কিন্তু ওকে কখনো মাদক নিতে দেখেনি কনকলতা। মালহোত্রা! খুব নেশায় পড়ে গিয়েছিল। ওর নেশা ছিল কনকলতা। এমন নেশাতেই পড়ে গিয়েছিল যে, নিজের গুপ্তকথা বলে দিয়েছিল কনকলতাকে। এক ঘোর রাতে নাইজেরিয়ার এক রিসর্টে ড্রিংক করতে করতে বলেছিল জীবনের শুরুতে কত রকম রাস্তা দেখেছে সে।

বহুদিন কলকাতায় ছিল মালহোত্রা। সেদিন রিসর্টে হেসে রক্তিম চোখ তুলে বলেছিল, "লরির ব্যাটারি বক্সে লুকিয়ে চব্বিশ কোটির মাদক পাচার করেছি গোল্ডি। কী করে খবর পেয়ে গিয়েছিল নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো। কলকাতায় শ্যামবাজার অঞ্চলে বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ আর এসটিএফের তদন্তকারীরা। চারটি দলে ভাগ হয়ে তারা শ্যামবাজার, ক্যানাল ইস্ট ও ওয়েস্ট রোড, বেলগাছিয়া রোড এবং বেলগাছিয়া মিল্ক কলোনি মোড়ের কাছে রয়েছে। আমি ছিলাম লরিতে। রাত সাড়ে ন-টা নাগাদ আমাদের লরিটাকে আটকে দিল পুলিশ। আর জি কর হাসপাতাল আছে না? সেখানে লরিটা যেতেই থামাতে চেষ্টা করে পুলিশ। না থামিয়ে গাড়িটাকে সোজা মিল্ক কলোনির দিকে নিয়ে যায় আমাদের ড্রাইভার। রসুল খান। এ বিষয়ে পাক্কা ছিল এ। এদিকে আমাদের জানা ছিল না যে মিল্ক কলোনির সামনে পুলিশের পাহারা আছে। গাড়ি ঘুরিয়ে থ্রি ডি বাসস্ট্যান্ডের দিকে নিয়ে যাওয়ার পরেই এসটিএফের দলের লোক আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়। সেখানেই শুরু হল তল্লাশি। বহোত তল্লাশি হয়েছে। কিন্তু ব্যাটারি বক্স খুলে দেখেনি ওরা। গাড়িতে কিছুই পেল না। আমাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।"

গ্লাসে চুমুক দিল মালহোত্রা, "লরি নিয়ে আমরা সোজা খিদিরপুর ডকে চলে গেলাম। কিন্তু রাস্তায় আমি ব্যাটারি বক্স খুলে নেমে গেলাম। আমার জন্য গাড়ি ছিল দাঁড়িয়ে। আমার নেমে যাওয়া লক্ষ করতে পারেনি তদন্তকারীরা। সে সময় মহরম চলছিল। রাস্তায় ভিড়, মিছিল ছিল। পিছনে পুলিশ ছিল জানতাম। ভিড়ে মিশে হাওয়া হয়ে গেলাম।"

শব্দ করে ঢেকুর তুলল মালহোত্রা, "এরপরে রসুলের সঙ্গে দেখা হল মুম্বইতে। সে আমার সঙ্গে যোগ দিল। চলছে এখনও। বাইরের কেউ জানে না এসব কথা। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না।"

এই বিশ্বাস ছিল মালহোত্রার কনকলতার ওপরে। সেই সুযোগ নিতে হয়েছে কনকলতাকে। মালহোত্রাও কিছুমাত্র সন্দেহ না করে প্রেমের নেশায় সাবধানতা, সন্দেহ ইত্যাদির সব ভুলে কনকের সঙ্গে চলে গিয়েছিল নির্জনে। তারপর তো হারিয়েই গেল ডন। কেউ সামান্যতম সন্দেহ করেনি কনকলতাকে। শুধু এই চুড়িগুলো মনে করিয়ে দেয় কনকলতাকে যে লোকটা আছে।

লাউঞ্জে বসে থেকে উড়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল কনকলতা। বিশ্বাসের মর্যাদা দেয় কনকলতা। ওর দুটো সত্তাকে একমাত্র ও নিজে জানে। আর খানিকটা জানতে পেরেছে অহনা। কিন্তু কনকলতার সবটা জানতে অহনাকে অনেক দেরি আছে।

দিল্লিতে পৌঁছে নিজের ম্যানশন হাউসের দু-হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে শাওয়ার নেওয়ার সময় হয়ে গেল। স্নান সেরে স্প্যানিশ মদ তেকিলা বা টাকিলার রেপোসাদোতে চুমুক দিতে দিতে নিজেকে ছেড়ে দেয় নিভৃত বেডরুমের অন্দরে। কিছু কিছু হিসেব ইদানীং গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ক-জন এল জীবনে? আরও কতজনকে আসতে হবে? হিসেব ঠিকঠাক রাখো কনকলতা। হিসেবের ভুল যেন না হয়। জীবনের স্বাদ বিভিন্ন রকম। এক অজানা-অচেনা নীল রঙের আগাভে উদ্ভিদের রস গেঁজিয়ে এই অসামান্য টাকিলা সৃষ্টি করেছে মানুষ। নীল আগ্নেয় উঁচু মাটি থেকে কী করে খুঁজে পেয়েছিল তেকিলাকে মেক্সিকানরা? আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই বলেই মনে করে কনকলতা। রিস্ক নিতে জানতে হয়। অজানাকে আপন করে নিতেও জানতে হয়।

ফের চুমুক দেয় গ্লাসে। বুক সামান্য মিষ্টি স্বাদে ভরে থাকে। আর আসে অদ্ভুত আমেজ। জীবনে কতজন এল রে কনক? হিসেব কর। হিসেবে গণ্ডগোল চলবে না।

উঠে ড্রেসিং রুমের স্লাইডিং ডোর খুলে দেওয়াল জোড়া আয়নার মধ্যে নিজেকে দেখে। সামনে থেকে, পিছন থেকে...পুরো মানুষটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে মন শান্ত হয়। হাতে সময় আছে শিকার ধরার জন্য। হাতে শিকার আছে। অন্তত চারজন আছে। খেলাতে হবে। খেলাতে হবে। অনেক সময় আছে হে গত্রদেবী। জমি প্রস্তুত করতে হচ্ছে।

ফের বেডরুমের দিকে যেতে যেতে একটা মুখ খুব কাছে এগিয়ে আসছিল। প্রেমময় মুখ। খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করছিল কনকলতার সেই প্রেমিককে। কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। উফ, পুরোনো প্রেমও কি ভাতে বাড়ে? হা হা হা। হাসতে হাসতেই ফোন হাতে তুলে নিল ও। ওদিকে রিং হচ্ছে।

"রোদ নিভে যায়"

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুজনে এয়ারপোর্টে পৌঁছোতে পৌঁছোতেই বৃষ্টি নেমে গেল। কলকাতাকে ভিজতে দেখে এসে মুম্বাই পৌঁছে বেশ ঝলমলে ওয়েদার পেয়ে মন খুশ। হোটেলের ঘর থেকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সাইড সিয়িং করে নেবে। তিনদিন পরে অজন্তা-ইলোরার দিকে যাত্রা। তারপরে গোয়া। দুর্দান্ত ট্যুর প্রোগ্রাম। অহনা হঠাৎ করেই হেসে ওঠে খুশিতে। মাঝে মাঝে অনেক কিছু ঝট করে হাতে এসে গেলে মন ভরে ওঠে। সেই খুশির ঝাঁপি উথলে ওঠে। তাকে আটকে রাখা যায় না।

অহনার হাসির শব্দে রীতেশ ঘুরে তাকিয়ে দেখল। হাসি সংক্রামিত হল রীতেশের মধ্যেও, "এখানে এসে মন খুব ভালো হয়ে গেছে তোমার,তাই না? আরেকটা জায়গায় নিয়ে যাব। সেই জায়গা মোটেই এমন আধুনিক নয়। সাগর নেই। পাহাড় নেই। ঝাঁ-চকচকে হোটেল, মল, বার-কাম-রেস্তোরাঁ নেই কো ম্যাডাম। কিন্তু এমন আশ্চর্য জায়গা যে মন ভালো হয়ে যেতে বাধ্য। যাবে?"

অহনা অবাক হয়ে গেল, "তাই? আগে বললে সেখানেই যেতাম!"

রীতেশ হাসে। কথা বাড়ায় না। অহনা ভাবে, রীতেশ কোন জায়গার কথা বলল?

প্ল্যান মাফিক বেড়ানো কমপ্লিট করে গোয়াতে পৌঁছেছে ওরা। দু-দিন কোলভা বিচ, চার্চ, শান্তা দুর্গা মন্দির দেখে তৃতীয় দিন ভাস্কো-দা-গামা শহর দেখতে বেরিয়েছে। একটি কোঙ্কনি রেস্তোরাঁয় বসে লবস্টারের অর্ডার দিচ্ছে রীতেশ, তখনই ফোনটা এল। অহনা স্ক্রিনে কনকলতার নাম দেখে খুব খুশি হল বটে, কিন্তু রীতেশের সামনে বসে কনকলতার সঙ্গে কথা বলতে চাইল না। কে জানে সুবাসিত তেল-এর প্রসঙ্গ যদি চলে আসে? রীতেশ শুনতে পেলে কী হবে? কনকলতা নিজেই বারণ করেছিল এই বিশেষ তেল নিয়ে যেন কারো সঙ্গে আলোচনা না করে অহনা। এমনকি রীতেশের সঙ্গেও নয়। তাহলেই নাকি সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

ফোন রিসিভ করে ইচ্ছে করেই রীতেশ পাশে আছে সেটা জানিয়ে রাখল অহনা, "কেমন আছ পিসি? আমরা গোয়ায় এসেছি। রীতেশ এখানেই আছে। আমার পাশেই। তোমাকে সেদিন ফোন করেছিলাম। রিসিভ করলে না দেখে বুঝতে পেরেছি বিজি আছ। এখন কথা বলা যাবে? ফ্রি আছ?"

ইঙ্গিতটা বুঝে কনকলতা বলল, "একটু দূরে সরে যা। যা বলব, মন দিয়ে শোন। তুই গোয়ায় গিয়েছিস যখন, কিছু লতা-পাতা নিয়ে আয়। তেল বানাতে লাগবে। বানানোর পদ্ধতি আমি শিখিয়ে দেব। হোয়া-তে মেসেজ করে দিচ্ছি। পরে কথা হবে। রীতেশকে বলিস পরে কথা বলব।"

হোয়াতে মেসেজ করেছে কনকলতা। অচেনা কিছু উদ্ভিদের নাম লিখেছে। এসব জোগাড় করবে কী করে?

প্রশ্নের জবাবে একটি নার্সারির নাম লিখে দিল কনকলতা। ভাস্কো-দা-গামা শহরের উপকণ্ঠে নার্সারি আছে। আজই পারলে চলে যাক অহনা। বেশি করে আনে যেন। কনকলতাও নেবে কিছু জিনিস। তার মধ্যে বিশেষ কিছু জিনিস আছে, যা অহনার এই মুহূর্তে দরকার হবে না। কনকলতার দরকার।

লতাপাতা, উদ্ভিদের নামগুলো দেখল অহনা। মারাঠা ছাল! চিলার বার্ক, ভিরান্ড, পডকুম, ব্ল্যাক ক্যাটফিশ, হলুদ ময়না। ওল্ড গোয়াতে ব্যাসিলিকা অব বম জেসাস চার্চ-এর মার্থা নামে একজন সেবিকার সঙ্গে দেখা করে যেন অহনা। সে কনকলতার পরিচিত। অহনা কনফারেন্স কলে কনকলতাকে ডেকে নিয়ে মার্থার সঙ্গে কথা বললে মার্থার কাছ থেকে দুর্লভ কিছু পাবে অহনা। সেই দুর্লভ জিনিস যেন নিয়ে আসে অহনা। মনে করে। কনকলতার বলে দেওয়া জিনিসগুলো মার্থা ঠিকঠাক গুছিয়ে দেবে।

রীতেশ লবস্টার নিয়ে ওয়েট করছিল। অহনা কনকলতার ফোন অফ করে রীতেশের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, "খুব ব্যস্ত পিসি। পরে তোমাকে ফোন করবে। আর আমি বলে ফেলেছি যে তুমি লবস্টার নিয়ে লড়ে যাচ্ছ। তাই শুনে পিসি বলল, রীতেশকে ডিস্টার্ব করছি না। শোনো না, পিসি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে কিছু ভেষজ লতাপাতা নিয়ে যেতে। খেয়ে নিয়ে চল। কিনে আনি।"

নার্সারিতে পৌঁছে মন দমে গেল অহনার। কেমন ঝিমিয়ে আছে চারপাশ। বহু পুরোনো নার্সারিতে মানুষ আছে বলেই মনে হচ্ছে না। ওরা দরজায় নক করতে ওদের পিছনের বাগানের ভিতর থেকে এক মধ্যবয়স্ক লোক শুকনো পাতার শরীর খচমচ করে ভেঙে দিতে দিতে বেরিয়ে এল, "ইয়েস।"

অহনা হোয়ার মেসেজ দেখে দেখে নামগুলো বলল। এগুলো চাই। লোকটি ভিতরে ডেকে নিল ওদের। ভিতরটা বড্ড গুমোট। স্যাঁতসেঁতে গন্ধের সঙ্গে পচা পচা গন্ধও নাকে এল অহনার। প্রাচীন গুহার ভিতরে ঢুকলে এরকমই লাগবে বলে মনে হয়।

রীতেশও গন্ধটা পেয়েছে। নাক সিঁটকে বলল, "কীসের গন্ধ বল তো? বিশ্রী। দম আটকে আসছে যেন। কাশি হচ্ছে আমার। পুরোনো কবরখানায় এরকম গন্ধ থাকে।" বলে খুক খুক করে একটু কেশে নিল রীতেশ।

"আঁধারের গহিন নিরুদ্দেশে"

লোকটা সারি সারি র‍্যাকে বসানো বোয়ম, টব জাতীয় পাত্রের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। গেল তো গেল, আর আসেই না। অহনার কেমন ভয় ভয় করছিল। কথাবার্তা নেই, এখানে চলে এল। কে জানে এরা কেমন! বড্ড নির্জনও বটে এদিকটা। লোকটা কি একাই আছে এখানে?

রীতেশও উশখুশ করছিল। কিন্তু, অহনা ভড়কে যাবে ভেবে কিছু বলল না। চারপাশে তাকিয়ে জনপ্রাণীর দেখা পাওয়া গেল না। রীতেশ একটু এদিক-ওদিক দেখছিল হেঁটে হেঁটে। এক জায়গায় লম্বাটে আলমারি। অনেকগুলো দরজা সেই আলমারির। এটায় কি নেটের দরজা লাগানো হয়েছে?

খানিকটা নীচু হয়ে ভিতরটা উঁকি মেরে দেখল রীতেশ। আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছিল। কী সব যেন—! ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে অনেকগুলো শুকনো শুকনো গাছের ডাল রাখা আছে। ভালো করে দেখবে বলে মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালতেই চমকে উঠে টর্চ অফ করে দিয়েছে রীতেশ। দ্রুত চলে এসেছে অহনার কাছে। বুক ঢিবঢিব করছিল রীতেশের। আচমকা ভয় পেলে যেমন হয়।

রীতেশের এই পরিবর্তন খেয়াল করে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছে অহনা। রীতেশ মাথা নাড়ল, "না, কিছু না। অত চিন্তা কেন? লোকটা কোথায় গেল বল তো?"

ঠিক আধঘণ্টা পরে বেরিয়ে এল লোকটা। ছোটো-বড়ো নানা ধরনের প্যাকেট হাতে। গুনে দেখল অহনা। বারোটা প্যাকেট। দামটা ভালোই হল। এখানে কার্ড ইউজ হয় দেখে স্বস্তি পেল অহনা।

জিনিসগুলো নিয়ে ফিরে এল ওরা। অহনা পরের দিন ওল্ড গোয়ার ব্যাসিলিকা অব বম জেসাস চার্চ দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে রাখল। রীতেশ অহনাতে মগ্ন হয়ে আছে। অহনা রীতেশের বুকে মাথা রেখে কথা বলছিল। জানতে চেয়েছে এমন কোন জায়গা আছে, যেখানে অহনাকে নিয়ে যেতে চায় রীতেশ?

রিতেশ ওর নদিয়ার রাহাকাকুর বাড়ির কথা বলছিল। রাহাকাকু

ওর নিজের কাকু নন। বাবার বন্ধু। রাহাকাকুর মাকে রীতেশের বাবা নিজের মায়ের মতোই মনে করেন। ঘোরতর গ্রাম। সেখানে সবুজে সবুজ চারপাশ। লাল মাটির রাস্তা। ছোটো ছোটো টালির চালগুলা ঘর। খড়ের ঘরও আছে। পুকুর। নাটমন্দির। রাধামাধবের মন্দির। রাহাকাকুর মা নিজের হাতে পায়েস রেঁধে খাওয়ান রীতেশকে। এ স্বাদের কোনো তুলনা হয় না। সেখানে প্রতিমা পিসি আছে। সবজি খেত থেকে পটল-বেগুন তুলে এনে রান্না করেন। পুকুরের মাছে ঝোল।

বলতে বলতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল রীতেশ। একসময় ও বলল, "একটা কথা কিন্তু তোমাকে বলা হয়নি। বলব?"

"বলব মানে কী?" অহনা অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রায়, "কী বলতে এত অস্বস্তি হচ্ছে তোমার?"

রিতেশ বলল, "তোমার পিসি কীসের জন্য ওষুধ নিচ্ছেন তোমাকে দিয়ে?"

ভিতরে ভিতরে সাবধান হয়ে গেল অহনা, "কেন বল তো?"

"না, মানে, সেই যে নার্সারিতে গেলাম, একটা লম্বাটে আলমারির ভিতরে কিছু আশ্চর্যজনক জিনিস দেখেছি। ওসব দিয়ে কী ওষুধ তৈরি হয়?"

"কী দেখেছ তুমি?" অহনার গলার স্বরে উদ্বেগ কাঁপে। কী জানতে পেরেছে রীতেশ?

"কিছু মরে যাওয়া কাঠবেড়ালি শুকিয়ে চিমসে হয়ে পড়েছিল আলমারির র‍্যাকে। একটা র‍্যাকই দেখেছি। অন্যগুলো দেখার মতো সাহসই পাইনি। কী হয় ওই জন্তুগুলোর মরা শরীর দিয়ে? কে জানে!"

রীতেশের মুখে শুনে গা ঘিন ঘিন করে উঠেছে অহনার। মরা জন্তু আলমারিতে গুছিয়ে রেখেছে কেন? কিছুক্ষণ দুজনের কেউই কথা বলেনি। রীতেশ কী ভাবছে, জানতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু অহনা সাবধান হয়ে গেল। অতিরিক্ত কৌতূহল দেখালে রীতেশও কৌতূহলী হয়ে উঠবে। তদন্তের একটা মনোভাব দেখা দেবে। কী দরকার এসব খুঁচিয়ে বের করার? বরং ওর মন থেকে এসব দূরে সরিয়ে দেওয়াই ভালো। অহনা হেসে উঠে বলল, "তুমিও যেমন। ওগুলো এক ধরনের গাছের ডাল গো। আমি পড়েছি এই ডালগুলো একটা কী গাছের যেন। এসব এলাকাতে পাওয়া যায়। ওষধি গুণ রয়েছে। দেখতে অনেকটা কাঠবেড়ালির মতোই।"

রীতেশ হাসল। মুখে কিছু না বলে অহনাকে কাছে টেনে নিল। মুখের ওপরে নেমে আসা চুল আলগছে সরিয়ে দিতে দিতে রীতেশ ভাবল, ডাল মানে? কীসের ডাল এরকম হয়, যার মরা চোখ দেখেছে রীতেশ? অহনা ঢাকছে কেন বিষয়টা? নাকি সত্যি বলছে? তাহলে রীতেশ যা দেখেছে সেগুলো গাছের শুকনো ডাল মাত্র?

রিসর্টের পাশেই বাসস্ট্যান্ড। বাসে উঠে পরের দিন সকালে ওলড গোয়ার চার্চের দিকে রওনা হল। ছাব্বিশ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পৌঁছে গেল বাস চার্চের কাছে পৌঁছোল। প্রচুর ট্যুরিস্ট রয়েছে। স্থানীয়দের কাছে এই চার্চ অত্যন্ত পবিত্র। এখানে গুপ্ত কক্ষে সেন্ট জেভিয়ারের দেহ রাখা আছে।

এখানে সেন্ট জেভিয়ার সম্পর্কে লেখা আছে মার্বেল পাথরের ওপরে। ধর্মযাজক সেন্ট জেভিয়ার ১৫৫২ সালে মারা যান। প্রথমে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় চিনের তাইশনে। পরে তাঁর দেহ মালয়েশিয়ার মালাক্কায় নিয়ে যাওয়া হয়। সবশেষে ভারতের গোয়ায় আনা হয় সেন্টের দেহ। শোনা যায়, কোনোরকম কেমিক্যাল ছাড়াই তাঁর দেহ এখনও অক্ষত রয়েছে। অলৌকিক শক্তির কারণেই এরকম হয়েছে, বলা হয়। এটাই বিশ্বাস।

চার্চটা দেখে অহনার বুকের ভিতরে কেমন করে উঠল। মনে হয়, কতকাল কেউ আসেনি এখানে। যেন চিরনিদ্রায় রয়েছে চার্চ। লালচে দেওয়ালে মাঝে মাঝে চুন-সুরকি খসে গিয়েছে। সেখানে জন্মেছে অচেনা উদ্ভিদ। অহনার মনে হচ্ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঢুকে গিয়েছে ও।

চার্চের কাছাকাছি এই মুহূর্তে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা। সারি দেওয়া বেঞ্চ। শেষ মাথায় জমকালো মঞ্চ। মঞ্চের পিছনের দেওয়াল সোনায় মোড়া। কোথাও শিশু ডানা লাগিয়ে উড়ছে। প্রাচীন লতাপাতার অভূতপূর্ব নকশা। সেন্ট জেভিয়ারের দেহ রাখা আছে উঁচু বারান্দার মতো জায়গায়। কফিন রুপোয় বাঁধানো। প্রতি দশ বছরে একবার সেন্টের দেহ জনগণকে দেখানো হয়। দু-হাজার চোদ্দো সালে শেষবার দেখানো হয়েছিল।

চার্চের ভিতরের কারুকাজ দেখছিল ঠিকই, মন পড়ে ছিল মার্থা নামের মহিলার দিকে। তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে ? রীতেশকে কিছু বলাও যাচ্ছে না। অথচ বলতে হবে। কনকলতার নাম করে বলা যাক।

অহনা বলল, "আচ্ছা, এখানে মার্থা নামে একজন আছেন। পিসি বলেছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কী করে যোগাযোগ করি বল তো?"

রীতেশ অবাক হল, "এখানে মার্থা নামের কেউ আছে? বেশ, আমি দেখছি। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করবে কার কাছে?" অহনা বলল, "আমরা চার্চের পিছনের দিকে গিয়ে দেখি। ওদিকে মার্থার ঘর শুনেছি। চল, গিয়ে দেখা যাক।"

চার্চের পিছনের দিকে ঘন সবুজ উপত্যকা। ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে কোথায় কে জানে! চার্চের পিছনের দিকে ছোট্ট পাথরের ঘর। অহনা ইশারায় ঘরটা দেখিয়ে রীতেশকে নিয়ে এগিয়ে গেল। ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে অহনা ডাকল, "মার্থা ম্যাডাম! আপনি ঘরে আছেন?"

রীতেশ বলল, "উনি মারাঠি জানেন। বাংলা জানেন না। আমি বলছি। অল্প অল্প মারাঠি জানি। এক সময়ে মুম্বইতে চাকরি করেছি।" বলে এগিয়ে গিয়ে ডাকল রীতেশ, "মার্থা, তু ঘরি আহেস কা?"

ঘরের দরজা খুলে গিয়ে খুব কালো এক মহিলা বেরিয়ে এলেন, "কৌন?"

অহনা কনকলতার নাম বলতেই মার্থার মুখে অদ্ভুত রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল, "ও কাঁহা হ্যায় অব?"

"কলকাতা মে। কনফারেন্স কল মে বাত করনা চাহতে হ্যায় কনকলতা।" অহনা ফোনে কনকলতাকে ডেকে নিল। তিনজনের কথা হচ্ছে। রীতেশকে সরে যেতে বলল মার্থা। রীতেশ অপ্রস্তুত হয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়াল। তিনজনের কথা শুরু হল।

কথা শেষ হলে মার্থা তার পাথরের ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল।

খানিক পরেই ফিরে এল। হাতে বড়ো প্যাকেট। ওটা অহনার হাতে দিয়ে দ্রুত ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল। একটা কাচের ছোটো চ্যাপ্টা পাত্র নিয়ে বেরিয়ে এল। অহনা দেখল কালচে থকথকে পদার্থ সেই পাত্রে। এর কথাই বলেছে কনকলতা। এটা নিয়ে যেতে হবে কনকলতার জন্য।

মার্থা বলল, ''মাগুবী নদীর জলে নিজের ছায়া দেখ। আজকেই।''

চার্চ থেকে বেরিয়ে অটো নিয়ে মাগুবী নদীর তীরে গেল ওরা। রাস্তা মসৃণ। দু-পাশে বেঁটে বেঁটে অচেনা গাছের সারি। আজ আকাশে সামান্য মেঘ রয়েছে। এখানে বৃষ্টি বেশি হয় বলে শুনেছে অহনা। রাস্তাটা ডানদিকে বাঁক নিতেই সামনে নদীর চর চোখে পড়ল ওদের।

অহনা মার্থার কাছেই শুনেছে, এই নদীর বিশেষত্ব হল, যেখানেই দাঁড়ানো যাক না কেন, জলে ছায়া পড়বেই। অটো ওদের ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। দাঁড়াতে বলেছিল রীতেশ। কিন্তু অটোর ড্রাইভার বলল, এখানে প্রচুর অটো পাওয়া যায়। অসুবিধে হবে না ওদের।

বরাবরই অহনার জলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ভালো লাগে। বেড়াতে গিয়ে দিঘার সমুদ্রের কাছ থেকে নড়াতে পারেনি কেউ ওকে। পুরীতেও। এমনকি অদিতিদিদুর বাড়ি অর্থাৎ বাবার পিসির বাড়ির পুকুরের ধারে ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেছে। জল যেন ওকে টানছিল সখীর মতো করে। অহনার ছায়া পড়েছে জলে। ছায়ার হাতে কাচের পাত্র। পাত্রে কালো পদার্থ।

অহনা অবাক হল বলা বাহুল্য। সব কিছুর মধ্যেই এক অন্যরকম কিছু ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। মার্থার খোঁজ পেল কী করে কনকলতা? মার্থার মধ্যেও এক ধরনের রহস্যময়তা রয়েছে, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। হঠাৎ করেই গা ছমছম করে উঠল অহনার। যাকে সহজে বোঝা যায় না, তাকে ভয় হয়, তার সম্পর্কে অস্বস্তি হয়। অহনার মধ্যে সেই ভয়, সেই অস্বস্তি দানা বাঁধছে। সাবুদানার মতো গুড়গুড় করে ভয়টা চলে ফিরে বেড়াচ্ছে সারা শরীরময়। মনের ভিতরেও। শ্যাম্পু করা খোলা চুলের গোড়ায় গোড়ায় একরাশ সাবুদানা চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, টের পাচ্ছে অহনা।

জলের ছায়ার দিকে তাকিয়েছিল অহনা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অহনাকে। হাতের পাত্র একেবারেই স্বচ্ছ জলে ফুটে আছে। যেন কাচে প্রতিবিম্ব পড়েছে। অহনা মার্থার কথামতো নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছে। আস্তে আস্তে আরও একটা ছায়া পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। স্পষ্ট নয়, কেবলমাত্র আভাস যেন। সে অহনা নয়। অন্য কেউ। যেন হাত বাড়িয়ে পাত্রটা ধরে আছে। অহনা অনুভব করল পাত্রের ভার খানিকটা কমেছে। যেন অন্য কেউ ভারটা খানিক নিয়েছে।

''তোমার নীল চোখের মায়াকাজলে আটকে যাচ্ছি। মাকড়সার মতো।''

একটা শীতল বাতাস উড়ে এল অনেক দূর থেকে। বাতাসে জলের গন্ধ। অহনা কেঁপে উঠেছে। সেই কম্পনে জল কেঁপে উঠতেই অহনার পাশে দাঁড়ানো ছায়াটা ভেঙে গেল তিরতির করে। অহনা নিজের পাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, কেউ ওর পাশে নেই। এমনকি রীতেশকেও কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে না। এই নদীর তীর,হু হু করা বাতাস, কোথাও কেউ নেই। এমন পরিবেশে বড্ড নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল অহনা। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। রীতেশকে জোরে ডেকে কাছে আসতে বলবে, সেই ইচ্ছেও করছে না। মনে হচ্ছে এই জলে ডুবে যেতে। যেখানে ছায়া ভেঙে গিয়েছে, সেখানে নেমে যেতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছেটা এত তীব্র হয়ে উঠছে যে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না অহনা। জলের দিকে পা বাড়াতেই চমকে উঠেছে। ওর হাত টেনে ধরেছে রীতেশ। আশ্চর্যের সঙ্গে ত্রাস মিশে আছে রীতেশের গলায়, ''কী করছ অহনা? জলে নামছিলে কেন?''

অহনা সচকিত হয়ে সরে আসতে গিয়ে দেখল, জল থেকে উঠে আসছে ভেঙে যাওয়া ছায়াটা। ক্রমে ক্রমে জড়ো হয়ে আকার নিচ্ছে। জল কাঁপছে। ছায়াটার আভাস ভেসে চলে যাচ্ছে কোথায় কে জানে।

রীতেশ অহনাকে ঝাঁকুনি দিল, ''এই, চল এখান থেকে। কী হয়েছে তোমার? কেমন যেন অ্যাবনর্মাল লাগছে তোমাকে। চল, চল।''

অহনা কথা না বাড়িয়ে রীতেশের হাত ধরে নদীর তীর থেকে

বের হয়ে এল। এরপর রিসর্টে ফিরে চেঞ্জ করে ফ্রেশ হয়ে এক কাপ গরম ক্যাপুচিনো মুহূর্তে উদ্দীপিত করে তুলল অহনাকে। খোলা চুল বড়ো ক্লাচে আটকে নিয়ে অহনা মার্থার দেওয়া পাত্র আর নার্সারির প্যাকেটগুলো বড়ো ক্যারিব্যাগে ঢুকিয়ে ট্রলিব্যাগের মধ্যে রাখতে গিয়ে থমকাল। এখানে নয়। নিজের সঙ্গে যে ব্যাগ সবসময় থাকে, সেটাতে বেশ এঁটে যাবে এগুলো। কাছে রাখাই ভালো। দুর্লভ মূল্যবান পদার্থ। এসবের মূল্য আর কেউই বুঝতে পারবে না যদি না এর গুপ্ত ব্যাপার সে জানে। এবং কথাটা হল, গুপ্ত ব্যাপারটা এমনই যে কাউকে জানানো চলবে না।

রীতেশ অনেকক্ষণ ধরেই প্রশ্নটা জমিয়ে রেখেছে। এবারে না করে আর পারল না, "এগুলো কী? মানে কী হয় এসব দিয়ে?"

অবলীলায় মিথ্যে বলল অহনা, "এসব কনকলতা পিসির। আমি জানি না কী হয় এসব দিয়ে। রেখে দেব। যেদিন আমাদের বাড়িতে আসবে, নিয়ে যাবে।"

পরদিন রিসর্টের খুব কাছে একটা হইচই শুনে রীতেশ কৌতূহলে বের হয়েছিল। রাস্তার মোড়ের দিকে একটা গোলমাল হচ্ছে। স্থানীয় ব্যাপারে এন্ট্রি না নেওয়াই ভালো মনে করে রীতেশ এগোয়নি। কিন্তু রিসর্টের স্টাফ শিবা গোলমালের ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে রিসর্টে ঢুকছে, রীতেশকে দেখে বলল, "এখানে আরেকটা মানুষ লাপাতা হয়ে গেছে। এ নিয়ে দশজন কি আরও বেশি হবে। বছরে দুবার এখানে মানুষ হারিয়ে যায়। পুলিশ কিছুই করতে পারছে না।"

রীতেশ শিবার মুখের কথাটা শুনে খুব অবাক হল। এখানে মানুষ হারিয়ে যায় ? মানে? কারা হারিয়ে গেছে? লোকাল লোক? এই ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না?

শিবা একটু দাঁড়াল, "লোকাল লোক হারিয়েছে অনেকগুলো। আমিই কয়েকজনকে চিনতাম। রিসর্টে চিকেন দিত হ্যারি, সে হারিয়ে গেল একদিন। ফ্রান্সিস, ডিসুজা, এরা দুজনও হারিয়েছে একমাস আগে-পরে। না, আমরা কেউ কিছু জানি না। কেউ বলে ভ্যাম্পায়ার, কেউ বলে গোস্ট মানুষকে তুলে নিয়ে যায়। জানি না সাব।"

রীতেশ চিন্তিত সুরে জানতে চায়, "লোকাল লোক হারিয়ে যাচ্ছে, এখানে কেউ কিচ্ছু করছে না?"

"চেষ্টা করছে থানা থেকে। মাইকিং হয় রাতের দিকে বের না হতে। কিন্তু, দিনের বেলাতে যদি মানুষ হারিয়ে যায়, তাহলে কী করা যাবে?"

"ট্যুরিস্ট নিশ্চয় হারায়নি?" রীতেশ শঙ্কিত।

"ট্যুরিস্ট? হ্যাঁ, হারিয়েছে। একটা কাপল এসেছিল তিনমাস আগে। এই রিসর্টেই উঠেছিল। বহোত সুন্দর। ওরা বেড়াতে বের হয়েছিল। ওয়াইফ এই রিসর্টে অপেক্ষা করছে, হাজব্যান্ড গিয়েছে ফুল কিনতে। ওদের সেদিন চার্চে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অপেক্ষা করে করে টায়ার্ড হয়ে পড়েছে ওয়াইফ। হাজব্যান্ড আর ফেরেনি। আজতক ফেরেনি। পুলিশ এসেছিল এখানে। আমাকে পুছতাছ করেছে। কিন্তু হদিশ মেলেনি হাজব্যান্ডের। হাজব্যান্ডের বাড়ি থেকে লোক এসেছিল। খুব ঝামেলা হয়েছে। থানা-পুলিশ, মিডিয়া সবাই জোর কাজ করেও হাজব্যান্ডের কোনো খোঁজ পায়নি। আপনারা কি আজ চলে যাচ্ছেন ?"

"কাল। কাল ভোরে চলে যাব।"

"সাবধানে থাকবেন সাব। নতুন লোক আপনারা। কাউকে বিশ্বাস করবেন না। এখানে কারা ডাইন, জানা যাচ্ছে না। এই এলাকায় সবাই খুব ভয়ে আছি। ডাইন ধরা পড়বে কবে,কে জানে!"

কথা বলতে বলতে ভিতরে চলে গেল শিবা। রীতেশ ব্যালকনির সোফায় বসে পুরো ব্যাপারটা আত্মস্থ করার চেষ্টা করছিল। এই ধরনের ঘটনার কথা ও গল্পের বইতে পড়েছে। সত্যিই যে এরকম হয়, জানতেই পারত না এখানে না এলে। অহনাকে জানিয়ে রাখা দরকার। ও একটু সরল। কেউ ডেকে ক্লোরোফর্ম করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেতে পারে।

অহনা চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে ফোনে কথা বলছে। রীতেশ কিছু কিছু কথার অংশ বিশেষ শুনতে পাচ্ছিল। কার সঙ্গে কথা বলছে অহনা বুঝতে পারছে না রীতেশ। তবে, মার্থার নামটা বলল অহনা। কাকে মার্থার কথা বলছে? কনকলতাকে? সেটাই হবে। মার্থাকে আর কে চেনে?

রীতেশকে দেখে ফোনের অপর প্রান্তকে অহনা "পরে কথা বলছি।" বলে ফোন অফ করল। হেসে বলল, "বাইরে গেছিলে?"

"না। একটা গোলমাল হচ্ছে রাস্তায়, তাই বের হয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। শিবা নামে যে স্টাফ রয়েছে এখানে, সে যা বলল, শুনে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এই জায়গা থেকে নাকি মাঝে মাঝেই মানুষ হারিয়ে যায়! শুনেছ এরকম কাণ্ড? এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো। কে জানত এসব ব্যাপার বল তো?"

অহনার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল, "মানুষ হারিয়ে যায়? মানে?"

শিবার কাছ থেকে যা শুনেছিল, অহনাকে বলল রীতেশ। অহনা বলল, "কালই যাচ্ছি। এখন আর বাইরে যাব না আমরা। কেউ ডাকলেও যাব না, মনে রেখো।"

গোছগাছ সেরে ঘুমোতে গেল বটে দুজনে, ঘুম এল না একজনের। রীতেশ একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। অহনা সারারাত জেগে রইল। কেন ঘুম আসছে না ওর? নিজেও বুঝতে পারছে না কারণটা। অথচ একটা কাঁটা বুকের ভিতরে খচ খচ করে যাচ্ছে। মানুষ হারিয়ে কোথায় যাচ্ছে? কারা নিয়ে যাচ্ছে তাদের?

"ছল করে জল আনতে—"

অনিমেষ আস্তে কথা বলে। স্পিকার অন করে অনিমেষের কথা শুনতে হচ্ছে কনকলতাকে। বোঝাই যাচ্ছে, অনিমেষ কনকলতার ফোনের জন্য অপেক্ষা করছিল। অধীর হয়েই অপেক্ষা করছিল। এই অধৈর্য হয়ে হয়ে অভিমানী হওয়া আর তারপর নিস্পৃহ ভাব দেখানোর প্রচেষ্টা ধরা পড়ে গিয়েছে কনকলতার কাছে। তবু ভালো লাগল। ওর জন্য একজন অপেক্ষা করে আছে, এটাই কি কম?

"বলো। কখন পৌঁছোলে?"

একটু আদুরে হয়ে ওঠে কনকলতা, "আর বলো না। ফ্লাইট লেট করেছে। আধঘণ্টা। এই এক ঘণ্টা হল ঢুকেছি। শাওয়ার নিয়ে এবারে

তোমাকে কল করছি। তুমি বলো, কেমন আছ? মনে পড়ছে আমাকে?"

হালকা হাসির আওয়াজ ভেসে ভেসে অনেকদূর ছড়িয়ে যাচ্ছিল। অনিমেষ হাসছে। হাসিতে ব্যঙ্গ কি ?

"হাসছ!" কনকলতা অস্ফুটে প্রশ্ন করে।

"হাসব না বলছ ? বেশ, হাসব না। তোমাকে মনে পড়ছে কিনা জানতে চাইলে, তাই হাসি পেল। আসলে তোমাকে কি ভুলেছি কখনো ? মনে পড়বে তাকে, যাকে ভুলে গেছি।"

"হুম। বুঝেছি। তাহলে চলে এসো প্লিজ।" নরম বিছানায় শুয়ে পড়ে কনকলতা, "তোমায় দেখতে ইচ্ছে করছে ফের।"

অনিমেষ খানিকক্ষণ নিশ্চুপ থাকল। তারপর আবেগপূর্ণ গলায় বলল, "যাব। তোমাকে নিয়ে সুখের সপ্তম স্বর্গে বেড়াতে যাব। এ আমার অনেক দিনের ইচ্ছে। সেখানে একশো রকমের রঙের ফুল আছে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন সুবাস। সবুজ মখমলের ঘাসের গালিচায় বসে থাকব দুজনে। অপার্থিব সব গোলাপের আবেশে তুমি কি ঘুমিয়ে পড়বে আমার কোলে মাথা রেখে? তোমার শরীর ঢেকে থাকবে ডালিয়া, কসমস, সূর্যমুখী ফুলের পাপড়ি দিয়ে। টিউলিপের লাল রং তোমার গালের লালিমা দেখে লজ্জায় মুখ লুকোবে। সেখানেই তোমাকে নিয়ে যাব। শিকারায় থাকব।"

মনে মনে হেসে ফেলল কনকলতা। গ্রামের ছেলেকে যতই তুমি শহুরে করার চেষ্টা করো না কেন, চরম সৌন্দর্যের জায়গা বলতে কাশ্মীর ছাড়া বোঝে না। ওকে মেক্সিকোতে নিয়ে যেতে হবেই। সেই সঙ্গে অন্যান্য জায়গাগুলোও দেখিয়ে দেবে কনকলতা। দেখুক। জীবন কি বারবার সুযোগ দেয়?

কথা না বাড়িয়ে কনকলতা বলল, "সে হবে। আগে বল, কবে আসছ?"

অনিমেষ বলল, "তুমি যখন চাইবে, আমি চলে যাব।"

কনকলতা টাকিলায় চুমুক দিল। খুব বেশি দেরি করে লাভ নেই। সময় নিতে হবে আস্তে আস্তে। এতদিন দেখাসাক্ষাৎ ছিল না। কথাবার্তাও ছিল না। হঠাৎ করে প্রেমের জোয়ার না আসাই ভালো। কে যেন বলেছিল, সবুরে মেওয়া ফলে? আসতে চাইছে, মাসখানেকের মধ্যে এলেই হবে।

মিষ্টি মিষ্টি হাসে কনকলতা, "এসো, এসো। চলে এসো।"

ফোন রেখে খানিকক্ষণ চোখ বুজে থাকে কনকলতা। তারপর ধীরেসুস্থে উঠে বসল। ড্রেসিংরুমের ভিতরে দেওয়াল জোড়া বিরাট ওয়ার্ড্রোবের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কোনের দিকের ওয়ার্ড্রোবের স্লাইডিং ডোর খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। ভিতর থেকে দরজা টেনে দিল।

ভিতরে একজন মানুষের দাঁড়ানোর মতো জায়গা। পিছনেই রয়েছে দেওয়াল। দেওয়ালের ওপরে ঘন কালো নিমীলিত চোখজোড়ায় কনকলতার ডান হাত পড়তেই চোখ সটান খুলে গিয়ে ওকে দেখল। আস্তে আস্তে দেওয়াল সরে গেল একধারে। কনকলতা ভিতরে চলে গেল আর দেওয়াল ফের আগের জায়গায় এসে স্থির হয়ে রইল।

কনকলতা পোশাক ছেড়ে লাল-কালো মিশ্রিত পোশাক পরে নিল। সেলাইবিহীন এই কাপড়ের খণ্ড দুটো শরীরে জড়িয়ে নিল ও। সামনেই রয়েছে এক অভাবনীয় মূর্তি। কষ্টিপাথরের মতো কালো নারী শরীরের হাতে ধারালো অস্ত্র। অস্ত্রের ডগা দিয়ে টপ টপ করে রক্ত ঝরছে।

সেই রক্তের টিপ পরে নিল কনকলতা । সময় এগিয়ে আসছে। প্রস্তুতি নিতে হবে আগে থেকেই। জমির ফসল তুলে ফেলে নতুন করে সার দিতে হবে। সেচ দিতে হবে। ফের নতুন করে ফসলের জন্ম হবে। বাতাসে তারা দুলবে। ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে আমি বনফুল গো।

কনকলতা নিবিষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে স্তুতি পাঠ করে। এক অচেনা ভাষা ওর গলায় ওঠানামা করে।

অনেকটা সময় ধরে একটি কালো শিশি থেকে ঘন তেল বের করে কনকলতা। তারপর শরীর অনাবৃত করে মাখতে থাকে। ধীরে ধীরে শরীর তৈলাক্ত হয়ে ওঠে। অবিশ্রান্ত মন্ত্রোচ্চারণ চলতে থাকে মুখে। একসময় তৈলাক্ত শরীর নিয়ে ছোটো ছোটো মাটির পাত্র থেকে ধান, গম, রাই, সর্ষে, তৈলবীজ ইত্যাদি চোদ্দো রকমের ফসল নিয়ে মূর্তির পায়ের কাছের মাটির পাত্রের আগুনে আহুতি দেয়। হু হু করে জ্বলে ওঠে আগুন। এক অদ্ভুত মিশ্র গন্ধে ভরে ওঠে ঘর। দু-হাত মেলে দিয়ে গন্ধকে শরীরে ধারণ করতে থাকে কনকলতা। আস্তে আস্তে শরীরের তেল শুকিয়ে আসে। দেহের কোষ টেনে নিতে থাকে তেল। খানিক পরে বন্ধ চোখ খুলে কনকলতা সোজা হয়ে দাঁড়াল। শরীর ঝরঝরে লাগছে।

দীর্ঘ সময়ের অনুষ্ঠান শেষ করে বের হয়ে এল কনকলতা। আরও অনেকটা সময় নিজেকে দিতে হবে। পুরো চুলটা চুড়ো করে বেঁধে নিল ও। শরীরে জড়িয়ে নিল কালো সিল্কের কাফতান। শুয়ে পড়ল মেঝের নরম কার্পেটের ওপরে। শরীরে এক অদ্ভুত কাঁপন ধরেছে। চোখ বন্ধ করে কনকলতা ঝিমিয়ে থাকে। কেউ এসেছে ঘরে। কেউ এসে ওর গায়ের ওপরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। শরীর নতুন হয়ে ওঠো। নতুন হয়ে ওঠো। ঝাঁকুনি দিচ্ছে কনকলতার দেহ। কোষ নতুন হয়ে উঠছিল। খোলস ছাড়ছে যেন সাপের মতো। কনকলতার শরীর বেঁকেচুরে যাচ্ছে। অসীম কষ্ট সহ্য করতে থাকে ও।

দীর্ঘ ঘুমের পরে জেগে ওঠে কনকলতা। শরীর তলতলে নরম। আস্তে আস্তে চোখ খুলে সিলিংয়ের দিকে তাকায় কনকলতা। ফোন বাজছে। কিন্তু এখন ফোন রিসিভ করার উপায় নেই ওর। আরও সময় চাই।

প্রায় চারঘণ্টা পরে স্বাভাবিক হয়ে উঠল কনকলতা। তবু আরও একটি ঘণ্টা শুয়ে থাকে। শরীরকে সময় দিতে হবে।

কনকলতা যখন উঠে দাঁড়াল, তখন রাত শেষ হয়ে ভোরের আলো দেখা দিচ্ছে। আস্তে আস্তে উঠে কিছু নিয়ম পালন করল কনকলতা। নিজেকে গুছিয়ে নিতে সময় লাগে । ধীরে ধীরে হেঁটে ওয়াশরুমে যায়। খুব ঠান্ডা জলের দরকার এখন। বাথটব ভরে ঠান্ডা জলে। আলতো করে নিজেকে ছেড়ে দিল জলের মধ্যে। ঠান্ডা জল কোষের ভিতরে ঢুকে যেতে থাকে। ঘুমিয়ে পড়ে কনকলতা।

ফোনটা বেজে যাচ্ছে। অবিরত।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে জল থেকে উঠে মেঝেতে পা রাখল

এক সাপিনি। হিলহিলে চকচকে শরীর। দীঘল চুলে লালচে নরম আভা। কুড়ি বছর বয়সি নারী শরীর তরতাজা মন নিয়ে ড্রেসিং রুমে গেল। আজ ওয়ার্কশপ আছে। নেক্সট মাসে র‍্যাম্প শো আছে। অনেক কাজ।

ফোন বেজে যাচ্ছে। আলগোছে ফোন তুলে নিল কনকলতা। স্ক্রিনে নাম দেখে হাসি ছড়িয়ে গেল ঠোঁটের এ-কূল থেকে ও-কূলে। অনিমেষ!

"বলো ডিয়ার।"

"কী হল? ফোন রিসিভ করছ না! ব্যস্ত নাকি?" অনিমেষ উদ্বিগ্ন।

একদৃষ্টিতে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কনকলতা বলল, "এসো অনি। অনেকক্ষণ দেখিনি তোমাকে। খুব দরকার। তুমি না এলে আমি আর আমাতে থাকতে পারব না। এসো।"

এই অমোঘ আহ্বান এড়াতে পারবে না অনিমেষ। আজ পর্যন্ত কেউ পারেনি। মালহোত্রার মতো বাঘা ডন পর্যন্ত কাত হয়েছে কনকলতার রূপের কাছে। আর অনিমেষ তো এমনিতেই কাত হয়ে আছে। কনক জানে অনিমেষ আসবে। ওকে আসতেই হবে। গত্রাদেবীর পুজো সামনেই। কনকলতার শিকার এবারে পুরোনো প্রেমিক অনিমেষ নামের একটি যুবক। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। যাকে ডাকলেই চলে আসবে। স্বেচ্ছায় নিজেকে আহুতি দেবে কনকের পায়ে।

অনিমেষ গাঢ় গলায় বলল, "এভাবে ডেকো না লতা। আমি তোমার সঙ্গেই আছি। যাব। এই উইকেই যাচ্ছি। তোমার কাছে। স্যাটারডেতে পৌঁছে যাব। এই খবরটা দেব বলেই ফোন করে যাচ্ছি। আর মহারানি ব্যস্ত নিজের বিজনেসে। আমার জন্য কি তাঁর সময় আছে?"

মৃদু হাসে কনকলতা। একদিন ছাদে যে কাজ অসমাপ্ত ছিল, অনিমেষ তা সমাপ্ত করতে আসছে। সেই জ্যোৎস্না মাখা রাতই ওকে গিফট করবে কনকলতা। তবে এই দিল্লি বা মুম্বইতে নয়। ওকে নিয়ে যাবে এই দেশেরই এক গুপ্ত জায়গায়।

কথাবার্তা শেষ করে বিশেষ নাম্বারে ফোন করল কনকলতা। অনেকক্ষণ পরে গুরুগম্ভীর গলা ভেসে এল, "গত্রাদেভি"।

কনকলতা কথা বলছিল। বিশেষ কথা বলার মতো সময় দেয় না এখানে। শুধু তারিখ আর কাজের গুরুত্ব বোঝাতে হয়। মাত্র দুটো শব্দ বলল কনকলতা। জবাবে একটি শব্দই ভেসে এল ওপার থেকে, "গত্রাদেভি"।

মঞ্জুর হয়েছে প্রার্থনা। তারিখ এবং গুরুত্ব মনোনীত হয়েছে। আরামের শ্বাস ফেলে কনকলতা। এবারে কাজ শুরু।

স্যাটারডে এসে গেল। সকালেই নিজেকে সাজিয়ে রেখেছে কনকলতা। অনিমেষের পছন্দের অরেঞ্জ কালারের তাঁতের শাড়ি, থ্রি-কোয়ার্টার স্লিভের ডিজাইনার ব্লাউজের অরেঞ্জ কালারে সোনালি বুটি, খোলা দীঘল চুলের ধারে একগোছা চাঁপা ফুল। অনেক ভেবে এই সাজটা করেছে কনকলতা। তাঁতের শাড়ি ছিল না। সেটাও আনাতে হয়েছে অনলাইনে। অনিমেষের এখানে আসতে আর মাত্র একটি ঘণ্টা। বিকেলে বেরিয়ে যাবে দুজনে। যদিও অনিমেষকে এখনও কিছু জানতে দেয়নি কনকলতা। সারপ্রাইজ থাকুক।

কয়েকটা জরুরি ফোনকল সেরে নিতে নিতেই ডোর বেল বেজে উঠল। কনকলতা আয়নায় নিজেকে দেখে নিল। সোহাগ নামের পরিচারিকাটিকে আগে থেকে ট্রেনিং দিয়ে রেখেছে কনকলতা। এত বড়ো ফ্ল্যাটে দুজন হেল্পার, একজন কিচেন সামলানোর লোক ছাড়া একজন আছে, যে কনকলতার প্রাইভেট নাম্বারের খোঁজ রাখে। র‍্যাম্প শো, মডেল সিলেকশনের কাজগুলো করতে সাহায্য করে কনকলতাকে। পোশাকের ডিজাইন করে মূলত কনকলতা। ছোটোবেলা থেকেই আঁকাআঁকিতে দক্ষ ও। নিজের হাতে ডিজাইন তৈরি করে। এছাড়া চট করে ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ওর যা এই পেশায় অত্যন্ত প্রয়োজন। পি আর খুব ভালো। কনকলতা মানেই একটা দারুণ স্কিল যেন। মুগ্ধতার পাশাপাশি ওর কাজের প্রতি ইন্টারেস্ট ওকে অনেকটা এগিয়ে রেখেছে এই পেশায়। নিজের তৈরি করা "দ্য গোল্ড" নামের পোশাক তৈরির ফ্যাক্টরিতে আজ যাবে না। গতকাল কাজ দেখে এসে কিছু ইন্সট্রাকশন দিয়ে এসেছে যোগিতা আর রাঘবকে। ওরা কনকের কাজগুলোকে এগিয়ে রাখবে। কাজ কম নয় কনকের। ও যেমন পোশাকের ডিজাইন তৈরি করে, তেমনই রং নির্ণয় করা, নির্দিষ্টি পোশাকের জন্য কাপড় নির্ণয় করা, যাবতীয় কাজের তদারকি করা, চলতি ফ্যাশন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হয় ওকে। এছাড়া ফ্যাশন ট্রেন্ড ফলো করা, সেই বিষয়ে রিভিউ করা ওর বিশেষ কাজ। নিজের জন্য অনেকটা সময় দিতে হয় বলে কাজের সময়টা কনকলতা সম্পূর্ণ মন দিয়ে করে কাজ এগিয়ে রাখে।

তিনদিনের জন্য থাকছে না দিল্লিতে। এই কথাটা কাউকে বলতে চায় না ও। কিন্তু, কাজের জন্য ওকে অযথা কেউ বিরক্ত করুক, সেটাও অনভিপ্রেত ওর কাছে।

অনিমেষকে নিয়ে বেড়াতে যাবে। যে কাজ অসমাপ্ত রয়েছে,সেই কাজ সমাপ্ত না করলে অনিমেষের প্রতি অবিচার করা হয়। কনকলতা আর ভুল করতে চায় না। অনিমেষের গাঢ় চোখ,ভালোবাসায় নত হয়ে থাকা শ্যামল মুখ, ও কী করে ভুলেছিল?

আজ সকালেই টেক্সটাইল সাপ্লায়ারদের সঙ্গে মিটিং স্কিপ করতে হয়েছে। অনিমেষের জন্য। রাঘবকে ফোনে বলে দিয়েছে মিটিংয়ের ডেট পিছিয়ে দিতে।

দরজা খুলে দিচ্ছে সোহাগ। এই মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল সুন্দরবনের কাছাকাছি গদখালি গ্রাম থেকে। সেই আয়লা ঝড়ের সময়। সেই থেকে ওর কাছে আছে সোহাগ। সোহাগকে দেখে কিছু বলল অনিমেষ। সোহাগ ভিতরে আসতে বলছে অনিমেষকে।

আড়াল থেকে দেখছে কনকলতা। অনিমেষ কনকের ফ্ল্যাটে ঢুকে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, চোখে-মুখে মুগ্ধতা চাপা আলো ছড়াচ্ছে। মনের মতো করে ফ্ল্যাট সাজিয়েছে কনকলতা। ওয়েলকাম ডোর বরাবরই কিছু ছোটো ছোটো প্রাচীন পেতলের ঘণ্টায় সাজানো থাকে। যারা অতিথিকে মৃদু শব্দে স্বাগত জানায়। আর আছে অসাধারণ ফুলের সমারোহ।

আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসে কনকলতা। ওর

পায়ে রুপোর পাঁয়জোর ঝিন ঝিন শব্দে বেজে উঠছে। অনিমেষ ঘাড় ঘুরিয়েই স্থির। কনকলতা লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠেছে, দেখছে অনিমেষ। এক অদ্ভুত ভালো লাগায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে দুজনেই।

অনিমেষ এগিয়ে এসে ওর গালে এক আঙুল ছোঁয়াল। কনকলতা হেসে মুখ নীচু করল। অনিমেষ বলল, "কথা রেখেছি কিনা বল? এসেছি আমি। তুমি ডাকলে না এসে পারি?"

কনকলতা অনিমেষকে ওর জন্য নির্দিষ্টি বেডরুমে নিয়ে এল। লাক্সারি বেডরুম। সঙ্গে ব্যালকনি। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে সুইমিং পুলের খানিকটা দেখা যায়। বাকি অংশে সবুজে পূর্ণ।

খোলা হাওয়ায় চোখ জুড়িয়ে এল অনিমেষের।

কনকলতা বলল, "এদিকে তোমার ওয়াশরুম। ফ্রেশ হয়ে নাও। এরপরে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা কথা বলব।" "ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে কনকলতা। পিছন থেকে ডাকল অনিমেষ, "স্বর্ণলতা!"

হেসে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কনকলতা, "বল।"

"তোমাকে সদ্যস্নাতা ফুলের মতো লাগছে। আর সুন্দর।"

হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে এল কনকলতা। রূপের প্রশংসা শুনতে শুনতে ক্লান্ত লাগে। কিন্তু রূপ না থাকলে ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, এক ঝটাকায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে এরা, এই প্রেমিকের দল। সেটা চায় না কনকলতা। নিজের রূপ নিয়ে সংশয় নেই বিন্দুমাত্র। তবু গালে ব্লাশ করেছে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কায়দায়। এক টুকরো বিট কেটে দুই গালে সামান্য ঘষে নিতেই অসাধারণ জৌলুসে ভরে গেল মুখ। সেই মুখ দেখেই অনিমেষের চোখে গাঢ়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনিমেষ একটু নয়, যথেষ্টই অবাক হল। ভেবেছিল, কনকের দিল্লির ফ্ল্যাটে কয়েকটা দিন থাকবে। একসঙ্গে। কিন্তু কনকলতা সুন্দর হেসে বলল, "এই ফ্ল্যাটে নয়। তোমাকে নিয়ে অনেক দূরে যাব। যেখানে আভান্দার ছিল, সেই জ্যোৎস্নাময় আলোতে তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করব। তুমি আমাতে, আমি তোমাতে। রাজি? কেউ আমাদের দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকবে না। সেইদিনে ছাদে যেমন জ্যোৎস্নার আলোকে আমরা পরস্পরকে দেখেছিলাম, তেমন করে দেখব সম্পূর্ণ ভাবে।" অনিমেষের ঠোঁট এগিয়ে এল স্বর্ণলতার ঠোঁটে। আজ বিকেলে যাবে ওরা। কিন্তু কোথায়? "কোথায় নিয়ে যাবে হে সুন্দরী?"

"রাজস্থানে। একটা অসম্ভব সুন্দর জায়গা আছে তসার জেলায়। সেখানে যাব। ট্যুরিস্টের ভিড় নেই বলে ওটা আমার পছন্দ।" আঁচলের ঝাপটা মেরে জোরে হেসে উঠল কনকলতা।

"সবাই গেছে বনে"

সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা। অনিমেষের দুটো শার্ট রয়ে গেল কনকের ফ্ল্যাটে।

রাজস্থানে পৌঁছে জিপ ভাড়া করে বেরিয়ে গেল। অনিমেষ দেখছিল উঁচু উঁচু টিলা, বালিময় প্রান্তর। দূরে দূরে ছোটো ছোটো গাছ ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা সময় খুব নির্জন জায়গায় ওদের জিপ দাঁড়িয়ে গেল। অনিমেষ উঁকি দিয়ে দেখল, বড়োসড় প্রাসাদ বলা যায়, ওর সামনে। এটা কি হেরিটেজ বিল্ডিং? হোটেল করা হয়েছে?

"না। এখানে একটা মন্দির রয়েছে। যে মন্দিরে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। এর একপাশে রয়েছে থাকার জায়গা। হোটেল ঠিক নয়, কিন্তু সব সুবিধেই পাবে তুমি। আমি আগে একবার এসে থেকেছি। খুব ভালো লেগেছিল। আচ্ছা, এসো। প্রাসাদের মালিক এসে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের জন্য।"

"জিপটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে! আমরা কি আজই ফিরে যাচ্ছি?"

"না। তিনদিন থাকব। কেন ভালো লাগছে না আমার সঙ্গ? তাহলে না হয় ফিরে যাব।" অভিমান ছিল কি কনকলতার গলায়? অনিমেষ শশব্যস্ত হয়ে পড়ে, "কী যে বল! জিপের কথাই বলছিলাম। গাড়ি রয়ে গেল কিনা। প্লিজ, রাগ করো না লতা।"

"জিপ এখানকার। আমি আসছি মেইল করেছিলাম। ওরা জিপ পাঠিয়ে দিয়েছিল। ভাড়া নিয়েছি ধরো। টাকাটা অ্যাড হবে টোটাল বিল-এর সঙ্গে চেক আউটের সময়। একটু থেমে কনকলতা বলল, "যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি মন্দিরের প্রধান। ওঁকে প্রণাম করো।"

ব্যাগ নিয়ে নেমে পড়ল

অনেকক্ষণ পরে গুরুগম্ভীর গলা ভেসে এল, "গত্রাদেভি"।

দুজনে। কনকলতার হাতে একটা হালকা কাপড়ের ব্যাগ। ওতে সামান্য পোশাক রয়েছে। তিনদিনের জন্য এত কম পোশাক কেন?

"ইচ্ছে করেই। প্রয়োজন হবে না বলেই আনিনি। দরকার হলে কিনে নেব। আমার ফ্যাশনের ব্রাঞ্চ রয়েছে কাছেই। একটা ফোন করলে দশটা ড্রেস চলে আসবে। তোমার ব্যাগ খানিকটা হালকা করে এনেছি। দুটো শার্ট আমার ফ্ল্যাটে আছে। এত জামাকাপড় নিয়ে এসেছ!" কোরাল কালারের ঠোঁটে হাসে কনকলতা।

নিজের মোটামুটি ভারী ব্যাগ নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে থাকে অনিমেষ। কনকলতা বিশালকায় মানুষটির পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসল। দেখাদেখি অনিমেষও।

অনিমেষের ব্যাগ নিয়ে গেল একটি লোক এসে। কনকলতার ব্যাগ কনকলতা নিজের কাছে রেখে দিল, "আমি নিয়ে যেতে পারব" বলে।

বিশালকায় লোকটি আশীর্বাদের সময় অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, "গত্রাদেভি।"

কনকলতা নিম্নস্বরে বলল, "গত্রদেবী।"

আরেকটি লোক এসে ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল একটি বিশালকায় ঘরে। ডাবল বেড, দামি ফার্নিচারে সজ্জিত ঘর ছোটো ছোটো আলো দিয়ে দেওয়ালে আলো-ছায়ার পরিবেশ তৈরি করেছে।

লোকটি ওদের ঘর দেখিয়ে দিয়ে চলে যেতেই অনিমেষ কনকের ওপরে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, "একই রুমে থাকছি তো?"

"অফকোর্স। আপত্তি?"

হেসে কাছে টেনে নিতে যাচ্ছে, তখনই বাইরে শব্দ হল, "চা!"

"আসুন ভিতরে।" কনকলতা দরজার দিকে তাকিয়ে বলল।

একটি পৃথুলা মহিলা পেতলের থালায় চা নিয়ে এসেছে বড়ো বড়ো পেতলের গেলাসে। ঘন দুধের চা। এলাচের গন্ধে ভরপুর।

মহিলা আড়চোখে কনকলতাকে দেখল। অনিমেষকে একবারের জন্যও দেখল না। টেবিলের ওপরে থালাটা রেখে চলে গেল। একটিও শব্দ উচ্চারণ করল না।

কনকলতা অপেক্ষা করছিল। মহিলা চলে যেতেই চায়ের গেলাস তুলে দিল অনিমেষের হাতে, "খেয়ে নাও। তারপর আমরা মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের আশীর্বাদ নিতে যাব।"

চা শেষ করে ওরা দরজা লক করে বেরিয়ে গেল। একজন ওদের জন্য বাইরে অপেক্ষা করছিল। লম্বা ঘোরালো প্যাসেজ কতদূর চলে গিয়েছে, কেউ জানে নিশ্চয়। কিন্তু অনিমেষ শেষ দেখতে পাচ্ছিল না। কনকলতাকে জিজ্ঞাসা করাতে ও বলল, "এই প্যাসেজ চলে গিয়েছে তিনতলা পর্যন্ত। মাঝে মাঝে এর ব্রাঞ্চ দেখা যায়। সেগুলো কোথায় গিয়েছে, আমি অন্তত জানি না। এই প্যাসেজে আলো দেওয়া হয় না। এটা জানি।" কনকলতা আলগোছে চুলে হাত বুলিয়ে নিল।

প্যাসেজ ধরে যেতে যেতে ওদের পথপ্রদর্শককে প্যাসেজটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে কোনো জবাব পেল না অনিমেষ। লোকটি হয় বোবা-কালা, নয় ইচ্ছে করেই কথা বলতে চাইছে না।

অনেকটা হেঁটে যেতে হল। একসময় লোকটি সাঁৎ করে ডানদিকে বেঁকে গেল। কনকলতা ইশারা করল সেদিকে যেতে। দুজনে আধো অন্ধকার সরু প্যাসেজ দিয়ে একটি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ভারী ঘন রঙের পর্দা ঝুলছে দরজায়। ওরা গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটি ব্যাক করে চলে গেল যেদিন দিয়ে এসেছিল, সেদিকে। আর ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই দরজা খুলে গেল। একজন অতি শীর্ণকায় বৃদ্ধ দরজা খুলে দাঁড়িয়েছেন।

নত হয়ে প্রণাম জানাল কনকলতা। দেখাদেখি অনিমেষও প্রণাম জানাল। বৃদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনিমেষকে দেখলেন। তারপর কনকলতার দিকে তাকালেন। কনকলতা চোখের ইশারায় সম্মতি জানাল অনিমেষকে লুকিয়ে।

দরজা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। ওরা দুজনে ভিতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ছোটো ঘর, দেওয়াল জুড়ে ভারী সিল্কের কাপড়ে ঢাকা। একটি দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে পর্দা সরাতেই একটি দরজা দেখা গেল। ওদের ভিতরে যেতে ইঙ্গিত করে নিজেও ঢুকে পড়লেন বৃদ্ধ। একই ভাবে পরপর কয়েকটি ঘর অতিক্রম করার পরে একটি সমতল খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। সেখানে মাটির ওপরে সার দিয়ে ঘট রাখা। দূরে দাঁড়িয়ে আছে একসার লোক। প্রত্যেকের মুখ লাল ভারী সিল্কের কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখা।

অনিমেষ অবাক হল। ঘরের পর ঘর পেরিয়ে একটি খোলা মাঠের মতো জায়গায় এসে পৌঁছেছে কেন ? দেখে মনে হচ্ছে সদ্য ফসল তুলে ফেলা হয়েছে এই জমিতে। অথবা অনুর্বর জমি। এখানে কী হবে?

"পুজো হবে। অনুর্বর জমিকে উর্বর করার জন্য পুজোর প্রথা তো প্রাচীন যুগ থেকেই আছে। এখানেও সেরকম কিছু হবে। দেখ। একটা এক্সপিরিয়েন্স হোক।" "কনকলতা কানে কানে বলল।

ওরা দাঁড়িয়ে ছিল একধারে। এখন দিন না রাত বোঝা যাচ্ছে না। এক অদ্ভুত ছাই রঙে ভরে আছে চারপাশ। আকাশ। আদিম চেহারার একটি নারীমূর্তিকে পুজো করা হচ্ছে জমির মাঝখানে। ঘন কালো রঙের মূর্তির লম্বা চুল নেমে এসেছে মাটিতে। লুটোচ্ছে। বৃদ্ধ পুরোহিত কনকলতাকে ডেকে বসালেন মূর্তির সামনে।

কনকলতা পুজোতে আহুতি দিচ্ছে। পুজোর জায়গাটা ঘিরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো এসে দাঁড়িয়েছে। তারা অদ্ভুত এক মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দু-হাত উঁচু করে প্রদক্ষিণ করছে । কাকে ডাকছে এরা? এই লোকগুলো এমন মত্ত হয়ে উঠছে কেন?

অনিমেষের একা দাঁড়িয়ে থেকে অস্বস্তি হচ্ছিল। জায়গাটা, পরিবেশ, এখানকার মানুষগুলো,—কিছুই পছন্দ হচ্ছিল না ওর। কনকলতা পুজোতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওকে দেখাই যাচ্ছে না । ধুনো জ্বলছে। একটা উৎকট গন্ধে নাক-চোখ জ্বলে যাচ্ছিল অনিমেষের। চোখ জ্বালাও করছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না। অনেকটা সময় ধরে পুজো হচ্ছে। কনকলতাও ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করেছে। ভরে পড়ার কথা শুনেছে অনিমেষ। কনকলতাকে দেখে ভরে পড়ার কথাই মনে পড়ল। একটা উন্মত্ততা গ্রাস করেছে কনকলতাকে।

একটা সময় বৃদ্ধ পুরোহিত একটি মাটির খুরি করে খানিকটা তরল খেতে দিলেন সবাইকে। অনিমেষ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পুরোহিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে আদেশ করলেন তরলটি খেয়ে ফেলতে।

অনিমেষ খেয়ে ফেলল। সামান্য তরল। গলা বেয়ে নেমে যাচ্ছে যেন এক জীবন্ত হড়হড়ে পদার্থ। অনিমেষের শরীর কেমন করে উঠেছে। গলা বেয়ে কি কোনো সরীসৃপ নেমে গেল? কী ছিল খুরিতে?

ভাবতে ভাবতেই দুজন লোক এসে ওকে পুজোর জায়গায় নিয়ে গেল। দুজন দুই দিক দিয়ে ধরে রেখেছে। ওকে নিয়ে মূর্তির সামনে পৌঁছোতেই মন্ত্রোচ্চারণের মাত্রা বেড়ে গেল। অনিমেষের মাথা ঘুরছে। চারপাশ কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে। হাঁটু গেড়ে বসানো হচ্ছিল ওকে।

"গোপন তব চরণ ফেলে"

সকালেই বেরিয়ে গেল ওরা। কলকাতা পৌঁছে স্বস্তি পাচ্ছিল অহনা। গোয়া থেকে নিয়ে আসা জিনিসপত্র লুকিয়ে গুছিয়ে রাখল। স্নানের জন্য তৈরি হচ্ছে, তলপেটে সামান্য অস্বস্তি হচ্ছে। অহনা বুঝল পিরিয়ড শুরু হয়েছে। আজ স্নানে চার নাম্বার তেলটা তর্জনী দিয়ে চৌষট্টিবার নাভির চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরবে। ড্রেসিং ইউনিটের তিন নাম্বার ড্রয়ার খুলে ভিতরের গুপ্ত ড্রয়ারে রাখা চার নাম্বার শিশি বের করে বাথরুমে চলে গেল অহনা। বাথরুমের আয়নার কাচে ছায়া পড়েছে ওর। হাতের তালুতে তেল ঢেলে নিল অহনা। নিরাবরণ শরীর। নাভিকুণ্ডলী ঘিরে তর্জনী ঘুরে বেড়াচ্ছে। চোখ আস্তে আস্তে বুজে আসছে। শরীরে তরঙ্গ উঠছে। নতুন হয়ে উঠছে শরীর। জরাব্যাধি দূরে চলে যাচ্ছে। জরা রাক্ষসী সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। জরা দূরে যাক। জরা নির্মূল হোক।

আজ স্নানে চার নাম্বার তেলটা তর্জনী দিয়ে চৌষট্টিবার নাভির চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরবে।

স্নানের শেষে ঘুমে শরীর ঝিমিয়ে পড়ছে। অহনা বটুয়া লুকিয়ে নিল আঁচলের নীচে। ঘরে ঢুকে চটপট লুকিয়ে ফেলল শিশি। আজ কনকলতার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে হবে। কাচের পাত্রের পদার্থটা নিয়ে যাবে কনকলতা।

তিনটে দিন কেটে গেল এক ধরনের ঘোরের মধ্যে। নিজের ভিতরে শক্তি জেগে উঠছিল যেন। টের পাচ্ছে অহনা। স্বাধীন মনোভাব দৃঢ় হচ্ছে। মনের শক্তি শরীরের কোষে কোষে পৌঁছে যাচ্ছে।

চারদিনের স্নানের পরে অহনা আয়নায় নতুন করে এক অন্য অহনাকে দেখল। সেদিনই কনকলতা এসেছে ওদের বাড়িতে। দিল্লিতে ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে খুব নাম করেছে কনকলতা। সোজা দিল্লি থেকে চলে এল। অহনার শ্বশুরবাড়ির সকলে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে কনকলতাকে দেখে। শাশুড়ি মা বলেই ফেললেন, "যেমন ভাইঝি, তেমন পিসি। অসাধারণ সুন্দরী পিসির ভাইঝিও সুন্দরী হবে, এ আর বেশি কী?"

আলাপ, হাসি, কথাবার্তার পরে একসময় গেস্ট রুমের বিছানায় শুয়ে শুয়ে অহনার কথা শুনছিল। অহনা মার্থার দেওয়া কাচের পাত্র নিয়ে এসেছে লুকিয়ে, "নিয়ে যাও তোমার জিনিস। তুমি কি আগেও এই জিনিস এনেছ মার্থার কাছ থেকে?"

সে কথার জবাব দিল না কনকলতা। কাচের পাত্রটা অহনাকে ফিরিয়ে দিল, "এটা তোর। এই জিনিস সহজে পাওয়া যায় না। সারা জীবন এই জিনিস তোর কাজে লাগবে অহনা। আমি যা বলে দেব, সেই মতো চলবি। পাত্রে যে কালো পদার্থ আছে, বছরে একবার, ফলহারিণী অমাবস্যার দিন রাতে একা নির্জন ঘরে থাকতে হবে। এই পাত্রের মধ্যে নিজের শরীর থেকে এক ফোটা রক্ত দিতে হবে। সেই সময় কোনোরকম অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলে ভয় পাবি না। তাহলে বিপদে পড়তে হতে পারে। এরপর রাতের শেষ প্রহরে পাত্রের ঢাকা খুলে তর্জনী দিয়ে অতি সামান্য কালচে পদার্থ নিয়ে কপালে লেপে দিতে হবে। সারারাত জেগে থাকবি।"

"কেন এসব করব?" অহনা এক অস্বাভাবিক জগতের মধ্যে ডুবে যেতে ভয় পাচ্ছে, "কী হবে এসব করে?"

কনকলতা অহনার চিবুক ধরে বলল, "কোনোদিন বুড়ি হবি না। তবে, যদি এই পাত্র ভেঙে যায়, কালচে পদার্থটা মাটিতে পড়ে যায়, সেদিন খুব বড়ো বিপদ তোর। চান্দ্রমাসের মধ্যে এই পদার্থ জোগাড় করতেই হবে। নইলে এক পূর্ণিমা থেকে আরেক পূর্ণিমার মধ্যে বার্ধক্য গ্রাস করে ফেলবে।"

অহনা চমকে ওঠে, "কী বলছ পিসি? এই জিনিস জোগাড় করা মানে গোয়ায় যেতে হবে। মার্থা ছাড়া এ জিনিস কে দেবে? আর, ইচ্ছে করলেই কি গোয়ায় যাওয়া সম্ভব?"

কনকলতা খানিকক্ষণ একদৃষ্টে অহনার দিকে তাকিয়ে থাকল। ডানহাতের তর্জনী অহনার কপালের মাঝখানে ঠেকিয়ে বলল, "তুই

পারবি আমার কাজ এগিয়ে নিতে। আমি তোকে শিখিয়ে যাব সব। যে বিদ্যা আমি শিখেছিলাম, সেই বিদ্যা তোকে শিখিয়ে দিয়ে যেতে হবে আমাকে। এই অখণ্ড যৌবনের রহস্য একজন বয়ে নিতে পারে না অহনা। তাকে সেই গুপ্তকথা কাউকে দিয়ে যেতে হয়। আমাকে দিয়েছে মার্থা। আমি দেব তোকে। এর দায়িত্ব নিলে তোকে একজনের খোঁজ করতে হবে, যে পারবে তোর শিক্ষা বয়ে নিতে যে কাজের মধ্যে ঢুকে গেলি, তার অনেক দায়িত্ব মনে রাখিস। অনন্ত যৌবন পাবি তুই। পাশাপাশি আরেকজনকে গুপ্ত রহস্যের ভার দিয়ে দিতে হবে। আজ থেকেই তার খোঁজে থাক। আর মনে রাখিস, একজন কেউ তোর পাশে পাশে আছে, যাকে মাঝে মাঝে দেখতে বা অনুভব করতে পারবি। সে অক্ষয় যৌবনের মূল ধাত্রী। রাক্ষসীতন্ত্রের দেবীর চর।"

"কিন্তু, আমি বুঝতে পারছি না, যে পাত্র নিয়ে এসেছি, সেটা ভেঙে গেলে কীভাবে জোগাড় করব, সেকথা বল! কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।" অহনা বিহ্বল চোখে তাকায়।

কনকলতা ইশারায় কাছে ডাকে অহনাকে। কানে কানে কিছু বলে। বোঝায়। মাঝে মাঝে কেঁপে উঠেছে অহনা। ভয়ে ছিটকে যেতে চেয়েছে কনকলতার কাছ থেকে। কনকলতা টেনে ধরেছে অহনাকে। একটা সময় অহনা শান্ত হয়। কনকলতা ধীরে ধীরে অহনার কপালের মাঝখানে নিজের ডানহাতের তর্জনী বুলিয়ে দিতে থাকে। অহনার চোখ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। কনকলতা বিড়বিড় করে অহনাকে বিশেষ শিক্ষায় দীক্ষা দিতে থাকে। ঘরের আলো কমে আসছে। একেবারে কমে আসছে। কারা ঘিরে ঘিরে ধরছে অহনাকে। তাদের ছায়া ভেঙে যাচ্ছে, ফের জুড়ছে এলমেলো ভাবে।—

বাইরে থেকে কেউ ডাকছিল। গভীর ঘুম থেকে উঠে বসল অহনা। কনকলতা ছেড়ে দিল ওকে। অহনা একরাশ সুবাস নিয়ে উঠে দরজা খুলে দিল। রীতেশের ভাই রেহান দাঁড়িয়ে আছে, "আড্ডা দিতে এলাম বউদি। তোমার পিসি এসেছেন শুনলাম। দেখা করতেও এলাম।"

অহনা আজ নতুন করে রেহানকে দেখল যেন। এই বাড়িতে রীতেশের দুই ভাই আছে। রেহান, সুভান। দিদি সুভদ্রা। জিজু জিষ্ণুদা।

"জানি আমি তুমি রবে—আমার হবে ক্ষয়"

দীর্ঘ কুড়িটি বছর কেটে গিয়েছে। কনকলতা আসে মাঝে-সাঝে কখনো। কুড়িতম বিয়েবার্ষিকীতে অহনা রীতেশের সঙ্গে সিকিম বেড়াতে যাবে। কনকলতা ওদের সঙ্গে যাবে ঠিক হয়েছে। অহনার ইচ্ছে অনুযায়ী রেহান, সুভানও সস্ত্রীক পুত্র, কন্যাসহ যেতে রাজি হয়ে গেল। রেহানের শালা দিব্যজ্যোতি সঙ্গী হল ওদের। জিষ্ণুদা বছর তিনেক আগে মারা গেছেন। দিদি সুভদ্রা নিঃসঙ্গ। ওকেও সঙ্গে নেওয়া হল। আর ওদের সঙ্গে গেল পুরোনো কাজের লোক অর্চনাদি।

সব মিলিয়ে বড়ো একটা দল হয়েছে। অহনার মেয়ে শ্রুতি, ছেলে কণাদ বিদেশে পড়াশোনা করছে। কনকলতা রওনা হওয়ার আগের রাতে অহনাকে ডেকে ছাদে নিয়ে গেল, "ক'জন হল?"

অহনা বলল, "বারোজন।"

কনকলতা হাসে। বেশ।

সেবারে সকলে একসঙ্গে গেলেও ফিরল না একসঙ্গে। গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করেছিল। ড্রাইভার নিয়ে তেরোজন ছিল গাড়িতে। পাঁচজন স্পটেই মারা গেল। বাকিরা আহত হয়েছে কমবেশি।

কিন্তু ভয়ানক ঘটনার আরও বাকি ছিল। হাসপাতালের মর্গ থেকে একটা বীভৎস দুঃসংবাদ পাওয়া গেল। অহনা কনকলতার সঙ্গে বসে রীতেশের শুশ্রূষা করছিল। হাসপাতাল থেকে ফোন এসেছে। দ্রুত যেতে হবে কাউকে।

কনকলতাকে সঙ্গে করে অহনা রওনা হয়েছে । শাশুড়ি মা, শ্বশুরমশাই, রেহান বাড়িতে আছে। পুরো বাড়িতে শোকের পরিবেশ। সুভান, অর্চনাদি, রেহানের স্ত্রী, সুভদ্রা, দিব্যজ্যোতি অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছে। তাদের বডি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে। পোস্টমর্টেমের পরে ছেড়ে দেওয়া হবে বডি বাড়ির লোকের হাতে।

অহনা কনকলতার সঙ্গে কথা বলছিল না। হাসপাতালে না যাওয়া পর্যন্ত কথাবার্তা বলতে চাইছে না ওরা।

হাসপাতালে পৌঁছোতেই ওদের জানানো হল, একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গিয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থানায় খবর দিয়েছেন। পুলিশ এসে গিয়েছে।

কেন? আর কী ভয়ংকর খবর শোনার বাকি আছে?

অহনার শ্রান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললেন, "আপনাদের পরিবারের অ্যাকসিডেন্টে মৃত পাঁচজনের বডি থেকে মাথা কেটে নিয়েছে কেউ। আজই পোস্টমর্টেম হওয়ার কথা। ডাক্তার এবং ডোম গিয়ে বডির ওপর থেকে আবরণ সরাতেই এই ভয়াবহ ঘটনা সামনে এসেছে।"

অহনা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। কনকলতা সবটা সামলাবে কী করে বুঝতে পারছিল না। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। অহনাকে সুস্থ করে বাড়িতে নিয়ে এসেছে কনকলতা। খবর পেয়ে রেহান এসেছিল ওদের নিয়ে যেতে।

তদন্ত চলছে। দিন গড়িয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছুদিন কনকলতা অহনাকে সঙ্গ দিতে পাশে রয়েছে। রীতেশ আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠছিল। মানসিক আঘাতে বিভ্রান্ত রীতেশ। পরিবারের এতগুলো মানুষকে একসঙ্গে হারিয়ে ফেললে আঘাত লাগবে, এ আর বেশি কী!

অনেক রাত পর্যন্ত কনকলতার কাছে থাকে অহনা। রীতেশ নিজের ঘরে ঘুমোয়। মধ্যরাতে কনকলতা স্টিমে বসায় কিছু পদার্থ। তার আগে সমস্ত বাড়িতে সুবাসিত তেল ছিটিয়ে দেয়। ধুনোতে সুগন্ধী মিশিয়ে দেয়। কারণ স্টিমে যা সেদ্ধ হচ্ছে তা থেকে বিশ্রী গন্ধ বের হয়। সেই দুর্গন্ধ ঢাকার জন্য সুবাসের ব্যবস্থা।

কয়েকটা দিন মাত্র। অবশেষে কাচের পাত্রে কালো থকথকে পদার্থ নিয়ে লুকিয়ে রাখল অহনা।

কনকলতা বলল, "বাকি জীবনটা কেটে যাবে এতে। যৌবন

অক্ষয় হবে। কিন্তু অমরত্ব পাওয়া যাবে না। আমার কাছে দুই পাত্র এই অক্ষয় যৌবন পদার্থ রয়েছে। খুবই কষ্টকর এসব জোগাড় করা। তুই সুযোগটা নষ্ট করিসনি, এতে আমি খুশি। মেয়ে শ্রুতিকে এই বিদ্যা শিখিয়ে দিস। আমি কাল যাচ্ছি দিল্লিতে। অনেক কাজ রয়েছে। এখন বুঝতে পেরেছিস গোয়াতে মানুষ হারিয়ে যায় কেন?"

অনেক আগেই বুঝেছে অহনা। পাঁচটি মানুষের মাথা সেদ্ধ করে যে তেল পাওয়া যায়, তা থেকে তৈরি হয় পাঁচমুড়ির তেল নামের অক্ষয় যৌবন সুবাসিত তেল। বেশি কিছু নয়, পাঁচটা মানুষের মাথা চাই। ব্যস!

হ্যাঁ, শ্রুতিকে এই বিদ্যা শিখিয়ে দিতে হবে।

কনকলতা এয়ারপোর্টে পৌঁছে সময় দেখল। একঘণ্টা লাউঞ্জে বসে একটা পেপারব্যাক পড়বে। থ্রিলার পড়তে বেশ লাগে ওর।

আড়াই ঘণ্টা পরে নিজের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কনকলতা। সোহাগকে জানিয়ে দেওয়া ছিল। দরজা খুলে মিষ্টি হাসে সোহাগ। এখন বয়স হয়েছে ওর। কনকলতা ঠিক করেছে, একটি নতুন মেয়েকে সোহাগের সঙ্গে রাখবে। শিখে নিক সব। সোহাগ ক্রমেই বুড়ি হবে। কনকের সংসার সামলাবে কে?

"সব ঠিকঠাক আছে ম্যাম?" "প্রতিবারের মতো এবারেও প্রশ্ন করে সোহাগ। যখনই কনকলতা বাইরে থেকে আসে, সোহাগ মিষ্টি করে হেসে কুশল জানতে চায়। ওর সৌজন্যবোধ মাঝে মাঝে অবাক করে কনকলতাকে।

ঘাড় হেলিয়ে ছেলেমানুষের মতো ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে কনকলতা, "সোহাগ, আমার জন্য ক্যাপুচিনো রেডি করো। স্নান করে আসছি।"

বাথটবের জলে ডুবে থাকল কনকলতা। আজ একটু টায়ার্ড লাগছে। সারাদিন বেশ পরিশ্রম গেছে। এসেনশিয়াল অয়েল দিয়ে স্নান করে তরতাজা হয়ে উঠবে ও। প্রত্যেকদিন নতুন হয়ে উঠতে এত ভালো লাগে! অদ্ভুত সুবাসে ভরিয়ে তুলল কনকলতা নিজেকে। শরীর তরতাজা হয়ে উঠছে। একটা কাঁপুনি দিয়ে উঠছে শরীর। প্রত্যেকবার শরীর নতুন হয়ে ওঠে যখন, তখনই এই হিল্লোল টের পায় কনকলতা। আনন্দের হিল্লোল। ভাষা দিয়ে একে প্রকাশ করা যায় না। শুধু আকণ্ঠ ডুবে থাকা নতুন তরঙ্গে।

ফোন বাজছে! কনকলতা আলগোছে ফোন তুলে নিল। সোহম। ফ্যাশন দুনিয়ার নতুন মডেল। কনকলতার কাছে আসে নিয়মিত। ফ্যাশন দুনিয়ার হালহকিকত শেখাচ্ছে সোহমকে। ক্রমেই যুবকটি জড়িয়ে পড়ছে কনকলতার সঙ্গে। ফের প্রেমে পড়া—।

কনকলতা জানে, অনন্ত আয়ু ভোগ করতে হলে যৌবন চাই। রূপ চাই। বৃদ্ধ হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী? এই যে সোহম, রেহান, কুণালদের মতো ছেলেরা কনকলতার রূপে মশগুল হয়ে আছে, এ কি সহজ পথে হয়েছে?

ফোন অ্যাটেন্ড করে সোহমের গাঢ় গলা শুনতে শুনতে রহস্যময় হাসি হাসে কনকলতা। একবার কথা বলতে শুরু করলে থামে না সোহম। বয়স বলে কিছু নেই কনকলতার মধ্যে। প্রাচীনত্বকে ছুড়ে ফেলা কনকলতার রীতি। আনন্দে ভাসতে ভাসতে শুনতে থাকে নবযৌবনের ডাক। আবার প্রেম। আবার যাত্রা অজানার উদ্দেশে। আবার নতুন হয়ে ওঠা। এই তো জীবন।

ড্রেসিংরুমের ভিতরে ঢুকে ক্যাবিনেটের বিশেষ একটি স্লাইডিং ডোর ঠেলে দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে ঢুকে পড়ে ও। একই রকম মূর্তি রয়েছে এখানে। রাজস্থানের যে মন্দিরে গিয়েছিল, যেতে হয় মাঝে মাঝেই, সেখানেও জমি উর্বর করার জন্য এই মূর্তির পুজোই হয়। আর আহুতি দিতে দরকার হয়—, কনকলতা একটি মোটা গোল ভারী কাচের বোয়মের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘন কালচে তরলে ডুবে আছে একটি অদ্ভুত দর্শন পদার্থ। মাথার চুলগুলো এখনও আছে। চোখ-মুখ বোঝা যায় না। একটি মাংসপিণ্ড মাত্র। নরমুণ্ড বলেও বোঝা যায় না। চোখ বন্ধই আছে এখনও। যদিও আন্দাজে বুঝে নিতে হয় চোখ কোনখানে আছে। কুড়ি বছর আগের একটি দুপুরে বলি হওয়া শরীরকে জমির উর্বরতার জন্য ইউজ করা হয়েছিল। শুধু মাথাটি পেয়েছিল কনকলতা। যৌবন অক্ষুণ্ণ রাখতে এটা ওর পুজোর ঘরে রাখা অত্যাবশ্যকীয়।

স্লাইডিং ডোর বন্ধ করে বেরিয়ে আসতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেল কনকলতা। পিছনে ঘরের মধ্যে কি কোনো শব্দ হল? তরলে ডুবে থাকা কিছু বুদবুদ শব্দে কিছু বলছে?

নিজেকে সামলে নিয়ে ড্রেসিংরুমের দেওয়াল জোড়া আয়নায় ওর প্রতিচ্ছায়া দেখল।

আর দেখতে দেখতে এক ধরনের আতঙ্ক জাপটে ধরল ওকে। চুলে কি পাক ধরেছে? এমন বয়স্ক দেখাচ্ছে কেন?

আয়নার সামনে গিয়ে সবকটা আলো জ্বেলে নিজেকে ভালো করে পরখ করে কনকলতা। নাহ। আলো-ছায়া কেমন ভ্রম তৈরি করেছিল ওকে ভয় দেখাতে!

হো হো করে হাসছে। সোহাগ দরজায় নক করল, "ম্যাম, আপনার ক্যাপুচিনো।"

ঠিক তখনই অন্ধকার গোপন ঘরের ভিতরে তরলে ডুবে থাকা নরমুণ্ড চোখ খুলছিল। অল্প অল্প। চোখের তারা গলে গিয়েছে সেই কবে। কিছুই আর পড়ে নেই কোথাও। শুধু আছে অনুভূতি, যাকে "বলি" দিয়ে মুছে দেওয়া যায়নি। তরলের ভিতর থেকে অশ্রুতপূর্ব ধ্বনি উঠে আসছে। কান পাতলে শুনতে পেত কনকলতা। চেনা শব্দগুলো কালো তরলের মধ্যে সাঁতার কাটছে, "জানি আমি তুমি রবে-আমার হবে ক্ষয়/পদ্মপাতায় একটি শুধু জলের বিন্দু নয়/ এই আছে নেই, এই আছে নেই—জীবন চঞ্চল/ তা তাকাতেই ফুরিয়ে যায় রে পদ্মপাতার জল/বুঝেছি আমি তোমায় ভালোবেসে—।"

কেউ শুনতে পায় না কিছুই। নীল চোখে কাজল পরছিল তখন কনকলতা। আয়নার সামনে বসে। ক্যাপুচিনোতে রুচি নেই এখন আর। ❖

গল্প

সৃষ্টিশীল মানুষদের আবার সাংবাদিক সম্মেলন কী? তবু বারাণসীর এই 'ভুবনদেব সিংহ শাস্ত্রীয় সংগীত সম্মেলন' এতটাই বৃহৎ এক আয়োজন যে প্রতিটি শিল্পীকে নিজের ভাবনা আর অনুভবের জগৎ খানিকটা হলেও উন্মোচিত করতেই হয়। কিন্তু প্রথম আর শেষ নিবেদনের ভিতরে বারাণসী শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ার পথে, গাড়ির চালকের মুখ থেকে যে অমন একটা কথা শুনতে হবে, অন্তর রায়চৌধুরী তার কল্পনাও করেননি। কথাটা শুনেই ওঁর জিভের ডগায় শব্দের আগে, চোখের সামনে ছবি ভেসে উঠল। অনেক বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সেই ছবি একদম অমলিন। পিঠ ছাপানো চুলের মধ্যে চেরাপুঞ্জি, আচম্বিতে হেসে ওঠার ভিতর সারি সারি ছোটো সাদা হাতি, বুকের খাঁজে ছোটো নাগপুরের মালভূমি, একইরকম অজড়, অমর, অব্যয়।

কাশীতে পায়ে হেঁটে কিংবা রিকশায় চেপে ঘোরাই সুবিধা। তবু নতুন রিং-রোড হবার পর এখন গাড়িও চলছে ইতি-উতি। তাছাড়া যাঁদের আহ্বানে কাশীতে আসা তাঁরা পাঁচতারা হোটেলে রাখা থেকে সবসময়ের গাড়ি, কোনো ব্যবস্থারই কসুর করেননি। সেই গাড়ির চালক পঙ্কজ মৌর্যর কাছে অন্তর জানতে চেয়েছিলেন, বারাণসীতে ইদানীং মদ পাওয়া যায় কি না।

—ক-বোতল চাই আপনার? লাস্ট কয়েক বছরে কাশীতে যতগুলো নতুন মদের দোকান হয়েছে, কানপুর, লখনৌ কিংবা এলাহাবাদ, কোথাও হয়নি। পঙ্কজ ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দিলেন।

—শিবের শহরে গাঁজা খাবে লোকে, সেটা স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু মদের ফোয়ারা ছুটবে...

—সারজি, গাঁজা যদি লোকে খায়, কিংবা কাশীর অরিজিনাল নেশা ভাঙে ডুবে থাকে, কাঁদে-হাসে, গভর্নমেন্টের ঘরে ট্যাক্স ঢুকবে? যে নেশা থেকে সরকারের রোজগার হয়, সরকার চাইবে না সেই নেশা বাড়ুক?

—তাই বলে হেরিটেজ সিটিতে? তবে আর এত পরিবর্তন করে লাভটা কী?

—পরিবর্তন অলরেডি হয়ে গেছে। আর সেই পরিবর্তনই চাইছে, শহর নতুন হোক। পঙ্কজ মৌর্য ঠাট্টার গলায় বললেন।

অন্তরের খুব যে ইচ্ছে করছিল পঙ্কজের সঙ্গে কথা বলতে তা নয় তবে অনেকসময় যাদের গুরুত্ব দেওয়া হয় না, তারাও এমন কথা বলে দেয় যে থম মেরে থাকতে হয়।

—আমার কথা বিশ্বাস না করলে আপনাকে আমি ক্যান্টনমেন্ট থেকে ভেলুপুর ফ্রি রাইড দিয়ে দেব। নিজের চোখে দেখে নেবেন। আর আজ যা দেখবেন কাল তার ডবল হয়ে যাবে। লাহারতারা থেকে চকঘাট যে নতুন ফ্লাইওভারটা হয়েছে সেটার দু-দিকেই শুনছি দুটো করে দোকানের লাইসেন্স দেবে। পান্ডেপুর, সিগরা, মাহমুরগঞ্জ কোথায় হয়নি মদের দোকান? সর্দার প্যাটেল ধর্মশালার উল্টোদিকে প্যাটেল রোডের উপর একটা ছিল, আর একটা হল। তেলিয়াবাগের আনন্দমন্দির সিনেমার পিছনে তো ছিলই, সাইডেও একটা হচ্ছে শুনছি। সব কে সব ফরেন লিকার শপ। দেশি দারু কা ঠেক্কা তো সির্ফ হাইডেল রোড আর শাস্ত্রী চকে।

—দেশি মদের দোকান কাছাকাছি পড়বে?

—দারুর ঠেকে যাবেন?

—আমরা মেক ইন ইন্ডিয়ার কথা শুনব আর সারাক্ষণ ফরেন মাল-এর পিছনে ছুটব?

—আসলে ব্যাপার কী বলুন তো, কাশীতে এখন কম সে কম দশটা ফাইভ-স্টার হোটেল। ফোর-স্টার আর থ্রি-স্টার মিলিয়ে ষাট-সত্তরটা হবেই। এবার যেখানে যেখানে এই হোটেলগুলো খাড়া হয়, তার আশেপাশেই বিলাইতির দোকান গজিয়ে ওঠে।

—হোটেলগুলোর স্টকে তো মাল থাকে, দোকানের দরকার কী?

—হোটেল তো আপনাকে বারোশো টাকার মাল ছ-সাত হাজারে বেচবে মিনিমাম। সামনে লিকার শপ থাকলে লোকে বেরিয়ে কিনে আনতে পারে। ঘরমে বৈঠকে পি লিয়া, খরচা ভি জাদা নহি হুয়া।

—তার মানে যেখানে থ্রি-ফোর-ফাইভ স্টার সেখানেই এই কেলো। আচ্ছা এত যে হোটেল, সেখানে লোক হয়? মানে স্পেশাল অকেশন-এর কথা বলছি না, এমনি সময়ে?

—লোক হয় মানে? বুক না করে এলে, জায়গা পাওয়া কঠিন। বারাণসী এখন ইন্টারন্যাশনাল হটস্পট। জার্মান, ইটালিয়ান, রাশিয়ান, জাপানিজ সব কো একবার আনা হি হ্যায় ইঁহা। আগে মরতে আসত লোকে কাশীতে আর এখন জিন্দগির গ্ল্যামার বাড়াতে চলে আসছে।

অন্তর কুঁকড়ে গেলেন কথাটা শুনে। পনেরো বছর আগে মণিকর্ণিকার একেবারে কাছের একটা বাড়ির তিনতলার জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ ওঁকে বলেছিল, "সবাই তো মরতেই আসে কাশীতে; চলো আমরা বেঁচে দেখাই।" শীতলা গলিতে ছিল সেই বাড়িটা, নাকি সিন্ধিয়া ঘাট লাগোয়া ছিল? আঙুলের হাড় দিয়ে মাথায় চাঁটি দিতে দিতে বাড়িটার ঠিকানা অবধি মনে পড়ে গেল অন্তরের—৭/১৪৭, সিদ্ধেশ্বরী মহল্লা, সঙ্কটা মাতার মন্দিরের সামনে।

মহাদেবের কান থেকে মণিকর্ণিকা মর্তে খসে পড়ায় যেমন মণিকর্ণিকা তীর্থের উৎপত্তি, সেদিন এক কিশোরের কৌমার্য খসে পড়তে পারত কন্যাকুমারীতে। দেবতার আভরণ মাটিতে পড়ে গিয়ে যদি পবিত্র কুণ্ডের জন্ম দিতে পারে, যৌবনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ানো দুই মানব-মানবীর আবরণ সরে গিয়ে জন্ম দিতে পারত ভালোবাসাবাসি। যা হাজার কোটি বার ঘটে যাওয়ার পরও সবার জীবনে নতুন হয়েই আসে, প্রত্যেককে নতুন করে তোলে।

কিন্তু ওই চিতার পর চিতা, কখনো নির্বাপন হয় না যাদের আগুনের; ওই শবের পর শব, যাদের একজন ছাই হয়ে যাওয়ার মুহূর্তেই আর একজন ছাই হতে শুরু করে দেয়; ওই কাঠের টুকরোর পর কাঠের টুকরো যারা ভারতের সব বনজঙ্গল উজাড় করে আসছে; জল-মাটি-আকাশ-বাতাস-আগুনে তৈরি অবয়বকে, আগুনের মাধ্যমে জল-মাটি-আকাশ-বাতাসে প্রত্যার্পণ করবে বলে; কিশোরকে করে দিয়েছিল কাশীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ানো কালভৈরব আর কিশোরীকে, চৌষট্টি যোগিনীর এক যোগিনী। কালভৈরব কেবল দরজা পাহারা দেয়, ঘরে ঢোকে না—যোগিনী মূর্ত থাকে মূর্তিতে, স্নানে যায় না।

অতীতের কষ্টও নস্টালজিয়া হয়ে ধরা দেয়। মাথাটা পিছনে হেলিয়ে দিয়ে অন্তর যখন নিজেকে বর্তমানের স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন, তখনই পঙ্কজ মৌর্য প্রশ্নটা করে বসলেন।

—আমার ওয়াইফ ক্লাসিক্যাল গানের খুব ভক্ত। ও আপনার মুখে 'বিলাওল' শুনতে চায়। নেক্সট প্রোগ্রামটায় শোনাবেন?

২

ছোটোবেলায় বছরে অন্তত একবার কাশী আসা হত। কোনো কোনো বছর দু-বারও এসেছেন। অন্তরের দাদু অভয় রায়চৌধুরী কাশীর নামকরা উকিলদের একজন ছিলেন। তার পাশাপাশি শাস্ত্রীয় সংগীত এবং বেদ-বেদান্তর চর্চাও ছিল ওঁদের বাড়িতে। অন্তরের বাবা চাকরি নিয়ে কলকাতা চলে যাবার আগে অবধি, তিনপুরুষ কাশীরই বাসিন্দা ছিলেন ওঁরা। দাদুর একপ্রকার সহকারী হিসেবে কাজ করতেন মনোহর চতুর্বেদী, ঠিক মাইনে করা কর্মচারী বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না অবশ্য। মাহিষ্মতী নগরী কি অবন্তী রাজ্যের ভিতরে ছিল নাকি বাইরে, এইরকম সব প্রশ্ন করতেন ভদ্রলোক, অন্তর কলকাতা থেকে গেলেই।

লাবণ্য ছিল মনোহর চতুর্বেদীর নাতনি, দাদুর মৃত্যুর কয়েক বছর পর ওর সঙ্গে প্রেম হয় অন্তরের। ততদিনে অবশ্য মনোহর চতুর্বেদীও পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

প্রেম যে কীভাবে হয়েছিল, ছাই ঘেঁটে সেটা ঠিক বের করতে পারেন না অন্তর, কেবল মনে আছে আর সকলে যখন, 'লাভানিয়া' বলত তখন অন্তরের মুখ থেকে 'লাবণ্য' শুনলে খুব খুশি হত মেয়েটা। ওর সঙ্গে কাশীর এদিক-ওদিক অনেক চক্কর কেটেছেন অন্তর। বরুণার পুলের কাছে চুমু খেয়েছেন, চুমু খেয়েছেন লাহারতারায়, আর চুমুর চাইতে অনেক বেশি কিছু হয়ে যেতেও পারত, মণিকর্ণিকা ঘাটের থেকে তিন মিনিটের দূরত্বে, লাবণ্যদের বাড়ির দোতলায়।

লাবণ্য চমৎকার গান গাইত। মনোহর চতুর্বেদীর কথায় ও অন্তরের জেঠিমার কাছে শিখতে এসেছিল কিন্তু দুজনের গানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা ছিল। জেঠিমার খুব প্রিয় একটা কম্পোজিশন ছিল, মিয়াঁ কি মল্লার আর গৌড়মল্লার মিলিয়ে, বসন্তবাহার-এ একটা বন্দিশ গাইতেও ভালোবাসতেন জেঠিমা কিন্তু লাবণ্য এগুলো পছন্দ করত না। ও যে ধ্রুপদী ধারা ধরে থাকতে চাইত সেখানে বৃষ্টি মাটিতে মিশে কাদা হয়ে যেতে পারে, শরীর শরীরে মিশে ইউফোরিয়া হতে পারে কিন্তু একটা রাগ নিজের শুদ্ধতা খুইয়ে অন্য রাগের সঙ্গে মিশে গিয়ে সংগীতের জন্ম দিতে পারে না। ওই ধ্রুপদী ধারা নিয়ে অদ্ভুত উন্মাদনা ছিল লাবণ্যের। প্রতিটা রাগের স্বতন্ত্র প্রবাহ নিজের মধ্যে ধারণ করার এক জেদি নেশা ছিল ওর।

"জো ভজে হরি কো সদা/ সো হি পরম পদ পায়েগা" গানটা অন্তরের মুখে শুনে, শিউরে উঠেছিল লাবণ্য একদিন।

—অসুবিধে কী হচ্ছে তোমার? অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলেন, অন্তর।

—সবটাই অসুবিধে। সকালে যা গাওয়ার সেটা সন্ধ্যায় গাইছখ

—ভৈরবী সবসময় সকালে না গাইলেও হয়!

—তাও! রে গা ধা নি, চারটেই কোমল হবে, তুমি মাত্র একটি জায়গায় কোমল স্বর ছুঁতে পারছ, অসুবিধে হবে না?

পেশাদার সংগীতশিল্পী হবে এমন ভাবনা অন্তরের তখনো ছিল না তবু খারাপ লাগছিল যখন কাশীর শিশু হাসপাতাল'-এর কাছে একটা সরুর সরু গলির ভিতর দাঁড়িয়ে লাবণ্য ওঁকে বোঝাচ্ছিল গলার কসরত আর গানের ফারাক।

—তোমার নিয়ম মেনে চলতে গেলে তো বলিউডের একটা গানও তৈরি হত না। অন্তর বলেছিলেন।

লাবণ্য একটু হেসে বলেছিল, ভিড়ের গান আর মন্দিরের গান এক হয় না ।

—ভিড় বুঝি মন্দিরে হয় না? অন্তর জানতে চেয়েছিলেন।

সেদিন কোনো উত্তর দেয়নি লাবণ্য। পরে একদিন যখন অঝোর বৃষ্টির ভিতর ওরা একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে, মুন্সিঘাট, রাজাঘাট পেরিয়ে তখন রাজাঘাটের একটা বড়ো ছাতার আড়ালে লাবণ্য চুমু খেতে শুরু করেছিল অন্তরকে। সেই চুম্বন, গলা থেকে শিরা-উপশিরা বেয়ে উঠে যাচ্ছিল কপাল অবধি, আবার সেখান থেকে নেমে আসছিল গলায়।

—মানুষের ঠোঁটের সঙ্গে ঠোঁট মিশে যেতে পারে কিন্তু প্রতিটা রাগ হচ্ছে এক-একটা গ্রহের মতো—সূর্যকে কেন্দ্রে রেখে আলাদা আলাদা ঘুরবে প্রত্যেকে, ওগুলো মেশায় কেন তোমার জেঠিমা? লাবণ্য হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করেছিল।

ওই প্রবল বৃষ্টি, প্রায় জনশূন্য ঘাট, অন্তরের মন যেন অন্যমনস্কতার একটা দুর্গ হয়ে উঠেছিল যেখানে কোনো প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর নেই। লাবণ্য চুম্বনের গতি কমানো-বাড়ানোর সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিল। অন্যদিকে অন্তরের মনে হচ্ছিল ও যেন ভেসে যাচ্ছে সেই পাথরের মতো, নদীর স্রোতকে যে নিজের মনের কথা বলে যায় শুধু, স্রোতের সঙ্গে কথোপকথন হয় না যার।

কথোপকথন সেদিনও বেশি হয়নি যেদিন সন্ধ্যায় ওরা মণিকর্ণিকার সামনে গিয়ে বসেছিল অনেকক্ষণ। তখনো মণিকর্ণিকার চিতাকে ফ্রেম-এর মধ্যে নিয়ে সেলফি তোলার যুগ আসেনি তবু ওই অনন্ত আগুন এবং অফুরন্ত ধোঁয়ার ভিতরে দশ মিনিট বসার পরই কীরকম যেন চাপ লাগছিল অন্তরের। সেই চাপটা কমে গেল যে মুহূর্তে লাবণ্য ওকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে যেতে চাইল। মণিকর্ণিকা ঘাটের থেকে খুব জোর তিনশো মিটার ওদের বাড়ি কিন্তু তাতে পৌঁছোনোর রাস্তা যে কী দুরূহ! সেই বাড়ির প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে যখন দম নিচ্ছে, অন্তরকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেছিল লাবণ্য। ওর সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠেছিল, দুই উরুর মাঝখানে প্রবল চাপ অনুভব করছিল আর তখনই হঠাৎ বিলাওলের তান ধরেছিল মেয়েটা। গলায় এত অনায়াসে কেউ সুর খেলাতে পারে কীভাবে, ভেবে তল পাচ্ছিল না অন্তর। মারাদোনার পায়ের ছোটো ছোটো ভাঁজে যেমন কেটে যায় বিপক্ষের বাঘা ডিফেন্ডাররা, লাবণ্যর গলা থেকে ছুটে আসা সুরের ফুলকিতে কেটে যাচ্ছিল সব অন্ধকার।

গলায় এত অনায়াসে কেউ সুর খেলাতে পারে কীভাবে, ভেবে তল পাচ্ছিল না অন্তর।

তার আগে সেই সকাল থেকে ওরা ঘুরেছে। লাবণ্যর মন করেছিল অন্তরের সঙ্গে পায়ে হেঁটে কাশীর নবদুর্গা দর্শন করবে। সেইমতো আলাইপুরার মড়িঘাটের কাছে দেবী শৈলপুত্রীর মন্দিরে অন্ধকার গর্ভগৃহে লাল কাপড়ে মোড়া কষ্টিপাথরের মূর্তি দেখে যাত্রা শুরু হয়েছিল।

শিবনিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী যখন প্রাণত্যাগ করেন তখন মহাদেব ক্রোধে পাগলপারা হয়ে পার্বতীর দেহ কাঁধে নিয়ে নাচতে শুরু করলেন। তাঁর তাণ্ডবনৃত্যে বিশ্ব বুঝি তলিয়ে যায় এই ভয়ে ভগবান বিষ্ণু নিজের সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে থাকলেন। দেবীদেহের সেইসব খণ্ড যেখানে যেখানে পড়ল, জন্ম নিল একটি করে শক্তিপীঠ। ওদিকে অসুরের সন্ত্রাসে বিপন্ন বিধ্বস্ত দেবতারা ব্রহ্মার নির্দেশে আদ্যাশক্তি মহামায়াকে কাতর প্রার্থনা করতে শুরু করলেন তাঁদের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য। সেই প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে দেবী দুর্গা আবার মর্তশরীর ধারণ করে হিমালয়ের ঘরে জন্ম নিলেন। তখনই তাঁর নাম হল শৈলপুত্রী।

অচ্যুত মহারাজ বলে এক সন্ন্যাসীর কাছে লাবণ্যর খুব যাওয়া-আসা ছিল। তিনিই ওকে বলেছিলেন যে কাউকে নবদুর্গা দেখাতে নিয়ে গেলে, মন্ত্রের ক্রম ভেঙে পথের সুবিধা অনুযায়ী যাওয়াই ঠিক। সেই হিসেব অনুযায়ী শৈলপুত্রী দর্শনের পরই দেবী স্কন্দমাতার মন্দিরে যাওয়া হল ঔসনগঞ্জের গলি-উপগলি পার হয়ে, জৈতপুরায় পৌঁছে।
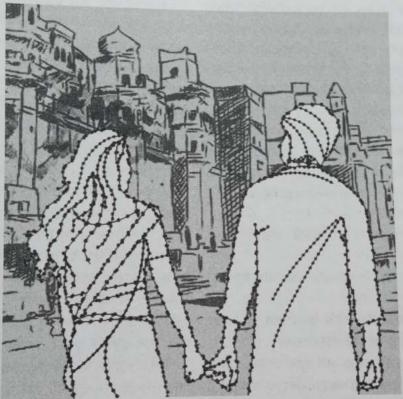
স্কন্দমাতার সামনে এসে লাবণ্য হাতজোড় করে বলছিল, "কনকসমান কলেবর রক্তাম্বর রাজে/রক্তপুষ্প গলমালা কণ্ঠনপর সাজে।"

অন্তর স্তব্ধ হয়ে ভাবছিল, আগেও তো কতবার এসেছে কাশীতে কিন্তু এই মন্দিরে নিয়ে আসেনি তো কেউ। কষ্টিপাথরের সিংহবাহনা দেবীমূর্তি, দেবীর ত্রিনয়ন শ্বেত শঙ্খের তৈরি। দেবীকে প্রণাম করে পাশের সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলে একটি সুড়ঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়। ঘনান্ধকার সুড়ঙ্গের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে কেমন যেন

একটা আবছা ওঁকারের আভাস পাওয়া যায়, একদিকের দেওয়ালে। কাশীর অনেক মন্দিরেই পাতালে একটি তলা আছে। সুলতানি বা মোগল আমলে আচমকা আক্রমণের সময় বিগ্রহকে বাঁচাবার জন্য এরকম ভূগর্ভস্থ গুপ্তকক্ষের প্রয়োজন হত।

স্কন্দমাতার পর পাশাপাশি দুটো মানুষ একসঙ্গে চলতে পারবে না এরকম সব গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছনো গেল দেবী চন্দ্রঘণ্টার মন্দিরে। অটোর দৌড় চক অবধি। চকের বাঁদিকে লক্ষ্মী চৌতারার খানাখন্দে ভরা রাস্তা পেরিয়ে চন্দুনাউ-এর গলির ভিতরে একটি অপরিসর, অপরিচ্ছন্ন তেরাস্তার মোড়ে দেবীর মন্দির। খুব ছোটো মন্দির, দরজা-জানলা কিছুই প্রায় নেই, গ্রিল দিয়ে ঘেরা একটি ঘরের ভিতর পিছনের দেওয়ালের দিকে বেদির উপরে সিংহাসন আর তাতে হাতখানেকের একটু বেশি উঁচু রক্তবস্ত্র আচ্ছাদিত দেবীমূর্তি। দেবীর পাশেই একটি বড়ো ঘণ্টা। কে জানে কখন বেজে উঠবে!

চন্দ্রঘণ্টার মন্দির থেকে বেরিয়ে হাঁটা শুরু করতে হল আবার। গাড়ি কিংবা অটো তো দূরস্থান, রিকশারও চলা কঠিন ওইসব গলির ভিতর দিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে মৈদাগিন ছাড়িয়ে কালভৈরবের মন্দিরের পশ্চিমদিকের একটার পর একটা গলি পেরিয়ে সিদ্ধিদাত্রী গলির একটা দরজার সামনে অন্তরকে দাঁড়াতে বলল লাবণ্য। শেকলের সঙ্গে দড়ি বাঁধা ছিল দরজায়। দরজার ফাঁক দিয়ে দড়ি ধরে টানলে ভিতরে ঘণ্টা বেজে ওঠার কথা। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় গেলে রেলিং দিয়ে ঘেরা জায়গায় দেবীর বিগ্রহ, ঠাকুরমশাই পর্দা সরিয়ে দিতেই সিদ্ধিদাত্রীর কষ্টিপাথরের বিগ্রহ যেন প্রাণ জুড়িয়ে দিল। কালোর ভিতরে অত আলো, অন্তর আগে জানত না। চতুর্ভুজা দেবীর চোখ তিনটি সোনার, তাঁর চার হাতে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম।

আবারও পায়ে হেঁটে আরও গলি পেরিয়ে আত্মাবীরেশ্বরের গলিতে এসে পড়া গেল।

—বিশ্বনাথের আত্মা বলেই বলেই ওঁর নাম আত্মাবীরেশ্বর। লাবণ্য জানাল।

—বিশ্বনাথের আত্মা বিশ্বনাথের থেকে দূরে থাকে কী করে? অন্তর একটু কৌতুকের গলায় জানতে চেয়েছিলেন।

—সূর্যের আলো যদি সূর্যের থেকে এত দূরে তোমার-আমার গায়ে এসে লাগতে পারে, বিশ্বনাথের আত্মা মন্দিরের একটু দূরে থাকতে পারে না কেন? লাবণ্যর প্রশ্ন ছুটে এল প্রশ্নের উত্তরে।

চুপ করে গেলেন অন্তর। ওঁর মনে হচ্ছিল, এই মেয়েটির ভিতর স্পষ্টতার যে ধার আছে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবেন না। বীরেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহে দেওয়ালের নীচের কুলুঙ্গিতেই দেবী কাত্যায়নীর অধিষ্ঠান। পুরোহিত হিন্দিতেই বলছিলেন যে স্বামী বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী দেবী বীরেশ্বরের কাছেই মানত করেছিলেন সন্তানের জন্য। তাই পুত্রের নাম বীরেশ্বর রাখা হয়েছিল প্রথমে।

পুরোহিতের কথা শুনতে শুনতেই পাশে দাঁড়ানো লাবণ্যর দিকে চোখ যেতে দেখা গেল যে ও বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করছে। অন্তরের চোখে চোখ পড়তেই গলা তুলল, "চন্দ্রহাসোজ্জ্বল-করা শার্দূলবরবাহনা/ কাত্যায়নী শুভং দদ্যাৎ দেবী দানবঘাতিনী।"

রাস্তা কিংবা গলি, ঘর অথবা বারান্দা, শস্যক্ষেত্র থেকে রণক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা দানবদের সম্বন্ধে তখন কতটুকুই বা জানা ছিল! অন্তরের মনে তাই মুগ্ধতার পাশাপাশি সমীহ জন্মাচ্ছিল লাবণ্যর প্রতি। গলির রাস্তা অনেক ঘোরপ্যাঁচের, তার থেকে ঘাট ধরে যাওয়া ভালো মনে করে লাবণ্য যখন কাত্যায়নী দর্শনের পর সিন্ধিয়া ঘাট থেকে এগোতে লাগল মণিকর্ণিকার দিকে তখন অন্তর কিছুই না বলে অনুসরণ করতে শুরু করলেন ওকে।

মণিকর্ণিকা কেবল শ্মশান কিংবা তীর্থ নয়, মণিকর্ণিকা এক বিস্ময়। কত কাঠ মাথায় করে নিয়ে আসছে কত লোক, কত চিতা যে জ্বলছে।

—এই যে কুণ্ড দেখছ, এর নাম চক্র-পুষ্করিণী। বিষ্ণু এখানে তপস্যা করছিলেন, তাঁর ঘামেই এই কুণ্ড পূর্ণ হয়ে যায়। সেই দৃশ্য দেখতে গিয়ে মহাদেবের কান থেকে কুণ্ডল খুলে পড়ে কুণ্ডের মধ্যে আর তখন থেকেই এই কুণ্ডের নাম মণিকর্ণিকা। একটা নালা গঙ্গার সঙ্গে এই কুণ্ডটাকে জুড়ে রেখেছে বলে, গঙ্গার জলই আসে এখানে।

অন্তরের মনে হল, ওই নালাটা তৈরি করেছে কে? নিশ্চয়ই কোনো ইঞ্জিনিয়ার এবং অনেক শ্রমিক মিলে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা মহেশ্বর নিশ্চয়ই হাত লাগাননি। কথাটা উচ্চারণ করল না কারণ লাবণ্য একটা ঘোরের মধ্যে ছিল, সেটা ভেঙে দিতে মন করছিল না। গঙ্গায় জোয়ার আসছিল বলে কুণ্ডের জলস্তরও বাড়ছিল, অন্তর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেলেন, সামনের মার্বেল পাথরে একটি শ্লোক খোদাই করা, "মরণং মঙ্গলং যত্র সফলং জীবনং তথা..."!

পায়ে ব্যথার দোহাই দিতেই লাবণ্য যখন নবদুর্গার ছয় দুর্গা দর্শন করেই ঘোরাঘুরিতে ইতি টেনে ওঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল, অন্তর তখনো জানেন না, কী অপেক্ষা করছে ওঁর জন্য। কিন্তু লাবণ্যর আদর যখন অন্তরের সঙ্কোচের উপর থেকে চাদর সরিয়ে নিচ্ছে, তখনই দরজার বাইরের কড়া নড়ে উঠল জোরে।

একরাশ বিরক্তি নিয়ে লাবণ্য দরজা খুলতেই, অন্তর ওর পিছন থেকে দেখলেন, একজন বয়স্কা মহিলা হাউমাউ করে কান্না জুড়েছেন। কী তাঁর বক্তব্য বোঝা যাচ্ছিল না কারণ নির্ভেজাল গ্রাম্য ভোজপুরীতে কথা বলছিলেন কিন্তু লাবণ্য যে ঘোর দুর্ব্যবহার করছে তাঁর সঙ্গে, সেইটে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না।

যদি মণিকর্ণিকা না হয়ে পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গা হত, অন্তরের হয়তো কিছুই মনে হত না; যদি বয়সটা আর পাঁচ বছর বেশি হত তাহলেও হয়তো পাত্তা দিত না কিন্তু সেই সন্ধ্যায় সদ্য কুড়ির বালকের কাছে সন্ধ্যার লাবণ্য আর সারাদিনের লাবণ্যর ভিতরের ফারাকটা আলাস্কা আর সাহারার চাইতেও বেশি মনে হয়েছিল।

হয়তো লাবণ্যরও উপায় ছিল না, ওদেরও তো দিন গুজরান করতে হত। অন্তরকে বলেওছিল ও সেই কথা।

—আমাদের চলবে কেমন করে? আমার বাবা সংসার ছেড়ে নিরুদ্দেশ একরকম। ন-মাসে-ছ-মাসে একবার করে আসে, তিন-চারদিন থেকে চলে যায় ফের। কেউ বলে কোনো আশ্রমে থাকে, কেউ বলে সংসার পেতেছে আবার, সত্যিটা কী আমি ঠিক জানি না।

—তাই বলে, তুমি ওদের ওইভাবে মুখ করবে? ওই বয়স্ক ভদ্রমহিলার ছেলে মারা গেছে, তুমিই তো বললে!

—আমাদের একতলার দোকান এত পুরনো যে তারা ভাড়া দেয়

না। দোতলায় যারা থাকতে আসে তারা সবাই তো কোনো না কোনো মুর্দার আত্মীয়। ঘরের কেউ না মরলে, এই বাড়িতে থাকতে আসবে কেন ঘরের লোকেরা?

অন্তর যেন স্ট্যাচু হয়ে গিয়েছিলেন কথাটা শুনে। মণিকর্ণিকায় বাবার দাহসংস্কার করতে ছেলে আসছে, ছেলের দাহসংস্কার করতেও বাবা আসছে কখনো-সখনো। আর প্রত্যেকবারই আসছে, আরও আরও বাড়ির লোক। কেন আসছে তারা? বেদনার উদযাপন করতে? নাকি সর্বনাশের ভিতরও একটু পুণ্যার্জনের লোভে? আসছে প্রয়াগরাজ থেকে, উন্নাও থেকে, হরদই থেকে, বালিয়া থেকে, কখনো লখ্নৌ বা কানপুর এমনকি মীরাট থেকেও। একবেলা না খেয়ে, ফাটা জামা, ছেঁড়া চটি পরে, শুধু মণিকর্ণিকায় আত্মজনকে পোড়ানোর জন্য ভারতবর্ষ আসছে বারাণসীতে।

হোটেলে থাকার সামর্থ্য নেই সেই সব শ্মশানযাত্রীর, আবার একদম রাস্তাতে পড়ে থাকার মতো ধকও নয়। তাই তারা দিনপ্রতি তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় ভাড়া নেয় সংকটা গলি কিংবা সিদ্ধেশ্বরী মহল্লার বাড়ির ঘর। এক-একটা ঘরে চার-পাঁচজন করে থাকে—আর বাড়ির মালিকরা একজনকে পঞ্চাশ টাকায় ভাড়া দিলে চারজনকে দেড়শো টাকায় দেয়। সেই ভাড়া দিতে না পেরেই এক পুত্রশোকাতুরা বিনা ভাড়ায় একদিন থাকার অনুরোধ করতে এসেছিলেন লাবণ্যর কাছে। কিন্তু লাবণ্য একেবারে গুষ্টির তুষ্টি করে ফেরত পাঠিয়ে দিল তাঁকে।

যে লাবণ্য ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাঙালি-অবাঙালি মানে না, সে টাকার ব্যাপারে এত কঠিন কেন? ঘোড়া ঘাসের প্রতি দয়া করলে না খেয়ে মরবে এই কথা সত্যি হলেও একমাত্র সত্যি কি?

সত্যি আর মিথ্যার বাইরে কোথাও সংবেদনশীলতা দাঁড়িয়ে থাকে। অন্তরের বাবা প্রায়ই বলতেন যে প্রেম নাকি মানুষকে অমানুষ করে। কারণ প্রেমে পড়ে যে ছেলেটা সতেরো বছরের মেয়েকে সিট ছেড়ে দেবে বাসে কিংবা মেট্রোয়, সেই ছেলেটাই একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধাকে থরথর করে কাঁপতে দেখলেও, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকবে। উঠে দাঁড়াবে না।

বাবার কথাটাকে সেদিন সন্ধ্যায় নিজের ভিতরে মিথ্যে হতে দেখলেন অন্তর। লাবণ্যকে একটু আগেও আদরে আদরে গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল; ওর ইশারা গলিয়ে দিচ্ছিল ভিতরের সব পারাকে, ওর জিভের স্পর্শ চোখ থেকে কেড়ে নিচ্ছিল দৃষ্টি আর কান থেকে শ্রুতি, ওর দুটো হাত হাতিয়ারের মতো ফালাফালা করে দিচ্ছিল এক সদ্য যুবকের গোটা অস্তিত্ব। কিন্তু মুখ-ঝুক খেয়ে ওই বৃদ্ধা চলে যাবার পর লাবণ্য আবার যখন ওঁর সামনে এসে দাঁড়াল তখন ফুটন্ত জল বরফে বদলাতে শুরু করে দিয়েছে। হয়তো লাবণ্যর ঘরের জানলা দিয়ে মণিকর্ণিকার ওই কুণ্ড, ওইসব শায়িত আগ্নেয়গিরি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল বলেই ভিতরের আগুনটা ছাই হয়ে গেল!

—বিরক্ত করতে চলে আসে, অকারণে। লাবণ্য গলার বিরক্তি গোপন করার চেষ্টা করেনি।

চুপ ছিলেন অন্তর। একজনের কারণই তো অন্যজনের অকারণ। আদিম মানুষ যখন জ্যান্ত পশুকে ঝলসে নিত আগুনে তখন সেই আগুন তার কাছে আঁচই থাকত কিন্তু পশুটার কাছে?

লাবণ্য কাছে এসে হাত দিয়ে বিলি কাটতে শুরু করেছিল ওঁর চুলে, আর একইসঙ্গে গুনগুন করছিল কিছু। যত অন্তরের কাছে আসছিল লাবণ্যর মুখ তত যেন প্রতিমার মতো চকচক করছিল।

—পা রে সা রে গা সা/ গা রে রে সা সা / পা রে সা রে গা সা...

—এই রাগ ঠিক এই সময়ের তো?

লাবণ্য হো হো করে হেসে উঠল। তারপর অন্তরের মাথাটা দু-হাত দিয়ে ধরে গেয়ে উঠল, "অঙ্গ সুগন্ধন চন্দন মাথে তিলক ধারে/ ত্রিগুণ অঞ্জন অঞ্চল পবন...

অন্তর শুনছিলেন কিন্তু এক বৃদ্ধার কুঁচকোনো মুখ ওঁকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল বারবার।

লাবণ্য গান থামিয়ে আবারও চুমু দিতে শুরু করল আর চুমু দিতে দিতে বলে উঠল, বিলাওল, আমার বিলাওল। সবটাই শুদ্ধ তোমার, সবটা।

অন্তরের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরা আনন্দে অবশ হয়ে আসছিল কিন্তু লাবণ্যর শেষ কথাটায় হৃৎপিণ্ডে চাকুর মতো বিঁধে গেল একটা কষ্ট যেটা ক্রমাগত বলে যাচ্ছিল, প্রেমের ভিতরে যদি নিষ্ঠুরতা থাকে তবে তা অশুদ্ধ, অশুদ্ধ, অশুদ্ধ।

লাবণ্যর থেকে এক ঝটকায় নিজেকে সরিয়ে অন্ধ আঁধির মতো দরজা ঠেলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন অন্তর। যেতে যেতে বলে গিয়েছিলেন, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না একদম। পরে কখনো...

মনের দায় শরীরের উপর চাপিয়ে দেওয়া মানুষের পুরোনো অভ্যাস। সেই অভ্যাসের বশবর্তী হয়েই নতুন অভিজ্ঞতার সিং-দরোজা খোলা পেয়েও পিছু হটে পালিয়ে গিয়েছিলেন অন্তর।

পরদিনই ছিল ওঁর কলকাতায় ফেরার ট্রেন।

৩

চোখটা একটু লেগে গিয়েছিল। গন্তব্য এসে গেছে বলে অন্তরকে ডাক দিলেন পঙ্কজ মৌর্য। আর তখনই খেয়াল পড়ল যে এবার বারাণসীতে এসে নতুন যা জেনেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনাটি হল লাবণ্য চতুর্বেদী এখন একজন জনপ্রিয় ভোজপুরী গায়িকা। আনন্দমন্দির সিনেমার দেওয়ালে তার জলসার পোস্টার পড়েছে।

শুদ্ধ আর অশুদ্ধ ... ক্লাসিক্যাল আর পপ কোথায় যে মিশে যায়! ভাড়া চাইতে চাইতে আগুন কখন যে সর্বস্ব দাবি করে। অন্তরের অন্তর হেসে উঠল।

গাড়ি থেকে নেমে এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন উনি। তারপর পঙ্কজ মৌর্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা ব্যক্তিগত কারণে আমি অনেকদিন বিলাওল গাইনি। তবে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে অবশ্যই আসুন আগামী পরশুর আসরে। ওইদিন আমি আবার বিলাওল গাইব। ❖

গল্প

তিন পীড়ীওঁকা সম্বন্ধ

শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ছবি : প্রণব হাজরা

প্রথম অধ্যায়

মেহবুব যেদিন প্রথম আমাদের ইস্কুলে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হয়ে আমাদের ক্লাসে এল সেদিন থেকেই ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব। প্রথম দিন এসেই একই বেঞ্চে আমার পাশে বসল। পরে ওর কাছে শুনেছিলাম মুর্শিদাবাদের কোন এক গ্রামের ইস্কুলে পড়ত, ওর দাদি আর চাচার কাছে থাকত। ক্লাস ফাইভে ওঠার পরে ওর বাবা ওকে বহরমপুরে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

ছোটো থেকেই ও ছিল রোগা, লম্বা আর খুবই ধীর, স্থির, শান্ত প্রকৃতির। ক্লাসের অন্য সবার চেয়ে আলাদা। চিৎকার-চেঁচামেচি, গণ্ডগোল কোনো কিছুর মধ্যেই সে থাকত না। লেখাপড়ায় সে ছিল অত্যন্ত সাধারণ মানের, কিন্তু অঙ্ক এবং ইতিহাসে তার ছিল ভীষণ আগ্রহ। এই দুটো বিষয়ে ক্লাসের মধ্যে সে সবসময়ে সবার চেয়ে বেশি নম্বর পেত। আর সে ভালোবাসত ঘুড়ি ওড়াতে। কতরকম মাঞ্জা করা সে যে জানত, তা বলে শেষ করা যাবে না। ঘুড়ি ওড়ানো আমারও ছিল নেশা। তার সাথে দুজনারই ছিল পায়রা পোষার শখ। এই সব কারণে দুজনার আরও বন্ধুত্ব গাঢ় হয়, ইস্কুলে সময়ের বাইরেও আমরা একসাথে থাকতাম। এইভাবে একসাথে থাকতে থাকতে মেহেবুবের দুটো পরিচয় আমার কাছে স্পষ্ট হয়। প্রথম যেদিন ওদের বাড়ি যাই সেদিন ওদের পুরোনো বাড়ির বাইরের ঘরে দেখি ওর বাবা ইউনানি দাবাখানায় বসে আছেন। আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। নাম, কোন পাড়ায় থাকি বলাতে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"গঙ্গার ধারে মুখার্জিবাড়ি, মানে—পুঁটু, বিজু তোমার কেউ হয়?"

আমি উত্তর দিলাম—"আমার বাবা, আর কাকা।" উনি হেসে বললেন, "মণিকাকা তোমার দাদু হয় তাহলে। তুমি কি জানো, তোমার দাদু আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। তোমার বাবা, কাকার সাথে ছোটো থেকে একই ইস্কুলে পড়েছি আমি। এদিকে তুমি আর মেহবুবও দেখছি খুবই বন্ধু।"

মেহবুবের মাকে বাড়ির ভেতর থেকে ডেকে পাঠিয়ে হাসতে হাসতে বললেন—"দেখ, দেখ, এ যে তিন পুরুষের বন্ধুত্ব। তিন পীড়ীওঁকা সম্বন্ধ, তিন নসল কা দোস্তি, হাঃ হাঃ। নাজিমা আজ তুম ইসকো কুছ খিলাও।"

শুধু এই কারণে কি না জানি না, এরপর থেকে আমরা দুজনাই একে অপরের বাড়িতে খুব সহজ হয়ে গেছিলাম। আমি থাকতাম আমার বড়োপিসির কাছে। আমার বড়োপিসি নিজের ছেলের মতো স্নেহ করত মেহবুবকে। মেহবুবের মা কত রকমের রান্না করে যে খাওয়াত তা বলে শেষ করা যাবে না। বলত—"শ্যাম বেটা তুঝে ম্যায় হরকিসমকে মুর্শিদাবাদী জায়কা সিখা দুঙ্গী। ইয়ে হামারে মুর্শিদাবাদ কা নবাবি ঘরানা হ্যায়। তেরে শাদি কে বাদ বহু কো ভী সিখা দুঙ্গী।" মুর্শিদাবাদ সম্পর্কে এক অদ্ভুত গর্ব তাদের পরিবারে সবসময়ে দেখেছি। বাংলাদেশ যখন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে জন্ম নিল, মেহবুবের বাবা বারবার বলতেন—

"বাটোয়ারে কে সময় হাম উন লোগোকে সাথে জুড়ে নেহী থে, হামারা মুর্শিদাবাদ তিন দিনোকে বাদ ১৮ অগস্ট মে আজাদ হুয়ে থে। হাম সব সমঝ-বুঝকে উনকে সাথ জুড়ে নেহী। হামারে বুজুরগ নে ঠিকহী সোঁচে থে। ওহাঁকে আদমি হামারা ইঁহাকে তহজীব সে না-ওয়াকিফ তব ভী থে, ঔর আজ ভী হ্যায়।"

আমরা ছিলাম প্রাণের বন্ধু। আনন্দ-উৎসবে, খেলার মাঠে, দোল-দুর্গোৎসব, ইদ, মহরমের তাজিয়ার মিছিলে সব কিছুতে একসাথে। একটু উঁচু ক্লাসে উঠে আমি ইস্কুলের ফুটবল টিমে চান্স পেলাম। বহরমপুর থেকে একটু দূরে জঙ্গীপুরে খেলা। মেহবুব আমার সাথে চলল। সেখানে গিয়ে তার আর এক পরিচয় পেলাম। শান্ত-শিষ্ট মেহবুবের সাহস আর রুদ্রমূর্তির। লোকাল টিম এক গোলে এগিয়ে যেতেই মাঠের ধারে বসা দর্শকরা আমাদের বিদ্রূপ করতে শুরু করল। আমি রাইট উইঙ্গে খেলছিলাম। গোলটা আমি শোধ করা মাত্রই দর্শকদের বিদ্রূপ আর গালাগালি আরও বেড়ে গেল। অবস্থা চরমে উঠল এবং রেফারি খেলা বন্ধ করে দিল যখন আমি বল নিয়ে সাইডলাইন দিয়ে দৌড়োনোর সময় বাইরে থেকে একজন দর্শক আমার জার্সি ধরে টেনে ফেলে দিল। হঠাৎ দেখি মেহবুব কর্নার ফ্ল্যাগের লাঠি নিয়ে আমাকে আড়াল করে এসে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল—"সাহস থাকে তো সামনে আয়। দেখি কত বড়ো বাপের ব্যাটা হয়েছিস।" তাকে আগে কখনো এত রেগে যেতে দেখিনি। তার ওই ভয়ংকর মূর্তি দেখে সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেল। খেলা আবার শুরু হলে আমরা দু-এক গোলে জিতলাম।

এমনি করে একসাথে থাকতে থাকতে ইস্কুলের দিন আমাদের শেষ হল। দুজনে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিলাম। মেহবুব ভালো রেজাল্ট করেছিল, কিন্তু আমার রেজাল্ট ভালো হল না। বাবা আমাকে আর বহরমপুরে রাখতে চাইলেন না। আমাকে ছোটোবেলার জায়গা ছেড়ে, বন্ধুকে ছেড়ে চলে আসতে হল দমদমে।

চলে আসার আগের দিন ওর বাড়িতে গিয়ে মেহবুবের মার মুখে শুনলাম ও সারাক্ষণ মনমরা হয়ে চুপ করে বসে থাকছে। সকাল থেকে কিছু খায়ওনি। কাছে যেতে আমাকে দেখে ওর চোখের জল আর বাধা মানল না! অনেকক্ষণ দুজনা একসাথে বসে থাকলাম। দুজনা ঠিক করলাম মাঝে মাঝে আমি বহরমপুর চলে আসব, আর মেহবুবও আমার কাছে যাবে।

মানুষ ভাবে এক আর তার জীবন তাকে অন্যদিকে নিয়ে যায়। প্রথম প্রথম চিঠিতে যোগাযোগ হয়েছিল, কিন্তু সংসারের নিয়মে জীবন অন্যভাবে বয়ে চলল। আর আমাদের দেখা হল না। আমারও আর বহরমপুরে যাওয়া হল না। মাঝে মাঝে মনে হত ওর কথা। সময়ের স্রোতে জীবন অন্যখাতে বয়ে চলল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্ধেবেলায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি বাগানে বাবার প্রিয় গোলাপ গাছগুলো শুকিয়ে পড়েছে। এরকম তো হবার কথা নয়। বাবা নিজে খাওয়ার কথা ভুলতে পারে, কিন্তু গাছে জল না দেওয়া তো কখনোই হবে না।

মাকে জিজ্ঞাসা করায় বলল—"কী জানি কী হয়েছে। দু-দিন ধরে দেখছি খুব চুপচাপ রয়েছে। কিছুটা অন্যমনস্ক।" আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করায় বলল কিছু হয়নি—শরীর ঠিকই আছে। আমিও আর ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্ব দিলাম না। কিন্তু বাবার শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়তে লাগল। সবসময় গভীর চিন্তায় থাকে। আমার বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হলে মাকে বারবার জিজ্ঞাসা করে আমি কিছু বলে গেছি কি না। হঠাৎ করে বাবার কী হল আমরা কেউই বুঝতে পারছিলাম না। এক রাতে খাবার টেবিলে বাবা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে আনলাম। ব্লাডপ্রেশার খুব বেশি। অত্যন্ত মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে হতে পারে। কিছু টেস্ট তাড়াতাড়ি করে করিয়ে নিতে বললেন। রাতে বাবার ঘরে গিয়ে দেখি বিছানার ধারে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। গভীর চিন্তায় মগ্ন। আমি বললাম—"তুমি এখনো ঘুমোওনি? ডাক্তার বলে গেছে তোমার প্রেশার বেশি। এখন যদি রাত করে জেগে থাকো তাহলে তো আরও শরীর খারাপ হবে।"

"ঘুমোতে আর পারছি কই?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"এত চিন্তা করছ কেন? কী হয়েছে, আমাকে বলো।"

বাবা বললেন, "বড়ো বিপদ রে শামু, অজান্তেই মনে হয় বড়ো কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে গেলাম। তুই সাবধানে চলাফেরা করিস, আর তোর মাকে কিছু এখন বলিস না। ভয় পেয়ে যাবে।"

বাবার মুখে যা শুনতে পেলাম—রোজকার মতো তিনি বিকেলে বড়ো রাস্তা হয়ে, সামনের পার্কের পাশ দিয়ে, হাঁটতে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, একাই ছিলেন। হঠাৎ দেখেন একটা ছোটো ট্রাক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় ইঞ্জিনে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, অথবা কারোর জন্য অপেক্ষা করছে। জায়গাটা পার্কের পিছন দিকের, বেশ খানিকটা নির্জন। ট্রাকের সামনে দুজন লোক দাঁড়িয়ে চারিদিকে সতর্কভাবে তাকাচ্ছে। ট্রাকের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে বাবা মেয়ের গলার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ পান। বাবা ট্রাকের পিছনে গিয়ে একটু দাঁড়িয়ে পড়েন। লক্ষ করেন সামনের লোক দুটো ট্রাকের কাছ থেকে কিছুটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কৌতূহলবশত বাবা ট্রাকের দরজাটা খুলে দেখেন চারজন ছোটো মেয়ে, প্রত্যেকের বয়সই ১২ থেকে ১৩-র মধ্যে সিটের নীচে হাত-মুখ বাঁধা-অবস্থায় পড়ে রয়েছে। একজন ছাড়া বাকি সবাই অজ্ঞান, সে-ই কাঁদছে। বাবা দরজাটা অল্প খুলে মেয়েটির মুখের বাঁধন একটু আলগা করে দিলে সে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "দাদু আমাদের বাঁচাও, এরা আমাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, বিক্রি করবে বলে।" মেয়েটির কান্নার আওয়াজ পেয়ে সামনের লোক দুটো ছুটে আসে বাবার কাছে, বলে, "আপনি কী করছেন এখানে? কী দরকার আপনার? ট্রাকের দরজা খুললেন কেন?"

বাবা জিজ্ঞাসা করেন, "এদের কোথায় ধরে নিয়ে যাচ্ছেন? ছেড়ে দিন। কাঁদছে এরা।" একজন শক্তসমর্থ লোক তখন এগিয়ে এসে বলে, "আপনার এদের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে না। এরা পাগল, এদের পাগলা গারদে নিয়ে যাওয়া হবে।"

বাবা তখন ওদের জোর করতে থাকে, মেয়েগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু রাস্তাটা নির্জন এবং সঙ্গে কেউ না থাকায় ওরা বাবাকে জোর করে ট্রাকের কাছ থেকে সরিয়ে দেয়। হঠাৎ করে তখন ট্রাকের পেছনে একজন মোটরসাইকেল আরোহী এসে দাঁড়ায়। আগের লোকগুলোর সঙ্গে তার কিছু কথা হয়। সে তখন বাবার দিকে এগিয়ে এসে বাবাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় আর বলে, "নিজের কাজে যান, আমাদের বিরক্ত করবেন না।" কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রাক আর মোটরসাইকেল চালক সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যায়।

বাবা সেই অবস্থায় সোজা থানায় গিয়ে সামনে যে অফিসারকে দেখতে পান তার কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। অফিসার

বাবাকে বলেন, "আপনি বাড়ি যান, আপনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। আমরা খোঁজ নিচ্ছি।" বাবা লিখিতভাবে সমস্ত ঘটনা জমা দেবার কথা বলেন, কিন্তু অফিসার বলেন, "তার এখনই কোনো দরকার নেই। আমরা আগে খোঁজ করি, পরে দরকার হলে আপনাকে ডাকব।"

অনেকক্ষণ কথা বলার পর বাবা একটু থেমে আবার বললেন—"আমার মনে হল পুলিশ অফিসার ঘটনাটার কোনো গুরুত্বই দিল না।"

আমি বাবাকে আর এসব নিয়ে চিন্তা করতে বারণ করে শুয়ে পড়তে বললাম। পুলিশে যখন খবর দেওয়া হয়েছে তারাই ব্যাপারটা দেখবে। বললাম, "তুমি এর চেয়ে বেশি আর কীই বা করবে। শুয়ে পড়ো, কাল টেস্টগুলো করতে হবে।" আমার মনে হল বয়সের কারণে বাবা বেশি উতলা হয়ে পড়েছেন। পুলিশকে বলা হয়েছে যখন, তখন গণ্ডগোল কিছু থাকলে তারাই দেখবে। আমি শুতে গেলাম।

আজ আপশোশ হয়, বাবার কথাটাকে খুব একটা গুরুত্ব না দেওয়ায়।

পরদিন সকালে অফিস বেরোনোর আগে বাবা আমার ঘরে এসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "একটা কথা মনে হল। জানি না ঠিক দেখেছি কি না। সেদিন থানা থেকে বেরোনোর সময় ওই ট্রাকের কাছে আসা লোকটার মোটরসাইকেলটা আমি থানার গেটের বাইরে দেখেছিলাম।"

আমি বাবাকে ওইসব নিয়ে আর ভাবতে 'না' করে, তাঁকে নিয়ে ডাক্তারখানায় টেস্টগুলো করার জন্য বেরিয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ির কাজের লোক গোপালদাকে সেখানে বসিয়ে রেখে, নিজে অফিসে চলে এসেছিলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

টেলিফোনটা অফিসে এল বিকেলের দিকে। বাড়ির কাছের বুথ থেকে গোপালদা ফোন করেছে। বলল, "দাদাবাবু তুমি শিগ্‌গির এসো, বাবুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে গেছে।" আমার মাথা কাজ করছিল না, হঠাৎ এই খবর পেয়ে। শুধু জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম বাড়ির কাছের সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেছে, মা বাড়িতে গোপালদার সাথে আছে।

পড়িমরি করে অফিস থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে এসে দেখি পাড়ার রতনদা, সঙ্গে কিছু ছেলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে যেতেই বলল, "শামু মন শক্ত কর। মেসোমশাই আর নেই। ভারী কোনো গাড়ি পিছন থেকে ধাক্কা মেরে চলে গেছে। দুপুরে রাস্তায় তেমন লোক ছিল না। স্পটেই মারা গিয়েছেন।"

আমার জীবনটা অন্ধকার হয়ে গেল। বাবা-ই আমাদের সবকিছু ছিলেন। সব কিছু সামলে রাখতেন। আমার আর মার উপর কখনো কোনোরকম আঁচ লাগতে দেননি। বাবা রিটায়ার করার পর বাড়ি, ঘর, বাজার, সবকিছু নিজেই সামলাতেন। বারণ করলে বলতেন, এসব না করলে অথর্ব হয়ে যাব।

আমি অল্প কিছুদিন হল একটা ছোটো প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছি। কলকাতার ডালহৌসিতে। মাইনে খুবই সামান্য। আমরা তিনজন কিন্তু ভালোই ছিলাম। বাবার পেনশন আর আমার আয় নিয়ে ঠিক চলে যাচ্ছিল। প্রয়োজনও কম, খরচাও কম। সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার। রিটায়ার করার পর, দমদম ছেড়ে শহরতলিতে বাবা একটা বাড়ি করেছেন। টাকার জোর না থাকায় আত্মীয়স্বজনের আসা-যাওয়া কম। তাহলেও বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এবং পারলৌকিক কাজের সময় জনাকয়েক আত্মীয়স্বজন এসেছিল। সবাই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়ে গেল, কিন্তু থানায় যাওয়া বা মামলা করার ব্যাপারে কেউ সাথে থাকার বিষয়টা এড়িয়ে গেল। বরঞ্চ পাড়ার রতনদা থানায় এফ. আই. আর. করার সময় আমার সঙ্গে ছিল।

সবকিছু মিটে যাওয়ার পরে, সুস্থির হয়ে চিন্তা করবার মতো মানসিক অবস্থা যখন ফিরে এল, তখন একদিন গোপালদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবা তো ডাক্তারখানায় তোর সাথেই ছিল, তাহলে গাড়িতে যখন ধাক্কা মারল তুই কোথায় ছিলিস?"

"বাবু তো আমাকে আগেই ডাক্তারখানা থেকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। রক্ত নেওয়া, মেশিনে হাত মাপা, বুকে আঠা দিয়ে কীসব মেশিন লাগিয়ে সব পরীক্ষা যখন হয়ে গেল, তখন বাবু আমাকে বাড়ি যেতে বললেন। তাঁর কী কাজ আছে সেখানে যাবেন বললেন।"

"কোথায় যাবে কিছু বলেছিল তোকে?"

"না, আমার সঙ্গে আর কোনো কথা হয়নি।"

চিন্তা-ভাবনা সব এলোমেলো হয়ে গেল। সেদিন সকালে ডাক্তারখানায় বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ ছিলাম, তখনো তো কিছু বলেননি। হঠাৎ করে কী এমন প্রয়োজন পড়ল? যাইহোক, এখন তো আর কোনোভাবেই একথা জানার উপায় নেই। ভাবলাম, কাল ইদের ছুটি আছে, একবার থানায় গিয়ে এনকোয়ারি অফিসারের সাথে কথা বলব।

থানার ইনচার্জ বললেন, "আপনার বাবার কেসটার এনকোয়ারি অফিসার মেজবাবু লিটন মণ্ডল। আপনি তাঁর সাথে কথা বলুন।"

মেজবাবু চেয়ারে বসে কিছু একটা পড়ছিলেন। সামনে যেতে মুখ তুলে, জিজ্ঞাসার দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। বললাম, "আমি একটা এফ. আই. আর. করেছিলাম, আমার বাবার রোড অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে। সেই কারণেই খোঁজ নিতে এলাম।" উনি সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললেন। খুবই সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, "মুখার্জিবাবু, আপনার বাবার ঘটনাটা খুবই দুঃখজনক। কিন্তু কীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হল, কোন ধরনের গাড়ি ধাক্কা মেরেছে সেটাও জানা যাচ্ছে না।

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে পিছন থেকে ভারী কিছুর ধাক্কায় মাথার পিছনে আঘাত লাগাই মৃত্যুর মূল কারণ। এ ছাড়া স্পাইনাল কর্ড টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কোনো সাক্ষী না থাকার কারণে আমাদের তদন্তের অসুবিধা হচ্ছে। গাড়িটা পাওয়া গেলে ইন্সিওরেন্স ক্লেম আপনি পেতে পারতেন।"

আমি বললাম, "বাবার মৃত্যুর ইনসিওরেন্স ক্লেমের জন্য আমি আসিনি। আপনি তো জানেন মৃত্যুর কয়েকদিন আগে বাবা আপনাদের থানায় জানিয়ে দেন, একটা ট্রাকে মেয়ে পাচার হচ্ছিল।

মেজবাবু চমকে গিয়ে বললেন, "এরকম তো কিছু আমার জানা নেই। কোনো লিখিত জবানবন্দিও নেই। কেউ তো এ ব্যাপারে আমার কাছে আসেনি।"

আমি বললাম, "আপনাদের থানায় অফিসার কতজন?"

—"দুজন, আমি আর বড়োবাবু। আর দুজন কনস্টেবল।"

কনস্টেবল দুজনার কাছেও কিছু জানা গেল না। উনি বললেন, "কোথাও বোধহয় ভুল হচ্ছে। যাইহোক আমরা কোর্টে কেস উঠলে আমাদের রিপোর্ট জমা দেব।"

থানা থেকে বেরিয়ে আসার আগে বড়োবাবুর কাছে বাবার থানায় আসার ব্যাপারটা বললাম। উনি বললেন, "আমার কাছে তো এই ব্যাপারে কেউ আসেনি। এটা তো সিরিয়াস ব্যাপার, লিখিত জবানবন্দি নিশ্চয়ই রাখা হত।" উনি 'মেজবাবু'কে ডেকে আমার সামনে সবকিছু জিজ্ঞাসা করলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন এই ঘটনার কোনো সাক্ষী আছে কিনা? আমি না বলাতে, মেজবাবু খুব শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "এরকম কিছু হলে লিখিত জবানবন্দি নেওয়া হত।" আমি বললাম, "বাবা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অফিসার বলেছিলেন পরে দরকার হলে নেব।" দুজন অফিসারই ব্যাপারটা আর গুরুত্ব দিলেন না।

থানার বাইরে এসে একটা বুড়ো রিকশাওয়ালাকে দেখতে পেয়ে তার রিকশায় উঠে বাড়ির দিকে যেতে বললাম। রিকশাওয়ালা সারাক্ষণ বকবক করতে লাগল, "আপনাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আমিও আজ বাড়ি যাব। আজ ইদের দিনে একসাথে খাওয়া-দাওয়া হবে।"

তার পরনের রং উঠে যাওয়া, ছেঁড়া গেঞ্জিটা দেখে বড়ো মায়া হল। জিজ্ঞাসা করলাম, "ইদের দিনে নতুন কাপড় পরোনি?" বলল, বউকে আর ছেলের বউকে শাড়ি কিনে দিয়েছি। আমরা গরিব লোক আর কোথায় পাব বলুন? মেয়েটাকেও কিছু দিতে পারিনি, ওকে দিলে জামাইকেও তো দিতে হবে।"

হঠাৎ কী মনে হল, ভাবলাম ডাক্তারখানায় বাবার রিপোর্টগুলো পড়ে আছে, একবার নিয়েই বাড়ি যাই। বাবা চলে যাবার পরে, কী জানি কেন, বাবার ছোটোখাটো সব জিনিসকে এক জায়গায় গুছিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে। তার ব্যবহার করা জামাকাপড়, দাড়ি কামানোর সেট, জুতো-চপ্পল, সব।

বাড়িতে পৌঁছে রিকশাওয়ালাকে ভাড়ার আরও একশো টাকা বেশি দিয়ে বললাম, "তুমি আজ একটা গেঞ্জি কিনে নিও। তোমার ইদী, আজকে পোরো।" বুড়ো মানুষটার চোখ ছলছল করে উঠল। বলল, "উপরওয়ালা আপনার ভালো করুন।"

হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, "আপনি যে ডাক্তারখানায় গিয়েছিলেন, কিছুদিন আগে এক বুড়ো বাবুকে আমি রিকশায় নিয়ে গেছিলাম। আমাকে দু-টাকা বকশিশ দিয়েছিল। পরে শুনলাম ওই বাবু অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে রাস্তায় মারা যায়। আমি দেখতে গিয়েছিলাম, দেখলাম সেই বাবু।" আমি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাক্তারখানা থেকে কোথায় নামিয়ে দিয়েছিলে?"

সে বলল, "থানায়!"

শেষ অধ্যায়

নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হয় আজকাল। বারবার মনে হয় বাবার মৃত্যু অ্যাক্সিডেন্টে নয়, কিন্তু আমার না আছে সঙ্গী-সাথীর জোর; না আছে পয়সার জোর। বাবার মৃত্যুর প্রায় চারমাস পরে কোর্টে কেসটা উঠল। মেজবাবু কোর্টে বললেন, তদন্ত চলছে, আরও কিছুদিন সময় লাগবে। দু-মাস পরে আবার কোর্টে দিন পড়ল। কিন্তু কোনো কারণে সেদিন শুনানি হল না। এইরকম করে প্রায় একবছর কেটে যাওয়ার পরে, কোর্টে গিয়ে দেখি নতুন পুলিশ অফিসার এসেছেন। তিনি কোর্টে পুলিশ রিপোর্ট জমা দিলেন— কোনো সাক্ষী, সাবুদ এবং গাড়ির সন্ধান না পাওয়ায় মহামান্য কোর্টের কাছে আবেদন করা হচ্ছে এই কেস যেন মুলতুবি করা হয়।

জজসাহেব অনেক ভর্ৎসনা করলেন পুলিশ এই তদন্তে এতটুকু না এগোতে পারার জন্য। নতুন অফিসারকে দায়িত্ব দিলেন পুনরায় তদন্ত শুরু করে রিপোর্ট জমা দেবার জন্য।

কোর্টের বাইরে নতুন পুলিশ অফিসার আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "এই কেস তামাদি হতে বাধ্য। আমার আপনার ওপর সহানুভূতি থাকলেও এতদিন পরে, সাক্ষী-সাবুদ জোগাড় করা অসম্ভব। তাও আমার দিক থেকে চেষ্টা করব।" আমি সব ঘটনা তাঁকে খুলে বললাম। উনি শুনে বললেন, "বড়ো সাহেবকে আমি চিনি অনেকদিন থেকে। ওঁর মতো সৎ পুলিশ অফিসার আমাদের গর্ব। আপনার বাবা মেয়ে পাচারের ঘটনা ওঁকে বললে একটা সুরাহা হতই। আপনি বরং আগের এনকোয়ারি অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। শুনেছি উনি মুর্শিদাবাদের কোনো থানায় জয়েন করেছেন। এর বেশি আমি কিছু বলতে পারব না।"

কী করব, কোথায় যাব, কার কাছে যাব, কিছু বুঝতে পারছিলাম না। কে পাশে দাঁড়াবে? একটু সাহায্য করবে। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম বাবার মৃত্যুর পিছনে এক চক্রান্ত লুকিয়ে আছে এবং আগের পুলিশ অফিসার জেনে-বুঝে মিথ্যা কথা বলছে।

মুর্শিদাবাদ, এখন মুর্শিদাবাদের কোনো এক থানায় পোস্টেড। মুর্শিদাবাদ শুনেই একজনার কথা মনে পড়ল। কিন্তু কত বছর যোগাযোগ নেই। যদি চিনতে না পারে, যদি বলে এতদিন খোঁজ নিসনি, আজ দরকারে এসেছিস। কোথায় আছে তাও তো জানি না, যদি আগের বাড়িতে না থাকে! তবু ঠিক করলাম, যা হয় হবে একবার কপাল ঠুকে চেষ্টা করে দেখি। মেহবুব ঠিক পাশে থাকবে।

ভোর ভোর ট্রেন ধরে সকাল করেই বহরমপুর স্টেশনে নামলাম। সেই আমার পুরোনো চেনা শহর, সেই পুরোনো রাস্তা। তবে ফাঁকা জায়গা আর নেই। দোকানপাটে ভর্তি।

ওদের বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামলাম। সেই পুরোনো দিনের পলেস্তারা খসা, শেওলা ধরা বাইরের দেওয়াল। অনেকদিন কোনো সংস্কার হয়নি, দেখলেই বোঝা যায়। বাইরের দেওয়ালে একটা চটাওঠা সাইনবোর্ড। সাইনবোর্ডের ডানদিকের কোনাটা নেমে এসেছে, পেরেক খুলে গিয়ে। লেখা আছে—

"মেহবুব হোসেন
ইউনানি হেকিম"।

ভেতরে ঢুকে দেখি একটা চৌকির ওপর মোটা ফরাস পাতা। পেছনের দেওয়ালে বড়ো বড়ো আলমারি নতুন-পুরোনো ওষুধের শিশিতে ঠাসা। সামনে একটা ছোটো টেবিল, চারটে চেয়ার, আর বাঁদিকের কোনায় রুগি-পরীক্ষা করার বিছানা। টুলের ওপর একটা গামলা, পাশে সাবান, এক বালতি জল আর মগ, হাত ধোয়ার জন্য।

সমস্ত ঘর খস্ আতরের গন্ধে ম ম করছে। ফরাসের উপরে যে বসে আছে তার পরনে একটা পরিষ্কার নীল-সাদা চেকের লুঙ্গি, সাদা চিকনের পাঞ্জাবি, মাথায় ফেজ টুপি, রোগাটে গড়ন। কাঁচা-পাকা লম্বা দাড়ি। বয়স দেখে মনে হয় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, কিন্তু আমি জানি একটু বুড়োটে গড়ন হলেও ওর বয়স ৩১-৩২।

এই সেই-ই মেহবুব, আমার দোস্ত, আমার ছোটোবেলার সঙ্গী, হামলোগোকা তিন পীড়ীওঁ কা সম্বন্ধ।

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"কৌন হ্যায় আপ? কেয়া চাহতে হ্যায় বোলিয়ে।" বুঝলাম চিনতে পারেনি।

আমি মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারলাম না। দু-হাত বাড়িয়ে ওর হাত দুটো ছুঁলাম। আমার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। ও চমকে উঠে আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে, হাসিমুখে ফিসফিস করে বলল, "শামু...শামু, তু ইতনে দিনো কে বাদ?" আমি বললাম, "পহচানা মুঝে?" ওর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল, বলল—"দুনিয়ামে স্রেফ একহী তো আদমি হ্যায়, মুঝে ছুনে কে বাদ যিসকে আঁখোসে আঁসু ইসতরহা বুঁদ বুঁদ টপক সকতে হ্যায়।"

বালিশের নীচে থেকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রিভলভারটা তুলে নিয়ে আমার দিকে তাক করে বলল, "তোরা এখানেও এসেছিস, এবার মর।"

চৌকির উপরে দাঁড়িয়ে উঠে দু-হাত বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "রৌশনী দেখো কোন আয়া, মেরা জিগর আগায়া, মেরা দোস্ত আগায়া।" টানতে টানতে ভেতরের ঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলল, "চল মা-এর কাছে যাই।" জড়িয়ে ধরে এক বয়স্ক মহিলার ফটোর সামনে দাঁড় করিয়ে দিল।

ঘরে চামেলি আতর-এর গন্ধে ভরে রয়েছে, ফটোর সামনে একটা লম্বা টুলের উপরে চকচকে কাঁসার রেকাবিতে অনেকগুলো তাজা গোলাপ ফুল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মা চলে গেছেন?" ও বলল, "দু-বছর আগে, ঠিক আজকেরই দিনে।" তারপর মার ছবির দিকে তাকিয়ে বলল, "মা কিন্তু বলত, দেখিস শামু ঠিক একদিন আসবে। বেচারা সংসারে আটকে গেছে, ঠিক আসবে ফুরসত হোনে সে হী।"

তারপর মার ছবির দিকে তাকিয়ে বলল—"মা দেখো তুমহারা শামু বেটা আ গায়া। তুমহারা ইদ কা চাঁদ আ গায়া।" আমি রেকাবি থেকে একটা গোলাপ ফুল নিয়ে ফটোতে ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। মনে পড়ে গেল আমার ছোটোবেলায় ওনার স্নেহ-ভালোবাসার কথা।

ওর এক মেয়ে, এক ছেলে। ওর বউ, ছেলে-মেয়ে দেখলাম আমাদের ছোটোবেলার কথা সব জানে। ছেলেটা ছোটো, সারাক্ষণ আমার কোলের কাছে বসে থাকল।

দুপুরে খাওয়ার পরে আর রাতে মেহবুবকে সব ঘটনা বললাম। ও দুঃখ করে বলল,—"এতদিন হয়ে গেছে তুই আজ আমার কাছে বলছিস। কিছু করতে না পারি, তোর পাশে তো গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম।" আমি বললাম, "মাথার ঠিক ছিল না, হঠাৎ করে এই ঘটনার পর। আমার পাশে কেউ নেই, আমার কোনো জোর নেই। তোর কাছে সব বলে একটু তো হালকা হতে পারব।" ও বলল—"তোর জোর নেই, ক্ষমতা নেই, এসব ভাবছিস কেন? তুই না মুর্শিদাবাদের ছেলে? মুর্শিদাবাদের ছেলেরা সহজে লড়াই ছাড়ে না।"

তারপর বলল, "তুই চিন্তা করিস না। ওই পুলিশ অফিসার সম্বন্ধে আমি সব খবর পনেরো দিনের মধ্যে জোগাড় করে ফেলব। কোথায় বাড়ি, এখানে কোথায় পোস্টেড। কেউ যদি কামিনা হয় তাহলে সব জায়গাতেই হবে। আমার মনে হচ্ছে ও যখন মিথ্যা কথা বলেছে, তখন ওর নিশ্চয়ই কোনো স্বার্থ আছে। আমার কাছে সব খবর এসে যাবে। সব জায়গা থেকে আমার কাছে রুগিরা আসে। আমার বাড়ির পাশে টেলিফোন বুথ আছে। তোকে নম্বর দিয়ে দেব, তুই পনেরো দিন পরে ফোন করিস। তোর বাড়ির ঠিকানাও দিয়ে যা, যদি আগে কোনো খবর পাই তোকে জানাব।"

অনেকদিন পর দুজনা সারারাত জেগে আমাদের ছোটোবেলার গল্প করলাম। বাবার মৃত্যু নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম। পরদিন সকাল সকাল ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরে এলাম। এখন সত্যিই মনটা অনেক হালকা লাগছে।

পনেরো দিন অপেক্ষা করতে হল না। দশ দিনের দিন মেহবুব আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। বলল, "আর দেরি করলাম না। দেরি হলে যদি সব হাতের বাইরে চলে যায়। ওই লোকটার কাছে যেকোনো ক্রিমিনাল শিশু। মুর্শিদাবাদের কোন থানায় আছে খবর পেয়েছি। লোকটার বাড়ি জয়নগর-মজিলপুরে। ওখানে ওর ছোটো ছোটো তিনটে ছেলেমেয়ে, বউ আর বাবা-মা থাকে। লোকটা বাংলাদেশ থেকে ইস্কুল ফাইনাল পাশ করে, এদেশে এসে বয়স ভাঁড়িয়ে নীচু ক্লাসে ভর্তি হয়। এখান থেকে পাশ করে চাকরি পায়।

সব কাগজপত্র একদম ঠিকঠাক, কেউ কিছু ধরতে পারবে না। আজ থেকে ১৫-২০ বছর আগে এসব তো ছিল জল-ভাত।

লোকটা মেয়ে পাচার চক্রের সাথে যুক্ত, আরও অনেক অবৈধ কাজ করে। দুশ্চরিত্র, লম্পট। এখানে এসেও নিজের পছন্দমতো সঙ্গী জোগাড় করে নিয়েছে। ধু-ধু ধানখেতের মধ্যে, ধান পাহারা দেবার জন্য একটা ঝুপড়ি আছে। সেখানে এই লোকটা বাজে মেয়েদের নিয়ে রাতে ফুর্তি করে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তুই এতসব খবর জোগাড় করলি কী করে?"

ও বলল, "নিজের গ্রাম থেকে ও একটা গরিব কমবয়সি মেয়েকে নিয়ে আসে। লোক দেখানো বিয়েও একটা করে। ওই মেয়েটা জানে লোকটা টাকা কোথায় লুকিয়ে রাখে। এই মেয়েটা লোকটার চরিত্র জানতে পারার পরে আর ওকে পছন্দ করে না। বুঝতে পেরেছে লোকটা ওকে ঠকাচ্ছে এবং যে-কোনোদিন মেয়েটা বিপদে পড়তে পারে।

লোকটার প্রচুর চর চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও ভালো করেই জানে পুলিশের উপরমহল থেকে কোনোদিন এনকোয়ারি হবেই। আর তখন ওর পক্ষে টাকাপয়সা সরানো কঠিন হবে। ও দু- একদিনের মধ্যে টাকা নিয়ে বাংলাদেশে চলে যাবে।"

মেহবুব বলল, "আর দেরি করাটা আমাদের ঠিক হবে না। তুই আজই চল।" আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমরা এখন কী করব? তুই লোকটাকে মেরে ফেলার কথা ভাবছিস না তো?"

ও বলল, "এক গুনহাগারকে সাজা দিতে আমরা হাত নোংরা করব কেন? তা ছাড়া ওর ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে আছে, তারা তো না খেতে পেয়ে মরে যাবে। সেটা তো আমাদেরও গুনহা হবে।"

ও আরও বলল, "আমাদের ওখানে একটা গ্রামে পিরবাবার একটা পুরোনো দরগা আছে। অনেক আগেকার। এখন যিনি পির তাঁর অনেক বয়েস হয়েছে, উনি বলেন গুনহাগার কি সাজা ঔর এক গুনহা নেহী হো সকতা। উপরওয়ালেকে উপর ছোড় দো। ও সব দেখতা হ্যায়।"

আমি বললাম, "তাহলে কী করবি?" ও বলল, "লোকটাকে ভয় পাওয়াতে হবে। তখনই ও ভুল করবে।" কিছুক্ষণ থেমে মেহবুব বলল, "আমার এক পেশেন্টের ছেলে একজন পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার। ওঁকে পুরো ঘটনাটা বলতে উনি সিভিল ড্রেসে কাল আমাদের বাড়িতে ফোর্স পাঠাবেন। আমরা সন্ধের সময় ও যখন বাড়িতে থাকবে না তখন মেয়েটার কাছ থেকে জেনে নিয়ে টাকাপয়সা পুলিশের হাতে দিয়ে দেব। মেয়েটা যাতে ভয় পেয়ে না পালায় পুলিশ সেটা নিশ্চিত করবে। লোকটাকে গিয়ে পুলিশ ধানের মাঠে ধরবে।"

প্ল্যান মতো পরের দিন সন্ধের সময় মেয়েটার বাড়িতে দুজন পুলিশের সঙ্গে আমরা গেলাম। মেয়েটা বাধা তো দিলই না, উল্টে সহযোগিতা করল এবং পুলিশের কাছে লোকটার আরও সব কিস্‌সা

ফাঁস করে দিল। ঘরভর্তি তাড়া তাড়া নোট। গুনে শেষ করা যাবে না। পুলিশ সব বাজেয়াপ্ত করল।
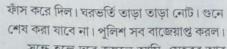
সন্ধে হলে দূরে জঙ্গলে আমি, মেহবুব আর দুজন পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ করতে লাগলাম। সোঁ সোঁ করে হাওয়া বইতে লাগল সঙ্গে ঝিপ ঝিপ করে বৃষ্টি। ভাবলাম তীরে এসে বোধহয় তরী ডুবল। যদি আজ কেউ না আসে?

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটা মেয়েকে নিয়ে দেখলাম একটা লোক ঝুপড়িতে ঢুকল। সময় কেটে যেতে লাগল। ভেতরে একটা হ্যারিকেনের আলো জ্বলে উঠল। কিছু পরে পুলিশ দুজন বলল, "এবার আপনারা গিয়ে চার্জ করুন। আমরা বাইরে আছি, পালাতে পারবে না।"

দূরে একটা বড়ো পাকুড় গাছ মাঠের মধ্যে অন্ধকার আরও গাঢ় করে দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়া আর বৃষ্টির ঝাপটা বেড়ে গেল। মেহবুব হাতে একটা লোহার রড নিয়েছে। ঝুপড়িতে কোনো দরজার পাল্লা নেই। এক ঝটকায় ঘরের ভেতরে ঢুকে মেহবুব লোহার রডটা লোকটার থুতনির নীচে ধরে বলল, "এবার কোথায় পালাবি? ওর বাবা কে তো তুই ট্রাক চাপা দিয়ে দিয়েছিস।" লোকটা প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিল চট করে। বালিশের নীচে থেকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রিভলভারটা তুলে নিয়ে আমার দিকে তাক করে বলল, "তোরা এখানেও এসেছিস, এবার মর।" কিন্তু ততক্ষণে মেহবুবের হাতের লোহার রড লোকটার কবজিতে আঘাত করায় রিভলভারটা ছিটকে খাটের পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার পায়ের কাছে পড়ল। মেয়েটি ইতিমধ্যে শাড়ি জড়িয়ে তার লজ্জা সংবরণ করে নিয়েছে। আমি রিভলভারটা মেয়েটির পায়ের কাছ থেকে তুলে নিলাম। লোকটা আর দেরি না করে খোলা দরজা দিয়ে ওই ঝড়ের মধ্যে পাকুড় গাছটার দিকে প্রাণপণে দৌড়োল। ঘন অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। মাঝে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে, তার আলোতেই তাড়া করা। লোকটা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। বড়ো আপশোশ হচ্ছে, হাতে এসেও বদমাশটা পালিয়ে গেল। লোকটা যখন পাকুড় গাছটার নীচে, হঠাৎ দেখলাম আকাশ থেকে আলো ঝলসে উঠল। কিছুক্ষণ পরে পাকুড় গাছটা আগুন লেগে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। তারপরেই কান ফাটানো বাজ পড়ার আওয়াজ। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা চারজনই থমকে গেছিলাম। একটু দূর থেকে দেখলাম লোকটা পাকুড় গাছটার নীচে পড়ে আছে। দেখেই মনে হয় দেহে প্রাণ নেই। মেহবুব আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, "উপরওয়ালানে সাজা দে দিয়া।"

কুড়ি বছর আগেকার ঘটনা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। সংবিৎ ফিরল গিন্নির ডাকে, "কী গো! রেডি হবে না? ট্রেনের যে সময় হয়ে গেল। আমরা সবাই রেডি হয়ে বসে আছি।" আজ বহরমপুর যাব। কাল ইদ। মেহবুবের বাড়ি নেমন্তন্ন। আর কোনোদিন আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। ❖

গল্প

নতুন আকাশ

শাশ্বতী নন্দী

চিত্র : স্মৃতীশ মণ্ডল
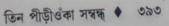
কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনি ঝোলা, কানে ইয়ারফোন। মাথা দোলাতে দোলাতে ডিপার্টমেন্টে ঢুকছে অঙ্কন চক্রবর্তী। হাঁটার ছন্দে ক্যাজুয়াল ভঙ্গি। মুখটাও বেশ হাসি হাসি। ভাবটা এমন যেন সবাই তার কতদিনের চেনা। কিন্তু আজই এই ডিপার্টমেন্টে তার প্রথম দিন।

নিখিল আর কাজল ভাগাভাগি করে একটা খবরের কাগজ পড়ছিল। অঙ্কন ওদের দিকে তাকিয়ে একটু কাশি দিল, 'আচ্ছা ভাই, ম্যাডাম মণিদীপা কোথায় বসেন?'

নিখিল চোখ না সরিয়েই আঙুল তুলে ডানদিক দেখাল, 'ওই দিকে।' কাজলের দৃষ্টি কিন্তু থমকে রইল তার দিকে।

রিভলভিং চেয়ারটা বোঁ করে এক পাক ঘুরিয়ে নিল মণিদীপা। মানে মণিদীপা লাহিড়ি। ডিপার্টমেন্টাল ইনচার্জ। বয়স আঠাশ কি উনত্রিশ। সদ্য এম বি এ পাস আউট। কিন্তু কোম্পানিতে এন্ট্রি নিয়েই একেবারে মগডাল ছুঁই ছুঁই করছে। অঙ্কন চক্রবর্তী সামনে এসে দাঁড়াতেই বলে, 'ইয়েস, কিছু বলবেন?'

—হ্যাঁ মানে...অঙ্কন কথা হাতড়ায়। মণিদীপাকে দেখে সে আড়ষ্ট। যেন জিভে কেউ ফেবিকল চিপকে দিয়েছে।

'হ্যাঁ বলুন?'—মণিদীপা চোখ তুলে প্রশ্ন করে।

উফ্, দৃষ্টি কত ধারালো মেয়েটির, যেন ভেতর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে! অঙ্কন নিজের চোখ নামিয়ে নেয়। ডাকসাইটে সুন্দরী না হলেও তার মধ্যে একটা আলো আলো ভাব আছে।

অঙ্কনকে স্থাণুর মতো দাঁড়াতে দেখে মণিদীপা একটু বিরক্ত, 'আপনি কাকে খুঁজছেন?'

—আপনাকে।—কীভাবে যে মুখ থেকে বেরিয়ে এল কথাটা।

আমাকে?—মণিদীপার চোখ এবার কুঁচকে যাচ্ছে। দু আঙুলের ফাঁকে পেনটা টেবিলে রেখে বলে, 'হ্যাঁ বলুন, কী ব্যাপার?'

অনামিকায় একটা হিরের আংটি। ওই হিরের দ্যুতিতেই ফর্সা ধবধবে সরু আঙুলটা যেন আরো সুন্দর।

অঙ্কন আবার ফিউজড্। কত কথা যে বুড়বুড়ি কেটে গেল ভেতরে ভেতরে কিন্তু জিভের ডগায় আসছে না কেন? এই একটা রোগ তার। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই জড়ভরত দশা। কেন যেন মনে হয় এই তো সে, যাকে ও খুঁজেই যাচ্ছে এই পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত।

এমনিতে অঙ্কন চক্রবর্তী কনফার্মড ব্যাচেলার। তবু কখনো এমন কারোকে দেখলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে ইচ্ছে করে।

'কী ব্যাপার আমার কাছে এসেছেন, একটু বলবেন?' মণিদীপা তার হুঁশ ফেরাতে চায়।

—বলছি।—অঙ্কন ঘাড় নীচু করে তার ঝোলার মধ্যে থাকা ডেপুটেশনের চিঠিটাকে হাতড়াতে থাকে।

মণিদীপা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে কম্পিউটারের মনিটরের দিকে নজর সরাল।

মণিদীপার বয়স কম। কিন্তু ব্যক্তিত্ব সাংঘাতিক। নিজের একটা টিপটপ চেম্বার থাকা সত্ত্বেও ও বেশির ভাগ সময় বাইরে এসে স্টাফদের মাঝখানে বসে কাজ করে।

খানিক ঘাঁটাঘাঁটির পর অঙ্কন তার অফিশিয়াল চিঠিটা এগিয়ে দেয়। লেখা আছে ক্যামাক স্ট্রিট ব্রাঞ্চঅফিস তাকে পারচেজ সুপারভাইজারের প্রোমোশন দিয়ে এখানে ডেপুট করল।

—ওকে ফাইন। আপনি তাহলে এক কাজ করুন। ওই জানলার ধারের সিটটা আপাতত খালি। ওখানে বসুন।

—বেশ, বেশ।—মনটা ফুরফুরে হয়ে উঠল তার। জানলার বাইরে খোলা আকাশ, আলো আর হাওয়া অফুরন্ত। কয়েকটা লাল, নীল ঘুড়ি পতপত উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে।

একটু অবাক লাগল। এরকম অফিস পাড়ার মাথায় কে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে? তার মতোই নির্ভেজাল কোনো খেপা বোধ হয়। কাজ শিকেয় তুলে ছাদে উঠে বিন্দাস...আনন্দে সে ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলে।

সঙ্গে সঙ্গে মণিদীপা নিজের সিট থেকে মাথা নাচাল, 'উঁহু, উঁহু, মিঃ চক্রবর্তী, স্মোকিং জোনটা বাইরে।'

—ওহ্ সরি ম্যাডাম।

—ওকে, ওকে। একটু হাসল মণিদীপা—আজ আপনার প্রথম দিন, তাই ছাড় পেলেন। বাট নেক্সট ডে...

কিন্তু নেক্সট ডে অঙ্কন চক্রবর্তীর আর দেখাই মিলল না। এবং পরপর তিনদিন সে বিনা নোটিশে বেপাত্তা। বাবু এলেন চতুর্থ দিন। মুখ অতিরিক্ত গম্ভীর। নিজের সিটে বসে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে একেবারে ঘাড় গুঁজে দিয়েছে ফাইলের গাদায়। এবং ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে টেবিল পরিষ্কার। একশো ফাইলের মধ্যে নব্বুইটাই ডিজপোজ্‌ড, খালাস। তারপরেই তার মেঘলা মুখে যেন ফুট ফুট রোদ্দুর ফুটে উঠেছে।

মাথা উঁচিয়ে চারিদিক তাকিয়ে ফস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'আজ ঢুকতে না ঢুকতেই চারপাশ থেকে কত চমকানি। সবাই ভেবেছিল ফাইলের স্তূপ দেখে আমি ভিরমি খাব। হু হু বাওয়া, এই অঙ্কন চক্রবর্তী একজন চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ার। একে খেলানোর মতো এত বড়ো মাঠ এখনো তৈরি হয়নি।'

সবাই চাওয়াচাওয়ি করছে। লোকটার লম্বা-চওড়া সাহস আছে তো বড়ো।

ভাগ্যিস মণিদীপার কানে কথাটা যায়নি। ও তখন নিজের চেম্বারে একটা ফোন কলে ব্যস্ত।

দুই

সকলের মুখে এক কথা, মণিদীপা লাহিড়ি নাকি এই কোম্পানির ব্যাকবোন হয়ে উঠেছে। সবেতেই মিস লাহিড়ি। মাঝখানে যে জীর্ণ দশা হয়েছিল কোম্পানির, তাকে কাটিয়ে তুলতে দিনরাত এক করে খাটছে মেয়েটা। সেলস, পারচেজ, মার্কেটিং, সবের দায়িত্বই ওর কাঁধে।

সেদিন মার্কেটিং-এর সুরেশ সমাদ্দার তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ, 'মণিদীপা ম্যাডামকে দেখে শিখতে হয়। ওইটুকু বয়স, কিন্তু মাথাটা, একেবারে সলিড। চোখের দিকে তাকালেই...'—সত্যি! ম্যাডামের চোখ দুটো না...অঙ্কন কথাটা বলেই দেখে পাশে বসা রবিন মুচকি মুচকি হাসছে।

'কী ব্যাপার সুপারভাইজার সাহেব, ম্যাডামের চোখের প্রতি এত ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছেন যে!'

অঙ্কন মোলায়েম করে একটু হাসল শুধু। সদ্য এসেছে এই ডিপার্টমেন্টে। আর একটু সাবধানি হওয়া প্রয়োজন। এই যে ভরি ভরি মুখ ফসকে কথা বেরিয়ে পড়ছে, যে কোনো সময় বিপদ ডাকতে পারে।

হঠাৎ কোনাকুনি তাকিয়ে দেখে কাচ ঘেরা চেম্বারে মণিদীপা লাহিড়ি গভীর মনোযোগে কী একটা পড়ছে। ওফ্, অ্যাংগেলটা দারুণ। ও ঝোলা ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে তাড়াতাড়ি একটা সাদা কাগজ বার করে আনল। তারপর একটা পেন্সিল ঠোঁটের ওপর নাচাতে নাচাতে বিড়বিড় করে, 'ঠিক ওইভাবে আর একটুক্ষণ বসে থাকুন ম্যাডাম, দেখুন কী ফাটাফাটি একটা স্কেচ নামিয়ে দিই আপনার।'

রবিনের চোখ দুটো এমনিতেই ছোটো ছোটো। এখন ওগুলো আরো ছোটো দেখাল। তার হাতে কাগজ-পেন্সিল দেখে বেশ অবাক। 'আপনি একজন আর্টিস্ট নাকি মশাই? আরে হাসছেন কেন, ঝেড়ে কাশুন না মশাই।'

অঙ্কন সত্যি একটু কাশি দিল, 'আর্টিস্ট হতে পেরেছি কিনা জানি না, তবে আঁকতে ভারী ভালোবাসি। পেটের দায়ে চাকরি করতে বেরোনো, বুঝলেন তো। ট্যাঁকের জোর থাকলে সারাদিন রং—তুলি হাতে নিয়ে বসে থাকতাম।'

—বিনয় ছাড়ুন তো মশাই, যারা আঁকে, তারাই আর্টিস্ট, অন্তত আমি তাই মনে করি।—রবিন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে কথা বলতে বলতে। তার সাদা কাগজে কোন রেখাচিত্র ফুটে উঠেছে, দেখার আপ্রাণ চেষ্টা। কিন্তু ম্যাডামের এই ছবি তো দেখানো যাবে না। অঙ্কন কাগজটা মুড়ে ঝোলায় পুরে নিল।

হঠাৎ সেই মেয়েটার কথা মনে পড়ল। তিনদিন আগেও ফোন করেছিল, আগে প্রায়ই করত, এখন কম। হয়তো তার

পাখির কাছ থেকে সমস্ত আকাশটা
কেড়ে নিলে যে পাখিটাই বাঁচবে না।'

মধ্যে নিস্পৃহতা দেখেই। কোনো একটা এক্সিবিশনে তার একটা ছবি দেখে নাকি পাগল। নম্বর জোগাড় করে, প্রায় প্রায়ই ফোন। অঙ্কনের আরো ছবি দেখতে চায়, কিনতে চায়। একদিন দেখা করতে চায়। সেক্টর ফাইভে চাকরি করে, ইঞ্জিনিয়ার মেয়ে। প্রথম প্রথম একটু আগ্রহ দেখিয়েছিল সেও, পরে ইচ্ছেটা মিইয়ে এসেছে। কেন কে জানে!

তিন

পারচেজ ডিপার্টমেন্ট এখন সরগরম। নিত্য নতুন ঘটনা ঘটেই চলেছে সেখানে। অঙ্কন সেই যে নব্বুইখানা ফাইল একসঙ্গে ছেড়েছিল, তা নিয়ে বিস্তর কমপ্লেইন বেরোল ক-দিন পরে। রামেরটা নাকি শ্যামের ঘাড়ে ফেলে দিয়েছে। আবার কোনো কোনো জায়গায় আরো সাংঘাতিক সব কেলো। পারচেজ অর্ডার ফর্মের সাদা জায়গাগুলোতে ছোটো করে এক একটা স্কেচ টানা।

ফাইল সই করতে গিয়ে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল মণিদীপার। এসব কী? সঙ্গে সঙ্গে নিজের চেম্বারে অঙ্কনকে তলব। ও ঢুকতেই ফাইলের পর ফাইল খুলে মুখের সামনে ছড়িয়ে দিতে থাকে। 'আর ইজ ক্রেজি? অফিসের ফাইলে কাটাকুটি খেলেছেন?'

অঙ্কন ফাইলে ঝুঁকে পড়ে দেখছে। মনে মনে একটা হাসি চাপল। এই মেয়ে যত ডিগ্রিধারীই হোক, আঁকাজোকায় গোল্লা। এগুলো থোড়ি কাটাকুটি খেলা? কী সুন্দর একেকটা ছবি!

তবে মুখে কিছু বলল না। ম্যাডাম যেভাবে ফোরফর্টি ভোল্ট হয়ে আছে!

—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, আপনি একজন সুপারভাইজার। কোথায় অন্যের ভুলচুক ধরবেন আর নিজেই...এখন কী হবে বলুন তো?—মণিদীপা ভেঙে দু-টুকরো।—পারচেজ অর্ডারগুলো এভাবে ক্যানসেল হয়ে যাবার মানে বুঝতে পারছেন? গোটা প্রসেসটায় ধস নামল। র' মেটিরিয়াল আর এই মুহূর্তে কেনা যাবে না। তার ফলে ফ্যাক্টরিতে প্রোডাকশনও আপাতত স্টপ। অবস্থাটা একবার আঁচ করুন। এবার আমি ওপরওলাদের কী জবাব দেব?—বলতে বলতে মণিদীপা হাঁপাচ্ছে। ঠোঁটের ওপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

আশ্চর্য! অত তিরস্কারেও অঙ্কনের হেলদোল নেই। তার চোখে মুগ্ধতা। মণিদীপার ঠোঁটের ওপর যেন শিশির ফোঁটা। মিনমিন করে বলল, 'কাগজ আর পেন হবে ম্যাডাম, আপনার কাছে?'

—কেন? আবার ছবি আঁকবেন?—মণিদীপা রাগে ফুঁসছে।

অঙ্কন আমতা আমতা করে বলে, 'না ভাবছিলাম, রাতভর খেটে যদি নতুন করে পারচেজ অর্ডারগুলো জেনারেট করা যায়। একবার চেষ্টা করে দেখব?'

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না মণিদীপা। পিটপিট করে তাকাল কয়েকবার। তারপর গলায় বেশ দোলাচলের মধ্যে বলে, 'পারবেন? তাহলে এই ভরাডুবি...'

—এভাবে বলবেন না ম্যাডাম, অবশ্যই পারব। আর আপনি কিছু অর্ডার করলে, আমি তা করবই। যদি বলেন একছুটে এভারেস্টও ছুঁয়ে আসতে পারি।

—পারডন। কী বলছেন, ঠিক বুঝলাম না।

—বললাম যে পারব ম্যাডাম, পারব। ডান।—অঙ্কন একটা বুড়ো আঙুল তুলে দেখাল।—শুধু দুটো দিন সময় দিন আমাকে। আমার ভুল আমিই শোধরাব।

মেঘলা আকাশ, ঝড়, তুফান, কিছুতেই সহ্য করতে পারে না অঙ্কন। সে রোদের প্রেমিক। কিন্তু সেই সেক্টর-ফাইভের ইঞ্জিনিয়ার, তার নাকি ঝড় খুব প্রিয়। একটা ঝড়ের ছবি চাই, বলে বায়না ধরেছে কবে থেকে। কী জ্বালা!

অঙ্কন বোঝাবার চেষ্টা করে, ঝড় মানেই একটা লণ্ডভণ্ড সময়। এক গরিব চাষির ঘর ভেঙে যাওয়া, চাষি-বউয়ের পরিপাটি সংসারে খড়কুটো বালি হয়ে যাওয়া। কিন্তু মেয়ে অবুঝ। তার আজকাল সন্দেহ হচ্ছে, ওর জীবনে নিশ্চয়ই কোনো ঝড়-ঝঞ্ঝার রাত এসেছে।

আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় চেয়ে নিয়েছিল সে মণিদীপার কাছে, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সে নিখুঁত, নির্ভুল ভাবে পারচেজ অর্ডারগুলো নতুন করে তৈরি করে দিল। মণিদীপার তখন রোদ্দুর ভরা মুখ। 'কী পুরস্কার চান বলুন?'

অঙ্কন গদগদ, 'নাথিং ম্যাডাম, নাথিং। আপনার মুখে আবার সেই মিষ্টি হাসিটা ফিরে এসেছে, এটাই আমার রিওয়ার্ড।'

বলেই মনে মনে জিভ কেটে ফেলল। সেরেছে! আবার লুজ বল খেলল।

হাফ-ইয়ার্লি ক্লোজিংয়ে অভূতপূর্ব ফল করল কোম্পানি। অঙ্কনের এখন ছবি আঁকার শখ-টখ সব মাথায় উঠেছে। রাত-দিন শুধু ফাইলের গাদায় পড়ে আছে। রবিন বলে, 'ইয়ার এন্ডিং আসছে না? প্রোমোশনের জন্য এখন থেকে গুটি সাজাচ্ছে।'

পাশ থেকে অমনি একজন চাপা গলায় বলে, 'ভুল। মণিদীপা এম বি এ করা মেয়ে। ইউজ অ্যান্ড থ্রো-তে বিশ্বাসী। প্রোডাকশনের ধাক্কাটা তুলে নিয়েই ঠিক টাইমে ল্যাং মেরে দেবে।'

চার

বেশ চলছিল কিছুদিন। পারচেজ ডিপার্টমেন্ট আবার খবরের হেডলাইনে। ভরা শ্রাবণে আবার গণ্ডগোল পাকিয়ে ফেলল অঙ্কন। এবার ফাইলের মধ্যে নোট শিট জুড়ে সে এঁকে ফেলেছে তার ড্রিম গার্লের ছবি আর নীচে লিখেছে, "ছোট্ট একটা পাখি, বলল হঠাৎ ডাকি, চল না মোরা ঘর বেঁধে ওই আকাশেতে থাকি।"

মণিদীপা সেদিন অফিসে নেই। একটা কাজ নিয়ে ব্রাঞ্চ ভিজিটে বেরিয়েছে। থাকলে হয়তো ধামাচাপা দিতে পারত ব্যাপারটায়। কিন্তু এমনই কপাল, ফাইলটা সেয়ানার সেয়ানা রবিনের হাতে গিয়ে পড়েছে।

ব্যস্, আর কী। খবরটা ক্রমশ ছড়াচ্ছে। পারচেজ ছাড়িয়ে সেলস্। মণিদীপার অনুপস্থিতিতে ফাইল চলে গেছে ম্যানেজারের ঘরে। সেখান থেকে সোজা চিফ ম্যানেজার।

চারিদিকে হইহই রইরই কাণ্ড। জরুরি মিটিং বসছে দফায় দফায়। কিন্তু অঙ্কন বিন্দাস। বলে, 'আমি শিল্পী মানুষ। মনের মধ্যে একেক সময় একেক রকম ভাবনা-চিন্তা উদয় হয়। হাতের কাছে কাগজ-পেন পেয়েছি। এঁকে ফেলেছি। অবশ্য অফিসিয়াল পেপারে অমন করাটা ঠিক হয়নি। কহি বাত নেহি। অ্যাপোলজি চেয়ে নেব।'

রবিন বলে, 'আস্ত শয়তান। ভাঙবে তবু মচকাবে না। ও আসলে মণিদীপার জন্য ওয়েট করছে। যদি সে এবারও বাঁচিয়ে দেয়।'

বেলা একটা নাগাদ অফিসের সাদা গাড়ি থেকে হন হন করে নেমে এল মণিদীপা লাহিড়ি। একটু বিধ্বস্ত চেহারা। বোঝাই যাচ্ছে সারাদিন ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত। তবে জরুরি তলবেই যে সে তড়িঘড়ি চলে এসেছে এটা বোঝা যাচ্ছে। পারচেজ ডিপার্টমেন্টের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তার দিকে একবার চাইল। চোখে দাউ দাউ আগুন।

রবিন বলে, 'খেলা এবার জমবে।'

অঙ্কন সত্যি এখন চুপসে গেছে। নিজের সিটে বসে একমনে বিড়ি টানছে। সিগেরেটের স্টক বোধহয় শেষ। সকাল থেকে টেনশন।

চারটে নাগাদ সব টেনশনের অবসান। একটা 'শো-কজের' চিঠি ধরানো হল অঙ্কনকে। ও হতভম্ব। চিঠিটা হাতে নিয়ে গুটিগুটি মণিদীপার ঘরের দিকে এগোনোর চেষ্টা করল। কিন্তু বাঁশের থেকে কঞ্চি দড়। পিয়ন দরজা আটকে বলে, 'আপনার ঢোকার পারমিশন নেই।'

চরম অপমানিত হয়ে নিজের সিটে ফিরে এল, অন্যমনস্ক চোখ। হঠাৎ লক্ষ করে আকাশ ভর্তি ছাই ছাই রঙের ঝড়ের মেঘ এলোপাথাড়ি টহল দিচ্ছে। পাখিগুলোও ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘরে ফিরতে চাইছে। যেন আগাম ঝড়ের খবর আছে তাদের কাছে। ও মোবাইল খুলে নম্বর টিপল, ওপাশে সেই সেক্টর ফাইভ।

—তোমার ঝড়ের ছবিটা আঁকা শুরু করেছি, কখনো এসে নিয়ে যেও।

ওপাশ থেকে উচ্ছ্বাস ছিটকে এল, 'তাই! কিন্তু এখন আর ঝড়, বাদলের মেঘের ছবি চাই না। বরং একটা শান্ত নদীর ছবি এঁকে ফেলো প্লিজ। হলে খবর দিও।'

সাতদিন আর অফিসমুখো হল না অঙ্কন। শো-কজের জবাব পাঠিয়ে দিয়ে ঘরেই স্বেচ্ছাবন্দি। চাকরটাকেও ছুটি দিয়ে দিল। একটু নির্জনতা দরকার। ঘরের চারপাশে কাগজ, রং, তুলি ছড়ানো। একের পর এক শান্ত নদীর ছবি আঁকছে।

কিন্তু দিন পনেরো বাদে ডিপার্টমেন্টাল ইনচার্জ মণিদীপা লাহিড়ি একটা ওয়ার্নিং লেটার পাঠাল বাড়িতে। একদিনের মধ্যে অফিস জয়েন না করলে অবিলম্বে টার্মিনেট করা হবে।

পাঁচ

নিজের সিটে উদাস হয়ে বসে আছে আজ অঙ্কন। মুখ-চোখ বসা। রবিন, নিখিল ঠেস দিয়ে অনেক কথা শোনাল। সে নিরুত্তর। চোখে শূন্য দৃষ্টি।

বেলা বারোটায় চিফ ম্যানেজারের খাস পিয়ন সামনে এসে দাঁড়াল, 'অঙ্কন চক্রবর্তী, আপনাকে কনফারেন্স রুমে এক্ষুনি যেতে বলা হয়েছে।'

—আসছি।—যাওয়ার আগে সে এক বোতল জল পুরো গলায় ঢেলে নিল। সকাল থেকেই জিভ শুকনো।

কনফারেন্স রুমে ঢুকতেই দেখে, কোম্পানির সব বড়ো বড়ো মাথা। মাঝখানে মণিদীপা।

এদিকে মিটিং রুমের বাইরে কৌতূহলীদের ভিড়।

এক ঘণ্টা কেটে গেছে। মিটিং তবু ভাঙে না। রবিনের অবস্থা বেশ খারাপ। পা-কোমরে টনটনে ব্যথা। তবু দরজার বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে। ফাইনাল খবরটা না পাওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই।

কনফারেন্স রুমের ভেতরটা যে এত বিশাল আর এত সুন্দর ধারণাই ছিল না অঙ্কনের। দেয়ালে নামী-দামি সব পেইন্টিং। সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা ছবির দিকে দৃষ্টি গেঁথে গেল। বিশাল নীল আকাশ। তার মধ্যে একটা পাখি মন্থর ভাবে ভেসে যাচ্ছে। বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে পাখিটাকে।

মনে একটা খচখচানি শুরু হল। ওই একলা পাখিটাকে কেন যেন বড্ড দুঃখী মনে হচ্ছে। ওর কি সাথী হারিয়েছে মেঘের ভেতর?

ছয়

পাক্কা এক ঘণ্টা কনফারেন্স রুমের ভেতর যেন টরনেডো বয়ে গেল। চিফ ম্যানেজারের চোখ-মুখ হিংস্র। যেন কতদিনের উপোসী পেট। ছিঁড়েই খেয়ে নেবে অঙ্কন চক্রবর্তীকে। একের পর এক অভিযোগ আনছে তার বিরুদ্ধে।

কিন্তু সে স্ট্যাচু। নিজেকে রক্ষার কোনো প্রচেষ্টাই নেই। একদৃষ্টে শুধু একলা পাখিকে দেখে যাচ্ছে।

একনাগাড়ে কথা বলার পর ম্যানেজার সাহেব বোধহয় একটু দম নিতে থামলেন। মণিদীপা সেই সুযোগে গলা ঝেড়ে বলে উঠল, 'এক্সকিউজ মি স্যার। মিঃ চক্রবর্তীর ব্যাপারে আমার একটা প্রপোজাল আছে। প্লেস করতে পারি?'

—বলো। আই অ্যাম ফেড আপ উইথ দিস ম্যান।—ভদ্রলোক দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে বলেন।

অঙ্কন আস্তে আস্তে মাথা তুলল। ওই একলা পাখিটাকে কিছুতেই আর একলা নিঃসঙ্গ দেখতে ইচ্ছে করছে না। হাতে রং-তুলি থাকলে ওর একটা জুটি এঁকে দেওয়া যেত এক্ষুনি।

মণিদীপা বলতে শুরু করে, 'স্যার, মিঃ চক্রবর্তী যা করেছেন তাতে তাঁর নেগলিজেন্স অফ ডিউটি অর্থাৎ কর্তব্যকর্মে অবহেলার পরিচয় মেলে। কিন্তু আমার মনে হয় কাজটা করে উনি নিজেও খুব অনুতপ্ত। এবারের মতো কি ওঁকে এক্সকিউজ করে দেওয়া যায়? আর একটা কথা, যেহেতু উনি একজন শিল্পী মানুষ, ওঁকে এই পারচেজ অর্ডার, চালান, ইনভয়েজের জঞ্জালে না ফেলে রেখে আমাদের ডিজাইনিং সেকশনে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। যদিও সেখানে ইনস্ট্রুমেন্ট ডিজাইনিং-এর কাজই বেশি, স্টিল তাঁর হাতে কাগজ আর পেন্সিলটা তো থাকবে।'

চিফ ম্যানেজার হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'যা ভালো বোঝো, করো। আমার একটা আর্জেন্ট কাজ আছে, উঠছি। তবে অ্যাপোলজি চেয়ে ওকে কিন্তু একটা লিখিত দিতে হবে আজই।'

ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। মিটিং ভাঙল আরও আধঘণ্টা পর। রবিন কৌতূহল মনে চেপে বাড়ি চলে গেছে। কতক্ষণ আর কোমর বাঁকিয়ে দাঁড়ানো যায়।

অঙ্কন নিজের সিটে এসে জিনিসপত্তর গোছাচ্ছে। কাল থেকে আর এই অফিসে হাজিরা দিতে হবে না। ডিজাইন সেকশন মানে আবার ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন। পুরোনো ক্যামাক স্ট্রিট ব্রাঞ্চ।

অনেকক্ষণ থম মেরে বসে থাকল সে চেয়ারে। উঠতে ইচ্ছে করছে না। এই ঘরটার প্রতি বড্ড মায়া। এখান থেকে আকাশের রং বদল দেখা যেত, কত রঙের মেঘ। বৃষ্টি ঝরা দুপুর, কালবৈশাখীর বিকেল। আকাশ যেন বড্ড কাছে কাছে ছিল। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। কাল থেকে আবার অনেকখানি দূরে।

হঠাৎ করেই কাচের ঘরের দিকে নজর গেল। মণিদীপাকে আজ দারুণ দেখাচ্ছে। সবুজ শাড়িতে ঠিক যেন একটা সবুজ টিয়া। ঠোঁটটাও টিয়ার মতো লাল। অপূর্ব! ভারী সুন্দর তুমি মণিদীপা! তারপরেই চোখ সরিয়ে নিল। না, আর তাকাবে না। আকাশ যে এখন অনেক দূরে।

হঠাৎ মণিদীপা নিজের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসে, 'মিঃ চক্রবর্তী, যাওয়ার আগে একবার শুনে যাবেন তো।'

ঝোলাটা কাঁধে ফেলে উঠে দাঁড়াল সে, 'হ্যাঁ আসছি।' তারপর খুব শ্লথ ভঙ্গিতে ওর ঘরের দিকে হেঁটে যায়। মণিদীপাকে কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার। ভাবনাটা আগেই মাথায় এসেছিল। কিন্তু নিজের ওপর যে আস্থা হারিয়ে গেছে। যদি আবার সে কোনো বেহিসেবিপনা করে বসে।

ওর ঘরে ঢুকে দু-হাত জোড়া করে অঙ্কন, 'কীভাবে যে আপনার ঋণ মেটাব, ম্যাডাম। আমার চাকরিটা বাঁচিয়ে দিলেন।'

মোবাইল স্ক্রিনের দিকে চোখ রেখে একমনে কী যেন দেখে যাচ্ছিল মণিদীপা। সেই ভঙ্গিতেই বলল, 'না বাঁচিয়ে কী করব? পাখির কাছ থেকে সমস্ত আকাশটা কেড়ে নিলে যে পাখিটাই বাঁচবে না।'

অঙ্কন চমকে ওর দিকে তাকাল। কী আশ্চর্য! মণিদীপার মুখেও পাখি আর আকাশের কথা!

স্ক্রিন থেকে চোখ তুলে মণিদীপা হাসছে, 'তাহলে কাল থেকে ডিজাইনিংয়ে চলে যাচ্ছেন, তাই তো? ওখানে মন দিয়ে যেন কাজকর্ম করা হয়, কেমন? আরে, অমন মুখ ঝুলিয়ে বসে আছেন কেন? কাগজ, পেন্সিল, আকাশ, উড়ন্ত পাখি, সবই তো রইল আপনার সঙ্গে।'

—কিন্তু ওই একলা পাখি?—আলগোছে বেরিয়ে এল অঙ্কনের মুখ দিয়ে।—অত বড়ো আকাশটায় কেমন নিঃসঙ্গ হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে যে।

—কোথায় একলা?—মণিদীপার চোখ দুটো চিকচিক করে ওঠে।—কখন সে জুটি বেঁধে ফেলেছে। এই আপনার শিল্পীর চোখ? একবার ভালো করে তাকান তো আকাশের দিকে। দেখতে পাবেন মহা আনন্দে দুটো পাখি আকাশময় চক্কর দিচ্ছে। এই জুটি কোনোদিন ভাঙবে না।—মণিদীপা চোখে পলক না ফেলে বলে যাচ্ছে।—যান, খুশি মনে বাড়ি যান। এখন আপনার জীবনে নতুন আকাশ।❖

গল্প

হ্যাঁ অনিমেষরা মাঝখানে

কল্যাণ মৈত্র

ছবি : নচিকেতা মাহাত

সেদিন খুব সকালে এল লোকটা। পুরোনো, অতি-ব্যবহৃত মোটর-সাইকেলটা হলুদ-ফুলের গাছটার ছাওয়ার নীচে দাঁড় করিয়ে, পাশের বাড়ির ধাপটার ওপর গিয়ে বসে পড়ল। সেখানেও সে ছায়া খুঁজে নিয়ে বসেছে। একটু যেন ক্লান্ত। হাঁপাচ্ছে, তবু একটা সিগারেট ধরাল। নাক দিয়ে একরাশ ধোঁয়া বার করে বিরক্তির সঙ্গে মোবাইল-ফোনের টাচ-স্ক্রিনের ওপর আঙুল চালাল। তারপর কী একটা দেখে নিয়ে মোবাইলটা কানে চড়াল।

লোকটাকে চোয়াড়ে দেখতে, বয়স হয়তো বেশি নয়, চল্লিশের ধারে-কাছেই হবে। তবে এরই মধ্যে বুড়োটে দেখতে। কপালের ওপর বলিরেখা স্পষ্ট। চোখ দুটোতে শ্যেন দৃষ্টি। গায়ের চামড়ায় পাকাটে ভাব। আজ লোকটা একটা নীল রঙের পাঞ্জাবি আর চোঙা জিনসের প্যান্ট পরেছে। বুক-পকেটে রোদ-চশমা ঝুলছে।

এই লোকটাকে অনিমেষ এই নিয়ে পর পর বেশ কয়েক দিন ধরে দেখছে। আগে আরেকটি লোক আসত, সাইকেলে। সকাল সাড়ে সাতটা-আটটা বাজলেই আর মোটরবাইকের একটা চড়া আওয়াজ পেলেই অনিমেষ বুঝে নিত—এ সেই লোক। বাইক থেকে নেমেই লোকটা পায়চারি করবে। অস্বস্তি প্রকাশ করবে, যেন কোনো অপেক্ষা তার সহ্য হয় না। এরই সঙ্গে সে বেশ কিছু ফোন করবে, একের পর এক। দু-একদিন সে দুপুরেরর দিকেও এসেছে। আজ সে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়িটার ধাপে বসেছে।

সন্দেহের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে অনিমেষ লোকটাকে দেখছিল, সামনে থেকে নয়, জানলার ফাঁক দিয়ে, গোপনে এবং আড়ালে। উত্তর দিকে পাশের দোতলা বাড়িটা বিক্রি হবে, এই বাড়িটার দিকেই লোকটার নজর, তার আসা-যাওয়া? সে এসেই ওদিকের দোতলা বাড়িটার ডোরবেল বাজাবে। তারপর হয় লম্বা টানে ওপরের দিকে তাকিয়ে ববি-দা ববি-দা বলে ডাকবে, নয়তো তার স্ত্রীকে। তাদের কেউ নীচে নেমে এসে চাবিটা দেবে। বাড়ির মালিক তাদের কাছেই চাবিটা রেখে গেছে। দালালদের সামলানোর দায়িত্ব এখন ববিবাবুদেরই। ইতিমধ্যে দু-চার জন মহিলা-পুরুষ সেখানে হাজির হবে। তারা বাড়িটার চার-ধার ঘুরে ফিরে দেখবে। তারপর বাড়িটার ভেতরে যাবে। নীচু স্বরে কথাবার্তা হবে তাদের। বাড়ির পিছনে চারকাঠা খালি জমি পড়ে আছে। সেখানে এক-পা ঘাস, আগাছা খুব সবুজ। একটা আমগাছ বড়ো হচ্ছে। জমিটা ঘেরা। লোকটি বলবে, অনিমেষ শুনেছে, 'ওটা ফাঁকা পড়ে আছে। জমিটা নিয়ে লাফড়া আছে, যতদিন থাকে ততদিনই আপনাদের লাভ। পূর্ব দিক খোলা। পশ্চিম দিকে বাড়ি হবার চান্স নেই, রাস্তা। দখিনের হাওয়া...ওই বাড়িটা যত-দিন-না কিছু হয় তত দিনই লাভ...।' হ্যাঁ, অনিমেষরা মাঝখানে। সেই কারণে চাপ বেশি, দুশ্চিন্তাও। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকেও শহরের কাটমানি-খ্যাত দাদারা, দুর্বাদলের নবজাগরিত ভাইয়েরা, চৌত্রিশ-বছরের ঐতিহাসিক পরিবারের আন্ডারগ্রাউন্ড লিডারদের 'এখন-ঘুমন্ত' চেলারা কয়েকজন ইতিমধ্যেই উপদেশ দিয়েছে, 'আর কী হবে, চিরকাল কি থাকবে সব? সবই তো

ফেলে যেতে হবে, আমার-তোমার বলে তো কিছুই হয় না ...চিতাতেই সব শেষ!! তবে কেন এত আমার আমার কর? দিয়ে দাও, চার কাঠার মামলা। বাড়ি পুরোনো হয়েছে। তুমিই-বা আর কতকাল বাঁচবে? ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ ওরা নিজেরা বুঝে নেবে। টাকা নিয়ে নাও। সেল ইট! যে-কটা দিন আর আছ সুখে থাকো।' বাপ রে! এ যে শ্রীম-র বাণী! মাটিই টাকা। হায় শ্রীরামকৃষ্ণ! কী মনে করে যে বলেছিলে ঠাকুর আর এরা কী করে ছাড়ল! সব ভাঙবে, সব নতুন হয়ে যাবে। প্রতিনিয়ত পৃথিবীর দৃশ্য পালটে যায় যেন! স্মৃতির কিছুই আর থাকবে না। আলোনিশায় অবুঝের এক খেয়ালি রঙের খেলা। হ্যাঁ, অনিমেষরা মাঝখানে। সে জানে, আজ-না-হয়-কাল চারধার থেকে কতগুলো ইটের দেওয়াল পর পর মাথায় মাথায় বসে বাতাস আটকে সামনের আকাশটাকে ঢাকতে ঢাকতে তাদেরকেও ঢেকে ফেলবে, দিনের বেলাতেই একটা কৃত্রিম অন্ধকারে অনিমেষরা ঢুকে যাবে। সে দিন সে না-থাকতেও পারে, ঠিকই, তবে যারা থাকবে তারা একটু আলো-বাতাসের জন্য ছটফট করবে। জলের জন্য, অক্সিজেনের জন্য লাফালাফি করবে। করবেই। জলের মতো অক্সিজেন পাউচে বিক্রি হবে, কোনো ঘরে আগুন লাগলে নেভানো যাবে না। গাড়ি ঢুকবে না। পথ নেই। কোথাও আর শুধু কি দাউ দাউ ধোঁয়ার আগুন? ঘরে তো কত রকমের আগুন লাগে। মানুষ আজকাল কত রকমের আগুন নিয়ে বেঁচে থাকে। নিঃসঙ্গতাও একটা মৃদু আগুন—মানুষ তাতে পোড়ে বইকী! কেউ যে কারোর নয় সে কথা কি নতুন করে আজকাল আর কাউকে বোঝাতে হয়? যত পথ তত মত, তত ভিন্নতা। এক আর এককের গল্প। কোথাও যেন মিলের কথা নেই, মিলনের টান নেই। কিন্তু অনিমেষ নিজে কেন, ছেলেমেয়ের জন্যও কোনো ভাবী বা আসন্ন অন্ধকারকে রেখে যেতে চায় না। এ জন্য সে নিজের সঙ্গে লড়াই করছে, প্রলোভনকে জয় করার, মনেরও নয় আপেক্ষিক সুখকে তুচ্ছ করার চেষ্টা করছে। এমনকী স্ত্রী ইন্দুর 'এখানে পড়ে থেকে কী হবে? তার চেয়ে চল কলকাতায় কোথাও একটা নতুন ঠিকানা'-র সন্ধানে যাওয়ার অকাট্য যুক্তিকেও সে পায়ে মাড়িয়ে দিয়েছে। সত্যি এখানে কিছু নেই! নতুন ঠিকানাতেই বা কী আছে? সবখানেই যে বিচ্ছিন্নতা! আচ্ছা এটা কি শুধু অনিমেষেরই মনের কথা? অবসাদ প্রসূত? বিষাদ-বিলাস? অনিমেষ কি অতীত-বিলাসী? শ্যাওলা-ধরা সময়ের নাগরিক? বয়স তো তা বলে না? এখন সে পঞ্চাশ। তাই বা হয় কী করে? শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চাশেতে চলে গেছেন, ঋত্বিক ঘটক? অথচ তাঁদের অমন বুড়ো দেখতে হয়ে গেল? রামকৃষ্ণ না হয় রোগ-ভোগে, ঋত্বিক মদ্যপানে? উত্তমকুমার? যৌবনে শ্রীরামকৃষ্ণ রূপবান ছিলেন। সবসময় এক ডজন ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে ঘুরেও মাইকেল জ্যাকসন পঞ্চাশ পেরিয়েছিলেন মাত্র। অনিমেষ কোনো অঙ্ক মেলাতে পারে না। এখনই সে মৃত্যুকে ভয় পায়? ভীষণ ভয় করে তার! মনে হয় সব সময় তার পাশে একটা হাসি হাসি মুখের মৃত্যু-ছায়া হাঁটছে। হেঁটে চলেছে। তাকে পরখ করছে। ছায়া কখনো বড়ো হচ্ছে, কখনো ছোটো। জীবন তার সঙ্গে ছলনা করেছে। জীবন তাকে বুঝতে দেয়নি যে দীর্ঘ সময়ের জন্য সে সঙ্গে থাকবে না। কামনা, বাসনা, মায়া, প্রেম, প্রণয়, যৌনদাসত্ব,স্বার্থচিন্তা-আত্ম-অহংকার তাকে একটা জীবন ঘোরের মধ্যে বিবশ করে রেখেছিল। হয়তো এটাই জীবন! এমনই জীবন! কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে এই জীবনে বাঁচতে চাওয়ার ফিলোজফিতে সে আগে বিশ্বাস করত, এখন করে না। এখন অসম্ভব মনে হয়। বেঁচে থাকাই যেখানে কষ্টকর, যেখানে বাঁচতে গেলে প্রতি পদে ডারউইনের থিয়োরিকে প্রমাণ করতে হয়—সংগ্রাম, প্রতিযোগিতা, লড়াইয়ে যোগ্যতম তবে তার উদ্বর্তন, সেখানে মাঝে মাঝে ঈশ্বরের কোনো অতি-জাগতিক ভাবনাও অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। ভূতের অস্তিত্বের মতো সংশয় জাগে ঈশ্বর আছে কি নেই। আজ বড়ো প্রশ্ন জাগে শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন কাশীপুর উদ্যানবাটীতে মরতে হল—দক্ষিণেশ্বরে নয় কেন? ক্যানসার হওয়ার পর কেন তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে রাখাই হল না? কেন সারদা মাকে স্বামীর মৃত্যুর পর দক্ষিণেশ্বরে নয়, অন্যত্র বাসাভাড়া করে থাকতে হল? অথচ সারদামণিকে তাঁর জীবনের অনেকটা সময় দক্ষিণেশ্বরে একটা অতি ছোট্ট ঘরে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের তীব্র গরমে কাটাতে হয়েছে। তিনি প্রথমে তো দেবী তারপর মানবী, তাই না! অনিমেষ এই সব ভেবে-দেখেই বুঝে নিয়েছে যে, নিজের বলে কিছুই হয় না। অবতারেরই যদি এই হয়, তাহলে মানুষ কোন ছাড়! মানুষের কোনো বাড়ি নেই সে শুধু থাকে কোথাও। তারপর সে এক সময় ছবি হয়ে যায়। মৃত্যু শাশ্বত, মৃত্যু নিশ্চিত। ডেস্টিনি! ঘুমের মধ্যে মৃত্যু অনিমেষের খুবই পছন্দের। তার কোনো কোনো বন্ধু ঘুমের মধ্যে হার্ট-অ্যাটাকে মারা গেছে। তবে ওই একটিই ব্যাপার—মৃত্যু ভগবানের মতো, চাইলেই পাওয়া যায় না। আসলে প্রশ্ন এটাই, কী এই জীবন? জীবন বোধহয় কোথাও নেই, মৃত্যু আসে যায়, আসে যায়—মাঝের সময়টুকু জীবন বলে কিছু একটা! সেই—খাঁচার ভিতর অচিনপাখি, ক্যামনে আসে যায়! অনিমেষ মনে করে একটা বাড়িরও মৃত্যু হয়। একটা বাড়িকে জোর করে মেরে ফেলা যায়। একটা বাড়িকে মাটি করে দেওয়া হলে তা টাকা হয়ে যায়। একটা বাড়ি খরচ হয়। একটা বাড়ি টাকা হয়ে ব্যাংকে থাকতে পারে আর তার মালিকের নিরাপত্তা দিতে পারে। ভাগ হয়ে টুকরো টুকরো হয়েও যায়।

২

লোকটা এখনও ফোন করছে। তার ক্লায়েন্ট এসে পৌঁছায়নি। এবার সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে। অনিমেষ স্পষ্ট তার কথা শুনতে পাচ্ছে। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে অনেক কথাই ভাবছিল।

প্রশ্নটা বাড়িটা থাকা-না-থাকা নিয়ে নয়, প্রশ্নটা তার অতীত-অস্তিত্ব আর ভবিষ্যতের ভিত্তি নিয়ে। বাড়িটার স্মৃতি, আত্ম-সংস্কৃতি নিয়ে। চলে-যাওয়া মানুষগুলোর রেখে যাওয়া সচল অদৃশ্য

ছায়াগুলো নিয়ে। অনিমেষ পৈতৃক এই বাড়িটা কিছুতেই ছাড়তে চায় না। মনে মনে একবারের জন্য ভাবতেও পারে না। বন্ধুরা, যারা আর্থিক টানা-পোড়েনে পারেনি রক্ষা করতে, আর যারা নিজের বসতবাটি বেচে দিয়ে নিজেরই পাড়ায় একটা রেসিডেন্সি নামক সাততলা আধুনিক মাটিতে নয় আকাশ-পাড়ায় বাস করে, কোন্দল করে যারা নিজেদের ভাগ করেছে, ইগোর লড়াই আদালত পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে, বঞ্চিতদের ক্ষোভ হাহুতাশ আর লাভবান সাবধানি শরিকদের হর্ষ—যারা আমাকে আমার মতো থাকতে দাও বলেছে, বা গুছিয়ে নিতে চায় তাদের কথা আলাদা। কোনো ব্যর্থতা, কোনো অসহায়তা মানুষকে কোনো কিছুতে বাধ্য করতে পারে। যতই রোজগার হোক, আজকের দিনে সাদা টাকায় জীর্ণ চল্লিশ ইঞ্চির দেওয়ালের বাড়ি রক্ষা করাও কঠিন। অনিমেষের সে-রকম কোনো চাপ নেই। সে শুধু কষ্ট পাবে। মনে মনে সে বেশ কল্পনা করতে পারে—হাতুরি পেটার শব্দ, ভেঙে পড়ার শব্দ, ধুলো-বালি-ইট, মরচে-পড়া-লোহার রড, দরজা জানলা, কড়িকাঠ, রাবিশ, জলকাদা, ভ্যান-রিকশা এবং প্রচুর লোকজন। পাশের বাড়িটার কী হবে? কীভাবে তার মৃত্যু হবে?

অনিমেষ ফিরহাদকে জিজ্ঞেস করেছিল। ফিরহাদ তার স্কুলের বন্ধু। এই শহরের বড়ো প্রোমোটার। নিজের নামে-বেনামে পনেরো-কুড়িটা ফ্ল্যাট, অটো, দোকান, নার্সিংহোমে টাকা খাটছে, রেস্তোরাঁ— আর কী চাই। কামিনী-কাঞ্চন মহাভোগ! সবটাই অবশ্য অ-দল এবং ব-দলের পর। রাজনীতির মহিমা!

ফিরহাদ বলেছিল, পার্টি খুব ঘোড়েল। বাপটা মারা গেছে, মা-মেয়ে এসেছিল, দেড় কোটি দাম হেঁকেছে। ছ-সাত কাঠা জমি। দু-দিক লক্‌ড। বাড়ির কি কোনো দাম আছে নন্তু?

অনিমেষ অবাক হয়ে গেল, তার নন্তু ডাকনামটা এখনও ফিরহাদের মনে আছে। সে আবার বলল, বাড়ির কোনো দাম নেই। ভেঙে লেবার কস্টও ওঠে না। যা দাম জমির। মা টাকা চাইছে, মেয়ে আলাদা টাকা চাইছে। দশ লাখ অগ্রিম দেওয়া আছে। পাশের জমিটা পেলে, ওদিকে রাখালদের বাড়িটা পড়ে আছে। সব মিলিয়ে কুড়ি কাঠা তো হবেই, কী বলিস রে? তোরা দিলে আমি একটা কমপ্লেক্স তৈরি করতে পারতাম। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে। পাশের জমিটার জন্য আটকে আছে। ওটার এখন মালিক কে জানিস?

অনিমেষ ফিরহাদের গায়ের কাছে গিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, কবে শুরু হবে ভাঙাভাঙি? কত তলা হবে? ছয়?

ফিরহাদ এমন প্রশ্নে বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, কেন বল তো? এখনই কিছু হচ্ছে না। পাশের জমিটা চাই, অ্যাট এনি কস্ট। আরেকটা বাড়ি আছে, খালের ধারে, সেটা নিতে পারলে স্টেশনের দিকটা খুলে যাবে। তখন এটা একটা প্রোজেক্ট হবে। বুঝলি। টাইম লাগবে। একটু খোঁজ লাগা তো পিছনের জমিটা কার?

অনিমেষ বলল, টর্চ-দারোগার ভাইঝির।

মানে?

ওই যে তারকেশ্বর থেকে বদলি হয়ে এখানে এসেছিল। এনকাউন্টার করে ফেঁসে গিয়েছিল। পার্টির লোক মেরেছিল। একসময় তেলেনিপাড়ার ত্রাস ছিল রে। কলাবাগানের সেই গণ-ধর্ষণ কেস।

অনিমেষ বেশ মনে করতে পারে, ওই ছাদের চিলেকোঠার কোণে দাঁড়িয়ে মানালি তাকে কত আদর করেছিল একদিন।

ফিরহাদ একটু চুপ করে গেল। অনিমেষ বুঝতে পারল প্রসঙ্গটা তার এইভাবে তোলাই উচিত হয়নি। ওই ঘটনার পর ফিরহাদ বেশ কয়েক বছর নিরুদ্দেশ ছিল। পরে জানা গেল বা রটানো হল সে বোম্বে গিয়েছিল ভিলেন হতে।

টর্চ-দারেগা কবেই মারা গেছে। রাতের বেলা হাইভোল্টেজ টর্চ নিয়ে সার্চ করা তার অভ্যাস ছিল।

৩

ইন্দু অনিমেষকে বলল, তাহলে তুমি সব খোঁজ-খবর দিলে। পাশের জমিটা খালি আছে সেটাও মনে করিয়ে দিয়ে এলে। বাহ্, বাহ্...এই না হলে অধ্যাপক? এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি লেকচার দাও! ছিঃ! যতদিন ওটা না পাবে ততদিনই তুমি মুক্ত থাকতে। এত গোলমাল করার কী দরকার ছিল জানি না বাবা!

—পাশের বাড়িটায় তো রোজ লোক আসছে।

—আসুক। তাতে তোমার কী? নিলে তুমি আটকাতে পারবে? তোমার কী মুরোদ আছে? তুমি তো আর ফিলোজফি ডিপার্টমেন্টের অরিন্দম ঘোষালের মতো নেতা নও যে তোমার কথা শুনবে লোকে, বিশ্বাস করবে। কত করে বললাম পাশের বাড়ির লোকটাকে বলে চাপ গিয়ে আমগাছটা কাটাও। পারলে না। মেয়র দেখালে। যেদিন ঝড়ে গাছটা ভেঙে পড়বে আমার বাড়ির উপর সেদিন বুঝবে। কিস্যু কাজের নয়। শুধু বউয়ের কাছে হম্বিতম্বি। ওয়ার্থলেস!

অনিমেষ আজ চুপ করে থাকল। কোনো প্রতিবাদ করল না। সে ওয়ার্থলেস। আমগাছটা যতই বিপজ্জনক হোক না কেন, গাছটার দারুণ স্বাস্থ্য, গাঢ় সবুজ পাতা। দোতলার ছাদ ছাড়িয়ে ডালপালা মেলেছে। ঠিক ঋতুমতী কিশোরীর মতো। একটা যৌন আবেদন আছে। জীবনের হাতছানি আছে গাছটার ভিতর। গাছটা তাদেরও ছায়া দেয়, আমগাছটা তাদের নারকেল গাছের পাশে যেন বন্ধুটি। গাছের আমটাও বড়ো মিষ্টি। দু-একবার কথা বলার চেষ্টা যে করেনি তা নয়। তবে কাজ হয়নি।

ইন্দু যে ঠিক কী বলতে চায় অনিমেষ তা অনেক সময় বুঝতে পারে না। একবার বলে, চলো কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট কিনি। হাসপাতাল কাছে হবে। আবার বলে, শ্বশুরের ভিটে। উনিশ বছরে ঢুকেছিলাম। যাব তো একবারে যাব। তারপর আবার বলে, গাছ কাটাও। ছাদের ঘরটা কর। একটু হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচি। একটাই তো জীবন। এ জীবন তো আর আসবে না। অনিমেষ ভাবে একটাই তো মৃত্যু, বারবার তো আসবে না । পরের জীবন বা মৃত্যুকে কে চিনবে? তার চেয়ে একটু 'বেঁধে বেঁধে' থাকলে ক্ষতি কী!

জানলার ফাঁক থেকেই অনিমেষ আবার দেখল। লোকটা অপেক্ষা করছে, তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। একটু ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল কর্নিশের পলেস্তরা ভেঙে পড়ছে, লোহার কাঠামো দেখা যাচ্ছে। সারা বাড়িটা আগাছায় ভরা। সেই সব আগাছায় বসন্তে ফুলও হয়। তুলসীমঞ্চতে তুলসী নেই। টবগুলোয় আগে যেখানে গোলাপ, ডালিয়া, গাঁদা ফুটত, সেগুলো অহংকারের আগুনে পুড়ে গেছে। গত ঝড়ে জানালার কাচটা ভেঙে গিয়েছিল সেটা দিয়ে বাদুড় ঢোকে। বেজিরা আসে যায়। ইঁদুর বাসা করেছে। একটা ভূতের বাড়ি যেন! অথচ বাড়িটার কাঠামো ভীষণ মজবুত। এই বাড়ি নিয়ে রাম চ্যাটার্জির কত অহংকার ছিল। রংয়ের কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলেন। বাড়িতে রাতবিরেতে পানাহারের আসর বসত। বিদেশি মিউজিক। রাস্তায় গাড়ি দাঁড়াত কত!

অনিমেষ বেশ মনে করতে পারে, ওই ছাদের চিলেকোঠার কোণে দাঁড়িয়ে মানালি তাকে কত আদর করেছিল একদিন। চুমু খেয়েছিল। বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার মাথাটাকে সাবানের মতো করে ঘষেছিল। নন্তুদা, আমাকে তোমার করে নাও, প্লিজ। আমাকে কেউ ভালোবাসেনি কোনো দিন...আমার হাতটা টেনে নিয়ে ও ওর তলপেটে নামিয়ে আনল। আর ঠিক তখনই ডোরবেলটা বেজে উঠল। মিসেস চ্যাটার্জি ফিরেছেন। মানালি আমাকে আর চিনতে পারল না। বলল, ঝাঁপ মারো এখান থেকে ছোটোছাদে, তারপর কাঁঠালগাছটা দিয়ে নেমে যাও। এটা তার একটা মুহূর্তের হয়তো কোনো খেয়াল ছিল। সেই গাছটা অবশ্য নেই।

অনিমেষের মনে পড়ে কোথায় দাঁড়িয়ে তার মা, মিসেস চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলতেন। ওই তো দোতলার জানলায় জানলায়। কোথায় বসে মিসেস চ্যাটার্জি শরৎচন্দ্র পড়তেন—ওই তো ভাঙা খাটের একটা পায়া জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা অনিমেষ ওটা কী করে চিনল? ওই খাটে একদিন বৃষ্টিদুপুরে মানালি তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে ছিল।

অনিমেষ শুনল, লোকটা বলছে—আজও আপনি আসছেন না? মুম্বাইতে? কবে ফিরছেন? পার্টি যে রেডি? হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়ি-জমি দেখে গেছে গত রবিবার। সেই জন্যই তো টাইম চাইলাম। ও সব আমরা ম্যানেজ করে নেব। ফিরহাদ কত দিয়েছে? কিছুই ফাইনাল হয়নি? আরে ছাড়ুন, পাণ্ডুয়া থেকে ডানকুনি এলাকা আমাদের, দাদার আশীর্বাদ ছাড়া কিছু হবে না। গাছের একটা পাতাও নড়বে না।

তিনমাস! তিনমাসের মধ্যে সব সেটেল করে ফেলব। বর্ষার সময় কাজ হবে না। পুজো...পুজোর সময় ভিতপুজো। আপনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, আধার আর প্যান কার্ডের সফট কপি পাঠান উকিলবাবুর মেলে। কী...বলুন...ওকে, ডান।

চোয়াড়ে লোকটা এইবার চলে গেল। একরাশ মনখারাপ নিয়ে জানলার ধার থেকে সরে এল অনিমেষ। এসব কথা নিশ্চয়ই সে ইন্দুকে বলবে না।

বাপের মৃত্যুর পর মাসখানেকের মাথায় মেয়ে দুর্গাপুর থেকে অল্টো চেপে এসে বাড়ির সব জিনিসগুলো বেচে দিয়ে গেল। খাবার টেবিল, খাট-আলমারি, ফ্রিজ, টিভি, কাচের বাসন...সব! একটুও কাঁদল না। যাবার সময় পাড়ায় বলে গেল তার বাড়িতে এ সব রাখার জায়গা নেই। বাবাকে-মাকেই সে রাখতে পারেনি তো এই সব ফালতু জিনিস! রাম চ্যাটার্জি বা তাঁর স্ত্রী বুঝতে পারেননি যে এসব তাঁরা রেখে যেতে বাধ্য হবেন। যে শখের চেয়ারে বসে একদিন তিনি পা নাচাতে নাচাতে মানুষকে অপমান করেছেন, সেই চেয়ারে বসে এবার এক অটো ড্রাইভার তার মেয়েকে কোলে করে নামতা পড়াবে। চেয়ারটি তাকে বকশিশ হিসাবে চ্যাটার্জির মেয়ে দিয়েছে। বাবার কোনো স্মৃতিছায়া সেখানে সে খুঁজে পায়নি। রাম চ্যাটার্জির মেয়ে এখন বাংলা সিনেমা-র শেফালি। ডান্সার। মিসেস চ্যাটার্জিও নেই আজ। তাঁরা বাড়িটাকে রেখে গেছেন। যেটা এই মুহূর্তে মৃত্যুর অপেক্ষায়!

আর হ্যাঁ, অনিমেষরা মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ❖

ছবি : শৈবাল দত্ত

সহযাত্রী
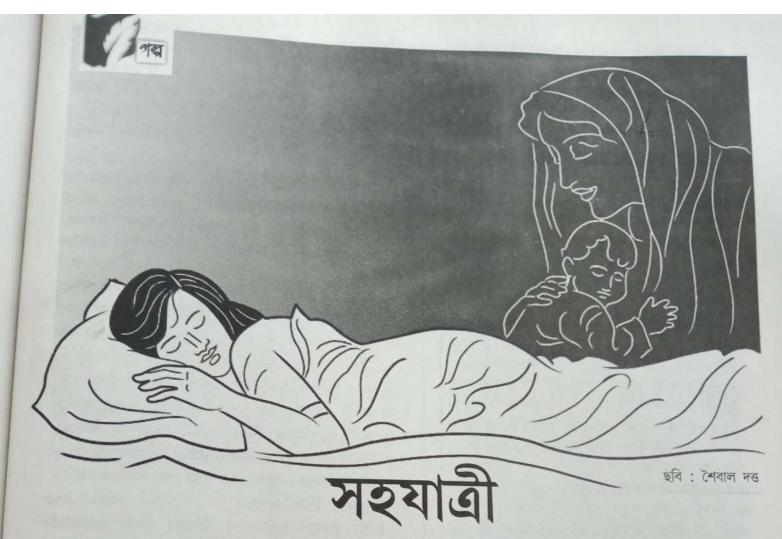
রূপক চট্টরাজ

শিয়ালদহ-নিউদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস বর্ধমান স্টেশন ঢোকার আগেই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল সোমালির। জেনে গেল ওর নাম দীধিতি। এ. সি. টু-টায়ারের প্যাসেজের একদিকের জোড়া সিটে তার স্বামী ডাঃ বিমল রায় ও সাত-আট বছরের ছেলে আকাশ। দুজনেরই মাথা চাদর মুড়ি দিয়ে ঢাকা। এ. সি.-র ঠান্ডা থেকে বাঁচবার চেষ্টা মনে হয়। দীধিতি চাকরি ছেড়ে এখন হাউস-ওয়াইফ।

সোমালির মনে হল মেয়েটির চোখ-মুখ ঘিরে রয়েছে একটা চাপা বিষণ্ণতা। কানে কর্ড গুঁজে একমনে কী যেন পড়ে যাচ্ছে সে মোবাইলে সর্বক্ষণ। মনে হয় ওর পৃথিবী বোধহয় মোবাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সোমালি একফাঁকে মানসের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, মেয়েটি সুন্দরী তবে বড্ড বেশি ঠান্ডা প্রকৃতির। সবসময় কেমন চুপচাপ।

স্ত্রীর মুখে এমন কথা শুনে হেসে ফেলল মানস। হাসতে হাসতেই ঠাট্টা করে বলল, মনে হয় ক্যালসিয়ামের অভাব। তারপর আড়চোখে এক ঝলক দেখে নিল মেয়েটিকে। দেখল ওর মুখে তেমন রূপটান নেই। পাতলা চেহারার ওপর চোখ-মুখ কাটা কাটা। যেন শ্বেতপাথর খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে এক প্রতিমার মুখ।

কৌতূহলী সোমালি জিজ্ঞাসা করল দীধিতিকে, সেই থেকে মোবাইলে কী দেখছেন অত মন দিয়ে বলুন তো?

দীধিতি সলজ্জভাবে বলল, কিছু না। এই একটা কবিতা পড়ছি।

—কবিতা পড়ছেন! কার লেখা?

—কার আবার, আমার ছেলেমানুষি।

—আপনার লেখা কবিতা! ও মাই গড! তার মানে আপনি কবি?

—আরে না, না। তেমন কিছু নয়। স্রেফ টাইম পাস। বলতে পারেন সময় কাটাতেই এসব।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বললেই হল। শোনাতেই হবে এখন একটা কবিতা।

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল দীধিতির ফর্সা মুখ। মাথা নীচু করে মোবাইল দেখে দেখে একটা কবিতা পাঠ করল ও।

কবিতা শুনে অবাক হয়ে গেল সোমালি। কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলল।

মানস স্বগতোক্তি করার মতো করে বলে উঠল—চমৎকার! বাঃ বাঃ!

দীধিতি আরো লজ্জা পেল মানসবাবুর কথায়। কান থেকে কর্ড খুলে মোবাইলের সুইচ অফ করে দিল ও।

দীধিতির কাছে ওর চাকরি ছাড়ার কারণ জানতে চাইল সোমালি। দীধিতি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপচাপ বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর সে চোখ বুজে স্মৃতির ভান্ডার হাতড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর চাপা গলায় দীধিতি বলতে শুরু করল, আমার স্বামী এক হাসপাতালের ডাক্তার আর আমি আইটি সেক্টরের সফট্‌ওয়ার ইঞ্জিনিয়ার। স্বামীর ব্যস্ততা হাসপাতাল ও চেম্বার নিয়ে আর আমার যা কাজের চাপ—ডিউটি কখনো দিনে কখনো রাতে। বিয়ের বছর দুয়েক পরে ছেলে জন্মাল। ওকে তো আয়া আর কাজের মাসির হাতেই ছেড়ে দিতে হল।

আবার চুপচাপ হয়ে গেল দীধিতি। একটা অস্বস্তিকর নৈঃশব্দ্য জড়িয়ে ধরল পরিবেশটাকে। সোমালি ভাবল, আলোচনায় এখন পূর্ণচ্ছেদ টানতে চাইছে দীধিতি। তাই সে বলল, কী হল? হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেলেন যে?

দীধিতি সোজা হয়ে বসল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তারপর আর কী? বাধ্য হয়েই চাকরি ছাড়তে হল। তাই তো চাকরিতে ইস্তফা দেবার পর শুরু হল আমার গৃহবধূর জীবন।

—বাধ্য হয়ে কেন? জানতে চাইল সোমালি।

—কারণ ততদিনে আকাশের যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। অকপটে স্বীকার করল দীধিতি।

—কী সর্বনাশ হল ছেলের? ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল সোমালি।

—আকাশ কানে শুনতে পেলেও কথা বলতে পারে না। আর সবসময় কেমন ঝিমিয়ে থাকে। বলেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল দীধিতি।

একটু উত্তেজিত হয়েই সোমালি বলল, কেন?

ডাক্তারবাবুরা বললেন, ছেলে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির অটিজম বেবি। জেন ওয়াই গ্রুপের বাচ্চা। একথা শোনার পর আমার

মনের অবস্থাটা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন।

চিকিৎসকদের অভিমত, বাচ্চাটি অকালে মানসিক অবসাদের শিকার। বাচ্চার কাছে কথা না বলা এবং নিঃসঙ্গতার কারণেই এই রোগ। আগে এসব রোগ খুব একটা হত না। কারণ তারা একান্নবর্তী পরিবারে জন্মাত। এবং তাদের কাছে কথা বলার লোকের অভাব ছিল না।

—এখন এ ব্যাপারে কী করছেন? কথার মাঝখানে বলে বসল সোমালি।

—চিকিৎসা করাচ্ছি। আমি সঙ্গ দিচ্ছি। এই তো ওর চিকিৎসার জন্য আমরা দিল্লি যাচ্ছি।

—আমার এক্তিয়ারের বাইরে একটা প্রশ্ন করব? কিছু মনে করবেন না তো?

—এতে মনে করার কী আছে? আপনি বলুন।

—চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্তটা কি আপনার ব্যক্তিগত? নাকি ডাক্তারবাবুর পরামর্শ?

—সে অনেক কথা। সেসব শুনে বোর হবেন। ভাববেন আমি জ্ঞান দিচ্ছি। মৃদু হেসে বলল দীধিতি।

—না ভাই, বোর হব না। আপনি বলুন, আমি শুনতে চাই। অবশ্য বলতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

—ঠিক আছে, বলব। মৃদু হেসে উঠে দাঁড়াল দীধিতি। হাসতে হাসতেই বলল, ডিনার দিচ্ছে। ছেলেকে একটু দেখি। বলেই ডাঃ রায় ও আকাশের দিকে এগিয়ে গেল দীধিতি।

—কথার অন্যথা যেন না হয়। ডিনারের পর কিন্তু শুনব। সোমালি বলল।

ডিনারের পর পরিবেশটা কেমন থমথমে। সবাই চুপচাপ। দীধিতি একসময় নিজে থেকেই শুরু করল, স্বগতোক্তি করার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, সন্তান জন্ম নিলে মেয়েরা নতুন করে জন্মায়। সন্তানকে জীবনে সফল হতে গেলে কোনো একজনের উৎসাহ বা অনুপ্রেরণার দরকার। সন্তানের আসল শিক্ষক মা। বাবা রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের মতো। বাবা টাকা-পয়সা, বই-পত্র, টিউটর প্রভৃতির জোগানদার। আর মায়ের ভূমিকা হেডমিস্ত্রির মতো। মা সন্তানের জন্মদাতা ও প্রকৃত শিক্ষক। 'এভরি চাইল্ড ইজ অ্যান এক্সপেরিমেন্ট ইন লাইফ'। আমি সেই এক্সপেরিমেন্টই করে চলেছি। চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্তটা আমি নিজেই নিয়েছি। এখন ছেলেকে নিয়ে

আমার সময় কেটে যায়। মাঝেমধ্যে মনের খিদে মেটাতে পড়াশোনা করি, কবিতা লিখি। ব্যস—। দিব্যি কেটে যায় সময়।

কথাগুলো বলেই উদাস দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল দীধিতি। টলটলে জলের মতো স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ প্রসন্নতা খেলা করতে লাগল তার চোখে-মুখে। চাদর-বালিশ টেনে নিয়ে শরীরটাকে এলিয়ে দিল বার্থে।

দীধিতির কথাগুলো কেমন যেন বিষণ্ণ করে তুলল সোমালি ও মানসকে। কেমন যেন ক্লান্ত-অবসন্ন মনে হতে লাগল। নরম বালির মতো দুঃখগুলো ঝুরঝুর করে ঝরে পড়তে লাগল তাদের মনের ভেতর। নিজের নিজের বার্থে গায়ের চাদর টেনে ওরা ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সোমালি তলিয়ে গেল ঘুমের অতল তলে। অচিরে স্বপ্নের মধ্যে তার মনের পর্দায় ভেসে উঠল একটা মুখ। বেশ চেনা চেনা। কোথায় যেন সে দেখেছে তাকে। অবাক হয়ে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বেশ খানিকটা সময়। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় তার মনে হল মুখটা তো তার চেনা। শ্বেতপাথরে গড়া এক মাতৃমূর্তি। নিখুঁত ভাস্কর্য। সন্তান কোলে জননী। তবে কি মূর্তিটা মা-মেরির?

মানসের ডাকে কাঁচা ঘুমটা ভেঙে গেল সোমালির। মানস ব্যস্তভাবে বলল, ওঠো ওঠো, কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশন এসে গেছে।

সোমালি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। চোখ কচলে চারদিকটা একবার দেখে নিল।

আওয়াজে দীধিতিরও ঘুম ভেঙে গেল। ও মুখের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে বলল, এখানে নামছেন! আপনারা দিল্লি যাবেন না?

—না ভাই, এখানেই দিদির বাড়ি। কটা দিন কাটিয়ে যাব। আপনার সঙ্গে হয়তো আর কোনোদিন দেখা হবে না। তবে স্মৃতি থেকে যাবে। চিন্তা করবেন না, দেখবেন সব কালো মেঘ কেটে যাবে একদিন। ঈশ্বর আপনার নিশ্চয় মঙ্গল করবেন। চলি ভাই। বলতে বলতে সোমালি ট্রেন থেকে নামার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

দীধিতি উঠে বসল। ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে ভাবল—সুখী দম্পতি। ❖

বিবিধ লেখা

পাকিস্তান

জয়ন্ত ঘোষাল

এই মুহূর্তে আমি লাহোরের আনারকলি বাজারের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। চারিদিকে অজস্র দোকান। সুবিস্তৃত এলাকা। একদিকে ফলের বাজার। বিরাট বিরাট তরমুজ, আপেল, পেঁপের সম্ভার। আবার তারপর শুরু হচ্ছে জামা কাপড়ের বাজার। সালোয়ার সুট, রেডিমেড কাপড়ের দোকান, পাঠান সুট, সালোয়ার সুট, পাঠান সুটের দোকান। এরপর আসছে খাওয়া-দাওয়ার দোকান। একের পর এক দোকানের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখনো মনে হয় যেন কলকাতার চাঁদনিচক বাজার। বেশ ঝলমলে পোশাক। কাপড়ে সবুজ রং-এর আধিক্য চোখে পড়ার মতো। কালো বোরখা পরা মেয়েরা আসছে-যাচ্ছে। বেশ মোটা গোঁফওয়ালা পাঞ্জাবি পাকিস্তানি রয়েছে। বহু দোকানদার পাঞ্জাবি। মিষ্টির দোকান, দুধের দোকান এইসব কিন্তু রয়েছে যথেষ্ট। যে সময়ের কথা বলছি সেটা ছিল ১৯৯০ সাল। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তখন বেনজির ভুট্টো। দেশের সাধারণ নির্বাচন হচ্ছে। আমি গেছি সেই ভোট কভার করতে। সেবারের ভোটে বেনজির ভুট্টো হেরে গেলেন। বিপুল ভোটে জিতলেন পাঞ্জাবের পাকিস্তান মুসলিম লিগের পাঞ্জাবি নেতা নওয়াজ শরিফ। হাঁটতে হাঁটতে একটা বইয়ের দোকানের কাছে এসে দাঁড়ালাম। ইসলামিক বইয়ের সম্ভার চোখে পড়ার মতো। কুর-আন তো আছেই। নানান রকমের উর্দু বই। তার মধ্যে একটা বই দেখলাম লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম গবেষক এক পন্ডিতের লেখা 'ইসলাম এন্ড মডার্নিটি'। পাকিস্তানি টাকায় বইটা কিনলাম। আবার হাঁটছি, এবারে ফুটপাতের ওপর দেখলাম ফেলা আছে পাকিস্তানের পত্রপত্রিকা। প্রচুর খবরের কাগজ আর প্রচুর ম্যাগাজিন বের হয় পাকিস্তান থেকে। লাহোর থেকে বোধহয় সবচেয়ে বেশি। অবাক হয়ে যাচ্ছি, দেখছি সেখানে একটা পুরোনো 'সানডে পত্রিকা'! 'সানডে পত্রিকা' তো এখন বন্ধই হয়ে গেছে। তো সেই সানডে পত্রিকা' সংখ্যাটির প্রচ্ছদ নিবন্ধ ছিল বেনজির ভুট্টো। প্রচ্ছদে ছবি বেনজির ভুট্টোর। তিনি সিংহাসনে বসে আছেন। বইটা কিনে ফেললাম। যত দাম লেখা আছে তার চেয়ে ডবল দামে বিক্রি হচ্ছে এখানে। তো দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে এখানে কি ভারতীয় পত্র-পত্রিকা বিক্রি হয়? বলল এমনিতে তো আসার পারমিশন নেই কিন্তু আসে গোপন পথে। অর্থাৎ সোজাকথা কালোবাজার। বইয়ের কালোবাজারি পাকিস্তানে কিন্তু সাংঘাতিক। সেইবার পাকিস্তানে যাওয়ার আগে এক প্রবীণ সাংবাদিক বলেছিলেন যে, ভারতীয় ফিল্মের ম্যাগাজিন যত পারো নিয়ে যাও। আর পাকিস্তানের বন্ধু-বান্ধবদের সেগুলো উপহার দিও। বিশেষত বাড়ির মেয়েরা হচ্ছে ভারতের ফিল্ম ম্যাগাজিন এর পোকা। আমি যে সময়টার কথা বলছি তখন কিন্তু এত স্যোশাল মিডিয়া ছিল না, এত ইন্টারনেটের প্রভাব ছিল না। এখন যেরকম মোবাইলে স্পর্শ করলেই পাকিস্তান কেন গোটা পৃথিবীর সমস্ত খবর জানতে পারে। হনুলুলুর নতুন নায়িকা তিনি কি করছেন সেটাও আপনি হয়তো জেনে ফেলবেন কিন্তু ৯০ সালে তো সেই পরিস্থিতি ছিল না। আমি অনেক ফিল্মফেয়ার, স্টারডাস্ট এসব পত্র-পত্রিকা নিয়ে গেছিলাম। তবে সেই সময় বাজারে ভিডিও ক্যাসেট এসে গেছে। টেলিভিশনের সঙ্গে তখন ভিসিআর, ভিসিডি লোকে কিনত। আর ভিডিও ক্যাসেটের অনেক লাইব্রেরি ছিল দিল্লিতে। কলকাতাতেও তৈরি হয়েছিল। আমরা ক্যাসেট ভাড়া করে নিয়ে এসে সিনেমা দেখতাম, মূলত পুরোনো ছবি। পাকিস্তানের আনারকলি বাজারে দেখলাম যে একটা জায়গা আছে যেখানে সমস্ত ইলেকট্রনিক্স জিনিস বিক্রি হচ্ছে, টেলিভিশন এবং ভিসিআর বিক্রি হচ্ছে তার পাশাপাশি আছে সমস্ত ভিডিও ক্যাসেটের আর অডিও ক্যাসেটের দোকান। সেই সময় পাকিস্তানের প্রচুর সিরিয়াল জনপ্রিয় হয়েছিল। পাকিস্তানের টেলিভিশনে আর সেই সমস্ত সিরিয়ালগুলোর ভিডিও ক্যাসেট তৈরি হয়ে বিক্রি হত। অনেক সময় সেগুলো তৈরি হত। যাকে বলে নকল। পাকিস্তানে খুব জনপ্রিয় একটা সিরিয়ালের নাম ছিল 'ধূপছায়া'। সেখানে একটা ডাক্তারের জীবনের পটভূমিতে সেই সিরিয়ালটা তৈরি হয়েছিল। আমাদের দেশে যে রকম বাংলা সিরিয়াল এখন যেরকম জনপ্রিয় সিরিয়ালগুলো সাংঘাতিকভাবে লোকে দেখে। এমনকী আমার বেশ মনে পড়ে টিভিতে যখন রামায়ণ-মহাভারত শুরু হয়েছিল তখন তো সকালবেলা রোববার রাস্তাঘাট শুনশান হয়ে যেত শুধু এই সিরিয়াল দুটো দেখার জন্য। আর রামায়ণ-মহাভারতের টাইটেল সং তখন রাস্তায় হাঁটতে গেলে প্রত্যেকটা বাড়ি থেকে ভেসে আসত। আর খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এই সিরিয়ালটা। সেরকমই 'ধূপছায়া' সিরিয়ালটা পাকিস্তানে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কয়েকটা ভিডিও ক্যাসেটও কিনলাম।

আসলে আমি গেছিলাম ভোট দেখতে। সে ভোটের গল্প তো নিশ্চয়ই বলব কিন্তু পাকিস্তানের যে জনসমাজ সেই জনসমাজের

যথার্থটা দেখা ছিল আমার প্রবল আগ্রহের বিষয়। দিল্লি থেকে এত কাছে লাহোর শহর পাকিস্তান এয়ারলাইন্সে যখন এলাম তখন আধঘন্টা সময় লেগেছে টেনেটুনে বাড়িয়েও যদি ল্যান্ড করা হয় তাহলে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। অথচ এই দুটো দেশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব এত কম হলেও মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক দূরত্ব এখন কীরকম সাংঘাতিক বেড়ে গেছে। যেন সহস্র যোজন দূরত্ব। হিন্দিতে কথা বললে লাহোরের মানুষরা কিন্তু বুঝতে পারে।

চারদিক দেখতে দেখতে হাঁটছি। যতই যাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি শুধু মানুষের ভিড়। এই তো একটা মস্ত বড়ো দোকান। আখরোট, কিসমিস, কাজু, খেজুর এইসবের আর তার মধ্যে চলছে ঠেলাগাড়ি। এমনকী রিকশা, ছোটো ছোটো অটো লাহোরে খুব জনপ্রিয়। আনারকলি বাজার নিয়ে অনেক গল্প আছে। কথিত আছে যে, এই বাজারটা প্রায় দুশো বছরের পুরোনো। সম্রাট আকবর তার পুত্র সেলিমের সঙ্গে নর্তকি আনারকলির সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি, সেই কারণে তিনি আনারকলিকে লাহোর ছাড়া করেছিলেন।

যাই হোক বাজার দিয়ে তো হাঁটছি। ধনিরাম বাজারে নানান রকমের সাইনবোর্ড দেখছি। সেই গলিতে গিয়ে দেখলাম একের পর এক শুধু পানের দোকান। নানান রকম মানুষ সেখানে নানান রকমের সুপুরি নানান রকমের মসলা দিয়ে পান খেতে ভালোবাসে। লাহোরের মেজাজটা সেই মুঘল আমলের কথাই মনে করিয়ে দেয়। নর্তকী এবং গায়কদের এক সময় এই এলাকায় দাপট ছিল। সেই আনারকলি বাজারে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা হল। সেই ব্যবসায়ীর নাম আনোয়ার। সে বলল, এই আনারকলি বাজারের চাকচিক্য এখন আর নেই, একসময় ছিল।

মনে পড়ে লাহোরে বেশকিছু সিনেমা হল ছিল। এই সিনেমা হলগুলো একদম দেখতে আমাদের মফস্বলের পুরোনো সিনেমা হলের মতো। আমার তো কলকাতা শহরের বিজলি, ছবিঘর এইসব সিনেমা হলের কথা মনে পড়ছিল সেগুলো দেখে। এখন অবশ্য পাকিস্তানে সেই সব সিনেমা হলগুলো আর নেই। আমি বেশ কয়েকবার পাকিস্তানে গেছি। যখনই গেছি ওই সিনেমা হলগুলোর সন্ধান করতে চেয়েছি। হঠাৎ একদিন দেখলাম সিনেমা হলগুলো একদম আমাদের দেশের মতোই বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের যেমন কলকাতা শহরে কত সিনেমা হল ছিল, এখন সেই সিনেমা হলগুলো সমস্ত শপিংমল হয়ে গেছে। আর শপিংমলের মধ্যে সিনেমা দেখার সুযোগ এসেছে। পাকিস্তানেও ঠিক তাই হয়েছে। পুরনো সিনেমা হলগুলো প্রায় সবই হয়ে গেছে শপিং মল। যখন প্রথম সিনেমা হল দেখতে গিয়েছিলাম পাকিস্তানে তখন সেই সিনেমা হলগুলোর বাইরে (প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা) দেখেছিলাম যে বিরাট বিরাট ফেস্টুন আঁকা। আমাদেরও তো ওইরকম আঁকা হত। এমনকি অনেক শিল্পীরা এসে রং দিয়ে নায়ক নায়িকাদের ছবি আঁকত। পরবর্তীকালে সেই রং দিয়ে আঁকা উঠে গেল। এল কাগজে আঁকা ছবি। সেগুলো পরপর আঠা দিয়ে দেয়ালে লাগিয়ে নির্মিত হত বিরাট বিরাট নায়ক নায়িকাদের বিজ্ঞাপন। সেবার যখন গেছি, গিয়ে দেখছি যে, ওখানে কিন্তু ভারতের দিলীপ কুমার আর তিনজন খানও খুব জনপ্রিয়। এদিকে দেবানন্দ আর রাজ কাপুর তাদেরও কিন্তু জনপ্রিয়তা কিছু কম ছিল না। এই সব নায়ক নায়িকাদের মতো দেখতে পাকিস্তানের নায়ক নায়িকাদের অনেকটা অর্থাৎ দিলীপ কুমারের মতো অনেকটা স্টাইল নকল করেছে ওখানকার একজন অভিনেতা। তাকে দূর থেকে দেখে মনে হবে এ তো আমাদের দিলীপ কুমার। তার পরে জানলাম যে না তিনি পাকিস্তানের অভিনেতা। অনেক সময় পাকিস্তানের যারা মানুষজন তারা এই ভাবে বলত আমাকে যে; উনি হলেন আমাদের দিলীপকুমার, পাকিস্তানের দিলীপকুমার, পাকিস্তানের রাজকুমার, পাকিস্তানের দেব আনান্দ। এটা থেকে আর একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি যে, বলিউডের প্রভাব সেটাও কিন্তু প্রবল ছিল পাকিস্তানের জনসমাজে। কাবুলে এরকমটা অনেক সময় হয়। কাবুলে গিয়েও অনেক সময় ভারতীয় নায়ক নায়িকাদের ছবি দেখেছি। সে দেশেও দেখেছি যে বলিউড খুব জনপ্রিয়। লাহোরের একজন সাংবাদিক বন্ধু ছিলেন আমার সঙ্গে। তিনি বললেন শুধু নায়ক নায়িকা নয় গায়ক-গায়িকাদের ক্ষেত্রেও কিশোর কুমার, মোহাম্মদ রফি, মুকেশ খুবই জনপ্রিয়। পাকিস্তানের এরকম অনেক শিল্পীকে আমরা বলি পাকিস্তানের মোহাম্মদ রফি। আমি এখনও ভাবি যে ভারত-পাকিস্তানের মানুষের যেমন সম্পর্ক সেখানে এই বলিউড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পারভেজ মোশারফ সরাসরি বলতেন যে তিনি বলিউড ছবির বিরাট ভক্ত। একবার তিনি বলেছিলেন যে, রেখাকে তাঁর খুব ভালো লাগে। রেখার ছবি দেখতে রীতিমতো দিনের কাজ সেরে রাতে তিনি টেলিভিশনের পর্দায় বলিউডের ছবি দেখেন। এই সংস্কৃতিটা যে এখন একেবারে বদলে গেছে তা কিন্তু নয়, এখনো রয়েছে। লাহোরের বাড়িগুলো তো খুব ঘেঁষাঘেষি করে অবস্থান করে এবং প্রচুর মানুষ সেখানে থাকে। সেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পাকিস্তানের সংস্কৃতির ভীষণ মিল।

খাওয়া দাওয়ার জন্য একটা বিশাল বাজার আছে। সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে 'ফুড স্ট্রিট'। আমাদের তো একটা ধারণা আছে যে পাকিস্তান মানেই ননভেজ খাওয়া-দাওয়া। কিন্তু পাকিস্তানে আমি গিয়ে যা শাকসবজি দেখলাম আর যেরকম তরিতরকারি ভিত্তিক রান্না দেখলাম, তাতে অবাক বনে যেতে হয়। বেগুন থেকে ফুলকপি সেইসবের ওপরে নানান রকমের রান্নার রেসিপি। ভাবা যায় না! আর শাক সবজির কোয়ালিটিও কিন্তু খুব খারাপ নয়। তবে এটা
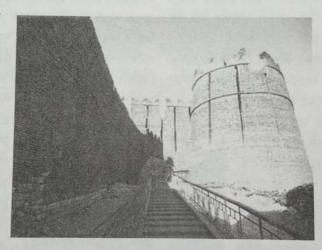
ঠিক যে পাকিস্তান আমিষ খাবারের জন্য বেশি বিখ্যাত। পাঞ্জাবের অমৃতসরে গেলে যেরকম মনে হয় সেরকম ভাবে এখানেও পাবেন ছাগলের মাংস, গরুর মাংস সবই। কিন্তু ছোটো মাছ আমি এখানে দেখতে পাইনি। করাচিতে অবশ্য ছোটো মাছ আমি দেখেছি। চিংড়ি মাছ দেখেছি। কেননা ওখানে সমুদ্র আছে। কিন্তু পাকিস্তানের লোকেরা আবার মাংস খেতে বেশি ভালোবাসে। এমনকী ডালে মাংস দিয়ে নানান রকমের রান্নার প্রিপারেশনও আছে।

তো আসুন আমরা এবার আনারকলি মার্কেট থেকে ফুড স্ট্রিট হয়ে এসে পৌঁছেছি 'হীরামান্ডি' বলে একটা জায়গায়। হীরামান্ডি কিন্তু পাকিস্তানের খুব বিখ্যাত জায়গা। আর হীরামান্ডির কাহিনির সঙ্গে পাকিস্তানের অতীতের সংস্কৃতি অনেকাংশে জড়িয়ে আছে। হীরামান্ডি হচ্ছে পাকিস্তানের যৌনকর্মীদের প্রাচীন এলাকা। ইসলামে কিন্তু যৌনকর্মীদের জীবিকা আইনসিদ্ধ নয়। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ আছে যেখানে এই আদিমতম ব্যবসা কার্যকর হয় না? এমনকী ইরানের মুসলিম কান্ট্রিতে গিয়েও আমি দেখেছি, সেখানেও এই আদিম ব্যবসা আছে। আর সেখানে ওরা টি ব্যবসাকে কীভাবে আইনি প্রক্রিয়ায় বৈধ করে তুললেন, সে কাহিনি শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। সেখানে অনেক সময় যৌনকর্মীরা তাদের যে মক্কেল আসে তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করে নেয়। তারপরে টাকা-পয়সার লেনদেন হয়ে যায়। মক্কেলরা যখন বিদায় নেয় তখন তিন তালাক দিয়ে বিয়েটাকে ভেঙে দেয়। এভাবে আইনত সেই যৌনাচারটাকে সিদ্ধ করে রাখা হয়। এটা একটা প্রাচীন প্রথা, এটা ইরানে হয়। পাকিস্তানে এই প্রথা নেই। তবে ইরানে যেরকম ভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রশাসন একেবারে খড়গহস্ত পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সেটা নয়। পাকিস্তান কিন্তু তুলনামূলকভাবে সে দিক থেকে অনেক লিবারেল।

হীরা সিংহ নামে একটা লোক ছিল। সেই হীরা সিংহকে নিয়ে প্রচুর প্রাচীন কাহিনি আছে। হীরা সিংহ রঞ্জিত সিংহের পরিষদের একজন মন্ত্রী ছিলেন। পরে রঞ্জিত সিংহের কাছ থেকে বিরাট ধন-সম্পদের অধিকারী হন আর হীরা সিংহ সেখানে একটা বিরাট বাজার গড়ে তোলেন। হীরা সিংহের নামেই সেই বাজার তৈরি হয়। আর সেই বাজার যা আজও হীরামান্ডি নামেই পরিচিত। এই হীরামান্ডিতে যখন ব্রিটিশরা আসে তখন এখানে যে নর্তকিরা ছিল তারা নানান রকমের ঠুমরি, গজল গাইত। তখন তাদের আলাদা সম্মানও ছিল। সমাজে তাদের কখনো অসম্মান করা হয়নি। পরে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীরা এখানে কিছুদিনের জন্য আসতেন। তারাই তাদের যৌন তাড়নায় হীরামান্ডিতে এই প্রথাটাকে আস্তে আস্তে নিয়ে আসে। এই হীরামান্ডিতে একটা তক্ষশীলা গেট আছে। সেই তক্ষশীলা গেট দিয়ে ঢুকতেই বিস্তীর্ণ এলাকাটা পড়ে। সেই হীরামান্ডিতে শাহি মোল্লা বলে একটা জায়গা আছে, যেটা ছিল একদা রাজার প্রাসাদ। যেটা এখন খন্দাহার। যেটাকে অনেক সময় 'রয়েল নেভার হুড' বলা হয়।

শাহী মোল্লা এই এলাকাটা নিয়ে বলিউডে একটা ছবিও তৈরি করেন। যার নাম 'কলঙ্ক'। লোকে বলে যে হীরামান্ডিতে এখন অবশ্য আগের মতো সেই আদিম ব্যবসা আর নেই। এখানে অনেক রকমের ব্যবসা দোকানপাট গড়ে উঠেছে। পাকিস্তানের বহু সাহিত্যে, উপন্যাসে লাহোর নিয়ে নানান রকমের ভ্রমণকাহিনি রচনায় ঘুরে ফিরে এসেছে এই হীরামান্ডি।

বলা হয় এই পাকিস্তানের পাঞ্জাব তার গৌরব গাঁথার সঙ্গে হীরামান্ডির কাহিনি লুকিয়ে আছে। হীরামান্ডির কাছে একটা খুব বিখ্যাত খাবারের দোকান আছে। সে দোকানটার নাম হচ্ছে কোকুনডেম। একটা সময় পারভেজ মোশারফ তখন তিনি সেনাপ্রধান, পরিবারকে নিয়ে খেতে আসতেন এখানে। এটি তাঁর খুব প্রিয় রেস্তোরাঁ। আর এখানে খুব ভালো মোগলাই খাবার বানানো হত। দোকানটা এখনো আছে। আমি শেষবার গিয়েও এই খাবারের দোকানে খেতে গেছিলাম। ফোল্ড রোডে সাহেব মোল্লার এই খাবারের দোকানটা আজও বিরাজমান।

ওয়াল সিটিতে রোশনাই গেট বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে কোকুনডেম নামে রেস্তোরাঁটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। এখনো সেখানে সন্ধেবেলা গজল হয় আর তার সঙ্গে অসাধারণ মোগলাই খানা পাওয়া যায়। পাকিস্তানের এই যে সংস্কৃতি এর সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির কোনো সংঘাত আপনার মনে হচ্ছে? আমার তো মনেই হচ্ছে না। তার কারণটা হচ্ছে যে ওখানে মানুষজনদের চরিত্র কিন্তু ভারতীয় মানুষদের চরিত্রের মতো।

লাহোর, ইসলামাবাদ, করাচি শহর কিন্তু তিন রকমের। লাহোর থেকে ইসলামাবাদে বাসে করে যাওয়া যায়। আমি অবশ্য সবসময় বিমানে এসেছি তার কারণ রাস্তা দিয়ে ইসলামাবাদে আসার অনুমতি পাকিস্তান সরকার ভারতীয়দের সাধারণত দেয় না। কিন্তু ইসলামাবাদের হাইওয়ে খুব ভালো। হাইওয়ের মাঝখানে মাঝখানে নানান রকমের বড়ো বড়ো ক্যাফে হয়েছে। ওই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাসে করে লাহোর থেকে ইসলামাবাদে আসার সময় মনেই হবে না যে এটা পাকিস্তান। আপনার হঠাৎ মনে হতে পারে যে আপনি বোধহয় নিউইয়র্ক শহর থেকে ওয়াশিংটনে আসছেন। আসলে পাশ্চাত্যের প্রভাব কিন্তু পাকিস্তানের ওপর প্রচণ্ড। খুব দামি দামি গাড়িও তো দেখা যায় শহরে। কিন্তু যে কথা বলছিলাম, এই তিনটে শহরের মধ্যে অনেক স্তর আছে, নানান রকমের তফাৎ আছে। লাহোর হল মূলত পাঞ্জাব অধ্যুষিত এলাকা। ব্যবসা-বাণিজ্যের শহর। সংস্কৃতিক

ভাবে খুব উচ্চ। শহরগুলো নানান রকমের উৎসবে সবসময় মুখরিত হয়ে আছে। কিন্তু ইসলামাবাদ অনেক চুন-সুরকি, কংক্রিটের শহর। ইসলামাবাদ হচ্ছে পাকিস্তান সরকারের রাজধানী। পাকিস্তানের মানুষেরও রাজধানী বটে। নানান রকমের বাংলো, নানান রকমের অট্টালিকা, সদর দপ্তর থেকে শুরু করে সংসদ, সুপ্রিম কোর্ট ভবন সবই তো এখানেই। কিন্তু করাচি হল আবার বাণিজ্যিক শহর। তুলনা যদি করতেই হয় তাহলে বলা যায় যে ইসলামাবাদটা হল আমাদের রাজধানী দিল্লি আর করাচিটা হল মুম্বাইয়ের সমতুল্য। করাচিতে সমুদ্র আছে। আমদানি-রফতানির একটা বিরাট ব্যবসা সেই করাচি বন্দর থেকে হয়। আবার করাচি শহরে দাউদ ইব্রাহিমের মতো লোক দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়ে থেকেছে। এই করাচিতে কিন্তু লালকৃষ্ণ আডবাণীর মতো মানুষের জন্ম। করাচিকে সব সময় পাকিস্তানের শাসক দল একটু ভয় পেয়ে এসেছে। তার কারণ এই করাচি নামক জায়গাটা সব সময় পাকিস্তানের রাজনীতিতে মৌলবাদী মূল স্রোতের সঙ্গে থাকেনি। করাচি অনেক সময়ই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আধুনিক উদারবাদী হতে চেয়েছে। একটা জিনিস বলা যায় যে লাহোরের যে সাংস্কৃতিক জীবন সেই সাংস্কৃতিক জীবনটা কিন্তু করাচি কিংবা ইসলামাবাদে পাওয়া যায় না। তা হলেও করাচিতে নানান রকমের সেমিনার-সিম্পোজিয়াম হয়ে থাকে। তার কারণ বনিক সংগঠনগুলোর দাপটেই করাচি শহরে এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করে। কিন্তু ইসলামাবাদটা হচ্ছে মূলত ডিপ্লোম্যাট। রাজনৈতিক নেতারা এখানে থাকেন। এখানে অনেক বেশি রাস্তাঘাট। ইসলামাবাদের বুকে ট্যাক্সি খুব একটা দেখা যায় না। আমি যখন প্রথম পাকিস্তানে গেছিলাম তখন দেখলাম যে ছোটো ছোটো ট্যাক্সি। সেই ট্যাক্সিগুলো হলুদ রঙের ছিল। সেগুলোতে কিন্তু লেখা থাকত সুজুকি। জাপান থেকে সুজুকি কোম্পানির কাছ থেকে নিয়ে ট্যাক্সিগুলো এখানে আনা হত। আমার বন্ধু আফজাল সে এখানে একটা নির্মাণ সংস্থায় চাকরি করে। ওকে জানিয়েছিলাম, দিল্লি থেকে তোমরা গাড়ি নিলে তো খরচা কম হতে পারে। কারণ ভৌগলিক দূরত্বটা কম। জাপান থেকে নিয়ে আসা কস্টলি। তা সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার ভারতের থেকে সুজুকি নেয় না। অথচ জাপানের কাছ থেকে এই যে মারুতি নিচ্ছে এটা তো একটা বৈষয়িক ব্যাপারে অপরিপক্কতা। জবাবে আমার সেই বন্ধু বললেন হতে পারে অপরিপক্কতা, কিন্তু এটা খুব স্বাভাবিক একটা প্রতিক্রিয়া। পাকিস্তান কখনোই ভারতের তৈরি করা সুজুকি গাড়ি নিতে পারে না। তাতে কিন্তু রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তানের ক্ষতি হয়ে যাবে।

এখন অবশ্য পাকিস্তানে নিজেদের গাড়ি পাকিস্তান নিজেরাই তৈরি করছে। ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি গড়ে উঠেছে। আর সেটা কিন্তু পাকিস্তানের জন্য একটা বিরাট পাওনা। পাকিস্তানের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিপুলভাবে সাহায্য করতে পারে এই নতুন অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি।

পাকিস্তানের প্রবীণ সম্পাদক নাজাম শেঠির সঙ্গে খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল। প্রবীণ সাংবাদিক, লাহোরে আবার একটা বইয়ের দোকান চালাত। কাঁচের শোরুম। বাইরে থেকে বইগুলো দেখা যাচ্ছে। খুব যে একটা বিরাট বইয়ের দোকান তা নয়। কিন্তু সম্ভার খুব ভালো। শুধু পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত বই নয়, ইসলামিক লিটারেচার নয়, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রকাশনার বইও তিনি রাখেন। অনেকদিন ধরেই তিনি ব্যবসা করেন। তিনি ভারতবিরোধী বলে পরিচিত ছিলেন, সাংবাদিক হিসেবে তিনি মডারেট ছিলেন। আমাকে পাকিস্তানের সমাজের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের নানান রকমের একটা সেরিব্রাল আড্ডা হত। সেখানে দেশভাগের কথা আছে, তো সেখানেই ইকবালের গল্পও হত, মির্জা গালিবের শায়েরি পড়া হত, গান শোনা হত। এরকম একটা পাকিস্তানও কিন্তু আছে। এমনিতে আমাদের একটা ধারণা এবং সেটা কিছুটা অসত্য নয় যে—পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত সমাজ বলে কার্যত কিছু নেই। হয় খুব ধনী, না হয় খুব গরিব। এই ব্যাপারটা এখনও আছে। আরব দুনিয়ায় আফগানিস্থানে তো বটেই মধ্যবিত্ত সমাজও গড়ে উঠেছে এটা একটা খুব ভালো লক্ষণ। আমি পরবর্তীকালে পাকিস্তানে গিয়ে দেখেছি যে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী রাস্তায় মিছিল করছে, বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। এই দৃশ্যটা কিন্তু গণতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে খুব ভালো। যেটা পাকিস্তানের পরিপ্রেক্ষিতে খুব দুর্লভ। কিন্তু পাকিস্তানের একটা মধ্যবিত্ত সমাজ যে নেই তা কিন্তু নয়, আছে। কিন্তু পাকিস্তানের যে সাধারণ মানুষ তাদের মধ্যে এখনও রক্ষনশীলতা প্রবল ভাবে রয়েছে। যারা ব্যবসায়ী বা দোকানদার তাদেরকে ঠিক মধ্যবিত্ত বলা হবে কি হবে না বুঝতে পারি না। কেননা প্রচুর দোকানদার এবং ব্যবসায়ী আছে যারা খুব বড়োলোক। লাহোরে প্রত্যেক বছর ঘুড়ি উৎসব হয়; ওরা বলে পাতাঙ্গ। বিশেষ করে পুরোনো লাহোরে তো পতঙ্গ উৎসব খুব বিখ্যাত। ঘুড়ির উৎসব বসন্তকালের একটা বিশিষ্ট উৎসব। মানুষের সঙ্গে মানুষের সদ্ভাব, মৈত্রী, ভালোবাসার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই উৎসব। নানান রঙের ঘুড়ি পাওয়া যায়। আনারকলি মার্কেট থেকে শুরু করে নামিদামি নতুন নতুন এমনকী ইমরান খানের যে নিজের মল সেখানে গিয়েও দেখেছি আধুনিক ডিজাইনের ঘুড়ি বিক্রি হচ্ছে। অনেক সময় যখন সেখানে ভারত-পাকিস্তান পতঙ্গ প্রতিযোগিতা হয়। ভারতের জাতীয় পতাকা দিয়ে তৈরি করা ঘুড়ি আর পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা দিয়ে তৈরি করা ঘুড়ির মধ্যে কাটাকুটি খেলা। কে জিতবে, কে হারবে একটা দারুণ উত্তেজনা তৈরি হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে ভারত এবং পাকিস্তানের বিরোধিতার সম্পর্ক এবং যে চোরাবালির মতো একটা তিক্ত আবহ সেটা যে অসত্য তা নয়। কিন্তু সেটাকে মদত দিচ্ছে
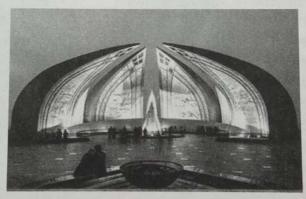
একটা মোল্লাতন্ত্র, আইএসআই এবং সেনাবাহিনী। সাধারণ মানুষও যে খুব বেশি ভারতবিরোধী এমন নয়। আসলে একটা জিনিস আমি দেখেছি সাংবাদিক হিসেবে তো অনেক বেশি ঘুরেছি যতক্ষণ না পর্যন্ত সেখানকার মানুষের বাড়িতে যাই এবং বাড়িতে গিয়ে থাকি সেখানে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করি, তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সেই সমাজটাকে জানা যায় না। পাকিস্তানে যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ পাকিস্তানকে চেনা যায় না। কিন্তু পাকিস্তানের যে বন্ধুদের বাড়িতে গেলাম এবং সেখানে গিয়ে তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করলাম এবং তারা অনেক খোলামেলা কথা বলছিল সেখানে দেখছিলাম যে তারা কিন্তু ভারত পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবসা চাইছে। এবং পাকিস্তানের মানুষের মধ্যেও তো অনেক স্তর আছে। গাড়ি করে যাচ্ছি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি। এক বন্ধুর গাড়ি তিনি আমাকে পাকিস্তানটা ঘোরাচ্ছেন। তো সেই আফজাল ওখানকার ব্যবসায়ী সে আমাকে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল এই যে দেখছেন গরিব মানুষগুলো ওদের দিকে তাকাবেন না। আমি বললাম কেন? ভিখারী তো আমাদের ভারতেও প্রচুর আছে। বলল, না। এখানে ইসলামে ভিক্ষা নিষিদ্ধ। কিন্তু এরা আসলে মাদকাশক্ত। আমি বললাম যে, তাই! বলল, হ্যাঁ। এটা আপনি লাহোর কেন ইসলামাবাদ, করাচিতেও পাবেন।

আমি অফিসে খবর পাঠাতাম ওই সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস থেকে। ফ্যাক্স মেশিন তখনো আসেনি। সিপিও-তে গিয়ে টেলেক্সে খবর পাঠাতাম। একদিন সন্ধেবেলা খবর পাঠাতে তারঘরে গেছি। শুনশান, লোকজন খুব কম আছে। শুধুমাত্র একজন-দুজন সরকারি কর্মচারী। তাদের কাছে আমি আমার লেখা নিয়ে গেছি। তারা ওটাকে পাঠিয়ে দেবেন। এই সময়ে তারঘরে অনেকে আসছেন মাঝে মাঝে। কারণ অনেকের বাড়িতেই ফোন নেই। তারা ফোন করতে আসে। সব সময় যে তারা আন্তর্জাতিক কল করতে আসছেন তা নয়। পাকিস্তানেই এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ফোন করার জন্য কিছু মানুষ আসেন। এরকম ফোন করতে আসা এক রমণীর কান্না শুনতে পেলাম তারঘরের মধ্যে। আর খুব জোরে জোরে হাউমাউ করে কাঁদছে সেই মহিলা। উর্দু ভাষায় অনেক কথা বলছেন। কিছুটা বুঝলাম কিছুটা বুঝলাম না। যা বুঝলাম তার মানেটা হচ্ছে যে, উনি গর্ভবতী ছিলেন তারপরে মেয়ে হয়েছে এখন আবার আরেকটি মেয়ে হয়েছে। তো পরপর দুবার কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ায় স্বামী এতটাই রুষ্ট হয়েছেন যে ওনাকে রোজ মারধোর করছে আর সেই নির্যাতনে তার হাত পা কেটে গেছে এবং মহিলা তার বাপের বাড়িতে ফোন করছেন আর বাবাকে বলছেন যাতে তার বাবা তাকে নিয়ে যায়। এই কষ্ট তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। অনেক বোঝানো সত্ত্বেও তার স্বামী কিছুতেই শুনছে না। তাকে রোজ মারছে। রোজই প্রায় নেশাগ্রস্ত হয়ে আসে এবং পেটায়। খুব দুঃখজনক একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে বাবা ফোনে এসব কথা শুনে ওকে যে নিয়ে আসবে এমন নিশ্চয়তা কিন্তু দিচ্ছে না। আমি যখন এগুলো শুনছিলাম ওখানে অনেকে ছিল। যারা স্থানীয় কর্মচারী তারাও শুনছিল। আমি তো ওখানে বিদেশি কিন্তু যারা শুনছিল তারা খুব সহজভাবেই ব্যাপারটা নিচ্ছে। অর্থাৎ এটার জন্য যে খুব একটা তারা হন্তদন্ত হয়ে তার কাছে যাচ্ছে বা তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে এমনটা নয়। মনে হল যেন প্রায়ই সেই মহিলা আসে কান্নাকাটি করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা লোক এসে হাজির হল হন্তদন্ত হয়ে। বুঝলাম যে লোকটি হচ্ছে ওর স্বামী। সে এসে প্রায় চুলের মুঠি ধরে মহিলাকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে আমাদের সকলের চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল এত সাহস যে তুই বাপের বাড়িতে ফোন করছিস? আজ তোকে আমি দেখাচ্ছি মজা। বলে তাকে নিয়ে চলে গেল। জানি না এরপর সেই মহিলার কী হয়েছিল। তার পরিবারের শেষ পর্যন্ত কী পরিণতি হয়েছিল। কিন্তু এটা বোঝা যায় যে পাকিস্তানে রক্ষণশীল এবং সামন্ততান্ত্রিক ভয়ংকর একটা শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে।
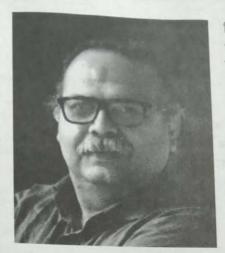
পাকিস্তান যেন এক রূপকথার শহর। যতবার পাকিস্তানে যাই মন ভরে না। প্যারিস, লন্ডনের চেয়েও আমার পাকিস্তান যেতে এইজন্য ভালো লাগে যে—মনে হয় পাকিস্তানে যেন একটা রহস্যের খনি আছে। আর খনি থেকে মণিমুক্তো উদ্ধার করতে যে মজা সেই মজা আমি কোথাও পাই না। পাকিস্তানে আমার এক প্রিয় সাংবাদিক বন্ধু আমাকে আলাপ করে দিয়েছিল লাহোরের মুসলিম কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে। এখনো সেই প্রবীণ সম্পাদকের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব। তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল লাহোর প্রেসক্লাবে। বিরিয়ানি খাওয়ার পর তিনি বললেন, একটা পান হবে নাকি? আমি বললাম—নিশ্চয়ই। লাহোরের পান খাই। লাহোরের পান খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম যে এত কথা হল কিন্তু খুশবু এই প্রবীণ সাংবাদিক এর নামটা তো জানা হল না। তা সেই সাংবাদিক প্রথম আলাপে বলেছিলেন যে আসলে আমি আমার নামটা জানাতে ইতস্তত করছি। এই জন্য যে আমার নামটা ভারতে তোমাদের কাছে খুব প্রিয় নাম নয় বরং খলনায়কের নাম। তাই ভয় পাচ্ছি প্রথম আলাপেই যদি বন্ধুত্বটা নষ্ট হয়ে যায়। আমি বললাম যে বলুন বলুন আমার সেইসব সমস্যা নেই। শেক্সপিয়ার তো বলে গেছেন, নামে কি আসে যায়। তা উনি বললেন আমার নাম ওরঙ্গজেব। আসলে আমরা ভারতের লোকেরা আকবরকে ভালোবাসি আর শিখেছি আকবরের দীন-ই-ইলাহীর মন্ত্র। কিন্তু ওরঙ্গজেব তিনি তো জ্ঞানব্যাপী মসজিদ তৈরি করেছেন বারাণসীতে শিবের লিঙ্গ ভেঙে। এই পারসেপশনটা একটা সাংঘাতিক বিভাজনরেখা তৈরি করে। ওরঙ্গজেব এর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর দেখলাম যে ওইরকম উদার, অমায়িক আর ওরকম সুলেখক পন্ডিত খুব বিরল। পাকিস্তানের গল্প ফুরোবে না। পাকিস্তানের কথা অমৃত সমান। ❖

স্মৃতির অতলে ব্যঙ্গ পত্রিকা

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

গগনেন্দ্রনাথের হাত ধরে যে বাংলার ব্যঙ্গচিত্রের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল তা পি. সি. এল বা কাফী খাঁর হাতে আন্তর্জাতিক রূপ পায়। বাংলায় ব্যঙ্গচিত্রের জোয়ার আসে। গগনেন্দ্রনাথের পর চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়কুমার বসু, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, প্রমথ সমাদ্দার, শৈল চক্রবর্তী ব্যঙ্গচিত্রের নতুন ধারাকে অব্যাহত রাখেন। ঠিক এরই পরবর্তীকালে আসেন রেবতীভূষণ, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, চণ্ডী লাহিড়ী, রবিন, কুমার অজিত, কমল সরকার, অহিভূষণ মালিক, চক্রধর শর্মা, ওমিও, ভাদুভাই, কাজী, সুফি, সুকুমার, নারায়ণ দেবনাথ, রামকৃষ্ণ, অমল চক্রবর্তীর মতো ব্যঙ্গচিত্রীরা। কিন্তু এর পরে একটা বিশাল শূন্যতা গ্রাস করে। বহু পরে দেবাশীষ দেব উৎসাহী হন ব্যঙ্গ ছবি আঁকতে। অধুনা বেশ কিছু তরুণ ব্যঙ্গচিত্র আঁকছেন। উদয় দেব, ঋতুপর্ণ, তমাল ভট্টাচার্য, সেন্টু, অভী প্রমুখেরা। কিন্তু শুধুমাত্র ব্যঙ্গচিত্রকে জীবিকা করে আর কেউ এগিয়ে আসছেন না।

বাংলার ব্যঙ্গচিত্রের অবনতির মূলে রয়েছে অনেকগুলি কারণ। প্রথমতএখানের কোনো আর্ট কলেজে ব্যঙ্গচিত্র আলাদাভাবে শেখানো হয় না। দ্বিতীয়ত কোনো কাগজই এখন আর ব্যঙ্গচিত্রকে সেভাবে স্থান দেয় না। তৃতীয় কারণটি ব্যঙ্গ সাহিত্য ও ব্যঙ্গ পত্রিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে শিবরাম চক্রবর্তী; পরবর্তীতে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, নবনীতা দেব সেন, তারাপদ রায়-এর পর আজ বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গধর্মী রচনার মান অনেকখানি পড়ে গেছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে ব্যঙ্গধর্মী সাহিত্য ও ব্যঙ্গচিত্র একে অন্যের পরিপূরক। ব্যঙ্গ সাহিত্যের ভাষা অনেক সময় চিত্রভাষা হয়ে ওঠে। তখন সেগুলো আর সাহিত্যের অক্ষরে আবদ্ধ থাকে না। হয়ে ওঠে চিত্র। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের সঙ্গে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্যের সঙ্গে চঞ্চলকুমারের আঁকা ব্যঙ্গচিত্র, পরশুরামের গল্পের সঙ্গে নারদের এবং শিবরাম ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের সঙ্গে শৈল চক্রবর্তীর আঁকা ব্যঙ্গ-চিত্রের যুগলবন্দি দেখলে একথাটাই মনে আসে যে ব্যঙ্গচিত্র অনেকখানিই ব্যঙ্গ সাহিত্যকে তুলে ধরতে পারে। এ যুগলবন্দি না হলে রম্যরচনা সার্থক হয় না।

ব্যঙ্গ সাহিত্য নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু একথা ঠিক যে ব্যঙ্গ সাহিত্যে যেমন এসেছে আকাল, ঠিক তেমনি করেই একে একে বন্ধ হয়ে গেছে সবকটি ব্যঙ্গ পত্রিকাও। ১৮৭৪ সালে শুধু ব্যঙ্গচিত্র ও ব্যঙ্গ সাহিত্যের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল বসন্তক, হরবোলা ভাঁড়। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আজ সবকটি পত্রিকা বন্ধ। বসন্তক থেকে শুরু করে যষ্টিমধু, সরস কার্টুন আজ সবই কালের গভীরে। একমাত্র টিমটিম বাতি জ্বালিয়ে চলেছে 'পত্রপাঠ' পত্রিকাটি। 'বিষয় কার্টুন' পত্রিকাটিও অনিয়মিত। আজকের প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকাগুলির প্রতিযোগিতার বাজারে এ ধরনের একক প্রচেষ্টায় ব্যঙ্গ ও হাসির পত্রিকা কতদিন চলতে পারে! এদেশের ব্যঙ্গচিত্রের আদিপর্ব ইংরেজদের হাতেই শুরু হয়েছিল। বলা বাহুল্য তাদের প্রেরণার উৎস ছিল LONDON PUNCH। দিল্লি থেকে যে 'INDIAN PUNCH' বা 'INDIAN CHARIVARI'

Amrita Bazar Patrika

INEFFICIENT POLICEMEN AND OFFICERS TO GO

SCHEME TO REORGANISE U.P. POLICE ADMINISTRATION

PROVISION FOR MORE AMENITIES

Training Period Cut Short: Committee Recommends Increase In Stipends

RECOVERY PLAN FOR WESTERN EUROPE ACCEPTED

PARIS CONFERENCE ADOPT REPORT

16 Nations Pledged For Co-ordinated Action To Solve Problems

DESIGN TO SET PAKISTAN AGAINST INDIA IN U.N.O.

Sensational Disclosure: Sends' Secret Deals With Malcontents

প্রকাশিত হয়েছিল তার মালিক, সম্পাদক, চিত্রকর সবাই ছিলেন ইংরেজ। কিন্তু সে ঐতিহ্যও মাত্র একশো বছরে ম্লান হয়ে গেছে।

'INDIAN PUNCH' ১৮৫৯ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়। এখানে রামগোপাল ঘোষ, জেমস্ লং ও স্টেনকার, বাহাদুর শা, তাঁতিয়া টোপী, রানি লক্ষ্মীবাঈ, ফিরোজ শাহ ও নানা সাহেবকেও ব্যঙ্গ- বিদ্রূপ করা হয়। 'ইন্ডিয়ান পাঞ্চ'-এর প্রথম কার্টুন—'The Times' পত্রিকার সংবাদদাতা স্যর উইলিয়াম হাওয়ার্ড রাসেল-এর সঙ্গে লর্ড ক্লাইভ উটের পিঠে বসে আছেন (নিবন্ধ—কমল সরকার— চতুষ্কোণ পত্রিকা---মাঘ ১৩৭৯)। ঠিক এর পরবর্তীকালে Indian Charivari ছাড়া ইন্ডিয়ান পাঞ্চ অনুকরণে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যঙ্গ পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে। 'The New Indian Punch (Anglo Bengali), বসন্তক (১৮৭৪), Oriental Figaro (১৮৭৫), Momus (১৮৭৬)। বম্বে থেকে Nusserwanji Dorabji Apakhtyer প্রকাশ করলেন ইংরাজি-গুজরাটি-পার্সি পাঞ্চ যেটি ১৮৮৮ খ্রিঃ Hindi Punch-এ রূপান্তরিত হয়। লখ্নৌ থেকে Oudh Punch (১৮৭৭), লাহোর থেকে Delhi Punch, মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোর থেকে Telephone ও Kabber, দাক্ষিণাত্য থেকে Deccan Punch এবং বাংলায় বিদূষক (১৩২০) পত্রিকা। এই সমস্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে Indian Charivari-র খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন Col. Percy Wyndham। আট বছর পত্রিকাটি সগৌরবে চলেছিল। লর্ড নর্থব্রুক, রিপন প্রমুখ বড়লাটগণ এবং বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখেরা পত্রিকাটিতে নিয়মিত চাঁদা দিতেন (বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ রচনা—ড. যূথিকা বসু)।

আজ বিজ্ঞাপনের দণ্ড কেড়ে নিয়েছে 'অবাঞ্ছিত' ব্যঙ্গচিত্রের স্থান, পত্রিকার পাতা থেকে। অথচ বিদেশে এই ব্যঙ্গচিত্রের ওপরেই সবচেয়ে বেশি দুরত্ব দেওয়া হয়। এমনকী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে প্রকাশিত W.T. Sted সাহেবের 'Review of Reviews' পত্রিকাটিতে 'Current History in Carricature' নামে পৃথিবীর নানা বিষয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হত। অথচ আমাদের দেশে ব্যঙ্গচিত্রের মতো এতবড়ো একটা Instant Art আজ সম্পূর্ণ অবহেলিত।

ফেরা যাক এখানকার ব্যঙ্গ পত্র-পত্রিকার কথায়। ১৮৭৪ সালে প্রথম দুটি সার্থক ব্যঙ্গ পত্রিকার উন্মেষ ঘটে। বসন্তক ও হরবোলা ভাঁড়। অবশ্যই এই সময়ে বটতলার বইয়ে ও পুরোনো পাঁজিতে বেশ কিছু উডকাট জাতীয় ব্যঙ্গচিত্রের দেখা পাওয়া যায়। ১৮৪০ থেকে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ ছিল বটতলার ছাপাখানার স্বর্ণযুগ। বটতলার বইগুলির মধ্যে কিছু স্থূল ব্যঙ্গকৌতুকমিশ্রিত গ্রন্থ পাওয়া যায়। আর তাতে কিছু কিছু ছবিও ছাপা হত। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন এ সম্পর্কে লিখেছেন—'অন্তঃপুরের ছবিগুলিতে সেকালের মেয়েদের সামাজিক আচরণের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ ইঙ্গিত খুব পুরোনো নয়। তবে আমাদের কাছে খুব কৌতুকাবহ।'

বসন্তক (প্রকাশ ৩১ জানুয়ারি ১৮৭৪) পত্রিকাটিই হচ্ছে সেযুগের মধ্যমণি। পত্রিকাটিতে প্রচুর পাতা ভর্তি ছবি থাকত। হরবোলা ভাঁড়-এও বেশ কিছু ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হত। তবে সেগুলি ছিল মূলত সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র। সেই সময়ে ইংরাজি কাগজগুলিতেও কিছু কিছু ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হত। যেমন Times of India, Servents of India বা পরবর্তীকালে The English Man প্রভৃতি কাগজে কিছু কিছু বিদেশি কাগজের পুনর্মুদ্রিত ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হত। কিন্তু স্বাধীন চিন্তার কোনো স্থান সেখানে ছিল না। The English Man ছিল The Statesman-এর পূর্বসূরি। এতে ভারতীয়দের নিন্দা করে বিদেশি কার্টুন ছাপা হত। এরই প্রতিবাদে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব ব্যঙ্গচিত্রী হিসেবে। কুখ্যাত ইলবার্ট বিল যেভাবে দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেছিল তাতে রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা দূরের কথা, সামান্য সমালোচনা করতেও সবাই ভয় পেত। ফলে দেশি কাগজগুলিকে সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেই তুষ্ট থাকতে হত। তবে 'বসন্তক' অবশ্যই এর ব্যতিক্রম। কারণ পরবর্তী পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

THE
ENGLISHMAN:
Being the Close of the PAPER so called.
With an EPISTLE concerning the
Whiggs, Tories, and New Converts.

— Servetur ad imum
Qualis ab incepto processerit, & sibi constet. Hor.

By RICHARD STEELE, Esq;

LONDON:
Printed for Ferd. Burleigh, in Amen-Corner. 1714.
(Price Six-Pence.)

১৮৬৪ সালে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে

সংবাদপত্রে ব্যঙ্গচিত্রকে তুলে ধরার জন্য অমৃতবাজারের অবদান সর্বাধিক। কিন্তু সেই সময়ে অমৃতবাজার পত্রিকাতেও কলকাতা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন নিয়ে বেশ কিছু ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হলেও, প্রধানত সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সেগুলির উদ্ভব। অবশ্য বিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা এমন কিছু পত্র-পত্রিকার দেখা পাই যেগুলিতে নিয়মিত ব্যঙ্গচিত্র ও ব্যঙ্গলেখা ছাপা হত। যেমন প্রবাসী (১৯০১) সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ (১৯১৩) সম্পাদক জলধর সেন, বিদূষক (১৯১৩) সম্পাদক ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসুমতী (১৯২২), বিদূষক সাপ্তহিক সম্পাদক শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, বেপরোয়া (১৯২১) সম্পাদক বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য, শনিবারের চিঠি (১৯২০) সম্পাদক যোগানন্দ দাশ, সচিত্র শিশির (১৯২৩) সম্পাদক বিদ্যারত্ন মজুমদার, রবিবারের লাঠি (১৯২৯) সম্পাদক কেশবচন্দ্র সেন, অচলপত্র (১৯৪৯) সম্পাদক দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল, যষ্টিমধু সম্পাদক কুমারেশ ঘোষ প্রভৃতি। এছাড়াও মজলিস, রসরাজ, মুষল-মুদগর, বঙ্গীয় ভাঁড়, বিদ্রূপ, নদের চাঁদ, লবডঙ্কা, বোতল পুরাণ, জন্মভূমি, অবতার, সম্মার্জনী, বৃহস্পতি, টেক্কা প্রভৃতি রসাত্মক কাগজ নিয়মিত প্রকাশিত হত। তবে এ ধরনের কাগজের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল 'সচিত্র ভারত'। সচিত্র ভারতে নিয়মিত বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রীরা ছবি আঁকতেন এবং বহু স্বনামধন্য লেখকের লেখায় তা সমৃদ্ধ ছিল।

এছাড়াও আরও কিছু পত্র-পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলোর বেশ কিছু 'বসন্তক' প্রকাশের আগে প্রকাশিত হত। মূলত বটতলার ছাপার সুবাদে তখন এ ধরনের তির্যক ও বিদ্রূপধর্মী বেশ কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তবে যে কথা আগে উল্লেখ করেছি যে প্রথম বিশুদ্ধ ব্যঙ্গ পত্রিকা কিন্তু বসন্তক-ই। বসন্তক-এর আগে প্রকাশিত হয় 'ব্রাহ্মণসেবধি' (১৮২৯), সম্বাদ রসরাজ (১৮৩৫), পাষণ্ড পীড়ন (১৮৪০), আক্কেল গুরুম (১৮৫৭), দলবৃত্তান্ত (১৮৩২), দুর্জ্জনদমন মহানবমী (১৮৪৭), যেমন কর্ম তেমনি ফল (১৮৬১), সংবাদ কাব্যরত্নাকর (১৮৪৭), সর্বশুভকরী (১৮৫৩), কাব্যপ্রকাশ (১৮৬৪), অবকাশরঞ্জিকা (১৮৬২), জ্ঞানাঙ্কুর (১৮৭২), পুলিশ গেজেট ও বঙ্গবার্তাবহ (১৮৭১), মহাশাপ বাল্যবিবাহ (১৮৭৩), হরবোলা ভাঁড় (১৮৭৪), সহোদর (১৮৭৪), হুতম (১৮৭৫), বঙ্গীয় ভাঁড় (১৮৭৫), কল্পদ্রুম (১৮৭৮), পঞ্চানন্দ (১৮৭৮), খেয়াল (১৮৭৯), লাঠ্‌ঠৌষধি (১৮৮০), রসিকরাজ (১৮৮১), গোপাল ভাঁড় (১৮৮২), বিদ্রূপ (১৮৮২), দিল্লীকা লাড্ডু (১৮৮২), কলির নতুন অবতার (১৮৮৩), নন্দিকেশর (১৮৮৩), ভূষণ্ডী কাকের নকশা (১৮৮৪), ভূত (১৮৮৪), কালভৈরব (১৮৮৪), সমাজ সংস্কার (১৮৮৪), পীর গোরাচাঁদ (১৮৮৮), মাসিক (১৮৯০), রসরাজ (১৮৯১), নন্দী (১৮৯৪), কোঁৎকা (১৮৮৮), সুলভ পত্রিকা (১৮৫৩) প্রভৃতি অসংখ্য পত্র-পত্রিকা। এরা যে কোনো বিষয় নিয়ে মেতে উঠত এবং পারস্পরিক আক্রমণও কম চালাত না। সমাচার চন্দ্রিকা একবার সম্বাদ রসরাজকে 'জগদ্ধঞ্চক বিশ্বনিন্দুক' বলে গালি দিয়েছিল। সংবাদ প্রভাকরও, রসরাজকে 'ঘৃণিত, অপবিত্র, অস্পৃশ্য, অবাধ্য, পরনিন্দা ও পরানিষ্ট পরিপুরিত্র কুৎসিত অপদার্থ রসহীন রসরাজ' বলে নিন্দা করেছিল। সম্বাদ রসরাজ-এর গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সঙ্গে মসীযুদ্ধ চালাবার ইচ্ছায় বাবু গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদ রসমুদগর প্রকাশ করেন।...সমুদ্রযাত্রা নিয়ে একসময়ে জন্মভূমি ও সাহিত্য পত্রিকার মধ্যে বিতণ্ডা শুরু হয়। সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গরচনা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তা স্মরণযোগ্য।—'ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এসব রচনা খুব Original-Smart-to the Point না হইলে effective হয় না। এটা শুধু গালাগালই বটে।' বাংলা ব্যঙ্গরচনার অধিকাংশ এই জাতীয়। এসব রচনার মূল্য সমসাময়িক যুগেই প্রায় নিঃশেষিত। তবু সেই সময়ের একটা আংশিক চিত্র ফুটে ওঠে এই সমস্ত পত্রিকার লেখনীতে। তার মূল্যও অনেকখানি।

মাসিক বসুমতী, প্রবাসী ও ভারতবর্ষ সিরিয়াস সাহিত্য পত্রিকা হলেও, বিনয়কুমার বসু, চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশ সিংহ, জ্যোতিষ সিংহ, শৈল চক্রবর্তীর ব্যঙ্গচিত্র তখন সেখানে নিয়মিত প্রকাশিত হত। 'দর্পণ' কাগজে অনেক নব্য ব্যঙ্গচিত্রীরই তখন হাতেখড়ি হয়েছিল। এ তো গেল সাময়িক পত্রের কথা। কিন্তু দৈনিক কাগজগুলোও কি এ ব্যাপারে নিস্পৃহ ছিল! না তা ছিল না! ১৯২৩ সালে প্রভাতী দৈনিকরূপে প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৯৩৭ সালে যুগান্তর পত্রিকা নবপর্যায়ে প্রকাশিত হয়। এই দুটি কাগজেই প্রতিনিয়ত ব্যঙ্গচিত্র স্থান পেয়েছে। সেসময় পরিবর্তন সাপ্তাহিকে নিয়মিত পুরো পাতা জুড়ে ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হত। আজকাল পত্রিকায় নিয়মিত ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হত। এখন শুধুই প্রতিদিন ও উত্তরবঙ্গ সংবাদ দৈনিকে একটি করে পকেট কার্টুন ছাপা হয়। কিন্তু তারপর! এক বিরাট শূন্যতা গ্রাস করেছে ব্যঙ্গ সাহিত্য ও ব্যঙ্গ পত্রিকা জগৎকে! সাপ্তাহিক বর্তমানে 'যষ্টিমধু' বলে একটি রম্যরচনার পাতা নিয়মিত প্রকাশিত হত। তাও বন্ধ। আসলে কোনো পত্রিকাই আজ ব্যঙ্গচিত্রকে সেভাবে স্থান দিচ্ছে না। নিখাদ ব্যঙ্গ পত্রিকাও নেই। ফলত নতুন করে এই ব্যঙ্গচিত্রকে পেশা করে আর কেউ এগিয়ে আসছেন না। ব্যঙ্গ পত্রিকা, ব্যঙ্গ সাহিত্য ও ব্যঙ্গচিত্র এই ত্রয়ীর মিলন-এর স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে গেছে। ❖